শনিবারের চিঠি

১৩৩১

বাংলার নবযুগ ও বঙ্কিমচন্দ্র

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৬

এইবার বঙ্কিমচন্দ্রের এই নবধর্ম্মে স্বদেশপ্রীতি বা জাতীয়তা-মন্ত্রের স্থান কি, তাহার একটু সুবিশেষ আলোচনা করিলেই বাংলার নবযুগ ও বঙ্কিমচন্দ্রের কথা একরূপ শেষ হইবে। যে স্বাজাত্যবোধ একদা বাংলা দেশেই জন্মলাভ করিয়া সমগ্র ভারতে একটা নূতন ধর্ম্মচেতনার মত বিস্তারলাভ করিয়াছিল তাহার আদি প্রবক্তা যে বঙ্কিম, সে বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মতত্ত্বের আর সকল তত্ত্ব ওই এক তত্ত্বে আসিয়া ঠেকিয়াছে—জাতি ও সমাজ, এই দুইয়ের এক অর্থ দাঁড়াইয়াছে স্বদেশ। ইংরেজী শিক্ষার ফলে ও রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষে ক্রমে ভারতবাসী সকল শিক্ষিত সমাজের মন স্বদেশ-প্রেম নামক যে একটা বিলাতী সেন্টিমেন্টে রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা অবশেষে একটা ধর্ম্মবিশ্বাসের মত গম্ভীরতা লাভ করিল বাঙালীর এই মন্ত্রদৃষ্টির প্রভাবে। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে বাংলা দেশে ওই ভাবের যে যজ্ঞানল জ্বলিয়াছিল—তাহার মন্ত্রোচ্চারণে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই অক্ষরগুলা ছিল বটে, কিন্তু ধর্ম্মের বিশুদ্ধি ছিল না; বঙ্কিম যে বিলাতী patriotism-এর ঘোরতর বিরোধী ছিলেন, সেই বস্তুই ভাবোদ্দীপনার সহায় হইয়াছিল। বঙ্কিমের দেশপ্রীতি মনুষ্যত্বসাধনারই একটা অঙ্গ—সেই বৃহত্তর ধর্ম্মেরই একটা বড় সাধন। ইহার মূল প্রয়োজন রাষ্ট্রিক নয়—সামাজিক; সুলভ পরজাতি-বিদ্বেষ নয়—স্বজাতি-প্রীতিই ইহার একমাত্র প্রেরণা; এমন কি, জগৎ-প্রীতি ও ভগবৎ-প্রীতিতেই তাহার শেষ পরিণতি। এই স্বদেশপ্রীতিকেই বঙ্কিমচন্দ্র মনুষ্যত্বলাভের অতিশয় সহজ ও নিশ্চিত উপায় বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালের মত গোড়া হইতেই ভগবানের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জগৎ-সংসারের প্রতি উদাসীন থাকিলে একালে আর

চলিবে না; ভগবানের জন্য সংসার-ত্যাগ নয়—মানুষের জন্যই আত্ম-ত্যাগ করিতে না পারিলে চিত্তশুদ্ধি হইবে না; ভগবান-লাভ তো পরের কথা, আপনাকেও হারাইতে হইবে—এই সত্য বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন; এবং য়ুরোপীয় জাতিসকলের স্বাজাত্যনিষ্ঠা হইতে ইঙ্গিত পাইয়া, তিনি সেই patriotism-কে শোধন করিয়া—তাহাকেই মানুষের একটি মহৎ ধর্ম্মরূপে গড়িয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার সেই অনুশীলন-ধর্ম্মের সকল অঙ্গ সংযোজন ও সুসম্পূর্ণ করিয়া লওয়ার পরে, তিনি যেন শেষে এই মন্ত্রটিকে বিদ্যুৎবিকাশের মত আপন অন্তরে দর্শন করিলেন এবং ঋষির মতই উচ্চারণ করিলেন—"ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন দেশপ্রীতিই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম"। তারপর—

ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন; এই জন্য সর্ব্বভূতে প্রীতি ভক্তির অন্তর্গত এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ। সর্ব্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম্ম নাই।

আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, পশু-প্রীতি, দয়া এই প্রীতির অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্বদেশপ্রীতিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলা উচিত।

বঙ্কিমচন্দ্র ইহার সবিশেষ ব্যাখ্যাও করিয়াছেন, তাহার কিছু নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) যদি সমাজ-ধ্বংসে ধর্ম্ম-ধ্বংস এবং মনুষ্যের সমস্ত মঙ্গলের ধ্বংস, তবে সব রাখিয়া আগে সমাজ রক্ষা করিতে হইবে। এই জন্য Herbert Spencer বলিয়াছেন, "The life of the social organism must as an end, rank above the lives of its units", অর্থাৎ, আত্মরক্ষার অপেক্ষাও দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

(২) আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা, দেশরক্ষা—জগৎরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু বাস্তবিক জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতির কোন বিরোধ নাই। যে আক্রমণকারী তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিব, কিন্তু তাহার প্রতি প্রীতিশূন্য হইব কেন? [মহাত্মা গান্ধীর আচরণ স্মরণীয়।]...জাগতিক প্রীতি ও সর্ব্বত্র সমদর্শনের এমন তাৎপর্য্য নহে যে পড়িয়া মার খাইতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যখন সকলেই আমার তুল্য, তখন আমি কাহারও অনিষ্ট করিব না। পর-সমাজের অনিষ্টসাধন করিয়া আমার সমাজের ইষ্টসাধন করিব না, এবং আমার সমাজের অনিষ্টসাধন করিয়া কাহারেও আপনার সমাজের ইষ্টসাধন করিতে দিব না। ইহাই যথার্থ সমদর্শন, এবং ইহাই জাগতিক প্রীতি ও দেশপ্রীতির সামঞ্জস্য।

(৩) আমি তোমাকে যে দেশপ্রীতি বুঝাইলাম, তাহা ইউরোপীয় Patriotism নহে। ইউরোপীয় Patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয়

Patriotism-ধর্ম্মের তাৎপর্য্য এই যে, পরসমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্ব্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে।...জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীয়ের কপালে এরূপ দেশবাৎসল্যধর্ম্ম না লিখেন।

এইখানে বোধ হয় একটা কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে যেমন ঐরূপ দেশবাৎসল্যের একটা উৎকট উন্মাদনা বাঙালীকে প্রায় বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল—তেমনই, তাহার কিছু পরেই অতি-উর্দ্ধ ভাব-স্বর্গ হইতে ঠিক বিপরীত ধর্ম্মের একটা সূক্ষ্ম বায়ুস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে—তাহাতে সেই বিধ্বস্ত সমাজের অবশিষ্টগণের ক্লীবত্ব ঢাকিবার বড় সুযোগ হইয়াছে। এই ধর্ম্মের নাম বিশ্বমানব-প্রেম; ইহার প্রধান লক্ষণ হইল—দেশ ও জাতির নামে নাসিকা কুঞ্চিত করা; খুব-বড়কে মৌখিক পূজা নিবেদন করিয়া, মাঝারি-বড়কে ধিক্কৃত করা, এবং তদ্দ্বারা খুব-ছোটর উপাসনাকে নির্ব্বিঘ্ন করিয়া আত্মসুখসাধন। সেই উন্মাদনার প্রতিক্রিয়া-মুখে এই ধর্ম্ম বড়ই আরামদায়ক হইয়াছিল, Nationalism যে কত বড় অধর্ম্ম—ভাবস্বর্গবাসী কবির মুখে তাহা শুনিয়া কুলচুরবিলাসী আত্মসুখ-লম্পটের আনন্দ আর ধরে না। অথচ, এইরূপ nationalism-কে গালি দেওয়া যে নূতন নয়, এবং তাহাকে গালি দিয়াও স্বজাতিপ্রীতি ও স্বদেশপ্রীতি যে একটা বড় ধর্ম্ম হইতে পারে—এ কথা এক পুরুষ পূর্ব্বেও একজন মহামনীষী প্রচার করিয়াছিলেন—সে সন্ধান কেহ লইল না; এ জাতির ঐতিহাসিক আত্মজ্ঞান এমনই। এক এক প্রহরে এক-একটা ডাক ডাকিলেই হইল—একজন যে ডাক ধরাইয়া দিবে, আর সকলে তাহাই ডাকিবে; কণ্ঠের কণ্ডুয়ননিবৃত্তি হইলেই হইল। যে ভূমা ও বিশ্বমানব-প্রীতির আজ এত প্রসার হইয়াছে—বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে এক মুহূর্ত্তও অস্বীকার করেন নাই; বরং ইহাই বুঝিয়াছিলেন যে, জাগতিক প্রীতির সহিত দেশপ্রীতির সামঞ্জস্যসাধন করিতে না পারায়, ভারতবর্ষে সার্ব্বজনীন মনুষ্য-ধর্ম্ম অবনতিগ্রস্ত হইয়াছে—আমাদের সামাজিক অবনতির একটা বড় কারণ ইহাই।

ভারতবর্ষীয়দের ঈশ্বর-ভক্তি ও সমদৃষ্টি ছিল। কিন্তু তাঁহারা দেশপ্রীতি সেই সার্ব্বলৌকিক প্রী তিতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা প্রীতিবৃত্তির সামঞ্জস্যযুক্ত অনুশীলন

নহে। দেশপ্রীতি ও সার্ব্বলৌকিক প্রীতি উভয়ের অনুশীলন ও পরস্পর সামঞ্জস্য চাই। তাহা ঘটিলে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিতে পারিবে।

এই কথাই, বোধ হয়, ধর্ম্ম সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের একটা খুব বড় কথা। পারমার্থিক আদর্শ, ও সেই আদর্শের সাধনায় ভারতবর্ষে জন-জীবন যে দিক দিয়া যতখানি সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকুক, এবং সেই আদর্শ অনুযায়ী তাহার সমাজ যতই সুবিহিত হউক—তাহার ঐতিহাসিক কর্ম্মজীবনের ধারা যে বার বার রুদ্ধ হইয়াছে, এবং মনুষ্যত্ববিকাশে বাধা ঘটিয়াছে, ইহার মত সত্যও আর কিছু নাই। এই সত্যকে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম উপলব্ধি করেন নাই বটে, কিন্তু তজ্জন্য যে সমস্যা, তাহাকে এমনভাবে জাতীয় সংস্কৃতি ও সংস্কারের অনুকূলে একটা নূতন ও উৎকৃষ্ট মন্ত্রের দ্বারা সমাধান করা, ইহাই তাঁহার মনীষার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। জাগতিক প্রীতিই মানুষের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম—তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বের মূলতত্ত্ব ইহাই বটে; কিন্তু তত্ত্বকে মানুষের ব্যবহারিক জীবনে সত্য করিয়া তুলিতে হইলে—মানুষকে নিঃস্বার্থ করিবার সহজ ও শ্রেষ্ঠ উপায়—এ যুগে এমন আর কিছু নাই। মনুষ্য-ধর্ম্মের সকল দিক চিন্তা করার পর সর্ব্বশেষে এই যে তত্ত্ব তাঁহার চিত্তে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার দৃষ্টির গভীরতাও যেমন—তেমনই তাঁহার বাস্তব-নিষ্ঠাও প্রকাশ পাইয়াছে। মনে হয়, ভারতের সেই প্রাচীন ধর্ম্মতত্ত্বকেই ভিত্তি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে নবধর্ম্ম প্রণয়ন করিয়াছিলেন—তাহার দৃঢ়তম খিলান হইল এই দেশপ্রীতি। আশ্চর্য্য বটে! কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা ও চিন্তাপ্রণালী যিনি আমূল পর্য্যালোচনা করিবেন, তিনি ইহাতে বিস্মিত হইবেন না; বরং জাতির চিন্তার ইতিহাসে তাঁহার এই দান যেমন অমূল্য, তেমনই যুগান্তকারী বলিয়া স্বীকার করিবেন। ভারতীয় ধর্ম্মের অঙ্গীকৃত করিয়া এই স্বদেশপ্রীতিকে এত বড় স্থান দিবার কল্পনাও পূর্ব্বে কেহ করে নাই।

উপরে উদ্ধৃত উক্তিগুলি হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে সমাজ ও স্বদেশ একই, অর্থাৎ দেশই সকল সমাজের অধিষ্ঠান-ভূমি। প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক কারণে, দেশ-কালের গূঢ়তর প্রভাবে, মনুষ্যজাতির গোষ্ঠী-বিভাগ অনিবার্য্য, এবং সেই কারণে স্বাজাত্যবোধও

স্বাভাবিক। কিন্তু ইহার চেতনা নানা কারণে কোথাও অপরিস্ফুট, কোথাও বা অসুস্থ আকারে পরিস্ফুট। ভারতবর্ষে একরূপ সমাজ-চেতনাই ছিল—এইরূপ জাতীয়তার চেতনা কখনও পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। পরে সেই প্রাচীন সমাজধর্ম্মও অটুট থাকে নাই, যুগান্তরের প্রয়োজন সত্ত্বেও, মানুষের ধর্ম্মকে সমাজধর্ম্মের সহিত যুক্ত করা হয় নাই—সমাজ একটা বাহিরের বন্ধনমাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; মানুষ তাহার মধ্যে স্ব ও পরের কল্যাণকে এক করিতে না পারিয়া শেষে মনুষ্যত্ব হারাইয়াছিল—তাহার আধ্যাত্মিক সাধনাও স্বার্থসাধনায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল, জীবনে আত্মোৎসর্গের অবকাশ অতিশয় সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল; জাগতিক প্রীতি বা সর্ব্বভূতের হিতসাধন—কর্ম্মে নয়, ধ্যানে ও ভাববিলাসে স্থান লাভ করিয়াছিল—শাস্ত্র-বচনের মত তাহা কেবল উচ্চারণ করিয়াই মনকে পবিত্র করা যাইত। তাই নব-যুগের নবধর্ম্মের প্রেরণা উত্তমরূপে উপলব্ধি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে-সমাজকেই সেই ধর্ম্মের প্রধান সাধনক্ষেত্র বলিয়া নির্ণয় করিলেন, তাহাতে এই দেশপ্রীতি হইল প্রত্যক্ষ সাধন; এমন কি ভগবৎ-প্রীতির এক ধাপ নীচেই তাহার স্থান! বহুর কল্যাণ-কামনায় একের আত্মোৎসর্গই যে বিশেষ করিয়া এ যুগের মানব-ধর্ম্ম, ইহা তিনিই প্রথম স্পষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন; এই অনুভূতিই পরে অপর এক মহাপুরুষের ধ্যানে ও কর্ম্মে আধ্যাত্মিক সত্যের মহিমা লাভ করিয়াছিল—সে কথা পরে বলিব। আজিও জগৎ ব্যাপিয়া যে সাগর-মন্থন চলিতেছে তাহার বিষবাষ্পে মূর্চ্ছিত ও উৎসন্নপ্রায় মানবসমাজ আর কিছুতেই রক্ষা পাইবে না—ওই অমৃতই একমাত্র ভরসা। উহারই সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে—"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"। উহার দ্বারাই মানুষ যেমন 'বলবান্' হইয়া 'আত্মা'কে লাভ করিবে, তেমনই দেশকে সমাজকে রক্ষা করিয়া, শুধু স্বজাতির নয়—সমগ্র মানবজাতির অকল্যাণ দূর করিবে।

আমরা দেখিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র যে আদর্শে তাঁহার ওই সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে চান, তাহা মূলে সেই প্রাচীন আদর্শ; রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতির পরিবর্ত্তে তিনি মনুষ্যধর্ম্মনীতিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। তথাপি সেই

সমাজকে তিনি এই যে একটি মন্ত্রের গ্রন্থিতে বাঁধিয়া দিয়াছেন, ইহাতেই সেই প্রাচীনকে সম্পূর্ণ আধুনিক পন্থায় স্থাপন করা হইয়াছে—সেই আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য করিয়াই এ যুগের প্রয়োজনকে পূর্ণভাবে বরণ করা হইয়াছে। ওই আদর্শ ও যুগের এই প্রয়োজন, এই উভয়ের সামঞ্জস্য করিয়া যদি একটা সমাজ-ব্যবস্থা সম্ভব হয়, এবং রাষ্ট্রনীতির সহিত সে ব্যবস্থায় বিরোধ না ঘটে—এ দেশে এমন কোন লোক-গুরুর আবির্ভাব হয় যাঁহার প্রতিভায় জাতির জীবনে ঐ মন্ত্র কার্য্যকরী হইয়া উঠে, তবেই এই মহামন্বন্তরে আমরা বাঁচিয়া থাকিব, নতুবা নহে—বঙ্কিমচন্দ্র ইহাই আশা ও বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

সর্ব্বশেষে আর একবার বঙ্কিমের এই মানবধর্ম্ম-বিষয়ক চিন্তার একটা সার-সংক্ষেপ করিয়া দিতেছি—তাঁহার নিজেরই কথায় তাহা প্রকাশ পাইবে, আমি সেইরূপ কয়েকটি উদ্ধৃত করিব মাত্র।

(১) এ দেশের আধুনিক ধর্ম্মের আচার্য্যেরা যে হিন্দুধর্ম্ম ব্যাখ্যাত ও রক্ষিত করেন, তাহার মূর্ত্তি ভয়ানক। উপবাস, প্রায়শ্চিত্ত, পৃথিবীর সমস্ত সুখে বৈরাগ্য, আত্মপীড় ইহাই অধ্যাপক ও পুরোহিত মহাশয়ের নিকট ধর্ম্ম।...এই মূর্ত্তি ধর্ম্মের মূর্ত্তি নহে—একটা পৈশাচিক পরিকল্পনা।

(২) "হিংসকদিগের হিংসা-নিবারণের জন্য ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে।...যদ্দ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয় তাহাই ধর্ম্ম"—ইহা কৃষ্ণোক্তি। ইহার পর উদ্ধৃত করিতেছি—"যাহা সাধারণের একান্ত হিতজনক তাহাই সত্য।" এখানে ধর্ম্ম অর্থেই সত্য শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে।

(৩) শিষ্য। আমার বিশ্বাস যে এইরূপ জীবন্মুক্তির কামনা করিয়াই ভারতবর্ষীয়েরা এরূপ অধঃপাতে গিয়াছেন।

গুরু। মুক্তির যথার্থ তাৎপর্য্য না বুঝাই এই অধঃপতনের কারণ।...যাহার চিত্ত শুদ্ধ এবং দুঃখের অতীত সে ইহলোকেই মুক্ত।...তাঁহাদের কর্ম্ম নিষ্কাম বলিয়া সে কর্ম্ম স্বদেশের ও জগতের মঙ্গলকর হয়; সকাম কর্ম্মীদের কর্ম্মে কাহারও মঙ্গল হয় না।...এ দেশের সকলে এইরূপ মুক্তিমার্গাবলম্বী হইলেই ভারতবর্ষীয়েরা জগতে শ্রেষ্ঠ জাতির পদ প্রাপ্ত হইবে।

(৪) ধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম অল্প লোকেই বুঝিয়া থাকে। যে কয়জন বুঝে, তাহাদেরই অনুকরণে ও শাসনে জাতীয় চরিত্র গঠিত হয়। এই অনুশীলনধর্ম্ম যাহা তোমাকে

বুঝাইয়াছি, তাহা যে সাধারণ হিন্দুর সহজে বোধগম্য হইবে, তাহার বেশি ভরসা আমি রাখি না। কিন্তু এমন ভরসা রাখি যে, মনস্বিগণ কর্ত্তৃক ইহা গৃহীত হইলে ইহার দ্বারা জাতীয় চরিত্র গঠিত হইতে পারিবে। জাতীয় ধর্ম্মের মুখ্য ফল অল্প লোকেই প্রাপ্ত হয়, কিন্তু গৌণ ফল সকলেই পাইতে পারে।

আর উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। শেষের উক্তিটিতে তাঁহার নিজের সেই ধর্ম্মজিজ্ঞাসার ফলাফল সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে সে বিষয়ে কত সজ্ঞান ছিলেন তাহাও বুঝিতে পারা যাইবে। যাহা তত্ত্বের সত্য মাত্র, তাহা মানুষের ধর্ম্ম নয়—জীবনে তাহা অনুভব-গোচর হইতে না পারিলে, সেরূপ তত্ত্ববিচার নিষ্ফল। বঙ্কিমচন্দ্র জানিতেন, এইরূপ তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠাই যথেষ্ঠ নহে—সেই সত্যকে প্রাণেও প্রত্যক্ষ করা চাই। যাহা জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি করিবার বস্তু তাহার ফল সমাজের উচ্চস্তরেই কিছু ফলিতে পারে; যদি উচ্চ হইতে নিম্নে সর্ব্বস্তরে একটা সামাজিক সমানুভূতির ধারা অব্যাহত থাকে, এবং যদি সেই তত্ত্ব জীবন-রস-বর্জ্জিত না হয়, তবেই তাহা উচ্চ হইতে নিম্নস্তরে আপনা-আপনি সংক্রামিত (filter down) হইতে পারে; তাহার যেটুকু জীবনীয় অংশ তাহা সর্ব্বস্তরের একটা সাধারণ কালচার বা চিত্তোৎকর্ষ রূপে ফলদায়ক হইয়া থাকে। তথাপি আমার মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে রামায়ণ-মহাভারতের মত কাব্য-পুরাণের শক্তি এবং সাফল্যের কথা কখনও বিস্মৃত হন নাই—জীবনেরই একটা রূপকে আশ্রয় করিয়া সেই যে মানবধর্ম্মের ব্যাখ্যা ভারতবর্ষীয় জনগণের চিত্তে এতকাল ধরিয়া একটা সংস্কৃতির স্থায়িত্ব রক্ষা করিয়াছিল, তাহার কারণ তিনি জানিতেন। এই জন্যই বোধ হয়, নূতন যুগের সাহিত্যসৃষ্টিতে শেষের দিকে তিনিও এই অভিপ্রায় করিয়াছিলেন;—পৌরাণিক ধর্ম্মের আধুনিক সংস্করণও যেমন তাঁহার অভিপ্রেত ছিল; তেমনই সেকালের কাব্যপুরাণকে আধুনিক ছাঁচে ঢালিয়া—জীবনের নূতন রূপ-সৃষ্টির কথাও ভাবিয়াছিলেন, তাই নব ধর্ম্মতত্ত্ব বা জীবন-তত্ত্বের ভাষ্যরূপে কাহিনী রচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আধুনিক উপন্যাসের রচনা-কৌশল ও ধর্ম্মব্যাখ্যার সেই প্রাচীন প্রণালী এই দুইয়ের সামঞ্জস্য একরূপ অসাধ্য-সাধন বলিলেই হয়; তাহাতে তিনি কি পরিমাণ সাফল্যলাভ

করিয়াছিলেন সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর ; এ প্রসঙ্গে আমি কেবল তাঁহার সেই অভিপ্রায় ও তাহার যে কারণ অনুমান করিয়াছি, তাহাই বলিয়া রাখিলাম।

নবযুগের সমস্যা ও তাহার সমাধানে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনা-চিন্তার যে পরিচয় আধুনিক বাঙালী-পাঠকসমাজে দিলাম, তাহাতে, আশা করি—আর কিছু না হউক, বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার যুগ এই বিস্মৃতিপরায়ণ জাতির স্মৃতিপটে ক্ষণিকের জন্যও প্রতিফলিত হইবে। বাঙালী নাকি একটি আত্মবিস্মৃত জাতি—কি অর্থে জানি না। সে আপনাকে বিস্মৃত হয় বটে, কিন্তু সে ব্যক্তিগত ভাবে নয়—জাতিগত ভাবে। কালকে সে বাঁধিয়া রাখে 'সাতপুরুষের ভিটা'য়—অন্তত এককালে রাখিত ; এবং ইতিহাস বলিতে সে নিজের ঊর্দ্ধতন পঞ্চাশ পুরুষের বংশতালিকাই বুঝিত ; নতুবা কাল তাহার নিকটে নিরন্তরই বর্ত্তমান—অতীত মৃত ; ভবিষ্যৎ অলসের সুখস্বপ্ন মাত্র, এমন কি, তাহা নাস্তি বলিলেও হয়। সেই মৃত মহাকালের বক্ষে বর্ত্তমান-রূপিণী মহাকাল-জায়ার নৃত্য তাহার চেতনাকে কিঞ্চিৎ আঘাত করে—জীবনে ক্ষণপতঙ্গবৃত্তিই তাহার স্বধর্ম্ম ; এতকাল এমনই করিয়া সে মহাকালকে ফাঁকি দিয়াছে। জাতীয় জীবনধারার অতিশয় অপ্রশস্ত পথে সে যেমন কোথাও কোন চিহ্ন অঙ্কন করে নাই, তেমনই, বৃক্ষ জলাশয় প্রতিষ্ঠাও করে নাই—ভবিষ্যতের পাথেয়-সঞ্চয় তো পরের কথা। কিন্তু আজ এতকাল পরে, তাহার সেই আত্মবিস্মৃতি নয়—ব্যক্তিসুখস্বপ্নের ঘোর আর টিকিতেছে না। মধ্যে সে ঘর ছাড়িয়া সমাজ ছাড়িয়া শ্মশানে পঞ্চমকার-সাধনায় মাতিয়াছিল, এখন তাহাও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে—কারণ সবই যে শব, কে কাহার উপরে বসিবে ? কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই আসন্ন মৃত্যুর অন্ধকারেই হঠাৎ একটু আলো জ্বলিয়াছিল—জাতীয় চেতনার একটা স্তরে জাগরণের লক্ষণ সত্যই দেখা দিয়াছিল,—আরও পূর্ব্বকালে যেমনই হউক, গত শতাব্দীর প্রায় প্রথম হইতেই তাহার প্রাণে-মনে জীবনের সাড়া জাগিয়াছিল, এবং সে স্পন্দন ভারতের পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম সমুদ্র-কূল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। সে এক আশ্চর্য্য ঘটনা, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আরও আশ্চর্য্য—তার পরেই মহামৃত্যুর দ্রুত আক্রমণ

দেশ গিয়াছে, বাস্তু গিয়াছে, সমাজ গিয়াছে, স্বধর্ম্ম গিয়াছে—জাতি-হিসাবে বাঁচিবার যাহা-কিছু সবই গিয়াছে; দেহে পঞ্চত্বপ্রাপ্তির পূর্ব্বে, মনেও মহামানবত্ব-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে; ভাব যেমন ক্লীব, ভাষাও তেমনই কুলটা হইয়াছে। শিরে সর্পাঘাত হইলে তাগা বাঁধিবে কোথায়? তথাপি মৃত্যুকালে তারকব্রহ্মনাম শুনাইতে হয়—আমার এ প্রয়াস তদপেক্ষা অধিক যুক্তিযুক্ত বা আশাপ্রদ নয়।

সে যুগের যুগনায়করূপে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই সাধনা—সে যুগের সকল উৎকণ্ঠাকে, জাতির হইয়াই একটি চিন্তায় কেন্দ্রীভূত করা, এবং মুক্তির একটা প্রশস্ত পন্থা নির্দ্ধারণ—তিনি যেমন করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ তেমন করেন নাই। তাঁহার সেই চিন্তার কতখানি এখনও এই বহু-মতের তুমুল সংঘর্ষে টিকিয়া থাকিবার যোগ্য, এবং ভবিষ্যতেও তাহার কতটুকু সাধনযোগ্য বলিয়া গ্রাহ্য হইবে, সে বিচার এখানে নিষ্প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্রের মত মনীষী বাংলা দেশে অল্পই জন্মিয়াছেন। সে যুগের সমস্যা তাঁহাকে যে দিক দিয়া যে ভাবে বিচলিত করিয়াছিল—তাহা ক্রমেই গভীরতর হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন ও আধুনিকের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া তিনি উভয়ের যে সামঞ্জস্য সন্ধান করিয়াছিলেন, আজিও সেই সামঞ্জস্যের প্রয়োজন আছে; শুধুই যুগ বা জাতি নয়, সারা পৃথিবীর ইতিহাস গতি ও স্থিতির একটা সংশয়-সঙ্কটে আসিয়া অনিশ্চিতভাবে দোল খাইতেছে—মানুষের মনুষ্যত্বের এক মহা পরীক্ষা আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য Humanism-এর যে প্রেরণা আমাদের চিত্তে জন্মিয়াছিল—রামমোহন হইতে বঙ্কিম পর্য্যন্ত তাহা প্রায় একমুখে বৃদ্ধিও পাইয়া শেষে একটা বাস্তব কিছুকে আশ্রয় করিয়া স্থির হইতে চাহিয়াছিল—চিত্তের সেই অস্থিরতার মধ্যে স্থিরত্বলাভের প্রয়াস বঙ্কিমের চিন্তাতেই প্রথম দৃষ্টিগোচর হয়—সমগ্র-দৃষ্টি ও স্থির-দৃষ্টির লক্ষণ তাহাতেই আছে। দৃষ্টির ওই ভঙ্গীটাই বড়, তাহাই অধিকতর মূল্যবান। আমি যুগনায়করূপেই বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিবার ও দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি—তিনি যুগকেও কোথায় কতটুকু অতিক্রম করিয়াছেন, প্রসঙ্গত তাহার কিঞ্চিৎ নির্দ্দেশ করিলেও, আমি মুখ্যত সেই যুগের কথাই বলিয়াছি; এবং তাঁহার

নিজস্ব ভাবচিন্তা যেমনই হউক, তিনি যে তাঁহার কাল ও তাঁহার সমাজকে সর্ব্বদা চোখের সম্মুখে রাখিয়াছিলেন, তাহাও বার বার স্মরণ করাইয়াছি। তৎসত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রের লোকোত্তর প্রতিভার পরিচয়-স্বরূপ একটা কথা আজিও নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে, তাহা এই যে—বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি সেই যুগ-প্রয়োজনের যতই বশীভূত হউক, তথাপি তাহা আরও গভীর অর্থে আধুনিক। যাহা তখনও কেহ বুঝিতে পারে নাই, এবং যত দিন যাইতেছে ততই যাহা মানুষের ভাবে-চিন্তায় স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে—নূতন জীবন-দর্শনের সেই সমন্বয়-তত্ত্ব তাঁহার প্রতিভাতেই প্রথম, শুধু চিন্তায় নয়, সৃষ্টিকর্ম্মেও ধরা দিয়াছিল। এই-জন্যই আমি এই সমন্বয়-শক্তিকে তাঁহার প্রতিভার প্রধান গৌরব বলিয়া বার বার উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার সর্ব্ববিধ চিন্তায়, এমন কি ভাব-কল্পনায় ও কাব্যসৃষ্টিতেও, ইহাই যেন একমাত্র প্রেরণা হইয়াছে। বাংলা-সাহিত্যের ভাষা-নির্ম্মাণে তিনি যেমন সাধু ও চলতি ভাষাকে একই ছাঁচে ঢালিয়া অসাধ্যসাধন করিয়াছিলেন, তেমনই তাঁহার উপন্যাস-গুলিতেও—কাব্য, নাটক ও আখ্যান—এই তিনের এক অপূর্ব্ব মিশ্র-রসরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন; সেই রূপও বাস্তব এবং আদর্শের মিলিত রস-রূপ। এখানেও ভোগ ও ত্যাগ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, সংসার ও সন্ন্যাস, প্রেম ও morality—এক রসকল্পনায় নির্দ্বন্দ্ব হইয়া উঠিয়াছে। তিনি যেমন পাশ্চাত্য ও ভারতীয় উভয় সাধনায় মিলন চাহিয়াছিলেন, তেমনই মানুষের ধর্ম্মসাধনাতেও, ব্যক্তি ও সমাজ, জ্ঞান ও ভক্তি, মনুষ্যত্ব ও ঈশ্বরত্ব—এই সকলকে এক সত্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। এই দৃষ্টিই ভারতীয় দৃষ্টি; নূতন যুগের নূতনতর সমস্যায় এই সনাতনই আবার সাড়া দিয়াছিল; সর্ব্ব বৈষম্য ও বৈচিত্র্যের সমতা সাধনেই যে সকল সমস্যার মূলোচ্ছেদ হয়—বর্জ্জন নয়, গ্রহণেই পূর্ণ সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়—এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাই ভারতীয় মনীষার শ্রেষ্ঠ গৌরব। বঙ্কিমচন্দ্র সেই তত্ত্বকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন; কেবল সে বিষয়ে তাঁহার নূতনত্ব এই যে, তিনি যুগসমস্যার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া জীবনের বাস্তবকে—মানুষের জন্মগত ও প্রকৃতিগত সংস্কারকে—আদৌ স্বীকার করিয়া, সেই সমন্বয়ের একটা পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন; তাঁহার তত্ত্ব যত বড়

বা আদৌ যত উচ্চ হউক, তিনি সেই বাস্তবকে কিছুতেই হিসাবের বাহিরে রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী যে অপর দুই মহা-প্রতিভাশালী পুরুষ বাঙালীর এই জীবনযজ্ঞে প্রায় শেষ মন্ত্রপাঠ করিয়াছিলেন তাঁহাদের সহিত তুলনা করিলেই ইহার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম হইবে; তাঁহাদের তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি যতই সঙ্কীর্ণ বা তাঁহার সাহস যত অনধিক বলিয়া প্রতিভাত হউক—তথাপি এই বাস্তব-বুদ্ধিই তাঁহার প্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। নিছক আধ্যাত্মিকতাকে যতদূর সম্ভব বর্জ্জন করিয়া, এবং ভাবের তূরীয়-স্বর্গকে বিশ্বাস না করিয়া—কেবল একরূপ যুক্তি ও বিচারমূলক ভাবুকতার সাহায্যে তিনি যে সত্যে উপনীত হইয়াছিলেন, তাঁহার জীবন-দর্শন তাহাতেই সম্পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি যে-সমাজের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহাতেও তিনি তাঁহার আদর্শকে নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞান-(New Learning)-এর দ্বারা রীতিমত শোধন করিয়া লইয়াছিলেন; তাই সে আদর্শ যতই স্থিতিশীল হউক তাহাতে গতির মাত্রাও অল্প নহে, ভারতের প্রাচীন ধ্রুব-তত্ত্বকে তিনি জীবনের গতিতত্ত্বে রূপান্তরিত করিয়া স্থিতি ও গতির বিরোধ মিটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; সত্য যত বড় হউক তাহা জীবনের সত্য হওয়া চাই—নহিলে তাহার কোন মূল্য নাই, ইহাই ছিল তাঁহার মূল ধর্ম্মমত। ইহারও একটি চমৎকার উদাহরণ না দিয়া পারিলাম না। সেই কালে হিন্দুত্ব সম্বন্ধে নব্য হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে একটি গৌরববোধ জাগিয়াছিল, মহামতি সার্ হেন্‌রি কটন তাঁহার 'New India' নামক গ্রন্থে তাহার সমর্থনে যাহা লিখিয়াছিলেন, এবং মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরও একটি প্রবন্ধে তাহার অনুকূল যে মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এ সম্পর্কে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা এই—

দ্বিজেন্দ্রবাবু বুঝাইয়াছেন যে, সমাজের স্থিতি ও গতি উভয় ভিন্ন মঙ্গল নাই।... গতির বেগ অধিক হইলে স্থিতির ধ্বংস হয়, বিপ্লব উপস্থিত হয়। এ বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রবাবুর সারগর্ভ কথাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি।

"গতিরোধক স্থিতি সমাজের পক্ষে যতই কেন ভয়াবহ হউক না, স্থিতিভঞ্জক গতি তাহা অপেক্ষা আরও অধিক ভয়াবহ। ঐকান্তিক স্থিতির গুরুভার যখন সমাজের অসহ্য হইয়া উঠে, তখন সমাজ পরিবর্ত্তনের দিকে স্বভাবতই উন্মুখ হইয়া থাকে,...কোন

নূতন উপকরণ তাহার উপরে আসিয়া পড়িলে পুরাতনের সহিত নূতনের কিছুকাল ধরিয়া বোঝাপড়া চলিতে থাকে; প্রথম প্রথম নূতন কিছুতেই পরিপাক পায় না, ক্রমে যখন নূতনের নূতনত্ব খিতাইয়া মন্দা পড়িয়া আসে, তখন পুরাতনের সঙ্গে তাহা কতকটা মিশ খায়,...নূতন পুরাতনের অঙ্গের সামিল হইয়া যায়। কিন্তু পুরাতনের সঙ্গে নূতনের সদ্ভাব বসিতে না বসিতে যদি আর এক নূতন আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে, এবং তাহাও স্থির হইতে না হইতে আর এক নূতন আসিয়া তাহার উপর চড়াও করে... তবে সমাজ নিতান্তই অতিষ্ঠ হইয়া উঠে।...ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঋতুপরিবর্ত্তন হইলে বৎসরের ফল যেমন ভয়ানক হয়, ক্রমাগত নূতনের স্রোত বহিতে থাকিলে সমাজেরও সেইরূপ দুর্দ্দশা হয়।" [দ্বিজেন্দ্রনাথের চিন্তাশীলতার একটি উৎকৃষ্ট পরিচয়; এই উক্তির যাথার্থ্য আমরা এক্ষণে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছি।]

কটন সাহেবেরও ঐ কথা। তিনিও বলেন, "Better is Order without Progress, than Progress with Disorder"।

এখন এই বিষম সমস্যার উত্তর কি?...দ্বিজেন্দ্রবাবু আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতা, তাঁহার ভরসা ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর।...কটন সাহেবের ভরসা হিন্দুধর্ম্মে। এই মতভেদটা তত গুরুতর নহে; কেন না, আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মমূলক। তাঁহারা হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছেদ স্বীকার করেন না, অন্ততঃ "Historical Continuity" রক্ষা করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য। এক্ষণে আমরা এ বিষয়ে কটন সাহেবের বাক্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।—

"Hinduism is still vigorous and the strength of its metaphysical subtlety and wide range of influence are yet instinct with life....The innate conservatism of the nation is beyond the power of any foreign civilization to shatter. The stability of the Hindu character could have shown itself in no way more conspicuously than by the wisdom with which it has bent itself before the irresistible rush of Western thought and has still preserved amidst all the havoc of destruction an underlying current of religious sentiment and a firm conviction that social and moral order can only rest upon a religious basis.

...They (the vast majority of Hindu thinkers, who have formed themselves into a party of reaction against the voice of a crude and empirical rationalism) adopt Theism in some form or other and endeavour in this way to give permanence and vitality to what they conceive to be the religion of their ancient Scriptures. At the same time they manage to reconcile with this teaching the ceremonial observances of a strictly orthodox Polytheism. They argue that these

rites are embedded in the traditions and customs of the people; that they are harmless in themselves and that their observance tends to bridge over the chasm which otherwise separates the educated classes from the bulk of the population. Their action is therefore animated by a large hearted tolerance.

[আশ্চর্য্য এই যে, বিদেশী দর্শক যখন এই কথাগুলি লিখিয়াছিলেন, তখনও রামকৃষ্ণের বাণী ও বিবেকানন্দ কর্ত্তৃক তাহার নির্ঘোষ বাংলার দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করে নাই; তাই, 'Polytheism' নামটিতে বিদেশীর সেই অলঙ্ঘ্য সংস্কার যেমনই টিকিয়া থাকুক, এই ইংরেজ মনীষীর অন্তর্দৃষ্টি সত্যই অসাধারণ। কথাগুলি অনুবাদ করিয়া দিলাম।—

"হিন্দুধর্ম্ম এখনও বলীয়ান্; তাহার সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলি যেমন দৃঢ় তেমনই তাহাদের প্রভাব ব্যাপক ও প্রাণবন্ত। রক্ষণশীলতা হিন্দুজাতির এমনই মজ্জাগত যে, কোন বিজাতীয় সভ্যতা কখনও তাহাকে উন্মূলিত করিতে পারিবে না। হিন্দু যেভাবে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার দুর্দ্দম গতিবেগের সম্মুখে নত হইয়াই তাহার অন্তরের অন্তঃশীলা সেই ধর্ম্মভাবের ধারাটিকে এতবড় সর্ব্বনাশের মধ্যেও রক্ষা করিয়াছে, এবং কিছুতেই এ বিশ্বাস ত্যাগ করে নাই যে, ধর্ম্মই সমাজ ও লোকস্থিতির একমাত্র আশ্রয়—তাহাতে সে যেমন তাহার চারিত্রিক ধৃতি, তেমনই জ্ঞানের গভীরতার পরিচয় দিয়াছে।

...(চিন্তাশীল হিন্দুসমাজের প্রায় সর্ব্বত্র একটা প্রবল প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ দেখা যাইতেছে,—এই অতি স্থূল বাহ্যজ্ঞানবিজৃম্ভিত (পাশ্চাত্য) যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে সকলেই কোমর বাঁধিয়াছে।) ইহারা প্রাচীন শাস্ত্র হইতে স্ব-ধর্ম্মের যে ধারণা করিয়াছে তাহাকেই স্থায়ী ও প্রাণশক্তিসম্পন্ন করিবার জন্য ঈশ্বরোপাসনার একটা না একটা আদর্শ ধরিয়াছে; অথচ তাহারই সঙ্গে খাঁটি পৌরাণিক দেবদেবী-পূজার নানা অনুষ্ঠান বজায় রাখিবার উপায় করিয়াছে। এ পক্ষে তাহাদের যুক্তি এই যে, এই সকল আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ এ জাতির একটা অভ্যস্ত সংস্কার এবং তাহা বহু প্রাচীন ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত; ইহাতে কোন দোষ নাই—বরং এইগুলির দ্বারাই, নব্যশিক্ষিত সমাজ ও দেশের জনসাধারণ এই উভয়ের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হইতেছে তাহা দূরীভূত হইবে। অতএব এইরূপ উদ্যমের মূলে আছে অতি উদার হৃদয়ের ধৈর্য্যশীলতা।]

উভয় লেখকের মতে, আমাদের সমাজের স্থিতিবল প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মে, গতিবল আধুনিক ইংরেজী শিক্ষায়।...এক্ষণে ইংরেজী শিক্ষা বলবতী হইয়া স্থিতি ধ্বংস করিবার সম্ভাবনা ঘটিতে পারে।...এ পর্য্যন্ত দেশী ও বিদেশী লেখকে—ব্রাহ্মবাদী ও পজিটিভিষ্টে একমত। প্রভেদ এই যে, দ্বিজেন্দ্রবাবুর ভরসা ব্রাহ্মধর্ম্মে, কটন সাহেবের ভরসা নব্য হিন্দুধর্ম্মে।

বলা বাহুল্য, 'প্রচার'-লেখকেরা [নব্য হিন্দুগণ] এ বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রবাবুর মতাবলম্বী না হইয়া কটন সাহেবের মতাবলম্বী হইবেন। তবে একটা কথা সম্বন্ধে উভয় লেখক

হইতে আমার একটু মতভেদ আছে। তাঁহারা ধর্ম্মকে কেবল স্থিতিরই ভিত্তি মনে করেন। আমার বিবেচনায় বিশুদ্ধ যে ধর্ম্ম তাহা সমাজের স্থিতি গতি উভয়েরই মূল। কিন্তু শিক্ষাও আমার বিবেচনায় ধর্ম্মের অন্তর্গত। আমরা যাহাকে ইংরেজী শিক্ষা বলি, তাহা বস্তুতঃ জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলির পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অনুশীলন-পদ্ধতি। অতএব ধর্ম্মের এই আংশিক সংস্কার হইতেই সমাজের আধুনিক গতির উৎপত্তি।...ইংরেজী শিক্ষাও নব্য হিন্দুধর্ম্মের অংশ বলিয়া আমি স্বীকার করি। অতএব স্থিতি ও গতি উভয়েই ধর্ম্মের বলে। উভয়েরই বল যখন এক মূলোদ্ভূত বলিয়া সমাজের হৃদয়ঙ্গম হইবে, এবং তদনুসারে কার্য্য হইতে থাকিবে, তখন আর স্থিতি ও গতিতে বিরোধ থাকিবে না। Order ও Progress এক হইয়া দাঁড়াইবে।

উপরে যাহা উদ্ধৃত করিলাম, তাহাই বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে এ আলোচনার শেষ এবং বোধ হয় চূড়ান্ত কথা। বাংলার নবযুগের যে সমস্যা সে বিষয়ে তিনজন মনীষীর চিন্তা, এবং সেই সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব ইহাতে যেরূপ ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাতেই আমার কথাও শেষ হইয়াছে। নব-যুগের প্রধান প্রবৃত্তি ইংরেজী শিক্ষার ফলেই প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছিল —ইহাই স্থিতির বিরোধী একটা নূতনতর গতি। এই গতির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও, অপর দুইজন তাহাকে স্থিতিধ্বংসকারী বলিয়া বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের একজন প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষণশক্তির উপরেই বিশেষ আস্থা স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাহিলেও বঙ্কিমচন্দ্র তাহাতে গোঁড়া হিন্দুর মত আত্মপ্রসাদ লাভ করেন নাই। তাঁহার মতে, ধর্ম্ম সত্য হইলে তাহা dynamic হইবে, স্থিতি গতিরই আশ্রয়; ইহাতে ভয় পাইবার কি আছে? ইংরেজী শিক্ষা সেই গতির দিকটা মুক্ত করিয়া ধর্ম্মকেই ক্রিয়াশীল করিয়াছে—এই হিসাবেই তাহার যাহা-কিছু মূল্য। অতএব সে যুগের সমস্যা তাঁহাকে শেষ পর্য্যন্ত উদ্বিগ্ন করে নাই, বরং তিনি তাহাতেই একটা বড় আশায় আশান্বিত হইয়াছিলেন—সমাজের অচলায়তন আবার সচল হইবে, এবং প্রাচীনের সেই স্থিতিই বহুকাল পরে গতিলাভ করিয়া ভারতের সেই সনাতনকেই মহিমান্বিত করিবে। বঙ্কিমচন্দ্রকে যদি নবযুগের জীবন-মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি বলা সঙ্গত হয়, তবে তাহা এইজন্যই। স্থিতি নামক যে সনাতন—যুগ তাহারই গতি-মূর্ত্তি; এবং জীবনের দিক দিয়া সাক্ষাৎভাবে এই গতির মূল্যই অধিক। সৃষ্টির অন্তঃপুরে যাহাই

থাকুক, বাহিরে এই গতিই সর্ব্বস্ব। Static ও Dynamic দুইয়ের তত্ত্ব একই; আজ বিজ্ঞান ও দর্শন উভয়েই সেই সত্য ধরি-ধরি করিতেছে। বঙ্কিম বিজ্ঞান বা দর্শন কোনটারই তেমন সাধনা করেন নাই—তিনি কেবল জীবনের ধ্যান করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার দৃষ্টিতে শক্তির দিকটাই বেশি করিয়া পড়িয়াছিল, তিনি শাক্ত না হইয়া পারেন নাই; তাঁহার সমগ্র সাহিত্যিক সাধনারও মূল মন্ত্র ছিল—Creative Dynamism। তথাপি স্থিতিই যে গতির আশ্রয়, তাঁহার ভারতীয় মনীষা সেই পরম তত্ত্বটিকে কখনও বিস্মৃত হইতে দেয় নাই।

* * *

বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দী বঙ্কিমচন্দ্রে আসিয়া কতকটা বিশ্রামলাভ করিলেও, তাহার পথ তখনও শেষ হয় নাই। ভাব ও চিন্তার প্রধান ধারাগুলিকে একমুখী করিয়া একটা প্রশস্ত পথ নির্দ্দেশ করিলেও, বঙ্কিমচন্দ্র পরোক্ষে নিজেই সেই যুগ-প্রবৃত্তির বেগ বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। আমি এই প্রসঙ্গের উপসংহারে যে আলোচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার এক স্থানে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই যে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, তাহারই সূত্র ধরিয়া আমাকে আরও কিছুদূর যাইতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ও কটন সাহেব উভয়ের যে উক্তি দুইটি পর পর উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, আমিও এখানে তাহা করিব; যথা—

"নব্যবঙ্গের বিষম সমস্যা এই যে, গতি স্থিতিকে ভঙ্গ করিবে না, স্থিতি গতিকে রোধ করিবে না, উভয়ের মধ্যপথ দিয়া বঙ্গ সমাজকে উন্নতির মধ্যে লইয়া যাইবে।" (দ্বিজেন্দ্রনাথ)

"Better is Order without Progress, if that were possible, than Progress with Disorder." (Sir. H. Cotton)

বঙ্কিমচন্দ্র প্রশ্ন করিয়াছেন—"এখন এই বিষম সমস্যার উত্তর কি?" তিনি নিজে একটা উত্তর দিয়াছিলেন, আমরা তাহা দেখিয়াছি। কিন্তু নব্য হিন্দু ও ব্রাহ্ম—কেহই তাহাতে নিরস্ত হন নাই;—একজন অধিকতর সাহস সহকারে, সেই প্রাচীন হিন্দুত্বকেই সর্ব্ব বাধা ও বন্ধন-মুক্তির উপায় করিতে চাহিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের সেই Dynamism-কে, সেই গতির শক্তিবাদকে, চরমে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন; অপর পক্ষের প্রতিনিধি-স্থানীয় যিনি তিনি স্থিতি-তত্ত্বকেই কাব্যসৃষ্টির creative ভাব-কল্পনায় মণ্ডিত

করিয়া, গতিকে মুক্ত-পুরুষের একটা লীলারূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, একজন বিবেকানন্দ, অপর পুরুষ রবীন্দ্রনাথ। বিবেকানন্দেই সে যুগের ভাবধারার শেষ ও স্বাভাবিক পরিণতি; রবীন্দ্রনাথের ধারা স্বতন্ত্র—একরূপ বিপরীত-মুখীও বলা যাইতে পারে। তিনি উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া, এক যুগকে গ্রাস করিয়া যুগান্তর কামনা করিয়াছিলেন; সেই যুগান্তর এখনও চলিতেছে, তাহার গতি-পরিণতি নির্ণয় করিবার সময় এখনও আসে নাই। তথাপি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেই তাঁহার কবিপ্রতিভার পূর্ণ স্ফুরণ আরম্ভ হয়, এবং তাহাতেই যুগ ও জাতির প্রবৃত্তি হইতে তাঁহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পৃথক ও পরিস্ফুট হইয়া উঠে,—সে আলোচনা পরে করিব; তৎপূর্ব্বে সেই নবযুগের যুগ-প্রবৃত্তির অনুসরণে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কিছু বলিব।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

প্রিয়া

প্রিয়ার আবাস খুঁজি' সারাদিন ফিরি সযতনে,—
নাম-ধাম-গোত্র-গৃহ—বাঁধিবারে সহস্র বন্ধনে।
না খুঁজিয়া পাই দেখা, খুঁজিয়া সন্ধান নাই যার,
কি করি তাহারে ল'য়ে—এ যে বড় বিচিত্র ব্যাপার! * * *
শ্রান্ত দেহে ক্লান্ত মনে অর্দ্ধরাত্রে করিনু শয়ন;
—নিদ্রা, না সে জাগরণ! দেখিলাম অদ্ভুত স্বপন,—
সেই হাসি, সেই অশ্রু, সেই মূর্ত্তি—পার্শ্বে মোর আসি'
কহিল কৌতুক-কণ্ঠে স্মিত হাস্যে সাদর সম্ভাষি'—* * *
এ কি কৌতূহল বন্ধু,—কেন এই মিথ্যা খোঁজাখুঁজি?
ভাল যদি বেসে থাক, সেই মোর ঠিকানা-ঠিকুজি!
কি বন্ধন চাহ আর,—বাকি কি রয়েছে, বল, দিতে?
—নাম? প্রিয়া;—গোত্র? প্রেম;—গৃহ? তব অন্তর-গলিতে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

মহাস্থবির জাতক

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এই প্রদর্শনীর হাঙ্গামা চুকে যাবার পরই ডফ কলেজ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আমাদের অন্য আর একটা ইস্কুলে ভর্ত্তি করা হ'ল। ডফ কলেজ আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় দু মাইল দূরে ছিল। প্রতিদিন দু বেলা এতখানি রাস্তা টানা-প'ড়েন করা যে ঠিক নয়, এতদিন বাদে তা বুঝতে পেরে বাবা এবার বাড়ির কাছেই একটা ইস্কুলে আমাদের ভর্ত্তি ক'রে দিলেন। এই ইস্কুলের হেডমাস্টার ও যাঁর ইস্কুল তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্ম। তখনকার দিনে মালিকিয়ানা হিসাবে অনেকে ইস্কুলের ব্যবসা করতেন, বিশ্ববিদ্যালয়কে ধন্যবাদ, তাঁরা এই সব ব্যক্তিগত কারবার তুলে দিয়ে সমস্তটাই নিজেদের যৌথ কারবারে টেনে নিয়েছেন।

ডফ সায়েবের ইস্কুলের চাইতে এই ইস্কুল আমার ঢের ভাল লাগল। তার প্রধান কারণ, এখানে আমার বন্ধু শচীন যে ক্লাসে পড়ত, ভাগ্যবশে আমি সেই ক্লাসে এসেই ভর্ত্তি হলুম। এখানে ক্লাসে ছেলের সংখ্যা ও মারধোরের মাত্রা ছিল অনেক কম। একটা মুশকিল ছিল এই যে, ছাত্রের সংখ্যা কম থাকায় প্রত্যেক শিক্ষকই প্রত্যেক ছাত্রকে পড়া জিজ্ঞাসা করবার সুযোগ পেতেন, ও তার ফলে কে যে কেমন ছেলে তা ক্লাসের সব ছেলেরাই জানত।

অতীতের দিকে চেয়ে আজ মনে হয়, প্রত্যেক মানুষই তার ভাগ্য সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসে। তার জীবন কি ভাবে গ'ড়ে উঠবে, কি অবস্থার মধ্যে তার মন তৈরি হবে; যাত্রাপথে চলতে চলতে কাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হবে, কাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ হবে; কত লোক সারা জীবন কাছে থেকেও আপনার হবে না, কত লোক দু দিনের পরিচয়ে আপনার হয়ে যাবে—সব আগে থাকতেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, কোন শক্তি দিয়েই তাকে প্রতিরোধ করা যায় না।

আমার বন্ধু শচীনের বাড়ির লোকেরা আমাকে সাংঘাতিক চরিত্রের ছেলে ব'লে জানত। ছ-সাত বছর বয়স থেকে সানৃডে ইস্কুলে যে দুর্নাম কিনেছিলুম, আজও তা ক্ষালন করতে পারি নি। এই কারণে আমার এই ইস্কুলে ভর্ত্তি হওয়াটা শচীনের বাড়ির লোকেরা বিশেষ সুনজরে দেখলেন না, বিশেষ শচীনের বাবা ছিলেন সেই ইস্কুলের মালিক।

শচীন আগে থাকতেই ক্লাসের সেরা ছেলে ব'লে নাম কিনেছিল। আমি এসে জুটতেই একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ হ'ল। এখানে টমারী বা বেত্রদণ্ডের রেওয়াজ তেমন ছিল না বটে, কিন্তু প্রায় সব মাস্টারই দেখতুম অকারণে অথবা সামান্য কারণেই শচীনকে নির্দ্দয় ঠেঙাতেন। শচীনের বাবা মাস্টারদের ব'লে দিয়েছিলেন, তার প্রতি যেন কড়া নজর রাখা হয়। সেইজন্যে শিক্ষকরা এইভাবে তাঁদের চাকরি বজায় রাখতেন।

শচীন আমার শৈশবের বন্ধু, তার প্রতি অকারণ এই অকরুণ ব্যবহার দেখে আমার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। ফলে দুই বন্ধুতে মিলে মাস্টারদের সঙ্গে তর্ক ক'রে মধ্যে মধ্যে এমন হাঙ্গামা শুরু ক'রে দিতুম যে, আমাদের শায়েস্তা করবার জন্যে হেডমাস্টার মশায়ের কাছে ধ'রে নিয়ে যাওয়া হ'ত।

কিছুদিন এইভাবে চলবার পর মাস্টারেরা ক্লাসে এসেই আমাদের দুজনকে দু জায়গায় বসিয়ে দিতে আরম্ভ করলেন। দুই মাথা একত্র হ'লেই যে অনর্থের সূত্রপাত হয়, বহুদর্শিতার ফলে তাঁরা সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁরা শচীনকে চোখের সামনেই অর্থাৎ 'ফার্স্ট বেঞ্চে' আর আমাকে শেষে অর্থাৎ একেবারে 'লাস্ট বেঞ্চে' বসতে হুকুম দিলেন। লাস্ট বেঞ্চে একটি মাত্র ছেলে বসত, তার নাম ছিল প্রমথ। আমার স্থান নির্দ্দিষ্ট হ'ল এই প্রমথর পাশে।

প্রমথ আমাদের চাইতে দু-তিন বছরের বড় ছিল, কিন্তু তাকে দেখলে আট-ন বছরের চেয়ে বেশি ব'লে মনে হ'ত না। রোগে, বোধ হয় ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে তার দেহের বাড়-বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সাতজন্মে সে স্নান করত না। চুলগুলো পাতলা, তা থেকে খুশকি উড়ছে, হাতের তেলো থেকে আরম্ভ ক'রে সর্ব্বাঙ্গ ফাটা,

আর সেই ফাটার মধ্যে ময়লা জ'মে থাকায় মনে হ'ত যে, যেন তার গায়ে ম্যাপ এঁকে দেওয়া হয়েছে। ফুল প্যাণ্ট, লম্বা কোট প'রে এক তাড়া বই বগলে নিয়ে সে ইস্কুলে আসত। পড়াশুনো কিছুই করত না সে, গেল বছর বার্ষিক পরীক্ষায় ফেল হওয়ায় এই ক্লাসেই প'ড়ে আছে। মাস্টারেরা স্রেফ দয়াপরবশ হয়ে তাকে কোন প্রশ্ন করতেন না। প্রতিদিন ইস্কুল বসবার মিনিট পাঁচেক আগে এক তাড়া বই নিয়ে ক্লাসে ঢুকে তার নির্দ্দিষ্ট জায়গাটিতে গিয়ে বসত, সমস্ত দিন কারুর সঙ্গে কথা বলত না। ক্লাসের কোন ছেলের সঙ্গেই তার ঝগড়া বা ভাব ছিল না। ছুটির ঘণ্টা বাজলে বিনা উচ্ছ্বাসে বইগুলি গুছিয়ে নিয়ে সে চ'লে যেত। মাস্টাররা চূড়ান্ত সাজা দেবার জন্যে এই রহস্যময় প্রমথর পাশে আমাকে বসবার হুকুম দিলেন।

প্রমথর পাশে ব'সে সারাদিন তার হালচাল পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগলুম। দেখলুম, কখনও সে খেয়ালমত তার সেই বইয়ের তাড়া থেকে একখানা বই টেনে নিয়ে পড়ছে, কখনও বা খাতা খুলে কি লিখছে, কখনও বা একটার পর একটা এমনই ক'রে পাঁচ-সাতটা পেনসিলই কাটলে। পেনসিল-কাটা কল, হাড়ের বাঁটওয়ালা ছুরি, ছুঁচমুখো Independent pen, মোটা লাল-নীল পেনসিল—কোন সরঞ্জামের ত্রুটিই তার কাছে নেই। কচিৎ কোনও শিক্ষক তাকে পড়ার প্রশ্ন করলে, সে দাঁড়িয়ে নীরব থাকত। শিক্ষক সে ইঙ্গিত বুঝতে পেরে অন্য ছাত্রকে প্রশ্ন করতেন, প্রমথ ব'সে পড়ত। এই কর্ম্মতৎপর, স্বল্পভাষী, ক্লাসে ব'সেই তার পরিবেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন প্রমথর মধ্যে আমি একটা রহস্যের ইঙ্গিত পেলুম।

একদিন অঙ্কর ঘণ্টায় দেখলুম, প্রমথ তার বইয়ের তাড়া থেকে বেঁটেসেঁটে চৌকো একখানা সুদৃশ্য লাল বই টেনে বার ক'রে নিবিষ্ট মনে পড়তে আরম্ভ ক'রে দিল। আমাদের বাড়িতে বইয়ের যে রাশি আবিষ্কার করেছিলুম, তার মধ্যে ঠিক এই রকম আকৃতির কালো মলাটের একখানা বই ছিল। সে বইখানার নাম 'ত্রৈলোক্য তারিণীর জীবন বা পাপীর আত্মকথা'—এই রকম একটা কিছু। বইখানা প্রথম যেদিন খুলে বসেছি, সেই দিনই যার চোখে পড়ায় তিনি সেখানা পড়তে বারণ ক'রে

দিয়েছিলেন। ফলে এক দিনেই বইখানা শেষ ক'রে ফেলেছিলুম। সে বইয়ের কাহিনী ছিল লোমহর্ষক। এক গৃহস্থের কন্যাকে এক বৈষ্ণবী ফুসলিয়ে কুলত্যাগ করায়। শেষকালে মেয়েটি ধাপে ধাপে নামতে নামতে নরহত্যা পর্য্যন্ত করতে আরম্ভ করে। অনেকগুলি নরনারী হত্যা করার পর ধরা পড়ায় তার ফাঁসি হয়। কাহিনীটা খুব ভাল না লাগলেও আমার কি জানি ধারণা হয়েছিল যে, নিষিদ্ধ পুস্তকগুলির আকারই ওই রকম ছোট ধরনের হয়ে থাকে। প্রমথর এই বইখানা 'পাপীর আত্মকথা'-জাতীয় কোনও বই মনে ক'রে তার পাশে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, কি পড়ছিস রে ?

প্রমথ চমকে উঠে চট ক'রে বইখানা বন্ধ ক'রে ফেললে। দেখলুম, মলাটের ওপরে রূপোর জলে বড় অক্ষরে লেখা—'গীতা'।

এক মুহূর্ত্তেই প্রমথর প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে গেল। সেই অতি ক্ষীণ, জরাগ্রস্ত, হেয়, গায়ের বোটকা গন্ধে যার কাছে বসতে আমরা ইতস্তত করতুম এমন যে প্রমথ, সে আমার কাছে মোহনীয় হয়ে উঠল।

আমাদের বাড়িতে বাবা ও তাঁর বন্ধুদের মধ্যে যে সব ধর্ম্মকথা ও ধর্ম্মপুস্তকের আলোচনা হ'ত, তাই শুনে শুনে বেদ, বেদান্ত, সাংখ্য, পতঞ্জলি, গীতা প্রভৃতি সম্বন্ধে এমন সব চটকদার কথা আমরা আয়ত্ত করেছিলুম এবং মাঝে মাঝে তালমাফিক ছাড়তুম, যা শুনে অভিভাবকেরা আমাদের সম্বন্ধে আশান্বিত, শিক্ষক-সম্প্রদায় ক্রোধান্বিত এবং বন্ধু-সম্প্রদায় আমাদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠত। বুলিচালি ছাড়লেও বেদ, বেদান্ত বা গীতা প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য এ পর্য্যন্ত হয়ে ওঠে নি।

যে গীতার কথা এতদিন অতি সম্ভ্রমের সঙ্গে স্মরণ ক'রে এসেছি, সেই গীতা প্রমথর বইয়ের তাড়ার মধ্যে! এর চেয়ে বিস্ময়ের বস্তু আর কি হতে পারে!

বিস্ময়টা যতদূর সম্ভব চেপে জিজ্ঞাসা করলুম, কি রে! গীতা পড়ছিস ?

প্রমথ কিছু না ব'লে একটু হাসলে মাত্র। সে হাসির অর্থ—এতদিনে দেখলি! ও তো হাতের পাঁচ!

জিজ্ঞাসা করলুম, তুই গীতা মুখস্থ করিস বুঝি ?

প্রমথ তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে, ও মুখস্থ হয়ে গিয়েছে কবে, তিন-চার বছর আগে। তারপরে গম্ভীর হয়ে বললে, গুরুর আদেশ কিনা।

সেদিন ড্রইং-মাস্টারের ঘণ্টায় নিছক আড্ডা না দিয়ে প্রমথর সঙ্গে গীতা নিয়ে আলোচনা হ'ল। প্রমথর গীতাখানার পেছনে 'মোহমুদ্গর' কবিতাটাও ছিল। সে আমাকে সুর ক'রে 'মোহমুদ্গর' আবৃত্তি ক'রে শোনালে। ভারী ভাল লাগল।

পরের দিন প্রমথ জানালে যে, সে শিগগিরই সংসার ত্যাগ ক'রে জঙ্গলে গিয়ে তপস্যা করবে। তার গুরুর আদেশ।

পরের দিন ইস্কুল বসবার অনেক আগেই প্রমথ এসে আমাকে আর একবার সুর ক'রে 'মোহমুদ্গর' শোনালে। উপরি উপরি তিন দিন নিয়মিত মুদ্গরের আঘাতে আমার মোহ প্রায় বোতলচূরের অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় প্রমথকে বললুম, তোর সঙ্গে আমিও সংসার ত্যাগ ক'রে জঙ্গলে গিয়ে তপস্যা করব।

আমার প্রস্তাব শুনে প্রমথ উৎসাহিত তো হ'লই না, বরং মুখ গম্ভীর ক'রে রইল, কিছু জবাব দিলে না।

আমার মতন একটা লোক সঙ্গী হতে চাইছে তাতে আনন্দ প্রকাশ না ক'রে প্রমথ গম্ভীর হয়ে পড়ল দেখে আমার আত্মাভিমানে আঘাত লাগল। কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলুম, কি রে ?

প্রমথ বললে, তোরা আবার বেহ্ম কিনা—

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ল। বললুম, যা যা ব্যাটা ম্যান্‌চেস্টার ! বেহ্মরা ছিল ব'লে আজ তোরা ভদ্রলোকের সঙ্গে একত্র বসতে পারছিস।

প্রমথ বললে, রাগ করছিস কেন ভাই ? আমি কি তোকে কিছু গালাগালি দিয়েছি ? বেহ্মরা যোগ-টোগ মানে না কিনা, তাই বলছিলুম।

প্রমথর সঙ্গে খুব ভাব জ'মে গেল। ঠিক হ'ল, আমরা দুজনে জঙ্গলে গিয়ে তপস্যা করব। প্রমথ কোথা থেকে—খুব সম্ভব সেগুলো বটতলা থেকে প্রকাশিত হ'ত—সব ধর্ম্মগ্রন্থ নিয়ে আসতে লাগল। তাকে

দিয়ে একখানা 'গীতা'ও আনিয়ে নিলুম। রোজ বিকেলে ঘুড়ি ওড়াবার আধ ঘণ্টা আগে গীতার শ্লোক মায় বটতলার ভাষ্য কণ্ঠস্থ ক'রে রাতে অস্থিরকে গীতা সম্বন্ধে লেক্‌চার দেওয়া চলতে লাগল। মোট কথা, জগৎ যে মায়াময় ও বিরাট একটি যাতনা-যন্ত্র, সে বিষয়ে আমার আর কোন সন্দেহই রইল না। এই যন্ত্রণা থেকে উদ্ধারের একমাত্র পন্থা যে যোগ, তারই অনুশীলনে মনকে মাসখানেকের মধ্যেই একাগ্র ক'রে ফেলা গেল।

একদিন প্রমথ একখানা ম্যাপ নিয়ে এল। ভারতের কোথায় কোথায় জঙ্গল আছে, কোন্ জঙ্গলে কি কি শ্রেণীর জীব ও গাছপালা আছে, তার বিবরণ তার সঙ্গে দেওয়া ছিল। এই ম্যাপ দেখে আমরা একটা গভীর জঙ্গল ঠিক করলুম বটে ; কিন্তু কি ক'রে কোথা দিয়ে যে সেখানে পৌঁছতে পারা যাবে, ম্যাপ দেখে তা কিছুতেই ঠিক করতে পারলুম না। শেষকালে অনেক পরামর্শ ক'রে ঠিক হ'ল যে, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধ'রে চলতে চলতে পথে জঙ্গল নিশ্চয় পাওয়া যাবে। বেশ ঝরনা-টরনা ও ভাল ভাল ফলমূলের গাছ আছে, এমন একটা জঙ্গল দেখে ঢুকে প'ড়ে সেখানে আসন পাতা যাবে।

প্রস্তাবটা আমাদের দুজনেরই বেশ লাগল। গীতা পাঠ ও তপস্যার আনুষঙ্গিক মানসিক ক্রিয়াকর্ম্মের ওপর মন নিবিষ্ট করবার জোর চেষ্টা চলতে লাগল।

এই ইস্কুলে এসে মাস্টারদের প্রশ্ন ও তদুপযোগী চাঁটি, গাঁট্টা ও বহুবিধ তাড়নার ইঙ্গিতে আমার উদ্দাম মন পাঠে কথঞ্চিৎ মনোনিবেশ করেছিল মাত্র, এমন সময় সংসারে দারুণ বৈরাগ্য উপস্থিত হ'ল। পড়াশুনো চুলোয় গেল, ফলে শ্যাম ও কুল অর্থাৎ ইস্কুল ও বাড়ি—দু জায়গাতেই নির্য্যাতনের মাত্রা হয়ে উঠতে লাগল নির্ম্মমতর।

একদিন প্রমথকে জিজ্ঞাসা করলুম, আচ্ছা, জঙ্গলে কোনদিন যদি বাঘ-টাঘ আসে ?

প্রমথ বললে, সে তুই কিছু ভাবিস নি। আমার কাছে গুরুর দেওয়া একটা বাণ আছে, সেটাকে জলে ভিজিয়ে সেই জল যে কোনও জিনিসে ঠেকানো যাবে তাই মারাত্মক হয়ে উঠবে।

বলিস কি ! কি রকম শুনি ?

সে বাণের গুণ এই যে, কোন রকমে একবার কারুর পাঁজরায় ঠেকাতে পারলেই হ'ল, তা বাঘই হোক আর মানুষই হোক, তাকে আর বাঁচতে হবে না।

উঃ! প্রমথটা কি? আমার তো ভিরমি লাগবার উপক্রম হতে লাগল।

প্রমথ ব'লে যেতে লাগল, এই বাণ তার গুরুর দেওয়া। গুরুদেব গভীর রাত্রে ঘুমের মধ্যে রোজ তাকে দেখা দেন, বাড়ির কেউ কিছু জানতে পারে না, কারণ তার দেহটা বিছানায় প'ড়ে থাকে, তার আত্মাটা গুরুর সঙ্গে চ'লে যায় বাগানের এক কোণে, সেইখানে তিনি তাকে যোগ শিক্ষা দেন। গুরু থাকেন হিমাচলের কোন এক নিভৃত গুহায়, সেখান থেকে আসতে তাঁর এক মিনিট সময়ও লাগে না।

বাপ রে! প্রমথর কথা শুনে আমি তো শিউরে উঠতে লাগলুম। এই পুঁইয়ে-মরা প্যাংলা প্রমথ, তার মধ্যে এত গুণ!

আমি দেখেছি, আমার মনের মধ্যে দুটি বোধশক্তি সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে। একটি শক্তি—সে যে কোন জিনিস শোনা বা দেখা মাত্র তা থেকে সত্য তত্ত্বটি তৎক্ষণাৎ ধ'রে ফেলতে পারে, তার কাছে আর ফাঁকি চলে না। এই বোধশক্তিটি হচ্ছে আত্মরক্ষার সংস্কার, একে সত্যবোধ অথবা সংস্কারবোধ বলা যেতে পারে। এই আত্মরক্ষার সংস্কার অথবা সত্যবোধ প্রাণীমাত্রেরই আছে। আমাদের দর্শন বলেন যে, পূর্ব্বজন্মের সমস্ত স্মৃতি আমাদের মন থেকে মুছে গেলেও মৃত্যু এবং মৃত্যুযন্ত্রণার স্মৃতি মনের অতি গভীর প্রদেশে থেকে যায়। বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করবার যে সহজাত প্রবৃত্তি জীবের থাকে, তার মূল হচ্ছে গতজন্মের মৃত্যুর অভিজ্ঞতা।

মনের মধ্যে যে আর একটি বোধশক্তি আছে, তার বর্ণনা করা সহজ নয়। সে এক অদ্ভুত রাজ্য, বিচিত্র সেখানকার হালচাল। কোনও নিয়মকানুনের বেড়িতে সে বাঁধা নয়। মনের অনুকূল যে কোন জিনিস বা অবস্থাকে সে আঁকড়ে ধরতে চায়। তার মধ্যে অসত্য বা অসম্ভাব্য যা আছে—সংস্কারবোধ বা সত্যবোধ তা প্রকাশ করতে থাকলেও আমার মনের এই দ্বিতীয় বোধশক্তি তার ওপরে কল্পনার রং চড়াতে থাকে।

ক্রমে সত্য ও কল্পনায় একাকার হয়ে যায় আর সেই সত্যমিথ্যাজড়িত কল্পলোকে মহানন্দে বাস করতে থাকি। আমার অন্তরের এই দ্বিতীয় বোধশক্তি, যা কঠিন বাস্তবের ওপর নিয়ত রামধনুর রং চড়ায়, দেবতারা তাকে 'কুমতি' আখ্যা দিতে পারেন, কিন্তু এই বোধই সংসারকে আমার আছে সহনীয় করেছে, এ না থাকলে আমার জীবন্মৃত্যু হ'ত।

প্রমথ যে আমার কাছে ডাহা মিথ্যা কথা বলছে, তা বুঝতে আমার এক মুহূর্ত্তও দেরি হ'ল না। কিন্তু মনের মায়াকাননে যে দুটি ধ্যানস্তিমিত তরুণ তাপসমূর্ত্তির আবির্ভাব হয়েছিল, রূঢ় সত্যালোকের জ্যোতিতে তখুনি তারা শুকিয়ে যেত। বরঞ্চ আমি এমন ভাব দেখাতে লাগলুম, যাতে প্রমথ আরও উৎসাহিত হয়ে উঠতে লাগল। শেষকালে সে নিজে থেকেই বললে, তোকেও গুরুদেবের শিষ্য ক'রে দোব।

কোন্ বিশেষ দিনটিতে আমরা এই মায়াময় সুখদুঃখের সংসার পরিত্যাগ ক'রে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব, তা নিয়ে দিনকতক আলোচনা চলল। অবশেষে প্রমথ একদিন বললে, গুরুদেব বলেছেন, তিনি নিজেই দিন ঠিক ক'রে দেবেন।

আমি ও প্রমথ যখন সংসারত্যাগের নেশায় মশগুল, এইরকম সময়ে একদিন শচীন এসে বসল আমাদের পাশে। অনেকদিন দূরে থেকে সে আর সহ্য করতে না পেরে বিদ্রোহ করলে। আশ্চর্য্যের বিষয়, মাস্টার মশায়রাও সেদিন তার এই স্থানত্যাগের অপরাধটা লক্ষ্যই করলেন না।

শচীনকে কাছে পেয়েই ব'লে ফেললুম, আমরা দুজনে সংসারত্যাগ করছি, দুদিনের জন্যে কেন আর কাছে ব'সে মায়া বাড়াচ্ছিস?

শচীন তো আমাদের প্ল্যান শুনে একেবারে অবাক! বলা বাহুল্য, সেও বললে, আমিও তোদের সঙ্গে যাব।

ঠিক হ'ল, প্রত্যেকে খানদুয়েক ক'রে ধুতি আর দুটো ক'রে জামা নেওয়া হবে। তাতে যতদিন চলে চলবে, তারপরে বল্কল তো আছেই। ধর্ম্মগ্রন্থের একটা ফর্দ্দ ক'রে ফেলা গেল। আধ মণটাক চিঁড়ে আর সেই অনুপাতে গুড়ও কিছু চাই। আরও অন্যান্য সমস্ত জিনিস মিলিয়ে পোঁটলা যা হ'ল, তার আয়তন প্রত্যক্ষ না করলেও সেটা যে প্রায় অভ্রভেদী হয়ে উঠেছে, তা মনশ্চক্ষে স্পষ্ট প্রতিভাত হতে লাগল।

প্রমথ বললে, বিলাসিতা করা চলবে না। তিনটে সমান ওজনের পোঁটলা ক'রে তিনজনে ব'য়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

সেদিন এই পর্য্যন্ত ঠিক হয়ে রইল।

পরদিন শচীন ক্লাসে এসেই আমাদের বললে, পোঁটলা ব'য়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা সব ঠিক ক'রে ফেলা গেছে।

কি রকম?

শচীন বললে, আমাদের বাড়ির পাশেই একটা মাঠ আছে, সেখানে ধোপারা কাপড় শুকোতে দেয়। এদের একটা ছেলে আমার খুব বন্ধু। সে বলেছে, পোঁটলা ব'য়ে নিয়ে যাবার জন্যে আমাদের সঙ্গে একটা গাধা দেবে।

আমি বললুম, তারপরে? আমরা জঙ্গলে ঢুকে গেলে গাধার কি হবে? সারাদিন তপস্যা করব, না গাধার তদারক করব?

শচীন বললে, সে ব্যবস্থা কি আমি করি নি? ধোপার ছেলে গাধা নিয়ে আমাদের সঙ্গে জঙ্গল অবধি যাবে। সেখানে আমাদের বসিয়ে-টসিয়ে দিয়ে গাধা নিয়ে আবার ফিরে আসবে।

যাক, কাঁধ থেকে মস্তবড় বোঝা নেমে গেল।

প্রমথ বললে, জানি, শচেটা চিরদিনই খুব ওস্তাদ।

দু-তিন দিন যেতে না যেতেই মাস্টারদের টনক নড়ল। শচীনকে আমাদের পাশ থেকে উঠে গিয়ে আবার তার পুরনো জায়গায় গিয়ে বসতে হ'ল বটে, কিন্তু তাতে বিশেষ অসুবিধা হ'ল না। পরামর্শ ওরই ফাঁকে ফাঁকে জোর চলতে লাগল।

একদিন প্রমথ এসে বললে, কাল রাতে গুরুদেব এসে আমাদের যাত্রার দিন স্থির ক'রে দিয়েছেন। আগামী বুধবার বেলা বারোটার মধ্যে যাত্রা করতে হবে। তিনি আমাদের তিনজনকেই আশীর্ব্বাদ ক'রে গেছেন।

সেদিন ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরে ঘুড়ি লাটাই অস্থিরের হাতে দিয়ে ছাতের এক কোণে ব'সে প্রাণ খুলে গান গাওয়া গেল, তনয়ে তার তারিণী—

বুধবার এল। ঘুম থেকে উঠেই ছাতে গিয়ে মহানির্ব্বাণতন্ত্রের ওঁ নমস্তে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায় শ্লোকটি (ব্রাহ্ম version নয়) আবৃত্তি ক'রে নীচে নেমে এসে দুখানি ধুতি ও দুখানি শার্ট কাগজে মুড়ে একটি পরিপাটি প্যাকেট বানিয়ে রাখা গেল, বেরুবার সময় দাদার চোখে পড়লে যাতে সে সন্দেহ না করতে পারে। কোনও রকমে পায়ে পা ঠেকিয়ে মাকে একটা প্রণাম ক'রে নেবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু সুবিধা হ'ল না ব'লে মনে মনেই তাঁকে প্রণাম ক'রে মাত্র সংস্কৃত বইখানা ও একখানা খাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দেখি যে, প্রমথ আগেই এসে আমাদের অপেক্ষা করছে। তাদের বাড়ি-সংলগ্ন যে বাগান, তারই পেছনে সে জায়গাটা। এর ধার দিয়ে যে রাস্তা, সেই রাস্তা দিয়ে শচীন রোজ ইস্কুলে যাতায়াত করে। দশটা সওয়া দশটা অবধি রাস্তায় আপিসের লোকের ভিড় থাকে, সে সময় গাধা ঠেঙাতে ঠেঙাতে এলে নিশ্চয় কোন না কোন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে—এই আশঙ্কায় শচীন বলেছিল, সে একটু দেরি ক'রে আসবে। আমরা দুজনে বাগানের এক কোণে দাঁড়িয়ে তার অপেক্ষা করতে লাগলুম। প্রমথ মস্তবড় একটা পোঁটলা নিয়ে এসেছে, তার মধ্যে ধুতি জামা ছাড়া রাজ্যের বই, তার সেই মারাত্মক বাণ আরও কত যে জিনিস আছে, তার ঠিকানা নেই। আশা, উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কায় নির্ব্বাক হয়ে আমরা দুজনে রাস্তার মোড়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম, কিন্তু শচীনের দেখা নেই। ওদিকে ইস্কুল বসবার ঘণ্টা কানে এসে বাজতে লাগল। কয়েক মিনিট পরে দূরে শচীনকে দেখতে পাওয়া গেল। দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে পান চিবোতে চিবোতে হেলে-দুলে সে এগিয়ে আসছে, তার ত্রিসীমানার মধ্যে রজক-নন্দন বা শীতলার বাহনের চিহ্নমাত্রও নেই।

আমি আর প্রমথ একবার দৃষ্টি বিনিময় ক'রেই দৌড়ে শচীনকে গিয়ে ধরলুম, কই রে, গাধা কোথায়?

শচীন অবাক হয়ে বললে, গাধা! কার গাধা রে? পাগল হলি নাকি?

প্রমথ ব'লে উঠল, উঃ, বিশ্বাসঘাতক!

আর দেরি করা চলে না, তখুনি ইস্কুলের দিকে ছুটতে হ'ল। ক্লাস সব ব'সে গিয়েছে, আমাদের ক্লাসে পণ্ডিত মশায় পড়াচ্ছিলেন। আমরা তিনজনে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ক্লাসে ঢুকতেই পণ্ডিত মশায় বললেন, এই যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, একত্রে যাওয়া হয়েছিল কোথায় ?

ক্লাসশুদ্ধ ছেলে আমাদের এই নতুন নামকরণ শুনে হো-হো ক'রে হেসে উঠল।

বোধ হয় দু সপ্তাহ শচীনের সঙ্গে কথা বলি নি, তারপরে আবার ভাব হয়ে গেল।

ক্রমশ

"মহাস্থবির"

তত্ত্ববোধিনী সভা এত জনপ্রিয় হইল কেন ?

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর (২১এ আশ্বিন ১৭৬১ শক) তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা কুড়ি বৎসর নিয়মিতভাবে চলিয়া ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি উঠিয়া যায়। সভা এই সময়ের মধ্যে ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ে এরূপ আন্দোলন উপস্থিত করে যে, তাহা সমাজের উপর একটি দৃঢ় ছাপ রাখিয়া যাইতে সমর্থ হয়। পরবর্ত্তী কালেও ইহার ফল অনুভূত হইয়াছিল। তত্ত্ববোধিনী সভা তখন শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই একটি আকর্ষণীয় বস্তু ছিল। রক্ষণশীল প্রগতিবাদী সকলেই ইহার উদ্দেশ্য সাধনে সহায় হইয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভার এরূপ জনপ্রিয়তার কারণ অনুসন্ধান করার সার্থকতা আজিকার দিনেও কম নহে।

শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে এই ধারণা বলবৎ যে, খ্রীষ্টান-বিরোধী আন্দোলন চালাইয়াই তত্ত্ববোধিনী সভা এরূপ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছিল। ইহা একটি প্রবল ও প্রত্যক্ষ কারণ সন্দেহ নাই। তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সে যুগের কোন কোন খ্রীষ্টান পত্রিকা এই মর্ম্মে মন্তব্যও করিয়াছিলেন যে, বেদান্ত-প্রচারের চেয়েও

ধর্ম্মের বিরোধিতায়ই সভার সভ্যদের অত্যধিক তৎপরতা।* কিন্তু এ কারণও গৌণ। সভার জনপ্রিয়তা লাভের মূল কারণ অন্যত্র। সভা প্রতিষ্ঠার এক বৎসরের মধ্যেই ইহার উদ্দেশ্য সমধিক প্রচারিত হইয়া পড়ে। খ্রীষ্টান পাদ্রীরা ইহার গুরুত্ব তখনই বুঝিতে পারিয়া কিঞ্চিৎ আতঙ্কগ্রস্তও হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অন্যতম মুখপত্র 'দি ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ভার' (জুলাই ১৮৪০, পৃ. ৪০৫) লেখেন—

The last and most novel movement on the part of the Hindu is that of the Vedists. They have, we understand, determined to send out Missionaries to preach the doctrines of the Vedas amongst the people. They also design to establish a patshala for the vernaculars in which the Vedas shall alone be taught.

এখানে বেদের উল্লেখ পাইতেছি। পৌত্তলিকতা-বর্জ্জিত বেদ-বেদান্ত-প্রতিপাদ্য উচ্চাঙ্গের হিন্দুধর্ম্মের কথা প্রচার করাই ছিল তত্ত্ববোধিনী সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। দেবেন্দ্রনাথও ইহার উদ্দেশ্য আত্ম-জীবনীতে এইরূপ লিখিয়াছেন,—"আমাদিগের সমুদায় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম-বিদ্যার প্রচার।"† বস্তুত এই সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং তাঁহার অনুবর্ত্তী তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যগণ সাধারণ হিন্দুর ন্যায় বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন ও মান্য করিতেন। 'নববার্ষিকী ১২৮৪'ও বলেন,—"এই সময়ে সমুদয় বেদশাস্ত্রে ইহার [দেবেন্দ্রনাথের] শ্রদ্ধা জন্মিল।" মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ১৭৬৫ শকের ৭ই পৌষ (১৮৪৩, ২১এ ডিসেম্বর) কুড়িজন সঙ্গীর সহিত

* "The papers give us a brief notice of the Tuttobodhinee Subha, or Society formed in the Metropolis for the diffusion of the doctrines of the Vedant ; the original system of philosopical deism. The members of it are opposed to the prevailing system of idolatry, but, in a far more intense degree, to the progress of Christianity."—*The Friend of India* July 23, 1846 : W. Ept. of News. Thursday, July 16.

† শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী। বিশ্বভারতী সংস্করণ। পৃষ্ঠা ৬৫।

ব্রাহ্মধর্ম্মব্রত গ্রহণ করেন। এই সময়ে যে তাঁহারা বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করিতেন এ সম্বন্ধে ইদানীং সন্দেহ প্রকাশ করা হইতেছে; এমন কি কেহ কেহ বলিতেছেন যে, দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভার পক্ষে যে চারিজন ব্রাহ্মণ-সন্তানকে কাশীধামে বেদ অধ্যয়ন করিতে পাঠাইয়াছিলেন, তাহার মূলে ছিল বেদের অভ্রান্ততা বা অপৌরুষেয়ত্বে সংশয় বা অবিশ্বাস। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দেও যে দেবেন্দ্রনাথ তথা তত্ত্ববোধিনী সভা বেদ সম্বন্ধে উক্ত মত পোষণ করিতেন, দেবেন্দ্রনাথের নিজের উক্তিতেই তাহা প্রকাশ। ১৮৪৫, জানুয়ারি-মার্চ সংখ্যা 'দি ক্যালকাটা রিভিয়ু'তে পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় "The Transition-states of the Hindu Mind" নামে একটি সমালোচনা-প্রবন্ধ লেখেন। ইহাতে তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার ধর্ম্মালোচনা ও প্রচার পদ্ধতির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেন। ইহার উত্তরে তত্ত্ববোধিনী সভার পক্ষে দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (১ ভাদ্র ও ১ আশ্বিন ১৭৬৭ শক) দুইটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রথম প্রবন্ধেই তিনি বেদ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অভিমত ব্যক্ত করিলেন—

In our endeavours to spread a knowledge of our ancient theological doctrines, we declare our firm conviction in them to be the only inciting principle by which our exertions are guided. We will not deny that the Reviewer is correct in remarking that we "consider the Vaids and Vaids alone, as the authorized rule of Hindu theology." They are the sole foundation of all our belief, and the truths of all other shasters must be judged of, according to their agreement with them. Even the Smrities which are almost entirely founded on the principles inculcated in the Vaids, must bow to their authority, wherever there is the slightest possibility of mistake or misconstruction; and for this reason, that the Shrooties were uttered by inspiration, while the Smrities contain only an exposition of their precepts. Durshuns are no more than philosophical systems, and do not come within the proper sense of religion. What we consider as revelation is contained in the Vaids alone, and the last parts of our holy

Scripture treating of the final dispensation of Hinduism, form what is called the Vaidant.

তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যগণের এই মূল বিশ্বাস ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্তও বলবৎ ছিল। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার 'আত্মজীবনী'তে (পৃ. ১০৭-৮) এই সময়ে নিজ (এবং সভারও) ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

যখন উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা প্রাপ্ত হইলাম, এবং জানিলাম যে সেই উপনিষদ্ এই সমুদায় ভারতবর্ষের প্রামাণ্য শাস্ত্র, তখন এই উপনিষদের প্রচার দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা আমার সঙ্কল্প হইল। ঐ উপনিষদকে বেদান্ত বলিয়া সকল শাস্ত্রকারেরা মান্য করিয়া আসিতেছেন। বেদান্ত, সকল বেদের শিরোভাগ ও সকল বেদের সার। যদি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পারি, তবে সমুদায় ভারতবর্ষের ধর্ম্ম এক হইবে, পরস্পর বিচ্ছিন্নভাব চলিয়া যাইবে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে, তার পূর্ব্বকার বিক্রম ও শক্তি জাগ্রৎ হইবে অবশেষে সে স্বাধীনতা লাভ করিবে,—আমার মনে তখন এত উচ্চ আশা হইয়াছিল।

তন্ত্র-পুরাণেতেই পৌত্তলিকতার আড়ম্বর। বেদান্ত, পৌত্তলিকতাকে প্রশ্রয় দেন না। তন্ত্র-পুরাণ পরিত্যাগ করিয়া যদি সকলে এই উপনিষদ্ অবলম্বন করে, যদি উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া সকলে ব্রহ্মোপাসনাতে রত হয়, তবে ভারতবর্ষের অশেষ মঙ্গল লাভ হয়। সেই মঙ্গলের পথ মুক্ত করিয়া দেওয়াই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।

কিন্তু যে-বেদের শিরোভাগ উপনিষদ্, যে-বেদের সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য বেদান্ত-দর্শনের এত পরিশ্রম, সে-বেদকে আমরা কিছুই জানিতে পারিতেছি না। রামমোহন রায়ের যত্নে তখন কয়েকখানা উপনিষদ্ ছাপা হইয়াছিল; এবং যাহা ছাপা হয় নাই এমন কয়েকখানি উপনিষদ্ আমিও সংগ্রহ করিয়াছিলাম; কিন্তু বিস্তৃত বেদের বৃত্তান্ত কিছুই জানিতে পারিতেছি না। বঙ্গদেশে বেদের লোপই হইয়া গিয়াছে। ...কেবল বেদ-বিরহিত নামমাত্র উপবীত-ধারী ব্রাহ্মণসকল রহিয়া গিয়াছেন। দুই একজন বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভিন্ন, কেহ তাঁহাদের নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যা-বন্দনার অর্থ পর্য্যন্ত জানেন না।

আমার বিশেষরূপে বেদ জানিবার জন্য বড়ই আগ্রহ জন্মিল। বেদের চর্চ্চা কাশীতে, অতএব সেখানে বেদ শিক্ষা করিবার জন্য ছাত্র পাঠাইতে আমি মানস করিলাম। একজন ছাত্রকে ১৭৬৬ শকে কাশীধামে প্রেরণ করিলাম; তিনি তথায় মূল বেদ সমুদায় সংগ্রহ করিয়া শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহার পর বৎসরে আর

তিনজন ছাত্র তথায় প্রেরিত হইলেন। আনন্দচন্দ্র, তারকনাথ, বাণেশ্বর এবং রমানাথ, এই চারি জন ছাত্র।

এই দীর্ঘ উক্তির মধ্যে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ কি তত্ত্ববোধিনী সভা কাহারও সংশয়ের বিন্দুমাত্রও আভাস পাওয়া যাইতেছে না। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার বিশিষ্ট সভ্য ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত এবং অন্যান্য সহকর্ম্মীর সহিত আলাপ আলোচনা বিতর্কের ফলেই বেদের অপৌরুষেয়ত্বে দেবেন্দ্রনাথের মনে সংশয়ের উদয় হইতে থাকে। তত্ত্ববোধিনী সভার অন্যতম বিশিষ্ট সভ্য রাজনারায়ণ বসু আত্মচরিতে (পৃ. ৬৫) লিখিয়াছেন—

ইংরাজী ১৮৪৮-৫০ এই তিন বৎসর, বেদ ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট কিনা, ইহা সর্ব্বদা আমাদিগের মধ্যে বিচারিত হইত। আমরা তখন ঈশ্বরপ্রত্যাদেশে বিশ্বাস করিতাম বটে, কিন্তু বেদ কেবল যুক্তিযুক্ত বাক্য পূর্ণ বলিয়া তাহা ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিতাম।

তত্ত্ববোধিনী সভা নব্যশিক্ষিত যুবদলের নিকট প্রিয় হইবার একটি বিশেষ কারণ ছিল। সুবিখ্যাত ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই কারণ সম্বন্ধে তাঁহার 'বাঙ্গালার ইতিহাস—তৃতীয় ভাগ'-এ (পৃ. ৪০-৪১) লিখিয়াছেন—

তত্ত্ববোধিনী সভা কর্ত্তৃক প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্ম এদেশীয় লোকের সামাজিক দোষ সংশোধনের প্রতিবন্ধক নয়—অথচ উহাই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত হইয়া থাকে। এমত স্থলে ঐ ধর্ম্মপ্রণালী বৈদেশিক শিক্ষায় প্রাচীন ব্যবস্থাদির উপযোগিতা সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন যুবকদের যে মনোরম হইবে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি?

তত্ত্ববোধিনী সভা জনপ্রিয় হইবার মুখ্য কারণগুলি আমরা এখন জানিতে পারিতেছি। দেবেন্দ্রনাথ ক্রমে বেদ-বেদান্তের উপর নির্ভর ছাড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে সহজ ধর্ম্ম বলিয়া জানিলেন এবং ঐ সকল শাস্ত্র হইতে সারসংগ্রহপূর্ব্বক পুস্তক প্রকাশ ও বক্তৃতাদি দ্বারা তাহা প্রচার করিতে লাগিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভাও নিজ কার্য্যভার ব্রাহ্মসমাজের হস্তে অর্পণ করিয়া ১৭৮১ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে বিদায় গ্রহণ করিল।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বাংলা প্রবাদ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সৎমা ও সৎমায়ের ব্যবহার উপলক্ষ্য করিয়া যে সব প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাও ইহার সঙ্গে ধরিতে হইবে। 'বাপের উপরোধে সৎমার পায়ে গড়' করিলেও, 'বিমাতা বিষের ঘর'—

সৎমার ছেন্দা পান্তা ঘি, মাথাটা মুড়িয়ে এস তেল-পলাটা দি॥

যাহারা দোজবরে, তাহাদেরও 'নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরা' নির্ব্বোধ আসক্তি ও কৌতুকের বিষয়—

ছেঁড়া কচুর পাত, এক মাগকে দিল না, আবার মাগের সাধ॥

দোজবরে ভাতারের মাগ, চতুর্দ্দশীর চোদ্দ শাক॥

একবরের মাগ হেলা-ফেলা, দোজবরের মাগ গলার মালা॥

দোজবরের মাগ গজরা হাতী, ভাতারকে মারে তিন লাথি॥

এবং যাহারা তৃতীয় বা চতুর্থ বার বিবাহ করেন, তাহাদেরও ব্যাখ্যা শুনিতে পাই—

একবরে ভাতারের মাগ চিংড়িমাছের খোসা।
দোজবরে ভাতারের মাগ নিত্যি করেন গোসা।
তেজবরে ভাতারের মাগ সঙ্গে ব'সে খায়।
চারবরে ভাতারের মাগ কাঁধে চ'ড়ে যায়॥

সুতরাং 'বুড়ো বয়সে দুধতোলানি' যেমন বিসদৃশ, তেমনই হইতেছে বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা—

বুড়ো বয়সে নবীন নারী, জ্বর বিকারে বিলের বারি।
আধমরা হয় নয়নবাণে, দেখতে পায় না চোখে কানে॥

ঝড় গিয়ে ঝাঁপি, বয়স গিয়ে বিয়ে॥

প্রবাদের আর একটি চিরন্তন কৌতুকের বিষয় হইতেছে পোষ্য-পুত্রের সামিল মেরুদণ্ডহীন হতভাগ্য ঘর-জামাই—

পহেলা কুত্তা কুত্তা বোলে, দোসরা কুত্তা ঘর-ঘর বোলে।
তিসরা কুত্তা জরুকা ভাই, চৌথা কুত্তা ঘরজামাই।

ঘরজামাইয়ের পোড়া মুখ, মরা বাঁচা সমান সুখ॥

বাইরের জামাই মধুসূদন, ঘরের জামাই মোধো।
ভাত খাওসে মধুসূদন, ভাত খেসে রে মোধো॥

যা ছিল আমানি পান্ত, মায়ে-ঝিয়ে খেলাম।
ঘরজামাই রামের তরে ধান শুকোতে দিলাম ॥
রুইয়ের মুড়ো কেঠো-মুড়ো, দাও আমার পাতে।
আড়ের মুড়ো ঘিয়ের মুড়ো, দাও জামাইয়ের পাতে ॥

কারণ, নিজের মর্য্যাদা নিজে না রাখিলে অন্যে তাহা রাখে না—

শ্বশুরবাড়ী মধুর হাঁড়ি, তিন দিন পরে ঝাঁটার বাড়ি ॥
শ্বশুরবাড়ী জামাইয়ের বাসা, একজনেরে মারলে তিন জন গোঁসা ॥
জামাই এল কামাই করে, বসতে দাও গো পিঁড়ে।
জলপান করতে দাও গো সরু ধানের চিঁড়ে ॥
যাচলে জামাই খান না পিঠে, শেষে মরেন ঢেঁকশাল চেটে ॥
যাচলে জামাই খান না, শেষে আমানিও পান না ॥
যাচলে জামাই কাঁঠাল খান না, শেষে জামাই ভোঁতাও পান না ॥

সুতরাং ঘরজামাই পড়িয়াছে সংসারের অবাঞ্ছিতদের পর্য্যায়ে—

কালো বামুন, কটা শুদ্দুর, বেঁটে মোছলমান।
ঘরজামাই, পুষ্যিপুত্তুর—পাঁচ বেটাই সমান ॥

সন্তান-স্নেহ জীবনের সৌভাগ্য; 'ঘরের গাছা পেটের বাছা'—দুই সমান প্রিয়, তাই 'কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন' বা 'গোগা ছেলের নাম তর্কবাগীশ' হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এক সন্তান দুর্ভাবনার বিষয়—

এক পুতের আশা, বালুর তীরে বাসা ॥
এক পুত পুত নয়, এক কড়ি কড়ি নয়, এক চোখ চোখ নয় ॥

এক সন্তান—'আলালের ঘরের দুলাল'—কিরূপ 'আদরে বাঁদর' হইতে পারে, তাহাও অজ্ঞাত নয়—

পুত, না ভূত ॥
হয় ত পুত, না হয় ত ভূত ॥
এক মায়ের এক পুত, খায় দায় যমের দূত ॥
একলা মায়ের ঝি, গরব করব না ত কি ॥

অপদার্থ সন্তানের প্রতি মর্ম্মান্তিক বিদ্রূপও বিরল নয়—

অনেক কালের ছিল পাপ, ছেলে হল সতীনের বাপ ॥
বাছা আমার ছিরিখণ্ডী, বসে আছেন বড়াই-চণ্ডী ॥
বাছার কিবা মুখে হাঁই, তবু হলুদ মাখেন নাই ॥
বাছার আমার কিবা রূপ, ঘুঁটে ছাইয়ের নৈবিদ্যি খেংরাকাঠির ধূপ ॥
বাছার গুণে নেইক ঘুম, কব কত লীলা।
বাপের গলায় শিকল দিয়ে মায়ের ভাঙে পিলা ॥

কিবা মেয়ের ছিরি, বাঁশবনের প্যারী॥

বাছার আমার বাড়াবাড়ি, ছ' আনা কাপড়ে ন' আনা পাড়ি॥

যাহার অনেকগুলি সন্তান তাহার জ্বালাও অনেক—

অভাগীর দুটা পুত, একটা দানা, একটা ভূত॥

এক ছেলে তার ফুলের শয্যা, পাঁচ ছেলে তার কাঁটার শয্যা॥

যে করে পাপ, সে হয় সাত বেটার বাপ॥

কারণ, 'পাঁচ আঙুল সমান নয়', তাই—

এক লাউয়ের বীচি, কেউ বা করে কচর-কচর, কেউ বা আছে কাঁচি॥

এক ঝাড়ের বাঁশ, কোনটিতে হয় দুর্গার কাঠামো, কোনটিতে হয় হাড়ির ঝুড়ি॥

কিন্তু আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতেই ছেলের আদর, মেয়ের অনাদর—

পুতের মুতে কড়ি, মেয়ের গলায় দড়ি॥

গাইয়ের বেটী, বউয়ের বেটা, তবে জানবে কপাল গোটা॥

পুত্র ও কন্যার মধ্যে তারতম্য থাকিলেও, উভয়কে মানুষ করার দায়িত্ব সমান—

ঝিয়ের জ্বালা বুকের খোঁচা, পুতের জ্বালা ভূতের বোঝা॥

ছেলে নষ্ট হাটে, ঝি নষ্ট ঘাটে॥

আবালে না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ট্যাঁশ-ট্যাঁশ॥

পাখ, পায়রা, পাঁচালি—তিনে ছেলে মজালি॥

পড়াবি ত পড়া পো' না পড়াবি ত সভায় থো॥

কিন্তু কন্যা আমাদের গৃহে একটি মস্ত দায়—

মেয়ে মেয়ে মেয়ে, তুষ করলে খেয়ে।
হরিভক্তি উড়ে গেল মেয়ের পানে চেয়ে॥

সুতরাং 'মেয়ের মায়ের পাঁচটা প্রাণ' এই প্রবাদ-বাক্য তাহার সহিষ্ণুতার নিদর্শক। মেয়েকে যত শীঘ্র পাত্রস্থ করা যায়, তত শীঘ্র এই দায়িত্ব হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, কারণ 'মেয়েমানুষের বাড়, না, কলাগাছের বাড়'। কিন্তু কন্যাকে অপাত্রে দানের মত আর পারিবারিক দুর্ঘটনা নাই। অতএব

অন্ন দেখে দেবে ঘি, পাত্র দেখে দেবে ঝি॥

ভাল মেয়ে হইলেই যে ভাল ঘরে পড়িবে, এমন নয়—

অতিবড় ঘরণী না পায় ঘর, অতিবড় সুন্দরী না পায় বর॥

অতিচতুরের ভাত নেই, অতিসুন্দরীর ভাতার নেই॥

যেমন কন্যা রেবতী, তেমনি পাত্র গদাহাতী (=বলরাম)॥

গৌরী লো ঝি, তোর কপালে বুড়ো বর আমি করব কি॥

সকল মেয়ের সুখ-সমৃদ্ধি সমান নয়—

সকলেই ত মেয়ে, কেউ যাচ্ছে পালকি চ'ড়ে, কেউ রয়েছে চেয়ে॥

কিন্তু বিবাহের পর মেয়ের বাপের বাড়ি থাকাও বিপজ্জনক ও অযশস্কর—

বাপের বাড়ি ঝি নষ্ট, পান্তাভাতে ঘি নষ্ট॥

কথায় কথা বাড়ে, জলে বাড়ে ধান।
বাপের বাড়ি থাকলে মেয়ে বাড়ে অপমান॥

তথাপি মেয়ে নিজের নয়, পরের। মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো নিশ্চিন্ত হইবার উপায় হইলেও, আমাদের দেশের একটি চিরন্তন অন্তর্বেদনা—

মেয়েছেলে কাদার ঢেলা, ধপাস্ করে জলে ফেলা॥

—মেয়ের নাম ফেলী, পরে নিলেও গেলি, যমে নিলে গেলি॥

কিন্তু 'যথা স্ত্রীণাং তথা বচাং সাধুত্বে দুর্জনো জনঃ'—মেয়ের সুখ্যাতি জীবদ্দশায় নাই, মৃত্যুর কঠিন নিকষে তাহার যাচাই হয়—

মরবে মেয়ে উড়বে ছাই, তবে তার গুণ গাই॥

ঘরের মধ্যে, ভাইয়ে ভাইয়ে যেমন ভাব—

মা'র পেটের ভাই, কোথা গেলে পাই॥

ভাই ভাই, মেরে যাই ত ফিরে চাই॥

ভাইয়ের ভাই, বাঁ হাত দিলে ডান হাত পাই॥

রাম লক্ষ্মণ দুটি ভাই, রথে চ'ড়ে স্বর্গে যাই॥

তেমনই আবার দ্বন্দ্ব—

ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই॥

রামের ভাই লক্ষ্মণ আর কি॥

ঘরের শত্রু বিভীষণ"

ভাইয়ের তুল্য মিত্র নেই, ভাইয়ের তুল্য শত্রু নেই॥

ভাই বোনের টান স্বাভাবিক, কিন্তু তাহাতেও পার্থক্য আছে—

শশা খেয়ে যেমন জলকে টান, তেমনি ভাইয়ের বোনকে টান।
গুড় খেয়ে যেমন জলকে টান, তেমনি বোনের ভাইকে টান॥

ভাইয়ের প্রতি বোনের দরদ বেশি হইলেও, ভাইয়ের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা বাঞ্ছনীয় নয়—

ভাই রাজা ত বোনের কি?

হাততোলা হইয়া থাকা আরও কষ্টকর—

ভাইয়ের ভাত, ভাজের হাত॥

তবে অনেক সময়ে যেমন ভাই, তেমন বোনও হয়—

আমার ভাই রাবণ রাজা, আমি শূর্পণখা।
ধরামাঝে এমন জোড়া পারিস্ যদি দেখা॥

বাংলা গার্হস্থ্য-জীবনের এই সুখদুঃখের চিত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, যদি পাড়ার প্রতিবেশী, বিশেষত প্রতিবেশিনীর, কথা এখানে না বলা হয়। বিপদে-আপদে প্রতিবেশীর প্রয়োজনীয়তা আছে। 'পাড়া-পড়শীর গুণে বেঁড়ে গরুও বিকিয়ে যায়'; কিন্তু

এক ঝিকরে মাছ বেঁধে না, সেই বা কেমন বঁড়শি।
এক ডাকেতে সাড়া দেয় না, সেই বা কেমন পড়শী॥

তথাপি ইহাদের অপরিসীম কৌতূহল প্রবাদের কৌতুকদৃষ্টি এড়ায় নাই—

পড়শী নয়, বঁড়শি।
পড়শী নয়, আরসি॥
খল পড়শী নাতান ভাই, তার সাথে বসত নাই॥

সব ঘরের সব কিছুর খবর রাখা, 'পরের ভাতে কাঠি দেওয়া' ইহাদের জীবনধারণের একমাত্র উপায়—

ঘাটে গেছল জায়ের মা, দেখে এল বাঘের পা।
সে দেখল, আমি শুনলাম, মরি বর্ত্তে বাঘ দেখলাম॥
যার ঝি তার জামাই, পাড়াপড়শীর কাটনা কামাই॥
মা বিয়ল, না, বিয়ল মাসী, ঝাল খেয়ে ম'ল পাড়াপড়শী॥
মায়ের পোড়ে, না, মাসীর পোড়ে, পাড়াপড়শীর ধবলা ওড়ে॥
ধার ভাতার তার ভাতার, কেঁদে মরে হরে ছুতার॥
খাইয়ে পরিয়ে রাখলাম দাসী, কিন্তু সে হ'ল পাড়াপড়শী॥
আমি খাই ভাতারের ভাত, তোর কেন গালে হাত॥

এহেন শুভানুধ্যায়ী পাড়াপড়শীর সকল বিষয়ে মাথা গলানো সত্ত্বেও

আটে-কাটে দড় বড় শক্ত মেয়ে যেই।
পাড়াপড়শীর বুকে ব'সে ঘর করছি তেই॥

Love thy neighbour—অতি উচ্চ আদর্শ, কিন্তু প্রাত্যহিক জগতে

হলুদ জব্দ শিলে, বউ জব্দ কিলে।
পাড়াপড়শী জব্দ হয় চোখে আঙুল দিলে॥

এই সব প্রতিবেশিনীদের মধ্যে যিনি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তিনি হইতেছেন পাড়াকুঁদুলী; তাঁহার চিত্র খুবই পরিস্ফুট—

মিনসের কোলে ছেলে দিয়ে মাগী যায় লড়ায়ে ধেয়ে॥

তিনি কোঁদল ভিন্ন থাকিতে পারেন না। যদিও 'কোঁদলে জাত নষ্ট, রোগেতে রূপ নষ্ট' তবুও

কুঁদুলে নাড়ী কোঁ-কোঁ করে, কোঁদল নইলে থাকতে নারে॥
নিয়ে আয় ত বউ নোড়া, যাই কোঁদলের পাড়া।
আর চাই না বউ নোড়া, পেয়েছি কোঁদলের গোড়া॥
পেয়েছি কোঁদলের গোড়া, আর যাব না উত্তর পাড়া॥
কি দিব কি দিব খোঁটা, গয়াতে মরেছে বাপবেটা॥
গেছলাম তোর বাপের দেশ, দেখে এলাম তোর মায়ের বেশ॥

কোঁদলের অন্ত নাই, কারণ

ঝগড়াটে লোক যারা ঝগড়া নাহি পায়।
বেনাগাছে পোঁদ চুলকে গড়াগড়ি যায়॥

চার

শুধু পারিবারিক সম্বন্ধ নয়, বাঙালীর গৃহের ও সামাজিক জীবনের এমন দিক নাই, যাহা হইতে বাংলা প্রবাদ-বাক্যের উপকরণ আহৃত হয় নাই এবং গৃহস্থালির এমন কোন বস্তু নাই যাহা উপেক্ষিত হইয়াছে। নেকড়া কানি, ছেঁড়া চেটাই, কাণা কড়ি, ভাঙা কুলো, ছাইয়ের গাদা, ঘটি বাটি, হাঁড়ি শরা, ঘড়া কলসী, থালা কাঁসি, ঢেঁকি চরকা, কুঁচ চালুনি, ধান চাল, ভাত কাপড়, নুন তেল, শাক মাছ, ঘি বড়ি, পিঠে আসকে, খই কলা, মুড়ি মিছরি, লাউ কুমড়ো, আম কাঁঠাল, ওল ঘোল, তেঁতুল আমড়া, আদা সুপারি, শালুক শামুক, তামা তুলসী, দা কাটারি, বঁটি ঝাঁটা, কুড়ুল কোদাল, ঢাক ঢোল, জাঁক জমক, কোঁচা কামিজ. হাট বাজার, চাষ বাস, কাটনা কাটা বাটনা বাটা, ঘরদোর, চাল-চুলো. পথ ঘাট,—এমন কি গৃহপালিত গরু মোষ, ভেড়া ছাগল, হাতী ঘোড়া, কুকুর বেড়াল হইতে কাক বক, ছুঁচো ইঁদুর. সাপ ব্যাং পর্যন্ত নিখুঁতভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়া বাস্তব ভাব ও ভাষায়, শ্লেষ কৌতুক, ব্যংগ বিদ্রূপ, জ্ঞান ও গর্হার নিরবিচ্ছন্ন খোরাক যোগাইয়াছে।

সবগুলির বিস্তৃত উদাহরণ এখানে দেওয়া সম্ভবপর নয়। আমরা শুধু আমাদের নিত্যপরিচিত ঢেঁকির কথা উল্লেখ করিব। পূর্ব্বের অনেকগুলি উদ্ধৃত প্রবাদে ঢেঁকির কথা আছে, কিন্তু তাহা ছাড়া অসংখ্য প্রবাদে আমাদের ঘরের ঢেঁকি লোকসমাজে মূর্ত্তিমান

হইয়াছে। ঢেঁকি অনেক প্রকার—'বুদ্ধির ঢেঁকি', 'আমড়া কাঠের ঢেঁকি,' 'নারদের ঢেঁকি', 'ঢেঁকি অবতার', 'ঘরের ঢেঁকি কুমীর'; তেমনই আবার 'ঢেঁকির আঁকশলী', 'ঢেঁকির কচকচি ও ঢাকের বাদ্যি', 'ঢেঁকি ভ'জে স্বর্গে যাওয়া', 'উপরোধে ঢেঁকি গেলা', 'ঢেঁকশেল দিয়ে কটক যাওয়া', 'ফোঁপরা ঢেঁকির পাড়ে উমর', 'বুকে ঢেঁকির পাড় পাড়া' ইত্যাদি প্রবাদ বা চলতি কথা হইতে ঢেঁকির গুরুত্ব বুঝা যাইবে। তাহা ছাড়া—

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে॥
অবুঝে বোঝাব কত বুঝে নাহি মানে, ঢেঁকিরে বোঝাব কত নিত্য ধান ভানে
ওঠ্ কলসী, জলকে চল্, ঢেঁকি কুটুক ধান॥
ঢেঁকির নয় ছয়, কুলোর উনিশের বন্ধ॥
উঠলে ঢেঁকি, বসলে পাট, সাত পাথর আমানি, যত পার ভাত॥
ঢেঁকি কেন গাঁ বেড়াক না, গড়ে পড়লেই হ'ল॥
ঢেঁকশেলে যদি মাণিক পাই, তবে কেন পর্ব্বতে যাই॥
ঢেঁক্‌শেলে না উঠতে পায়, হাবলে-হাবলে কুঁড়ো খায়॥
আসল ঘরে মশাল নেই, ঢেঁক্‌শেলে চাঁদোয়া॥
ঢেঁকি আড় কাটে, আপনার ক্ষয় করে॥
ছিল ঢেঁকি, হ'ল শূল, কাটতে কাটতে নির্ম্মূল॥
চাল না চুলো, ঢেঁকি না কুলো, বিধাতা করেছে দোর বুলো-বুলো॥
এক গাঁয়ে ঢেঁকি পড়ে, আর গাঁয়ে মাথাব্যথা॥
পরের ফোড়া, ঢেঁকি দিয়ে গালে॥
লাথির ঢেঁকি চড়ে ওঠে না॥
লাথির ঢেঁকি মাথায় চড়ে॥
যার ঘরে নেই ঢেঁকি মুষল, সে বউঝির নেই কুশল॥
ভারি বাড়ি, তার ঢেঁকিশালা॥
হেদী কয় পেঁদীরে— বোঝা লো, ঢেঁকি দিয়ে কান বেঁধা লো॥
বামুনে দক্ষিণা ধ'রে, ঢেঁকির নামেও চণ্ডী পড়ে॥
মা ডাকলে, খেলাম না, বাপ ডাকলে, খেলাম না।
সাতপুরুষের ঢেঁকি বলে—পান্তা খা, পান্তা খা॥
পিরীত যখন ছোটে, ঢেঁকিতে ফেলে কোটে॥

ইত্যাদি সর্ব্বত্র ঢেঁকির মহিমা বিরাজমান।

যেমন গৃহস্থালির নানা দিক ও দ্রব্যের, তেমনই সামাজিক জীবনের নানা শ্রেণী, সংস্থান ও সম্পদের টুকরা ছবি অসংখ্য প্রবাদ-বাক্যে

পাওয়া যায়। এমন নিত্যদৃষ্ট বিষয় নাই, যাহা ইহার কৌতুক ও বিদ্রূপের পরিধির মধ্যে আসে নাই। চাষা গয়লা, তাঁতী নাপিত, কলু কামার, বেণে সেকরা, ন্যাকা বোকা, বামুন বোষ্টম, কায়েত বৈদ্য, কাজী পেয়াদা, পীর বাঁদী, গুরু চেলা, হিঁদু মোছলমান, প্রজা জমিদার, চোর ছ্যাঁচড়, ছোট বড়, ধনী কৃপণ, গরিব কাঙাল, আপন পর, বেকার বেগার, নেয়ে মেয়ে, ভূত পেত্নী, বুড়ো বুড়ী, মরদ মাগী, কাণা খোঁড়া, হাগুন্তী নাচুন্তী, ভড়ং ভণ্ডামি, চুরি বাটপাড়ি, নষ্টামি দুষ্টামি, আয়েশ আমিরি, অনাচার অনাসৃষ্টি, স্বাস্থ্য সুখ, রোগ শোক, পর-চর্চা পরনিন্দা, ঘোঁট দলাদলি, গঙ্গাস্নান তীর্থযাত্রা চড়ক গাজন, দুর্গোৎসব ঘেঁটুপুজা, মনসা শীতলা, ষষ্ঠী সুবচনী, প্যানাপুকুর ভাঙা বেড়া, খাল বিল, খানা নর্দমা, গু গোবর, ভাগাড় আঁস্তাকুড়, ক্ষেত খামার, বাগান বাঁশবন,—কোন কিছুই বাদ পড়ে নাই। সমস্তগুলির আলোচনার স্থান আমাদের নাই; কেবল উদাহরণস্বরূপ দুই-চারিটি বিষয়ের কথা বলিব।

ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইলেও, জন্মফলারে যজমানী 'কলির ব্রাহ্মণে'র লোভ, মূর্খতা ও অনাচার কিরূপ কঠিন বিদ্রূপের বিষয় ছিল, তাহা প্রবাদের 'গলায়-দড়ে জাত' এই অভিধান হইতেই সুস্পষ্ট হইবে। ব্রাহ্মণ দক্ষিণা পাইলে ঢেঁকির নামেও চণ্ডীপাঠ করে, তাহা কোন পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রবাদে দেখিয়াছি। আমরা আরও শুনিতে পাই—

বামুন, বাদল, বান, দক্ষিণা পেলেই যান॥
বামুন, বাক্স, বাঁশ তিনে বাস্তুনাশ॥
বামুন, মুচ্ছুন্দী, ধোপা, গোমস্তা, তার নেই কোন বুঝ-ব্যবস্থা॥
লাখ টাকায় বামুন ভিখারী॥
যাকে না বামুন বলি, তার গায়ে নামাবলী॥
কালির অক্ষর নেইক পেটে, চণ্ডী পড়েন কালীঘাটে॥
ভট্‌চায্যের খুটের খুট, স্বস্ত্যয়নে সবংশে লুট॥
ব্রাহ্মণের উদর, ছিটে বেড়ার ঘর॥
বারো নারকেল তেরো বামুনের ঘাড় ভাঙে॥
মুখচোরা বামুন, আর কেশোরোগী চোর॥
চোর মরে কাশে, বামুন মরে আশে॥
জপের সঙ্গে খোঁজ নেই কপালজোড়া ফোঁটা।
বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যের পুজোর বড় ঘটা॥

কপালে দীর্ঘ ফোঁটা, দর্শনী চোদ্দ টাকা॥
দেখাও পৈতে, মারো ভাত॥
মাগ্‌নার ওপর টাক্‌না, তার ওপর ভিখারী বামনা॥
বামুন ঘরে খাবে ভাত, গোবর দেবে আড়াই হাত॥
পোঁদে গু বড়বড় করে, আলোচালের হবিষ্যি মারে॥
কলির বামুন ঢোঁড়া সাপ, যে না মারে তার পাপ॥

'শতমারী ভবেদ্‌ বৈদ্যঃ', সুতরাং বৈদ্যের আনাড়ী চিকিৎসার বিদ্রূপও যথেষ্ট রহিয়াছে—

লাথি চড়ে নাহি লাজ, আমার নাম কবিরাজ॥
আমার এমনি হাতযশ, এ-পাড়ায় যদি ওষুধ খাওয়াই ও-পাড়ায় মরে গণ্ডা দশ॥
মরণ নেই মরবি কিসে, আমার কাছে ওষুধ নিসে॥
বৈদ্যের বড়ি, ছুঁলেই কড়ি॥
ঘরামির ভাঙা ঘর, বদ্যির বউয়ের নিত্যি জ্বর॥
হরি বাঁচান প্রাণ, বদ্যির বড় মান॥
নামে ধন্বন্তরি, কাজে যম॥
নাপিত, বদ্যি, ধোপা, চোর, যুগী বৈরেগীর নেইক ওর॥

আধুনিক ডাক্তারির কথাও একটি প্রবাদে স্থান পাইয়াছে—

জল, জোলাপ, জোচ্চোরি, এই তিন নিয়ে ডাক্তারি॥

কায়স্থের মুন্‌শীয়ানার সঙ্গে তাহার ধূর্ত্ততা প্রবাদে প্রসিদ্ধ হইয়াছে—

কলমে কায়স্থ চিনি, গোঁফে রাজপুত।
বৈদ্য চিনি তারে, যার ওষুধ মজবুত॥
কায়েতের ছেলের কলমের আগায় ভাত॥
কায়েতের মূর্খ, কলুর বলদ॥
কায়েতের ঘরের বেরালটাও আড়াই অক্ষর পড়ে॥
কাক ধূর্ত্ত, আর কায়েত ধূর্ত্ত।
কায়েতের বুড়া হীরার ধার, নাপিতের বুড়া ছারের ছার॥
কায়েতের বুদ্ধি আঁতে, বাঁদরের বুদ্ধি দাঁতে॥
কায়েতের মড়া কাকেও ঠোক্‌রায় না॥
কায়েতের হাড়া, বেগুনের খাড়া॥
দাঁত থাকে না ব'লে, কায়েত মায়ের পেটের মাংস খায় না॥

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, শাক্তের কথা বড় একটা শোনা যায় না, কিন্তু বোষ্টম বৈরাগীর নষ্টামি প্রবাদের একটি উপাদেয় বিষয়—

পাঁঠা ম'রে বোষ্টম॥

বোষ্টম হবার বড় সাধ, তৃণাদপি ১ শুনে শুনে লেগে গেছে বাদ॥

সাধ যায় বোষ্টম হ'তে, পোঁদ ফাটে মোচ্ছোব ২ দিতে॥

জাত হারালে বোষ্টম॥

তেলক কাটলেই বোষ্টম হয় না॥

ভক্তিহীন ভজন, লবণহীন ব্যঞ্জন॥

ভজনের সঙ্গে খোঁজ নেই, ভোজন ছত্রিশ জাতে॥

বৈরাগীর রাগটুকুও আছে, সুখটুকুও আছে॥

হরি বড় দয়াময়, কথায় বটে কাজে নয়॥

ব্রজের রজে গড়াগড়ি॥

রসের ঘরেই গৌর নাচে॥

গৌর হতে বাকি ক'দিন॥

শুধু গৌর নয়, গৌরহরি॥

আগে বেশ্যে, পরে দাস্যে, মধ্যে মধ্যে কুটনী।
সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যজ্য, এখন বোষ্টমী॥

মাছ খাই না মাংস খাই না, ধর্ম্মে দিয়েছি মন।
বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী যাচ্ছি বৃন্দাবন॥

আগে ছিলাম ছোঁচা বেরাল, ধর্ম্মে দিয়েছি মন।
তুলসীমালা গলায় দিয়ে যাচ্ছি বৃন্দাবন॥

দেখে এলাম, শ্যাম, তোমার বৃন্দাবন-ধাম, কেবল নামই আছে॥

তুমি রাধা, আমি শ্যাম, এই কাঁধে বাড়ি বলরাম॥ ১

শুধু চৈতন্য ধর্ম্মী বৈষ্ণব নয়, রঘুনন্দনপন্থী গোঁড়া স্মার্ত্ত, বলরাম ভজা প্রবর্ত্তিত নেড়ানেড়ী দল, সকলকেই সমানভাবে উপলক্ষ্য করিয়া একটি সামাজিক ইতিহাসমূলক প্রবাদও প্রচলিত আছে, যাহা এই সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

রঘু, চৈতা, বলা, এ তিন কলির চেলা॥

১। চৈতন্যের বৈষ্ণব-লক্ষণের শ্লোক—"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

২। বৈষ্ণবের মহোৎসব।

১। হুতোম পেঁচার নকশায় বারোয়ারী পূজা নিবন্ধে গুরুপ্রসাদীর বিবরণ দ্রষ্টব্য।

হিন্দু সম্প্রদায়ের মত, মুসলমান সম্প্রদায় ও তাহার পীর-মোল্লাও ব্যঙ্গবিদ্রূপের উপলক্ষ্য হইয়া প্রবাদের মধ্যে আসিয়াছে—

নেড়ে নয় ইষ্টি, তেঁতুল নয় মিষ্টি॥

ধানের মধ্যে আগুনবাণ ১, মানুষের মধ্যে মোছলমান॥

হাটের নেড়ে হুজুগ চায়॥

নেড়ে খোঁজে ঈদ্ পরব॥

পীর-বরাবর নেড়ে, সোনার-ক্ষুরে এঁড়ে॥

মোল্লার দৌড় মস্‌জিদ তক॥

পীর, না, পয়গম্বর॥

পাঁচে পুজলে পাথরে, সেও পীর হয়ে পড়ে॥

বাজারে আগুন লাগলে পীরের ঘরও বাঁচে না॥

পীরের কাছে মামদোবাজি॥

ডুব দিয়ে পানি খাই, সারাদিন রোজা থাই॥

মুরগীর পোঁদে তেল হ'লে মোল্লার দোর দিয়ে রাস্তা॥

আরের সঙ্গে যেমন তেমন, পীরের সঙ্গে মস্‌করী করণ॥

একটি প্রবাদে ধর্মপরিবর্তনেরও ইঙ্গিত রহিয়াছে—

এক একাদশী ছাড়াই, ত্রিশ রোজা বাড়াই॥

মুসলমান ভায়ারাও যে ছাড়িয়া কথা কহিত, তাহা নহে—যেমন

হিঁদুদের দুগ্গোপুজো, উপরে চিকণ-চাকণ, ভেতরে খড়ের বুজো॥

সমাজের নানা শ্রেণীর কাজকর্ম 'ইস্তক জুতা সেলাই নাগাদ চণ্ডীপাঠ' পর্য্যন্ত, অথবা বিবিধ ক্রীড়াকৌতুক হইতে বিবিধ প্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে; কিন্তু সেগুলি সব এখানে বিস্তারিতভাবে আলোচনার স্থান নাই। তাস, পাশা বা দাবা খেলা হইতে 'হাতের পাঁচ', 'পোয়া বারো', 'উঠসার কিস্তিতে মাত' প্রভৃতি স্পষ্টই গৃহীত হইয়াছে। 'হালে পানি পায় না' 'হাল যদি ধরে ঠেসে, তুফানে নাও যায় কি ভেসে', 'দাঁড়িকে মাঝি করা, মাঝগাঙে ডুবে মরা',—নৌকার মাঝির উক্তি; 'এক হেঁসেলে তিন রাধুনী, পুড়ে মরে তার ফেনগালুনী', 'কি বা করে ঝালে তেলে, কি বা না হয় দম্‌কা জ্বালে', 'ধুঁয়া যার সয় না, সে রাঁধুনী হয় না'—পাকা রাঁধুনীর বিদ্রূপ; 'এলো শ্রাদ্ধের গুঁতো দষিণা'—শ্রাদ্ধের পুরোহিতের আক্ষেপ; 'সেকরার ঠুক্‌ঠাক্, কামারের এক ঘা', 'শাঁখের করাত, আসতেও কাটে, যেতেও কাটে', 'কুঁদের মুখে বাঁক থাকে না', 'কামার বুড়োলে লোহা শক্ত', 'খুরে

১। এক রকম নিকৃষ্ট ধান।

তাঁতীর তসরে হাত',—শ্রমজীবীর অভিজ্ঞতা; 'কোন্ কালে বা চুরি করেছি, ঘরে ভাত নেই তাই এসেছি'—চোরের সাফাই; 'চাকুরি না, গুখোরি'—চাকুরিজীবীর মন্দভাগ্য; 'গাইতে গাইতে গায়েন, বাজাতে বাজাতে বায়েন', 'আতি-চোর পাতি-চোর হতে হতে সিঁধেল চোর', 'ছিঁড়ে কুটে কাটুনী, পুড়ে ঝুড়ে রাঁধুনী'—অভ্যস্ত কার্যেতা বহুজ্ঞার ফল; 'উঠন্ত মুলো পত্তনেই চেনা যায়', 'দেখাদেখি চাষ, লাগালাগি বাঁশ', 'ক্ষেতের কোণা, বাণিজ্যের সোনা', 'নোট খেটে আড়ায়ে, সজনন বারো মাস', 'আছে গরু বয় না হাল, তার দুঃখ সর্ব্বকাল' প্রভৃতি—চাষবাসের কথা; 'আসলের চেয়ে সুদ মিষ্টি'—সকল সুদখোরই জানে; 'হাকিম ফেরে ত হুকুম ফেরে না', 'জামিন দেয় মরতে গাছে উঠে পড়তে', 'ঘুষ পেলে আমলা তুষ্ট' প্রভৃতি আইন-আদালতের বিচিত্র পদ্ধতি; 'বাপ পোয় বরতি, মায় পোয় এয়োতি', 'বাপ পুরুত মা এয়ো, ঘরের জিনিস বাইরে না যেও'—যজমানী বামুনের পেশা সম্বন্ধে উক্তি; 'রেওর স্বর্গেও চিঁড়ে দই'—রেওভাটের দুর্ভাগ্যের কথা; 'গুড়ের ঘরে ডেঁয়ো কর্ত্তা'—ভাঁড়ারীর কথা; 'সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে', 'সাপের কাছে বেঁজি নাচে, তবে জানি রোজা আছে'—প্রভৃতি সাপুড়ের কেরামতের বিবৃতি। নিজ নিজ জাত-ব্যবসাই যে সবচেয়ে ভাল, তাও বলা হয়েছে—'জাত-ব্যবসা নরের ভূষা, আর সব ফাসাফুসা'।

কেবল সমাজের কোন বিশেষ শ্রেণী বা বিশেষ আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া নয়, সাধারণভাবেও সমাজের নানা কৌতুককর বিষয় লইয়া অসংখ্য বাংলা প্রবাদ প্রচলিত আছে; তাহার দুই-চারিটি নমুনা দিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের শেষ করিব। সংসারে 'কাছাখোলা ন্যাকা' ও বোকার অভাব নাই, কিন্তু

> ন্যাকা, বোকা, ঢলঢলে কাছা, তিনে প্রত্যয় ক'রো না, বাছা॥
> ন্যাকা, আজুলে, চাল্শে কাণা, জল ব'লে খায় চিনির পানা॥

কারণ, অনেক সময় ন্যাকামি ও বোকামি ভাণ মাত্র—তাই

> কুলোয় শুয়ে তুলোয় দুধ খান॥
> ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানেন না॥
> নাচতে কি আমি জানি নে, মাজার ব্যথায় পারি নে॥
> ঘোমটার ভেতর খেমটার নাচ॥
> বড় ভাইয়ের মাগ নেই, সেই ভাবনায় ঘুম নেই॥
> খেতে পারি না শ'কে না (রুচি হয় না), মুখে দিলে থাকে না॥

অবিয়ন্তীর ঠ্যাকোর ব্যথা॥
নাচতে নেমে ঘোমটা॥
নাচতে জানি নে, আমায় ধ'রে এনেছে।
যদি নাচি, তবে আমার ছেলে নেবে কে॥
খাব না খাব না অনিচ্ছে, তিন রেক চাল এক উচ্ছে॥

প্রভৃতি এই শ্রেণীর লোকদের প্রতি প্রযুক্ত। কিন্তু সংসারে নিতান্ত হাস্যকর ও অযৌক্তিক ঘটনা বা আচরণ নিত্যই দেখা যায়—

দেখে ঘোর কলি, হাড়ে মাসে জ্বলি॥
অবাক্ করলি, ভবি, অম্বলে দিলি আদা॥
অবাক্ কলি অঘোরে, গুড়ছোলা খেলে গা ঘোরে॥
অবাক্ কলি বাক্ সরে না, গুড় দিয়ে মুড়ি পেট ভরে না॥
অবাক্ কিবা কলিকাল, মণ্ডায় লাগে বড় ঝাল॥
অবাক্ কলির অবতার, ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার॥
কালে কালে কতই হ'ল, পুলিপিঠের লেজ গজাল॥
আ মরি, মিন্‌সে লোক হাসালে, গোঁফ রেখেছে তোবড়া গালে॥
আ মরি, আ মরি বালাই যাই, গুড় দিয়ে তোর গাল চেটে খাই॥
বিয়ের কনে বলে—হাগব॥
আমার হাগা পেলে জাগিয়ে দিও॥
খ্যাঁদা নাকে নথ, আর গোদা পায়ে মল॥
চালুনিতে ঘোল বিলান॥
কোন্ কালে হবে পো ন্যাকড়াকানি তুলে থো॥
হাগুন্তীর লাজ নেই দেখুন্তীর লাজ॥
এঁড়ে গরু, না, টেনে দো॥
আমানি খেয়ে দাঁত ভেঙেছে, সিঁদুর পরবি কিসে?
মা আইবুড়ো, বেটী শ্বশুরবাড়ি যায়॥
রথ দেখতে ভাতার ম'লো, দোল দেখতে যাই॥
বুনলাম ধান, তুললাম তিল, ফলল রুদ্রাক্ষ, খেলাম কিল॥
কিসে নেই কি, পান্তা ভাতে ঘি॥
হাতী ঘোড়া গেল তল, বেতো বলে হাঁটু-জল॥
কত শত গেল রথী, শেওড়াতলার চক্কোত্তি॥

মানুষের যোগ্যতার চেয়ে আশা বেশি, তাই সাধের অন্ত নেই—

মনে বড় সাধ, চড়ব বাঘের কাঁধ॥
কত সাধ যায় রে চিতে, মলের আগায় চুট্‌কি দিতে॥

কত সাধ যায় রে চিতে, ফোগলা দাঁতে মিশি দিতে॥
কত সাধ যায় রে চিতে, বেগুন গাছে আঁক্‌শি দিতে॥
সাধ করেছেন কাণ্ড, পাকলে খাবেন ডাঁও॥
সাধ যায় বাদশা হতে, খোদা মেগে দেয় না খেতে॥
সাধ করে বেধ্‌লাম কান, কাঠি দিতে যায় প্রাণ॥
চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেল, জোনাকির পোঁদে বাতি।
মোগল পাঠান হদ্দ হ'ল ফারসী পড়ে তাঁতী॥
বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি॥
বারো হাত কাপড়ের তেরো হাত দশী॥
ছেলের চেয়ে ছেলের গু ভারী॥

বাহিরে জলুস ভিতরে ফাঁকা, ব্যর্থ আত্মম্ভরিতা বা হাম্‌বড়াই—ইহাও এক শ্রেণীর ন্যাকামি, বোকামি, ভণ্ডামি বা ভড়ং, যাহা বিবিধ প্রকারে দেখা দেয়; তাই এ সম্বন্ধে বিবিধ প্রকারের প্রবাদের শেষ নাই,—

বাইরে কোঁচা লম্বা, ভেতরে অষ্টরম্ভা॥
বাইরে কোঁচার পত্তন, ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন॥
ভেতরে ফাঁক যত যার, বাইরে ঢাকা তত তার॥
ঘরে নেই ভাত, কোঁচা তিন হাত॥
ঘরে নেই ঘটিবাটি, কোমরে মেলাই চাবিকাঠি॥
ঘরে নেই ভাজাভুজা, নিত্য করেন গোঁসাই-পূজা॥
ঘরে নেই ভাত, দোরে চাঁদোয়া॥
ইটে নেই, ভিটে নেই, চৌধুরীর পুত॥
ইটে নেই, ভিটে নেই, বাইরে মর্দ্দানি॥
পোঁদে নেই চাম, চৌধুরী নাম॥
চৌধুরী চৌধুরী বড় নাম, ছাগলে চিবায় পোঁদের নাম॥
পোঁদে নেই ইন্দি, ভজ রে গোবিন্দি॥
উদ্‌ খেতে ক্ষুদ নেই, নেউলে বাজায় শিঙে॥
আলা এলে, ডালা এলে, মুই পুতের মা।
পাইক এলে, পেয়াদা এলে, মুই কিচ্ছু না॥
রূপের সঙ্গে খোঁজ নেই ফটিকে রাঙা থোপ॥
ফুটানির মামা, ভিতরে কপনি উপরে জামা॥
পেটে ভাত নেই, ঠোঁটে আল্‌তা॥
ছুঁচোর গোলাম চামচিকে, তার মাইনে চোদ্দ সিকে॥

ফেন দিয়ে ভাত খায়, গল্পে মারে দই।
মেটে হুঁকোয় তামাক খায়, গড়গড়াটা কই॥
খড়ো ঘরে ঝাড় টাঙান॥
মেটে দেওয়ালে পাঁকীর কাজ॥
ঘরে শাকসজনা, বাইরে বাবুয়ানা॥
পরের ঘরে খায় দায়, আঠারো মাসে বছর যায়॥
পেট ভরে না ভাতে, সোনার আংটি হাতে॥
পরবার নেংটি নেই, দরগায় যেতে যায়॥
বাঁচতে পায় না ভাত কাপড়, মরতে হ'ল দানসাগর॥
যার মোটে বিয়ে হয় নি, তার ঠাকুরঝি বলবার সাধ॥
চাল নেই, তার ধুচুনি নাড়া॥
খেতে পায় না শাকসজনা, ডাক দিয়ে বলে ঘি আন না॥
তপ্ত ভাতে নুন জোটে না, পান্তা ভাতে ঘি॥
ভাত পায় না কুঁড়ের নাগর, আমানি খেয়ে পেটটা ডাগর॥
ভাত পায় না, মল প'রে নাচে॥
ক্ষুদের জাউ পায় না, ক্ষীরের জন্য কাঁদে॥
ক্ষুদ পায় না, মলুকারে কাঁদে॥
পোঁদ নেংটা মাথায় ঘোমটা॥
ফোগলা দাঁতে হাসি, জিল দেখিয়ে হাসি॥
গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল॥
ছাতার বলে—গাঁ আমার॥
চাল নেই, চুলো নেই, হাটের মাঝে রাজত্ব॥
ঢাল, না তলবার, নিধিরাম সর্দ্দার॥
নিনুর পিরানে আত্মারাম সরকার॥
কুকুর কি জানে তুলসী বন, ঠেঙ তুলে মুততে মন॥
যত ছিল নাড়বুনে, হ'ল সব কীর্ত্তুনে॥
বাপ মেরেছে উকুন তাই ছেলে ধনুর্দ্ধর॥
মায়ের নাম পোঁটাচুন্নী, ছেলের নাম চন্দনবিলাস॥
ঘুঁটেকুড়ুনীর বেটা ভাঙাগাঁয়ের মোড়ল॥
কোন কালে নেইক গাই, চালুনি নিয়ে দুইতে যাই॥
চুল নেই, তার পেটো পাড়া॥
চুলের সঙ্গে খোঁজ নেই, তার বোঝা পাঁচ ছয় দাঁড়॥

ছাই পায় না, মুড়কি জলপান॥
মা পায় না ছেঁড়া কাঁথা সেলাই করবার সুতো।
বেটার পায়ে দেখ গিয়ে চোদ্দ সিকের জুতো॥
মা বেচে খায় কলমিশাক, বেটার মাথায় ফরমেসে পাগ॥
বড় গাঁ, তার মাঝের পাড়া, বড় নাক তার নথনাড়া॥
বড় বাড়ি, তার ঢেঁকিশালা॥
বাড়ির মধ্যে একটি ঘর, তার আবার সদর অন্দর॥
দোয়াত নেই, কলম নেই, বলে—আমি মুনশী॥
আমি কি নেড়ী-ভেড়ী, আমার পাঁচখানা কাপড় ধোপার বাড়ি॥
কানকাটা কই তালগাছ যায়, কালামুখ নিয়ে দরবারে যায়॥
ছাঁচের জলে খাবি খায়, সমুদ্দর পার হতে চায়॥
ভাত রোচে না, রোচে মোয়া, চিঁড়ে রোচে পোয়া-পোয়া॥
বড় নাক, তার গোঁফের বাহার॥
ভারি বিয়ে, তার দুপায়ে আলতা॥
গাজনের নেই ঠিক ঠিকানা, তবু বলে ঢাক বাজা না॥
শিবের সঙ্গে খোঁজ নেই, গাজনের ঘটা॥
ছিল নাক ঘেঁটুপুজো একেবারে দশভুজো॥
তিন দিনের যুগী, তার পা পর্য্যন্ত জটা॥
খুস্‌কিতে তেল নেই, কলাবড়ার সাধ॥
বাপের বয়সে কলমা নেই, পাঁজা ভরা দাড়ি॥
বাপ বলবার নাম নেই, হিদে জোলার নাতি॥
বিষহারা ঢোঁড়া, তার গর্জ্জন দেশজোড়া॥
আরশুলা আবার পাখী॥
তেলাপোকা আবার পাখী, ভেরণ্ডা আবার গাছ॥
বিষ নেই কুলোপানা চক্কর॥
হেলে ধরতে পারে না, কেউটে ধরতে চায়॥
হায় রে আমড়া, আঁটি আর চামড়া॥
আপনি গেলে ঘোল পায় না, বেঁশোকে পাঠায় দুধের তরে॥
আপনি পায় না শঙ্করাকে ডাকে॥
আমি বেহায়া পেড়েছি পাত, কোন্‌ বেহায়া না দেয় ভাত॥
দুর্গাপুজোয় শাঁক বাজে না, ষষ্ঠীপুজোয় ঢোল॥
ঘণ্টা বাজিয়ে দুর্গোৎসব, ইতুপুজোয় ঢাক॥
নিত্য চাষার ঝি, বেগুন-ক্ষেত দেখে বলে—এ আবার কি॥

ছিল ঘুঁটে-কুড়োনী, পেয়েছে রাজপুত্তুর বর।
মুড়ি মুড়কি দেখে বলে—কি গাছের ফল॥
কাঠ-কুড়োনীর মেয়ে, রাজা আনলে ঘরে।
খাট পালঙ্গ দেখে দেখে হেসে হেসে মরে॥

ক্রমশ
শ্রীসুশীলকুমার দে

উৎসব

দৈনিক দীনতাগুচ্ছে আটি বাঁধা বাঁধা
বৎসরে বৎসর,—
শুষ্ক তৃণস্তূপ,—
জীর্ণপ্রায় পাণ্ডু ত্রি-প্রান্তর।
সহসা বিদীর্ণ করি তাম্র দিগন্তর
আসে না উৎসব কোন ?
মুহূর্তের স্ফুলিঙ্গ-পরশে
দাহন-হরণ আনি
ক্ষণতরে দেয় না রাঙায়ে প্রাণের আকাশ ?
সমস্ত শূন্যতা
সুপ্রসন্ন, করি সুপ্রকাশ ?

এস এস হে উৎসব !
হাসিমুখে একবার করহ আহ্বান ;—
পতিত মাঠের মাটি
দিনেকের তরে পেয়ে প্রাণ
উঠুক প্রতিমা হয়ে পূজার মণ্ডপে।
তোমারি মায়ায়
একটি রজনীতরে ঝুটা রাংতায়

উঠুক ঝলিয়া
মহামূল্য মাণিক্যখচিত
কষিতকাঞ্চনসমাদর।
বাঁশের বাঁশির রন্ধ্রে অধমের মুখে—
নহবতে উঠুক বাজিয়া—
দিব্য স্বরে বুকের সানাই।
মরণান্তে প্রসাধিত
অবোলা পশুর চামড়ায়
কাড়া ও নাকাড়া ঢোল
করিয়া উঠুক কলরোল।
মণ্ডপের বদ্ধ নির্জ্জনতা
সহসা খুলিয়া দ্বার হোক মুখরিত
গীতে বাদ্যে গণ্ডগোলে,
আলোক-উজ্জ্বল চন্দ্রাতপতলে
দলে দলে জনসমাগমে।
এ মন্দিরে একদিন
সুন্দর সুন্দরী নবীনা নবীন
সাজিয়া আসুক সবে বিচিত্র সজ্জায়
গৌরবে গরবে অলঙ্কারে।
বালক-বালিকা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা প্রৌঢ় কি প্রৌঢ়ারা
মলিন আটপৌরে ছাড়ি
যে যার পোশাকী সাজে
একদিন সাজিয়া আসুক সারি সারি।
বহিয়া আনুক গন্ধ, মাল্য, মাঙ্গলিকী।
ভুলি নিত্য তুচ্ছতা ও কুৎসিতের স্মৃতি
এক সন্ধ্যা সুন্দরের করুক আরতি—
বাহুল্যের সহস্র শিখায়।
ধূপ দীপ শঙ্খ ঘণ্টা,
পুষ্প পত্র মন্ত্র হোম দান,

নৃত্য হাসি গান,
দীয়তাম্ ভুজ্যতাম্ রব—
আন আন আন হে উৎসব !
তারি মাঝে—
কি আত্মীয় অনাত্মীয়ে
সসম্ভ্রমে করিয়া আহ্বান,
সুমধুর অশনে ভাষণে
সবারে হৃদয় করি দান।
গুরু বৃদ্ধে করিয়া প্রণাম
করপুটে লভিলাম
মুক্তাসম যত আশীর্ব্বাদ,
গাঁথি মালা, পরায়ে তরুণ-কণ্ঠে,
পূর্ণ করি অন্তরের সাধ।

কার্পণ্যকুঞ্চিত করে
তিন সন্ধ্যা কাঁচা পোয়া ছটাকের জপ
একদিন ভুলাও উৎসব !
দিনেকের তরে
ভারে ভারে মণে মণে মাঠের সম্পদ
বহিয়া আনহ মোর ঘরে।
অনর্জ্জন অসঞ্চয় ঋণ
এক পাত্রে গনি,
এক রাত্রি কর মোরে ধনী,—
ঋণোজ্জ্বল পূর্ণচাঁদে পূর্ণিমা-রজনী সম।
মিথ্যা করি ভাগ্যলিপি, লঙ্ঘিয়া বিধাতা,
বারেক করহ মোরে দাতা।
ল'য়ে তুচ্ছ অকাঞ্চন কাচে
প্রাণ যদি এতকাল বাঁচে,
কাঞ্চনে করহ আজ কাচ,

কুবেরের কনক-মন্দিরে
লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে উড়ে লাগুক ছোঁয়াচ,
হাঘোরিয়া উড়নচণ্ডীর !
... ...

তার পর ?
তার পর দেখিব চাহিয়া—
তোমার বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট ভস্ম তৃণস্তূপ,
তোমার উচ্ছ্বাসবন্যা আনন্দপ্লাবন,
গেছে ভাসি—
গেছে নামি ;—
আর—
ঘিরে চারি ধার—
সংশয়-সঙ্কুল সন্ধ্যা,—
সঙ্কট-পঙ্কিল তেপান্তর !

তা হোক তা হোক,—
দিগন্ত নিতান্ত নিরুৎসব,
একবার এস, হে উৎসব !

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ধান

ধানে ক্ষেত একেবারে ভ'রে গেছে। কালু শেখের ছ-সাত বিঘা ক্ষেত্রের শ্যামা জননীর পীত অঞ্চলে যেন আর ধান ধরে না। কালু শেখের সাত বিঘে, তার ভাই মণি শেখের তিন বিঘে। তারপর গ্রামের আর সকলের, কারু বেশি, কারু কম। সিধু মোড়লের ধান-জমি কালুর সীমানার পাশেই।

কালু এসে দাঁড়াল ক্ষেতের পাশে। তারপর চলতে চলতে তার ঘরের সামনে গ্রামের মাঝে এসে পড়ল।

ঘরের দুয়ারে শিকল দড়ি দিয়ে বেশ শক্ত ক'রে বাঁধা, যেমন ক'রে বেঁধে রেখে চ'লে গিয়েছিল। কালু উন্মনভাবে এদিকে ওদিকে তাকাল। তার ভাইয়ের ঘরও সেই ভাবেই শিকল টানা আর কাঠি দিয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধা। কালু ক্লান্তভাবে দাওয়ার ওপর বসল। তা হ'লে কি তারা আসে নি? মাথাটা যেন কেমন হয়ে গেছে। মনে হ'ল, বিষম তৃষ্ণা পেয়েছে।

খানিক ব'সে থাকার পর তার হঠাৎ মনে হ'ল, হয়তো বাড়ির সবাই এসেছে, অন্য জায়গায় কিছু কাজে গিয়ে থাকবে। কিন্তু ঘরের দাওয়ায় ধূলোর ওপর পায়ের দাগ একটিও প'ড়ে নেই। কয়েক মাসের মধ্যে মানুষের গতিবিধি হয়েছে সেখানে এমন মনে হয় না; কিন্তু মন সে কথা ভাবতে চায় না। কালু উঠে দাঁড়াল। যদি ঘরে কলসী থাকে জলের, তা হ'লে একটু জল এনে খাবে, তারপর জল ভ'রে রেখে তাদের ওপাড়া থেকে ডেকে আনবে। একটু রান্নার যোগাড় করতে পারে যদি কারুর কাছে দুমুঠো চালের যোগাড় ক'রে। ক্ষেতের দিকে চেয়ে তার চোখে জল এল। কি দুর্দ্দিনই গেছে, দীর্ঘ চার মাস ধ'রে। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, জোয়ান ছেলে হবিব, তাদের মা, হবিবের বউ—আট-ন জন পথে পথে ঘুরে ঘুরে— তারপর ছোট ছোট তিনটি শিশুর মৃত্যু; হবিবের বউয়ের একটি মৃত সন্তান হয়ে জ্বরে ভুগে খেতে না পেয়ে অর্দ্ধমৃত অবস্থা। তারপর হঠাৎ তারা কোন্‌দিকে কি ভাবে ঘুরতে ঘুরতে চ'লে গেল, ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, বুড়ো কালু শেখ তা জানে না। কালুর বিবির কাছেই ছিল দুটি ছেলে—জমির আর ফকির। হঠাৎ দেখলে, তার সঙ্গে যেন তারা নেই। কলকাতার পথে পথে কদিন ধ'রে খুঁজে তাদের পায় নি। লরী ভর্ত্তি ক'রে লোক নিয়ে গেছে, লোকে বললে। কোথায়, তা কেউ বলে না। কালু ভাবলে, হয়তো তারা দেশেই সকলে এসেছে। কথা তো তাই ছিল, ধান পাকলে দেশে ফিরবে। তারা এলেই কালুও দেশে ফিরবে। কথাই ছিল, এই কটা মাস কোন-ক্রমে ভিক্ষে ক'রে প্রাণটা বাঁচলে আল্লা আর কোন অভাব রাখবে না।

কালুর চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। ক্ষেতের দিকে চেয়ে সে চোখ মুছতে লাগল। উন্মনভাবে বিড়বিড় ক'রে মুখে বলে, বাবা-মায়েরা, বহুত

ধান হয়েছে। তোরা একমুঠো ভাত চোখে দেখতি পেলি না বাপ। আজ ভরপেট ভাত খেতে দিতাম বাপ। কালুর ঝাপসা চোখের সামনে সমস্ত ক্ষেত মিলিয়ে গেল, কেবলই ছোট ছোট তিনটি বালক-বালিকার শীর্ণ কঙ্কাল তনু ভেসে ভেসে আসতে লাগল। শহরে এত ভিক্ষান্ন মেলে নি, এবং অন্ন তো দৈবাৎই মিলেছে, তাদের সকলের তো নয়ই, শিশুগুলিরও পেট ভরে নি। শিশুগুলিকে বহু আশ্বাস দিয়ে নিজেরা বহু আশা ক'রে দিনের পর দিন ওরা পথে পথে বেড়িয়েছে, যদি কোন রকমে এই কটা মাস বাঁচিয়ে রাখা যায়, তা হ'লে আবার সব হবে। তারপর—

কালু ঘরের দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করলে। না, তারা কেউ এখানে আসে নি। জলের কলসী, ধান-চালের জালা, হাঁড়িকুড়ি, ধূলায় ধূসরিত। মেঝেতে বহু ইঁদুরের গর্ত্ত। মাটি তুলে তুলে ঘরখানা ক্ষতবিক্ষত করেছে তারা। কালু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর কলসীটা নিয়ে গ্রামের দিকে এগিয়ে গেল।

চৌধুরীদের বড় পুকুরে জল নিয়ে ফিরবে, আর দেখবে, যদি ওই দিকে কোথাও হবিব তার মাকে বউকে নিয়ে এসে থাকে। তা হ'লে কদিনের জন্যে চারটি চাল যোগাড় করুক। তারপর? আর এবারে অন্নের দুঃখ খোদা রাখেন নি।

চৌধুরী-পুকুরের আশেপাশে ঘাটে আঘাটায় কয়েকজন জল নিতে, স্নান করতে এসেছিল।

কালু কলসী নিয়ে নিজেদের ঘাটের দিকে গেল।

অন্য ঘাট থেকে পতিত রুইদাস জিজ্ঞাসা করলে, কালু শেখ আইলে নাকি? ভাল সব?

কালু কলসী রেখে বললে, হাঁ ভাই, আলাম তো। হবিবরে দেখেছ নাকি?

পতিত স্নান করছিল, সে বললে, না ভাই। সবাই এসেছ তো? তোমার ক্ষেতে খুব ফসল হয়েছে ভাই। আর দেখ না, সব ক্ষেতেই কি ফলন ফলেছে! একটু নিশ্বাস ফেলে তারপর বললে, শুধু দেশে আর মানুষ নাই।

পতিত স্নান ক'রে চ'লে গেল।

কালু মাথায় মুখে খানিক জল দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইল। তা হ'লে এরা হবিবদের দেখে নাই!

খানিকটা জল খেয়ে কলসীটা ভ'রে কালু ঘাটের ওপরে একটু ছায়া দেখে বসল।

আশেপাশে এঘাটে ওঘাটে প্রায় জনহীন গ্রামের কয়েকটি লোক স্নান করতে এল। কেউ তারা কালুকে চেনে, কেউ চেনে না ভাল ক'রে। আর অনাথ আতুরের মত কালুর চেহারা হয়েছে, চেনাও শক্ত। কালু ভাবতে লাগল, একবার সিধু মোড়লের বাড়িতে খোঁজ করবে, সে হয়তো জানে হবিবের খবর। বেলা পড়তে আরম্ভ হয়েছে। কালু ক্লান্তভাবে উঠে দাঁড়াল।

সিধু মোড়লের ঘরখানা কালুর ঘরের খানিকটা পেছনের দিকে। তার ঘরের তুয়ার খোলা। আঙিনায় একটা শীর্ণকায় গরু, তার বাছুরটা নেই কোথাও। সিধুর একটা কুকুর ছিল, সেটা এখন যেমন হ্যাংলা তেমনই খেঁকি। কালুকে দেখে ঘেউঘেউ ক'রে এল। আঙিনায় জঙ্গল ভ'রে গেছে। দাওয়ার ওপর বহুকাল লেপা পড়ে নি।

কালু ডাকলে, সিধু ভাই, ঘরে আছ?

ঘরের মধ্যে থেকে অতি ক্লান্ত স্বরে জবাব এল, আছি, কে তুমি? উঠে এস, আমার জ্বর।

কালু ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, আমি কালু শেখ ভাই। তুমি জ্বরে প'ড়ে আছ? ভাই, হবিবের মারে—ওদের দেখেছ? এখানে আইল নাকি? তোমার কাছে এখানে কেউ নাই? সবাই কোথায়? খুব ধান হইছে তোমার ক্ষেতেও দেখলাম।

কঙ্কালসার সিধু একবার উঠে বসবার চেষ্টা করলে, পারলে না। কোটরে-বসা চোখ তুটায় জল চকচক ক'রে উঠল। একটু পরে শান্তভাবে ধীরে ধীরে বললে, হ্যাঁ ভাই, ধান হইছে। রামের খুব অসুখ করল—জ্বর পেটের অসুখ, তার মায়েরও জ্বর হ'ল। তারপর—তারা তুজনেই আমায় ফেলে চ'লে গেল। সিধুর চোখের কোলের জল তু

কৌটা গড়িয়ে পড়ল। ভাই, পাকা হাড়ে খুব সয়, তাই আমি জ্বরে ভুগেও, না খেতে পেয়েও টিকে আছি। ওরা সইতে পারলে না।

কালুরও চোখে জল পড়ছিল। সে বললে, হ্যাঁ ভাই, আমারও তিনটা বাচ্চারে কলকাতাতে রেখে আলাম—ফতি, আয়েষা, সোনা। তারা খিদেতে শুকিয়ে গেল ভাই—ভাতের জন্যি। আর এত ধান—

দুজনেই নীরব হয়ে গেল। ঘরের সামনে থেকে দেখা যায়, সিধু মোড়লের ধানের ক্ষেত ফসলের ভারে নুয়ে পড়েছে। সিধু জিজ্ঞাসা করলে, আর সবাইরে নিয়ে এসেছ ?

কালু শেখ উঠে দাঁড়াল, বললে, গেরামে তাদের দেখতি পাব মনে ভেবে আলাম তো। তারা যে কমনে গেল! খুঁজে দেখি। তোমাদের দিকে আসে নাই ?

সিধু বললে, না তো। তোমার বিবিরে কি ছাওয়ালদের তো এদিকে দেখি নাই, তা আমি তো জ্বরে শুয়ে প'ড়ে, দেখি, মেয়েটা ছেলেটা ফিরলে শুধুব, তারা জানবে হয়তো।

কালু শেখ উন্মনভাবে সারা বেলা অনাহারে তাদের গ্রামে হবিবদের আর তার মাকে খুঁজে বেড়াল। না, তারা এ গ্রামে আসে নি। দুমুঠো চাল এনে সন্ধ্যাবেলা সিধু মোড়লের মেয়ে বললে, কালুকাকা, দুটো রেঁধে খাও আজ। এক মুঠো খেয়ে কাল আবার ভিন্ গাঁয়ে দেখো, হয়তো আসতেছে। পথ চিনতে দেরি নাগে তো।

পতিত রুইদাসও তাই বললে। গ্রামের ঘর বেশির ভাগই শূন্য, কোঠাবাড়িতেও লোক যেন নেই, চেনা পথের মাটিতে পায়ের দাগ যেন গুনে নেওয়া যায়—এত কম। গরু বাছুর বলদও নেই, লোকে বেচে দিয়ে চ'লে গেছে। যারা কিছু ধান রাখতে পেরেছিল লুকিয়ে চুরিয়ে, তারাই প'ড়ে আছে, হয়তো বেঁচেও আছে। বাকি সব পালিয়ে গেছে, চ'লে গেছে। বেঁচে আছে ? কেউ জানে না। আর ফেরে নি।

কালু কোনক্রমে দুটো রাঁধে। মুখে গ্রাস ভাল ক'রে ওঠে না। মনে হয়, হয়তো তারও কবিলা নেই, আর জমির ফকির—কচি ছেলে দুটা ?

সিধু মোড়লের কথা মনে হয়, পাকা হাড়ে খুব সয়। তার মন হুহু ক'রে ওঠে, চোখে উচ্ছ্বসিত হয়ে জল আসে। অবশিষ্ট ভাতগুলি সিধুর গরুর কাছে কুকুরের কাছে ঢেলে দিয়ে ওদেরই দাওয়ার পাশে শুয়ে পড়ে। বললে, লক্ষ্মী, শূন্যি ঘরে যেতে মন সরছে না মা, আজ তোদের ঘরকে হেথায় প'ড়ে থাকি।

লক্ষ্মী ম্লানভাবে হেসে বলে, শোও তাই, একখানা মাদুর দিই। কার্ত্তিকের রাত্রের মাঠের কনকনে হিম ছেঁড়া কাপড়ে বাধা মানে না। কালুর ঘুম শীতেও আসে না, ভাবনাতেও আসে না।

রাত্রি শেষ হবার আগেই মন আশান্বিত হয়ে ওঠে। সত্যি ভিন্ গাঁয়ে—ওই পাশের গাঁয়ে হয়তো এসে জিরুচ্ছে তারা। খাওয়া নেই কতকাল, হয়তো জ্বরে পড়েছে, হয়তো কমজোর হয়ে গেছে। কালু ছেঁড়া কাপড়টা টেনেটুনে গায়ে দিয়ে প্রভাতের আগেই পাশের গ্রামের দিকে যায়।

সে গ্রামের প্রায় সকলেই অচেনা। মানুষ সেখানেও যেন নেই। কাকে জিজ্ঞাসা করবে, কে তাদের চেনে, কেবা ওকে চেনে, কিছুই যেন বোঝা যায় না।

অখাদ্য আহারে কঙ্কালসার রোগা জীর্ণকায় এক-একজনকে দেখে কালু জিজ্ঞাসা করতে যায়, কি জিজ্ঞাসা করবে যোগায় না। হতবুদ্ধির মত গ্রামের পথে পথে খুঁজে খুঁজে ঘুরে বেড়ায়। তারা পাঁচজন, হবিব, তার মা, বউ, ছেলে দুজন! যদি একজনকেও দেখতে পায়।

গ্রামে কোঠাবাড়ি নেই বললেই হয়, কাঁচা ঘর প্রায় খালি, যারা আছে তাদের দেখলে মনে হয় আর অল্প কয়েক দিনের জন্যেই আছে। গ্রামের আশপাশের ক্ষেত কিন্তু ফসলের ভারে হেলে পড়ছে। কিন্তু এখানও যারা বেঁচে আছে, পথে উঠে এসেছে, তাদের কারও দৃষ্টি উদাসীন, কারু বা হতবুদ্ধি, আতঙ্ক-অভিভূত। ফসল? ফসল কার? তাদের? লোকেরা কি ছিনিয়ে নিতে আসবে না আর? আর ফসল কে খাবে? কে কাটবে? খাবার লোক, অতিপ্রিয়তম যারা, তারা অনেকেই যে নেই। কাটবার জন্যে যারা আছে, আর তাদের শক্তিও নেই, প্রয়োজনবোধও নেই; শোকে রোগে ভয়ে ভাবনায় জড়ের মত হয়ে

আছে। সকালে একবার শুধু গ্রামের পথে উঠে আসে। তারপর ফিরে গিয়ে জীর্ণ খড়-ছাওয়া কুটিরখানিতে গিয়ে ব'সে থাকে। বিকালের দিকে হয়তো জ্বর আসে, ছেঁড়া কাঁথাখানা গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে।

কালু এ গ্রাম ও গ্রাম ঘুরে বেড়ায়। ভদ্রলোক কারুকে দেখলে কাছে গিয়ে সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়ায়। সকলে ভয় পায়, পাছে ভাত চায়, খেতে চায়। কালু বলে, না বাবু মশায়, খেতে চাচ্ছি না, মোর কবিলারে ছাওয়ালদেরকে খুঁজতে আলাম এধার পানে, মোরা মোছলমান। সে অন্ন চায় না, আশ্রয়ও না, শুধু ছত্রভঙ্গ সঙ্গীদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। আজ আর অন্ন আশ্রয়ের অভাব তার খোদা রাখেন নি। কেউ সহৃদয়ভাবে বলেন, না বাপু, মোছলমান দেখি নি কারুকে এ গাঁয়ে। কেউ বিরক্ত হয়ে বলে, শোন কথা ব্যাটার, ওর কবিলা কোথায় আমরা তার হিসেব রাখি যেন।

কোনদিন আশপাশের গ্রামেই প'ড়ো ঘরের দাওয়ায় শুয়ে পড়ে, কোনদিন গ্রামে ফিরে আসে। এমনই ক'রে দশ-বারো দিন গেল। পাশাপাশি কালুদের ক্ষেতের, সিধু মোড়লের ক্ষেতের, পতিতের ক্ষেতের, সকলের ক্ষেতেরই ধান পেকে উঠল। সিদুর ছেলে নিতাই দু-একজন আপন জন ডেকে জড়ো ক'রে ধান কাটতে আরম্ভ করলে।

কালু উদাসীন নির্ব্বোধের মত ওদের দাওয়ার এক পাশে ব'সে থাকে নিজের ক্ষেতের দিকে পিছন ফিরে।

এখন সিধু কোনক্রমে শরীর টেনে নিয়ে তার পাশে এসে বসতে পারে। বলে, ভাই, তামুক খাও। কলিকাটি হুঁকা থেকে নাবিয়ে দেয়।

কালু কলিকাটি হাতে নিয়ে ব'সে থাকে। তারপর ফুঁ দিয়ে টানতে গিয়ে তার চোখ জলে ভ'রে যায়। কলিকা নাবিয়ে রাখে।

সিধু বললে, কি হ'ল ভাই, বিষম খালে?

কালু চোখ মুছে বলে, কি জানি।

কালু ব'সে ব'সে দেখে। লক্ষ্মী খুঁজে-আনা সঙ্গিনী জড়ো ক'রে ধান মাপে, ঝাড়ে, তোলে। নিতাইয়ের ক্ষেতের কাজ শেষ হয়ে এল।

এবার একদিন সন্ধ্যাবেলা নিতাই বললে, কালুকাকা, আমার কাজ হয়ে এল। এবারে তোমার খ্যাতে নাগব সবাই, কাল বাদে পরশু নাগাত।

কালু অবুঝের মত নিতাইয়ের পানে চাইলে।

সিধু ঘর থেকে বললে, হ্যাঁ, দশে মিলে কাজ করলে, তোমারও কাজ উঠে যাবে ভাই, ভাবছ কেনে?

কালু এবারে হাউহাউ ক'রে কেঁদে ফেললে।

ধান কাটা হয়ে উঠবে কি না, তার কাজ উঠে যাবে কি না, কালু ভাবে নি। সে ক্ষেতের দিকে আর চাইতেই পারে নি। কালু কিছু ভাবতেই আর পারে নি।

দুটি কিশোর তরুণ-বয়স্কের, তাদের বাপেরও চোখ শুকনো রইল না। কালুর কান্না সিধুর শোক জাগিয়ে তুলল। কিন্তু সিধুর ঘরে এখনও নিতাই আছে, লক্ষ্মী আছে। আবার ধীরে ধীরে তার সমস্ত দুঃখের ক্ষতে প্রলেপ পড়বে, আবার হয়তো এই আঙিনা ভ'রে নিতাইয়ের লক্ষ্মীর কোলের শিশুদেবতার পায়ের চিহ্ন পড়বে। নিতাইয়ের জননীর কথা, রামের কথা তারা জানবে না, সিধুও হয়তো তাদের মধুর হাসি-কাকলির কলশব্দে আজকের গ্রামের জনহীন এই নিস্তব্ধ ভয়াবহ দুর্দিনকে ভুলে যাবে।

চোখ মুছে লক্ষ্মী বললে, কালুকাকা, কেঁদো না। কাকী বুড়ো হয়েছে, হয়তো হাঁটতে পারে না তেমন। আর হবিব ভাই তো সঙ্গে আছে। তুমি আজ দুটি রেঁধে খাও, কাল আবার খুঁজতে বেরিও। ওরাও তো জানে ধানকাটার সময়। ওরা আসবেই ফিরে।

নিতাই বললে, হ্যাঁ, তাই কর। তুমি ফিরে এলে আমি তোমার ধান কাটতে শুরু করব।

সিধু বললে, তখন যদি গাঁ ছেড়ে না যেতে ভাই! তা হ'লে আর এমন হ'ত না। কালু চোখ মুছে নীরবে ব'সে রইল।

নিতাই বললে, ঘরে যদি খাবার চাল থাকত, তা হ'লে কি আর লোকে যেত বাবা! এমন ক'রে গাঁ 'নক্ষীশূন্যি' ক'রে দিলে যে—

নিতাই চুপ ক'রে গেল। চোখের সামনে যেন ভেসে এল উর্দ্দি-চাপরাস-পরা সরকারী লোকের শোভাযাত্রা। লোকে সভয়ে

আঙিনায় গোলার পাশ থেকে স'রে দাঁড়াল, বীজধানের জালা খুলে দেখিয়ে দিলে। কেউ বা কয়েকটা কাগজের টাকা পেলে, কেউ বা পেলে না। কি জন্যে কি নীতিতে গ্রাম লক্ষ্মীশূন্য অন্নহীন হয়ে গেল একদিনের মধ্যে, তা আজও নিতাই জানে না। দু-এক ঘর গৃহস্থ শুধু ধান চাল রাখতে পেরেছিল। তারা 'নিসপেকটার' সায়েবের কাছে সেলাম করতে গিয়েছিল। নিতাইরা তাদের কাছেই ধার চেয়ে ক্ষেত বাঁধা দিয়ে আজও মরে নি। নইলে ওরাও গাঁ ছেড়ে যেত না কি? তবু তো মা গেল, ভাই গেল।

দুখানি ইট দিয়ে উনান ক'রে লক্ষ্মী বললে, কালুকাকা, এখানেই দুটি ভাতে ভাত ক'রে নাও। কালু হতবুদ্ধির মত লক্ষ্মীর নির্দ্দেশমত ভাতে ভাত বসিয়ে দিলে ওদেরই গোয়ালে। লক্ষ্মীদের ঘরে সকলের খাওয়া হ'ল। কালুর ভাতে ভাত সিদ্ধ হয়ে গেল। রাত্রি গভীর হয়ে আসতে লাগল। সিধু রোগা মানুষ, তার ঘরের আগল বন্ধ ক'রে লক্ষ্মী বললে, কালুকাকা, খেয়ে এসে আজ ওই পাশের ভাঙা ঘরখানায় শোও। বাইরে বড় ঠাণ্ডা। আর রাত ক'রো না। দেয়ালে ঠেস দিয়ে কালু মূঢ়ের মত চুপ ক'রে ব'সে ছিল। শুধু বললে আচ্ছা, তুমি শোও গা মা।

রাত্রি গভীরতর হ'ল। রাত্রি কত প্রহর হ'ল ওরা বোঝে ঘড়ি না দেখেই। কালু নিদ্রাহীন দৃষ্টিহীন চোখে আকাশের সীমান্তে চেয়ে রইল। মনে আসে তিনটি শিশু বালক-বালিকার কথা। গত বছরের কথা, তারপর হবিবের মা, হবিব, ফকির, জমির, বউ, ভাইদের বাড়ির সকলের কথা। সকলেই ছিল তারা। ধান কাটা, ঝাড়া, তোলা, তাদের কত কাজ, কত আনন্দ! চৌধুরী-বাড়িতে 'লবান্নর' (নবান্ন) জন্যে নতুন ধান কুটে চাল দিয়ে আসে হবিবের মা। তেনারাও তারে লবান্ন দেয়—কাঁচা চাল দুধ গুড় ফল সন্দেশ, তারা খেয়েছে সকলে। আর এবারে তারা কেউ নেই। ধান? ওরা কাটবে বলেছে। কিন্তু কি করবে কালু ও ধান নিয়ে? কে খাবে? কাদের খাওয়ার জন্যে ও ধান কাটবে? কোন্ সময় খেঁকিটা কালুর ভাত কটি উনান ঠাণ্ডা হ'লে খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে সেইখানেই ঘুমিয়েছে।

অকস্মাৎ পূর্ব্বদিক রাঙা হয়ে উঠল। কালু সোজা হয়ে বসল। তারপর আস্তে আস্তে দাওয়া থেকে নেমে গেল। সরু পথের দুধারে ওদেরই ক্ষেতের ফলন্ত ভারী ধানের শীষ নুয়ে এসে তার গায়ে লাগে—যেন সাপের স্পর্শের মত তার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠে। চোখে আকুল হয়ে জল আসে। সে অভিভূতের মত দ্রুতপায়ে ক্ষেতের সীমানা, গ্রামের সীমানা অতিক্রম ক'রে যেতে চায়। কিন্তু কোথায় খুঁজতে যাবে? মহানগরীর মানুষের অরণ্যেই কি কোথায় তারা হারিয়ে গেল? অথবা—? অথবার কথা কালু ভাবতে পারে না। দূরে—বহুদূরে মানুষ দেখে। মনে হয়, ওরা কি জানে তাদের কথা, হোক অচেনা, হয়তো জানে। হয়তো ওদের মাঝেই হবিবকে, জমিরকে, ফকিরকে—একজনকেও দেখতে পাওয়া যাবে।

* * *

সরকারী খাদ্য-বিভাগের কর্ম্মচারীরা এসে দেখছিল, কোন গ্রামে কত ধান হয়েছে।

গাছে ঠেস দিয়ে সাইকেল রেখে খাকি সুট পরা দু-তিনটি লোক পতিত রুইদাসের ক্ষেতের পাশে এসে দাঁড়াল। এই নতুন ধানের শীষের মত নধর হৃষ্টপুষ্ট গোল সবল চেহারা, পরস্পরের মধ্যে বললে, বাঃ, চমৎকার ফসল হয়েছে তো!

পতিত ধান ঝাড়ছিল, আতঙ্কে তার হাতের কাজ থেমে গেল।

খাকি-পরা একজন জিজ্ঞাসা করলে, এ ক্ষেত কার, তোমার?

সভয়ে পতিত বললে, আজ্ঞে।

ওটা? সামনে সিধু মোড়লের ক্ষেতের সামান্য ধান মাপা বাকি ছিল।

ওটা সিদ্ধেশ্বর মোড়লের।

এবারে পতিতের আশেপাশে কয়েকজন জড়ো হ'ল—নিতাই, লক্ষ্মী, পতিতের ভাই, তার লোকজন।

আর ওটা? ওটা যে কাটাই হয় নি, কার?—ঠিক নাকের নীচে কাঁঠালে মাছির মত ক'রে গোঁফ ছাঁটা একজন জিজ্ঞাসা করলে।

নিতাই বললে, ওটা কালু শেখদের।

কাটে নি যে ?

তারা হেথায় নেই। তারা চ'লে গিয়েছিল মন্বন্তরের সময়।—পতিত বললে।

মস্ত ক্ষেত যে, কতজন তারা ? একজন পকেট থেকে নোটবই পেন্সিল নিয়ে লিখে নিচ্ছিল কি সব।

তা উনিশ-কুড়ি জন হবে। কালু শেখ, তার বউ তার চার ছেলে দুই মেয়ে, এক ছেলের বউ, তার ভাই মণি শেখের দুটো পরিবার, তাদের সাত-আটটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে।—নিতাই বললে।

আশ্চর্য্য হয়ে মাছি-গোঁফওয়ালা বললেন, কেউ নেউ তারা ? কেউ ফেরে নি ? এত ধান হয়েছে, কাটবে না ?

নিতাই বললে, কালু শেখ এসেছিল, চার দিন হ'ল তাকে আর দেখছি না। মণি শেখের মোরা কোন খবর জানি না। বর্ষার সময় গাঁ ছেড়ে চ'লে গিছল তারা।

অন্নাভাবে পলাতক মারীতে উজাড় জনহীন গ্রামে তাদেরই হাতে রোপণ করা শস্যভারানত ক্ষেত্রের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই লোকেরা কি সব লিখে লিখে নিতে লাগল।

কালু শেখের সাত বিঘে, মণি শেখের তিন বিঘে, পীতাম্বর কুমোরের দু বিঘে, সরস্বতী মাইতির খানিকটা ক্ষেত, সোনা বাউরীর আর কার সঙ্গে ভাগের ধান-জমি, আরও কার কার সব নাম লেখা হয়ে গেল। শুধু তারা যে কোথায় গেছে বা আছে, লেখা গেল না।

খাকি-পরা তারা জিজ্ঞাসা করলে, এদের তোমরা চেন ?

পতিত নিতাই হাতজোড় ক'রে বললে, হ্যাঁ বাবু, এক গেরামে বাস ছোট কাল থেকে। চিনি বইকি।

বেশ।

তারপর তারা সাইকেল চ'ড়ে পাশের গ্রামের দিকে চ'লে গেল। সরু সুঁড়ি পথের আশেপাশে তাদের সামনে পিছনে প্রায় জনশূন্য গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাবার পথে সোনার শীষে ভরা ধান নুয়ে নুয়ে পড়তে লাগল। যেন কাদের জন্য তাদের আর মিনতির শেষ নেই।

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

চকোর-শিক্ষা

আকাশে আকাশে টো-টো ক'রে আজও জ্যোৎস্না করিস পান ?
ছি ছি রে চকোর-দল,
নেহাত পুরোনো সাবেক সেকেলে ধাঁচা !
যা বলছি বাপু, মন দিয়ে শোন্,
ইজ্জতটাকে বাঁচা।
জ্যোৎস্না খাবি কি ! 'লাপসি'-ভোজন করি সমাপন
কলের জলেতে আঁচা।
তার পর ছুটে চল্
সেলুনেতে ঢুকে দাড়ি-ফাড়িগুলো চাঁছা,
ল্যাজ-ফ্যাজগুলো ছাঁটা,
তার পর সেটা নাচাতে চাস তো হিসেব-মাফিক নাচা।
বুকে-পেটে-পিঠে লেবেল-টেবেল সাঁটা।
তার পর গিয়ে শিক্ষা নে
ভিক্ষা নে
দীক্ষা নে···
টানতে শেখ্, মানতে শেখ্,
শুষতে শেখ্, লুসতে শেখ্,
হাফপ্যাণ্ট প'রে নানান নামতা ঘুসতে শেখ্।
তার পর ?
কর্ ফরফর, নয় ফড়ফড়।
উড়তে চাস তো ডানা দুটো মুড়ে লাফিয়ে চড়—
রয়েছে 'প্লেন
স্টীমার ট্রেন
বাইক কার
চমৎকার
(কিনবি ? আমার রয়েছে একটা নতুন 'বুইক্'।)

উড়তে উড়তে বাট্‌ন্‌হোলের কিস্‌-মি-কুইক
মাঝে মাঝে শোঁক্‌
পিড়িং পিড়িং ভোঁ প্যাঁক পোঁক
বাজনা বাজা—
ওরে ও খাজা
জরদগব ভব্য হ
কাগজ পড়, 'ইজ্‌ম' শেখ্‌, সভ্য হ।

"বনফুল"

বন্ধন-মুক্তি

চলা মোর ধন্য হোক রাত্রি আর দিন
নিঃশব্দ যাত্রায় রত পাদপের মত।
প্রাপ্তি মোর হোক ক্ষয় বৃন্ত-বন্ধ-হীন
ধূসর ধূলিতে লীন পত্র শত শত
মরণ লভিছে যেথা, সর্ব্ব ক্ষতি মম
পূর্ণ হোক ছন্দে রসে, মাধুর্য্য সম্ভারে
নব বসন্তের পল্লবিত তরু সম
বর্ণগন্ধ-মেশা শত পুষ্প অলঙ্কারে।
নিরাসক্ত হোক মোর সকল বন্ধন ;

প্রাপ্ত মোর যত সুখ, হাসি স্বপ্ন যত
র'চে যাক তারা মুক্তি-পথে আলিম্পন
তরুতলে ঝ'রে-পড়া কুসুমের মত।
বন্ধন-মুক্তির ছন্দে চ'লে যেন যাই
তারি টানে পেয়ে যাকে তবু নাহি পাই।

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী

নাদ

[হৃদয়ে ভাবাবেগ সৃষ্টির পক্ষে অর্থযুক্ত শব্দ অপেক্ষা নিছক ধ্বনিই যে অধিক বলবান— এ কথা জানিতে আর কাহারও বাকি নাই। এই নাদ-ব্রহ্মই সমস্ত রসসৃষ্টির মূল, বস্তুত অর্থযুক্ত বাক্য নিরঙ্কুশ রসাস্বাদে বাধা প্রদান করে মাত্র। আমি তাই স্রেফ 'ভাষাশূন্য অর্থহারা' নাদের সাহায্যে নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করিয়াছি। কবিতাটি বীররসাত্মক। পাঠকের মনোমত হইলে অন্যান্য রসের নাদ-কবিতাও লিখিবার ইচ্ছা আছে।—চন্দ্রহাস]

মট-মট-মট হুজ্যট-কট গন্থিয়া
ঘন্ন বিছট রণ্টিয়া!
বল্লুক লুক বাণ্ডা
হণ্ডুল-গুল ভাণ্ডা—
পণ্ডু-পুহিন গণ-গণ-গণ যণ্ডিয়া!
চিম্পট কুটু? গুম্ফট লগ ফন্দরে
ভণ্ডুর গুজু গন্দরে!
রুক্ষিলি কিল মুক্ষি
জর্ম্ম-জটুল ফুস্কি
চিঞ্চিল চিন রণক ধনক লন্দরে।
কর-খল-মঘ ডাঙ্গুলি-রগ ভণ্টিয়া
ডুম্বুল পিলু পন্থিয়া!
ঐ ঝলঝলি হঞ্জে
কিঙ্কিড়ু দিলু ভঞ্জে
গম্বু-গজর লম্বুক পরিচণ্টিয়া!
মট্ট-মটক হুজ্যট-কট গন্থিয়া!

"চন্দ্রহাস"

প্রত্যাখ্যান

সুখ যদি কোন দিন সম্ভোগের শত উপচারে
বঞ্চিত অঞ্জলি মোর চাহে ভরিবারে
তার সে নির্লজ্জ ছলনায়
বদ্ধমুষ্টি হতে মোর দণ্ড যেন না খসে ধূলায়।

দুর্ভাগ্যের বন্ধু মোর যত আছে স্বদেশে বিদেশে,
জীবনের উৎসবের শেষে
পরিত্যক্ত অন্নমুষ্টি প্রতি কণা তিক্ত অপমানে
ক্লান্ত দিবসের শেষে যারা নিজ ভাগ্য বলি মানে,
সভ্যতার রথচক্র যারা প্রতিদিন
অকৃপণ বক্ষরক্তে যুগে যুগে করিছে মসৃণ,
আমি তাহাদেরি সাথে, ললাটে মুদ্রিত অপমান,
বঞ্চনার বিষপাত্র নিঃশেষে করিতে চাহি পান।
কলুষিত ভাগ্যের উৎকোচে
উদ্ধত বিদ্রোহ মোর নতশির হবে না সঙ্কোচে।

বঞ্চিতের রক্তপুষ্ট ঊর্ণনাভ বুনিতেছে জাল
চতুর্দ্দিকে সমাকীর্ণ শোষিতের বিশুষ্ক কঙ্কাল;
তবু তার ক্রূর তন্তুপাশে
আলোকে শিশিরে যেন ইন্দ্রধনু ফিরে ফিরে আসে;
মনে হয় বুঝি
এই তো পেয়েছি যাহা জীবনের মাঝে নিত্য খুঁজি
রূপ রস আনন্দের সুমহান সহজ প্রকাশ!
তবু অবিশ্বাস
হৃদয়ের উৎস হতে সতর্ক করিছে বার বার—
জালিকের চতুর্দ্দিকে লক্ষ লক্ষ নর-মক্ষিকার
বিশুষ্ক কঙ্কালরাশি ইন্দ্রধনু-বর্ণের বিন্যাসে
অমোঘ সত্যের মত হাসিছে নিষ্ঠুর পরিহাসে।

শ্রীশান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

সংবাদ-সাহিত্য

১৩৫১ আসিয়াছে। ১৩৫০কে চৈত্র সংখ্যায় বিদায় দিয়াছিলাম; সে বিদায় গ্রহণ করিল কি না, আজও তাহা জিজ্ঞাসা করিবার মত সাহস পাইতেছি না। ব্যক্তিগতভাবে একটি বৎসরের পরমায়ু আমাদের সকলেরই শেষ হইয়াছে। কিন্তু যে সময়ে চোখের সম্মুখেই লক্ষ লক্ষ লোকের পরমায়ু চিরকালের মত শেষ হইতে দেখিয়াছি, সে সময়ে এক বৎসরের পরমায়ু খোয়াইয়াই যদি নিষ্কৃতি পাইয়া থাকি, তাহা হইলে নিজেকে ভাগ্যবান ভাবিতে হয় বইকি। বাঁচিয়া থাকা, 'mere living', সে যে কত বড় আনন্দের কথা তাহা কবিরা বলিয়াছেন। সে যে কত পুণ্যের ফল, কত কৌশলের কৃতিত্ব, তাহা ১৩৫০এর বাংলা দেশে না জন্মিলে কে বুঝিতে পারিত? সেই বহু সাধনায় আয়ত্ত কৌশলের কথা আজ প্রকাশ করিবার প্রয়োজনও নাই। যাঁহারা আমাদের সঙ্গে গত বর্ষকাল এমনই করিয়া মুখ থুবড়াইয়া পড়িতে পড়িতে উঠিয়া ছুটিয়াছেন, তাঁহারাও সকলেই এই বিদ্যা আয়ত্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন—পরস্পরে হাত মিলাইয়া আমরাও সকলেই দোকানীর সম্মুখে চাউলের জন্য হাত পাতিয়াছি, তেলের জন্য প্রার্থী হইয়াছি, চিনির জন্য ঝি ও বস্তির বন্ধুদের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছি, কয়লার জন্য রণনীতির সমস্ত কৌশল প্রয়োগ করিয়াছি, স্ট্যাণ্ডার্ড বস্ত্রের দর্শনাশা ত্যাগ করিয়া বারে বারে মেয়াদ-বাড়ানো 'ভদ্র' আচ্ছাদনই কিনিয়াছি, আর ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়মান সাদা কাগজের পিছনে ধাবিত হইয়াছি। এক সঙ্গেই আমরা হাত মিলাইয়া এই দিকে হাত পাকাইয়াছি, হাতাহাতি করিয়াছি, যে যাহাকে পারিয়াছি পাশে ঠেলিয়া ফেলিয়াছি, যে যেমন করিয়া পারি অন্যের আগে নিজের স্থান করিয়া লইয়াছি, যে যাহাকে পারি মারিয়াছি, বুদ্ধির কৌশলে, কাগজীয় মুদ্রার বলে, পদস্থ বন্ধু-বান্ধবের পরিচয়ে আপনাকে আগে বাঁচাইয়াছি, এবং এই সনাতন পথেই পিতৃনাম রক্ষার সনাতন কর্তব্য পালন করিয়াছি। ভাগ্যবান আমরা ১৩৫০এর বাঙালী, যাহারা ১৩৫১-এর মুখ দেখিতে পাইলাম।

* * *

হয়তো সকলে মিলিয়া এইরূপে সর্বাগ্রে বাঁচিবার চেষ্টা না করিলে বাঁচা এতটা দুঃসাধ্য কর্ম হইয়া উঠিত না, মরাও, যাহারা মরিল তাহাদের পক্ষে, এমন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িত না। কিন্তু এই সদুপদেশ ও মহাজন-সুলভ সত্য উচ্চারণ করিয়া কি লাভ—'এ আমার, এ তোমার পাপ'? সহজ এবং বাস্তব সত্য সম্মুখে দেখিতেছিলাম—মৃত্যু আমার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সহজ জৈব প্রেরণাতেই বাঁচিতে চাহিয়াছি—যেমন করিয়া হউক, বাঁচিয়াছি। মৃত্যুর ছায়া তোমার চোখের তারায় ঘনাইয়া উঠিল কি না, পথের পাশের গ্রাম-গৃহহীন তুমি, বা অর্ধভুক্তা ও অভুক্তা তুমি প্রতিবেশীর গৃহিণী ও পরিবার,—তাহা দেখিবার মত আমার অবকাশ কোথায়? প্রাণ-বিজ্ঞানের পবিত্র ইঙ্গিতই আমি মান্য করিয়াছি, প্রাণ বাঁচাইতে চাহিয়াছি; সামাজিক চেতনার সমস্ত তাগিদকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি—ভুলিয়াছি, প্রাণ বাঁচাইবারই দায়েই আমরা সমাজবদ্ধ হইয়াছি। যে সামাজিক বোধ আমরা বহু বহু শতাব্দীর মধ্য দিয়া তিলে তিলে আয়ত্ত করিয়াছি এই মন্বন্তরে তাহা ভুলিয়াছি, ভুলিয়াছি প্রতিবেশীর জন্য প্রতিবেশীর সহজ সহমর্মিতা, ভুলিয়াছি আত্মীয়ের সঙ্গে আত্মীয়ের রক্তের বন্ধন, বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর বহুদিনের সৌহার্দ্য—হয়তো অনেকেই ভুলিয়াছি স্ত্রীপুত্র, কন্যা, মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নীকেও; হয়তো আরও অনেকে ভুলিতাম এই সব স্নেহ-প্রেম-মমতার ডোর—যদি দুর্বিপাকে তেমনই করিয়া জড়াইয়া পড়িতাম।

* * *

অথচ বিস্ময়ের তবু অবধি খুঁজিয়া পাই না—ভুলিলাম কি করিয়া? আমাদের জাতি স্বভাবত অতিথিপরায়ণ, আমরা স্বভাবত সংবেদনশীল, স্বভাবত আমরা ভাবপ্রবণ। ইহাই আমরা জানিতাম; সে জানা একেবারে মিথ্যা, আজও তাহা ভাবিতে পারি না। তাহা হইলে এমন স্বাভাবিকভাবেই এই 'স্বভাবকে' খোয়াইলাম কি করিয়া? ইউরোপের কথাও বুঝিতে পারি। সেখানে মানুষে মানুষে সম্পর্ক বড় কাটা-ছাঁটা; আদান-প্রদান হিসাব করা, বাকি-বকেয়ার কারবার তাহাদের নাই—সেখানে পণ্যোপজীবী বিপুল সমাজ মানুষকে পণ্যের খতিয়ান বুঝিয়া চলিতে শিখায়, সামাজিক সম্পর্ক সেই দান-প্রতিদানের চুল-চেরা হিসাবেই

চলিতে বাধ্য হয়, আর মন্দার বাজারে তাহাতেও মন্দা নামে। এই ইউরোপকে বুঝি। কিন্তু আমরা এ দেশের মানুষ, আমাদের ঢিলা-ঢালা জীবনযাত্রা,—বাণিজ্য আমাদের সর্বস্ব হইয়া উঠে নাই, একান্নবর্তী পরিবারের স্মৃতি একেবারে লোপ পায় নাই, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী মরিলে এখনও বাহ্যত অশৌচ পালন করি, এখনও এই কলিকাতা শহরেও প্রতিবেশীর গৃহিণী আমার গৃহিণীকে দিদি বলিয়া ডাকেন, সে গৃহের পুত্র কন্যারা মাসীমা বলিয়া আমার গৃহে কারণে ও অকারণে উপস্থিত হয়, আমিও জগৎতারণবাবুর সহিত মোহনবাগানের খেলা ও তপসেমাছের মূল্য বিষয়ে গবেষণা করি। গ্রামে এখনও আমাদের হরু শেখ ও মরণ মাঝি দাদা ও ভাই, মহেশ দোকানী এখনও হরুর চাচা, আর গঞ্জের হাটে এখনও আমাদের আড়তদার ব্যাপারী ছিলেন জ্যাঠা আর খুড়া—ওদিকে জমিদার-গৃহে কর্তামা, গিন্নীমা, সকলেই আছেন তো—জীবনযাত্রায় আমরা সেই মধ্যযুগের সরলতর দিনকেই টানিয়া টানিয়া চলিতেছি। এই একটি বৎসরের মধ্যে সেই মধ্যযুগীয় জীবন-মূল্যও বদলায় নাই,—তেমনই আফিস আদালত, বাজার হাট, ক্ষেতের ধান, গঞ্জের দোকান, সবই রহিয়াছে,—তবু কি করিয়া আমাদের সেই সহজ স্বাভাবিক ঢিলা-ঢালা স্নেহ-প্রেম-আত্মীয়-বান্ধবতা-মাখা সেই বাঙালী জীবন-যাত্রা এমন করিয়া ভাঙিয়া পড়িল? এমন করিয়া আপনাকে বাঁচাইবার খুন আমাদের চাপিয়া বসিল? জেলেরা, মাঝিরা, চাষীরা গ্রামে মরিল, বাবুরা হাত বাড়াইয়া দিতে পারিলেন না; চাষীরা গ্রাম ছাড়িয়া মরিতে চলিল, জোতদারেরা কৃষাণের কথাও ভাবিল না; বাজারের উপর পরিচিত মৃতদেহ পড়িয়া রহিল, আড়তদারের মজুত চাউল বাহির হইল না; চোখের সম্মুখে নিরন্ন নিঃসম্বল নারী আপনার দেহ বিক্রয় করিতে লাগিল, ধর্মপ্রাণ মহাজন ও ব্যবসায়ীর বিবেক-বুদ্ধি জাগ্রত হইল না; লক্ষ লক্ষ ক্ষীণায়ু প্রাণ মহামারীর মুখে কাঁপিতে কাঁপিতে বলি গেল, প্রাণদায়ী কুইনাইন ও ঔষধপত্র—সরকারের হাত খুলিলেও পীড়িতের মুখে পৌঁছিল না; ফৌজের কণ্ট্রাক্টের টাকার স্রোতে বাংলা দেশের জীবন ডুবিয়া গেল, তবু মন্বন্তরের বাংলার নরনারীর জন্য বাঙালীর নূতন পুরাতন ধনীর স্বর্ণথলি উন্মুক্ত হইল না?

* * *

হয়তো ইহার উত্তরও আছে। আমাদের ঢিলা-ঢালা সমাজ-সম্পর্কেরও তলায় তলায় বহু বৈষম্যের স্তর রহিয়াছিল। আজ এক সংকটের দিনে তাহার স্বার্থান্ধ নগ্ন রূপ প্রকাশিত হইয়া পড়িল। দেখিলাম, এই পুরাতনীর মূল রূপ—সেখানে দয়া নাই, মায়া নাই, মমতা নাই, বন্ধুত্ব নাই। ইউরোপের পচ-ধরা ধনতন্ত্রকে দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম, স্বার্থের নগ্ন রূপ সেখানে কত ভয়ঙ্কর; আমাদের জরা-জর্জর সমাজের এই শেষ পর্যায়ে দেখিলাম, স্বার্থের এই নগ্ন রূপ কত বেশি বীভৎস! ইহাও বুঝিলাম, ইউরোপের সেই ধনিক-বুদ্ধি তবু আপন স্বার্থেই,—আপন বৈষম্যময় ব্যবস্থার দায়েই, তাহার স্বার্থের সীমানা টানিয়া তাহার জন-সমষ্টিকে জীয়াইয়া রাখিতে চায়। সেখানে তাই দ্রব্যের মূল্য টাকায় এক সিকির বেশি বাড়ে না; চোরা-বাজারের অস্তিত্ব প্রায় অসহ্য হয়। কিন্তু এখানকার আমাদের দায়িত্ব-বঞ্চিত, অধিকার-বঞ্চিত ধনীর পক্ষে আপনার মুনাফার সেই সীমা টানিবার প্রয়োজনও নাই। জন-সমষ্টিকে জীয়াইয়া রাখিবার অধিকার তাহার নাই, সে দায়িত্বই বা সে স্বীকার করিবে কেন? প্রজাপালকের নির্ভুল বিধানে বাজারের দ্রব্যমূল্য যখন এক টাকার স্থলে তিন টাকা হইয়া উঠিল, ছোট বড় বিভিন্ন সরকারই যখন কোমর বাঁধিয়া মুনাফার মৃগয়ায় নামিয়া পড়িল, স্বয়ং বাংলা সরকারও যখন এক হাত ইহারই মধ্যে খেলিয়া লইলেন,—চোরা-বাজারই যখন সদর-বাজার হইয়া উঠিল,—তখন এ রাজত্বের জগৎশেঠ ও খাস পোদ্দারের দল, আমাদের কাশেম ভাই ও কেশব ভাইয়ের আর রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক কোন বাধাই রহিল না, মুনাফার মৃগয়া এক মৃত্যুর মৃগয়া হইয়া উঠিল।

বুঝিলাম অনেক কথাই, কিন্তু তবু নিজেকে বুঝাইতে পারি না—অবাঙালীর প্রাণ যদিই বা কাঁদিয়া উঠিল, তবু বাংলার সাহায্য-সমিতিতে এবার কেনই বা এমন দক্ষতার, কর্তব্যনিষ্ঠার, এমন ক্ষুদ্রতাহীনতার শোচনীয় অভাব ঘটিল? কেন এমন মন্বন্তরের মুখেও আমরা, কি মন্বন্তরের বিশ্লেষণে, কি তাহার প্রতিকার নির্দেশে, কি আর্তত্রাণে এক হইতে পারিলাম না?

* * *

১৩৫১এর সম্মুখে দাঁড়াইতে তাই আজ ভরসা পাই না, তাই ভাবিতে সাহস পাই না ১৩৫০ বিদায় লইয়াছে কি না! অনেক সহিয়াছি, কিন্তু শিখিয়াছি কতটুকু? শিখিয়াছি শুধু আপনার প্রাণ বাঁচাইবার দায়ে হাতাহাতি করিতে; কিন্তু হাত মিলাইতে শিখি নাই তো। অথচ এই ৫১র দুয়ারে দাঁড়াইয়া বুঝিতেছি, দুর্দিন তো শেষ হয় নাই। কলিকাতায় আমরা বরাদ্দমত চাউল পাই,—ভাল পাই, খারাপ পাই, পাই; পাইব—এইটাই আমাদের দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের পক্ষে আশার কথা। সে খাদ্য স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর না হওয়া চাই, আর চাই শ্রমিকের পক্ষেও অন্তত যথেষ্ট পরিমাণ হওয়া। বরাদ্দমত আজ আমরা তবু কলিকাতায় চাউল পাই, চিনি পাই, আটা পাই, রুটিও পাই, লবণও এখন পাই; পাই না কয়লা, পাই না কাগজ। কিন্তু গ্রামে আমাদের স্বজনেরা জমি-জমা বেচিয়া ঘটি-বাটি বন্ধক দিয়া পঞ্চাশের পার পাইয়াছিলেন, আজ এই ষোল টাকা কণ্ট্রোল-দরে তাঁহাদের চাউল কিনিবার মত সামর্থ্য কই? অথচ সর্বত্র তো চাউলের দর কুড়ির নীচেও নামে নাই। বুঝিতেছি, বেচিবার মত কিছু থাকিলে তাঁহারা বাঁচিবেন। কিন্তু দেহ ছাড়া আর কি সম্বল কাহার আছে, তাহা জানি না। অথচ, ডাল, তেল, কেরোসিন, কাপড়, কয়লা, সর্বশেষে আজ লবণ পর্যন্ত সব কিছুই চাউলের সহিত পাল্লা দিয়া ঊর্ধ্বে চড়িতেছে, চোরা-বাজারের শোভাবর্ধন করিতেছে। আর আমেরি সাহেবের কথায় জানিতেছি, নিয়ন্ত্রিত মূল্য চালাইবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য এখনও কর্তৃপক্ষ সংগ্রহ করে নাই। অথচ সংবাদপত্রের নিস্তব্ধতাকে ধন্যবাদ দিয়া হাটে গঞ্জে ও বাজারে গাড়ি আর নৌকা বোঝাই ধান চাউল আবার গত বৎসরের পথেই যাত্রা শেষ করিতেছে। এক দিকে জোতদার মজুতদারের হাতে কৃষকের জমি আসিয়া ঠেকিয়াছে, তাহাদেরই গোলায় ও ঘরে কৃষকের ধান জমিয়া বসিয়া আছে, আর দিকে ছোট-বড় ব্যাপারী-ব্যবসায়ী মুনাফার নেশায় হাটে-বাজারে ধান-চাউল কিনিয়া ফিরিয়াছে, মজুত করিতেছে; আর ইহারই মধ্যখানে জানিতেছি আজ কৃষকের জমি নাই, হালের বলদ নাই, আউশ ধানের বীজ নাই, মজুর খাটিবার লোক নাই; তাঁতীদের তাঁত বন্ধ, জেলেরা যাহারা বাঁচিয়া আছে বসিয়া আছে, ছোট দোকানী গত বারই

নিঃশেষ হইয়াছে ; আছে বসন্ত, আছে কলেরা, আছে শোথ, আছে মহামারী।

* * *

বড়লাট আসিয়াছিলেন, একটা বড় রকমের আয়োজনও করিয়াছিলেন—জঙ্গী অভিজ্ঞতার বলে তিনি জঙ্গী বিভাগের সহায়তায় বাংলাকে মন্বন্তরের ও মহামারীর হাত হইতে রক্ষা করিবেন। কিন্তু আশা ও আশ্বাস এখনও আমরা ফিরিয়া পাই নাই, দিল্লী ও লণ্ডন তাহা আমাদের শুনাইয়া দিয়াছে। আর ইহারই মধ্যে সেই ক্ষীণ আশাকে আকুলিত করিয়া আমাদের দ্বারে যে নূতন বিপদ সমুদিত হইল, তাহাতে স্বভাবতই স্মরণপথে উদিত হইল এই কথাটি—লর্ড ওয়াভেল তো বাংলাকে বাঁচাইতে এ দেশে আসেন নাই, তিনি লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের ভাবী অভিযানের সামরিক আয়োজনই সুসম্পূর্ণ করিতে এ দেশে আমাদের শাসনভার লইয়াছেন। অতএব সামরিক কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি প্রধানত আজ আবার সামরিক কেন্দ্রেই পড়িবে, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহার ও ভারত সরকারের সমস্ত শক্তিও নিয়োজিত হইবে। রেল যানবাহন আর খাদ্য ও ঔষধ কতটা যোগাইবে, কতটা আমাদের সম্মুখে আবার সামরিক ভ্যান 'ফুড ফর পিপ্‌ল' এই আশ্বাস-বাণী বহন করিয়া ফিরিবে, তাহা জানি না। মোট কথা, যে সামরিক পদ্ধতিতে মন্বন্তর ও মহামারীর প্রতিকার-চেষ্টা চলিয়াছিল, তাহা কতটা সার্থক হইত জানি না, 'পিপ্‌লকে' প্রাধান্য না দিয়া 'পিপ্‌লের' ফুড বণ্টন করা যায়, তাহাও বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু আসাম-সীমান্ত জুড়িয়া যে জাপানী আক্রমণ আজ অগ্রসর হইতেছে তাহাতে স্বভাবতই মনে হইতেছে, ব্রিটিশ ও আমেরিকান সামরিক প্রয়াস আজ সেখানেই কেন্দ্রীভূত না হইয়া পারে না, আর তাহাই যদি হয় তাহা হইলে "একপেট খাইতে পারিব"—এই যে আশা ও আশ্বাস আমাদের ১৩৫০এ আমেরি-ওয়াভেল ব্যবস্থায় ও নীতিতে জন্মিতে পারিল না, তাহা এই ১৩৫১ সালে জন্মিতে পারিবে তো?

* * *

সামরিক হিসাব জানি না। যুদ্ধের খবর লইয়া তর্ক করিতে পারি, কিন্তু বাঙালীসন্তান-হিসাবে যুদ্ধকে নিষিদ্ধ বস্তু বলিয়াই গণ্য করি।

সে দিকে তাই আশা-নিরাশায় দোলা খাইবার কোনও কারণ দেখিতেছি না। কলিকাতার বুকের উপর দিয়া সামরিক সামগ্রীর বর্ষাধিক-কালব্যাপী যেরূপ বিজয়যাত্রা দেখিয়াছি, তাহাতে এ বিষয়ে একটা অন্ধ-বিশ্বাসই আছে ; ইম্ফাল, কোহিমা, ডিমাপুর লইয়া দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবার কারণ দেখি না। পৃথিবীব্যাপী চার বৎসরের যুদ্ধেও দেখিতেছি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অতি সামান্যই লোকক্ষয় হইয়াছে—১ লক্ষ ৫৮ হাজার মরিয়াছে ; মোট হতাহত ও বন্দী ৬ লক্ষ ৬৭ হাজার, ইহারও মধ্যে ভারতবাসীই আবার ১ লক্ষ ৯ হাজার ৮ শত। এ দিকে আমেরির হিসাবেই এক বাংলা দেশে গত এক বৎসরে আমরা মৃত্যুসংখ্যায় চার বৎসরের যুদ্ধকে একেবারে ম্লান করিয়া দিয়াছি—বরাবরের মরারও উপরে আমরা এবার মরিয়াছিই ৬ লক্ষ ২৯ হাজার বেশি ;—বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাবে ৩৫ লক্ষ, সাধারণের চাক্ষুষ অনুমানে ৫০ লক্ষ। মোট কথা, যুদ্ধে রুশ বা জার্মানদের লোকক্ষয় যাহা হইবার হউক, ব্রিটিশ-কর্তৃপক্ষ বাঁচিবার কৌশল জানে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লোকক্ষয় সামান্য, আর তাহার অন্য সামরিক উপকরণও এখন অতুলনীয়। অতএব, সরল কথা আমরা বুঝিতেছি—অপরিমেয় ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি (সোভিয়েটকে ছাড়াই) একদিন জাপানকে পরাজিত করিতে পারিবে। জোয়ার-ভাটা মাঝখানে আসিবে,—ক্যাসিনো-অ্যানজিও চুকিয়া যাইবে, 'দ্বিতীয় রণাঙ্গন' দেখা দিবে, তারপর ইউরোপের যুদ্ধ-আয়োজন হইতে মুক্ত হইয়া একবার ইঙ্গো-মার্কিন শক্তির এই এশিয়ার দিকে ফিরিতে মাত্র দেরি। বিশ্বাসের অভাব নাই ; এই দেরিতেও আমাদের আপত্তি ছিল না,—দেরি দেখিলে আমরা সোভিয়েটের মত ও কম্যুনিস্ট বন্ধুদের মত হৈ-চৈ জুড়িয়া দিই না—'দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোল,' 'দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোল'। এ দেশেও আমরা বলিতাম না—'বর্মা অভিযান চাই,' 'বর্মা অভিযান চাই'। কারণ এত কাল ব্রিটিশ নিয়ম-নীতি দেখিয়া আমরা বিস্মৃত হই নাই যে, তাঁহাদের নড়িতে-চড়িতে একটু দেরি হয়, কিন্তু 'যথাসময়ে' তাঁহারা সব করেন। তাই লৌকিক হিসাবে 'বর্মা অভিযানে' দেরি দেখিলেও আমরা কিছু মনে করিতাম না। কিন্তু অভিযানটা যখন 'বর্মাভিযান' না হইয়া উল্টা 'বঙ্গাভিযান' হইবার উপক্রম

করিতেছে, তখনই আমাদেরও পক্ষে একটু হিসাব করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। জানি, ইঙ্গ-মার্কিন সমরায়োজন প্রচুর, কলিকাতার পথ ও পথিকও তাহার সাক্ষ্য দিবে। কিন্তু যুদ্ধ যখন ভারতভূমির দ্বার উত্তীর্ণ হইয়াছে, আমাদের দেশ যখন সমরক্ষেত্রে পরিণত হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি, শুধু আমাদের আকাশেই যখন আর মৃত্যুর গর্জন সীমাবদ্ধ থাকিবে না, মনে হয়,—আমাদের শ্যামল ক্ষেত্র দগ্ধ হইবে, আমাদের জীর্ণ কুটীর চূর্ণ হইবে, আমাদের ভগ্ন জীবনযাত্রার উপরে নামিয়া পড়িবে উৎকট বিশৃঙ্খলা, যুধ্যমান বাহিনীর গতায়তের পথে আমরা খড়ের মত, কুটার মত দলিত বিদলিত হইয়া যাইব, আমাদের জিলায় জিলায় যাতায়াতের বাধা ঘটিবে, আত্মীয়ে-আত্মীয়ে বিচ্ছেদ ঘটিবে, আধুনিক যুদ্ধের সমস্ত বিভীষিকা আমাদের ভাগ্যে জুটিবে—তখন সন্দেহ জাগে, এই মন্বন্তরে নিষ্পিষ্ট, মহামারীতে নিঃশেষিত বাঙালী নরনারীর জন্য এই ভাগ্যলিপি লইয়াই কি আসিয়াছে ১৩৫১ সাল?

* * *

মনিব বদলাইবার সম্ভাবনাও নাই, সাধও নাই। বয়স হইলে এই তত্ত্বও সহজবোধ্য হয়। যাঁহার সঙ্গে বরাবর ঘর করিয়াছি, আজিও যখন রোগশয্যায় সেই পুরাতন গৃহিণী তাঁহার নিজহস্তে কমলালেবুর শরবতটুকু তৈয়ারি করিয়া আনেন, তখন কল্যকার তাঁহার ঝাঁটা-হস্তিনী মূর্তিও উহারই মধ্যে খাপ খাইয়া যায়; অন্তত নূতন কোনও পঞ্চদশীর আধুনিকী ঝাঁটার জন্য মনে মনে নিজেকে একবারও প্রস্তুত করিতে পারি না। অতএব, মনিব বদলাইবার সাধও নাই। কিন্তু বাঁচিবার সাধ আমাদেরও আছে। এত করিয়াও সেই বাঁচার সম্ভাবনাই এখনও যখন সুস্থির হইল না, তখন অত্যন্ত সরল চিত্তেই একবার বলিতে চাহি—সামরিক উপায়ে যতটুকু মন্বন্তর ও মহামারী দূর করিবার তাহা তো হইয়াছে, এবার বাকি যাহা আছে, সেইটুকু আমাদের জাতীয় নেতা, আমাদের জাতীয় কর্মীদের উপর ছাড়িয়া দাও না কেন? তাঁহাদের সাহচর্য পাইলে আজ ১৩৫১র যে ভয়ঙ্করতর বিভীষিকা আমাদের সম্মুখে দেখিতেছি—দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধচ্ছায়া যেভাবে আমাদের সম্মুখে

ঘনায়িত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আমরা একটু আশ্বাস না পাই, সান্ত্বনা পাইতাম—হয়তো বাঁচিতামও।

* * *

মনে হইবে, ইহা আবেদন আর নিবেদন। কিন্তু জানি, তাহা সত্য নয়—আজ সমস্ত দেশের ইহা প্রয়োজন। ইহাই মিত্রশক্তিরও রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজন, কিন্তু সে কথা বলিয়া লাভ নাই। সাম্রাজ্য-নীতি এরূপ ধর্মের কাহিনী শোনে না। শোনে না যে, আজই তাহা বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছে। পথে পথে এক-আধবার জাতীয় ধ্বনি শুনিতেছি—পঁচিশ বৎসরের ওপার হইতে বৈশাখী মেলার সেই মৃত্যু-অভিষেক মনে পড়িতেছে—জালিয়ানাবাগ। পঁচিশ বৎসর! এই পৃথিবীতে এই পঁচিশ বৎসরে যাহা ঘটিয়াছে, পূর্বেকার পাঁচ শতাব্দীতেও তাহা ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। বিরাগ-বিরোধ-বিস্ময়ের মধ্য দিয়া একটা নূতন তন্ত্র আজ রণক্ষেত্রেও তাহার জয়পতাকা পুরোভাগে লইয়া চলিয়াছে। কিন্তু 'ভারত তবু কই'?

তবু জানি, মন্বন্তর মহামারী, ব্রিটিশ কমন্‌ওয়েল্‌থ, বা জাপানী কোপ্রস্‌পারিটি স্ফিয়ার—কোনও আবির্ভাবই দুঃসহ নয়, আর অনিবার্য নয়। আমাদের জনসমাজের যে সহনশক্তির বলে আমরা বহু শতাব্দী উত্তীর্ণ হইয়াছি, তাহা আমাদের সামান্য পাথেয় নয়। বহু পীড়নে আমাদের যে জনসমাজ মথিত হইতেছে, তাহাও সামান্য প্রেরণা নয় আমাদের ভবিষ্যতের পক্ষে। আমরা সাড়ে ছয় লক্ষই বেশি মরিয়া থাকি বা পঁয়ত্রিশ লক্ষই মরিয়া থাকি, আমরা অমরই রহিয়াছি। আমরা তবু ক্ষেতে চাষ করিব, ফসল ফলাইব, বোঝা বহিব, নূতন দিনে নূতন কারখানায় মজুরি করিব, নূতন নূতন সন্তানের মধ্যে আমরাই তবু বাঁচিব, আর অগ্রসর হইব আমাদের নূতন ভাগ্যের পথে।

মৃত্যুময় ১৩৫১র সম্মুখে দাঁড়াইয়াও আজ স্মরণ করিব—বাংলার সাধারণ মানুষ আমরা এবারও বোধ হয় মরিব; তবু আমরাই অমৃতস্য পুত্রাঃ।

'অঙ্গার শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।' অচিন্ত্য সেনগুপ্তের মলিনত্ব ভগবদ্দত্ত পাকা রং—মোচনের চেষ্টা বৃথা। বিশে তিনি যেমন ছিলেন, ত্রিশ উত্তীর্ণ হইয়া চল্লিশেও তেমনই আছেন। এখনও তাঁহার কাছে "পাঁচিও পাচ্য, থেঁদিও খাদ্য।" উদ্ভট শব্দপ্রয়োগের বক-দেখানো পদ্ধতিতে তিনি 'প্রগতি'-'কল্লোল'-'কালিকলমে' আসর মাত করিতে চাহিয়াছিলেন, পঞ্চাশের চৈত্রেও তিনি সেই বদভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। নমুনা দিতেছি—'নম্র নিবেশ', 'গোলালো বিশ্রাম', 'অক্রিয় অবকাশ', 'বিপুল বিপর্যাস', 'নিষ্প্রাণ এলোমেলোমি', 'নির্লজ্জের মতো সুশৃংখল', 'অনিষেধ্য', 'উচ্চবচতা', 'ভ্রূণায়মানতা', 'দ্রবীকৃত চোখ', 'কৃশীকৃত (কৃষি-কৃত ?) কটিতে কাকুতি'। ঘাবড়াইবেন না, আরও ছিল, কিন্তু স্থানাভাববশত এইখানেই থামিতে হইল।

* * *

উদাহরণগুলি একটি মাত্র গল্প হইতেই আহরণ করা হইয়াছে। গল্পের নাম "বিদিশা"। 'কৃশীকৃত কটিতে কাকুতি'র 'অনিষেধ্য' ইতিহাস। গল্পের নায়ক বাসব-দা অনেক বছর জেল খাটিয়া আসিয়া একটু নরম বিছানার আশ্রয় লইয়াছে। আর্য বাসব-দা'র দলতুতো ছোট ভাই। সে চিদানন্দের ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছে, 'চেত রে চেত রে চিত ডাকে চিদানন্দ।'

সত্যি, মানায় না বাসব-দাকে এই নম্র নিবেশে। এই গোলালো বিশ্রামে।... আরাম যেন তাঁকে আঁকড়ে ধরেছে। পুলটিসের মতো।...সেই ধৃষ্ট মেরুদণ্ড আজ কেমন নেতিয়ে পড়েছে। ঝলছেন টিমে আঁচে। শুধু শ্রান্ত নয়, সীমাঙ্কিত। শুধু অকর্মক নয়, নিঃসম্বল। বিধ্বংস। শৈথিল্য। দায়িত্বহীনতা।

বাসব-দা ফুরাইয়া গিয়াছেন। আর্য তাঁহাকে চেতাইয়া তুলিতে চায়। 'বাসব-দা যদি একবার জাগেন! যদি খাপের সঙ্গে তলোয়ারের ঠিক জোখা মিলে যায়! যদি হাতে একবার টিপ আসে!'

'ভয় নেই, বিদিশার মাঝে আছে সেই প্রতিশ্রুতি। সেই ভ্রূণায়মানতা। সে ঠিক জাগাতে পারবে বাসব-দাকে। নড়িয়ে ঝরিয়ে দিতে পারবে। (!)'

দলের অবন্তীর ছোট বোন বিদিশা। 'কিছুরই মূল্য ছিল না তার (অবন্তীর) কাছে, মানুষ যাকে বলেছে ঈশ্বর বা সতীত্ব।' তাহারই ছোট বোন বিদিশা। সুতরাং সে নিশ্চয়ই পারিবে।

আর্বির বিশ্বাস হয় না বিদিশা জোলো। বিশ্বাস হয় না, আগ্নালী। বিশ্বাস হয় না, অবন্তী-দি জামিন রেখে যান নি।

কিন্তু নেতিয়ে-পড়া বাসব-দা'কে চেতাইয়া তুলিতে হইলে হেকিমি দাওয়াইয়ের প্রয়োজন। হাকিম অচিন্ত্য সেনগুপ্ত তাহাই প্রয়োগ করিয়াছেন। এই হেকিমি দাওয়াইয়ের সাঙ্কেতিক প্রয়োগই গল্পের মুখ্য বক্তব্য। সঙ্কেতেই বলিতেছি—

দেখেছে অনেক চোখ। কূট ও মদির। অনেক হাসি। তিক্ত ও তির্যক! এবার দেখে চুল। গহন ও বিক্ষুব্ধ। বিদ্যুৎ। মরুমাঠ। এবার দেখে অরণ্য। নির্জন, নিষ্প্রবেশ। এত চুল থাকতে পারে, পিঠ ছেয়ে কোমর ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে প্রায় পায়ের গোছার উপর এ না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না। বিপুল বিপর্যাস। এত যার চুল সে নিশ্চয়ই নিয়ে আনতে পারবে ঝড়। অন্ধ অন্ধকার। নিশ্চয়ই জাগাতে পারবে বাসব-দাকে।...

'পারবো ঘুরিয়ে দিতে।' হঠাৎ হাত আলগা করে চুলের ভারটা বিদিশা ছেড়ে দেয়। কাঁধ বেয়ে পিঠ ভরে পাছা ঢেকে ভেঙে পড়ে। শব্দ হয় অরণ্যের চাপা দীর্ঘনিশ্বাসের মতো।...

'কী করছ?'

'ঘর ঝাঁট দিয়ে বিছানা করে চুল বাঁধছি।' বিদিশার চুল আজ বুকের উপর ভুর-করা।...

আয দু'হাত দিয়ে মুঠ-মুঠ ক'রে ধরে বিদিশার চুল। স্পষ্টীকৃত ঝড়। বিদ্যুৎ-বিদারিত।...

বিদিশা'র দিকে তাকাতে লজ্জা করে। ভয় করে। বিদিশা কাঁচি দিয়ে তার চুলগুলি সব ছেঁটে ফেলেছে।

চৌলিক দাওয়াইয়ে ফল ফলে নাই। বাসব-দা চলিয়া গিয়াছেন! জেলে। ইতি গল্পশেষঃ। হেকিমি ব্যর্থ হইয়াছে, সুতরাং হাকিমের জেরা নিষ্প্রয়োজন। শুধু একটি মাত্র জিজ্ঞাস্য আছে, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত প্রচারকার্যের জন্য কত টাকা উপরি পান?

অদ্য বর্ষশেষ-দিনে সংবাদপত্রে বাংলা সরকারের একটি বিজ্ঞাপনে অবগত হইলাম যে, মাংসের দোকানে অথবা হোটেলে সোমবার ও বৃহস্পতিবার মাংস পাওয়া যাইবে না। অনেক প্রকারের মাংস সংক্রান্ত

প্রবাদ, ইডিয়ম, গালাগালি ও কটূক্তি আমাদের সাহিত্যে ও মজলিসে প্রযুক্ত হয়। উক্ত দুই দিনে সেই সকলের ব্যবহার আইনসঙ্গত হইবে তো ?

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় শিক্ষা-দানরীতি প্রবর্তিত হইবার পর যেমন আনন্দিত হইয়া উঠিয়াছিলাম, তেমনই ক্রমশ বাংলা-প্রশ্নপত্র রচয়িতাদের এক একটি প্রশ্নে শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছি। দেখিলাম, এবারকার ম্যাট্রিকুলেশন প্রশ্নপত্রে 'ঋ'র উচ্চারণস্থান নির্দেশ করিবার ভার নিরীহ ছাত্রদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বহু স্থানের খবর রাখিলেও আমাদের পক্ষে 'ঋ'এর উচ্চারণস্থানটি বাহির করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়ের পন্থা অনুসরণ করিয়াও আজ পর্যন্ত স্বরবর্ণের আদি অক্ষরের উচ্চারণস্থানটিকে আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। কিন্তু প্রশ্নকর্তা যে আমাদের অপেক্ষা উচ্চমার্গে উঠিয়াছেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি।

* * *

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তবু পদে আছেন, কিন্তু পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় যুদ্ধক্ষেত্রের 'রেঞ্জ' হইতে দূরে থাকায় সম্পূর্ণ অকুতোভয়ে বিহারে বসিয়া বাংলা ভাষাকে আক্রমণ শুরু করিয়া দিয়াছেন। এবারকার আই. এ. ও আই. এস-সি. ইংরেজী পরীক্ষাপত্রে ইংরেজীতে অনুবাদ করিবার জন্য যে বাংলাটি দেওয়া হইয়াছিল, তাহার স্বরূপ নিম্নে প্রদর্শিত হইল। পাঠকবর্গ ক্রস-ওয়ার্ড পাজ্‌লে খুব দক্ষ হইলে ইহার মর্মার্থ বাহির করিতে পারিবেন।—

মনুষ্যগণ অভিপ্রেত কিছু করিবার জন্য। একজন লোককে তালাবদ্ধ করিয়া রাখা এবং তাহাকে কিছু করিতে না দেওয়া, সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর যে সকল শাস্তি তাহাকে দিতে পারি, তাহার মধ্যে অন্যতম। যদি একজন মানুষের এত টাকা থাকে যে তাহার কাজ করিবার প্রয়োজন না হয়, তাহার নিজের জন্য কাজের উদ্ভাবন করিতে হইবে। বন্যজন্তুর সহিত যুদ্ধ বা খাদ্যের জন্য মৃগয়া করিবার তাহার দরকার নাই, কিন্তু তামাসার জন্য সে খেঁকশিয়াল বা হরিণ শিকার করে। যদ্যপি সে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি হয়, সে জানে যে এইসব কার্য্যকলাপ তাহাকে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট করিতে পারিবে

না। কোনো লোক কিছু না করিয়া বা স্বচিত্তবিনোদন করিয়া সুখী হইতে পারে না।

এই অদ্ভুত বাংলাটি আসলে প্রশ্নকর্তা মহাশয় নিজে করিয়াছেন। ইঁহার উর্বর মস্তিষ্কের পূর্ণ পরিচয় নিম্নলিখিত ইংরেজী ছত্রটি পাঠ করিলেই পাঠকবর্গ অনুধাবন করিতে পারিবেন। জে. সি. হিলের *Introduction to Citizenship* পুস্তকের ৪৩ পৃষ্ঠায় আছে—

Human beings are designed to do things. To lock a man up and let him do nothing is one of the most cruel punishments we can give him. If a man has so much money that he does not need to work, he has to invent work for himself···He does not need to fight wild animals or hunt for food, but he hunts foxes or deer for the fun of it. If, however, he is an intelligent man, he knows that these activities cannot satisfy him for long.···No man can be happy either doing nothing or working for his own amusement.

"কোন লোক কিছু না করিয়া বা স্বচিত্তবিনোদন করিয়া সুখী হইতে পারে না" সত্য কথা। সেই কারণে ছাত্রদের উপর যাহা খুশি করিয়া বোধ হয় প্রশ্নকর্তার সুখ ক্রমশ বাড়িয়া উঠিতেছে। প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় শেষের দিকে এই ধরনের পণ্ডিতদের বাহুল্যবশতই বোধ হয় ধ্বংস হইয়াছিল।

জনৈক আধুনিক কবি অতি স্পষ্টভাবে নিজেদের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। কবি চটিয়া প্রথমে লিখিয়াছেন—

আর কতকাল বুর্জোয়া-খেলায়
চংক্রমণ রথচক্রে পিষ্ট হবে চক্রবাক্ ধূসর ধূলায়?

তাহার পর তিনি নিজের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া বলিতেছেন—

আধুনিক কবি আমি
আমার প্রথম প্রিয়া
চলে গেছে দূরে —বহু দূরে—
পতি পরম গুরুর পাশে।
তবু আজো তার
অলক-সৌরভ নিয়ে
রক্তরাঙা মিষ্ট ওষ্ঠপুট
দিয়ে যায় চুম্
আমার নয়নে এসে

জনশূন্য পাহাড়িয়া স্রোতস্বিনীকূলে।
যুগছায়া কাঁপে জলে।

পরস্ত্রী সম্বন্ধে কবিরা নাম না করিয়া এরূপ উক্তি করিতে পারেন অবশ্য; কিন্তু তাহার পর কবির অবস্থা শুনুন—

মাঝে মাঝে শুয়ে পড়ি
রিক্ত বক্ষে মাথা রেখে অলস তন্দ্রায়।

পাঠক, এইভাবে একবার শুইবার চেষ্টা করিয়া দেখুন তো, কায়দা করিতে পারেন কি না? যদি বলেন যে, প্রেয়সী কথাটা উহ্য আছে, এটুকু বুঝিতেছ না? বুঝিতে পারিতাম যদি না তৎক্ষণাৎ—

কি প্রলাপে সর্ব অঙ্গ ওঠে কেঁপে
শুনে তার স্তনের গুনন

শুনিতাম। 'রিক্ত বক্ষে'র সহিত শেষোক্ত দুইটির যোগ না থাকাতেই গোলমাল হইয়া গেল।

—

"যেনাহং নামৃতা স্যাম্" উচ্চারণ করিয়া একদিন বৈদিক যুগে মহীয়সী মৈত্রেয়ী সকলের হৃদয় মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, আজ বহুদিন পরে কবি নির্মলচন্দ্র বড়াল বি. এল. বাণীকণ্ঠ সেই ভাবধারায় আমাদেরও অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছেন। কবি ওই নামের অন্তরালে খুব ভাল কথা বলিয়াছেন—

কিছু টাকাকড়ি, কিছু নাম যশে
কি হবে আমার
অমৃতেরে লাভ হবে না যাহাতে
বৃথা সে,—অসার!

সত্য কথা। কিছু টাকাকড়িতে এ যুগে কিছু করা মুশকিল। যদি দাও তো ভাল করিয়াই দাও—অন্তত একটা বড় মিলিটারি কণ্ট্রাক্ট!

—

নব বৈশাখের 'ভারতবর্ষে'র প্রথম প্রবন্ধের উপর সবে দৃষ্টি পড়িল—"প্রাচীন ভারতের ভৌগলিক অবস্থা"। গোল ঠেকিবার কারণ নাই। কারণ লেখক ডক্টর "শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম-এ, বি-এল, পি-এচ্-ডি, ডি-লিট্"। অতএব, সম্পাদকের দায়িত্বও ওই সঙ্গেই ফুরাইয়াছে।

১৩৫০ বঙ্গাব্দের ভয়াবহ মন্বন্তরের সর্ব্বশেষ দুঃসংবাদ সাহিত্য-জগতে আমাদের অগ্রজ, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক, অমায়িক নির্বিরোধ স্বল্পবাক্ জ্ঞানপ্রবীণ বন্ধু প্রফুল্লকুমার সরকারের অপ্রত্যাশিত মৃত্যু। মধ্যবিত্ত সমাজে এরূপ মুহুর্মুহু মৃত্যুর জন্য আমরা প্রস্তুত হইয়া আছি—সুতরাং ইহা অপ্রত্যাশিতও নয়। আমরা যখন শিশু, "ডন-সোসাইটি"র অন্যতম সদস্য হিসাবে প্রফুল্লকুমার তখন এই হতভাগ্য দেশের মুক্তি, এবং দুর্ভাগ্য সমাজের উন্নতির জন্য নিরলস সাধনা করিয়াছিলেন; আমাদের শৈশবেই রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন-নবপর্য্যায়ে' তাঁহার ধারাবাহিক সাহিত্য-সাধনার ইতিহাসও আমাদের অজ্ঞাত নয়। সেই সুদূর অতীত হইতে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বকাল পর্যন্ত নানাভাবে তিনি বঙ্গভারতীর সেবা করিয়া গিয়াছেন, কখনও গৌরাঙ্গ-ভক্ত, কখনও এই ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুজাতি ও সমাজের কল্যাণকামী সংস্কারক, কখনও ঔপন্যাসিক, কখনও শিক্ষক এবং কখনও সাংবাদিক হিসাবে লেখনীবৃত্তিই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ছিল। কিন্তু নানা কারণে, তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় সাধারণের অজ্ঞাত থাকাতে তাঁহার শেষ সাংবাদিক পরিচয়টিই দেশের কাছে তাঁহার সর্বশেষ পরিচয় হইয়া রহিল। তাঁহার বিয়োগে আমরা একজন স্বভাবত-ভদ্র সহিষ্ণু সুহৃদকে হারাইলাম। বর্ষশেষে আমাদের বিষণ্নচিত্তে তিনি এই ভাবনাই জাগ্রত রাখিয়া গেলেন যে, শুভ নববর্ষারম্ভে এই দুঃখের আনন্দবাজার আমরা কাহাদের লইয়া জমাইব? নচিকেতা যমগৃহ হইতে কি এই চিরন্তন প্রশ্নের উত্তর আনিতে পারিয়াছে? পারে নাই। তাই আমরামূঢ় ভয়ে নির্বাক্ শোচনা করিতেছি। গীতায়—

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ

[সর্বপ্রাণীর অন্তর্নিহিত জ্ঞান অজ্ঞান দ্বারা আবৃত, সেইহেতু তাহারা সুখদুঃখ পাপপুণ্য ইত্যাদি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়া মোহে পতিত হয়]

ইত্যাদি চিরন্তন সত্য উক্তিতেই বা আমাদের মত তামসবুদ্ধির সান্ত্বনা কোথায়?

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শনিবারের চিঠি
১৬শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১

বাংলার নবযুগ ও স্বামী বিবেকানন্দ

"Each nation like each individual, has one theme in this life, which is its centre, the principal note round which every other note comes to form the harmony....If any one nation attempts to throw off its national vitality, the direction which has become its own through the transmission of centuries, that nation dies.... Every man has to make his own choice ; so has every nation. We made our choice ages ago...and it is the faith in an Immortal Soul.···I challenge anyone to give it up.···How can you change your nature ?"

"Never forget the glory of human nature ! We are the greatest God that ever was or ever will be. Christs and Buddhas are but waves on the boundless ocean which *I am*."—Vivekananda

উপরে যে কথা কয়টি উদ্ধৃত করিলাম—বাংলার নবযুগের, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় অবসানকালে, একজন বাঙালীর মুখেই তাহা উচ্চারিত হইয়াছিল। এই বাণীর পশ্চাতে যে জ্ঞান-শক্তি ও পৌরুষের ঐকান্তিক প্রেরণা ছিল—যুগনায়ক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'অনুশীলন'-ধর্ম্মে মানবত্বের এই উপাদানকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দান করিলেও, তাহার এমন একাধিপত্য মনুষ্যসাধারণের জীবনে সম্ভব বা সুফলপ্রসূ বলিয়া মনে করিতেন না। কিন্তু রহস্য এমনই যে, তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে আকাশ হইতে দৃপ্ত দৈববাণীর মতই ওই বজ্ররব ধ্বনিত হইল। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে, বঙ্কিমচন্দ্র যখন মৃত্যুশয্যায়, তখনই ভাগীরথীতীর হইতে বহুদূরে, সাগরপারে—'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'র সেই প্রাচীন ভঙ্গী ও ভাষায়, এক বাঙালীর কণ্ঠে যে বাণী প্রথম পুনরুদ্গীত হইল, সে বাণী—আত্মার

সর্ব্ববন্ধন-মুক্তির স্বাধিকার-ঘোষণার বাণী, তাহাতে প্রকৃতির সহিত বোঝাপড়া করার কোন চিন্তাই নাই। এ যেন সমতল পৃথ্বী ভেদ করিয়া সহসা এক পর্ব্বতচূড়ার অভ্যুদয় হইল; যে যজ্ঞানল এতদিন ধিকি-ধিকি জ্বলিতেছিল তাহারই এক শিখা যেন আচম্বিতে আকাশ স্পর্শ করিল! বাংলার নবযুগের এই শেষ ও অভিনব বাণীর পরিচয় দিতে বসিয়াছি বটে, কিন্তু ইহা তো শুধুই বাণী নয়,—প্রতিভার দিব্য শক্তিও নয়; একদা এক দিব্য আবেশে কবি যাহা কামনা করিয়াছিলেন—

শঙ্খের মতন তুলি' একটি ফুৎকার হানি' দাও
হৃদয়ের মুখে।

—ইহাও মহাপ্রাণ-নিঃশ্বসিত হৃদয়-শঙ্খের সেই ফুৎকার। সে প্রাণ, সে পৌরুষ একটা আবির্ভাবের মত; সেই মহাজীবন হইতে পৃথক করিয়া বাণীর আলোচনা আদৌ সম্ভব নয়। এ মূর্ত্তির দিকে চাহিলে যুগের কথা ভুলিয়া যাইতে হয়, সনাতনের সংজ্ঞাও লোপ পায়। আজ যে প্রয়োজনে আমি এই পুরুষের প্রসঙ্গে উপনীত হইয়াছি তাহার পক্ষে অতি ধীরভাবে আলোচনায় অগ্রসর হওয়াই সঙ্গত, কিন্তু ভয় হয়, এবার হয়তো আমাকে হার মানিতে হইবে। আমার ব্যক্তিগত সাধনায় যাঁহাদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি তাঁহাদের কথা বলিতে আমার কণ্ঠ কাঁপে নাই—আমার সাহিত্যগুরু সেই বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে আমার বিদ্যা ও বুদ্ধি সর্ব্বদাই অতি সচেতন। কিন্তু প্রথম যৌবন হইতে আজ পর্য্যন্ত যখনই এই পুরুষের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি তখনই সকল অভিমান নিমেষে অন্তর্হিত হইয়াছে; কেবল একটি বিরাট পুরুষ-সত্তার মহিমা আমাকে আবৃত করিয়াছে—সাগর-সঙ্গমে নদীস্রোতের মত আমার প্রাণস্রোত ক্ষণেকের জন্য তাহাতে বিশ্রাম লাভ করিয়াছে। পরক্ষণে ইহাও মনে হইয়াছে, এবং সে বিশ্বাস আজিও তেমনই আছে, যে—পুরাকালের কথা বলিতে পারি না—ইদানীন্তন কালে বাঙালী জাতির মধ্যে এত বড় পুরুষ আর জন্মে নাই। তাই যখনই দেশী ও বিদেশী সকল সাক্ষীর মুখে এই একই কথা শুনি—

I was impossible to imagine him in the second place. Wherever he went he was the first.

কিংবা—

His pre-eminent characteristic was kingliness, and nobody ever came near him either in India or America, without paying homage to his majesty.

—তখন আর এক অভিমানে আত্ম-সম্বিৎ ফিরিয়া পাই, সে অভিমান বাঙালীত্বের অভিমান। যে বেদান্তকে ভারতীয় সাধনা আত্মার উত্তুঙ্গ শিখরে বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগের আশ্রয় করিয়াছিল, সেই বেদান্তের বাণীকে শুধু জ্ঞানে নয়—প্রেমে ও কর্ম্মে—মানুষের গভীরতম হৃদয়-সংবেদনায় এমন করিয়া প্রাণের ছন্দে স্পন্দিত করিতে একমাত্র বাঙালীই পারিয়াছে, আর কেহ পারে নাই—পারিত না। বৈষ্ণবের ভাব-কল্লোলিনী-বিধৌত পলিমাটি এবং শাক্তের হৃদয়াবেগ-বর্জ্জিত কঠিন সাধনার এই সুদৃঢ় তটভূমিতে—এই শ্যামলিমাবেষ্টিত শ্মশান-মৃত্তিকায়—হিমালয়ের দেওদার কে রোপণ করিয়াছিল? জল-মাটির গুণেই সেই দেওদার-শাখায় এমন সুস্বাদু পিপ্পল ফলিয়াছে! বাংলার নবযুগ সম্পর্কে বাঙালী প্রতিভার সেই দিকটির পরিচয় লওয়াও যেমন আবশ্যক, তেমনই, সেই প্রতিভা যে শুধুই বাণী-প্রতিভা নয়, তাহাও বুঝি, তাই বাণীকে অতিক্রম করিয়া যে ব্যক্তির প্রকাশ ঘটিয়াছে, আমি সেই ব্যক্তি-চরিত্রের বৃন্তটি ধরিয়া বাণীর রূপ সাজাইবার চেষ্টা করিব।

* * *

উনবিংশ শতাব্দীর সেই যুগ-বন্যার প্রধান ধারায় বৃহত্তর তরঙ্গের ফাঁকে ফাঁকে বহু জ্ঞানী ও সাধকের বিচিত্র প্রয়াস নানারূপে প্রবাহিত হইয়াছে; সাহিত্য, সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম্ম, এবং সর্ব্বশেষে রাষ্ট্রনীতি—এই সকল ক্ষেত্রেই অল্পাধিক উদ্যম—সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের সন্ধান শেষ পর্য্যন্ত একরূপ অব্যাহতই ছিল। খণ্ড খণ্ড ভাবেও এ সকলের পরিচয় ঐতিহাসিকের পক্ষে কর্ত্তব্য বটে, আমি কেবল তাহাদের অন্তর্গত প্রধান প্রবৃত্তি এবং তদ্‌সম্পর্কিত কার্য্যকারণ-তত্ত্বের একটা স্থূল পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতেছি। আমি এ পর্য্যন্ত ইংরেজী শিক্ষা ও তজ্জনিত সাহিত্যিক ভাবচিন্তার ভিতর দিয়া এই যুগের প্রধান প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করিয়াছি; এবং তাহারই প্রসঙ্গে,এ জাতির জাতীয় সংস্কারে যে আধ্যাত্মিকতার বীজ

নিহিত আছে—যাহা তাহার প্রতিভার মূলে স্বপ্ন-চেতনার মত অস্ফুট রহিয়াও শক্তিসঞ্চার করিয়াছে, তাহার কথাও বলিয়াছি। যুগাবতার বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাতিভ দৃষ্টিতে—নবযুগ-প্রবৃত্তির সহিত জাতির এই প্রাক্তন সংস্কারের দ্বন্দ্ব কি আকারে দেখা দিয়াছিল, এবং কোন্ মন্ত্রে তিনি তাহার নিরসন করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাহিয়াছিলেন, তাহা সবিস্তারে বলিয়াছি। কিন্তু এ জাতির অস্থিমজ্জাগত সংস্কার সেই সমস্যাকে যে এত সহজে বিদায় করিবে না—সমস্যার মূল যে আরও গভীর, তাহার প্রমাণ ইতি-পূর্ব্বেই পাওয়া যাইতেছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎ-কালেই আর এক ক্ষেত্রে আর এক আন্দোলন ক্রমেই প্রবলতর হইয়া উঠিতেছিল। নবজাগরণের অনতিকালমধ্যেই, প্রথমে সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনে, এবং শেষে আধ্যাত্মিক কল্যাণ-পিপাসার বশে, এক গুরুতর ধর্ম্মান্দোলন শুরু হইয়াছিল—সে আন্দোলন শুধুই চিন্তার ক্ষেত্রে নয়, শুধুই সমাজ-চৈতন্যে নয়, ব্যক্তির স্বকীয় চৈতন্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিতে লাগিল। ইহাই স্বাভাবিক। অতি দীর্ঘ নিদ্রার অবসানে এ জাতি এক নূতন জগতে চক্ষুরুন্মীলন করিল—সে জগৎ তাহার সেই প্রাক্তন পল্লীসমাজের জগৎ নয়; আকাশ যেন অনেক দূরে উঠিয়া গিয়াছে, এবং তাহারই দিক্-দিগন্ত হইতে মানবেতিহাসের বিপুল ও বহুবিচিত্র ধারার কলরোল তাহার জ্ঞান-বুদ্ধিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতেছে—শুধুই কর্ণে কলগর্জ্জন নয়, সেই স্রোত তাহার বক্ষতটে প্রহৃত হইতেছে। সেই আঘাত সর্ব্বশেষে তাহার প্রাণধাতুকে স্পর্শ করিল, এবং প্রতিঘাতে তাহার স্বকীয় সংস্কার যেন ভিতরে ভিতরে প্রবলভাবে নাড়া পাইল। নবযুগের সংক্রমণ ও তাহার প্রভাব রামমোহনের চিন্তায় সর্ব্বপ্রথম ধরা দিয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি সম্মুখপ্রসারী হইলেও উপরের দিকেই নিবদ্ধ ছিল; নূতন আবহাওয়ার উপযোগী একটা স্বাস্থ্যকর গৃহ নির্ম্মাণ করিবার পক্ষে ভিত্তি যতটুকু দৃঢ় হওয়া আবশ্যক, তাঁহার বিষয়-বুদ্ধি তাহার অতিরিক্ত ভাবনা করে নাই—ভূমিকম্প প্রভৃতির চিন্তাকে তিনি কখনও আমল দেন নাই। ধর্ম্মের ব্যাপারেও, কেবল সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কারের গ্রন্থি একটিমাত্র আঘাতে ছেদন করিবার উদ্দেশ্যে, তিনি খ্রীষ্টান বা সেমিটিক ঈশবাদকেই বেদান্তসূত্র দ্বারা শোধন করিয়া একটি অতি সহজ

অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রামমোহনের ধর্ম্ম যতই যুক্তিসিদ্ধ ও সুকল্পিত হউক, তাহা মূলে অ-ভারতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত—তাহাতে এমন সঞ্জীবনী অধ্যাত্ম প্রেরণা ছিল না, যাহার বলে মানুষ শেষ পর্য্যন্ত নিজের আত্মার উপরে আস্থা না হারাইয়া একটা মহাসঙ্কটে উদ্ধার পাইতে পারে। যে য়ুরোপীয় সমাজ ও রাষ্ট্রের আদর্শ ও যে ধর্ম্মনীতি একদা রামমোহনকে আশ্বস্ত করিয়াছিল, তাঁহার যুক্তিবাদের সহায় হইয়াছিল, সে আদর্শ ও সে নীতির পরিণাম শতাব্দী-শেষে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। বরং রামমোহনের প্রতিভার অসাধারণত্ব ইহাই যে, তিনিই প্রথম ভারতীয় সাধনার গঙ্গোত্তরী-ধারাকে ভিন্ন-পথগা করিবার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতেই সাময়িক পঙ্কোদ্ধারের কাজ হইয়াছিল। সেই বুদ্ধির জাগরণই সে যুগের প্রথম লক্ষণ,—চৈতন্য-স্ফুরণের আদি অবস্থা যে তাহাই। দ্বিতীয় অবস্থায় হৃদয় বা প্রাণের জাগরণ—বিদ্যাসাগরে ও মধুসূদনে, দুই দিক দিয়া তাহাই ঘটিয়াছিল। তৃতীয় অবস্থায় বুদ্ধি ও হৃদয় দুইয়েরই সমান জাগরণ—সুস্থ মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ, তাহার বিগ্রহ বঙ্কিমচন্দ্র। ইহারও পরে, শতাব্দীর শেষভাগে, জাতীয় জাগরণের প্রায় তুরীয় বা চতুর্থ অবস্থায়, সেই সকলের সহিত আর এক যে-বস্তুর উন্মেষ হইল, অন্য নামের অভাবে তাহার নাম দিব 'আত্মা'। মন, বুদ্ধি, হৃদয় ও প্রাণ—সকলই ইহার সেবায় পূর্ণভাবে নিয়োজিত; এই আত্মার দৃষ্টিতে যুগসমস্যা এমন একটি আকার ধারণ করিল যে, তাহা যুগ-জাতি-দেশ অবলম্বনে সর্ব্বকাল ও সর্ব্বদেশের সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল।

২

জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও জীবন-জিজ্ঞাসা—ইহাতেই যুগপ্রবৃত্তির আরম্ভ, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়াও হইতে থাকে। প্রতিক্রিয়ার কারণ—বহুকাল-অর্জ্জিত সংস্কার; এই সংস্কারই অন্ধসংস্কাররূপে জীবনকে গতিহীন করিয়াছিল। নবযুগ ও তাহার অনুষঙ্গী সেই পাশ্চাত্য প্রভাব, এই সুপ্ত সংস্কারের এতই বিরোধী যে, দেশের রক্ষণশীল সমাজ একটা অজ্ঞাত অস্পষ্ট ভয়ের বশীভূত হইয়া সেই প্রভাবের গতিরোধ করিতে চাহিল; কোথায় যে বিরোধ—ভিতরের কোন্ মূল গ্রন্থিতে টান পড়িতেছে তাহা বুঝিতে না পারিয়া, বিচার-বুদ্ধিকে

দমন, এবং অবোধ চিত্তবৃত্তিকে প্রাণপণে আশ্রয় করিয়া, নির্জ্জীব শাস্ত্র-বচনের মহিমা-ঘোষণায় অধীর হইয়া উঠিল। অপর দিকেও উৎকণ্ঠা কম ছিল না; প্রাণের প্রবল মুক্তি-কামনা—জীবনকে বিবিধমতে ভোগ করিবার আকাঙ্ক্ষাও যেমন জাগিয়াছে, তেমনই ব্যক্তির আত্ম-চেতনা প্রখর হইয়া উঠিয়াছে; তাহার ফলে আধ্যাত্মিক সত্য-মীমাংসাও নবযুগের আন্দোলনে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিল; শেষের দিকে ইহাও একটা পৃথক খাতে বহিতে শুরু করিয়াছিল। রামমোহন-পন্থীরা এই আধ্যাত্মিক উৎকণ্ঠাকে বুদ্ধির শাসনে সংযত রাখিবার চেষ্টা করিলেও তাহা যে সফল হয় নাই, তাহার প্রমাণ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মত পুরুষেরও অবশেষে সন্ন্যাস-গ্রহণ। আবার নিছক যুক্তি-বিচার যে ভগবদ্ভক্তির অনুকূল নয়, সেই গভীরতর পিপাসা-নিবৃত্তির জন্য জাগ্রত বুদ্ধিবৃত্তির উপরে একপ্রকার রস-চেতনাকে প্রাধান্য দিতেই হয়, সে যুগের ধর্ম্মান্দোলনের সর্ব্বপ্রথম ও শক্তিমান নেতা আচার্য্য কেশবচন্দ্রই তাহার প্রমাণ। কিন্তু এ সকলের দ্বারা যুগ-সমস্যার কোনরূপ সমাধান হয় নাই; কেবল ইহাই প্রমাণ হয় যে, যুগধর্ম্মের প্রভাবে এ জাতির চেতনার উপরি-স্তরে যত তরঙ্গই উত্থিত হউক, তলদেশে একটা গভীরতর আকুতি উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছিল; যুগ ও সনাতন, সর্ব্বমানবীয় চেতনা ও জাতীয় সংস্কার, এই দুইয়ের সংঘর্ষ ভিতরে ভিতরে বৃদ্ধি পাইতেছিল; ফলে, একটা ঘোরতর আধ্যাত্মিক সংশয়-সঙ্কট আসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। যাহারা অতিশয় মেধাবী অথচ তীক্ষ্ণ অনুভূতিশীল—তাই জীবনের আদি-অন্ত সম্বন্ধে যাহারা কোন কাটা-ছাঁটা ধারণায় সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই, তাহারা শেষ পর্য্যন্ত জীবন সম্বন্ধে নাস্তিক হইয়া পড়িতেছিল, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে যুগের আদি-প্রবৃত্তি প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে যে নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উদ্দীপ্তি ঘটিয়াছিল, এক্ষণে তাহা প্রশমিত হইয়া বাঙালীর জীবনযাত্রায় তথা চরিত্রে যে পরিণতির আভাস দেখা দিতেছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাই লক্ষ্য করিয়া অতিশয় বিচলিত হইয়াছিলেন, তাহারই নিবারণকল্পে তিনি তাঁহার প্রতিভার সকল শক্তি নিয়োজিত করিয়া

জাতির জীবন-রক্ষার একটা পন্থা নির্ণয় করিয়াছিলেন। নব্যশিক্ষিত সমাজের দাসত্ব-প্রীতিও তিনি যেমন লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তেমনই তাহার চরিত্রে দারুণ স্বার্থসুখলোলুপতা ও তাহার কারণ দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন; তাহার এই মনুষ্যত্ব-লোপ এবং অচিরকালের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার অধঃপতনের সম্ভাবনা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়াছিল। তথাপি তাঁহার ভরসা ছিল শিক্ষিত বাঙালীর উপরেই; তাই উৎকৃষ্ট ভাব ও চিন্তারাজি অকাতরে ছড়াইয়া তিনি তাহাদের চিত্তশুদ্ধির প্রাণপণ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই চিন্তারাজির মধ্যে দুইটি ছিল প্রধান—সার্ব্বজনীন মনুষ্যপ্রীতি ও বিশেষভাবে দেশপ্রীতি, এবং সমাজের নেতৃত্ব-ভার গ্রহণ করিবার জন্য আত্মানুশীলন,—দেহ, মন ও প্রাণের উৎকর্ষসাধন। ইহা যে আপামর সাধারণের জন্য নয়, তাহা তিনি জানিতেন, সে আদর্শ ও তাহার সাধনা কেবল শিক্ষিত-সমাজেরই আয়ত্ত। বৃহত্তর সমাজের দারুণ দুর্গতি ও অবনতির অবস্থা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না, সে সমস্যাও তাঁহার চিন্তায় অল্প স্থান অধিকার করে নাই; কিন্তু সে সকলের দায়িত্ব তিনি আধুনিক কালের 'ব্রাহ্মণের' উপরেই দিয়াছিলেন; এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন আদর্শবাদী, তেমনই aristocrat। তথাপি নব-মানবধর্ম্ম-প্রচারক বঙ্কিম, দেশপ্রেম-মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিম, এই aristocrat বঙ্কিম একদা যেমন 'সাম্য' নামক প্রবন্ধমালা রচনা করিয়াছিলেন, তেমনই তাঁহার সেই আদর্শবাদী ভাব-চিন্তার মধ্যেই এমন বীজ নিহিত ছিল, যাহা অতঃপর সেই আদর্শের উচ্চভূমি বিদীর্ণ করিয়া বাস্তবকেই আরও বিরাট, আকারে সঙ্কট-সঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের পরেই বিবেকানন্দ একের সহিত অপরের যুগগত পরম্পরতার যোগই শুধু নয়, ভাবগত যোগও নিশ্চয় ছিল—সে যোগ সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষ যোগ না হইতে পারে, কিন্তু এতবড় বাণীবরপুত্রের সেই বহুপ্রচারিত বাণী বিবেকানন্দের মত পিপাসু যুবকের পানীয় হয় নাই, ইহা সম্ভব নয়; রামমোহন, কেশবচন্দ্রকে যেমন, বঙ্কিমচন্দ্রকেও তেমনই তিনি তাঁহার দিক দিয়া হজম করিয়াছিলেন, এবং বঙ্কিমের চিন্তাধারার প্রায় বিপরীত মুখে হইলেও, বঙ্কিম যেখান শেষ করিয়াছিলেন ঠিক সেইখান হইতেই তাঁহার যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। ইহাও মনে হয়, বিবেকানন্দের গন্তব্য

পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের আপত্তি ছিল না, বরং অতিশয় হৃষ্টচিত্তেই তিনি তাহাতে সম্মত হইতেন; কিন্তু পঙ্গুর পক্ষে সেরূপ গিরিলঙ্ঘন তিনি আদৌ সাধ্য বলিয়া মনে করিতেন না, এমন অসীম সাহসের যোদ্ধ-মনোভাব তাঁহার ছিল না। বঙ্কিম ছিলেন ভাবুক ও চিন্তাশীল, প্রাকৃতিক নিয়তি-নিয়মের অনুবর্ত্তী, ক্রমবিকাশবাদী। বিবেকানন্দ আত্মার স্ব-শক্তিতে আস্থাবান, তিনি প্রকৃতির ধমক মানিতেন না। উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী যতই বিপরীত হউক, মূল সমস্যা উভয়ের নিকটেই এক; আবার তত্ত্বের দিক দিয়া যেমনই হউক, ভাব-প্রেরণায় উভয়ের সগোত্রতা এত অধিক যে, এককালে বাঙালী যে উভয়কে একই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। মনুষ্যত্বের উদ্ধার-সাধন যেমন উভয়েরই ছিল একমাত্র ব্রত, তেমনই প্রেম ও পৌরুষ, এই দুই ছিল উভয়ের সাধন-মন্ত্র; এবং উভয়েরই মতে, সেই প্রেম ও পৌরুষের মুখ্য সাধনক্ষেত্র ছিল স্বদেশ ও স্বজাতি-সমাজ। কিন্তু বিবেকানন্দেই সে যুগের জাগরণ প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে। সে জাগরণের এইরূপ ক্রমনির্দ্দেশ করা যায়:—প্রথম, মনুষ্য-জীবনের গৌরব-বোধ; দ্বিতীয়, জীবন-জিজ্ঞাসা, মনুষ্যত্বের আদর্শ-সন্ধান, ও জীবনের মাহাত্ম্য-ঘোষণা; তৃতীয়, জীবনের মহিমাই মানুষের মহিমা নয়; জীবন-সাধনার কোন স্বতন্ত্র আদর্শ নাই; মানুষই মানুষের আদর্শ, মানবাত্মার মহিমাই সকল মহিমার মূল; জ্ঞানে প্রেমে ও কর্ম্মে বন্ধনমুক্ত আত্মার সেই স্বরাজ-প্রতিষ্ঠাই মনুষ্যজীবনের নিঃশ্রেয়স। এবার এই বাণীর কিছু পরিচয় দিব, কিন্তু বাণী ও ব্যক্তির পরিচয় একই—বরং ব্যক্তিই আগে, বাণী পরে।

৩

তখন উনবিংশ শতাব্দী প্রায় শেষ পাদে আসিয়া পৌঁছিয়াছে; ইংরেজ-শাসন ও ইংরেজী শিক্ষার ফলে বাঙালী তখন বড় মোহকর স্বপ্ন দেখিতেছে, সে স্বপ্ন সফল হইতেও যেন আর বিলম্ব নাই; বাঙালী তখন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতেও আরম্ভ করিয়াছে! এদিকে সরকারী চাকুরির মাহাত্ম্য সমাজে এক নূতনতর কৌলীন্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, জীবনযাত্রায় পরিবর্ত্তন শুরু হইয়াছে। কলিকাতা শহর এক নূতন নাগরিক সভ্যতার কেন্দ্রস্থল হইয়াছে; অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত

বাঙালী যেখানে যেটুকু সংস্কৃতি অর্জ্জন করিয়াছিল এই নগরী তাহারও সবটুকু আকর্ষণ করিতেছে; বাঙালীর চিত্তভূমির—তাহার হৃদয় ও মস্তিষ্কের—সবটুকু শক্তি তাহার একাধিকারে বর্ত্তিয়াছে। শিক্ষা সমাজ ও ধর্ম্ম-সম্পর্কিত, এমন কি, নূতন সাহিত্যের জন্মঘটিত যত কিছু আন্দোলন, এই শহরেই সব হইয়া গিয়াছে। প্রাচীনের হিসাবনিকাশ প্রায় শেষ করিয়া বাঙালী তখন নূতনের সঙ্গেও একটা আপস করিয়া লইয়াছে, সম্মুখে যেন বাঁধা পথ; সে পথ যেমন উন্মুক্ত, তেমনই নিঃসঙ্কট। দাসত্বের অন্ন সুলভও বটে, রুচিকরও বটে; নিজের উপরে অথবা ভগবানের উপরে যে বিশ্বাস তাহা ইংরেজের উপরে স্থাপন করিয়া বাঙালী একরূপ নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

কিন্তু আসলে এই স্বপ্ন-বিলাস ও সুখের আশ্বাস—নিরুপায়ের আত্ম-প্রবঞ্চনা মাত্র; তলে তলে একটা ক্লান্তি আসিয়াছে, সংশয়ও দেখা দিয়াছে—পশ্চিম এ জাতির মস্তিষ্কে হানা দিয়াছে—তাহার জীবনকে দুর্ব্বল করিয়াছে। একদিন যাহার নূতনত্বে সে অধীর হইয়াছিল—সেই নূতনকে লইয়া লোফালুফি করিয়া, তাহাকে বাজাইয়া এবং চতুর্দ্দিকে ছুঁড়িয়া ছড়াইয়া সে সকলকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল, এক্ষণে সেই নূতনের উন্মাদনা-শেষে তাহার দেহে-মনে একটা বেদনা জাগিতে লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম সেই বেদনা সজ্ঞানে অনুভব করিয়াছিলেন। সেই যুগের যত কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভয়-ভরসাকে তিনিই একটি প্রকৃষ্ট বাণীরূপ দিয়াছিলেন বটে—যুগনায়করূপে জাতীয়-জাগরণের প্রধান পুরোহিতরূপে তিনিই দাঁড়াইয়াছিলেন—তথাপি, এই বেদনা তাঁহাকে বিহ্বল করিয়াছিল, জাতির সেই হীন আত্ম-সন্তোষ ও হৃদয়দৌর্ব্বল্য দর্শনে তাঁহার লজ্জা ও ক্ষোভের অবধি ছিল না। ইংরেজী শিক্ষার পদ্ধতি-দোষে তাহার সুফল অপেক্ষা কুফল বৃদ্ধি পাইল, সে শিক্ষার একমাত্র তপঃফল হইল চাকুরি-লাভ—সরস্বতীর কমলবনে কমলবিলাসী বাঙালী চাকুরি-মধু-পানে বিভোর হইয়া উঠিল। বাঙালীর নিজস্ব সমাজ-জীবনও নষ্ট হইতে চলিল; পল্লীর প্রতিবেশে, মাঠে, বাটে, প্রান্তরে সেই সরল উন্মুক্ত জীবন যাপন করিয়া সে যেটুকু প্রাণশক্তি বজায় রাখিয়াছিল তাহা ক্রমেই হ্রাস পাইতে লাগিল;

কলিকাতা শহরের বদ্ধ বায়ুতে নূতন নাগরিক সুখোপকরণ তাহার সেই স্বাস্থ্য নাশ করিয়া অহিফেন-সুলভ জড়তা বৃদ্ধি করিল—প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু নেশার ঘোরে, নূতনত্বের মোহে, সেই অস্বাভাবিক অবস্থা ক্রমে অভ্যস্ত হইয়া আসিল; পল্লীসমাজের বন্ধন যেমন দুঃসহ, পল্লীবাসও তেমনই অসুখকর হইয়া উঠিল। বাস্তব জীবনে দাসত্বপ্রীতি যতই বাড়িতে লাগিল—মনে ততই স্বাতন্ত্র্য-অভিমান জাগিয়া উঠিল; ইংরেজের চাকুরি ও ইংরেজের আইন সেই স্বাতন্ত্র্যের পোষকতা করিল; ইংরেজী বিদ্যার অভিমানও মনের সঙ্কোচ ঘুচাইল। এক দিকে চাকুরি-গৌরব, আর এক দিকে Mill, Bentham, Spencer; এক দিকে দাশুরায়ের পাঁচালি, আর এক দিকে Shakespeare, Milton, Byron; এক দিকে মাহেশের রথ, বাগানবাড়ির আমোদ, অপর দিকে ব্রাহ্ম-মন্দিরের উপাসনা—সে যেন এক অপূর্ব্ব প্রহসন! এই দুইয়েরই রস যে সমভাবে উপভোগ করিতে পারে, সে 'হুতোম পেঁচার নক্‌শা' লিখিয়া প্রবল হাস্যবেগ প্রশমিত করে। এই জীবনই সেকালের চতুর্ব্বর্গকামী বাঙালী-সন্তানের আদর্শ হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু মধ্যবিত্ত সমাজ তখনও একেবারে মরে নাই—এই সমাজই ক্ষতবিক্ষত হইয়াও জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ এ পর্য্যন্ত সমাজের স্থিতি রক্ষা করিয়াছে; আবার এই সমাজই সর্ব্বপ্রকার বিদ্রোহের বীজ ধারণ ও পালন করিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশে, ইংরেজী শিক্ষার সুফলস্বরূপ, যত কিছু আন্দোলন ঘটিয়াছে তাহার প্রায় সকলগুলিতে শক্তি-সঞ্চার করিয়াছে—এই শ্রেণীর মানুষ; শুধুই বিদ্রোহের মন্ত্র-রচনা নয়, তাহার আগুনে ঝাঁপ দিয়াছে ইহারাই। উৎকৃষ্ট প্রতিভারও জন্ম হইয়াছে ইহাদেরই মধ্যে, কেবল দুইজন এই শ্রেণীভুক্ত নহেন—রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ। ইহার কারণ আছে; বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের যে একটি মহৎ গুণ—তাহা এই শ্রেণীর জীবনেই সম্ভব। তখনকার একান্নবর্ত্তী পরিবারে জীবিকা-অর্জ্জনের ভার প্রায় একজনের উপরেই থাকিত, অথবা পৈতৃক জমিজমার দ্বারাই তাহা এক প্রকার নির্ব্বাহ হইত, তাহাতে এক দিকে যেমন আলস্য প্রশ্রয় পাইত, তেমনই স্বপ্নসুখসন্তুষ্ট, দায়িত্ববন্ধনমুক্ত, ভাবুক ও চিন্তাপ্রবণ বাঙালীর ভাবচর্চ্চার

বড় অবকাশ হইত। যে বিলাস-ব্যসনে অভ্যস্ত নয়, অথচ জাতিস্বভাব-সুলভ চিন্তা ও কল্পনাশক্তির অধিকারী—কোন একটি ভাব-সত্যের প্রতিষ্ঠায় তাহার পক্ষে সর্ব্বস্বত্যাগ আদৌ দুষ্কর নয়, ইহার প্রমাণ বাংলা দেশের ধর্ম্ম, সমাজ ও শেষে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ইতিহাসে প্রচুর পাওয়া যাইবে। সেকালের কলিকাতার সেই সমাজে, সেই নব্য জীবনযাত্রার অবসাদকর আবহাওয়ায়, রুদ্ধ আলোক ও বদ্ধ বায়ুর সেই শ্বাসকৃচ্ছ্রতার মধ্যে, স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্মের সংঘর্ষে জাতির সেই মানস-বৈকল্যের অবস্থায়, আত্মক্ষয়কারী দারুণ দাসত্ব-ব্যাধি যখন সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে, তখন কলিকাতারই এক মধ্যবিত্ত পরিবারে সেই শ্রুতি-প্রসিদ্ধ নাচিকেত-অগ্নির একটি শিখা সকলের অগোচরে জ্বলিতে আরম্ভ করিল; এবারে শুধু জীবনের আরাধনাই নয়, মৃত্যুর বদ্ধমুষ্টি হইতে অমৃত-ভাণ্ড উদ্ধার করিবার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জাগিল।

অতি অল্পবয়সেই এই তেজ—সর্ব্ববন্ধনমুক্তির সেই দুর্দ্দমনীয় পিপাসা—বিবেকানন্দের জীবনে দেখা দিয়াছিল; ইহাকেই আমাদের অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ভাষায় 'শৈব তেজ' বলে। অপরের উপদেশ নয়, পরের সাক্ষ্য নয়, কোন তর্ক-যুক্তির পুঁথিগত সিদ্ধান্ত নয়—পরোক্ষ আপ্তবাক্যের আশ্বাস নয়, নিজেরই জ্ঞান-বুদ্ধি ও অপরোক্ষ অনুভূতির সাহায্যে, জীবনের তথা মানবীয় সত্তার অর্থ সন্ধান করিতে হইবে, যদি কোন সত্য থাকে তাহা সাক্ষাৎকার করিতে হইবে—ইহাই ছিল সেই বালকের প্রাক্তন সংস্কার, সে সংস্কার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়তর হইয়াছিল। সেকালের স্কুলে ও কলেজে অধ্যেতব্য যাহা কিছু ছিল তাহা যেন গণ্ডূষে পান করিয়া, জ্ঞানপন্থী অধ্যাত্মবাদীদের সঙ্গ করিয়া তাহাদের তত্ত্ববিচার শুনিয়া কিছুতেই পিপাসা মিটে না; বরং সংশয় বাড়িয়া যায়, আত্মা আরও বিদ্রোহী হইয়া উঠে। বিবেকানন্দ ছাত্রাবস্থাতেই যুক্তিপন্থী নব্য-সম্প্রদায়ে যোগ দিয়াছিলেন—সেও যেন অন্ধভক্তি ও গুরুবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা। দেশে তখন পাশ্চাত্য বিদ্যার মোহ কিছু কমিয়াছে, বন্যার সেই জলরাশির নিম্নে পঙ্ক দেখা দিয়াছে; মানবত্বের মহিমা-বোধ যতই টিকিয়া থাকুক সেই ভাবের আবেগ বাধা পাইতে আরম্ভ করিয়াছে; কারণ ইতিমধ্যেই পাশ্চাত্য

জাতির সেই মানবতন্ত্র-শাস্ত্রের সাধন-পীঠে আর এক মন্ত্র মানবতাকে পরিহাস করিয়া জয়ী হইতে চলিয়াছে। মানবধর্ম্মকে প্রকৃতিধর্ম্মের সহিত বাঁধিয়া লওয়ার ফলে, যে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিধর্ম্ম উত্তরোত্তর প্রাধান্য লাভ করিতেছিল তাহাতে মানুষের আত্মা ক্রমেই জড়শক্তির বশীভূত হইতেছিল—প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস প্রভৃতি মনুষ্যজীবনের আত্মিক সম্পদ মানুষ তখন হারাইতে বসিয়াছে। কিন্তু তখনও সে ঘটনা আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে নাই—আত্মার স্বাতন্ত্র্য-মহিমা নয়, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধের অনুকূল যে যুক্তিবাদ তাহাই পরম উপাদেয় হইয়াছে; তাহার কারণ, জীবনের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগও ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না। তাই সেই নূতন নাগরিক জীবনে সমাজবন্ধন ছিন্ন করিয়া ব্যক্তির যে আত্ম-প্রসাদ—পুঁথিগত যুক্তির বলে কুসংস্কার-মুক্তির যে দুঃসাহস—তাহাই পরম জ্ঞানের পরিচায়ক হইয়া উঠিয়াছিল। এক দিকে শাস্ত্র, গুরু ও ব্রাহ্মণে ভক্তি, এবং অপর দিকে মানস-মুক্তির এই যুদ্ধঘোষণা—এই দুইয়ের মধ্যে যুবক বিবেকানন্দ যে শেষেরটির দিকেই আকৃষ্ট হইবেন, ইহাই স্বাভাবিক। সংস্কার-কৈঙ্কর্য্যের উচ্ছেদ—মনের মুক্তিই তো আত্মার উদ্ধারসাধনের প্রাথমিক উপায়—মনুষ্যত্বের যাহা সার সেই পৌরুষের ("পৌরুষং নৃষু") ইহাই তো প্রথম পরীক্ষাস্থল। কোন জ্ঞান, কোন তত্ত্ব কোন গুরুবাক্যে প্রয়োজন নাই—আগে চাই নিজ আত্মার স্বাধীনতা-বোধ, তাহার তুলনায় আর সকলই তুচ্ছ।

বিবেকানন্দ-চরিত্রের এই প্রধান লক্ষণ তখন হইতেই, অথবা আরও পূর্ব্ব হইতেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। সে চরিত্র যেন একটি শাণিত ইস্পাত-ফলক, তাহার ধার—ওই প্রখর মুক্তি-পিপাসা, সর্ব্ববন্ধন-অসহিষ্ণুতা। কিন্তু প্রথম জীবনের সেই দুর্দ্ধর্ষ আত্ম-স্বাতন্ত্র্য এবং আজন্ম-শাণিত সেই জ্ঞান-পিপাসার তীক্ষ্ণ তরবারিও শেষে বড় কাজে লাগিয়াছিল, তাহার অন্তরস্থ সেই অতি-কঠিন ইস্পাতের দ্বারাই যে নূতন অস্ত্র নির্ম্মিত হইল তাহাতে মাটির উপরকার বনগুল্মলতাই নয়, তলদেশের শিকড়গুলা পর্য্যন্ত কাটিয়া ফেলিবার উপায় হইল; বঙ্কিমচন্দ্র মাটির উপরকার ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন, ভিতর পর্য্যন্ত দৃষ্টি করা তখনই আবশ্যক বোধ

করেন নাই; তিনি ছিলেন দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, সমন্বয়পন্থী শাক্ত সাধক, এমন উগ্র অদ্বৈতবাদকে তিনি ভয় করিতেন।

৪

বিবেকানন্দের চরিত্র ও জীবন-কথা বলিতেছিলাম। তাঁহার প্রথম যৌবনের সেই অদম্য জ্ঞান-পিপাসা ও স্বাতন্ত্র্য-স্পৃহার কথা বলিয়াছি; এ চরিত্রের মূল গ্রন্থি তাহাই বটে, কিন্তু তাহাই সব নয়। সে চরিত্রের যে দিকটি অসাধারণ, যাহা মহামনীষীগণকেও মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়াছে, সেই দিকটির কথা এইবার বলিব। ভগবান বুদ্ধের প্রসঙ্গমাত্রে তাঁহার নিজের সেই অপূর্ব্ব ভাবাবেশের কথা স্মরণ হয়, এবং তাহাতেই অনুমান করা যায়, বিবেকানন্দ কি কারণে আজীবন বুদ্ধকে এত ভক্তি করিতেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বেও যেমন তিনি বুদ্ধগয়ায় গিয়া বোধিবৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া রোমাঞ্চ-কলেবর হইয়াছিলেন, তেমনই জীবনের সর্ব্বশেষ তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন সারনাথে। তিনি এমন কথাও বলিতেন যে, অতি অল্প বয়সে ভাবাবেশে তিনি বুদ্ধের সাক্ষাৎ-দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। ইহা আশ্চর্য্য নয়, বুদ্ধের সঙ্গে তাঁহার আত্মার সগোত্রতা ছিল—তিনিও অতীত ও অনাগত বুদ্ধগণের বংশে জন্মিয়াছিলেন; বুদ্ধের মতই তিনি যত বড় সন্ন্যাসী, তত বড় প্রেমিক। যে-পুরুষ কোন বন্ধন মানিবে না, দেহের বন্ধনও যাহার কাছে দুর্ব্বিষহ, কৈবল্য-মুক্তিতে পরমানন্দ ভিন্ন আর কিছুতেই যাহার রুচি ছিল না, সেই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী দেশকে ও দেশের মানুষকে যেরূপ ভালবাসিয়াছিলেন, তেমন ভালবাসা বোধ হয় আর কেহই বাসে নাই। ইহার কারণ যাহাই হউক, সেই প্রেমের অপূর্ব্ব আবেগ তাঁহার ব্যক্তিগত মুক্তিপিপাসাকেও দমন করিয়া, দেশের মুক্তি-কামনা হইতেই জগতের হিতার্থে, তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়াছিল। এই প্রেম একটা আধ্যাত্মিক রসাবেশ নয়, ইহাতে এক বিশাল হৃদয়ের অসীম দুঃখবোধ ছিল; এ প্রেম খাঁটি মানবীয় প্রেম। বিবেকানন্দের ত্যাগ-বৈরাগ্য এতই বিশুদ্ধ ও এমনই মজ্জাগত যে, তাহার সহিত এই ধরনের প্রবল হৃদয়-সংবেদনা স্বভাববিরুদ্ধ বলিয়াই মনে হয়। যে একদিন এক মুহূর্ত্তও আত্মার স্বরূপ-মহিমার কথা ভুলে নাই—সেই আত্মার

লেশমাত্র অজ্ঞান-মোহ, বন্ধন বা দুর্ব্বলতা, যে সহ্য করিতে পারে না, সর্ব্বপ্রকার হৃদয়াবেগকে যে মাত্রাস্পর্শ-জনিত ভাবালুতা ("overflow of the senses") বলিয়া বিকৃত করে, তাহার সেই জ্ঞানাগ্নি-শুষ্ক আঁখিপল্লবে এমন অশ্রুধারা উদ্গত হয় কেমন করিয়া?

এ রহস্য দুরবগাহ; হয়তো মানব-মাহাত্ম্যের এই অভিনব রূপ এ যুগের শেষ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান, Humanism-এর অন্তর্গত যে গভীরতম তত্ত্ব, তাহারই চরম ও পরম প্রকাশ। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ইহার যে কারণই নির্দ্দেশ করি না কেন, ইহার এই রূপকে—বুদ্ধির দ্বারা নয়, একরূপ মিষ্টিক চেতনার দ্বারাই—উপলব্ধি করা সম্ভব। কারণ, দেহ ও আত্মা, জীবন ও মহাজীবন, দ্বৈত ও অদ্বৈত এখানে এমন একটা নির্দ্বন্দ্বতার ইঙ্গিত করিতেছে, "বাচো যতো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"। এখানে জ্ঞান যেন প্রেমের দুঃখানলে দগ্ধ হইয়া আরও স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে—নিদাঘ-দিনের দাহশেষে তারকাখচিত আকাশ যেমন আরও উজ্জ্বল, আরও সৌম্য-গম্ভীর হইয়া উঠে। মহাযোগী মহাদেবের কণ্ঠে সেই যে গরল-নীলিমা, তাহার জ্বালা-বোধ কি কম? সেই গভীর জ্বালাকে নিঃশেষে পান করিয়াই তিনি ব্যোমকেশ হইয়াছেন; তাই তাঁহার ললাটনেত্রের সেই জ্ঞান-বহ্নিও শশিকলার স্নিগ্ধকিরণে করুণ হইয়া উঠে! তথাপি বিবেকানন্দ মহাদেব নন—মানুষ।

উপমা-রূপকের ভাষা ছাড়িয়া—মনুষ্যচরিত্র হিসাবেই ইহার কারণ-সন্ধান ও কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যার চেষ্টা করিব। বালক বিবেকানন্দের সেই দুর্দ্ধর্ষ জ্ঞানাভিমানের ঊর্দ্ধফণা কোন্ মন্ত্রৌষধির বলে রুদ্ধবীর্য্য হইয়াছিল তাহা আমরা জানি। কিন্তু এই প্রেমের অঙ্কুর তাঁহার নিজের চরিত্রেই আজন্ম নিহিত ছিল—কেবল বিকাশের অপেক্ষা মাত্র। আমি বিবেকানন্দ-চরিত্রের যে উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যস্পৃহার কথা বলিয়াছি, তাহা ব্যক্তির ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বাভিমান নয়—তাহা পরের তুলনায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব-জ্ঞান নয়, সেই মর্য্যাদা-বোধ ব্যক্তির নয়—আত্মার। আত্মারই সেই মর্য্যাদা-বোধ তাঁহাকে এত বড় প্রেমিক করিয়া তুলিয়াছিল কেমন করিয়া, তাহাই বলিব। ক্রমশ

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

মহাস্থবির জাতক

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

একদিন, সেদিন কিসের ছুটি ছিল। সারাদিন পিসীমার বাড়িতে কাটিয়ে বেলা প্রায় তিনটে নাগাদ গলি দিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরছি, এমন সময় আকাশ অন্ধকার ক'রে এল মুষলধারে বৃষ্টি। ব্যাপার গুরুতর দেখে আমি আত্মরক্ষার জন্যে একটা বাড়ির উঁচু রোয়াকে আশ্রয় নিলুম।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরও বৃষ্টি থামল না। জলের ছাটে প্রায় আধভেজা হয়ে গিয়েছি। রাস্তায়ও বেশ জল দাঁড়িয়েছে, যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন—মনে ক'রে বৃষ্টি মাথায় নিয়েই বাড়ির দিকে রওনা হব মনে ক'রে ধুতি সামলাচ্ছি, এমন সময় প্রায়-সামনের এক বাড়ি থেকে ছাতা নিয়ে একটি ছেলে রাস্তায় বেরিয়েই মুখ তুলে বললে, কে রে, স্থবির নাকি ?

কে রে, ললিত ?

ললিত সুলতার ছোট ভাই। সেই বছর সে মেয়ে-ইস্কুল ছেড়েছে। সে জিজ্ঞাসা করলে, কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে আছিস ? এঃ, ভিজে গেছিস যে !

আর ভাই বলিস নি, ঘণ্টাখানেক ধ'রে ঠায় দাঁড়িয়ে ভিজছি।

এখানে দাঁড়িয়ে ভিজছিস আর বাড়ির মধ্যে যাস নি, এই তো আমাদের বাড়ি।

আরে, ওইটে তোদের বাড়ি ? আমি তো জানি না।

ললিত ছাতা বন্ধ ক'রে আমার হাত ধ'রে বললে, আয় আয়।

বাড়ির মধ্যে ঢুকে ললিত চীৎকার ক'রে উঠল, দিদি, দেখ, কে এসেছে।

ললিতের চীৎকার শুনে তার ভাইবোনেরা ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত হ'ল, সবার পেছনে এল সুলতা হাঁপাতে হাঁপাতে।

ললিত চেঁচাতে লাগল, আজ ঠিক ধরেছি, এইখানে দাঁড়িয়ে ছিল।

সুলতা আমাকে দেখেই বললে, এতদিনে মশায়ের সময় হ'ল বুঝি? মিথ্যেবাদী কোথাকার! প্রতিজ্ঞা করেছিলি না?

সুলতার কথার কোন জবাব দিতে পারলুম না। তাকে দেখে শুধু মনে হ'ল, কি সুন্দর দেখতে হয়েছ তুমি!

সুলতার ছোট বোন সুজাতা আমাদের দু ক্লাস নীচে পড়ত। ইস্কুলময় চড়ুইপাখীর মতন নেচে বেড়াত সে। সুজাতা চড়ুইপাখীর মতই কিচকিচ ক'রে উঠল, আবার কথা কওয়া হচ্ছে না বাবুর!

সুলতা এগিয়ে এসে আমার হাত ধ'রে বললে, চল মার কাছে।

মা বড় ভালমানুষ। প্রণাম ক'রে বসতে না বসতে কয়েক মিনিটের মধ্যে একেবারে আপনার ক'রে নিলেন। তিনি বললেন, লতু কতদিন থেকে বলছে, তুমি আসবে, তা ছেলের বুঝি সময়ই হয় না?

তখুনি তাস পাড়া হ'ল। ললিত এক বোঝা মুড়ি আর তেলে-ভাজা এনে হাজির করলে। এই তেলে-ভাজা কিনতে যাবার মুখেই আমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল।

'গ্রাবু' খেলা শুরু হ'ল। আমি আর সুলতা এক দিকে, সুজাতা ও ললিত আর এক দিকে। বাকি যারা ছিল, তারা আমাদের ঘিরে বসল। হৈ-হৈ ক'রে খেলা জ'মে উঠল।

ওদিকে আকাশ বিরাট আর্ত্তনাদে বার কয়েক দিগ্বিদিক চমকে দিয়ে আমাদের ঘিরে একঘেয়ে ঝরঝরানি সুরে বিনিয়ে কাঁদতে থাকল।

সময় যে কোথা দিয়ে কাটতে লাগল, তা বুঝতেই পারি নি। দিনের আলো আর রাতের অন্ধকার মিলিয়ে ঘরের মধ্যে যে স্বপ্নলোকের সৃষ্টি হয়েছিল, তারই মায়ায় আমার আত্মজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। নিজের বাড়িতে নিয়ত নানা শঙ্কায় মন আমার সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত থাকত। উদ্যত শাসনকে কত মিথ্যায় ও ছলনায় যে ঠেকিয়ে রাখতে হ'ত তার আর ঠিকানা নেই, কিন্তু লতুদের ওখানে দেখলুম, ঠিক তার উল্টো। বাবা-মার সঙ্গে তাদের ব্যবহার অত্যন্ত সুন্দর ও সহজ, ঠিক বন্ধুর মতন। অথচ তাদের কেউ লেখাপড়ায় আমার চাইতে খুব ভাল ছিল না। তা ছাড়া অনাত্মীয় পরিবারের মধ্যে এমন ভাবে মেশা এর আগে জীবনে

হয় নি। আমার স্নেহলোলুপ অন্তর তাদের আদরে এমন সাড়া দিলে যে, কিছুক্ষণের জন্যে নিজের বাড়ির কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলুম। হঠাৎ পাশের ঘরের একটা ঘড়ি ঢংঢং ক'রে জানিয়ে দিলে, সাতটা বাজল যে হে স্থবির শর্ম্মা, আর কত আড্ডা দেবে? আজ বরাতে দুঃখু আছে তোমার।

আর নয়। তড়াক ক'রে উঠে পড়লুম। আমার ও লতুর কাঁধে তখনও একটা পাঞ্জা ও একটা ছক্কা চাপানো রয়েছে।

উঠে পড়লুম। আর নয়, আর নয়, আর নয়।

সুজাতা বললে, কাল আসতে হবে কিন্তু।

নিশ্চয় আসব।

লতু বললে, না এলে দেখবে মজা। আজকের হারের শোধ দিতে হবে, মনে থাকে যেন।

চলতে চলতে বললুম, নিশ্চয় আসব।

পথে একবুক জল ঠেলে চলতে চলতে মনে হতে লাগল, কাল নিশ্চয় এসে আজকের হারের শোধ নিতে হবে।

পরাজয়ের বন্ধনে আমার ও লতুর মধ্যে বন্ধুত্ব হ'ল।

সেদিন রাশিচক্রের কি সমাবেশ ছিল বলতে পারি না। সেই সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যের পর ভিজে বাড়িতে ফেরার অপরাধে প্রহার তো হ'লই না, বাবার কাছে কিছু জবাবদিহিও করতে হ'ল না। বরং তিনি আমার অবস্থা দেখে তক্ষুনি এক কাপ গরম চায়ের হুকুম দিয়ে দিলেন।

পরদিন অস্থিরকে নিয়ে লতুদের ওখানে গিয়ে হাজির হলুম। অস্থির ওদের অচেনা নয়। লতুর ছোট বোন সুজাতা ও ললিত অস্থিরের সঙ্গে পড়ত, তাকে পেয়ে ওরা ভয়ানক খুশি হয়ে উঠল। এর পর থেকে আমরা প্রায় রোজই বিকেলে লতুদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হতে লাগলুম।

ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরে বাবার হুকুমমত আমাদের তিন ভাইকে এক পাতা ইংরেজী, এক পাতা বাংলা ও এক পাতা সংস্কৃত হাতের লেখা লিখতে হ'ত। এ ছাড়া আবার দশটা ক'রে অঙ্ক কষতে হ'ত।

প্রতিদিন সকালবেলায় বাবাকে এইগুলো দেখাতে হ'ত। নিয়মমত এইগুলো দেখাতে না পারায় সপ্তাহের মধ্যে অন্তত একদিন আমাদের তিন ভাইয়ের কেউ না কেউ মার খেত। আমি আর অস্থির ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি লেখা-টেখাগুলো সেরে ঘুড়ি লাটাই নিয়ে ছাতে উঠে-যেতুম। আমাদের ছাত থেকে পাশের বাড়ির ছাত, তার পাশের বাড়ির ছাত ঘুরে সেই সন্ধ্যের সময় নেমে পড়তে বসতুম। ঘুড়ি ওড়ানোটা বাবা বিশেষ পছন্দ করতেন না, তবে রাস্তায় বেরুনোর চাইতে ভাল মনে ক'রে সেটা সহ্য করতেন মাত্র। এই ছাতের ওপরে ওঠা ও সেখান থেকে নেমে আসা পর্য্যন্ত সময়টুকু আমাদের আর খোঁজ হ'ত না।

আগেই বলেছি, ইস্কুলে যাওয়া ও বাড়ির কাজ ব্যতীত বাইরে বেরুনো আমাদের মানা ছিল। বিনা অনুমতিতে অন্য সময় রাস্তায় পা দেবার জো ছিল না। দিন কয়েক লতুদের ওখানে যেতে না যেতেই একদিন ধরা প'ড়ে বাবার কাছ থেকে বেশ কিছু নগদ পাওয়া গেল; আমরাও বুদ্ধি খাটিয়ে আর একটি উপায় আবিষ্কার ক'রে ফেললুম। আমরা ঘুড়ি লাটাই ও সেই সঙ্গে জামা ও জুতো নিয়ে ছাতে উঠে পাশের বাড়িতে লাটাই ঘুড়ি রেখে তাদের সিঁড়ি দিয়ে নেমে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতে লাগলুম। সন্ধ্যে হবার কিছু আগে ঐ প্রণালীতে আবার বাড়িতে ফিরে আসতুম।

কিছুদিন এইভাবে বেশ চলল। ওদের ওখানেই আমাদের লাটাই রেখে আসা গেল। চলছিল বেশ, কিন্তু একদিন আবার ধরা প'ড়ে গেলুম। উত্তম-মধ্যম তো হ'লই, সঙ্গে সঙ্গে ছাতে ওঠাও বন্ধ হয়ে গেল।

এই বাইরে বেরুনো নিয়ে আমাদের তিন ভাইকে বাল্যকালে সব-চেয়ে বেশি দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়েছে। বাবা মনে করতেন, ছেলেরা বাইরে গেলেই তাদের পরকালটি একেবারে ঝরঝরে হয়ে যাবে। ছেলেদের জগতে ইহকাল ব'লে যে একটা বড় জিনিস আছে এবং সেটি বাঁচাতে না পারলে পরকালটির ঝরঝরানি যে অনিবার্য্য, সে সত্য তখনকার দিনের অনেক অভিভাবকই স্বীকার করতেন না।

বাড়ির মধ্যে ছেলেরা যে নিরুদ্বিগ্নতার আওতায় বেড়ে ওঠে, সে রকম নিরুদ্বিগ্নতা ছেলেবেলায় কখনও উপভোগ করি নি। শুনতুম, লেখাপড়ার প্রতি বালকদের স্বাভাবিক অনুরাগ থাকে, কিন্তু আমার তা ছিল না; বরং বিরাগই ছিল। লেখাপড়া করাকে আমি ভীষণ, ভয়াল, ভয়ঙ্কর মনে করতুম। শৈশবে ইস্কুলে যাবার আগে বাড়িতে অক্ষরপরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ ও তৃতীয় ভাগ পর্য্যন্ত লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহই ছিল, কিন্তু ইস্কুলে ভর্ত্তি হবার পর লেখাপড়ার জন্যে যে দিন থেকে চাপ শুরু হ'ল, সেই দিন থেকে ধীরে ধীরে তার বিরুদ্ধে মনের মধ্যে বিতৃষ্ণাই সঞ্চিত হতে লাগল। ইস্কুলের বই ছাড়া যে-কোন বিষয়ের যে-কোনো বই আগ্রহের সঙ্গে পড়তুম ও তার মর্ম্মার্থ জানবার চেষ্টা করতুম। পড়ার বই ছাড়া অন্য বই পড়তে দেখলে বাবা যে তার মর্ম্মার্থ ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেবেন, সেই ভয়ে এই সুখও পেতুম ক্বচিৎ। এই সব কারণে বাড়ির বাইরেই আমি পেতুম ফুর্ত্তি, আর যদি সেখানে স্নেহ-ভালবাসার আকর্ষণ থাকত, তা হ'লে পেতুম স্বর্গ।

বাবার ধমক ও প্রহারের জন্যে হয়তো তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি বেড়ে যাওয়া উচিত ছিল। হয়তো মনে হওয়া উচিত ছিল যে, ভদ্রলোক আমাদের জন্যেই চাকরি করেন। সমস্ত দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর সন্ধ্যাবেলা ক্লান্ত শরীর নিয়েই আমাদের পড়াতে আরম্ভ ক'রেন। আমাদেরই ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্যে অপত্যস্নেহের প্রস্রবণকে রুদ্ধ ক'রে নিজের অন্তরকে নির্ম্মমভাবে পীড়ন ক'রে আমাদের এমন শাসন করেন যে, সন্তানবতী প্রতিবেশিনীরা ডাক ছেড়ে কাঁদতে থাকেন। হয়তো আরও অনেক কিছু মনে করা উচিত ছিল, কিন্তু আমার কল্পনা জীবনের ব্যবহারিক দিকটাকে সর্ব্বদাই উপেক্ষা করেছে, তাই প্রহারের পূর্ব্বে হ'ত ভয় এবং পরে হ'ত রাগ। রাগটা ছিল নিষ্ফল এবং প্রহার থেমে যাবার পরই ভয়টা যেত চ'লে। তাই বাড়ি থেকে বেরুনো বন্ধ হওয়ার অর্ডিন্যান্স জোরসে পাস হবার পরও লতুদের ওখানে যাওয়া বন্ধ করবার ইচ্ছা তো দূরের কথা, কোন্ সুযোগে আবার সেখানে রোজ হাজিরা দিতে পারা যায়, দিনরাত দুই ভাইয়ে তারই পরামর্শ চলতে লাগল।

পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে সুযোগও এসে গেল। এসে গেল বললে বোধ হয় ভুল হবে, সুযোগ ক'রে নেওয়া গেল। ছেলেবেলায় সুযোগ জুটিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে আমার ও অস্থিরের বুদ্ধি খেলত অদ্ভুত ও চমকপ্রদ। এ বিষয়ে অস্থির আমার চাইতে ঢের বেশি ওস্তাদ ছিল। ভাগ্যে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রতিভার এই দিকটা ম্লান হয়ে এসেছিল, নইলে কোথাকার জল যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াত, তা ঠিক বলা যায় না। সুযোগকে কি ক'রে টেনে নিয়ে এসে কাজে লাগাতুম, সেই কথাটা বলি।

আমাদের দরিদ্রের সংসার হ'লেও চাকরবাকর, ঝি, আশ্রিত প্রতিপাল্যের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। এ ছাড়া বাবার ও আমাদের তিন ভাইয়ের কুকুরের শখ থাকায় বিলাতী অভিজাত-সম্প্রদায়ের গুটি পাঁচ-ছয় সারমেয়নন্দন আমাদের বাড়িতে বিশেষ সমারোহের সঙ্গে পালিত হ'ত। তা ছাড়া মার নিজের ছিল ছাগলের শখ। বাড়ির একতলা থেকে তেতলা অবধি গুটি বারো-তেরো ছাগল অবাধে বিচরণ করত। এই মানুষ, কুকুর ও ছাগলের প্রত্যেকটিকেই মা অতি যত্নে পালন করতেন। এদের প্রত্যেকে কে কি খেতে ভালবাসে, কার কি সহ্য হয় না, সব তাঁর একেবারে নখদর্পণে থাকত। বিশেষ ক'রে জানোয়ারদের তদারক সম্বন্ধে তাঁর নজর ছিল খুবই কড়া। প্রত্যেকে ঠিক সময়ে তার নির্দ্ধারিত খাদ্য পাচ্ছে কি না, তা তিনি নিজে দেখাশোনা করতেন। জানোয়ারদের প্রতি মার এই দুর্ব্বলতাটা আমরা নিজেদের সুযোগে খাটিয়ে নিলুম।

দুই ভাই বিমর্ষ হয়ে রকে ব'সে আছি, সন্ধ্যে হয় হয়, এইবার পড়তে বসতে হবে, এমন সময় ঘাসওয়ালা এল ছাগলদের ঘাস নিয়ে। ঘাসওয়ালাকে দেখেই মুহূর্ত্তের মধ্যে আমাদের প্ল্যান তৈরি হ'য়ে গেল। তাকে ব'লে দিলুম, মা ব'লে দিয়েছেন, আজ থেকে আর ঘাস নেওয়া হবে না।

আমাদের কথা শুনে সে বেচারীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। এমন বাঁধা খদ্দের হঠাৎ কি কারণে বিগড়ে গেল ভেবে সে হতভম্বের মত আমাদের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

আমরা বললুম, সব ছাগল বিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। মা বলেছেন, ছাগল বড় অপয়া জাত।

ঘাসওয়ালা বেচারী খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে আবার ঘাসের বোঝা মাথায় তুলে নিয়ে চ'লে গেল দেখে আমরা গিয়ে পড়তে বসলুম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মা এসে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ রে, ঘাস দিয়ে গিয়েছে ?

কই, না।

আবার কিছুক্ষণ পরে মা বললেন, দেখ তো, ঘাস দিয়ে গিয়েছে কি না। ও আবার মাঝে মাঝে কারুকে না জানিয়েই ঘাসের বোঝা ফেলে দিয়ে চ'লে যায়।

আমি উঠে রক অবধি গিয়ে ফিরে এসে বসলুম, ঘাস দেয় নি মা।

মা সেই যে বকতে শুরু করলেন রাত্রি এগারোটায় গিয়ে তা থামল।

প্ল্যান আগে থাকতেই ঠিক করা ছিল। পরদিন ইস্কুল থেকে এসেই শুনলুম, মা ভীষণ চেঁচামেচি করছেন। রাত্রে ঘাস খেতে পায় নি ব'লে ছাগলেরা দুধ দিচ্ছে না। আমরা দুজনেও ছাগলের দুঃখে ললিত-গলিত হয়ে ঘাসওয়ালার দায়িত্বজ্ঞানহীনতা সম্বন্ধে অনেক রকম মন্তব্য করতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। অনেক বকাবকির পর ঠিক হ'ল যে, আমরা দুজনে রোজ ঘাস নিয়ে আসব। এতে আমাদের কষ্ট হবে বটে, কিন্তু সেজন্যে ছাগলগুলোকে কষ্ট দেওয়া কিছু নয়। আহা, অবোলা জানোয়ার!

পরদিন থেকে আমরা ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরে হাতের লেখা ইত্যাদি কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন ক'রে ঘাস আনতে যেতে লাগলুম। ঘাস আনবার প্রোগ্রামটা ছিল এই, বাড়ি থেকে বেরিয়ে দৌড়ে লতুদের বাড়ি যাওয়া। সেখানে কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে ও খেলা ক'রে মিনিট দশ পনেরো বেলা থাকতে থাকতে বেরিয়ে পড়তুম ঘাস আনতে। তেরো আঁটি ভিজে নোনাঘাস দুই ভাইয়ে সমান ভাগ ক'রে নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে ফিরতুম বাড়িতে।

লতুদের বাড়ির সবার সঙ্গে আমাদের দুজনের এত ভাব হয়ে গিয়েছিল যে, একদিন না যেতে পারলে সেখানে একেবারে হাহাকার

উপস্থিত হ'ত। পরদিন তাদের বাবা মা থেকে আরম্ভ ক'রে চাকরদের পর্য্যন্ত অনুপস্থিতির জন্যে কৈফিয়ৎ দিতে হ'ত।

মাস কয়েক বেশ চলল। একদিন ইস্কুল থেকে এসে শুনলুম, ঘাসওয়ালা ব্যাটা দুপুরবেলায় এসে মার সঙ্গে দেখা ক'রে আবার ঘাস দেবার ব্যবস্থা ক'রে গেছে।

হায় ভগবান! এত দুঃখও তোমার ভাণ্ডারে আছে! সেদিনও কিন্তু নিয়মিত সময়ে লতুদের বাড়ি গিয়ে হাজির হলুম। সেখানে সমস্তক্ষণটাই ঘাসওয়ালার বিশ্বাসঘাতকতা মনের মধ্যে খোঁচা দিতে লাগল। আবার নতুন সুযোগ আহরণের পরামর্শ শুরু হয়ে গেল।

সেদিন সন্ধ্যের সময় দু-একটা চড় ও কানৌটি দিয়েই বাবা ক্ষান্ত হলেন। পড়তে ব'সে যাওয়া গেল।

দিন দুই আর লতুদের বাড়িমুখো হলুম না। তৃতীয় দিন অস্থির সেখানে গেল, আমি বাড়িতে রইলুম। বাবা আপিস থেকে ফেরবার আগেই সে ফিরে এল। পরের দিন আমি গেলুম। এই রকম চলতে লাগল।

একদিন অস্থির ওখান থেকে ফিরে এসে বললে, সুজাতার অসুখ করেছে।

পরদিন দুই ভাইয়ে একসঙ্গে লতুদের ওখানে চ'লে গেলুম। আমাদের দুজনকে একসঙ্গে পেয়ে তাদের ভাইবোনদের মধ্যে খুশির হুল্লোড় লেগে গেল। দেখলুম, সুজাতা শুয়ে রয়েছে, তার গলায় একটা ফ্ল্যানেল বাঁধা, গলায় ভয়ানক ব্যথা। জ্বর রয়েছে, বুকেও খুব বেদনা।

আমরা তাকে ঘিরে বসলুম। আমাদের পেয়ে সুজাতাও তার রোগ-যন্ত্রণা ভুলে গেল। কয়েকদিন পরে বেশ লাগতে লাগল। আমরা ঠিক করেছিলুম, বাবা বাড়ি ফেরবার আগেই চ'লে আসব, কিন্তু সুজাতা কিছুতেই উঠতে দেয় না। বাবা বাড়ি ফেরবার আগেই আমাদের যাওয়া যে বিশেষ প্রয়োজন, সে কথা সেখানে প্রকাশ করতে পারি না, ওদিকে লতু ও সুজাতা কিছুতেই ছাড়ে না। শেষে অনেক কষ্টে কাল তাড়াতাড়ি আসবার প্রতিজ্ঞা ক'রে সেদিন পালিয়ে এলুম।

বাড়িতে ফিরে দেখি যে, বাবা এসে গিয়েছেন। বার কয়েক খোঁজও

হয়েছিল। বেশ কিছু প্রহার সেবান্তে পাঠে নিযুক্ত হওয়া গেল। বাবা বললেন, তোমাদের বাইরে-যাওয়া রোগ আমি ছাড়াতে পারি কি না একবার দেখব।

পরের দিন সাহস ক'রে আর লতুদের ওখানে যেতে পারলুম না। দিন দুই পরে সেই পুরানো কায়দায় অস্থির সেখান থেকে চট ক'রে একবার ঘুরে এল। অস্থির বললে, সুজাতার নিমোনিয়া হয়েছে, কথা বলতে পারছে না।

রাতে ঘুমোবার আগে খালি সুজাতার কথাই মনে হতে লাগল। সুজাতা কি ভাল হবে? কতদিনে সে একেবারে সেরে উঠবে? নীলরতন সরকার যখন দেখছেন, তখন আর কোনও ভাবনা নেই। আজকাল নিমোনিয়ার অনেক ভাল ভাল ওষুধ বেরিয়েছে, এই ভাবতে ভাবতে অনেক রাতে ঘুমিয়ে পড়লুম। সকালে ঘুম ভাঙতেই প্রথমে সুজাতার কথা মনে পড়ল।

সারাদিন দারুণ উৎকণ্ঠায় কাটিয়ে বিকেলে অস্থিরকে বাড়িতে রেখে সুজাতাদের বাড়ি চ'লে গেলুম।

রোগিণীর ঘরের মধ্যে ঢুকলুম। একটা তীব্র ঝাঁজালো গন্ধে ঘর ভরপূর হয়ে রয়েছে। সন্তর্পণে সুজাতার কাছে এগিয়ে গেলুম, তার দুই চোখ অর্দ্ধনিমীলিত, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। লতু তার মাথার কাছে ব'সে, মা এক পাশে ব'সে আছেন। আমি কাছে যেতেই তিনি মুখ তুলে বললেন, কে, স্থবির? আয়, এদিকে ব'স।

মায়ের দুই চক্ষু অশ্রুতে পরিপূর্ণ।

আমি ধীরে ধীরে লতুর পাশে বসলুম। মা বললেন, কালও তোদের নাম করেছে কতবার।

সুজাতার দিকে চাইলুম। কিন্তু বেশিক্ষণ চেয়ে থাকতে পারলুম না। কি এক অস্বাভাবিক ধরনের নিশ্বাস টানছিল সে। উজ্জ্বল গৌর তার বর্ণের ওপর কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। জেগে আছে কি ঘুমিয়েছে, তা বুঝতে পারলুম না। সুজাতার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে লতুর দিকে চাইলুম। রহস্যময় দৃষ্টিতে সে আমার দিকে অনিমেষ চেয়ে রইল। গভীর সে দৃষ্টির মধ্যে কি মৃত্যু লুকিয়েছিল? তার দিকেও

চেয়ে থাকতে পারলুম না, মায়ের দিকে চাইলুম। তাঁর চোখে চোখ পড়তেই তিনি আমার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, কেমন আছিস বাবা? চেহারাটা তো ভাল দেখাচ্ছে না!

বাবা ফেরবার আগেই যে বাড়ি পৌঁছতে হবে সে জ্ঞান তখনও হারাই নি, তাই মিথ্যে ক'রেই বললুম, শরীরটা তেমন ভাল নেই।

মা বললেন, তা হ'লে তাড়াতাড়ি বাড়ি যা।

কিছুক্ষণ ব'সেই বাড়ি চ'লে এলুম।

পরের দিন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আধ মাইল ঘুরে ইস্কুলে যাবার আগে সুজাতাকে দেখতে গেলুম। তাকে তখন গ্যাস দেওয়া হচ্ছে; শুনলুম, সে গ্যাস নিতে পারছে না। ঘরের মধ্যে ঢুকতে আর সাহস হ'ল না, বাইরে দাঁড়িয়ে রইলুম। কিন্তু বেশিক্ষণ সেখানে থাকবারও উপায় ছিল না, তাড়াতাড়ি যেতে হবে, নইলে ইস্কুল ব'সে যাবে। লতু ব'লে দিলে, তাড়াতাড়ি আসিস।

ইস্কুল থেকে ফিরে নাকে-মুখে চাট্টি গুঁজে দুই ভাই ছুটলুম সুজাতাকে দেখতে। তাদের গলির মোড়ে পৌঁছেই চীৎকার শুনে বুঝতে পারলুম, সুজাতা চ'লে গেছে।

সেইখান থেকেই কাঁদতে কাঁদতে ছুটলুম তাদের বাড়িতে। বাড়ির ভেতরের সে হৃদয়বিদারক দৃশ্যের খুঁটিনাটির কথা আজ আর সমস্ত মনে নেই। পূজোবাড়িতে শাঁখ, ঘণ্টা, জয়ঢাক, কাঁসর মিলিয়ে যে অখণ্ড আওয়াজ বাতাসে গুমরোতে থাকে, তেমনই নানা কণ্ঠের চীৎকারোত্থিত এক অখণ্ড আওয়াজ নিষ্ফল অভিযোগে সেখানে আর্ত্তনাদ করছিল। কত পুরুষ ও নারী যে সেখানে এসে জমেছে, তাদের এতদিন দেখি নি। আত্মীয় অনাত্মীয় সকলেই হাহাকার করছে—সুজাতা চ'লে গেছে।

মৃতদেহ যে ঘরে সে ঘরে মেয়েদের ভিড়। তাঁরা সকলেই কাঁদছেন—কেউবা চীৎকার ক'রে, কেউবা নীরবে। লতু ও তার বাবা ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করছিলেন, আমাদের দেখে তাঁরা দুজনেই চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলেন। আমরা দুজনে একেবারে দৌড়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলুম।

দেখলুম, সুজাতার মৃতদেহ খাটের ওপরে শায়িত। তাকে স্নান করিয়ে নতুন একখানা শাড়ি পরানো হয়েছে। রুক্ষ চুলগুলিকে যতদূর সম্ভব গুছিয়ে আঁচড়ানো। কৈশোরের চাপল্য ও জীবনের চাঞ্চল্যের চিহ্ন সে মুখে নেই, এতদিন রোগযন্ত্রণার যে ছায়া তার মুখে দেখেছিলুম তা একেবারে অপসারিত হয়ে গিয়েছে। শান্ত সৌম্য সে মুখমণ্ডল, বুকের ওপরে দুটি হাত জোড় করা, সে মূর্ত্তি আমার মনে একাধারে শোক ও শ্রদ্ধার প্রস্রবণ ছুটিয়ে দিলে। মনে হ'ল, আমাদের এই অতি নিকট বন্ধু পরম শান্তিতে মৃত্যুর কোলে আত্মসমর্পণ করেছে। সে যেন আর আমাদের নয়, আমাদের চাইতে অনেক দূরে অনেক উঁচুতে চ'লে গেছে। সংসারের প্রতি দারুণ অভিমানে তার মুখে এই যে গাম্ভীর্য্য ফুটে উঠেছে, কোন কিছুতেই আর তা ভাঙবে না।

অস্থির ঘরের মধ্যে ঢুকে কিছুক্ষণ সুজাতার মৃতদেহের প্রতি শঙ্কিত বিস্ময়ে চেয়ে থেকে চীৎকার ক'রে তার বুকের ওপর আছড়ে পড়ল।

মৃতদেহ ঘিরে ব'সে যে সব মহিলারা এতক্ষণ কান্নাকাটি করছিলেন, হঠাৎ অস্থিরের এই কাণ্ড দেখে তাঁরা প্রথমে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন, তারপরে সেই শোকাশ্রুপ্লুত চোখগুলিতে ফুটে উঠতে লাগল বিশ্বজোড়া কৌতূহল—কে এই ছেলেটি?

অস্থিরের চীৎকার শুনে সুজাতার বাবা ঘরের মধ্যে এসে তাকে কোলে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

লতুদের বাড়িতে তাদের এক আধপাগলা মামা থাকত। আধপাগলা হ'লে কি হবে, সেই তাদের সংসারের বিষয়-আশয় থেকে আরম্ভ ক'রে সব দেখাশোনা করত। মামা সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে সুজাতার মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে গেল। এগারো বছরের ললিতও তাদের সঙ্গে গেল, কারুর মানা সে শুনলে না।

সেদিনকার বিকেলের একখানি মধুর ছবি আজও আমার মনের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে, স্মৃতির পরশ লাগলেই সেটি ঝকঝক ক'রে ওঠে। দোতলার খোলা ছাতে একখানা শতরঞ্চি পাতা। মধ্যিখানে লতুর বাবা অস্থিরকে কোলে নিয়ে ব'সে আছেন। অস্থির ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, আর তিনি মধ্যে মধ্যে তাকে বুকের মধ্যে চেপে

ধরছেন। এক ধারে লতুর মা ব'সে আছেন, তাঁর দক্ষিণ উরুতে মাথা রেখে লতু শুয়ে আছে, বাঁ পাশে আমি ব'সে, মা ধীরে ধীরে বাঁ হাতখানি আমার পিঠে বুলোচ্ছেন। শোকের আগুনে আমাদের বয়েস ও সাংসারিক অবস্থার তারতম্য ঘুচে গেছে। সকলেই আত্মহারা, সবারই মন একই কেন্দ্রের চারিদিকে ঘুরছে। আমাদের চারিদিকে বাড়ির আত্মীয়, বন্ধু ও প্রতিবেশীর দল, নারী ও পুরুষ—কেউবা ব'সে, কেউবা দাঁড়িয়ে।

বেলা প'ড়ে আসার সঙ্গে একে একে সকলে বিদায় নিতে লাগলেন। আমাদের চারিদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠতে লাগল, সেই অন্ধকারে আমাদের চোখে ঝরতে লাগল অশ্রু আর মন ফিরতে লাগল অমর্ত্ত্যলোকের সন্ধানে।

সময়ের জ্ঞান ছিল না। হঠাৎ লতুর মা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে বললেন, স্থবির, অস্থির, এবার বাড়ি যাও বাবা। তাঁরা আবার ভাববেন।

লতুদের একজন চাকর চলল আমাদের বাড়ি অবধি পৌঁছে দিতে। বাড়ির দিকে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই আমরা চাকরকে বিদায় দিয়ে রাস্তার ধারে গরু-ঘোড়ার জল খাবার জন্যে যে লোহার চৌবাচ্চা তখন থাকত, তারই একটাতে বেশ ক'রে চোখ-মুখ ধুয়ে ভয়ে ভয়ে অত্যন্ত সন্তর্পণে বাড়িতে ঢুকলুম। পথে ঠিক হ'ল যে, বলা হবে, গড়ের মাঠে খেলা দেখতে গিয়ে ফেরবার সময় পথ হারিয়ে গিয়েছিলুম।

পড়ার ঘরের কাছে গিয়ে দেখলুম, বাতি জ্বলছে বটে, কিন্তু সেখানে বাবাও নেই, দাদাও নেই। তাড়াতাড়ি নিজেদের ঘরে গিয়ে জামা ছেড়ে বই নিয়ে পড়তে যাচ্ছি, এমন সময় মা এসে বললেন, পোড়ারমুখোরা, গিয়েছিলে কোথায়? আজ যে খুন ক'রে ফেলবে।

শুনলুম, দাদাকে নিয়ে বাবা বেরিয়েছেন আমাদের খোঁজে।

পড়তে বসলুম। অচিরেই সাংঘাতিক রকমের একটি ফাঁড়া রয়েছে জেনেও মনের মধ্যে কোনও ত্রাসই হচ্ছিল না। নিদারুণ মানসিক ক্লান্তি সারা দেহমনকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলতে লাগল।

মিনিট পনরো পরেই বাবা দাদাকে নিয়ে ফিরে এলেন। মিনিট

পাঁচেক জিজ্ঞাসাবাদের পরই প্রহার শুরু হ'ল, প্রহারের সরঞ্জাম আগে থাকতেই ঠিক করা ছিল।

সেদিনকার প্রহারের বিবরণ আর দোব না। শুধু এইটুকু বললেই হবে যে, উত্থানশক্তিবিরহিত অবস্থায় আমরা মেঝেতে প'ড়ে গোঁ-গোঁ করছি, আর বাবা ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে আমাদের হত্যা করবার জন্যে বঁটি খুঁজছেন, এমন সময় কয়েকজন প্রতিবেশিনী আমাদের বাড়িতে ঢুকে মাকে গালাগালি করতে আরম্ভ করায় তিনি বাবাকে নিরস্ত করলেন।

চাকরেরা তুলে নিয়ে আমাদের বিছানায় শুইয়ে বাতি নিবিয়ে দিয়ে চ'লে গেল। আমাদের চোখ দিয়ে নিঃশব্দে অশ্রু ঝ'রে পড়তে লাগল বালিশে। পিতা ও পরম পিতা উভয়ের অত্যাচারে জর্জ্জরিত সেই দুটি বালককে সুপ্তি এসে মুক্তি দিলে।

ক্রমশ

"মহাস্থবির"

বাংলা প্রবাদ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সুতরাং মরদের মরদের বলিহারি প্রায়ই শোনা যায়—

মরদ চলেছে পথে, দুব্বার কোস্তা হাতে॥

মরদ বড় তেজী, ভাড়া করেছে বেঁজি॥

মরদ বড় ভারী, তার ভেড়া পাগাড়ি॥

মরদ বড় হেংগা, তার শনকাঠিখান ঠেংগা॥

মরদ বড় মান, তার ছেঁড়া দুটো কান॥

তিনি আছেন রাজপথে, দুব্বো ঘাসের কোঁৎকা হাতে॥

গজপৃষ্ঠে যে বা যায়, ফেউ দেখে সে ডরায়॥

মরদের নেই সীমে, রথ দিয়েছে নিমে॥

জন্মের মধ্যে কর্ম্ম নিমুর চৈত্র মাসের রথ॥

বড় বড় বানরের বড় বড় পেট, লঙ্কা ডিঙোতে সব মাথা করে হেঁট॥

মরদ বটি, চিঁড়ে কুটি, যখন যেমন তখন তেমন॥

একশ কোঁড়া গুণে খান, ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান॥

কচুর বেটা ঘেঁচু, বড় বাড়েন ত মান॥

আমার নাম রণরঘু, ভিটাতে চরাই ঘুঘু॥

আমার নাম নিতাই, এক খাই এক থিতাই॥

পূর্ণিমার চাঁদ দেখে তেঁতুল হ'ল বঙ্ক,
গেঁড়ি গুগুলি বলে এরা—আমরা শঙ্খ।

ডেংরা কাক বলে—আমি করব একাদশী,
লেজকাটা কুকুর বলে—যাব বারাণসী॥

পরচ্ছিদ্রের অন্বেষণ মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা, কিন্তু আত্মচ্ছিদ্রের কথা মনে থাকে না—

ছুঁচ বলে—চালুনি তোর পোঁদ কেন ছেঁদা।

আপন দোষ দেখেন না যার সর্ব্বাঙ্গেই বেঁধা॥

পরের দোষ আকাশ জোড়া, আপন দোষ ছোটো।

চালুনি বলে—ধুচনি ভায়া, তুমি বড় ফুটো॥

চালুনির পোঁদ ঝর ঝর করে, চালুনি ছুঁচের বিচার করে॥

ওল বলে—মানকচু ভায়া, তুমি নাকি লাগ॥

গুয়ে বলে—গোবরদাদা, তোর গায়ে বড় গন্ধ॥

রসুন বলে—কাঁচকলা ভাই, তোর বড় খোসা॥

আনারস বলে—কাঁঠাল ভাই, তোর গা বড় খস্‌খসে॥

পেঁচা পিঁপড়েকে বলে—সর লো সর, থেবড়ামুখী॥

আত্মচ্ছিদ্র ন জানাতি, পরচ্ছিদ্র পদে পদে॥

পরের ছিদ্র বেল, নিজের ছিদ্র সরষে॥

ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে, সবার একদিন আছে শেষে॥

আজ খেয়ে নেড়া নাচে, কালকে গোবিন্দ আছে॥

সুতরাং, আপন ও পর এই পার্থক্যের প্রতি মানুষের মন খুবই সজাগ। এ সম্বন্ধে বহুসংখ্যক প্রবাদ আছে, তাহার কতকগুলি এখানে চয়ন করা যাইতে পারে—

আপনি রাঁধি, আপনি খাই, আপনি তার বলিহারি যাই॥

আপনার বেলা আঁটাআঁটি, পরের বেলা দাঁত-কপাটি॥

আপন বেলা চাপন-চোপন, পরের বেলা ঝুরঝুরে মাপন॥

পরের ভিটায় জরিপ এলে—মাপ রে মাপ।

নিজের ভিটায় জরিপ এলে—বাপ রে বাপ॥

আপনার বেলায় ছ কড়ায় গণ্ডা, পরের বেলায় তিন কড়ায় গণ্ডা॥

আপনারটিতে খোদার দোহাই, পরেরটিতে আন্ খাই॥

তোরে, না, মোরে, প্রতি ঘরে ঘরে॥
আপন চোখে সোনা বর্ষে, পরের চোখে রূপা।
যত লোকে কথা কয় গাপা আর গপ্পা॥
আপন ছাগল বেঁধে রাখি, পরের ছাগল ছেড়ে দিই॥
আপন ঘোল কেউ টক বলে না॥
আপন কোলে ঝোল সবাই টানে॥
আপন কোটে পাই, চিঁড়ে কুটে খাই॥
আপনি বড় ভালো, তাই পরকে বলে কালো॥
আপন বগলে গন্ধ নেই, পরের বগলে গন্ধ॥
আপনার পানে চায় না শালী, পরকে বলে টেঁবো-গালী॥
আপনার হাতে পড়লে হাঁড়ি, ভাত রেখে আমানি কাড়ি॥
মোর ঢাকা থাক্, তোর বিকিয়ে যাক্॥
কাঁঠালটি আমায় দাও, বীচি গুণে কড়ি নাও॥
পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা॥
পরের মাথায় হাত বুলান॥
পরের গোয়ালে গোদান॥
পাসরে পাসরে মরি, পরের হাঁড়ির ভাত নিয়ে নিজের হাঁড়ি ভরি॥
আপনার কথা পাঁচ কাহন॥
পরের মাথা কেটে নাপিত॥
পরের মাথায় দিয়ে হাত, কিরা করে নির্ঘাত॥
পরের জিনিস পায়, হেগো পোঁদে খায়॥
পরের ধন, আপন ছালা, যত ইচ্ছা ভরে ফেলা॥
পরের ভাত, আপন হাত॥
আপনি নেঙাই, পরকে ভেঙাই॥
আমার নাম যমুনাদাসী, পরের খেতে ভালবাসি।
পরকে দিতে জ্বরে গা', পরের নিতে সরে গা'॥
আমার দইয়ের এমনি গুণ, এক সের দইয়ে তিন সের নুন॥
আপন ঘরের ধোঁয়ায় নিজের চোখ কাণা॥
পরের ধনে পোদ্দারগিরি, লোকে বলে লক্ষ্মীশ্বরী॥
পরের ধনে বরের বাপ॥
পরের পিঠে বড় মিঠে॥
পরের ভাতে কুকুর পোষা॥
পরের কাপড়ে ধোপার নাট॥

পরের ঘোল খাবার লোভে নিজে গোঁফ কামান॥
পরের ঘি পেলে, প্রদীপ দেয় মেলে॥
পরের ডাল, পরের চাল, নন্দে করেন বিয়ে॥
পরের ছেলে ছেলেটা, খায় দেখ এতটা, বেড়ায় যেন বাঁদরটা।
নিজের ছেলে ছেলেটি, খায় শুধু এতটি, বেড়ায় যেন লাটিমটি॥
পরের ফোড়া, ঢেঁকি দিয়ে গালা॥
পরের ধন, আপনার পরমায়ু, কেউ অল্প ক'রে দেখে না॥
পরের লেজে পা পড়লে তুলোপানা ঠেকে।
নিজের লেজে পা পড়লে কেঁক করে ডাকে॥

কিন্তু পর আপন হয় না, পরকে বিশ্বাস নাই, পর-প্রত্যাশী হওয়া বা পরহিংসা বিড়ম্বনামাত্র—

পর আর পরমেশ্বর॥
পরচিত্ত অন্ধকার॥
পরের মন, আঁধার কোণ॥
আপন বুদ্ধিতে ফকির হই, পরবুদ্ধিতে বাদশা নই॥
আপন বুদ্ধিতে তর, পরবুদ্ধিতে মর॥
নিজের বুদ্ধিতে ভাত, পরের বুদ্ধিতে হাভাত॥
পর-প্রত্যাশী নর, উপোস ক'রে মর॥
পর-প্রত্যাশী ধন, পর নিয়ে গমন॥
পর রেখে ঘর নষ্ট॥
পরে দেবে চেয়ে, পেট ভরবে খেয়ে?
পরের কথায় লাথি চড়, নিজের কথায় ভাত-কাপড়॥
পরের ঘর ঢুকতে ডর, নিজের ঘর হেগে ভর॥
পরের ছেলে খায়, আর পথ পানে চায়॥
পরের সোনা দিও না কানে, কেড়ে নেবে হেঁচকা টানে॥
পরের দুধে দিয়ে ফুঁ, পুড়িয়ে এলেন আপন মু'॥
পরের দেখে তোলে হাই, যা ছিল তাও নাই॥
নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ॥
নিজে ম'রে জ্ঞাতির হাঁড়ি ফেলান॥
পরের হাতে ধন, পেতে অনেকক্ষণ॥
পরের মুখে ঝাল খাওয়া॥
আপন চরকায় তেল দাও॥
আপন ঘরে সবাই রাজা॥

আপন কোটে কুকুরও বড়॥
আপনার মান আপনি রাখ, কাটা কান চুল দিয়ে ঢাক॥
আপন মুখ আপনি দেখ॥
আপনার কামার, আপনার খাঁড়া, যেখানে পড়াবি, সেইখানেই পড়া॥
ছিঁড়ি কুটি নিজের সুতে, মারি ধরি নিজের পুতে॥
আপন বোন ভাত পায় না, শালীর তরে মোণ্ডা॥
আপনার আপনি, ডোর আর কপনি॥
আপনার হাত জগন্নাথ, পরের হাত এঁটোপাত॥
আপন ধন পরকে দিয়ে, দৈবকী বেড়ায় মাথায় হাত দিয়ে॥
আপন পাঁজি দিয়ে পরকে দৈবজ্ঞ বেড়ায় পথে-পথে॥
আপনি বাঁচলে বাপের নাম।
নিজে আগে সামাল কর, পরে গিয়ে পরকে ধর॥
নিজের আছে ত খাও, নইলে ফেলফেলিয়ে চাও॥
সময় গুণে আপ্ত পর, খোঁড়া গাধার ঘোড়ার দর॥
ফেল কড়ি, মাখ তেল॥
দয়া আছে, মায়া আছে, গলা ধরে কাঁদি।
আধ পয়সার আটটি কলা, পরাণ গেলেও না দি'॥
চাচাই বল, কাকাই বল, কলাটি পাঁচ কড়া॥
ফেল কড়ি, ত দেব বাঁড়ি॥

ভালবাসার বিচিত্র পদ্ধতি ও নারী জাতির ভালমন্দ সম্বন্ধে প্রবাদের অভাব নাই, কিন্তু অধিকাংশরই বিদ্রূপ তীক্ষ্ম ও তিক্ত। দাম্পত্য-প্রীতি ও দাম্পত্য প্রহসনের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে, এখন প্রেম সম্বন্ধে সাধারণ কয়েকটি প্রবাদ তুলিয়া দেওয়া হইল—

যার ইষ্টি তার মিষ্টি।
চোখে চোখে যতক্ষণ, প্রাণ পোড়ে ততক্ষণ॥
কাছে আছে যতক্ষণ, আমার আমার ততক্ষণ।
পথে গেলে পোড়ে মন, বাড়ি গেলে ঢন্‌ঢন্‌॥
ভালবাসার এমনি গুণ, পানের সঙ্গে যেমন চুণ।
বেশি হ'লে পোড়ে গাল, কম হলে লাগে ঝাল॥
পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ, সে পিরীতে কিবা কাজ॥
মনেরে পাথর করে যেই, পিরীত-পথের পথিক সেই॥
যার সঙ্গে যার মজে মন, কিবা হাড়ী কিবা ডোম।
যারে যেমন গড়েছে বিধি, সেই ভাতারের পরম নিধি॥

পিরীতের নৌকা পাহাড়েও চলে॥
চেতনেতে অচেতন, পিরীতে যার টানে মন॥
পিরীত যখন জোটে, ফুট্‌কলাই ফোটে।
পিরীত যখন ছোটে, ঢেঁকিতে ফেলে কোটে॥
পিরীত আর গীত, জোরের কাজ নয়॥
পিরীত থাকলে তেঁতুলপাতায় দু'জন শোয়া যায়।
অপিরীতে মানপাতায় জায়গা না কুলায়॥
পিরীত, আগুন, কাস—রয় না অপ্রকাশ॥
পিরীতের কত খেলা বুঝে ওঠা ভার।
চুলের সাঁকোয় তুলে দিয়ে করল সাগর পার॥
পিরীতের পেত্নীও ভাল॥
মিষ্টির মধু, ইষ্টির বধু॥
অতিভাব যেখানে, নিত্যি যাবে সেখানে।
যদি যাবে নিত্যি, ঘটবে একটা কীর্ত্তি॥
যেখানে কম জোর, সেখানে ছেঁড়ে ডোর॥
যেখানে নেই আসল মায়া, সেইখানেই বেশি আহা॥
পুরুষ আর স্ত্রী, আগুন আর ঘি॥
ভাবে ডগ্‌মগ্‌ তেলাকুচো, হেসে মরে যত কালো ছুঁচো॥
যেখানে গুড়, সেখানে পিঁপড়ে॥
মধুপান করতে পারি, মাছির কামড় সইতে নারি॥

কিন্তু যাঁহারা পুরুষের ব্যাখ্যা করেন ও বলেন—'পুরুষের ভালবাসা, মোল্লার মুরগী পোষা'—সেই মেয়েদের স্বরূপ ও গুণ কীর্তন অনেক সময় মেয়েদেরই মুখে, কিছু কম যায় না, বরং মাঝে মাঝে ভব্যতার বাহিরে চলিয়া যায়—

গড় করি মেয়েদের পায়, ধানভানা চাল ঠাকুরে খায়॥
নারীর বল, চোখের জল॥
তুফানে যে হাল ধরে না, সেই বা কেমন নেয়ে।
পড়লে কথা বুঝতে নারে, সেই বা কেমন মেয়ে॥
ধার বোঝে না, চর বোঝে না, সেই বা কেমন নেয়ে।
টিপ বোঝে না, টাপ বোঝে না, সেই বা কেমন মেয়ে॥
তিন মাইয়া যেখানে, কাজীর বিচার সেখানে॥
নদী, নারী, শৃঙ্গধারী—এ তিনে না বিশ্বাস করি॥
সিঁড়ি তুমি কার? যে যায় তার॥

ঝাল, টক আর কড়া ভাতার॥
ছাঁদন-দড়ি গোদা-বাড়ি, যে আমার আমি তারি॥
নাও, ঘোড়া, নারী—যে চড়ে তারি॥
মেয়ে চিনি হাসে, পুরুষ চিনি কাসে॥
যার হাতে খাইনি, সে বড় রাঁধুনী।
যার সঙ্গে ঘর করিনি, সে বড় ঘরণী॥
গরবের গরবিনী, এই পরেন নাকে নথ, এই পরেন কানে॥
সতী হ'লি কবে? না, সে মরেছে যবে॥
জন্ম গেল ছেলে খেয়ে, আজ বলে ডান॥
সব জন্তু মোট বয়, ধরা পড়েছে গাধা।
সবাই সতী কবলায়, ধরা পড়েছে রাধা॥
সবে মিলে খাবে ননী, বাঁধা পড়বে নীলমণি॥
শনিবারেও হাট, রবিবারেও হাট।
সহজে রাধা কলঙ্কিনী, বুক চিতিয়ে হাঁট॥
মাগ ভাতারে দেখা নেই, ষষ্ঠীপুজোর ধুম॥
যতই কর শিব-সাধনা, কলঙ্কিনী নাম যাবে না॥
নষ্টনারীর পরিচয়, বুদ্ধিগুণে সতী হয়॥
মাছ খায় না যতনী, পাতে তিনটে খলসে।
কি করে না যতনী, কোণে তিনটে মিনসে॥
সকল ব্রত করলে যশী, বাকি আছে ভীম একাদশী॥
সকল পাখীতে মাছ খায়, মাছরাঙার কলঙ্ক॥
বার করলাম, ব্রত করলাম, স্বর্গে দিলাম বাতি।
যুবকালে রঙ্গ করে বৃদ্ধকালে সতী॥
বেরিয়ে এলাম, বেশ্যা হলাম, কুল করলাম ক্ষয়।
এখন কিনা ভাতার শালা ধমকে কথা কয়॥
বারো কাঁদি নারকেল, তের কাঁদি কলা।
আজ আমাদের রাণীর উপবাসের পালা॥
ভবী হ'ল বনবাসী, বাসনকোসন একরাশি॥
ভাবুনী লো ভাবুনী, তোর ঘর পুড়ে যায়।
যাকগে মোর ঘর পুড়ে, মোর ভাবন বয়ে যায়॥
মিষ্টি লাগল ছাঁই (=পিঠের পুর), স্বামী-পুতকে নাই॥
লাজের বুড়ী আগে হাঁটে॥

লোকলজ্জায় রাঁধি-বাড়ি, পেটের জ্বালায় খাই।
লজ্জাসরম আছে ব'লে কাপড় প'ড়ে যাই॥
সাত রাঁড়, এক এয়ো, যার কাছে যাই সেই বলে—আমার মত হয়ো॥
সাতভাতারী সাবিত্রী॥
ভাবনা কি তোর, হাবী, তোর পেটের তলায় যে ধন আছে
তাই ভাঙিয়ে খাবি॥

ভাল ভাল ক'রে গেনু কালোর মার কাছে।
কেলের মা বলে—আমার বেটার সঙ্গে আছে॥
ভালমানুষের কাছে ব'সে খাই গুয়াপান।
অমানুষের কাছে গিয়ে কাটাই দুটি কান॥
কপালে ছিটে-ফোঁটা, তুম্ব ঝুলি হাতে।
মাইরি দিদি, তোর মাথা খাই, কিছু নেইক তাতে॥
দেখে গেছ সেই, নিয়ে বসেছি এই, তবু আবাগীরা বলে কতই খাই॥
কাঁকালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে কে, কাল মঙ্গলবার করবে যে।
ও ত বরং দাঁড়িয়ে আছে, আমার শুনে কাঁকাল ভেঙে গেছে॥
দেখে যা পাড়ার লোক চোরের দাগাদারি।
যে ঘরেতে রাঙা বউ, সেই ঘরেতে চুরি॥
নাক নেই বেটীর নথের সখ, ফেলনা বেটীর কত ঠমক॥
মরদের জিদে বাদশা, মাইয়ার জিদে বেশ্যা॥

এইরূপ সাংসারিক জীবনের বিবিধ বিষয়ের বিবিধ প্রবাদ প্রচলিত আছে। উপরের উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে যে, একই ধরণের বা মূলত একই বিষয়বস্তু লইয়া, নানা অভ্যস্ত পদার্থের চিত্র অবলম্বন করিয়া, একাধিক প্রবাদ-বাক্য রচিত হইয়াছে। আগে আমরা ছুঁচ ও চালুনি সম্বন্ধে সুপরিচিত প্রবাদের বিভিন্ন রূপান্তর দেখিয়াছি, তেমনই—

উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ॥

এই সুপ্রসিদ্ধ প্রবচনটি বিবিধ সরসরূপে দেখিতে পাই—

হাটে কলা, নৈবেদ্যায় নমঃ॥
গাছে ফুল, শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ॥
ফাটলে পড়ল নাড়ু, গোপালায় নমঃ॥ ইত্যাদি

অল্প যে তুচ্ছ নয় বা অল্পেও বৈশিষ্ট্য আছে, এ সম্বন্ধে অনেকগুলি একই ধরণের প্রবাদ আছে—

অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী॥

অল্প আগুনে শীত হরে, বেশি আগুনে পুড়িয়ে মারে॥
অল্প বৃষ্টিতে কাদা হয়, অনেক বৃষ্টিতে সাদা হয়॥
অল্প মারে কাঁদে বাঁদী, অল্প বোঝায় ফাটে চাঁদি॥
বোঝার ওপর শাকের আঁটি॥
অল্প শোকে কাতর, অনেক শোকে পাথর॥
অল্প জলের মাছ, ফরফরানি বেশি॥
আধ গাগরী জল, করে ছলছল॥
অল্প আগুনে তামাক খাওয়া, আর ছোট লোকের খোসামোদ করা॥
অনেক খাবে ত অল্প খাও, অল্প খাবে ত অনেক খাও॥
ধানি লঙ্কা॥
সরষের দানা ছোট হ'লেও, ঝাল কম নয়॥
ছোট কলসীর বড় কানা॥
সজনে শাক বলে—আমি সকল শাকের হেলা।
আমার খোঁজ পড়ে কেবল টানাটানির বেলা॥
ছোট কাঁটাটি ফোটে পায়, তুলে ফেল, নইলে দায়॥ ইত্যাদি।

একধর্মী লোকের পরস্পর সাংগত্য প্রবাদ-প্রসিদ্ধ কৌতুকের বিষয়—
চোরে চোরে মাসতুতো ভাই॥
চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা, শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল॥
আমে দুধে এক হয়, আদাড়ের আঁটি আদাড়ে যায়॥
যেমন উনোনমুখো দেবতা, তেমনি ঘুঁটে ছাই নৈবেদ্য॥
যেমন গুরু তেমনি চেলা, টক ঘোল তার ছেঁদা মালা॥
যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল॥
যেমন হাঁড়ি তেমনি শরা, যেমন নদী তেমনি চড়া॥
এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ কব কার॥

সুতরাং বিপদের ঘরে ব্যাথার ব্যথীর অভাব নাই—
কান কাঁদেন সোণা রে, সোণা কাঁদেন কান রে॥
তুই খল্‌সে, মুই খল্‌সে, একই বিলের মাছ।
তোর মরণে মরব আমি, আমার কোমর ধ'রে নাচ॥

কিন্তু পরস্পরের চালাকি পরস্পরের অবিদিত নয়—
কানের সোণা কান কাটে॥
তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে।
তুমি ফের ডালে ডালে, আমি ফিরি পাতে॥
আমায় না দিয়ে খাবে ননী, কত ধন বাঁধবে, ধনী॥

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কতকগুলি জনশ্রুতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যাহার মধ্যে সহজ প্রাত্যাহিক অভিজ্ঞতা স্বল্প কথায় ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে—

আঁতে তেতো, দাঁতে নুন, পেট খালি এক কোণ।
এবেলা ওবেলা শৌচে যায়, তার কড়ি কি বৈদ্যে খায়॥
খেয়ে হাগে, শুয়ে জাগে, তার গন্তি কভু না লাগে॥
খায় না খায় সকালে নায়, হয় না হয় তিনবার যায়।
তার কড়ি কি বৈদ্যে খায়॥
সকাল বিকাল নিকাল দেয়, তার কড়ি কি বৈদ্যে খায়॥
একবার যায় (=শৌচে যায়) যোগী, দুবার যায় ভোগী,
তিনবার যায় রোগী॥
সকালে শুয়ে সকালে উঠে, তার কড়ি না বৈদ্যে লুঠে॥
কানে কচু, চোখে তেল, তার বাড়ী না বৈদ্য গেল॥
নির্মনিসিন্দা যেথা, মানুষ মরে না সেথা॥
তাল, তেঁতুল, দই, বৈদ্য বলে ওষুধ কই॥
পুঁই, কচু, ঘেসো, তিন আমাশার মেসো॥
কখনো খেও না ওলে আর ঘোলে, কখনো ভুলো না ঢেমনার বোলে॥
মুড়ি আর ভুঁড়ি, সব রোগের গুঁড়ি॥
শাক, অম্বল, পান্তা, তিন ওষুধের হন্তা॥

তেমনই অভিজ্ঞতার নির্যাস-স্বরূপ অবাঞ্ছিত ব্যক্তির বা অযশস্কর কার্যের কতকগুলি উপাদেয় ফিরিস্তি পাওয়া যায়। ইহার দুই চারটি পূর্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে, আরও কয়েকটি যথেষ্ট কৌতুকজনক—

ছেঁদা ঘটি, চোরা গাই, পাপ পড়শী, ধূর্ত্ত ভাই।
মূর্খ ছেলে, মাগ নষ্ট, এ ছয়টি বড় কষ্ট॥
নদীর ধারে চাষ, বালির ওপর বাস।
সু-অদৃষ্টের আশ, নারীর মুখের হাস।
এর ওপর যার বিশ্বাস, তার সাতপুরুষে কাটে ঘাস॥
তাস, তামাক, পাশা, এ তিন কর্ম্মনাশা॥
আহার, নিদ্রা, ভয়, যত কর তত হয়॥
চোর, ছিনার, চোপায় দড়, আগে যায় শীতলা মাড় (=মন্দির)॥
টাক, প্রকৃতি, গোদ, ম'লে হয় শোধ॥
তাল, তেঁতুল, মাদার, তিনে দেখায় আঁধার॥
তাল, তেঁতুল, কুল, তিনে বাস্তু নির্ম্মূল॥

ঘোল, কুল, কলা, তিনে নষ্ট গলা॥
আগে হাঁটে, পাঁটা কাটে, পিদ্দিম উস্‌কোয়, দই বাঁটে।
ভান্ডারী, কান্ডারী, রাঁধুনী বামুন, যশ পায় না এই সাতজন॥
আগে হাঁটুনী, পান-বাঁটুনী, বউয়ের ধাই, এ তিনের যশ নাই॥
টেরা চোখ, মাথায় টেরি, পিঠে কুঁজ, গলায় গড়্গাড়ি।
দুচোখ ডাঁসা, এক চোখ কাণা, বজ্জাতের এই নিশানা॥
ওল, কচু, মান, এ তিন সমান॥
জন, জামাই, ভাগনা, তিন নয় আপনা॥
উই, ইঁদুর, কুজন, ভাল ভাঙে তিনজন॥
সাপ, শালা, জমিদার, এ তিন নয় আপনার॥
কাণা, খোঁড়া, কুঁজো, তিন চলে না উজো॥
কাণা, কুঁজো, খোঁড়া, তিন অসতের গোড়া॥
কাণা, খোঁড়া, একগুণ বাড়া॥
ঘরের পাপ বুড়ী, পেটের পাপ মুড়ি॥
ঘরের শত্রু কাণা, পুকুরের শত্রু পানা॥
পেঁয়াজ, ধূম, নষ্ট নারী, চক্ষে আনে অশ্রুবারি॥
রোগের শেষ, আগুনের শেষ, শত্রুর শেষ, ঋণের শেষ রাখতে নেই॥

তেমনই হেমন্তকালে প্রশস্ত হইতেছে—

তেল, তামাক, তপন, তুলা তপ্তভাতে ঘি।
পাছুড়ি (=উত্তরীয় বস্ত্র), খিচুড়ি, আর স্বাশুড়ীর ঝি॥

সব সময়ে ভাল যাহা, তাহারও তালিকা পাওয়া যায়—

উচ্ছের কচি, পটোলের বীচি, শাকের ছা, মাছের মা॥
শাকের মধ্যে পুঁই, মাছের মধ্যে রুই।
ধানের মধ্যে কট্‌কী, বউয়ের মধ্যে ছোট্‌কী॥
মাছের মধ্যে রুই, শাকের মধ্যে পুঁই, মানুষের মধ্যে মুই॥
কুটুমের মধ্যে শালা, গয়নার মধ্যে বালা।
সাজের মধ্যে মালা, বাসনের মধ্যে থালা॥
কচি পাঁটা, পাকা মেষ, দইয়ের আগা, ঘোলের শেষ॥
কালি, কলম, মন, লেখে তিন জন॥
ছুঁচ, সোহাগা, সুজন, ভাঙা গড়ে তিনজন॥
জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে॥
জল জল ইন্দ্রের জল, বল বল বাহুর বল॥
ফলের মধ্যে আম্রফল, জলের মধ্যে গঙ্গাজল॥

দুগ্ধ, শ্রম, গঙ্গাবারি, এ তিন বড় উপকারী॥
ইষ্টকালয়, শ্যামা নারী, বটচ্ছায়া, কূপবারি॥

ক্রমশ

শ্রীসুশীলকুমার দে

নাক—ঊনবিংশ শতাব্দী

"সন্দেহ ক'রো না, ওহে একেলে-রতন,
আমাদেরই নাক ছিল নাকের মতন।
নস্য, লোম, চশমা যেথা পাইত আদর,
ঘুঁষি, লাথি, সিকনি, আতর
স্থান পেত সমভাবে যেথা,
যে নাকেতে কাঁদিতাম আদাব করিয়া যেথা সেথা,
তুলি যাহা করিতাম বাদ-প্রতিবাদ,
কুঁচকাইয়া চুলকাতাম দাদ,
ফুলাইয়া করিতাম মান,
তিল-ফুল-জিনি নহে—ছিল যাহা খড়্গ-সমান,
হাঁচিতাম উচ্চরোলে কাঁপাইয়া ছাদ,
ডাকাতাম তুলি ভীমনাদ,
যার 'পরে চড়ায়ে তিলক
দোমনা-যজমান-বক্ষে গাড়িতাম ভক্তির কীলক,
উপদংশ-প্রহারেও যাহা অলজ্জিত,
মাজা-ভাঙা কেউটে সম ফুঁসিত গর্জ্জিত—
তোমাদের সেই নাক কই ?
খাঁদা খিন্ন তুলতুলে—ওই
পাউডার মাখায়ে যারে রাখো,
ফিনফিনে রুমালেতে অহরহ ঢাকো—
তাহারে কি নাক বল বাছা ?"
—এই বলি বাচস্পতি গুঁজিলেন কাছা।

"বনফুল"

শনিবার

আমরেশের কথা আমি অপরোক্ষ রীতিতেই ব'লে যাচ্ছি—

আইনমত অফিস থেকে বেরুবার কথা একটায়; কিন্তু সে আইন যাদের পক্ষে খাটে তাদের ধাত তো দূরের কথা, চামড়ার রঙই আলাদা। ফলে অফিস পেছনে ফেলে সত্যিই যখন রাস্তায় হাঁটতে আরম্ভ করেছি, তখন বেলা পৌনে তিনটে। শনিবার না হ'লে আরও ঘণ্টা চারেক বিজ্ঞানের ভাষায় নেহাত ইনারসিয়ার বলেই চ'লে যেত। কারণ পাঁচটায় অফিস থেকে বেরুবার জন্যে হাঁকুপাকু করে কাঁচা কেরানীরা, যারা এখনও বাড়ি-ট্রাম-ডালহৌসি এবং ডালহৌসি-ট্রাম-বাড়ি ছাড়াও আরও কিছুর প্রত্যাশা রাখে জীবনের কাছ থেকে; অবশ্য পায় না। না পেয়ে ধীরে ধীরে এই বহুতন্ত্রীবিশিষ্ট অফিস-বীণাটিতে আর একটি তার নিজের জীবন দিয়ে যোজনা করে। এইরূপ বিবর্ত্তনের ইতিহাসের যে একটা আরম্ভ ছিল এ কথাও আজ বিস্মৃতপ্রায়। সে ইতিহাসে নিজেকে সত্য ক'রে তোলাই বর্ত্তমানে যৌবনের সৃষ্টিপ্রেরণার সাধনা।

তবু আজ শনিবার। সারা সপ্তাহের অবহেলিত উদ্বদ্ধ জীবন একটু হাত-পা নাড়তে পাবার আশায় চঞ্চল হয়ে উঠে, যে কোন রকমের মুক্তি, যে কোন রকমের অবাধ শিথিলতা। তাই ভিড় স্থানে অস্থানে। স্থান আর কোথায়! কৃষ্টিমানদের মতে সবই তো অস্থান। যে কেরানী কলেজে পড়ার সময় শকুন্তলা প'ড়ে আনন্দ পেয়েছে, সে যখন ছোটে 'বার্থ অব এ বেবি' দেখতে, তখন আর আশা করবার কি থাকে? জিজ্ঞাসা করলে বলে, না হে, ছবিটা ইনস্ট্রাকটিভ। এ তো আর আমাদের দেশ নয় যে, 'অশ্লীল, অশ্লীল' ক'রে চেঁচিয়ে উঠবে। ওরা জীবনটাকে 'ফেস' ক'রে বোঝবার চেষ্টা করে। কৃষ্টিমানদের সঙ্গে ভয়ে ভয়ে সায় দিয়ে ভাবি, হবেও বা। জীবনের 'ফেস' কি রকম তা তো আর সত্যিই কেউ জানে না। পশ্চিমের অতি-সন্ধানী দৃষ্টি মাংসের নীচে হাড়ে হয়তো জীবনের মূল সত্য আবিষ্কার করেছে। হাড় কামড়ে মুখ ছ'ড়ে গেলে নিজের রক্তের স্বাদও কম সুস্বাদু নয়। সেও একটা অভিজ্ঞতা। সক্রেটিস ব'লে গিয়েছেন, 'নো দাইসেল্ফ'। যেমন ক'রেই হোক নলেজ চাই।

তারপরে এই ভিড়ের আনন্দে আত্মবিসর্জনও ধীরে ধীরে গতানুগতিক হয়ে ওঠে। তবু নূতন গতানুগতিক হ'লেও নূতন—সে টানে। এই টানটা বড় অদ্ভুত। রাতের একঘেয়ে ঝিঁঝিপোকার শব্দের মত; থামলেই মনে হয়, বড্ড নির্জ্জন। প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে। তখন ঘুম না এলে বিপদ।

আমার বয়স ছ মাস। হাসি পাচ্ছে, কিন্তু সত্যিই তাই। আমার কেরানীজীবনের অন্নপ্রাশন হয়েছে এই ছ মাস—দাঁত ওঠে নি ভাল ক'রে। ডালহৌসিরও মূর্ত্তি তাই আমার শনিবারের দৃষ্টিতে বেশ অরুণ হয়ে উঠল। সার্ আর্. এন.-এর মাথায় কাক বসেছে। সত্যিই অবশ্য সার্ আর. এন. নয়; তাঁর প্রতিমূর্ত্তি। একটু হাসি পেল। আচ্ছা, প্রায়ই তো ওই জায়গাটায় কাক বসে। দেখে অন্য দিন মনে হয়, মাথায় কাক বসা তো দূরের কথা, মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়াই অকল্যাণকর। আর আজ কিনা আমার সটান হাসি পেয়ে গেল! সার্ আর. এন.-এর মত লোকের মাথায় সত্যিই কাক বসলে ব্যাপারটা যে কি রকম হাস্যকর হয়, এ কথা কেন এর আগে মনে আসে নি!

রসিকতাটা গিয়ে অরুণার সঙ্গে করতে হবে। অরুণা আমার স্ত্রী।

কিছু অধীরতা এল আমার মনে—এখনও বাড়ি যেতে কত দেরি! কাচের চুড়ি, টি-পট, কমলালেবু আর ফুলকপি নিয়ে বাসে ক'রে মেসে ফিরলে এই শনিবারের বাজারে কিছু আর আস্ত থাকবে না। অতএব হেঁটেই যেতে হবে এই দু মাইল পথ। পরিশ্রমের কথা উল্লেখ করতেই অরুণা এতটুকু হয়ে গিয়ে বলবে, কেন একটা রিকৃশ করলে না? আমার উত্তর তৈরিই আছে—তা হ'লে তোমার চুড়িগুলি—। অরুণা সমস্ত-মূল্য-শোধ-ক'রে-দেওয়া হাসি হেসে বাঁ হাতখানি এগিয়ে দেবে আমার সামনে—হাতে গৃহস্থালির চিহ্নস্বরূপ আমার আগমন-সম্ভাবনায় প্রচুর মসলা বাটার দাগ।

এমন সময় ছোট্ট খুকী এসে উপস্থিত—বাবা, মাকে কি পরিয়ে দিচ্ছ? আমাকে একটা দাও। চাপা-কণ্ঠে অরুণার শাসন—এই টুকু! কি দুষ্টু মা! এখনই মা শুনতে পাবেন। খুকী ইতিমধ্যে বস্তুটি নিরীক্ষণ ক'রে দু হাতে তালি দিয়ে নাচতে নাচতে ঠাকুমাকে ব্যাপারটা

জানিয়ে দিলে, ঠামা, বাবা চুড়ি এনেছে। মাকে—অরুণা উপায়ান্তর না দেখে তাড়াতাড়ি গিয়ে মেয়ের মুখ চেপে ধরলে। আমি মন্তব্য করলাম, কি পাকা হয়েছে দেখেছ!

মা এসে চুড়ি দেখে আমার রুচির তারিফ ক'রে বউমাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, আমাদের সময়ে কিন্তু বাছা বেলোয়ারী চুড়ি মেথরানীরা পরত। তোমাদের আজকাল সোনাদানা ছেড়ে এ কেমন ধারা শখ! তারপর টুকুকে সম্বোধন ক'রে, তুমি দিদি, কখ্খনও কাচের চুড়ি প'রো না। তা হ'লে মেথরে ধ'রে নিয়ে যাবে। ব'লে, হাসতে হাসতে চ'লে গেলেন টুকুকে কোলে ক'রে। আমি, অরুণা নিশ্চিন্ত হলাম।

চিৎপুর রোডে বন্ধু মীনাক্ষীপ্রসাদ আমার গতিরোধ করলে। বাড়ি পৌঁছতে এখনও অনেক দেরি। হাতের দ্রব্যসম্ভার এবং দ্রুত গতি বন্ধুর মুখে ব্যঙ্গের হাসি ফোটাল। ভাবটা এই: তুই তো ভারী বোকা! ফুলকপিগুলি বন্ধুর হাত থেকে নিয়ে বন্ধুকে একটু লঘুভার ক'রে মীনাক্ষী বললে, এগুলো আমার ওখানে দিলে ঠাকুর তোফা রান্না করবে গল্‌দা চিংড়ি দিয়ে; রাতে আমার ওখানেই খাবি। বাড়ি যাবি কি দুঃখে? একটু থেমে বললে, যে টাকাটা খরচ ক'রে বাড়ি যাবি সে টাকাতে এখানে—চোখ দুটো একটু টিপে ফের বললে, কি না করা যায় বল্ তো? হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, তুই গত শনিবারে গিয়েছিলি কেন?

ছ মাস পরে; স্ত্রীর সন্তানলাভ উপলক্ষ্যে।—ব'লে একটু হাসলে।

মদ ধরেছিস নাকি?

রসিকেই রসিক চেনে। তবে আমি বাবা নিমচাঁদ নই, আর তুমিও অটল নও, ভয়ের কোন কারণ নেই।

যে ভাবে তোর চোখ ওপরে নীচে, আশে পাশে, আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাতে তুই এখানে এতক্ষণ কি ক'রে অপেক্ষা করছিস তাই ভাবছি।

মীনাক্ষী একটা বাড়ির ওপরের বারান্দায় দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে মুচকি হেসে বললে, ডুবে ডুবে জল খাও বাবা, তা আর জানি না। কালকের সেই যে কবিতাটা, ওটি কি স্ব-স্ত্রীক প্রেম? ব'লে—অপেক্ষা না ক'রেই কপিগুলো নিয়ে একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। পেছনে পেছনে ছোটার

কোন মানে হয় না দেখে এগিয়ে চললাম। মীনাক্ষী কি মনে করেছে, কপি ফিরে নেবার লোভে আমি তার পশ্চাদ্ধাবন করব? কবিতা প'ড়ে কবি সম্বন্ধে এমন নির্দ্ধারণ অবশ্য নূতন নয়; কিন্তু আসলে কবিতাটা আমার নয়, অলোকবরণ সেনের। মীনাক্ষীর কাছে ভাবাতিশয্যে কাল সন্ধ্যাবেলা নিজের ব'লে প্রচার করেছিলাম। কাল সন্ধ্যাবেলা সত্যই বড় ক্লান্ত লেগেছিল; আজ যেন মনে হচ্ছে সেই ক্লান্তির কিছু অপনোদন হবে; কাল অতীত স্মৃতিতে গা ঢেলে দিতে বড় ভাল লেগেছিল। কবিতাটি এই—

আমার উপেক্ষিত যৌবনের নৈরাশ্যের মাঝখানে
তোমার চকিত দৃষ্টি
সৃষ্টি করেছিল আশার মরূদ্যান।
জীবনের, যৌবনের, বসন্তের সমস্ত সঞ্চিত ঐশ্বর্য্য আভাসিত হয়েছিল
সেই চাওয়ায়।

* * *

তারপরে কেটে গেছে দিন, কেটে গেছে রাত্রি,
এসেছে সন্ধ্যা, এসেছে প্রভাত।
সত্য শুধু এখন দ্বিপ্রহরের নীলিমাহারা আকাশ।

* * *

চলেছি গৃহে
দিনের কাজশেষে,
অন্নের সংস্থান ক'রে।
রাস্তা পার হওয়ার সতর্কতায় আচ্ছন্ন আমার মন।
সামনে দিয়ে ট্রাম চ'লে গেল,
ওঠবার উপায় নেই লোকের ভিড়ে।
বাসেও নেই স্থান।
চিৎপুরের মোড়,
বিচিত্র পণ্যনারীর ভিড়ে আমোদিত পথ,
দৃষ্টি বিহ্বল হয়ে ওঠে,
লোভাতুর মন সংস্কারবশে আত্মসংযম করে।

ট্রামে উঠি,
মানুষের মাঝে আবার স্বাভাবিক হয়ে আসি।
হঠাৎ মনে আসে,
অরুণ যৌবনে পাওয়া,
সেই চকিত, অভাবনীয় দুর্লভ দৃষ্টি।

মীনাক্ষী কবিতাটা বোঝে নি তা হ'লে। না বুঝুক; আমি কিন্তু প্রায়ই কেন অফিসের লেডি টাইপিস্টের সুডৌল দেহের দিকে তাকিয়ে থাকি? দেহকামনা? হঠাৎ সেই উত্তরই মনে আসে বটে। কিন্তু সারাদিনের শ্রমক্লান্ত চোখ যখন সন্ধ্যার আবছায়ায় চারিদিকের ঘনীভূত অবসাদের মধ্যে ওই পরম আরামে উপবিষ্ট কিঞ্চিৎ পরিশ্রান্ত আত্মতৃপ্ত দেহের দিকে তাকায়, তখন সে চোখে কামনা জাগে সত্যি; তবে সে কামনা জনতার কোলাহল থেকে দূরে সীমাহীন মাঠে ঘনপত্র বটগাছের তলা থেকে আসা বাঁশীর ধ্বনির প্রতি কামনার মত। উন্মাদনা থেকে দূরে তন্ময়তার তৃষ্ণা সেই দৃষ্টিতে; মীনাক্ষী ওইখানে গিয়ে যে আনন্দ পায়, সে ওই তন্ময়তার আনন্দ। নিজের স্ত্রীর কাছে সে শুধু আত্মপ্রচার করে, আর এখানে সে আত্মবিলোপ করে, বেশ্যার ভালবাসায় নয়, নিজেকে ভালবাসার হাত থেকে এই প্রবঞ্চনাহীন মুক্তিতে। সারাদিনের অপ্রয়োজনীয় কাজের পর, সংসারে আমার প্রয়োজনে কেউ কিছুক্ষণের জন্যও নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করছে, এইটেই সুখ। বেশ্যার সেই আত্মদানের মধ্যে কোন বাধা নেই, কুণ্ঠা নেই, ভালবাসার অভিনয় আছে, কিন্তু সেটা অভিনয় হিসাবেই গ্রহণীয়। গার্হস্থ্য প্রেমের মত এ প্রকাশের অভাবে মৃতপ্রায় নয়। এ প্রেমের অভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত।

কালকে হ'লে মীনাক্ষীর আহ্বান হয়তো এত সহজে প্রত্যাখ্যান করতে পারতাম না। কিন্তু আজ? হাসি পায় মনে করলে। ছটায় ট্রেন, এক ঘণ্টার পথ। তারপরেই আর পরিশ্রম নেই, ক্ষোভ নেই, নিরানন্দের ঘের নেই চারিদিকে, শুধু নেওয়া, অঞ্জলি ভ'রে নেওয়া, সে দেওয়ার মধ্যে কার্পণ্য নেই, চাওয়া নেই, মিথ্যা নেই। সে যেন প্রয়োজনাতিরিক্তের জগৎ।

আবার কপি কিনতে হবে। মেসে ফিরে জিনিসপত্র রেখে বাজারে

গিয়ে কপি কিনে, শীতকালে কলকাতার বিখ্যাত মাছ—ভেটকিও একটা নিতে হ'ল। পথে আসতে কি একটা চা-এর বিজ্ঞাপন দেখে মনে পড়ল, বাড়ির চাও তো এতদিনে ফুরিয়ে যাবার কথা। এক পাউণ্ড চা নিয়ে গিয়ে অরুণার নাকের ডগায় ধ'রে দিয়ে বলব, দেখ, তোমার বলার অপেক্ষাতেই আমি ব'সে থাকি না। গিন্নীপনাটা সেইজন্যে আমার ওপর একটু কম ক'রো। অরুণা তখন, কি গিন্নী আমার! চা এখনও এক সপ্তাহ চলত।—ব'লে চা-টা নিয়ে ছুট। চায়ের কৌটোটা দেখলে বোঝা যেত, মিথ্যাভাষণটা গিন্নীপনার একটা অঙ্গ। যখন জিনিস থাকে না, তখনও ছল-চাওয়া লক্ষ্মীদেবীর অন্তর্দ্ধানের আশঙ্কায় মেয়েরা বলে, চাল বাড়ন্ত, কি, নুন বাড়ন্ত। এ যেন মায়ের-দয়া হওয়া।

আছি বেশ! জিনিসপত্র গুছতে হবে; বিছানাটা গুছিয়ে এমন ক'রে রাখতে হবে, যাতে ঘরের অন্য সভ্যেরা আমার অনুপস্থিতিতে সেটিকে অব্যবহার্য্য না ক'রে তোলে। জুতো পালিশ করতে হবে; সকালে তাড়াতাড়িতে দাড়ি কামানো হয় নি। যাক ব্লেডটা তবু নতুন, মোটে একবার কামানো হয়েছে। গিলেট ব্লেডে দ্বিতীয় শেভ যা হয়, আঃ! একটা ভাল শেভ সত্যিই একটা আনন্দ।

বাঁধা-ছাঁদা সেরে দাড়িটি কামিয়ে এক কাপ চা খাচ্ছি। সত্যেন দত্ত সাত কাপ পর্য্যন্ত চালাতে পারতেন; কিন্তু এই এক কাপের যে কি শক্তি, এ তিনি বোধ হয় জানতেন না।

জিনিসপত্র সব ফিটফাট। এখন শুধু নিয়ে বেরিয়ে পড়া। সত্যি, এ একটা অভিসার। নয়? কিসে কম? কথাটা ব'লে ফেলেছি ব'লে লোকে বলবে সেন্‌টিমেণ্টাল, ভাবালু, ছেলেমানুষ। একটা কেরানী—শনিবারে বাড়ি যাবে, আজ অর্দ্ধশতাব্দী ধ'রে এই রকম যাতায়াত কেরানীরা ক'রে আসছে, এতে আর নূতনত্ব কি আছে? নূতনত্ব নেই ঠিক। তবু একেবারে কিছুই নয়, এ কথাও একেবারে নিছক প্রগতিবাদীর মত শোনাল; কারণ্ প্রগতিবাদী সাহিত্যের মূল কথা হচ্ছে, 'পৃথিবী বিগতযৌবনা'। আচ্ছা, অভিসার নয় কিসে? রসিকতা করছি না, সত্যি জিজ্ঞাসা করছি। কিন্তু এ কথাগুলোই এমন যে, ভেতরে যতই গুমরে মর না কেন, লোকের কাছে বললেই লোকে হাসবে। কথা

যত অন্তরের হবে, বাইরে সেটা তত বেশি অপ্রকাশ্য। ফলে মাঝে মাঝে অসামাজিক প্রকাশ হয়ে পড়ে। তাই মীনাক্ষীপ্রসাদ ছুটেছে ওইখানে, সে ওই স্থানকেই প্রকাশের উপযুক্ত পরিবেশ ব'লে মনে করে। কি করবে? কেউ কারও কথা শুনতে চায় না; সকলেই নিজের কথা বলতে ব্যস্ত—এই মশাই ছোট ছেলেটার আজ দশ দিন হ'ল আমাশা; বড় মেয়েটার পাত্র ঠিক করেছি, কিন্তু বাপ বেটা চামার, চোখের চামড়া নেই; আর মশাই কদিনই বা আছি, ইত্যাদি। অথচ যে শুনছে, সে যে এখনও কিছুদিন আছে এ কথাটা বক্তা আমলেই আনেন না।

তাই বলছিলাম, অভিসার নয় কিসে? সোমবার থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে, সমস্ত পারিপার্শ্বিককে অনুকূল ক'রে এনে কুটিলা-রূপী বড়বাবুকে ফাঁকি দিয়ে, আয়ান-রূপী অর্থকৃচ্ছ্র তাকে সারা সপ্তাহ ধ'রে সামলে সামলে এই যে একটি মুহূর্ত্তকে পরিপাটি ক'রে তৈরি করা গিয়েছে, যেটা এই একটু পরেই জীবন্ত হয়ে উঠবে, এটা একেবারেই তুচ্ছ!

চায়ের ধোঁয়ার মতই চিন্তাগুলি একের পর এক আমার সামনেই মিলিয়ে গেল। উঠে পড়লাম। স্নানটা ক'রে আসা যাক। শীতকাল হ'লেও দুবেলা স্নান আমার অভ্যাস। আর আজকে স্নানটার একটা বৈশিষ্ট্য আছে, এটা অফিস যাবার আগের স্নান নয়। প্রাক-অফিস-যাত্রা স্নানটা হচ্ছে 'চান', সেটা খাটি কলকাত্তাই। এটা হ'ল সারা সপ্তাহ ধ'রে সঞ্চিত ক্লেদের এবং শহুরেপানার পরিশোধন, সাপ্তাহান্তিক স্নান। তারপরেই আসবে সংপরিপ্রাপ্তি। সং এবং পরি দুটো উপসর্গ শুধু প্রাপ্তির গভীরতার কিঞ্চিৎ আভাস দেবার চেষ্টা; হয়তো ব্যাকরণের ভুল হ'ল। কিন্তু মনোভাব, যাকে বলে, রূপায়নের চেষ্টায় শব্দসৃষ্টি এই নূতন নয়।

মুখে সাবান দিতে গিয়ে দেখি দাড়ির নীচে দাড়ি। দাড়ি-কামানো খারাপ হ'লে এমন বিরক্তি লাগে! অফিসে দাড়ি-ভরা মুখ দেখে সাহেব খ্যাবি বললে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতাম, আশি টাকা মাইনেয় রোজ চার আনা ক'রে ব্লেড কেনা যায় না। সে উত্তরের মধ্যে বেশ একটা আত্মপ্রসাদ থাকে। আজকের ব্যাপারে উত্তরের কোন বালাই নেই। তবু মাকে গিয়ে প্রণাম করলেই চুমো খেতে গিয়ে তাঁর হাতে যখন

দাড়ির খোঁচা লাগবে, তখন বড় লজ্জা লাগবে। ছেলে বড় হয়েছে সত্যি, তার দাড়িও নিশ্চয় গজিয়েছে, না গজালে লোকে মাকুন্দে বলবে। তবু মায়ের কাছে সেটা গোপন থাকলেই যেন ভাল হয়।

আবার ক্ষুরটি লাগিয়ে দুবার টান দিলাম। একটু ক্রীম ঘ'ষে গালকে যত সুখ দিলাম, মনকে দিলাম তার চেয়েও বেশি। খাসা লাগে ওই মৃদু গন্ধটুকু, ঘরে লেগেছে সন্ধ্যার আবছায়া, বাইরে এখনও আলো। সন্ধ্যা ঘনালে আমাদের বাড়িতে জ্বলবে প্রদীপ। জ্বলে কি না জানি না, শুধু কল্পনা করি। কারণ সন্ধ্যার আগমন কলকাতায় শঙ্খে শঙ্খে যেমন ধ্বনিত হয়, পাড়াগাঁয়ে আজকাল আর তেমন হয় না। সেখানে অকাল-সন্ধ্যা বহুকাল আগেই তার শঙ্খ বাজিয়েছে। তবু রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় যে ছবিটি ফুটেছে সে কি মিথ্যা—

'নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা সোনার আঁচল খসা
হাতে দীপশিখা।

সোনার আঁচল বহুদিন খসেছে। এখন আঁচলেরই একান্ত অভাব। তবু—তবু, কল্পনা কিছুতেই মরে না কেন? প্রগতিবাদীরা আমাদের দেখে রোমাণ্টিক ব'লে মুখ বেঁকায়।

রিকৃশ—রিকৃশই সই; বাসে যাব না কিছুতেই। ওই ঘাম আর পেট্রোলের গন্ধের মধ্যে না হয় একদিন নাই গেলাম। তারপরে প্রত্যেকেই বাড়িমুখো, নিজের জিনিসটুকু বাঁচাবার জন্যে অতিসতর্ক, ফলে বিরক্ত। আমি না হয় বিরক্তিটা নাই বাড়ালাম। নিজেকে আজ ভিড়ের থেকে একটু বিচ্ছিন্ন রাখতে ইচ্ছে হচ্ছে। অতএব দশ আনা পয়সা রিকৃশা-ওয়ালার পকেটে যাবেই। শ দুই টাকা মাইনে হ'লে না হয় দশ আনার চারগুণ ট্যাক্সি-ওয়ালার পকেটে যেত। ভিড় থেকে আলাদা হবার জন্যে দাম দিতে হবে বইকি। সবাই কিছু কিছু দিয়ে থাকি। পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ছেলেরা জিজ্ঞাসা করলে বলি, আমি কমিউনিস্ট। মিথ্যা কিছু বলি না। মানুষকে ভালবাসি ব'লে তো আর অমানুষকে ভালবাসতে পারি না। নোংরা জিনিসকে মানুষ চিরকালই ঘেন্না করে।

ভিড় হবে স্টেশনে জানতাম। আমাদের গাড়িতে টিকিট দেওয়া

বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই পাঁচ সিকের জায়গায় ন সিকে লাগল এবং তোরণ-রক্ষকও একেবারে নিরামিষাশী রইলেন না। মনে মনে হিউম্যানিটারিয়ান করুণা হ'ল এদের ওপর আজ। যুগোপযোগী রাগ ঘনিয়ে উঠল মনে অর্থগৃধ্নুদের ওপর; মনটা গিয়ে পড়ল স্টালিনের পায়ের ওপর উপুড় হয়ে। সেখান থেকে তাকে তুলে নিয়ে মনের আনন্দে ঘুষ দিয়ে, 'মশাই পা-টা একটুখানি, হেঁ-হেঁ, দুয়োরটা একটু ছেড়ে দিয়ে, বসবার জায়গা চাই না, এটা একটু রাখতে দিন' করতে করতে গাড়ির কামরায় ঢুকলাম বলা যায় না, প্রবেশিত হলাম। এ বরং ভাল। ঢোকবার দায়িত্ব আমার নয়। কেউ খিঁচিয়ে উঠলে বলি, কি করব মশাই, পেছনটা একবার দেখুন।—বলতে বলতে ভদ্রলোকের পাশে গিয়ে দাঁড়াই। ধীরে ধীরে তিনি সঙ্কুচিত হন, আমি প্রসারিত হই, ঘটনাটা অলক্ষ্যেই হয়। ভদ্রলোক একটু পরাজয়ের গ্লানি অনুভব করে সম্ভবত।

কোন্ স্টেশন অত লক্ষ্য করি নি, 'নাম, নাম' রব উঠল। কেন রে বাবা? শুনলাম, বাবাই বটে, মিলিটারি উঠবে। আমরা যাব কোথায়? সে ভাবনা রেল-কর্তৃপক্ষের নয়, আমাদের। নামতে গিয়ে এক ভদ্রলোকের কমলালেবু ছড়িয়ে প'ড়ে গেল। এতদিনে বুঝলাম কেন ওদের আমরা যা-তা বলি—আমরা মানে আমাদের মধ্যে অবিমৃষ্যকারীরা, যাদের যা-তা বলবার সাহস আছে। নিমেষের মধ্যে পতিত কমলালেবুগুলি প্ল্যাটফর্ম থেকে উধাও হ'ল। নিজের ভেটকিমাছটা সামলে দেখি, প্ল্যাটফর্ম কমলালেবুর খোসায় ভ'রে গিয়েছে। ভদ্রলোক ওই সৈন্যগুলোকেই বাধ্য হয়ে নিজের ছেলেমেয়ে ভেবে নিলেন। আমরা স্থান খুঁজে নিতে ব্যস্ত। কেউ মন্তব্য করবারও অবকাশ পেলাম না।

যুবক এবং যুবকল্পরা স্থান ক'রে নিলে, কিন্তু প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধের দল পরের গাড়িতেই যাবেন স্থির করলেন বোধ হয়। যুবকরা তো সব বিষয়ে এগিয়ে যাবেই। আমি ভেটকিমাছ নিয়ে এই নামা-ওঠার গণ্ডগোলে আগের চেয়ে একটু ভাল জায়গাই পেয়ে গেলাম। কে কোথায় অন্যায় করলে এবং সে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা হ'ল না, এ নিয়ে

মাথা ঘামাবার সময় নেই। নিজের সঞ্চয় নিয়ে বাড়ি পৌঁছতে পারলে হয়। এ ট্রেনটায় পৌঁছতে না পারলে খুকী ঘুমিয়ে পড়বে; মা হতাশ হয়ে খেতে ব'সে যাবেন আর অরুণাকেও বলবেন খেয়ে নিতে। অবশ্য ভোজননিরত অরুণাকে হঠাৎ উপস্থিত হয়ে সচকিত করা মন্দ নয়। সে তাড়াতাড়ি উঠে পালাবে, আর আমি বলব, আরে, উঠছ কেন? আগে ক্ষিদে পেলে আগেই খেতে হয়।

তবু আগে পৌঁছনোই যেন ভাল।

২

শিরশির ক'রে সারি সারি অশ্বত্থগাছের পাতাগুলো কাঁপছে শীতের হাওয়ায়, মানুষের মত হি-হি করে কাঁপছে আর আলোয় ঝলমল করছে—চাঁদের আলোয়। প্রিয়জন আঘাত করলে যেমন বলি, না, লাগে নি এবং ব্যথায় ঈষৎ-কম্পমান দেহকে পুনরাঘাতের জন্য উৎসর্গ করি, ওই অশ্বত্থগাছগুলো তেমনই আলোয় বিহ্বল হয়ে কাঁপছে আর বলছে, আরও দাও, আরও দাও, আমাকে একেবারে ডুবিয়ে দাও। কিশোর বালকের মত স্পর্শকাতর ওই অশ্বত্থের পাতাগুলি, ভারি স্পর্শকাতর, একটুতেই উদ্বেল হয়ে ওঠে। তফাত এই—অশ্বত্থের পাতা আনন্দ পায় আর মানুষ শুধু ব'লে উঠতে পারে—

নিঃসঙ্গতার মাঝে
এস তুমি দু হাতে ভ'রে নিয়ে আলাপন।

আবার অলোকবরণকেই স্মরণ করতে হ'ল; কিন্তু সবটা মনে নেই। ভারি সুন্দর লিখেছিল কবিতাটা। তারপরে কি ছিল,

তোমার সত্তার দুর্নিরোধ্য স্রোতোবেগে?...

দূর! আর মনে আসে না। আর আগের লম্বা কবিতাটা স—ব মনে প'ড়ে গেল।

ইতিমধ্যেই চারিদিক চুপ। ভালই হয়েছে। কলকাতা থেকে এক সপ্তাহ পরে ফিরছি, হাতে সুদৃশ্য ভেটকিমাছ দোদুল্যমান; রাস্তার দুপাশ থেকে প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত হয়ে আধমরা হয়ে বাড়ি পৌঁছতে

হ'ত। তারপরে সকালবেলা উঠেই শুনতে হ'ত, কি হে ভায়া, ভেটকি-মাছটা একাই খেলে? এই প্রশ্নের মধ্যে সত্যিকারের রসিকতা ছাড়াও একটু অন্য কিছু থাকে, এইজন্তেই এদের এড়াতে চাই। কলকাতার এবং ট্রেনের অপ্রয়োজনীয় অর্থহীন ভিড়ের পর এই নির্জ্জনতার যে এত প্রয়োজন ছিল আমার, তা একে বাস্তবে অনুভব না করলে বুঝতে পারতাম না। এ যেন এক মুহূর্ত্তে সব অপচয় পূর্ণ ক'রে দেয়।

ছুটো শেয়াল একটা মেটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমাকে দেখে অপরাধীর মত রাস্তার পাশের ঝোপে ঢুকে গেল। ও বাড়িটা আমাদের জমির ভাগীদার অছু শেখের। রাষ্ট্রের অস্বীকৃত দুর্ভিক্ষে এদের মৃত্যু স্বীকৃত হয়েছে। অছুর স্ত্রী বেরিয়ে গিয়েছে; বিধবা মেয়ে গলায় দড়ি দিয়েছে; আর ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ছেলেটাকে শুনেছি শেয়ালে ঘুমন্ত অবস্থায় নিয়ে গিয়েছে। অছু ধান রোয়া শেষ ক'রে সেই যে বিবাগী হয়েছে আর ফেরে নি। বোধ হয় রাষ্ট্রের আশ্রয়কেন্দ্রে গাজর খেয়ে ঘোড়া হয়ে পুনর্জ্জন্ম নিয়েছে।

শেয়াল ডেকে উঠল হুকি-হুয়া। বাড়ি পৌঁছলাম।

এতক্ষণে একটু গা-ঢেলে-দেওয়া বিশ্রাম।

৩

সংসারের কাজ সেরে অরুণা যখন শুতে এল, অমরেশ তখন গভীর নিদ্রামগ্ন। অরুণা কি বুঝে তার পায়ে একটা চিমটি কাটলে। অমরেশ গভীর বিরক্তিতে দীর্ঘায়িত স্বরে 'আ' ব'লে আগ্রহভরে. স্নিগ্ধ" আলিঙ্গন করলে পাশ-বালিশটাকে। অরুণা জানলা দিয়ে বাইরে একবার তাকিয়ে অমরেশের দিকে পেছন ফিরে শুয়ে পড়ল।

শেয়াল ডাকল, হুকি-হুয়া।

শ্রীশীতাংশু মৈত্র

চলতি সাহিত্য-সভা

সভা !···সাহিত্যের,
বিশেষিত ব্যক্তিদের শুভ-সম্মিলন।
নানান সংবাদপত্রে বিঘোষিত নির্দ্দিষ্ট সময়ে
অনির্দ্দিষ্ট অসময়ে
যে যার সময়মত সভ্য-সমাগম
বঙ্গীয় নিয়মে সনাতন।
অতঃপর
পরস্পর-পরিচয়, কুশল-জিজ্ঞাসা,
এলোমেলো আলাপন,
সতর্ক পোশাকী সম্ভাষণ,
ঈষৎ সংযত হাসি, শুদ্ধ উচ্চারণ,
অমায়িক অভিনয়ে স্বরূপের স্নিগ্ধ আবরণ,
অর্থহীন আমড়াগাছি, দম্ভের মুখোশ,
পরপরিবাদে মত্ত নিরুদ্ধ আক্রোশ—
শহরের প্রাজ্ঞরূপ
আধুনিকতার
হেয়তম দলাদলি ক্লীব অহঙ্কার।
নানা তর্ক বিতর্ক বিচার—
অর্থহীন উপন্যাস, দুর্ব্বোধ্য ধোঁয়াটে কবিতার,
সভা—

আধুনিক সাহিত্যের
সামীপ্যের লালিত্যের
প্রাণচাপা মনঢাকা সাময়িকতার।
কপট গাম্ভীর্য্যে ঢাকা ঔদাস্যমধুর শিষ্টতার
বৈদগ্ধ্যের প্রতিযোগিতার
সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি
ভদ্রতার বাঁধাবুলি—
পাণ্ডিত্যের ঝুলি,

নিঃশেষে উজাড় করা আলাপের ছলে
সদ্যপরিচিত দলে
বাক্যবলে আত্ম-বিজ্ঞাপন
প্রাণখোলা মনঢালা সভ্য-বিস্মরণ!

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

সুখ-দুঃখ

বুকের কষ্টিপাথরে উজ্জ্বল এক সোনার দাগ—
সেই মেয়েটি!
দূর থেকে দেখে তাই যেন মনে হ'ল।
কিন্তু দূরদর্শন সব সময়ে খাঁটি হয় না।
কাছে গিয়ে অণুবীক্ষণে দেখলাম,
নাঃ, তত সুন্দর নয়,
তেমন মারাত্মক নয় মোটেই।
মন থেকে একটা বোঝা নেমে গেল যেন—
দীর্ঘনিশ্বাসের বোঝা।
বাসে উঠে চ'লে গেল সে,
কিন্তু কোন দুঃখ দিয়ে গেল না।
কিন্তু সত্যিই যদি সে সুন্দর হ'ত—
সেই অজানিতা, সেই অজ্ঞেয়া, সেই অলভ্যা—
কি মন খারাপই না করত তা হ'লে আমার।
সারাটা বিকেল নিজের অন্ধকার হৃদয় প্রত্যক্ষ হয়ে থাকত
সেই উজ্জ্বল সোনার কষে।

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

"সব পেয়েছির দেশ"

এক

দেশবিশ্রুত ডাক্তার সত্যপ্রিয় সেনের বাড়ি। ঘড়িতে সাতটা। সত্যপ্রিয় মাস দুয়েক জরুরী কেসে বিদেশে কাটাইয়া এইমাত্র বাড়ি ফিরিয়াছেন। নিতাই চাকর মালপত্র গুছাইয়া ঘরে তুলিতেছে। সত্যপ্রিয় প্রফুল্লমুখে শিষ দিতে দিতে উপরে উঠিতেছিলেন, সিঁড়িতে পত্নী কুন্তী দেবীর সহিত সাক্ষাৎ। কুন্তী দেবীর পোশাকে ও চেহারায় বাহিরে যাইবার সুস্পষ্ট প্রসাধন-ইঙ্গিত। স্বামীকে দেখিয়া কুন্তী দেবী যেন ঈষৎ থতমত, ঈষৎ যেন বিরক্ত হইলেন।

কুন্তী। ও মা, তুমি! আমি বলি এই বেরুবার মুখে আবার কোন্ আপদ এসে জুটল! তা তুমি এত শিগগির ফিরে এলে যে! এর মধ্যেই কাজ হয়ে গেল?

সত্যপ্রিয়। (ম্লান হাসিলেন) খুব বিরক্ত হয়েছ মনে হচ্ছে! এত শিগগির ফিরে এসে বোধ হয় অন্যায় করে ফেলেছি কুন্তী। আমার আরও কিছু দিন বিদেশে থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তোমায় না দেখে আর থাকতে পারছিলাম না, বিশ্বাস কর।

কুন্তী। তোমার যত কথা! বাড়ি ফিরবে তার আবার ন্যায় অন্যায় কি? তোমার ঘরবাড়ি, তোমার ছেলেমেয়ে। আমি কে? একটা পরের মেয়ে বই তো নয়! সংসারের আর কোনও আকর্ষণই নেই আমার। তা তুমি জান।

সত্যপ্রিয়। আমিই এ বাড়ির কেউ নই কুন্তী। আমি বাড়ি ঢুকলেই এ বাড়ির হাওয়া মৃত্যুপুরীর মত আনন্দ-উৎসবহীন হয়ে ওঠে। ছেলেমেয়ে? অজয় তো শুধু পালিয়ে ফেরে। বেবীর সাড়াশব্দই মেলে না। তুমি তো আজকাল ধরাছোঁয়ারই বাইরে। ছবিটা এখনও আদর ক'রে 'বাবা' ব'লে ছুটে আসে। বোধ হয় ছোট আছে তাই।

কুন্তী। অত শত ঘোরালো কথাবার্তা বুঝি না বাপু। তোমার গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে নাকি? তা হ'লে আমরা ওতেই যাই।

সত্যপ্রিয়। এতদিন পরে আমি বাড়ি ফিরলাম আর তুমি চললে! অথচ আশ্চর্য্য, সারাপথ ভাবতে ভাবতে আসছি, গিয়েই ওকে পাব।

কুন্তী। কি করি বল? তুমি তো মা-মহামায়ার নাম শুনলেই আগুন হয়ে ওঠ। কিন্তু সারা শহর তাঁর নামে পাগল। অত বড় একটা নামী মানুষ। আমার হাত ধ'রে অনুরোধ করলে আমি কি এড়াতে পারি? ওঁর আজ বিশেষ অধিবেশন সভা। আমাকে আর বেবীকে যেতেই হবে। আচ্ছা, তোমার ভাবনাটা কিসের? খানসামা, বয়, নিতাই সবাই রইল। আমি ওদের না হয় ব'লেও দিয়ে যাচ্ছি। কই বেবী, তোর হ'ল?

- কুন্তী দেবী ত্বরিতপদে নীচে নামিয়া গেলেন। অরিন্দম অন্যমনস্ক-ভাবে সিঁড়িতেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। হাই হীলের খটখট শব্দে বেবী নামিয়া আসিল। বেবী সত্যপ্রিয়ের চোদ্দ বছরের মেয়ে। বেশ সুন্দরী। পরনে আগুন-রং মারাঠী শাড়ি। বেবী ফ্রয়েডের একটি বিশেষ ভক্ত। তাঁহার কোন বই বেবী বাদ দেয় না। বাবাকে দেখিয়াই বেবী গায়ের কাপড়টা সুসংযত করিয়া লইল। লজ্জায় তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

সত্যপ্রিয়। (সোৎসাহে) ম্যাই গড, তোকে লাভলি রেড রোজ বলব, না লিলি অফ দি গ্রীন ভ্যালি বলব রে? এ ব্লুমিং বিউটি অফ মডার্ন ক্যালকাটা দেখছি। বেবী, তুই একেবারে হঠাৎ যেন বদলে গেছিস। বাঃ বাঃ, গায়েও একটু লেগেছিস মনে হচ্ছে। এ স্লেণ্ডার অ্যাণ্ড টেণ্ডার মেড, কি বলিস?

বেবী শাড়ির আঁচলটা আরও ভাল করিয়া গায়ে জড়াইল। বাবাটা যেন কি! খালি তাহার রূপের কথা! ছিঃ ছিঃ! বেবীর ভারী লজ্জা করে। অন্য কথা কি জগতে নাই? মৃদু সলজ্জ স্বরে কহিল, মার সঙ্গে মায়া-আশ্রমে যাচ্ছি।

সত্যপ্রিয়। গুড। বাড়িসুদ্ধ সবাই যে এক জোটে 'মায়ের চরণ অভয় শরণ পরম তীর্থ রে' করেছ, তা তো জানতাম না। বেশ বেশ। তা দুজনে কেন? ছি ছি, কি অন্যায়! অজয়, বউমা, ছোট খোকা, ছবি, খানসামা, বয়, নিতাই সবাইকে তাঁর মালকের দোরটা

বাতলে দাও না। আর এ বাড়িটাও যদি তাঁর শ্রীপাদপদ্মে অর্ঘ্য দিতে চাও—। দি আইডিয়া, আমি পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে হোটেলে গিয়ে উঠব। এখানেও বয়-খানসামার তদ্বির, সেখানেও তাই। বাই দি বাই, তোমার দাদা কোথায়? রাত্রে ঘরে ফেরে? ইঞ্জেকশন নিয়েছে? বউমা কেমন? খোকাটা ভাল আছে তো?

প্রশ্নের জবাব প্রত্যাশা করিয়া সত্যপ্রিয় সাগ্রহে বেবীর মুখের পানে চাহিতেই বেবী লজ্জায় মাথা নামাইল।

বেবী। দাদা রাত্রে প্রায়ই ফেরে না। বউদির গয়না চুরি ক'রে কোন অ্যাক্‌ট্রেসকে দিয়ে এসেছে। তারপর থেকে আর ওপরেই যায় না। মায়ের সঙ্গে দেখা ক'রেই বেরিয়ে যায়। খোকাটার গাময় বিশ্রী ঘা। তাকে নিয়ে বউদি চুপচাপ ঘরেই ব'সে থাকে।

সত্যপ্রিয়। তোমার মা কিছু বলেন না অজয়কে?

বেবী। মা তো বাড়িতেই কম থাকেন। আর মা বউদিকেই বেশি বকেন। বলেন, তুমিই হাবা মেয়ে, তাই আগলাতে জান না, বাঁধতে পার না।

সত্যপ্রিয়। হুঁঃ, তা হ'লে মহামায়া-আশ্রমই এখন তোমার মার একমাত্র আকর্ষণ, কি বল?

বেবী। হুঁ, ওখানেই মা খাওয়া-দাওয়া করেন। মা-মহামায়া মাকে খুব ভালবাসেন। তিনি সকলকেই নির্ব্বিচারে ভালবাসেন। মাকেই একটু বেশি বোধ হয়। আশ্রমের ভাগলপুরী গাই আছে। টাটকা নানা রকম মিষ্টি তৈরি হয়—সরের খাঁটি ঘি, দুধ থেকে দই, ঘোল সবই হয়। বাগানে ঢের ফলমূল আর পুকুরে বিস্তর মাছও আছে।

সত্যপ্রিয়। বা! বা! আর তুমি যাও কিসের টানে?

বেবী। ওখানে নানা রকম আলাপ-আলোচনা হয়। বেশির ভাগই ধর্ম্ম আর বৈষ্ণব-সাহিত্য নিয়ে। তা ছাড়া মান হয়, মাথুর হয়, পদাবলী কীর্ত্তন হয়। মা-মহামায়া ভাবাবেশে ভাবনৃত্য করেন।

সত্যপ্রিয় ব্যঙ্গ হাসিলেন।

সত্যপ্রিয়। নাঃ, মা-মহামায়ার কেরামতি আছে স্বীকার করি। এতগুলো শিক্ষিত নরনারীকে নিয়ে কি যে সহজ অবলীলায়

বাঁদর-নাচ নাচাচ্ছেন। আশ্চর্য্য! শ্রীমতীর বয়স কত? দেখতে কেমন?

বেবীর লজ্জাতুর মন বয়সের কুশ্রী ইঙ্গিতে লজ্জা অনুভব করিল।

বেবী। বয়স এই চল্লিশের মত হবে। দেখতে অপরূপ সুন্দরী না হ'লেও আশ্চর্য্য একটি আকর্ষণী শক্তি আছে। ওঁর চোখে চোখে চাইলেই মন আকর্ষণ ক'রে নেন।

সত্যপ্রিয়। (হো-হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন) আকর্ষণ ব'লে আকর্ষণ, একেবারে মাধ্যাকর্ষণের শেষ পর্ব্ব পাতালপ্রবেশের মত ব্যাপার। শুধু মনকে কেন? সুন্দর সাজানো-গোছানো পরিপূর্ণ আনন্দময় একখানি সোনার সংসারের মূল শেকড় ধ'রে উপড়ে টেনে নিয়েছেন, কম ক্ষমতা তাঁর! কি বল?

নীচের তলা হইতে মায়ের ডাক শুনিয়া বেবী চলিয়া যাইতেছিল, সত্যপ্রিয় ফিরিয়া ডাকিলেন, শোন, তোমার মাকে ব'লো যেন তোমার দাদাকেও একটু বুঝিয়ে-পড়িয়ে ওই "সব পেয়েছির দেশের" ভক্ত ক'রে দেন।

পিতার ব্যঙ্গ বেবী বুঝিতে পারিল না। ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

বেবী। হ্যাঁ, মা-মহামায়াকে মা দাদার সব কথাই খুলে বলেছেন। মার সঙ্গে দাদারও আজ আশ্রমে যাবার কথা আছে। লটিদের বাড়ি থেকে তাকে তুলে নেবেন।

সত্যপ্রিয় চিন্তিত বিরস মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বেবীদের গাড়ি স্টার্ট দিয়া গেটের বাহির হইয়া রাস্তায় পড়িল।

দুই

মায়া-আশ্রমের সমুখে শ্রেণীবদ্ধ গাড়ি দণ্ডায়মান। গাড়িগুলির প্যাটার্ন, শোফারের পোশাক এবং আরোহীদের চালচলনে উগ্র আভিজাত্য-মার্কা প্রতিভাত। দামী চুরুট, উগ্র সেণ্ট পাউডার ও কেশ-তৈলের সুগন্ধে আকাশ-বাতাস পর্য্যন্ত সুরভিমদির। অতিথিরা অধিকাংশ তরুণ-তরুণী। কুন্তী দেবীর মত স্থিরযৌবনাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। আশ্রমের বাগান, লতাকুঞ্জ, হরিণ-হরিণী, ময়ূর-ময়ূরী,

হলঘরের সাজসজ্জা, অয়েল পেন্টিং ও মর্ম্মর মূর্ত্তির আর্ট একবিংশ শতাব্দীর অনুরূপ। আশ্রমের দামী ঘড়িটি সুমধুর বাদ্যধ্বনি সহ যেন আশ্রমভক্তদের অভ্যর্থনা করিল। অতিথিরা এতক্ষণ যুগলে বেড়াইতেছিলেন, এবার নীরবে ভক্তি-অবনম্রচিত্তে হলঘরে প্রবেশ করিলেন। হলঘরের দরজায় অর্ঘ্য-মার্কামারা একটি ক্ষুদ্র বাক্স। ইহাতে প্রতিদিনের প্রণামী সংগৃহীত হয়। এ ছাড়া মোটামুটি দান তো প্রচুর আছে, কারণ আশ্রমের ভক্ত সন্তান-সন্ততিরা প্রচুর বিত্তপ্রতিপত্তিশালী। এই কুন্তী দেবীই তো গত সপ্তাহে আশ্রমের বিজলী-পাখাক্রয়কল্পে বাইশ ভরির একটি নেকলেস সঁপিয়া দিয়াছেন। হলঘরে প্রকাণ্ড স্টেজে ভারী রেশমী পর্দ্দা খাটানো। পাদপ্রদীপ জ্বলিতেছে। আজিকার বিশেষ আকর্ষণ মা-মহামায়ার রাধা সাজে বিরহ-নৃত্য। ভক্তবৃন্দেরা নীরবে আসন গ্রহণ করিবার পর মনোমুগ্ধকারী সুমধুর ঐক্যতানবাদ্য বাজিয়া উঠিল। পর্দ্দার অন্তরাল হইতে অপূর্ব্ব লাস্য-ভঙ্গিমায় নাচিতে নাচিতে মা রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণা হইলেন। দর্শকবৃন্দের তরফ হইতে সজোরে হাততালি পড়িল। কেহ কেহ বা ভক্তিভরে উঠিয়াও দাঁড়াইলেন। কেহ ফুল ও রুমালে বাঁধা প্যালাও ছুঁড়িলেন। কালিদাস-ভবভূতির যুগের মেয়েরা যে ধাঁচে কাপড় পরিত, মারও পরনে সেই বেশ। চারুবাবু-সঙ্কলিত বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্যের পূর্ণবাবুর হাতে আঁকা পটের রাধাই মনে হয় বটে। মা ভাবনৃত্যে বিভোর। সমবেত ভক্তমণ্ডলীর নিশ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ। দেবীর চোখ জলে ভরিয়া আসিয়াছে, কুন্তী দেবীর মাথা ঘুরিতেছে। অমন ডাকসাইটে ছেলে অজয় পর্য্যন্ত একেবারে চুপ। একা মা নাচিতেছেন, আর কীর্ত্তনিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া গাহিতেছে—

কৃষ্ণ কালো তমাল কালো তাই তো কালো ভালবাসি সখী
মরিলে তুলিয়ে রেখো তমালেরই ডালে
দেখো যেন ভুলো না সখী।

ঘণ্টাখানেক পরে রুদ্ধশ্বাস ভক্তবৃন্দদের নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ দিয়া মা-মহামায়া নৃত্য থামাইয়া নামিয়া আসিলেন।

ইতিমধ্যে পাশের ঘরে গিয়া এক গ্লাস পেস্তা-বাটা মাখন ও মিছরি মিশ্রিত উষ্ণ দুগ্ধ (রং ও গলা ভাল থাকে, চামড়া মসৃণ লাবণ্যযুক্ত হয়)

এবং এক কাপ আনারসের রস (ফ্যাট কমে) পান করিয়া আসিয়াছেন। নিন্দুকেরা বলে প্রসাধনেও নাকি কিছু কিছু কারিগরি সামলাইয়া লইয়াছেন।

কুন্তী। (সগর্ব্বে পুত্রের প্রতি) কেন, কিসের টানে এখানে আসি বুঝতে পারলি। যত বাজে মেয়ে নিয়ে তোর কারবার। রূপে গুণে, ধর্ম্মে, জ্ঞানে এমনটি আর কোথাও পাবি না। একেবারে নিখুঁত, কি বলিস ?

অজয়। (অভিভূত মুগ্ধ বিস্ময়ে) সত্যি মা, অদ্ভুত! চমৎকার! (স্বগত) মার্ভেলাস, এ বয়সেও এমন চার্মিং, ষোল বছরের মেয়েরাও ওঁর পাশে দাঁড়াতে এলে মার খেয়ে হার মেনে যাবে। মিছেই শুধু এতকাল ধ'রে পান্‌সে অ্যাংলোগুলো আর থিয়েটারের ওই নাচওয়ালী পেত্নীগুলোর পেছনে টাকা ঢেলে ঢেলে রোগ কিনলাম। মায়া-আশ্রমের যে এত মজা, আগে জানলে কোন্‌কালে আশ্রমবাসী হয়ে পড়তাম।

কুন্তী। তোকে এখানেই রেখে যাব। বাড়িতে তোর বাবা আর ওই বউটা তোকে অষ্টপ্রহর টিকটিক ক'রে টিকতে দেয় না। এখানে ওঁর অমন যত্ন-আওতায় থাকলে দুদিনে তোর রোগবালাই সারবে। ওঁর কাছে ভাল ভাল তত্ত্বকথা শুনলে, দু দিনে মন ফিরে যাবে তোর। চুপচাপ ক'রে থাকবি তো এখানে ? না পালাই পালাই করবি ? যে চঞ্চলমতি ছেলে বাপু তুই।

অজয়। এমন জায়গায় থাকব না ? আলবৎ থাকব। (স্বগত) একে বিলিতী ক'রে ভেনাস, ক্লিওপেট্রা, হেলেনও বলা যেতে পারে, আবার স্বদেশীয়ানা ক'রে উর্ব্বশী মেনকাও বলা যায়।

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দনবাসিনী উর্ব্বশী।

তুমি আর আমায় বাড়ি ফিরতে ব'লো না মা। ওই থসথসে ভিজে কাঁথার মত ওই বউ, আর রামকাঁদুনে ইঁদুরছানার মত এক ছেলে। ছোঃ, অসহ্য।

কুন্তী। (চিন্তিতমুখে) কিন্তু তোর বাবা যা ওঁর ওপরে চটা,

এখানে এসে আছিস শুনলে কি আর রক্ষে রাখবেন? ওঁর সব সম্পত্তি হাসপাতালে দিয়ে যাবেন। তোকে একটি আধলাও দেবেন না। আচ্ছা, সে আমি ঠিক মানিয়ে নেব 'খন।

অজয়। সম্পত্তি না দিলেন তো ব'য়েই গেল। এমন মা পেলে জগতের সব ক্ষতি সহ্য হয়। (সোৎসাহে) ঠিক হয়েছে। তুমি বাবাকে একদিন ভুলিয়ে ভালিয়ে এখানে আনতে পার? বাস্, দেখবে, সব প্রবলেম জলবৎ তরলং হয়ে গেছে। বাবা তখন মা-মহামায়াকেই না সব লিখে দিয়ে যান। তাই বা মন্দ কি? আমরা সবাই মিলে তখন আশ্রমসেবক হয়ে যাব। বেবীর বুঝি ওই ঘাড়-ছাঁটা ছেলেটার দিকে মন পড়েছে? ফুল দেওয়া-নেওয়া করছে দেখছি। তা মন্দ কি? মা-মহামায়াকে ব'লে ওদের বিয়েটা লাগিয়ে দাও। কি বলছ? জাতে ধোপা? তাতে কি? তিন আইন ছ আইন কতই আছে তো। হাতে পয়সা, বিলেতফেরত, মনের মিলও হয়েছে। বিয়ে না হয়, ইলোপমেণ্টও করতে পারে। আর মোদ্দা একটি কথা ব'লে রাখি মা, ওই প্যানপেনে সতী-সাধ্বী বউটাকে তোমার বাপের বাড়ি চালান ক'রে দাও। ওটার নাকী কান্নার জন্যেই বাবা আমায় অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছেন।

মাতাপুত্রের কথার মাঝখানে মহামায়া আসিয়া দাঁড়াইলেন। কুন্তী দেবী, বেবী ও অজয় প্রণাম করিল।

মহামায়া। আঃ, থাক থাক। বলেছি না, ওসব আমি ভালবাসি নে?

মহামায়া। (অজয়ের চোখে চোখ রাখিয়া মুগ্ধ বিস্ময়ে) এটি কে? চিনতে পারছি নে তো! কি কমনীয় ওর মুখশ্রী! ঠিক যেন আমার ধ্যানের শ্রীকৃষ্ণ দিব্যমূর্তি ধ'রে ধরার ধূলায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

কুন্তী। (বিগলিত মুখে) আমার ছেলে। ওর কথাই আপনাকে বলেছিলাম মা।

মহামায়া। তুমি থাকবে এখানে?

অজয়। আপনি রাখলেই থাকি।

মহামায়া। (হাসিয়া মিষ্টস্বরে) তুমি থাকলেই রাখি।

বেবী। (মহামায়াকে) আপনার সঙ্গে আমার একটি গোপন পরামর্শ আছে।

মহামায়া। বেশ তো, চল ওদিকে। (যাইতে যাইতে) তুমি যে দিন দিন সর্ব্বনাশা অগ্নিশিখার মতই রূপময়ী হয়ে উঠছ বেবী। ব্যাপারখানা কি? কাকে পুড়িয়ে মারবার মতলব? প্রবীর নিশ্চয়। ঠিক ধরেছি, না?

বেবী। না না, বাজে কথা নয় মা। আপনি একটা উপায় ব'লে দিন। বাড়িতে বাবা বড় বিশ্রী ব্যাপার শুরু করেছেন। দেখা হ'লেই ডারলিং, তুই গায়ে লাগছিস, সুন্দর হচ্ছিস, সুইটি; তোর চুল আমার মায়ের মত, রং আমার ঠাকুমার মত—হেনো তেনো সাত সতেরো রূপব্যাখ্যানা! ওসব আমার ভাল লাগে না। বিশ্রী কদর্য্য মনোভাব। মা তো ওইজন্যেই বাবাকে সইতে পারেন না। সারাক্ষণ শুধু আদর সম্বোধন আর ডিয়ার ডিয়ার ডারলিং—যত অশ্লীল নাটুকেপনা! আমি ওখানে থাকব না তা হ'লে।

মহামায়া। (ছোট্ট মেয়ের মত খিলখিল করিয়া হাসিলেন) বাঃ রে, তোমার আর তোমার মায়ের ভাগ্য দেখে তো হিংসেই হচ্ছে আমার। আমায় কেউ অত আদর করলে আমি তো বর্ত্তেই যেতাম। তোমাদের মায়ে-ঝিয়ের সব উল্টো হিসেব বাপু। বীজ যিনি পুঁতবেন, ফলেমূলে সমৃদ্ধিশালী হ'লে, সে গাছটিকে তিনি প্রশংসাও করতে পারবেন না! এ তোমার অন্যায় বিচার বেবী। তোমার বাবা অত্যন্ত রসিক সুজন ব্যক্তি। চল, তোমার দাদার সঙ্গে আলাপ করিগে। কি সুন্দর ওর চোখ দুটি! চাইলেই মন কেড়ে নেয়।

বেবী। ওই চোখের জন্যেই তো দাদার ছেলেবেলা থেকে মেয়েমহলে আদর। ব'খেও গেল ওই ক'রে। কিন্তু বাজে কথা নয়। আমি কি করব বলুন? (উভয়ে আগাইয়া চলিলেন।)

মহামায়া। তোমার একমাত্র উপায় দেখছি প্রবীরকে নিয়ে কোন দূরদেশে পালিয়ে যাওয়া। কারণ প্রবীরের পয়সা খেতাব থাকলেও, ধোপার ছেলে জামাই, তোমার বাবা সইবেন না।

তিন

রাত্রি প্রায় দেড়টা। উজ্জল আলোকিত একখানি অতি-আধুনিক রকমে সুসজ্জিত শয়নকক্ষে অজয় একা। অস্থিরভাবে কখনও অল্পক্ষণ বাজনা বাজাইতেছে, কখনও ছবির অ্যালবাম ঘাঁটিতেছে, একবার একটি বই উল্টাইয়া দেখিল, পরক্ষণেই পাদচারণা শুরু করিল। মা-মহামায়া হাতে এক গ্লাস দুধ, কিছু কাটা ফল ও মিষ্টি লইয়া ঢুকিলেন।

মহামায়া। লক্ষীটি, শোবার আগে এইটুকু খেয়ে নাও দেখি। আজ তোমায় আমি গীতা প'ড়ে শোনাব।

অজয়। রোজ রোজ বলছি, ওসব আমি চাই নে চাই নে চাই নে। কেন আমায় জোর ক'রে ধ'রে রেখেছ মায়া? ছেড়ে দাও এবার।

মহামায়া। কি চাও তবে তুমি, বল?

অজয়। (ক্রুদ্ধ চোখে) কি চাই, তা তুমি জান না, না?

মহামায়া। (নাটকীয় বিস্ময়ে) ও মা, দেখ দিকি ছেলের কথা! আমি কি অন্তর্য্যামী ভগবান না কি যে, কারও মনের কথা টের পাব?

অজয়। বেশ, না জান ক্ষতি নেই। তোমার পায়ে ধরি এবার ছেড়ে দাও আমায়, আর মিছে ধ'রে রেখো না। এ কারাবাস আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে। কালই ভোরে চ'লে যাব আমি।

মহামায়া। ওয়াটার ওয়াটার এভরিহোয়্যার, নট এ ড্রপ টু ড্রিঙ্ক। কি বল? (মধুর দুষ্ট হাসি হাসিয়া) জানি গো জানি, আমি সব জানি, দেখবে?

দেওয়ালের আলমারির তালা খুলিয়া জনি ওয়াকার, সোডা, এক প্লেট ঝাল মাংস, কাঁকড়ার তরকারি, সিগারেট ও দেশলাই টেবিলে রাখিলেন। মায় দেশলাই জ্বালাইয়া সিগারেটটি পর্য্যন্ত ধরাইয়া দিলেন।

মহামায়া। দেখলে জানি কি না? সব গুছিয়ে রেখে গেছি এক ফাঁকে। কারণ (চুপিচুপি) তোমায় হারানোর ক্ষতি আমার সইবে না। (খানিক পরেই কহিলেন) কিন্তু আজ আর আমায় নাচতে ব'লো ব'লো না বাপু। বাতের ব্যথাটা আবার দিব্যি চাগিয়েছে দেখছি।

ইহার পরের খবর আর জানি না। তবে অজয়ের মত ডাকসাইটে ভবঘুরে ছেলে পর্য্যন্ত একেবারে ভেড়া বনিয়া গিয়াছে। আর কোথাও

যাইবার নামটি পর্য্যন্ত করে না, এবং শোনা যায়, মা-মহামায়ার প্রোপাগাণ্ডা-মিনিস্টারের পদটি পর্য্যন্ত সে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে।

চার

দিন কয়েক পরের কথা। সেদিন অধিবেশনশেষে অন্য ভক্তরা সবে বিদায় লইয়াছেন। হলঘরে বেবী, কুন্তী দেবী ও অজয় মা-মহামায়াকে ঘিরিয়া গল্প করিতেছিল। এমন সময় ঝড়ের মত বেগে ক্রুদ্ধ সত্যপ্রিয়ের প্রবেশ। তাঁহার সঙ্গে একগলা ঘোমটায় মোড়া অজয়ের স্ত্রী বিমলা। বিমলার কোলে কচি খোকা।

সত্যপ্রিয়। (বিমলাকে) এস তো মা, দেখি, সোনার প্রতিমা বউ ফেলে বাঁদর কিসের টানে এখানে আস্তানা গেড়েছে! (বেবীর প্রতি) কই, তোমার মেরী কুইন অব স্কটস—মহামায়া দেবী কোথায়? আমার সাজানো বাগান, আমার সোনার সংসার পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দিয়েছে ওই রাক্ষসী। কোথায় এখন? ডাক তাকে। নীরবে অনেক সহ্য করেছি, আর নয়।

মা-মহামায়া অপূর্ব্ব লীলায়িত ভঙ্গীতে সত্যপ্রিয়র সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন বিদ্যুৎবর্ষী মধুকটাক্ষ হানিয়া, হাসিতে রাঙা ফুল ফুটাইয়া সুধামাখা স্বরে শুধাইলেন, আমায় কিছু বলবেন?

সত্যপ্রিয় সেন, দেশবিশ্রুত ডাক্তার সত্যপ্রিয় সেন, কুন্তী দেবীর একান্ত অনুগত স্বামী সত্যপ্রিয়, অজয়-বেবী-ছবির বাবা সত্যপ্রিয়, বিমলার শ্বশুর সত্যপ্রিয়, বিমলার ছেলের পিতামহ সত্যপ্রিয়, নিতাই-খানসামা-বয়ের মনিব সত্যপ্রিয় সেন আজ এক মুহূর্ত্তের জন্য জগৎ ভুলিলেন। হতভম্বের মত দুই পা পিছাইয়া আসিলেন, পরক্ষণেই তিন পা আগাইয়া গেলেন। তারপর বিস্ময়ে বিস্ফারিত আবেগে উদ্বেলিত প্রেমে মন্ত্রমুগ্ধ সত্যপ্রিয় কহিলেন, মায়া, তুমি? মাই ওল্ড ফ্লেম, মাই ফার্স্ট সুইট ড্রিম, মাই লাভ, তুমি এখানে! সেই যে পঁচিশ বছর আগে দার্জ্জিলিং স্নো ভিউ থেকে অকারণে অভিমান ক'রে তুমি নিরুদ্দেশ হ'লে, তারপর দেশদেশান্তরে কত খুঁজেছি, কত কেঁদেছি, আর শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে যখন করতেই হবে, ওই কুন্তীকে বিয়ে করলাম। আজ এতদিন পরে—, এ কি স্বপ্ন? কি আশ্চর্য্য!

মহামায়া। হ্যাঁ, সে রাত্রে ঝগড়াটা হবার পর হঠাৎ মনে হ'ল যে, তোমাকে বিয়ে করলে দুঃখ অনিবার্য্য। রাতে চুপিচুপি বেরিয়ে সোজা গেলাম গ্রোভে অশোক গুপ্তর ফ্ল্যাটে, তোমার মত অত দহরম-মহরম ওর সঙ্গে ছিল না সত্যি, কিন্তু বেশ কিছু পরিচয় ছিল তা তুমি জান। সেখান থেকে দুজনে আলমোরায় চ'লে গেলাম বিয়ে করব ব'লে। সেখানে গিয়ে সবে নেমেছি, কোত্থেকে খবর পেয়ে তার মা এসে ওত পেতে ব'সে ছিল, সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধ'রে নিয়ে গেল। এক সপ্তাহের ভেতর সুসেন রায়ের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়েও হয়ে গেল। রাগে দুঃখে অপমানে কলকাতায় ফিরেই বিয়ে ক'রে ফেললাম আদিত্য গুপ্তকে। বেচারা অনেক কাল থেকে ধৈর্য্য ধ'রে অপেক্ষা করছিল।

সত্যপ্রিয়। (উৎসাহভরে) করবেই তো। তুমি যে তখনকার একটি প্রধানতমা বালিগঞ্জ বিউটি ছিলে, কত পাঁচ ছেলের বাপ তোমার জন্যে লোরেটোর পাঁচিল টপকাবার ধান্ধা করত। কিন্তু কি নামটি বললে? আদিত্য গুপ্তকে বিয়ে করলে?

উপস্থিত প্রত্যেকেই চমকাইয়া উঠিল।

মহামায়া। হ্যাঁ গো, চেনো নিশ্চয়। মস্ত ধনী। প্লাইউডের ফলাও কারবার। ভদ্রলোক, মিথ্যে কথা বলব না, সুখেই রেখেছিল খুব। কিছুরই অভাব ছিল না, একটা মেয়েও হ'ল। তবে জান তো আমার চালচলন। একেবারে পর্দ্দানশীন সেলিমাবেগম ক'রে রেখেছিল। তা আমার সইবে কেন? একদিন বেশ মোটা কিছু টাকা আর গয়নাগাঁটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আর কি? এই তো দেখছই আজ।

বিমলা এতক্ষণ ঘোমটা তুলিয়া অবাক বিস্ময়ে গল্প শুনিতেছিল। এক্ষণে সহসা আগাইয়া আসিয়া মা-মহামায়াকে ঢিপ করিয়া প্রণাম করিল।

বিমলা। মা, মা, তুমি তবে বেঁচে আছ? বাবা যে বলেন, তুমি পুরীর সমুদ্রে ডুবে গেছ মা। উঃ, এতদিন পরে মা পেলাম?

মহামায়া মেয়ের মাথায় স্নেহস্পর্শ রাখিলেন।

অজয়ও আসিয়া শাশুড়ীকে প্রণাম করিল। ডাকিল, মা, আশীর্ব্বাদ?
মহামায়া। বেঁচে থাক বাবা। ভাগ্যমানী হও। (আশীর্ব্বচন করিলেন।)
কুন্তী। সে কি, আদিত্য গুপ্তের স্ত্রী তুমি? বউমার মা? আমার অজুর শাশুড়ী? দিদি দিদি, বেয়ান ভাই! (আগ্রহে মহামায়াকে জড়াইয়া ধরিলেন।)
বেবী। কি আশ্চর্য্য! আপনিই আমার মাউইমা? (প্রণাম করিল।)

এই পরিপূর্ণ মিলন-উৎসবে শুধু একটি দুঃখের সংবাদ রহিয়া গেল। অজয়ের ছেলেটির এখনও দিদিমা ডাকিবার বয়স হয় নাই। তবে সান্ত্বনা, সে কিছুদিন পরেই ডাকিবে।

* * *

অবাক হইয়া যদুদার গল্প শুনিতেছিলাম। যদুদা থামিতেই কহিলাম, কি বলছ যা তা? যত গাঁজা; এ হতেই পারে না; রাবিশ, এ আমি বিশ্বাসই করি না।

যদুদা গম্ভীরমুখে কহিলেন, আমিও না।

কহিলাম, তবে?

যদুদা এবার চোখ নাচাইয়া হাসিয়া কহিলেন, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর অতিআধুনিক সাহিত্যগুলি প'ড়ে শেষ করবার পর, স্বনামধন্য মনীষী ফ্যালারামবাবু একটি পুরাতন প্রবাদে নতুন লেজুড় জুড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। এভরিথিং ইজ ফেয়ার ইন লাভ অ্যাণ্ড ওয়ার ছিল তো? কথাটাকে আরও বাড়িয়ে 'অ্যাণ্ড লিটারেচা'র জুড়ে ছেড়েছেন।

প্রতিবাদে কিছু বলিতে যাইতেছিলাম। যদুদা হাত নাড়িয়া থামাইয়া দিলেন। কহিলেন, আরে ভায়া, কলির শেষ পোয়া পূর্ণ হতে চলল। আজকের এই জগতে অসম্ভব ব'লে কিছু আছে নাকি? জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করলে, ইংরেজ রাশিয়া বনাম ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম কম্যুনিজ্‌মে গলাগলি হ'ল, নাকখ্যাবড়া অসভ্য জাপান সভ্য-সমাজকে গোল্লা খাওয়ালে, মুসোলিনীর পতন হ'ল, মায় চেতাবনীর দৌলতে

আমরা সত্যযুগ পর্য্যন্ত চোখে দেখে নিলাম। এতই বিপরীতবর্ণের সব অঘটন ঘটছে, আর নগণ্য একটা গল্প কি আর এমনটি হতে পারে না?

যদুদার কথাগুলি যুক্তিসঙ্গত। হার মানিয়া শেষ পর্য্যন্ত সায়ই দিলাম।

শ্রীমতী গোপা বসু

[যদুদার গল্পটির নাট্যরূপ সম্প্রতি কলিকাতায় প্রদর্শিত হইয়াছে, যাঁহাদের আসিবার কথা তাঁহারা সকলেই আসিয়াছিলেন, মহামায়া-আশ্রমের স্ত্রী-পুরুষেরাই অভিনয় করিয়াছিল। শুনিতেছি ফেচুগঞ্জের বেতারকেন্দ্রেও নাটকটি অভিনীত হইবে।]

পরিচয়

আমরা তিমির-রাত্রিতলে
দলে দলে চলিতেছি, দলে দলে করিতেছি ভিড়—
গায়ে গায়ে ছোঁয়া লাগে স্পর্শটুকু হয় শুধু চেনা;
মনের গহনলোকে কল্পনার মায়ার পরশ
কখনো রচনা করি, হয় না গভীর পরিচয়।
আঁধারের চন্দ্রাতপ-তলে
রচিয়া বিভিন্ন নীড়, কুণ্ডে কুণ্ডে ক্ষীণ বহ্নি জ্বালি
ছায়ামূর্তি সম মোরা নিত্য করি রাত্রির উৎসব।
হে অচেনা, পথ ভুলে গিয়েছিনু তোমার গণ্ডিতে,
চকিতে হইল চেনা মশালের প্রদীপ্ত আভায়,
তুমি মোরে শুনাইলে তিমিরের বন্দনা-সঙ্গীত।
আলো-অন্ধকারে
সঙ্গীতের ব্যবধান অকস্মাৎ দূর হ'ল বাহুর বন্ধনে।

তুমি শিল্পী—আমি কবি, এই পরিচয়
বিলুপ্ত হইয়া গেল। মানুষের আবেদন মানুষের কাছে—
(দেহের বন্ধনে বাঁধা অসহায় হায় রে মানুষ !)
অন্ধকারে সত্যতর হয়ে ওঠে দেহের সঙ্গীত।

আমরা বিদেহী নহি, সে নহে মোদের অপরাধ,
ভয় পেয়ে করাঙ্গুলি খুঁজে মরে অঙ্গুলি-আশ্রয়—
ছন্দ-মায়াজাল হতে সেই সত্য এ গাঢ় তিমিরে।
গনিও না অপমান, ওগো বন্ধু, কর মোরে ক্ষমা,
মানসের বার্তা হতে বড় বার্তা এই দেহে আছে,
নভ-পরিচয় হতে বড় মৃত্তিকার পরিচয়।
কবিতা—বিদেহী সুর শব্দের আকাশে মরে ঘুরে,
দুই দেহ এক হয় জীবনের ঘনিষ্ঠ স্পন্দনে।

শোন বন্ধু, সত্য কহি শোন।
ছন্দোবদ্ধ কাব্যে মোরা জীবনের গাহি জয়-গান ;
জীবনে বাসি না ভাল—প্রেমহীন নিষ্ফল জীবন।
সে কাব্য আমার নহে,-হে মোহান্ধ, মোরে কর ক্ষমা—
জীবনেরে দূরে ঠেলি পাখা মেলি কাব্যের অসীমে
এ আঁধারে কাজ নাই কুড়ায়ে ধরার করতালি।
তুমি শিল্পী, আমি কবি—মনোরাজ্যে ভিন্ন মোরা দুয়ে,
মিলিবার পথ নাই ছন্দে সুরে ভাবে ও ভাষায় ;
শিল্পের বিচিত্র লোকে এ উহার জন্মাই বিস্ময়।
গুণীরে চাহি না আমি, এ আঁধারে নেমে এস তুমি—
হাতে হাত রাখি মোর নিরুদ্বেগে আত্মসমর্পণ
না যদি করিতে পার, জীবলোকে দিও গো বিদায়—
কাব্যলোকে মিলনের তাহাতে হবে না অন্তরায়।

সংবাদ-সাহিত্য

গোড়ায় কিছু কাজের কথা বলি।

কাগজ-সমস্যা জটিলতর হইবার ফলে 'শনিবারের চিঠি' প্রকাশে এই বিলম্ব অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। পাঠকগণের কাছে পূর্বেই আমাদের নানা অসুবিধার কথা নিবেদন করিয়া রাখিয়াছি। আজ ৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে "সংবাদ-সাহিত্য" লিখিতে বসিয়া সর্বাগ্রে তাঁহাদিগকে আবার সেই কথাটা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। বাংলা দেশের বৃহত্তম কাগজের মিলের কর্তৃপক্ষ আমাদিগকে মাসে মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাগজ সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়াও কোন্ কারণে তাহা রক্ষা করিতেছেন না জানি না, ফলে আমরা বাধ্য হইয়া অন্য মিল হইতে অথবা তিমিঙ্গিল-ধর্মী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে কাগজ লইয়াছি। আমাদের এই অপরাধে প্রথমোক্ত মিল আমাদের উপর চোখ রাঙাইয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহারা কাগজও দিবেন না, পথও ছাড়িবেন না। আমরা বিনীতভাবে পুনর্বার তাঁহাদের ধর্মবুদ্ধির নিকট আবেদন জানাইয়াছি। তাঁহারা কৃপা করিবেন এই আশায় এখনও আমাদের পাঠকদের সম্বোধন করিতে পারিতেছি। তাঁহারা ভিন্ন মূর্তি ধরিলে আমাদিগকেও রূপান্তর পরিগ্রহ করিতে হইবে। আশা করিতেছি, তাহার প্রয়োজন হইবে না।

গত পক্ষকালের মধ্যে দৈনিক সংবাদপত্রে কাগজ-সমস্যা সম্পর্কে নানা চিঠিপত্র, সভার বিবরণী ও সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। সমস্যা-সমাধানের চারিটি মাত্র উপায় দেখা যাইতেছে। এক, অসামরিক ব্যবহারের জন্য শতকরা ত্রিশ ভাগকে কিছু বাড়াইয়া দেওয়া; দুই, বৈদেশিক কাগজ বেশি পরিমাণে আমদানি করা; তিন, চোরাবাজার বন্ধ করিয়া কাগজের বাজারে ধর্ম এবং সাম্য বজায় রাখা; এবং চার, অনাবশ্যক পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক মুদ্রণ আপাতত বন্ধ রাখিয়া যাহা একান্ত প্রয়োজন তাহার প্রচার অব্যাহত রাখা। প্রথম তিনটি উপায় সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে হওয়া সম্ভব নয়; চতুর্থ উপায় অবলম্বিত হওয়া এই কারণে সম্ভব নয় যে, প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের বিচার কে করিবে! সুতরাং আমরা একান্তভাবে কাগজ-প্রস্তুতকারকদের খামখেয়ালী দয়ার উপর নির্ভর করিয়া যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকিতে বাধ্য হইব। তাঁহাদের

দয়া-ধর্ম ও ন্যায়বুদ্ধির তারিফ করিয়া করিয়া তাঁহাদের সহৃদয়-হৃদয় বিদীর্ণ করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই। পয়সা দিয়া এরূপ চোর বনিয়া থাকার ইতিহাস পৃথিবীতে এই নূতন। তাই মনে হইতেছে, ইতিহাসে পরিবর্তন আবশ্যক হইয়াছে। সে পরিবর্তন কি আমরা সাধন করিতে পারিব ?

* * *

এই গেল ব্যক্তিগত কাজের কথা। সম্প্রদায়-গত কাজের কথা মাধ্যমিক শিক্ষাবিল-সংক্রান্ত। ইহার ফলে আমাদের কি ক্ষতি অথবা সর্বনাশ হইবে, তাহা সম্যক না বুঝিলেও আমরা এই বিলের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। কারণ, আমাদের আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, আমাদের শ্যামাপ্রসাদ এবং হিন্দু-মুসলমান অন্যান্য আরও যে সকল নেতাকে আমরা ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকি তাঁহারা সকলেই বলিতেছেন, এই বিল বিধিবদ্ধ হইলে বাংলার হিন্দু-সমাজের সর্বনাশ হইয়া যাইবে। শুনিয়া মনে হইতেছে, পুরা সর্বনাশ তাহা হইলে এখনও হয় নাই। বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে কৃষক-প্রজাদলের দুই-একজন মুসলমান নেতা যুক্তির সহিত বলিয়াছেন যে, ইহা মুসলমান-সমাজেরও অকল্যাণ আনয়ন করিবে। ইহা সত্য জানিয়া আমাদের প্রতিবাদ তীব্রতর করিতেছি। বাংলা দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, পাঠ্যপুস্তকাদি যে সমিতি এই শিক্ষাবিলের পরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করিবেন, সেই সমিতির সদস্যদের বৃহত্তম অংশ সরকারকর্তৃক মনোনীত হইলে এই লোক-দেখানো ঘনঘটার প্রয়োজন কি ? মারিবার জন্য সরকারী স্লটার হাউস যেখানে খোলা আছে, সেখানে সমারোহ করিয়া কালীঘাট পর্যন্ত আমাদিগকে টানা হইতেছে কেন ? সুতরাং এই শিক্ষাবিল অনাবশ্যক, অযৌক্তিক ও নির্দয়।

* * *

জাতিগতভাবে আমাদের অবস্থা সর্বাঙ্গসুন্দর হইতে আর বাকি নাই। পূর্বপ্রত্যন্তে ইংরেজ ও কমিউনিস্ট মতে ভারতবর্ষের বৃহত্তম ও নৃশংসতম শত্রু জাপানীরা ওত পাতিয়া বসিয়া আছে; পশ্চিমে চব্বিশপরগণা-মেদিনীপুর-চুম্বী লবণাক্ত সমুদ্র ও অজয়-দামোদর-দ্বারকেশ্বরের অকস্মাৎ জলোচ্ছ্বাস, অনাবৃষ্টি ও ম্যালেরিয়া মহামারী; সারা বাংলা দেশ জুড়িয়া বিগত ও আসন্ন দুর্ভিক্ষের স্মৃতি ও শঙ্কা এবং

গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকম্ একজ্বরীবৎ ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। বাঙালীর প্রাণশক্তি যে কতখানি প্রবল, এই বহুবিধ মৃত্যু-সমারোহের মাঝখানেও তাহার ধুকধুক হৃদ্‌স্পন্দন তাহার প্রমাণ দিতেছে। যাঁহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, গত পঞ্চাশ সনের মহামন্বন্তরে বাঙালী জাতির অধমাঙ্গ সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত (মৃত্যুজনিত) হইয়াছে, তাঁহারা আজিও দৈনিকপত্রে কলিকাতায় দুর্ভিক্ষগ্রস্ত লোকের মৃত্যুসংখ্যা প্রকাশিত হইতে দেখিয়া হয়তো চমকাইয়া চমকাইয়া উঠিতেছেন। কিন্তু এই সংখ্যা প্রকাশের দ্বারা কি ইহাই প্রমাণিত হইতেছে না যে, রবীন্দ্রনাথের গল্পের কাদম্বিনীর মত ইহারা মরিয়া দেখাইতেছে যে ইহারা বাঁচিয়া ছিল। সরকার দুর্ভিক্ষের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া মৃত্যুর হার দেখাইয়াও যে সত্যের মহিমা স্বীকার করিতেছেন, সেটাও কি কম কথা !

* * *

কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিতে গেলে বুঝা যাইবে, এটি সরকারী ভ্রান্তি মাত্র, আসলে সরকার বাহাদুর প্রবল উদ্যমে প্রচুর অর্থব্যয়ে জীবনেরই জয়গান করিতেছেন—"গ্রো মোর ফুড—ফসল বাড়াও" নামক জাতীয় সঙ্গীতে। যেখানে গ্রামে গ্রামে নামমাত্র ফসল ফলাইয়াও শুধু কিষাণ-মজুরের অভাবে মাঠের ধান ঘরে তোলা সম্ভব হয় নাই, যেখানে হাজার হাজার বিঘা সুফলা জমির উপর পুষ্পকরথের নৃত্য দেখিয়াও চাষী-মজুরেরা স্থানান্তরে পলায়ন ও ভিক্ষাপাত্র হস্তে মৃত্যু বরণ করিয়াও বিদ্রোহ করে নাই, সেখানে দীর্ঘদিনের পতিত জমিতে ফসল ফলাইবার এই হুকুম পঞ্চাশোর্ধ্বগতা বিধবার পুনর্বিবাহ হুকুমের মত কৌতুকপ্রদ নয় কি ? বাংলা দেশে ভাল জমি যদি সত্যই কোথাও অনাবাদী পড়িয়া থাকে, তাহা আছে এই সকল ফসল-বাড়াও আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের উর্বর মস্তিষ্কে। হাজার হাজার হ্যাণ্ডবিল ও প্রচার-পুস্তিকা সর্বত্র ছড়াইয়া ইহারা সাদা কাগজ ও ছাপাখানার ব্যবসায়ীদের ফসল বাড়াইয়া নিজেদের কতখানি উপকার সাধন করিতেছেন জানি না—বাংলা দেশের ফসল এক ছটাকও বাড়িতেছে না। তাহা করিতে হইলে ছাপাখানা ও কাগজের দোকান ছাড়িয়া কলেরা-ম্যালেরিয়া-সাপ-শিয়াল-অধ্যুষিত গ্রামে গ্রামে ধাওয়া করিতে হইবে, মৃতকল্প চাষীদের দেহে স্বাস্থ্য ও প্রাণে

আশার সঞ্চার করিতে হইবে এবং সর্বোপরি গোখাদক সৈন্যদের কবল হইতে চাষীর হালের গরু-মহিষদের রক্ষা করিতে হইবে। এই সব করিতে ইঁহাদের দায় পড়িয়াছে। চাষীরা হাজারে হাজারে কলিকাতায় সিনেমা দেখিতেছে, মাসিকপত্রাদি পড়িতেছে—সুতরাং ইঁহারা সিনেমার পর্দা ও পত্রিকার পৃষ্ঠা 'ফসল বাড়াও' বিজ্ঞাপনে ভরাইয়া দিতেছেন। বাংলা দেশের ফসল চমৎকার বাড়িয়া চলিয়াছে।

*　　　*　　　*

গোপালদার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়াছে বলিয়া আজকাল তাঁহার কথায় বড় একটা আমল দিই না—আমাদের অসহায় অস্বাচ্ছন্দ্য ভাব দেখিয়া সেই পাগলই একদিন একটা উপায় বাতলাইয়া দিলেন। বলিলেন, মরিবেই তো একদিন; বীরের মত মর। কাগজ সরবরাহ বন্ধ করিয়া তোমাদের কাগজ একদিন উঠাইয়া দিবে, তাহা ঘটিতে দিও না। র‍্যাঙ্ক সিডিশন লেখ। উহারাই নোটিশ দিয়া কাগজ বন্ধ করিয়া দিবে। জেলে লইয়া গেলে অধিকন্তু লাভ।

এই উপায় আমাদের পছন্দ নয়, এই স্তিমিত পত্রিকা-জীবনযাত্রা কোনক্রমে নির্বাহ করিতেই হইবে। খোশামোদি করিয়া মোসাহেবি করিয়া ভাঁড়ামি করিয়া এবং মাঝে মাঝে বিকল্পে চোখ রাঙাইয়া আর সবাই যেমন টিঁকিয়া আছে, আমাদিগকে তেমনই করিয়াই টিঁকিয়া থাকিতে হইবে। "কর্ণ-কুন্তী সংবাদে"র কর্ণের মত আমাদিগকেও বলিতে হইবে—

আজি এই রজনীর তিমির-ফলকে
প্রত্যক্ষ করিনু পাঠ নক্ষত্র-আলোকে
ঘোর যুদ্ধফল। এই শান্ত স্তব্ধ ক্ষণে
অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে
জয়হীন চেষ্টার সঙ্গীত,—আশাহীন
কর্মের উদ্যম, হেরিতেছি শান্তিময়
শূন্য পরিণাম। যে পক্ষের পরাজয়
সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান।

*　　　*　　　*

এই নিরুদ্যম নিশ্চেষ্টতার মধ্যেই মহাত্মা গান্ধীর মুক্তি আমাদের মোহমুক্তির কি কোনও সূচনা করিতেছে? তিনি নিজের স্বাস্থ্য ও

জনাব জিন্নায় ভবিষ্যৎ লইয়া কতদিন ব্যস্ত থাকিবেন জানি না, কিন্তু আর আমরা সহিতে পারিতেছি না। কংগ্রেসের মধ্য দিয়া আমাদের জাতীয় জীবনে উচ্চনীচনির্বিশেষে যে চেতনা সঞ্চারিত হইয়াছিল, কংগ্রেসকে বেআইনী ঘোষণা করিয়া ভারত গবর্মেণ্ট সেই চৈতন্যকেই মো"গ্রস্ত করিয়াছেন। গান্ধীজীর মুক্তি আশাপ্রদ বটে, কিন্তু কংগ্রেসের মুক্তি এই দুর্দিনে সর্বাপেক্ষা অধিক কাম্য। দেবীচৌধুরাণী-রূপী প্রফুল্লকে ধরিবার জন্য যখন নদীবক্ষে আয়োজন চলিতেছিল, তখন প্রফুল্ল যে আশায় নিশ্চিন্ত ছিলেন, সেই ক্ষীণতম আশা কি আমাদের প্রাণেও সঞ্চারিত হইতেছে?

এদিকে পাঁচ দিক হইতে পাঁচখানা ছিপ আসিয়া বজরার অতি নিকটবর্ত্তী হইল। প্রফুল্ল সেদিকে দৃক্‌পাতও করিল না, প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির মত নিস্পন্দ শরীরে ছাদের উপরে বসিয়া রহিল। প্রফুল্ল ছিপ দেখিতেছিল না—বরকন্দাজ দেখিতেছিল না। দূর আকাশপ্রান্তে তাহার দৃষ্টি। আকাশপ্রান্তে একখানা ছোট মেঘ, অনেকক্ষণ হইতে দেখা দিয়াছিল। প্রফুল্ল তাই দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে বোধ হইল, যেন মেঘখানা একটু বাড়িল; তখন "জয় জগদীশ্বর" বলিয়া প্রফুল্ল ছাদ হইতে নামিল।

আমাদের বজরাখানাকে নানা দিক হইতে নানা ছিপ আসিয়া ঘিরিয়াছে; দুই-একটির মাত্র পরিচয় দিয়াছি, কিন্তু সবগুলিই সমান সর্বনাশা, সমান মারাত্মক। আমাদের ভাগ্যাকাশে কোথাও কি উদ্ধারকারী মেঘ দেখা দিয়াছে? "জয় জগদীশ্বর" বলিয়া আমরাও কি মুক্তিসাধনার কর্মক্ষেত্রে দেবী চৌধুরাণীর মত নামিতে পারিব?

—

গত প্রায় দুই মাস কাল অসুস্থ দেহে শয্যা আশ্রয় করিয়াছিলাম। এই অবস্থায় বাংলা সাহিত্য-জগতের নানা বৈচিত্র্য লক্ষ্যগোচর হইয়াছে, যাহা সুস্থদেহে সহজ অবস্থায় নজরেই পড়িত না। যুগপ্রভাব এমন প্রবল ও চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে যে, সাধারণ মানুষ আর স্বেচ্ছায় পথ চলিবার অধিকারী নয়, সম্মুখ ও পিছনের মানুষের ভিড় ও কর্তব্যের ঠেলা তাহাকে অনুক্ষণ নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে অনির্দিষ্ট লক্ষ্যে ঠেলিয়া লইয়া চলে। বাধা দিতে গেলে শুধু জখমই হইতে হয়, নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। রোগী সাজিয়া বসিয়া সাময়িকভাবে মুক্তি পাইয়াছিলাম। সমুদ্রতটে বালিতে বুক দিয়া পড়িয়া থাকিয়া যেমন

প্রবল ঢেউয়ের ধাক্কা সহজেই এড়ানো যায়, এ যেন তেমনই। ঢেউয়ের মাথায় চাপিয়া যাহারা দোল খায়, দোল খাওয়ার মত্ততাই তাহাদিগকে পাইয়া বসে—আশেপাশের আর কিছু দেখিবার অবকাশ তাহাদের হয় না। সময়ের তরঙ্গে আমরা সর্বদাই এরূপ দোল খাইয়া থাকি বলিয়া বহু বিচিত্র জিনিস আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। তরঙ্গচূড়াচ্যুত হইয়া খাটিয়া আশ্রয় করিলেই বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিতে হয়।

বিস্ময়ের সঙ্গে দেখিলাম, বাংলা দেশে যে সকল পুস্তক-পুস্তিকা বর্তমানে প্রকাশিত হইতেছে, তাহার শতকরা পঞ্চাশটিরও অধিক সোভিয়েট সভ্যতা, সোভিয়েট সংস্কৃতি, মার্ক্সবাদ অথবা রুশদেশ সম্পর্কিত। সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ গল্প কবিতার শতকরা চল্লিশ ভাগ হয় সোভিয়েট, নয় মার্ক্সীয়। সোভিয়েট ও মার্ক্সবাদ যেন ভূতের মতন বাংলা দেশ ও বাংলা সাহিত্যের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়া আছে। আমাদের নিজস্ব কোন বক্তব্য নাই, নিজস্ব কোন চিন্তা নাই, নিজস্ব কোন অনুভূতি পর্যন্ত আছে কি না সন্দেহ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষে একবার এইরূপ চিন্তাদৈন্য দেখা গিয়াছিল। বাঙালী তখন ইংরেজীতে হাসিত, ইংরেজীতে কাসিত এবং ইংরেজীতে স্বপ্ন দেখিত। আজ প্রায় শতাব্দী কাল পরে বাঙালী সোভিয়েট মতে হাসিতেছে, সোভিয়েট মতে কাসিতেছে এবং মার্ক্সীয় স্বপ্নে বিভোর হইয়া আছে। ইংরেজী শিক্ষায় অত্যধিক শিক্ষিত কয়েকজন ইয়ং-বেঙ্গল সেদিন মাতৃভাষা ও ভারতীয় সংস্কৃতির দিকে এক রকম গায়ের জোরে ঝোঁক দিয়া এক শোচনীয় ব্যর্থতা হইতে স্বদেশ ও স্বজাতিকে রক্ষা করিয়াছিলেন। সোভিয়েট সংস্কৃতিতে সত্য সত্যই সংস্কৃত আমাদের আধুনিক ইয়ং-বেঙ্গল বন্ধুরা কি এখনও নিশ্চিন্ত থাকিবেন?

* * *

মজা এই যে, এই সকল পুস্তক ও প্রবন্ধের অধিকাংশই দুর্বোধ্য—যাঁহারা লেখেন সম্ভবত তাঁহাদের কাছেও। মার্ক্সীয় দর্শন সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় পঞ্চাশটির অধিক বই দেখিলাম, কিন্তু কোনটিই ডায়ালেকটিকের চক্রান্তের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিল না, দাড়ির দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আসল মানুষটাই হারাইয়া গেল। বেফয়দা এতখানি কালিকলম ও কাগজ

কোনও দেশে কোনও কালে খরচ হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। [এই হিমালয়-প্রমাণ ব্যর্থতার মধ্যে শ্রীযুক্ত সুশোভনচন্দ্র সরকারের 'মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপ'-এ, বেনামীতে (অমিত সেন) তাঁহারই লেখা 'ইতিহাসের ধারা'য় এবং সরোজ আচার্যের 'মার্ক্সীয় দর্শন'-এ সফলতার কিছু পরিচয় পাইয়া সত্যই আনন্দিত হইয়াছি। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এ কথা এখানে জানাইয়া রাখিলাম।] কয়েকটি সাময়িক-পত্রে ইংরেজী বুকনি-মিশ্রিত মার্ক্‌স-চচ্চড়ি তো ক্রমশই আতঙ্কজনক হইয়া উঠিতেছে। যে সকল ধাড়ী লেখক এককালে "দোহাই মা কালী" বলিয়া অলাবুবিষয়ক প্রবন্ধেও গৌরচন্দ্রিকা ভাঁজিতেন, তাঁহারাই দেখিতেছি বুড়া বয়সে কার্ল মার্কসের তোবা:না করিয়া কথা বলেন না। এ এক ভাল জুয়াচুরি বাংলা দেশে চলিতে আরম্ভ হইয়াছে!

প্রবন্ধগুলা না হয় সভয়ে পাশে ঠেলিয়া রাখিতে পারিতাম, কিন্তু গল্পে কবিতাতেও কাস্তে হাতুড়ি ও লালে-লালের এমন ভয়াবহ ছড়াছড়ি যে, বাংলা দেশের রবিবার-শনিবারগুলা পর্যন্ত লাল হইয়া উঠিয়াছে। মদ সুলভ হইলে এ লালের তবু একটা অর্থ ছিল। এই পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার তীরে গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ সর্বাঙ্গে মাখিয়া নীপারের বাঁকের লালঝাণ্ডা উঁচা করিয়া উড়াইতে দেখিলে এ ম্যালেরিয়ার দেশেও গায়ে জ্বর আসে। জনস্রোতে ভিড়ের ঠেলায় এই বিচিত্র দশা কাহারও লক্ষ্য-গোচর হইতেছে না, সকলেই 'গৌর গৌর' করিয়া নাচিতেছে।

* * *

গত চৈত্র মাসের (ষষ্ঠ বর্ষ ৩য় সংখ্যা) 'চতুরঙ্গে' দেখিলাম ডক্টর বটকৃষ্ণ ঘোষ সম্ভবত আমাদের মত রোগশয্যায় শুইয়া "মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্র"কে ভিন্ন চোখে দেখিবার অবকাশ পাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

সমাজতন্ত্রের অসংখ্য রূপ আছে। শুনা যায় যে তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ রূপ হইল মার্ক্সবাদ, কারণ ইহাই নাকি বিজ্ঞানসম্মত বা scientific; এবং মার্ক্সবাদ রূপ যে শ্রেষ্ঠ সমাজ-তন্ত্রবাদ তাহাই ভারতবর্ষকে গ্রহণ করিতে হইবে। যদিও মার্ক্সবাদ একটি দুর্বোধ্য গ্রন্থের মধ্যেই পঙ্গু হইয়া পড়িয়া আছে, যদিও কার্যক্ষেত্রে তৎপরিবর্তে লেনিনবাদ, ট্রটস্কিবাদ, ষ্ট্যালিনবাদ প্রভৃতি ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না, যদিও স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে এই লেনিনবাদ প্রভৃতিরও অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ও আশ্চর্যকর বিভিন্ন মূর্তি দেখা গিয়াছে

এবং যাইতেছে, এবং যদিও ইহাও ঠিক যে রাশিয়ায় ট্রটস্কির পরাজয় না ঘটিলে মার্ক্সবাদ বলিতে আজ ট্রটস্কিবাদই বুঝাইত—তথাপি এক শ্রেণীর ভারতীয় সমাজতন্ত্রী অনবরতই বলিয়া থাকেন ভারতের যাহা প্রয়োজন তাহা হইল মার্ক্সবাদ (অর্থাৎ ষ্ট্যালিনবাদ)। স্বীকার করিতে হইবে যে, যাঁহারা এই কথা বলেন ও বিশ্বাস করেন তাঁহাদের মনে যুক্তি ভক্তির নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছে।...

মার্ক্সবাদ-এর "বৈজ্ঞানিকত্ব" একটি অভাব মাত্র, দোষ নহে। ইহার দোষ হইল পরমার্থসত্যের (transcendental absolute truth) অস্বীকরণ। এবং এই দোষের জন্যই মার্ক্সবাদ একটি যুক্তিসহ দর্শনপ্রস্থান রূপে পরিগণিত হইতে পারে না।... মার্ক্সবাদী ভালত্বে বিশ্বাস করেন না কিন্তু দাবী করেন যে তাঁহার উদ্দেশ্য ভাল, তিনি সত্যে বিশ্বাস করেন না কিন্তু বলিয়া থাকেন যে আধিক জগতে (পারমার্থিক জগতের প্রশ্নই তাঁহার নাই) মার্ক্সবাদ-ই একমাত্র সত্য; স্ব-তন্ত্র সৌন্দর্যে তাঁহার আস্থা নাই, কিন্তু তাঁহার মুখেই আবার শুনা যায় যে ভবিষ্যৎ মার্ক্সবাদীয় জগৎ সুন্দর। মার্ক্সবাদীর মুখে এ সকল কথার কোনই অর্থ হয় না।

Vandalism যদি একটি বিশিষ্ট শিল্পপদ্ধতি বলিয়া পরিগণিত না হয় তবে মার্ক্সবাদ যে কেন একটি বিশিষ্ট দর্শনপ্রস্থান রূপে স্বীকৃত হইবে তাহা বাস্তবিকই আমি বুঝিতে পারি না। স্বার্থোদ্ধারই যাহার নিকট সত্যমিথ্যা বিচারের একমাত্র মাপকাঠি সে যে তস্কর, সজ্জন নহে,—একথা বোধ হয় মার্ক্সবাদীও অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু জনসাধারণকে স্ব-তন্ত্র পরমার্থসত্য অস্বীকার করিতে শিক্ষা দিয়া মার্ক্সবাদী কি এই তস্করবৃত্তিরই প্রচারক হইয়া পড়েন নাই? সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির মনোবৃত্তি যদি তস্করোচিত হয় তবে তাহা হইতে কি জগতের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে? প্রত্যেকে ব্যক্তিগত জীবনে স্বার্থোদ্ধারকেই চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করিবে অথচ সেই সঙ্গেই জাতীয় জীবনে এই বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিবে যে সকলের কল্যাণই প্রকৃত কল্যাণ—মার্ক্সবাদীর এই আশা কি একান্ত অযৌক্তিক নহে? মার্ক্সবাদী বলিতে পারেন, রাশিয়াতে যখন এই আশা সফল হইয়াছে তখন ভারতেই বা তাহা হইবে না কেন? কিন্তু রাশিয়াতে যাহা সফল হইয়াছে তাহা মার্ক্সবাদ নহে, ষ্টালিনবাদ, এবং অন্তর্বিপ্লবের ভিতর দিয়া রাশিয়াতে এই ষ্ট্যালিনবাদ-এর আরও অনেক পরিবর্তন সাধিত হইত যদি সমস্ত পৃথিবীর প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্ন প্রতিকূলতায় রুশদিগকে বাধ্য হইয়া ক্রমোন্নতির পরিবর্তে আত্মরক্ষার প্রতিই অধিক মনোযোগ দিতে না হইত।

...H. G. Wells-এর কথায় সায় দিতে হয় যে মার্ক্সবাদ হইল "Sabotage of civilization by the disappointed"। ক্ষুধায় সকল মানুষই পশুতে পরিণত হইতে পারে। মার্ক্সবাদ হইল ক্ষুধার তাড়নায় পশুভাবাপন্ন গণমানবের চরম তিক্ততার পরম পরিণাম। সেই অবমানিত ও ক্ষুৎপীড়িত গণমানব যদি আজ জগতের সমস্ত খাদ্য কেবল তাহারই বলিয়া দাবী করে তবে কাহারও তাহাতে আপত্তি করা নৃশংসতা। কিন্তু

সে যদি বলে যে অন্নসমস্যাই মনুষ্য-সমাজের প্রধান সমস্যা, এবং সেই সমস্যার যেরূপ সমাধান যে-সমাজে হয় তাহাই হইল সেই সমাজের সভ্যতার প্রধান নির্দেশক, তবে তাহাতে আপত্তি না করিয়া পারা যাইবে না। ইহা কিন্তু মার্ক্সবাদীর কথা, এবং ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। মার্ক্সবাদী যদি প্রগতিবাদী হ'ন তবে তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে প্রগতির ফলে এমন একদিন নিশ্চয়ই আসিবে যেদিন অন্নসমস্যাকে আর সমস্যা বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ থাকিবে না। কিন্তু এই অন্নসমস্যার সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে সমস্যাটির সমাধাতৃ মার্ক্সবাদীর-ও অবসান ঘটিবে, কারণ মার্ক্সবাদী নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে অন্নসমস্যাই তাঁহার প্রধান সমাধেয় বস্তু। কাজেই মার্ক্সবাদীর নিজের কথা হইতেই অনুমিত হয় যে অন্নসমস্যার সমাধানের পর প্রকৃত মানবত্ব লাভের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সম্মুখে যে অনন্ত উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইবে তৎসম্বন্ধে মার্ক্সবাদীর কোন কৌতূহলও নাই। অর্থাৎ, সমাজতন্ত্রীর নিকট পশূচিত জীবনসংগ্রামের অন্তে প্রকৃত মনুষ্য-জীবনের আরম্ভ, যে-জীবনে প্রতি মানুষ প্রতি বিষয়ে আপনার বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়া প্রকৃত মানবোচিত উচ্চতর কৃষ্টির অধিকারী হইবার সুযোগ লাভ করিবে; মার্ক্সবাদীর কিন্তু নিজেরই প্রতিজ্ঞা এই যে অন্নসমস্যাশূন্য প্রকৃত মানবোচিত সমাজে তাঁহার কোন স্থান নাই। এখন জিজ্ঞাস্য, যিনি নিজের স্বীকৃতি অনুসারেই মানবোচিত সমাজের বহির্ভূত তিনি কিরূপে মানব-সমাজের নেতৃত্ব করিবেন? কাজেই ভারতীয় বা বৈদেশিক সকল সমাজতন্ত্রীরই কর্তব্য মার্ক্সবাদীর নেতৃত্ব অস্বীকার করা।

মার্ক্সবাদ ভাল কি মন্দ—সে কথা পণ্ডিতেরাই বিচার করিবেন, আমরা শুধু বাংলা সাহিত্যে ও সমাজে এই যে মার্ক্সীয় ও সোভিয়েট পরিবেশের সৃষ্টি হইতেছে তাহা পছন্দ করিতে পারিতেছি না, কারণ Henry Drummond-এর মত আমরাও বিশ্বাস করি

Environment is going to bring about great revolutions in the world. Environment will shake the foundations of the earth.

যে রুশীয় environment আমরা ইচ্ছা করিয়া সৃষ্টি করিতেছি, তাহা যে ভারতের মাটিতে সুফলপ্রদ হইতে পারে না তাহা বিশ্বাস করি বলিয়াই এত কথা লিখিলাম।

রোগ-শয্যায় আর একটি বিস্ময়কর পদার্থ নজরে পড়িল। বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকার দুর্বোধ্যতা ও ভঙ্গীসর্বস্বতার বিরুদ্ধে অভিযানের জন্যই একদিন প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'নিরুক্ত' বাহির হয়। প্রথম সংখ্যা 'নিরুক্তে'র গোড়ায় রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখার ব্লক করিয়া একটি

পত্র ছাপা হইয়াছিল, তাহাতে এই ভঙ্গীসর্বস্বতা ও দুর্বোধ্যতাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করা হইয়াছিল। সম্পাদকেরাও স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছিলেন বাংলা কাব্যকে হিংটিংছট্ করিয়া তোলা মোটেই তাঁহাদের অভিপ্রেত নয়। সেই ঘোষণাকে উপহাস করিয়া আজ 'নিরুক্ত' পত্রিকা তিন মাস অন্তর অন্তর অমেধ্য দুষ্পাচ্য কতকগুলা শব্দযোজনাকে কবিতা আখ্যা দিয়া পরিবেশন করিয়া চলিয়াছে—ভিড় হইতে দূরে আসিয়া বিস্ময়ের সহিত তাহাও প্রত্যক্ষ করিলাম। চৈত্র ১৩৫০-এর সংখ্যা অর্থাৎ চল্‌তি সংখ্যাটি হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

চেষ্টা অনেক :
হ'লনাক' তবু ধ্রুব নিধন।
ব্যর্থ সাধনা যত আয়োজন
সবই বিফল।
টীলের রাত্রি
ধরেছে কঠোর যদিচ কাফ্রী কালো পেথম।
সূর্য কি ধরে
কাঁটা তারে মোড়া কফিনটার ?
সূর্য সমাধি অসম্ভব।

কোথায় রাত্রি
টীলের পাখা যে হ'ল বেহাত।
খাড়া পাহাড়ের উপরে ভোরের
কী অরুণিমা।
পরাজিত তাই কালো কিরাত :
সাতরঙা রঙে অঙ্গীকার।

দিনের যাত্রা
দলে দলে তাই চলে মিছিল।
জীবন সূর্য এ খর নভে
মহিমায় হল মহামহিম।
চেষ্টা অনেক :
হ'লনাক' তবু ধ্রুব নিধন।
টীলের রাত্রি
ধরেছে কঠোর যদিচ কাফ্রী কালো পেথম।
পরাজিত হল কালো কিরাত :
সাতরঙা রঙে অঙ্গীকার।

* * *

আরও অনেক বিস্ময়ের ব্যাপার আছে, কিন্তু আমাদের বিস্ময়-প্রকাশের স্থান নাই।

—

এই দুর্বোধ্যতা ও জটিলতা বাংলা সাহিত্যে অতিশয় ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে। ডক্টর অমিয় চক্রবর্তীর মত পণ্ডিতজনের আশ্রয় লাভ করিয়া এই পাপ মহারাজ নন্দের সভায় বাচালের মত বাংলা সাহিত্য-রাজ্যে বিপুল বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি করিতেছে। কর্তাভজার দেশে নাম-ডাকের মোহ বড় ভয়ানক, অথচ জ্ঞানপাপীদের শূলে দেওয়ার ব্যবস্থা তথাকথিত সভ্যজগৎ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। মনুর শাসন সমাজ-ব্যবস্থায় আমরা অদ্যাপি মানিয়া থাকি, কিন্তু রাষ্ট্রব্যবস্থা ভিন্ন রূপপরিগ্রহ

করিয়াছে বলিয়া সর্বচোরেরা শাস্তি পায় না। মনু একটি শ্লোকে সর্বচোরদের এই সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন—

বাচ্যর্থা নিয়তাঃ সর্বে বাঙ্‌মূলা বাগ্‌বিনিঃসৃতাঃ।
তাং তু যঃ স্তেনয়েদ্বাচং স সর্বস্তেয়কৃন্নরঃ ॥

অর্থাৎ, মনুষ্যমাত্রেরই সমস্ত ব্যবহার বাক্যের দ্বারা পরিচালিত হয়। পরস্পরের বিচার-আলোচনা পরস্পরকে জানাইবার পক্ষে শব্দের ন্যায় দ্বিতীয় সাধন নাই। কিন্তু এই সমস্ত ব্যবহারের আশ্রয়স্থান ও বাক্যের যে মূল উৎস, তাহাকে যে ব্যক্তি ঘোলাইয়া ফেলে অর্থাৎ বাক্যের সহিত প্রতারণা করে, সে ব্যক্তি সর্বচোর ব্যতীত আর কিছুই নহে। * * *

'ছোটো গল্প গ্রন্থমালা'র তৃতীয় সংখ্যা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের "ধরা বিয়ে"। রায় লিখিতে লিখিতে হাত টাটাইয়া গেলে ছোট আদালতের হাকিম যে ভাষায় ডাইরি লেখেন, এ সেই ভাষা। না লিখিলেই নয় তাই সাঁটে লেখা। "বাধ্যতামূলক" সৃষ্টিকে শিল্পসৃষ্টি হিসাবে প্রচার করার বাহাদুরি আছে। বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কি ভাগ্য!

সব আবছা-আবছা। মনের মধ্যে এঁটে আছে শুধু সেই মেয়েটার নড়াচড়া। হেলা-দোলা। ডাবা হুঁকোর ছুচলো করে ঠোঁট রাখা। ধোঁয়া ছাড়া। ঘাসের মতো পান চিবানো। শব্দ করে পিক ফেলা। ফক্কড়, ছ্যাবলা মেয়ে।...সোদপুরের ক্রসিং-লেভেল (?)...

গল্পের নায়িকা দিব্যমণির মত অচিন্ত্যবাবুরও এখন সাঁটে কাজ সারিবার ঝোঁক চাপিয়াছে—ভাবী স্বামী ভক্তদাসকে দিব্যমণি যে ভাবে চুমু খাওয়াইয়া ভাগাইতে চায়, পাঠককেও এ যেন তেমনই তাড়ানো। হাঁপানির ধমকও হইতে পারে।

চোখে ঝিলিক মেরে বলে দিব্যমণি, "চুমু খাবি তো? চুমু খেলেই তো হবে? খা না—যটা তোর খুসি। আমার মুখে খুব মিষ্টি পান। নে, শিগগির, সাটে সেরে নে চট করে। তার পর বাড়ি পালা।"

এখনও যাহারা পলাইতে পারে নাই, তাহাদের দুর্গতি কে নিবারণ করিবে! * * *

জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে "নারীর গোত্রান্তর..." এবং "নারী অপরাধী" সম্পর্কে প্রবন্ধ পড়িলাম। পাতা উল্টাইয়া দেখিলাম সচিত্র "মহিলা-জগৎ" 'প্রবাসী' হইতে অন্তর্ধান করিয়াছে। স্পষ্ট বুঝা গেল নীতির পরিবর্তন হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই। * * *

ফাল্গুনের 'আগন্তুকে'র প্রথম প্রবন্ধ, প্রক্ষিপ্ত—অমিয় চক্রবর্তী। "প্র" উপসর্গের প্রয়োগ সুষ্ঠু হইয়াছে কি না ব্যাকরণবিদ্ বলিতে পারিবেন। গোটা "প্রক্ষিপ্ত"টা ধরিলেও একটা অর্থ হয়। রবীন্দ্রনাথ যেখানে মূল, সেখানে অমিয় চক্রবর্তী নিঃসন্দেহে প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু মূলের সঙ্গে এমন বেমালুম মিলিয়া যাইতে মেঘদূতের শ্লোকও পারে নাই। * *

জ্যৈষ্ঠের 'ভারতবর্ষে' শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের "কাব্য ও আধুনিক কাব্য" শীর্ষক প্রবন্ধ শেষ হইল। তিনি যথেষ্ট সহানুভূতির সঙ্গে আধুনিক প্রগতিবাদী কবিদের কাব্য বিচার করিয়া তাঁহাদের স্খলন-পতন-ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন করিতে চাহিয়াছেন। সে কাজ ইতি-পূর্বে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যে করিয়া গিয়াছেন, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সতর্কবাণী সত্ত্বেও "দুর্বোধ্য ও 'আঙ্গিক'সর্বস্ব কবিতা লেখা"র ফ্যাশন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। সাবিত্রীবাবুরও মনোবেদনা পাইবার আশঙ্কা আছে। * *

বৈশাখ সংখ্যা 'মাসিক মোহাম্মদী'র প্রথম প্রবন্ধ "আলীগড় আন্দোলন" পড়িয়া মহাত্মা গান্ধীকে জনাব জিন্নার সহিত সাক্ষাৎ না করিবার জন্য তারযোগে পরামর্শ দিবার বাসনা হইল। ইতিহাসের নজির দেখাইয়া আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেব প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, "এ দেশে হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক কোনোদিনই প্রীতিকর ছিল না।" অনেক কাঁচা সত্য কথায় প্রবন্ধটি ভর্তি। হিন্দুদের মতলব যে বরাবরই খারাপ, লেখক তাহা প্রমাণ করিয়া ছাড়িয়াছেন। তিন চার পুরুষ পূর্বে কোনও কোনও হিন্দু যখন ইসলাম বরণ করিয়াছিল, তখনও তাহাদের মতলব নিশ্চয়ই ভাল ছিল না। সেই সকল গোপন ইতিহাসও শামসুদ্দীন সাহেব প্রকাশ করিয়া দিলে ভাল হয়। * * *

সকলেই অবগত আছেন বেদব্যাসকৃত বেদান্তসূত্রের দ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত বহুবিধ মতানুযায়ী ভাষ্য প্রচলিত আছে। শাঙ্করভাষ্য ও রামানুজের শ্রীভাষ্যে আসমানজমিন ফারাক। ব্রহ্মসূত্র লইয়া যাহা সম্ভব হইয়াছে, দেশের মাটির গুণে লৌকিক ইতিহাস লইয়াও সেরূপ ভাষ্যবিরোধ ঘটিতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস লইয়া নানা জনে নানা ভাষ্য প্রস্তুত করিয়াছেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত

যোগানন্দ দাস ও প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এই ইতিহাসের ব্রাহ্মভাষ্য প্রস্তুতির কাজে লাগিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্যম প্রশংসনীয়। শ্রীযুক্ত দাস মহাশয় ইতিমধ্যেই ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন ও রামমোহন প্রসঙ্গ লইয়া খাঁটি নিরেট ঐতিহাসিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সহিত তাল না রাখিতে পারিলেও নেক-টু-নেক চলিতেছেন।

কিন্তু ভাষ্যকারদের ভুল হইলে ইতিহাসের রঙ বদলাইয়া যায়, এই কারণে তথ্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিককে অত্যন্ত সজাগ থাকিতে হয়। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় মাঝে মাঝে ঝিমাইয়া পড়েন এই তাঁহার দোষ—যেমন দ্বিতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা (মাঘ-চৈত্র ১৩৫০) 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় প্রকাশিত "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা" প্রবন্ধে তিনি কিছু গলতি করিয়া ফেলিয়া একজনের কৃতিত্ব আর একজনের স্কন্ধে চাপাইবার অপরাধ করিয়া বসিয়াছেন। তিনি নিজে পরের ভুল-ধরণে একজন তৎপর পুরুষ। তাই অতীব সঙ্কোচের সহিত তাঁহার ভ্রম সংশোধন করিতেছি।

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "এই বৎসর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা ও তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠার একশত বৎসর পূর্ণ হইবে।" প্রবন্ধের অন্যত্র (পৃ. ২৯৪) তিনি লিখিয়াছেন, "১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা।" ভাষ্য যে মতেরই হউক, ১৮৩৯-১৯৪৪—একশত বৎসর কোনও গাণিতিক মতেই সিদ্ধ হয় না।

সময়ের হিসাবে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বরাবরই কিঞ্চিৎ গলতি করিয়া ফেলেন। এই ভুল এই প্রবন্ধে আরও ঘটিয়াছে। তিনি "১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে রামমোহনের স্কুলের ছাত্রদের দ্বারা স্থাপিত একটি সভা"র কথা বলিয়াছেন (পৃ. ২৯০)। তাহার পর তিনি "ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে একখণ্ড বাঁধানো সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা"র কথা বলিয়া (পৃ. ২৯১) লিখিয়াছেন, "একই বৎসর এই পত্রিকা ও ঐ একই মাসে রামমোহনের স্কুলের ছাত্রগণের একই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সভা স্থাপন হইতে মনে হয় যে উভয়ের যোগ আছে।" (পৃ. ২৯২)। এই উক্তিটি অবশ্য ব্রাহ্ম-ভাষ্যের উদ্দীপনার ফল, কিন্তু আসলে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ইম্পিরীয়াল লাইব্রেরির নামই শুনিয়াছেন, স্বয়ং গিয়া উক্ত 'সর্ব্বতত্ত্ব-

দীপিকা'খানি দেখেন নাই—দেখিলে উহার প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল দিতেন ও বিষয়বস্তুর সন্ধান রাখিতেন এবং ফলে একটি মারাত্মক লজ্জাকর ভুল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন। পুস্তকখানির পুরা নাম—'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা এবং ব্যবহার দর্পণ'—ইহার ১ম খণ্ডের প্রকাশকাল "মাহ শ্রাবণ সন ১২৩৬ সাল" অর্থাৎ ইংরেজী জুলাই ১৮২৯। অন্ধকারে অনেক কিছু করা যায় কিন্তু গবেষণা যে করা যায় না, তাহার প্রমাণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্ধদৃষ্টিতে ১৮২৯ ও ১৮৩০-এর পার্থক্য লোপ পাইয়াছে। তিনি ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে স্থাপিত সভা ও ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রকাশিত পুস্তক সম্বন্ধে লিখিয়া বসিয়াছেন—"একই বৎসর এই পত্রিকা ও ঐ একই মাসে রামমোহনের স্কুলের ছাত্রগণের একই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সভা"। ভাষ্যভাগ আরও চমৎকার। উক্ত পুস্তকের "অনুষ্ঠানপত্রে" আছে—"...এই দেশীয় লোকেরা অন্য দেশীয় লোকের ব্যবহার যাহা গ্রহণ করিতেছেন তাহাতে যে দোষ তাহা প্রদর্শন করাইয়া সদাচার এবং সদ্ব্যবহার যাহাতে হয় এমত উপায় লিখা যাইবেক।" প্রগতিশীল রামমোহনকে এই সংস্কারবদ্ধ পুস্তকের সহিত অজ্ঞানে জড়াইয়া প্রভাতবাবু রামমোহনের অসম্মান করেন নাই তো? ব্রাহ্মভাষ্যে ইহা সমীচীন হইয়াছে কি? * *

কাগজ-সমস্যা যতদিন না মিটিতেছে, ততদিন পুস্তক লেখক ও প্রকাশকদের প্রতি আমরা সুবিচার করিতে পারিব না। তাঁহারা ক্ষমা করিবেন। আনন্দের কথা এই যে, বাঙালী পাঠকসমাজ পুস্তকক্রয়ে সম্প্রতি অত্যন্ত আগ্রহশীল হইয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ও বিশ্বভারতীর বহু পুস্তক বারংবার পুনর্মুদ্রিত করিয়াও লোকের চাহিদা মিটানো যাইতেছে না। অত্যল্পকালমধ্যে তারাশঙ্করের ধাত্রী দেবতা ও কালিন্দীর ৩য় সংস্করণ, পাষাণপুরী ও চৈতালী-ঘূর্ণির ২য় সংস্করণ গজেন্দ্র মিত্রের মনে ছিল আশার ২য় সংস্করণ ও মনোজ বসুর ভুলি নাই-এর ২য় সংস্করণ বিস্ময়কর না হইলেও, শ্যামাপ্রসাদের পঞ্চাশের মন্বন্তর ও অনাথগোপাল সেনের যুদ্ধের দক্ষিণা ও টাকার কথার সংস্করণান্তর বিস্ময়কর বটে। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও নবীনচন্দ্র সেন, এবং বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহে জমি ও চাষ ও যুদ্ধোত্তর বাংলার

কৃষিশিল্প নূতন সংযোজন। দীনবন্ধুর লীলাবতী এবং সঞ্জীবচন্দ্রের পালামৌ প্রকাশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নূতন কীর্তি। সিগনেট প্রেস পুস্তক-প্রকাশের কাজে লাগিয়াই তিনখানি অতি সুদৃশ্য মনোরম চিত্র ও মলাট শোভিত পুস্তক বাহির করিয়া ফেলিয়াছেন—নীলিমা দেবীর কাব্য When the Moon Died, বাংলা দেশের কয়েকজন প্রসিদ্ধ গল্পলেখকের লেখার ইংরেজী তর্জমা Best Stories of Modern Bengal এবং অচিন্ত্য সেনগুপ্তের অনুবাদ—আধুনিক সোভিয়েট গল্প। বেঙ্গল পাবলিশার্স সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সমাজ ও সাহিত্য, বনফুলের বিন্দুবিসর্গ, মনোজ বসুর দুঃখনিশার শেষে এবং সুবোধ ঘোষের গ্রাম-যমুনা প্রকাশ করিয়াছেন। মিত্র ও ঘোষ ও মিত্রালয় যথাক্রমে ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের অধ্যাপক, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবাগত, তারাশঙ্করের স্থলপদ্ম, সুমথনাথ ঘোষের ডেভিড্ কপারফিল্ড এবং গজেন্দ্রকুমার মিত্রের ইউরোপের সেরা সাহিত্যিক, ও 'বহুবিচিত্র' আশ্চর্য তৎপরতার সহিত প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। বুকল্যাণ্ড লিমিটেড প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কস্তুরবাঈ গান্ধী, গ্রন্থাগার সুবোধ বসুর রাজধানী, অভিযান পাবলিশার্স অখিল নিয়োগীর নিশি-পট বাহির করিয়াছেন। পুরাতন কয়েকটি অতিশয় মূল্যবান পুস্তক আমাদের দপ্তরে অনুল্লেখিত পড়িয়া ছিল—সেগুলির উল্লেখ না করিলে পাপ হইবে। প্রসিদ্ধ শিল্পী ও ভ্রমণকারী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের হিমালয় পারে কৈলাস ও মানসসরোবর ও তন্ত্রাভিলাসীর সাধুসঙ্গ; মনোবৈজ্ঞানিক ও যৌনবৈজ্ঞানিক হোমিওপ্যাথ ডাক্তার শ্রীরাধারমণ বিশ্বাসের হোমিও-প্যাথিক পকেট মেটিরিয়ামেডিকা এবং বিবাহ বিজ্ঞান ও দাম্পত্যজীবনে যৌনসমস্যা, শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া এবং আয়ুর্বেদীয় গোবিন্দসুন্দরী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মল্লিক ব্যাকরণ-কাব্য-সাংখ্যতীর্থের ভারতবর্ষীয় ষড়্দর্শনসার 'দর্শনসমুচ্চয়ঃ' সকলেরই এক এক খণ্ড সংগ্রহ করা কর্তব্য।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শনিবারের চিঠি
১৬শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৫১

বাংলার নবযুগ ও স্বামী বিবেকানন্দ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ব্যক্তির স্বাধিকার-বোধ ও আত্মার স্বাতন্ত্র্য-জ্ঞান এক বস্তু নয়; ঠিক সেই কারণে স্বাধীনতার অভিমানও দুই ক্ষেত্রে দুইরূপ। একটিতে যেমন সর্ব্ববিষয়ে দুর্ব্বলতাকে অস্বীকার করিবার আগ্রহ প্রকাশ পায়, এবং তাহা নিজের ও পরের নিকটে প্রমাণ করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া থাকে—এবং সেইজন্য একটা প্রচ্ছন্ন আত্মাভিমান থাকিবেই; অপরটিতে তেমনই, ক্ষুদ্রতা বা দুর্ব্বলতার সংস্কারমাত্র না থাকায়, এবং তাহার স্থলে আত্মার মহত্ত্ববোধ সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে বলিয়া, অধিকার অপেক্ষা একরূপ দায়িত্ব-চেতনাই আত্মচেতনাকে প্রবুদ্ধ করে; সে দায়িত্বও বন্ধন নয়—কারণ, তাহাতে আত্মাতিরিক্ত আর কিছুর বশ্যতা নাই। ব্যক্তিত্বের যে অভিমান, তাহার মূলে আছে একরূপ মমতা বা আত্মপ্রীতি; সেই আত্মপ্রীতি অনেক স্থলে প্রেমের ছদ্মরূপ ধারণ করে, আমরা সাধারণতঃ সেই প্রেমেরই জয়গান করি। সেই প্রেম যে নিতান্তই মমতা-মূলক তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারি বটে, তথাপি যে-প্রেম ব্যক্তিসম্পর্কবর্জ্জিত, যাহাতে ব্যক্তিগত সুখদুঃখের অনুভূতি নাই—সেই সুখের তীব্রতা ও দুঃখের হাহাকার নাই—তেমন প্রেম আমাদিগকে তৃপ্ত করে না; মানুষ যখন এই 'আমি'র অভিমানকে অস্বীকার করে, তখন তাহাকে আমরা বিরাগী সন্ন্যাসী বলিয়া থাকি, তাহার সহিত আমাদের কোন আত্মীয়-সম্পর্ক আর থাকে না। এইজন্য ব্যক্তি-'আমি'র প্রেম আমরা যেমন বুঝি, আত্মা-'আমি'র প্রেম তেমন বুঝি না; কোনরূপ স্বার্থ যাহার নাই সে যেন মানুষই নয়। এই প্রেম যেমন ব্যক্তিচেতনাযুক্ত, তেমনই ইহা ব্যক্তির বা বিশেষের প্রতিই জন্মিয়া থাকে, তাই নির্ব্বিশেষের প্রেম যেন সোনার পাথরবাটি। ইহা খুবই সত্য; তাই আমি আত্মার যে স্বাতন্ত্র্যবোধের কথা বলিতে-ছিলাম, তাহা এইরূপ প্রেমের অন্তরায় বটে। কারণ, আত্মার সেই

বিশালতায় আত্মপর-ভেদ আর থাকে না—সকলই তাহাতে একাত্মীয়তা লাভ করে; তখন পরের তুলনায় বা পরের সম্পর্কে যত কিছু পীড়া তাহা নিজের বলিয়াই মনে হয়। তথাপি 'দুই'-এর চেতনা তাহাতেও থাকে, না থাকিলে—অর্থাৎ, সম্পূর্ণ নির্বিকল্প অবস্থায়—নিজের সেই আত্মার সম্বন্ধেও কোন বোধ থাকে না; সেই বোধ থাকে বলিয়াই আর এক প্রকার প্রেমের অনুভূতি সম্ভব হয়। আত্মার যে আত্মমর্য্যাদাবোধ তাহাও বিশুদ্ধ অদ্বৈত-জ্ঞানে অসম্ভব, কারণ, সে অবস্থায় আত্মার আবার ভাব-অভাব কি? অস্তি-ভাতি ছাড়া আর কিছুই তখন থাকে না।

অতএব বিবেকানন্দের সেই ত্যাগ-বৈরাগ্যের সহিত যুক্ত যে প্রেম, তাহাই তাঁহার অদ্বৈত-জ্ঞানের একমাত্র দ্বৈত-সংস্কার, সে সংস্কারের একমাত্র কারণ তাঁহার স্বভাবের সেই অনমনীয় পৌরুষ। তথাপি বিশুদ্ধ জ্ঞানের সহিত এইরূপ প্রেমের যোগ যে অসম্ভব নয়, তাহার প্রমাণ পূর্ব্বেই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল—শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় ও জীবনে দ্বৈতাদ্বৈতের এক অতি অভিনব সমন্বয় যেন মূর্ত্তি ধরিয়া সকল তর্ক-বিচারকে পরাস্ত করিয়াছিল। কিন্তু সে আলোচনা এখানে অবান্তর, তাই আমাকে অন্যরূপ ব্যাখ্যার শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। বিবেকানন্দের সেই প্রেম আত্মার আত্মমর্য্যাদাবোধ হইতেই জন্মলাভ করিয়াছিল বলিয়া আমি তাহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাই বর্ত্তমান আলোচনায় বিশেষ কাজে লাগিবে। ওই প্রেমে মমতার বন্ধন নাই, বাহিরের প্রতি কোন আসক্তি নাই; উহার মূলে আছে আত্মাবমাননার গ্লানি হইতে নিজকে মুক্ত রাখিবার আকাঙ্ক্ষা। নিজে মুক্ত বলিয়া পরের বন্ধনদশায় উদাসীন থাকা, নিজে দুঃখকে অবস্তু জানিয়া পরের দুঃখকে অস্বীকার করা—ইহা পরের প্রতি নির্ম্মমতা নয়, নিজেরই আত্মার অবমাননা। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা; অতএব জগতের চিন্তা জ্ঞানীর পক্ষে অনুচিত, যাহারা মায়ামুগ্ধ তাহারাই সে চিন্তা করিয়া থাকে—আমাদের দেশের বড় বড় ধার্ম্মিক সাধু ও সাধকগণের উক্তি এইরূপ। কিন্তু এই উক্তির যুক্তি বড়ই অদ্ভুত; জগৎ যদি মিথ্যাই হয়, তাহা হইলে সেই জগতেরই একাংশে অবস্থিত এই ব্যক্তির অস্তিত্বও কি মিথ্যা নয়? তাহার মুক্তিচিন্তাও কি একটা মোহ নয়? বিবেকানন্দের

যে অভিমান ছিল তাহা মুক্ত আত্মার অভিমান; যে অন্তরে মুক্তি পাইয়াছে, তাহার আর সে-বস্তুর প্রতি লোভ থাকিবে কেন? তাই তাঁহার সেই ত্যাগ-বৈরাগ্য মুক্তিসাধনার বৈরাগ্য নয়—সে বৈরাগ্য অভয় হইবার জন্য নয়; এজন্য বিবেকানন্দকে সাধারণ অর্থে সন্ন্যাসী বলাও যায় না। এ হেন পুরুষের পক্ষে, এক দিকে যেমন নিজের জন্য কোন ভয়, কোন চিন্তা নাই, তেমনই পরের দুঃখ পরের ভয় দেখিয়া অবিচলিত থাকাও সম্ভব নয়। 'আমি'র মুক্তিতেই জগতের মুক্তি—এমন কথা দেহধারী আত্মার পক্ষে মিথ্যা। দেহের সংস্কার যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ দ্বৈত-সংস্কার থাকিবেই; ওই দ্বৈত-সংস্কারের মধ্যেই আত্মার যে অদ্বৈত-চেতনা তাহাই সর্ব্বভূতে-প্রীতির রূপ ধারণ করে। ইহাই সেই প্রেম, যাহাতে ব্যক্তির মমত্ববোধ নাই—আত্মার সর্ব্বাত্মীয়তা-বোধ আছে।

৫

তথাপি একটা কথা বাকি থাকিয়া যায়। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, বিবেকানন্দের এই প্রেমে মানব-হৃদয়ের আবেগ ছিল, সে প্রেম খাঁটি মানবীয় প্রেম। মমত্বের বন্ধন না থাকুক, তাহাতে মানুষের সহিত আত্মীয়তাবোধের মনুষ্যত্ব ছিল, কেবল আত্মার পৌরুষই নয়। তাহার কারণ, মানুষের দুঃখই ছিল এই প্রেমের সাক্ষাৎ জন্মহেতু; ওই দুঃখই দেহের ভূমিতে সেই আত্মাকে টানিয়া আনিয়া মানুষের সঙ্গে তাহার আত্মীয়তা ঘটাইয়াছিল। সকল তত্ত্বের পরম তত্ত্ব এই দুঃখ, প্রেমের তত্ত্বও তাহাই। বিবেকানন্দের সেই আত্মিক পৌরুষ এই দুঃখবোধের সহিত যুক্ত হইয়াছিল; সেই দুঃখের—সেই দেহচেতনার সমল সলিলে পূর্ণবিকশিত হৃদ্‌পদ্মে, তাঁহার আত্মা যে আসন রচনা করিয়াছিল সে আসনের তলদেশে পঙ্ক ছিল, কিন্তু তাহা পদ্মের বৃন্তমূলকেই দৃঢ় করিয়াছিল, পদ্মকে স্পর্শ করে নাই। মাটির সহিত আত্মার সংস্পর্শে ইহার অধিক আবশ্যক হয় না; দেহ-আত্মার ওইটুকু মিলন হইতেই মনুষ্যত্বের মৃণালে সেই প্রাণ-পদ্ম ফুটিয়া উঠে, যাহাকে আমি বিবেকানন্দের মত পুরুষের প্রেম বলিয়াছি। মনুষ্যত্বের যে পূর্ণতম বিকাশ বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যানে ধরা দিয়াছিল ইহাও সেই প্রেম; বঙ্কিমচন্দ্র

ইহারই একটা সাধন-পদ্ধতি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু দীক্ষামন্ত্রের সন্ধান দেন নাই; তিনি যজ্ঞের সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু অগ্ন্যাধান করেন নাই। বিবেকানন্দ এই আগুনের সন্ধান পাইয়াছিলেন—অল্প বয়সেই সংসারের প্রবেশ-দ্বারে জীবনের সেই হুতবহকে সাক্ষাৎ-দর্শন করিয়াছিলেন। সকল মানুষই দুঃখ পায়; কেহ নিরুপায়ভাবে সহ্য করে, কেহ ভুলিয়া থাকে বা দমন করে; অনেকে সুখসাধনায় জয়ী হইয়া তাহাকে ঠেকাইয়া রাখে; কিন্তু দুঃখের স্বরূপ কয়জনের চক্ষে ধরা পড়ে? স্থির অপলক দৃষ্টিতে তাহার মর্ম্মভেদ করিতে পারে কে? যাহারা 'বৈরাগ্যমেবাভয়ং' মনে করিয়া সংসার ত্যাগ করে তাহারা দুঃখের সে-রূপ দেখিয়া ভয় পাইয়াছে, তাহাদের আত্মা সংকুচিত হইয়াছে—তাহাদের মনুষ্যত্বের মৃত্যু হইয়াছে। এই দুঃখই তাহাদের চক্ষে মৃত্যুর রূপ ধারণ করে—যজ্ঞের হুতবহ হইতে পারে না। দুঃখের সহিত প্রথম পরিচয়ে বিবেকানন্দও তাহার সেই মৃত্যু-রূপ দেখিয়াছিলেন; তখনও তাঁহার হৃদয়ের হবি হোমযোগ্য হইয়া উঠে নাই, তখনও তাহা ঢালিয়া দিবার মত তরলতা প্রাপ্ত হয় নাই; কারণ, তখনও জগতের বিশাল যজ্ঞভূমিতে, তাহার হোমানল-শিখার প্রচণ্ড উত্তাপ সে হৃদয় স্পর্শ করে নাই। তথাপি নিজেরই গৃহদ্বারে তাহার সেই মৃত্যু-রূপ দেখিয়া তিনি বিমূঢ় হন নাই; তাহার সেই মূর্ত্তি তাঁহার পৌরুষকে ব্যঙ্গ করিয়াছিল—সেই ব্যঙ্গ সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি তাহার শক্তি পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন; এবং শেষে মৃত্যুরূপী দুঃখের মুখ হইতেই, বালক নচিকেতার মত, তিনি জীবনের অগ্নিক্ষেত্রে পূর্ণাহুতির মন্ত্র—সেই এক প্রশ্নের উত্তর—কাড়িয়া লইয়াছিলেন।

আশ্চর্য্য এই দুঃখ! কারণ ইহাই যেমন চরম তথ্য, তেমন ইহাই আবার পরম সত্যেরও প্রবেশ-দ্বার। এই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি নয়—ইহারই অগ্নিতাপের পুটপাকে, ভাগ্যবান ও শক্তিমান মানুষের বজ্রহৃদয় বিগলিত হয়, সেই বিগলিত হৃদয়ের নামই প্রেম; তাহাই আত্মার ধর্ম্ম—দেহযুক্ত আত্মার। বড় বড় তত্ত্ব বা অতি উচ্চ ও সূক্ষ্ম ভাবরাজি যোগীর যোগসাধনায় সহায় হইতে পারে—কিন্তু তাহাতে

জগতের সহিত, বাস্তব মানব-জীবনের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। সে সাধনাও 'ব্যক্তি'র সাধনা, 'আত্মা'র সাধনা নয়; কারণ আত্মা প্রসার-ধর্মী—সংকোচধর্মী নয়। আশ্চর্য্য এই যে, ব্যক্তির আত্মসাক্ষাৎকার হয় ওই দুঃখের ভিতর দিয়া; যে যত শক্তিমান, অর্থাৎ যাহার হৃদয় যত বলিষ্ঠ, তাহার দুঃখবোধের শক্তিও তত অপরিমেয়—অভিভূত না হইয়া সেই আগুনের মধ্যেই তাহার চক্ষু স্থির-বিস্ফারিত থাকে, তাই চরম মুহূর্ত্তে দিব্য-দর্শন ঘটে। এই দুঃখ সাক্ষাৎ দেহচেতনা-ঘটিত—মস্তিষ্কজাত ভাবকল্পনার দুঃখ নয়, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহার সাক্ষাৎ-অনুভূতি না হইলে আত্মায় তাহা পৌছে না। এ বিষয়ে একটি পুরাতন কবি-বাক্য মনে পড়িতেছে, যথা—

> Who ne'er in weeping ate his bread,
> Who ne'er throughout the night's sad hours
> Hath sat in tears upon his bed,
> He knows you not, Ye Heavenly Powers!

বিবেকানন্দের জীবনে অতিশয় সুলগ্নে এই দুঃখের দর্শনলাভ ঘটিয়াছিল। পিতৃবিয়োগের ফলে, সেই অল্প বয়সেই জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপরে বৃহৎ সংসারের ভার পড়িয়াছিল; অতিশয় স্বচ্ছল অবস্থার পর হঠাৎ তাঁহারই মুখাপেক্ষী সেই অনাথ পরিবারের অনশন-সঙ্কট বিবেকানন্দের মত যুবকের পক্ষে কি তীব্র বেদনাময় হইয়াছিল, সেকালে তাঁহার আত্মীয়-পরিজনেরাও তাহা জানিতে পারেন নাই; অনেক পরে প্রসঙ্গবিশেষে তাঁহার নিজের উক্তি হইতেই তাহার একটু ধারণা করা যায়। মনীষী রোমঁ্যা রোলাঁ (Romain Rolland) বিবেকানন্দের এই আধ্যাত্মিক সঙ্কট বর্ণনা করিয়া লিখিতেছেন—

One evening when he had eaten nothing, he sank down exhausted and wet through, by the side of the road in front of a house. The delirium of fever raged in his prostrate body. Suddenly it seemed as if the folds enveloping his soul were rent asunder, and there was light. All his past doubts were automatically solved. He could say truly: "I see, I know, I believe, I am undeceived...." In the morning his mind was made up. He had decided to renounce the world.

[একদিন সন্ধ্যাকালে বৃষ্টিতে ভিজিয়া, ও সারাদিন অনাহারের পর, তিনি পথিপার্শ্বে, একটি বাড়ির সম্মুখে, নিরতিশয় অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার সেই ধূলাবলুণ্ঠিত দেহ যেন একরূপ জ্বরের প্রদাহে সংজ্ঞাহীন। হঠাৎ চেতনা হইল—মনে হইল, যেন তাঁহার আত্মার শত-পাক-বেষ্টনী ছিঁড়িয়া গিয়াছে, এবং তাহাতে আলোক প্রবেশ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এতদিনের দ্বিধা-সংশয় আপনা আপনি মিটিয়া গেল, তখন তাঁহার আর বলিতে বাধিল না—"আমি দেখিয়াছি, আমি জানিয়াছি, আমার বিশ্বাস হইয়াছে, আমার নেত্র হইতে মোহজাল অপসারিত হইয়াছে!" পরদিন প্রভাতে তিনি কৃতনিশ্চয় হইলেন।...স্থির করিলেন যে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে।]

উপরের এ আলোক-দর্শন সম্বন্ধে মঃ রোলাঁ একটি মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা এই—

Revelation came always by the same mechanical process at the exact moment when the limit of vitality had been reached, and the last reserves of the will to struggle exhausted.

ওই 'mechanical process' কথাটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার পক্ষে আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু ওই নিয়ম কি সাধারণ মানুষের দেহতত্ত্ব বা মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া সত্য? ওই 'Vitality' এবং ওই 'Will to struggle' যদি দেহ ও মনের ধর্ম্ম হয়, তথাপি সে শক্তি চরম না হইলে তেমন চরম অবসন্নতাও ঘটে না—যাহার ফলে মানুষমাত্রের অন্তশ্চক্ষুতে ঐরূপ আলোক-দর্শন হয়। ঐ অবস্থায় ঐরূপ আলোক-দর্শন বুদ্ধের হইয়াছিল,—কতখানি Vitality এবং কত বড় 'Will to struggle' থাকিলে তবে দেহের অন্তিম অবস্থায় দেহাতীত প্রজ্ঞার এমন অপূর্ব্ব উন্মেষ হয়! ঠিক বুদ্ধের মত, বিবেকানন্দের সত্যদর্শন বা আত্মদর্শন এত শীঘ্র না ঘটিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু দুঃখের সহিত সংগ্রামে তাঁহার যে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সাধারণ শক্তিমান মানুষের পক্ষেও সুলভ নয়, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

উপরের ঘটনা হইতে দেখা যাইতেছে, তখনও দুঃখের সহিত যুদ্ধে বিবেকানন্দ সম্পূর্ণ জয়ী হইতে পারেন নাই—কারণ কেবল অন্তরের বৈরাগ্য বা ত্যাগ নয়, তিনি সংসারও ত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তখনও আত্মার আত্মাভিমানই বড়—প্রেম জাগে নাই। তথাপি সে সময়ের সেই সংকল্পের মধ্যে হৃদয়াবেগের লক্ষণই প্রবল;

সেই বৈরাগ্যও অভিমানপ্রসূত, তাহাতে স্পষ্ট বিদ্রোহের ভাব রহিয়াছে। এই সময়ে, ও তাহার পরে, শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত কথাবার্ত্তায় তাঁহার সেই বিদ্রোহী-ভাবের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আসল কথা, তাঁহার জীবনের এই ঘটনায় জ্ঞান ও প্রেমের একটা অতি কঠিন দ্বন্দ্বই ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাঁহার চরিত্রের অপর দিকটি স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। পরে তিনি বুঝিয়াছিলেন, দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য ব্যক্তি-আত্মার উচ্ছেদ একমাত্র উপায় হইলেও, তাহাতে প্রয়োজন কি? বরং ইহারই সংঘাতে আত্মা আত্মস্থ হয়, তাহার স্বরূপ-উপলব্ধি হয়—যদি আত্মার সেই শক্তি থাকে। তখন দুঃখের সেই অতল অকূল অশ্রুহ্রদে, ব্যক্তিত্বের বৃন্তটি মাত্র ধরিয়া আত্মার সহস্রদল সেই বারিরাশির উপরে খুলিয়া ঢলিয়া পড়ে, এবং প্রেমামৃতের মধু-সৌরভে মনুষ্য-জীবনের দিগন্ত পর্য্যন্ত আমোদিত হইয়া উঠে। বিবেকানন্দের জীবনের সেই মহালগ্নে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেম-শীতল করস্পর্শ তাঁহার মস্তিষ্কের বহ্নিতাপ প্রশমিত করিল, অপার করুণার গভীর উচ্ছ্বাসে তাঁহার হৃদয়-নদী কূল হারাইল—সংসার ত্যাগ করিয়াই তিনি সংসারকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন। তখন বেদান্তের সেই নির্গুণ আত্মা-ব্রহ্মকেই তিনি 'কালী'রূপে জগৎময় উদ্ভাসিত হইতে দেখিলেন; ঘোর বৈদান্তিক নির্ব্বিকল্প-সমাধির পিপাসা যাহার কখনো ঘুচে নাই, কোন ঈশ্বরে যে কখনও বিশ্বাস করিবে না—সেও বলিয়া উঠিল;—

The only God in whom I believe, is the sum-total of all souls, and above all I believe in my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races…"

—কিন্তু সে কথা এখন নয়, পরে।

আমি সন্ন্যাস-বৈরাগ্যের সহিত প্রেমের সম্পর্কের কথা বলিতে-ছিলাম, প্রসঙ্গক্রমে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। বিবেকানন্দের চরিত-কথা ও তাঁহার বাণী এক—তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, অতএব সেই চরিত-প্রসঙ্গে তত্ত্বের কথা আপনি আসিয়া পড়ে;—পরে দেখা যাইবে, আমি গোড়া হইতে মূল তত্ত্বেরই অনুসরণ করিয়াছি। এই দুঃখ যে এক অর্থে অবস্তু নয়, এই দুঃখের যে-জ্ঞান সেই জ্ঞানই প্রেমের জনয়িতা—

তাহা বলিয়াছি; আরও বলিবার আছে, এখানে তাহা প্রাসঙ্গিক হইবে না। এই দুঃখ যাহাদিগকে সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী করে তাহারা বিবেকানন্দের মত পুরুষের সগোত্র নয়; আবার যাহারা ভাবযোগে সংসারকে, অর্থাৎ দুঃখকে, একটি পরম রসবস্তুর মত আস্বাদন করিয়া থাকে—সেই স্থূলভোগ-বিমুখ, সূক্ষ্মভোগবিলাসী Epicureএর artistic monasticismও বিবেকানন্দের ধর্ম্ম নয়; ইহারাও আত্মপ্রেমিক Egoist—আত্মত্যাগী প্রেমিক নয়। ইহার পূর্ব্বেও পৃথিবীতে দুই মহাপ্রেমিকের আবির্ভাব হইয়াছিল—বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট; একজন জ্ঞানী-প্রেমিক, আর একজন ভক্ত-প্রেমিক। অতিরিক্ত ভক্তি (ভগবদ্ভক্তি) বাস্তব জগৎ ও জীবনের প্রতি বৈরাগ্যের কারণ হইয়া থাকে; খ্রীষ্ট ও চৈতন্য উভয়েই ভক্তির অবতার—চৈতন্য কিছু বেশি। ইঁহারা কেহই দুঃখকে বা জীবনের বাস্তবকে স্বীকার করেন নাই; বুদ্ধ করিয়াছিলেন,—এই দুঃখের জ্ঞানই তাঁহার বুদ্ধত্ব-লাভের কারণ; সেই জ্ঞানে তিনি ব্রহ্ম বা ভগবান কিছুই স্বীকার করেন নাই। বুদ্ধ সর্ব্বভূতের দুঃখ-নিবারণকল্পে যে মৈত্রী ও করুণার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন—তাহাতে ব্যক্তি-আত্মাকে লোপ করিয়া, আত্মামাত্রকেই অস্বীকার করিবার আবশ্যকতা ছিল। বুদ্ধের সেই বাণীই পূর্ণতালাভ করিয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণের অভিনব ব্রহ্মবাদে—আত্মাকে অস্বীকার করিয়া নয়, আরও পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়া। সেইজন্যই জগৎ একেবারে মিথ্যা বা মায়া নয়, দুঃখও 'অসৎ' নয়। শঙ্করের যে মায়াবাদ বৌদ্ধ শূন্যবাদের প্রায় নামান্তর, সেই মায়াই এবার—অবিদ্যা নয়, পরাবিদ্যার জননীরূপে দেখা দিল; কেবল জ্ঞান নয়, কেবল সন্ন্যাস নয়, কেবল প্রেমও নয়—সকলই এক নির্ব্বিরোধ উপলব্ধিতে অন্যোন্যসাপেক্ষ হইয়া উঠিল। বিবেকানন্দের অত্যুগ্র জ্ঞানপিপাসা যে-প্রেমের নিকটে আত্মসমর্পণ করিল—সেও জ্ঞানেরই পরাকাষ্ঠা। কিন্তু, পূর্ব্বে বলিয়াছি, ওই প্রেমের বীজ তাঁহার স্বভাবে নিহিত ছিল—নির্ব্বিকল্প নির্ব্বিশেষের প্রতি একটা জন্মগত আকর্ষণ থাকিলেও, তাঁহার রক্তের বাঙালীত্ব তাঁহাকে সহজে নিষ্কৃতি দেয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাতেই এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন; তিনি নরেন্দ্রের সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও তজ্জন্য সেই উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা দেখিয়া কিছুমাত্র

চিন্তিত হন নাই, বরং আশান্বিত হইয়া তাহার গতি-পরিণতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন; এবং শেষে নিজেই সেই স্বভাবের পূর্ণ-বিকাশ সাধন করিয়াছিলেন।

৬

বিবেকানন্দ-চরিত্রের যে দিকটি অসাধারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলাম এবং তাহার প্রসঙ্গে যে প্রশ্নের মীমাংসা এত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, সেই প্রশ্নই "বাংলার নবযুগ ও স্বামী বিবেকানন্দ" বিষয়ক আলোচনায় সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান; এই প্রশ্নের অন্তরালে ভারতীয় সাধনা ও মানবধর্ম্মের মধ্যে একটা নূতন বোঝাপড়ার ইঙ্গিত রহিয়াছে, এবং ইহারই মীমাংসায় সেই সাধনার ইতিহাসকে নূতন করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন আছে। বিবেকানন্দ যেন প্রাচীনের প্রতি নূতনেরই একটা বড় challenge। যুগে যুগে সেই একই তত্ত্বকে নব নব প্রশ্নের আঘাতে ভাঙিয়া পুনঃস্থাপিত করা হইয়াছে—এমন ভাঙা-গড়ার যুগসন্ধি ভারতের ইতিহাসে আরও কয়েকবার আসিয়াছে ও গিয়াছে। এবারে সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া ভাবী মন্বন্তরের প্রতীক্ষায় একটা যুগ-বিপ্লব চলিয়াছিল, সেই যুগ-বিপ্লবের প্রায় শেষ তরঙ্গের উপরে এই যে আর এক আবির্ভাব, ইহা যে তদপেক্ষা বৃহত্তর ও গুরুতর মন্বন্তরের পূর্ব্বাভাষ—সে কথা আজিকার দিনে আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকেই যেটুকু অস্পষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন, সেই অনুভূতির বলে, ও এক প্রকার দৈবী দৃষ্টির সাহায্যে, যুগ ও সনাতনের—মনুষ্যধর্ম্মের ও আধ্যাত্মিক ধর্ম্মতত্ত্বের—তিনি যে সমন্বয় করিয়াছিলেন, তাহা যেমন বুদ্ধি-সঙ্গত, তেমনই তত্ত্ববিরোধীও নয়; যুগধর্ম্মকে বুঝিবার ও সার্থক করিয়া তুলিবার পক্ষে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীবন-দর্শন এ জাতির উপযোগী করিয়া সে যুগে আর কেহ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। এক্ষণে তাহাকেও অতিক্রম করিয়া যে গভীরতর সমস্যা, ও তাহার যে সমাধান-চিন্তা দেখা দিল তাহাতে, শুধু বর্ত্তমানের নয়—একটা দূরতর ও বিরাটতর ভবিষ্যতের ভাবনা যেন প্রবিষ্ট রহিয়াছে—সমগ্র মনুষ্যসমাজের আসন্ন মহাসঙ্কট যেন সে দৃষ্টির গোচরীভূত হইয়াছে। ইহাই মনে রাখিয়া সেই পূর্ব্ব প্রশ্নের আর একটু অনুসরণ করিব।

আত্মার পৌরুষই, একাধারে বৈরাগ্য ও প্রেম—আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক ধর্মসাধনার সহায়, হিন্দুর অধ্যাত্মবাদ বহু পূর্ব্বে এই তত্ত্বে উপনীত হইয়াছিল। ইহার একটা স্পষ্টতর অভিব্যক্তি, বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দেখা দিয়াছিল। বুদ্ধ তাহার পূর্ব্বে কি পরে—সে বিষয়ে মতভেদ হওয়া সম্ভব; কোন-কিছুর পূর্ণাঙ্গতা যদি কালসাপেক্ষ হয়, তবে গীতাকার বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন, পরবর্ত্তী বলিয়াই মনে হয়। বুদ্ধের জ্ঞানসর্ব্বস্ব ধর্মনীতির উপরে পরবর্ত্তী কালে গীতার জ্ঞানমিশ্র ভক্তির প্রভাব পড়িয়াছিল বলিয়াই মহাযান সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও অভ্যুদয় হইয়াছিল, এরূপ মত প্রমাণসহকারে কেহ কেহ স্থাপন করিয়াছেন—যদিও বুদ্ধের পূর্ব্বগামিত্ব স্বীকার করেন নাই। সে যাহাই হউক, তত্ত্বের দিক দিয়া এই জগৎব্যাপারকে ও মনুষ্যজীবনকে গীতা যতটুকু মূল্য দিয়াছিল তাহার অধিক মূল্য পরে আর কোন শাস্ত্র দেয় নাই। তন্ত্রেও সেই এক তত্ত্বের সাধনায় যে নূতন পদ্ধতির সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে জগৎরূপিণী মহামায়ার উপাসনায় সৃষ্টিকে স্বীকার করিলেও—ত্যাগ ও ভোগ দুইয়েরই সমন্বয় থাকিলেও, সে সাধনা মুখ্যত ব্যক্তির সাধনা, তাহা সমষ্টিমুখী নয়। যে প্রেমের তত্ত্ব আধুনিক মানবধর্ম্মে একটা বড় তত্ত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে—ঠিক সেই তত্ত্ব এ পর্য্যন্ত কোন সাধনপন্থায় প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহা নিশ্চিত। আত্মা একাই সর্ব্ববিধ প্রেমের বিষয় ও আশ্রয়—এই শ্রুতিবাক্য ভারতীয় সাধনাকে আত্মকেন্দ্রিক করিয়াছিল, উহার অর্থ সংকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। এমন তত্ত্ব সহজেই বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়, আত্মার দুর্ব্বলতাই জয়যুক্ত হয়, স্বার্থই আধ্যাত্মিকতার ছদ্মবেশে পরমার্থ হইয়া উঠে; শেষে সমাজ ও লোক-স্থিতি সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে। এইরূপ কোন সঙ্কটকালে গীতার আবির্ভাব হইয়াছিল; সেই আত্মার গৌরব সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সমন্বয়মূলক এক নূতন ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল; ইহা দ্বারাই ব্যক্তির আত্মহিত ও সর্ব্বভূতের হিত, এই দুইয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা হইয়াছিল। তাহার ফল সে যুগে হয়তো ভালই হইয়াছিল—ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহার সাক্ষ্য মিলিতে পারে। কিন্তু পরে সেই ধর্ম্ম যে ভারতবর্ষীয় সমাজকে রক্ষা করিতে পারে নাই—

তাহার প্রভাব যে নানা লোকধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে মন্দীভূত হইয়াছিল, তাহাতেও সন্দেহ নাই। এক দিকে বেদান্তের সেই 'ব্রহ্মপদ' এবং বুদ্ধের 'নির্ব্বাণ' যেমন তাহা দ্বারা নিরস্ত হয় নাই, তেমনই মানুষের স্বভাবধর্ম্মের প্রতিকূল সেই শূন্যবাদ ও অধ্যাত্মবাদের পীড়নে তাহার 'মহাপ্রাণী' অসুস্থ হইয়া পড়িল, এবং আত্মতত্ত্ব ও দেহতত্ত্ব উভয়কেই বিকৃত করিয়া, নানা অনাচার ও কদাচারের পর যখন আত্মার পৌরুষ প্রায় লোপ পাইয়াছে তখন দিকে দিকে ভক্তিরসের স্রোত বহিতে আরম্ভ করিল, ও তাহারই নেশায় কর্ম্মবিমুখতার ছদ্মবৈরাগ্য বড় প্রশ্রয় পাইল; জীবনের সহিত মুখামুখী দাঁড়াইয়া তাহাকে জয় করিবার প্রয়োজন আর রহিল না। সেই উপনিষৎ ও সেই গীতা তখনও টিকিয়া আছে, কিন্তু টীকাভাষ্যের ভস্মলেপন অথবা পুরাণ-উপপুরাণের রসসিঞ্চন তাহাকে আর এক বস্তুতে পরিণত করিল; তাই আমাদের মধ্যযুগের ইতিহাসে জাতিহিসাবে পৌরুষের সাধনা প্রায় লোপ পাইয়াছিল।

উপনিষদ্ বেদান্ত ও গীতার প্রভাব প্রাচীন ভারতের সমাজে ও ধর্ম্মে কোন না কোন রূপে অবিচ্ছিন্ন ধারায় বহিয়া আসিয়াছিল, এবং পরবর্ত্তী যুগে সেই তত্ত্বজ্ঞানের সহিত ভক্তিরস যুক্ত হইয়া আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের পত্তন হইয়াছিল—ইহা স্মরণে রাখিয়াও, আজিকার এই যুগের হিন্দু-সমাজে একমাত্র গীতারই প্রসার ও প্রতিপত্তি আশ্চর্য্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখিয়া মনে হয়, ওই একখানি গ্রন্থেই সর্ব্বযুগের উপযোগী এমন কোন সত্য আছে যাহার জন্য আজিকার এই ভাববিপ্লব, ধর্ম্মবিপ্লব ও সমাজ-বিপ্লবের দিনে, উহারই মধ্যে একটা আশ্রয়ের ভরসা, জ্ঞানে ও অজ্ঞানে প্রায় সকলেই পাইয়া থাকে। ইহাও সত্য যে, এমন কোন তত্ত্ব-বিচার নাই যাহার প্রসঙ্গে গীতার কোন না কোন শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া পরকে চমৎকৃত ও নিজকে আশ্বস্ত করা না যায়। অতএব গীতার সেই বাণীগুলির মধ্যে একটা চিরন্তনতা আছে—সর্ব্বকালের সর্ব্ববিধ মানবচিত্তের সুপথ্যস্বরূপ বহু মহাবাক্য তাহাতে ছড়াইয়া আছে। কিন্তু ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এমন ধর্ম্মগ্রন্থও ভারতীয় সমাজের জীবন-বেদ হইয়া উঠিতে পারে নাই; ভাষ্যের পর ভাষ্য রচনাই হইয়াছে, এখনও

হইতেছে, কিন্তু তাহা দ্বারা এ দেশের এই বিশাল মানবগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্ম্মের তথা কর্ম্মের ঐক্য স্থাপন হয় নাই, হইলে ভারতের ইতিহাস অন্যরূপ হইত। ইহার কারণ, গীতায় আত্মতত্ত্বই প্রধান হইয়া আছে—মানুষের জীবন বা খাঁটি মনুষ্যত্ব বলিতে আমরা যাহা বুঝি, আত্মার সম্পর্কে তাহার যে মূল্যই তাহাতে স্বীকৃত হউক না কেন—তাহাতে মানুষের প্রাণ সাড়া দেয় নাই। গীতার যে কর্ম্মসংন্যাস তাহাতে সংসার ত্যাগ করিবার প্রয়োজন না থাকিলেও তাহা সন্ন্যাসই বটে; মায়াবাদ সেখানেও প্রবল। গীতায় পরহিতব্রত বা সর্ব্বভূতে আত্মৌপম্যবোধের যে প্রেম, সে প্রেমও একমুখী, বহুমুখী নয়; তাহাতেও চিত্তকে সেই একের উপরে নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। অতএব গীতায় সন্ন্যাস ও মানবপ্রেমের সমন্বয় হইয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। সেখানে মানুষের প্রতি যে শ্রদ্ধা, তাহা সেই এক 'আত্মা'র প্রতি শ্রদ্ধাই বটে; কিন্তু সেইজন্যই দুঃখও মিথ্যা, তাহা আত্মার দেহাভিমানপ্রসূত—প্রথম হইতেই ইহাও উপলব্ধি করিতে হইবে। আমি ও পর যখন একাত্মা, তখন পরের দুঃখ বলিয়া যেন কোন পৃথক দুঃখ নাই—আমার জ্ঞানে তাহার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিলে, বাহিরেও তাহার অস্তিত্ব থাকিবে না। ইহা পরম তত্ত্ব বটে, কিন্তু ইহা জগতের বাস্তব তথ্য নহে; সেই বাস্তবকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিলে থাকে কেবল 'আমার'ই ব্যক্তি-সত্তা। সমস্ত বহির্জগৎ, সংসার, সমাজ আছে এবং নাইও; যেটুকু আছে সে যেন আমারই মোক্ষ-সাধনার যন্ত্ররূপে। নিষ্কামভাবে সর্ব্বভূতের হিতসাধনা করার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, উহার দ্বারা অদ্বৈত-জ্ঞান আরও দৃঢ় হইবে, নিস্পৃহভাবে মায়ার সেবা করিতে পারিলেই মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ হইবে। পুরুষ এখানে আসলে একা, রঙ্গমঞ্চে সেই পুরুষ ছাড়া আর কেহই নাই, আর সকলই ছায়ামূর্ত্তি; তাহাদের সহিত অভিনয় করিয়া, অর্থাৎ অকর্ম্ম-জ্ঞানে সকল কর্ম্ম করিয়া, পঞ্চমাঙ্কে যবনিকা-পতনের সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরুষের মুক্তিলাভ হইবে। আমি গীতা-তত্ত্বের এই যে ব্যাখ্যা করিলাম, তাহাই যে গীতার সমগ্র তত্ত্ব নয়, ইহা বলিবার জন্য গীতাপন্থী মহাজনগণ সকলেই উন্মুখ হইবেন তাহা জানি; তাঁহাদের এক উত্তর

এই যে, গীতায় সকল তত্ত্বই আছে, এবং একটি মূল তত্ত্বে সেগুলি সমন্বিত হইয়াছে। এ কথা হয়তো সত্য যে, সকলের সকল রকমের পিপাসাই গীতায় মিটিতে পারে, কিন্তু ওই সমন্বয় যদি সত্যই হইয়া থাকে, তবে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আজও এত ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইত না। গীতা এই সৃষ্টিকে—এই প্রকৃতি বা মায়াকে—স্বীকারও করে, অস্বীকারও করে; সে যেন 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'; আসলে তাহার মূলে আছে সেই বৈদান্তিক মায়াবাদ, বহু শ্লোকে তাহার সুস্পষ্ট ঘোষণাও আছে; বরং তাহার সেই সমন্বয়চেষ্টাই অতিশয় সংশয়পূর্ণ।

উপরের কথাগুলি হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি গীতার নিন্দা করিতেছি; গীতার অন্তর্নিহিত অধ্যাত্মদর্শনের সমালোচনা করিব, এমন স্পর্দ্ধা আমার নাই; বরং ধর্ম্মগ্রন্থ হিসাবে তাহাকেই হিন্দুর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া আমি তাহার নিত্য পূজা করি। কিন্তু মানুষ আমি, মনুষ্যসাধারণের সহিত একযোগে আমি যে সংস্কারের অধীন তাহার শেষ কণাটুকু ত্যাগ করিবার মত আত্মজ্ঞান এখনও লাভ করি নাই. যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আমি প্রণাম করি। অতি প্রাচীনকাল হইতেই মানুষ—বিশেষত এই ভারতবর্ষের ভাবুক মনীষীগণ দুঃখকে একটা বড় তত্ত্বরূপে স্বীকার করিয়াছেন; আরও প্রাচীন কালে ব্রহ্মজ্ঞানের যে আনন্দবাদ প্রচারিত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী কালে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির অভাবে, সেই ব্রহ্ম ও তাহার তত্ত্ব মন্ত্ররূপে আর কাহারও দৃষ্টিগোচর হইত না। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, ক্রমেই জীবনের বাস্তব-অনুভূতি অন্তরের সেই সহজ আনন্দবোধকে সংশয়াচ্ছন্ন করিয়াছিল। কিন্তু তখনও সকল তত্ত্বই আত্মানুভূতিমূলক ছিল, আত্মোপলব্ধিই ছিল পরম পুরুষার্থ—জ্ঞানই ছিল একমাত্র প্রস্থান। প্রেমের পথ তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। এদিকে জীবনের সহিত পরিচয় যত ঘনিষ্ঠ ও বিস্তৃত হইতে লাগিল, অর্থাৎ দুঃখ যত বাড়িয়া উঠিল, এবং তাহাকে উড়াইয়া দিবার মত সেই আদিম প্রাণশক্তি যত কমিয়া আসিতে লাগিল, ততই তাহার আত্যন্তিক নিবৃত্তি কামনায় নানা সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইতে লাগিল। শেষে এই দুঃখদর্শনে পুরুষের প্রাণের যে গভীর অনুকম্পা, তাহার অবতারস্বরূপ ভগবান

বুদ্ধের আবির্ভাব হইল, সেই অনুকম্পার বশে তিনি দুঃখকে নস্যাৎ করিবার জন্য 'আত্মা'কেই বিনাশ করিতে চাহিলেন। এ পর্য্যন্ত জ্ঞানই ছিল একমাত্র পন্থা; এই পন্থার মধ্যস্থলে মহর্ষি কপিল এমন একটি প্রস্তরস্তম্ভ দৃঢ়প্রোথিত করিয়া দিয়াছিলেন যে, তাহার দিক হইতে চক্ষু ফিরাইবার সাধ্য কাহারও হয় নাই; উপনিষদের সেই ব্রহ্মবাদকেও তাহার সহিত বোঝাপড়া করিতে হইয়াছিল, গীতাই তাহার দৃষ্টান্ত—"সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ" এ কথা তাহাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে। কিন্তু গীতাই সর্ব্বপ্রথম জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা প্রদর্শন করিয়াছিল—জ্ঞানের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াই ভক্তিকে এমন আসন তৎপূর্ব্বে আর কেহ দিতে পারে নাই। কপিলের নিকট হইতে ভূত-বিজ্ঞান এবং উপনিষদের নিকট হইতে অধ্যাত্মবিজ্ঞান আহরণ করিয়া, এমন একটি তত্ত্বের দ্বারা সে উভয়ের যোগসাধন করিয়াছে যে, জ্ঞানই তাহাতে সমৃদ্ধ হইয়াছে; সাংখ্যের সেই দ্বৈতবাদ—সেই পুরুষ-প্রকৃতি—এক অদ্বৈতরূপী পুরুষোত্তমের আলিঙ্গন-পাশে নির্দ্বন্দ্ব হইয়া উঠিয়াছে; সেই এক আত্মাই দুই হইয়া এক অপরকে বলিতেছে—"মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু"! কপিলের সেই দুঃখ-ভয় আর ইহাতে নাই, কারণ সেই 'আমি'ই 'আমাকে' বলিতেছে—"অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ"। গীতায় জ্ঞানের যথাযোগ্য স্থান আছে, কিন্তু তাহা ভক্তি-শাসিত; Mind-ও আছে, Heart-ও আছে, কিন্তু সেখানে—"Heart is the Mind's Bible"। এই ভক্তিবাদই ভারতীয় সাধনায় গীতার শ্রেষ্ঠ দান—যদি প্রকৃত সমন্বয় কোথাও কিছু হইয়া থাকে, তবে সে এইখানে; এরূপ সমন্বয়, মানুষের জীবন-সাধনায় নয়—অধ্যাত্ম-সাধনাতেই সম্ভব ও সত্য।

কিন্তু গীতার যাহা অপর শ্রেষ্ঠতত্ত্ব, যাহার জন্য আমরা গীতাকে একটি খুব practical ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া থাকি—তাহার যে 'কর্ম্মযোগ'-শিক্ষায় জীবনের একটা বড় সমস্যার মীমাংসা হইয়াছে বলিয়া মনে করি, প্রকৃতপক্ষে তাহার সেই তত্ত্ব মানুষের প্রাকৃত জীবনে সত্য হইতে পারে নাই—জীবন-ধর্ম্মের সহিত তাহার সমন্বয় সম্ভব নয় বলিয়াই তাহা তত্ত্বগত হইয়া আছে, তথ্যগত হয় নাই। গীতার প্রধান ভাষ্যগুলির

দিকে দৃষ্টি করিলেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে; জ্ঞানপন্থী বা ভক্তি-পন্থী কোন আচার্য্যই গীতার ওই কর্ম্মযোগকে স্বীকার করেন নাই—শুধুই কর্ম্মফল-ত্যাগ নয়—কর্ম্মত্যাগেরই ওকালতি করিয়াছেন। ইহার কারণ, জ্ঞান-ভক্তির পথ ও এইরূপ কর্ম্মের পথ যেন কিছুতেই মিলিতে চায় না—একটি যেন অপরের বিপরীত; তাহারও কারণ—দুইয়ের জগৎই স্বতন্ত্র, একটি প্রবৃত্তির, অপরটি নিবৃত্তির। গীতায় একটা অসাধ্যসাধনের চেষ্টা হইয়াছে; গীতাকার যতই তাহা সম্ভব বলিয়া উপদেশ করুন না কেন, জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়েই যেন আপন আপন পথে ওই কর্ম্মকে একটা বাধা বলিয়াই মনে করে, সাধনার গতিবেগে তাহারা উহাকে এড়াইয়া যাইতে চায়। সত্য বটে, সেই-জন্যই গীতায় বার বার জ্ঞানের উপরে ভক্তিকেই বড় করা হইয়াছে; কারণ, ভগবানে সর্ব্ব-সমর্পণ ব্যতিরেকে এমন 'মৎকর্ম্মপরম' হইয়া, ফলাকাঙ্ক্ষা ও আত্মকর্তৃত্ব নিঃশেষে বর্জ্জন করিয়া, কোন কর্ম্ম করা সম্ভব নয়। কিন্তু এরূপ 'যোগযুক্ত' হইয়া কর্ম্ম করা কি মনুষ্যপ্রকৃতির পক্ষে সম্ভব? কয়জন মানুষ এমন অতি-মানুষ হইতে পারে? কর্ম্ম কেবল ভাব বা জ্ঞানমূলকই নয়, তাহা প্রবৃত্তিমূলক; সেখানে কেবল knowing ও feeling লইয়াই কারবার নয়—willingও চাই। এই will-এর অপর নাম—কাম। কর্ম্ম করিতে হইবে অথচ কামকে উচ্ছেদ করিতে হইবে, ইহা মনস্তত্ত্বের তথা জীবন-সত্যের বিরোধী—অর্থাৎ দেহাধিষ্ঠিত আত্মার পক্ষে, মনুষ্যনামধারী পুরুষের পক্ষে, ইহা অসম্ভব। জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় যে ক্ষেত্রে সম্ভব, কর্ম্মের ক্ষেত্র তাহা হইতে স্বতন্ত্র; সেখানে, জ্ঞান ও ভক্তির প্রেরণাসত্ত্বেও, 'প্রবৃত্তিহীন' হইয়া কর্ম্মে 'প্রবৃত্ত' হওয়া মানুষের পক্ষে অসাধ্য। ভক্ত বলিবেন, ভগবানের কর্ম্ম করিতেছি, এই জ্ঞানে কর্ম্ম করিলেই কর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া থাকে, এবং তাহার সহিত যদি জ্ঞান যুক্ত হয় তবে আসক্তিও থাকিবে না। ইহাতেই বুঝা যাইবে যে, ওই জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম কোনটাই জগৎ-মুখী নয়, সকলই ভগবৎ-মুখী; ওই ভক্তিও যেমন সংসার-বৈরাগ্যের ভক্তি, ওই জ্ঞানও তেমনই বৈরাগ্যযুক্ত—ইহার কোনটার দ্বারা প্রকৃত কর্ম্ম—প্রকৃত জগৎ-সেবা—হয় না।

কর্ম্মের যে 'কর্ত্তা' সে 'আমি'ই; ভগবানের নামে হইলেও কর্ম্ম 'আমার'ই; মানুষ যখন ভগবানের নামে কোন কর্ম্ম করে, তখনও তাহাতে একটা স্বকীয় প্রবৃত্তি থাকিবেই—এই প্রবৃত্তির যাহা শ্রেষ্ঠ তাহারই নাম প্রেম। শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম নিষ্কাম হইবার প্রয়োজন নাই, তাহার প্রবৃত্তিমূলে প্রেম থাকিলেই হইল—জ্ঞান ও ভক্তি তাহার সাহচর্য্য করিবে মাত্র। কিন্তু দুঃখকে—জগৎ ও জীবনকে—স্বীকার না করিলে ওই প্রেমের জন্ম হয় না, তাই এতকাল পর্য্যন্ত আমাদের ধর্ম্মতত্ত্বে মানব-প্রেমের স্থান অতিশয় সংকীর্ণ ছিল—আত্মার সত্যকে আমার জীবনের সত্যের সহিত ভাল করিয়া মিলাইয়া লইতে পারি নাই। অথচ, সেই অতিপুরাতন তত্ত্বের মধ্যেই যে ইহার বীজ নিহিত ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী-মন্ত্রে ও বিবেকানন্দের জীবনে আমরা তাহারই প্রমাণ পাইয়া বিস্মিত হইয়া থাকি। সেই বাণীতেই মানুষের ও আত্মার, জগৎ ও ব্রহ্মের, এক অপূর্ব্ব সমন্বয় মানুষেরই বুদ্ধিগোচর হইয়াছে; তাহা যে এতকাল পরে, ঠিক এই যুগেই ঘটিয়াছে, ইহাও পরমাশ্চর্য্যের বিষয়। শ্রীরামকৃষ্ণের 'কালী' এই সমন্বয়ের প্রতীক,—নরেন্দ্রের সেই জ্ঞানকেই অতিশয় সুলক্ষণযুক্ত দেখিয়া তিনি এই 'কালী'র মন্দিরে তাহাকে বলিরূপে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এবার শুধুই জ্ঞান ও ভক্তি নয়—জ্ঞান ও প্রেমের সমন্বয়; তাই কর্ম্মও তাহার এমন অনুকূল হইয়াছে।

৭

বিবেকানন্দের জীবনে যে-প্রেম জ্ঞানের সহিত অবিরোধে বাস করিয়াছিল, তাহার প্রসঙ্গ এখনও শেষ হয় নাই, সম্ভবত একেবারে শেষ হইবে না; কারণ ইহারই তত্ত্ব বিবেকানন্দের সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। আমি তাঁহার মধ্যে জ্ঞান ও প্রেমের যে সাম্যাবস্থার কথা বলিয়াছি তাহাও সম্পূর্ণ সত্য নয়, কারণ এত বড় প্রেম সত্ত্বেও সে জীবনে জ্ঞানের সহিত তাহার একটা বিরোধ কখনও ঘোচে নাই; সকলেই তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। এইজন্যই তাঁহার মধ্যে সর্ব্বদাই একটা অশান্তির অস্থিরতা ছিল, তাঁহার আত্মার সেই অমিত বীর্য্য আপনাতে আপনি সমাহিত হইয়া থাকিতে পারে নাই,—তিনি সারাজীবন একটা প্রবল উত্তেজনা ও কর্ম্মব্যাকুলতা অনুভব

করিয়াছিলেন, তাহারই দাহে তাঁহার দেহ অকালে ভস্মীভূত হইয়াছিল। মঃ রোলাঁ বড় সত্য কথাই বলিয়াছেন—

His super-powerful body and too vast brain were the predestined battlefield for all the shocks of his storm-tossed soul.... And his days were numbered. Sixteen years passed between Ramakrishna's death and that of his great disciple—years of conflagration. He was less than forty years of age when the athlete lay stretched upon the pyre.

ইহার কারণ, প্রেম তাঁহার সেই অপর প্রকৃতিকে জয় করিতে পারে নাই, অতিশয় দৃঢ়বলে শাসনে রাখিয়াছিল; তাহার জন্য নিরন্তর যে শক্তি প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল—নিজের সহিত নিজেই যে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তাহার প্রচণ্ডতাই সে জীবনকে এমন দীপ্যমান করিয়াছে। তথাপি জ্ঞান ও প্রেম দুই-ই তাঁহার উপরে সমান আধিপত্য করিয়াছিল—একটা ভিতরে, অপরটা বাহিরে; তাই সে দ্বন্দ্ব এমন অন্তর্গূঢ় হইয়াছিল। এই প্রেমও যে সময়ে সময়ে তাঁহার নিকটে শাস্তির মত বোধ হইত, এবং ভিতরের কি একটা শক্তির বশে সে শাস্তি তিনি যেন বহন করিতে বাধ্য,—এমন ভাবও তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। ভগিনী নিবেদিতাই এক স্থানে লিখিয়াছেন—

It seemed almost as it were by some antagonistic power that he was "bowled along from place to place being broken the while", to use his own graphic phrase. "Oh, I know I have wandered over the whole earth", he cried once, "but in India, I have looked for nothing save the cave in which to meditate !"

কিন্তু সন্ন্যাসী-বিবেকানন্দের এই দীর্ঘশ্বাসে প্রেমিক-বিবেকানন্দের পরিচয় কি আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে না? যে শান্তি তাঁহার এত কাম্য, যে জীবন তাঁহার এত প্রিয়, তাহাই তো তিনি ত্যাগ করিয়াছেন! এই ত্যাগের শক্তি আসে কোথা হইতে? প্রেম ও বৈরাগ্য এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে তাঁহার জীবন জীর্ণ হইলেও, তিনি ওই প্রেমেরই যজ্ঞানলে সেই জীবনকে আহুতি দিয়াছিলেন।

ক্রমশ

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

প্রসঙ্গ কথা

দেউড়ির দারোয়ান

...এক-একজনের পরখ করিবার শক্তিও স্বভাবতই অসামান্য হইয়া থাকে। যাহা ক্ষণিক, যাহা সংকীর্ণ, তাহা তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিতে পারে না; যাহা ধ্রুব, যাহা চিরন্তন, এক মুহূর্তেই তাহা তাঁহারা চিনিতে পারেন। সাহিত্যের নিত্যবস্তুর সহিত পরিচয়লাভ করিয়া নিত্যত্বের লক্ষণগুলি তাঁহারা জ্ঞাতসারে এবং অলক্ষ্যে অন্তঃকরণের সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন। স্বভাবে এবং শিক্ষায় তাঁহারা সর্ব্বকালীন বিচারকের পদ গ্রহণ করিবার যোগ্য।

আবার ব্যবসাদার বিচারকও আছে। তাহাদের পুঁথিগত বিদ্যা। তাহারা সারস্বত প্রাসাদের দেউড়িতে বসিয়া হাঁকডাক, তর্জনগর্জন, ঘুষ ও ঘুষির কারবার করিয়া থাকে—অন্তঃপুরের সহিত তাহাদের পরিচয় নাই। তাহারা অনেক সময়েই গাড়িজুড়ি ও ঘড়ির চেন দেখিয়াই ভোলে। কিন্তু বীণাপাণির অনেক অন্তঃপুরচারী আত্মীয় বিরল বেশে দীনের মতো মার কাছে যায় এবং তিনি তাহাদিগকে কোলে লইয়া মস্তকাঘ্রাণ করেন। তাহারা কখনো কখনো তাঁহার শুভ্র অঞ্চলে কিছু কিছু ধূলিক্ষেপও করে—তিনি তাহা হাসিয়া ঝাড়িয়া ফেলেন। এই সমস্ত ধুলা-মাটি সত্ত্বেও দেবী যাহাদিগকে আপনার বলিয়া কোলে তুলিয়া লন—দেউড়ির দারোয়ানগুলা তাহাদিগকে চিনিবে কোন্ লক্ষণ দেখিয়া? তাহারা পোষাক চেনে, তাহারা মানুষ চেনে না। তাহারা উৎপাত করিতে পারে, কিন্তু বিচার করিবার ভার তাহাদের উপর নাই।—রবীন্দ্রনাথ

সরস্বতীর স্বর্ণমন্দিরের পার্শ্বেই একটি অস্তকুণ্ড আছে, প্রাকৃতজনের ভাষায় যাহাকে বলা হয়—আঁস্তাকুড়। সারস্বত-মন্দিরের আবর্জনা কালের সম্মার্জনীতে পরিষ্কৃত হইয়া উহাতে নিক্ষিপ্ত হয়। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' রচনার নামে এই আঁস্তাকুড়ের আবর্জনা ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া ডাঃ সুকুমার সেন কিছুদিন ধরিয়া বাংলা সাহিত্যে উৎপাত সৃষ্টি করিয়াছেন। উক্ত আবর্জনারাশির দ্বিতীয় খণ্ড 'আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' নামে প্রকাশিত হওয়ায় এই উৎপাত নূতন আকারে দেখা দিয়াছে। অবিলম্বে ইহার প্রতিকার না করিলে এই মথিত জঞ্জালের কদর্যতা ও পূতিগন্ধে সারস্বত-মন্দিরের শুভ্রশ্রী ও পবিত্রতা বিনষ্ট হইবে। আমরা এই দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, বাংলার শিক্ষিত সমাজ এবং সারস্বত-সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আমাদের পূর্বপুরুষগণ চিরকালই অধিকারী-ভেদ স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। শক্তি-সামর্থ্যের কথা বিচার করিয়া প্রথমেই স্বীকার করিয়া লওয়া ভাল যে, সকলের সব-কিছু করিবার অধিকার নাই। ডাঃ সুকুমার সেন ভাষাতত্ত্বের লোক। ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে অধিকার বিস্তৃত করিবার চেষ্টা করিলে হয়তো একদিন যোগ্য শিষ্য হিসাবে তিনি তাঁহার পূজনীয় গুরুদেবের গৌরব বর্ধিত করিতে পারিতেন। কিন্তু নিজের শক্তিসামর্থ্য সম্বন্ধে সেন মহাশয়ের স্পর্দ্ধিত আত্মাভিমান তাঁহাকে সাধনার স্বক্ষেত্র হইতে বিচ্যুত করিয়াছে। তিনি স্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ভয়াবহ পরধর্ম আচরণে লিপ্ত হইয়াছেন। বাংলা ভাষাতত্ত্বের ঐতিহাসিক আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহাকে প্রাচীন ও আধুনিক পুথিপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করিতে হইয়াছে। ভাষাবিচার করিতে করিতে তাঁহার ধারণা হইয়াছে যে, তিনি সাহিত্যবিচারেরও অধিকারী। অমনই তিনি ভাষাতত্ত্বের চর্চায় ইস্তফা দিয়া সাহিত্যের গবেষণা ও ইতিহাস-রচনার নামে সাহিত্যবিচারের দুরূহ ক্ষেত্রে নিজেকে প্রলুব্ধ করিয়া আনিয়াছেন, এবং এইসব ক্ষেত্রে যাহা হয়—লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু—তিনি নিজেই তাঁহার অপকর্মের স্তূপীকৃত জঞ্জালে তাঁহার সাধনার পথ আচ্ছন্ন করিয়া নিজের অপমৃত্যুকে ডাকিয়া আনিয়াছেন।

কোন চিন্তাশীল পাঠক যদি ধৈর্য ধরিয়া সেন মহাশয়ের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে'র দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ করিবার কষ্ট স্বীকার করেন, তাহা হইলেই তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, আঁস্তাকুড়ের জঞ্জাল লইয়াই তাঁহার কারবার, পরখ করিবার শক্তি তাঁহার নাই, সাহিত্যের নিত্যবস্তুর সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে নাই; স্বভাবতই যাহা ক্ষণিক, যাহা সংকীর্ণ, তাহাই তাঁহার চোখ ভুলাইয়াছে; আবর্জনা হইতে মণিমুক্তাকে, অসাহিত্য হইতে সাহিত্যকে বাছিয়া লইবার মত সাহিত্যবুদ্ধি বা সাধনা হইতে তিনি বঞ্চিত। সেইজন্যই তিনি 'নাদাপেটা হাঁদারামে'র 'আচাভূয়ার বোম্বাচাক' কিংবা 'বেশ্যাবিবরণ' জাতীয় সাহিত্যের জঞ্জালকে বিদ্যাসাগর-মধু-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের অমর সাহিত্যরাজির পার্শ্বে স্থান দিতে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হন নাই। শুধু ইহাই নয়, তাঁহার আসল কারবার 'আচাভূয়ার বোম্বাচাক' লইয়াই। পুরাতন লাইব্রেরির

ক্যাটালগ ঘাঁটিয়া হাজার দুই বাতিল পুথিপত্র লইয়াই তিনি তাঁহার ইতিহাসের পসরা সাজাইয়াছেন। বাতিলকে লইয়াই তাঁহার প্রধান বেসাতি, এবং তিনি ইহার জন্যই গৌরব বোধ করিয়া থাকেন।

কিন্তু সেন মহাশয়ের জানা উচিত যে, সাহিত্যের আঁস্তাকুড় হইতে জঞ্জাল কুড়াইয়া আনিলেই সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করা যায় না। সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রধান কথা হইল—ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা। গতিশীলতাই সাহিত্যের লক্ষণ, প্রগতি তাহার ধর্ম। সাহিত্যিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মূল ধারার সহিত নূতন নূতন ধারা সংযোজিত হইয়া প্রতিনিয়ত সাহিত্যকে পুষ্ট করিতেছে। পূর্বের সঙ্গে পরের, পুরাতনের সঙ্গে নূতনের আকার ও প্রকারগত, রূপ ও ভাবগত সম্পর্ক নির্দেশ করিয়া সাহিত্যধারার বাঁকে বাঁকে নবপ্রবাহিত স্রোতের উৎস, তাহার পরিচয় এবং পরবর্তী কালে তাহার প্রভাবের আলোচনাই সাহিত্যের ইতিহাস-রচনার প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হইল, নূতন নূতন ধারার যাঁহারা প্রবর্তক, অর্থাৎ সাহিত্যক্ষেত্রে যাঁহারা দিক্‌পালসদৃশ তাঁহাদের কীর্তির সম্যক আলোচনা। তৃতীয় কথা, সাহিত্য-সৃষ্টির বিচার। কালের মাপকাঠিতে যে সমস্ত অমূল্য গ্রন্থ স্থায়ী সাহিত্য-সৃষ্টি বলিয়া ধার্য হইয়াছে, সাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতাকে সাহিত্য-বিচারে তাহার গুণাগুণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে হইবে। চতুর্থ কথা, সাহিত্যক্ষেত্রে ঘটনারাজির কালানুক্রমিক বিবরণ; সাল তারিখ ও তালিকা লইয়াই এই দিকের কারবার; তথ্যসন্নিবেশ কতটা সম্পূর্ণাঙ্গ এবং নির্ভুল হইয়াছে তাহার উপরই এই দিকের সাফল্যের বিচার নির্ভর করে।

সাহিত্যের ইতিহাস রচনার এই চতুরঙ্গ কর্তব্য বিশ্লেষণ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, সাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতাকে একাধারে ঐতিহাসিক, সহৃদয় এবং সাহিত্যের বিচারক হইতে হইবে। সাহিত্যের ইতিহাস জাতির ইতিহাসের সঙ্গে সমতালে পদচারণা করিয়া চলে, কাজেই ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং তীক্ষ্ণ ঐতিহাসিক-বোধ না থাকিলে সাহিত্যের ইতিহাস রচনা অসম্ভব। সেন মহাশয় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের ইতিহাস

লিখিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানের একটিমাত্র নমুনা দিলেই যথেষ্ট হইবে। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী জাতির প্রধান চেতনা হইল তাহার দেশাত্মবোধ, তাহার জাতীয়তা-আন্দোলন। এই দেশাত্মবোধ ও স্বাজাত্যগর্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া সেন মহাশয় বলিয়াছেন—

অন্নবস্ত্রের স্বাচ্ছন্দ্য থাকিলেও বিদেশী রাজপুরুষের কাছে চাকুরী-পরায়ণ শিক্ষিত বাঙ্গালী উপযুক্ত মর্য্যাদা পাইত না। প্রধানত এই ক্ষোভই বাঙ্গালা দেশে জাতীয়তা-আন্দোলনের প্রথম ঢেউ তুলিয়াছিল।—পৃ. ২২৩

অর্থাৎ বিদেশী রাজপুরুষের কাছে মর্যাদা ও চাকুরিপ্রার্থী বাঙালী মর্যাদা ও চাকুরি না পাইবার ক্ষোভেই দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে! বাঙালী জাতি সম্বন্ধে এই অবমাননাকর ঘৃণিত উক্তির উপর কোনও মন্তব্য করিয়া আমরা বাঙালী জাতিকে আর অপমানিত করিতে চাই না। কুৎসা-কলুষ-কণ্ঠ মেকলের বিজাতীয় উক্তিও বোধ হয় বাঙালীর চরিত্রে এতটা কলঙ্ক লেপন করিতে পারে নাই। সেন মহাশয়ের স্বজাতিদ্রোহের কথা আপাতত উহ্যই থাকুক, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস সম্বন্ধে ইহাই যাঁহার জ্ঞানের স্বরূপ, তাঁহার পক্ষে বাঙালী জাতির এই নবজাগরণ এবং নবজাগরণের সাহিত্য-ইতিহাস রচনার অধিকার কত দূর আছে, তাহার বিচারের ভার আমরা শিক্ষিত সমাজের উপরই ছাড়িয়া দিলাম।

* * *

ইতিহাসের অথই দরিয়ায় সেন মহাশয়কে নাকানি-চোবানি খাওয়াইয়া আর নাজেহাল করিব না, সাহিত্য-ইতিহাসের সংকীর্ণ ক্ষেত্রেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিব। সকলেরই জানা আছে যে, আকারে ও প্রকারে, রূপে ও ভাবে, প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। কি করিয়া এই ব্যবধান সম্ভব হইল, তাহাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গোড়ার কথা। এই প্রসঙ্গে সাহিত্যের 'আধুনিকতার' স্বরূপ লক্ষণ কি এবং কখন হইতে ইহার আরম্ভ তাহাও বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ না করিয়া আধুনিক সাহিত্যের আলোচনাই আরম্ভ হইতে পারে না। সেন মহাশয় মাত্র আড়াই পৃষ্ঠার মধ্যে 'আধুনিক বাঙ্গালা

সাহিত্যের লক্ষণ' লিপিবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন। একটু তলাইয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে, প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের নাম করিয়া তিনি প্রাচীন সাহিত্যের প্রতীক হিসাবে কেবল বৈষ্ণব পদাবলী এবং আধুনিক সাহিত্যের প্রতীক হিসাবে কেবল আধুনিক কাব্য সম্বন্ধেই কয়েকটি চমকপ্রদ উক্তি করিয়া আসর মাত করিতে চাহিয়াছেন। "সমাজসচেতনতা আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম লক্ষণ।...দ্বিতীয় লক্ষণ ব্যক্তিসচেতনতা দেখা দিল সর্ব্বপ্রথম মধুসূদনের কাব্যে।...চতুর্দ্দশ-পদী কবিতাবলীতে এবং অন্যত্র ব্যক্তিসচেতনতার সঙ্গে আত্ম-সচেতনতাও দেখা দিয়াছে।...তৃতীয় লক্ষণ হইতেছে আধুনিক গীতিকাব্যের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য—আত্মকেন্দ্রিকতা। ইহা প্রথমে দেখা দিল বিহারীলালের রচনায়।...চতুর্থ লক্ষণ আত্ম-সম্প্রসারণ।" রবীন্দ্র-নাথের কাব্যসৃষ্টিতে ইহার প্রকাশ।

বলা বাহুল্য, এই কথাগুলি নিতান্তই ধার করা। সেন মহাশয় কাহার নিকট হইতে এই তত্ত্ব-পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন তিনি বলেন নাই। ঋণ স্বীকার করা তাঁহার স্বভাবে নাই। নিন্দার সুযোগ না পাইলে পূর্বাচার্যগণের উল্লেখমাত্র তিনি করেন না, 'গ্রন্থপঞ্জী' তাঁহার গ্রন্থে স্থান পায় না, কাজেই সেন মহাশয় অন্যের জিনিস বেমালুম আত্মসাৎ করিয়াও অঋণী। অতএব এই অপ্রীতিকর আলোচনা স্থগিত থাকুক। কিন্তু এই ধার-করা বিদ্যা যে যথাসময়ে কোনও কাজেই আসে নাই, তাহার দুইটি উদাহরণ দিতেছি। সমাজ কিংবা ব্যক্তি বা আত্মা—যে সম্পর্কেই হউক না কেন, সচেতনতা বলিতে কি বোঝায়, সে সম্বন্ধে সেন মহাশয় নিজে সম্পূর্ণই অচেতন। সেইজন্যই মধুসূদনের সম্বন্ধে [উপরে উদ্ধৃত] ভূমিকায় ব্যক্তি-সচেতনতা ও আত্ম-সচেতনতার কথা বলিয়া তিনি মধুসূদনের কাব্যবিচার যেখানে আরম্ভ করিয়াছেন, সেখানে বলিতেছেন, "মধুসূদনের প্রতিভা ছিল আত্মসচেতন, প্রথম হইতেই। এই আত্ম-সচেতনতার জন্যই তাঁহার কবিবুদ্ধি যথোপযুক্ত শিক্ষা ও সংস্কার গ্রহণ করিতে পারে নাই।" ব্যক্তি ও আত্মসচেতনার অর্থ ও পার্থক্য কি, সে সম্বন্ধে যথোপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিলে এই জাতীয় দায়িত্বহীন কথা সেন মহাশয় বলিতেন না। কিন্তু অতটা সূক্ষ্ম বিচারে

প্রবেশ করিয়া লাভ নাই। ধার-করা বুলির কথা ছাড়িয়া দিয়া প্রাচীন ও আধুনিক কাব্যের পার্থক্য সম্বন্ধে সেন মহাশয়ের কি ধারণা, তাহা নিম্নোক্ত কয়েকটি কথা হইতেই স্পষ্ট হইবে। তিনি বলিতেছেন—

ভাবে ও ভাষায় আধুনিক বাঙ্গালা কাব্যের সহিত প্রাগাধুনিক বাঙ্গালা কাব্যের পার্থক্য আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই পার্থক্য উভয়ের মধ্যে সর্বত্র একান্তভাবে সীমা-রেখা টানিয়া দেয় নাই। শুধু পয়ারের বন্ধনমুক্তিই প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গালা কাব্যের মধ্যে সুস্পষ্ট বিদারণ-রেখা টানিয়া দিয়াছে।—পৃ. ১৫৩

অর্থাৎ আধুনিক কবি মধুসূদন-বিহারীলাল-রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রাচীন কবি কৃত্তিবাস-চণ্ডীদাস-মুকুন্দরাম-ভারতচন্দ্রের সুস্পষ্ট পার্থক্য রচিত হইয়াছে প্রধানত পয়ারের বন্ধনমুক্তিতে! মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের স্বরূপনির্ণয় সম্বন্ধে এই শেষ-কথা শ্রবণের পর আর এই বিষয়ে আলোচনার আবশ্যকতা নাই।

অথ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কালারম্ভ ও পর্ব-বিচার। আড়াই পৃষ্ঠায় 'আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের লক্ষণ' বিশ্লেষণ করিয়া সেন মহাশয় এক লাফে উনবিংশ শতাব্দীর ৪২ বৎসর ডিঙাইয়া 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র আমলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। 'তত্ত্ববোধিনী' (১৮৪৩) হইতেই তাঁহার "আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের" কালারম্ভ। শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে সেন মহাশয় আমলই দেন নাই, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে সাময়িক পত্রিকা এবং রামমোহনও তলাইয়া গিয়াছেন, এমন কি ঈশ্বর গুপ্তকেও গঙ্গাযাত্রায় প্রাচীনদের সঙ্গী হইতে হইয়াছে। আধুনিক যুগের অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের আরম্ভ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে! মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার নির্দেশ-নামায় এই যুগের দুইটি পর্ব—'মধুসূদন-পর্ব' ১৮৪৩ হইতে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ, আর 'বঙ্কিম-পর্ব' ১৮৭২ হইতে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ। ইহাকেই বলে রাম না জন্মিতেই রামায়ণ! মধুসূদনের প্রথম সাহিত্য-সৃষ্টি ১৮৫৮ সালে, অথচ তাহার ১৫ বৎসর পূর্ব হইতে তাঁহার পর্ব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া মধুসূদন আধুনিক কাব্যের স্রষ্টা, নাটকেরও অন্যতম স্রষ্টা বলিতে আপত্তি নাই; কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্কিমপূর্ব যুগের গদ্য-সাহিত্যে মধুসূদনের কোন প্রভাবই থাকিবার কথা নয়। কাজেই

কাব্য, নাটক, গল্প, উপন্যাস মিলাইয়া যে সাহিত্য তাহার ইতিহাসে মধুসূদন-পর্ব অর্থহীন। তা ছাড়া কাব্যের ইতিহাসে মধুসূদনের পর্ব যেখানেই আরম্ভ হউক না কেন, তাহার সমাপ্তি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কিছুতেই হইতে পারে না। অন্তত হেম-নবীনের আমল পর্যন্ত তাহা অনায়াসেই প্রসারিত হইতে পারে। 'বঙ্গদর্শনে'র প্রকাশ যতই গুরুত্বপূর্ণ হউক না কেন, বঙ্কিম-পর্ব কি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়াছে? ১৮৬৫ যেদিন 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হইল সেই দিন হইতেই কি বঙ্কিম-পর্বের আরম্ভ নয়? মধুসূদনের সাহিত্য-আবির্ভাবের ১৫ বৎসর পূর্বে যদি মধুসূদন-পর্ব আরম্ভ হইতে পারে, তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের বেলা এত বিলম্ব কেন? তা ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকার প্রধানত গদ্যসাহিত্যে। কাব্য ও নাটকে তাঁহার পর্বের কোন অর্থই হয় না। সাহিত্য-সৃষ্টির কথা পরিত্যাগ করিয়া যদি ভাবধারা ও ব্যক্তিত্বের বিচারেই পর্বনির্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে অন্তত আরও দুইটি পর্ব, প্রথম দিকে বিদ্যাসাগর-পর্ব এবং শেষের দিকে গিরিশ-পর্ব, স্বীকার করিতেই হইবে। 'তত্ত্ববোধিনী'-প্রকাশের সহিত যে পর্বের সূত্রপাত তাহার সঙ্গে মধুসূদনের কোনই সম্পর্ক নাই, কিন্তু বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কাজেই ইহাকে মধুসূদন-পর্ব না বলিয়া বরং বিদ্যাসাগর-পর্ব বলাই অনেক সঙ্গত। তা ছাড়া উনবিংশ শতাব্দীকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করিয়া লইলে দ্বিতীয় ভাগের চিন্তানায়ক যদি বঙ্কিমচন্দ্র হন, তবে প্রথম ভাগের চিন্তানায়ক যে বিদ্যাসাগর সে বিষয়েও কি সন্দেহের অবকাশ আছে?

* *

সেন মহাশয় সাহিত্যতত্ত্বের একটি চমৎকার 'মেড-ঈজি' আবিষ্কার করিয়া সাহিত্যবিচার একেবারে জলের মত সহজ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার নবাবিষ্কার-মতে সাহিত্যসৃষ্টির অদ্বৈত সত্য হইল 'রোমান্টিকতা'। তাঁহার মুখেই শ্রবণ করুন—

এই প্রসঙ্গে রোমান্টিকতা (Romanticism) কথাটির ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। মানুষের চিত্তবৃত্তির প্রকাশ হয় তিন রূপে—ঐতিহাসিক, রোমান্টিক, ও বৈজ্ঞানিক। ঐতিহাসিক বিবেচনা হয় কালানুক্রমিক বিবর্তন ধরিয়া। রোমান্টিক কল্পনা চলে

কালানুক্রম ও বাস্তব-কার্যাকারণপরম্পরাকে যেন পাশ কাটাইয়া, আর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি খাটে বাস্তব-কার্যাকারণপরম্পরার উপর নির্ভর করিয়া। ঐতিহাসিক বিবেচনা ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্টতর (sic)। কেন না কালানুক্রমিকতার সঙ্গে কার্যাকারণপরম্পরার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। রোমান্টিকতা হইতেছে কোন এক অনির্দেশ্য ইষ্ট আদর্শকে ইমোশনের মধ্য দিয়া পাইবার প্রচেষ্টা।...

ইংরেজি সাহিত্যে যেমন বাঙ্গালা সাহিত্যেও তেমনি, রোমান্টিকতা উপন্যাসের পক্ষে অপরিহার্য। আধুনিক কালে সাহিত্যে যাহা আমরা realism বা বাস্তবতা বলি তাহা রোমান্টিকতার পরিণাম মাত্র। সাহিত্যে বাস্তবতার সঙ্গে রোমান্টিকতার কোন বিরোধ নাই। বিষয়বস্তুর বাস্তব বিচার বা বিশ্লেষণ তখনই সাহিত্যের সামগ্রী হইয়া উঠে যখন তাহা রসপরিণতি লাভ করে। নতুবা তাহা বিজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকিবে। বিষয়বস্তুকে রসপরিণতি দিতে পারে একমাত্র কবিকল্পনা অর্থাৎ রোমান্টিক দৃগ্ভঙ্গি।—পৃ. ২০৬-৭

রসপরিণতিই সাহিত্যের শেষ কথা। রোমান্টিক দৃগ্ভঙ্গিই বিষয়বস্তুকে রসপরিণতি দিতে পারে। অতএব রসোত্তীর্ণ তাবৎ সাহিত্যই রোমান্টিক। শুধু উপন্যাস কেন, গীতিকাব্য, মহাকাব্য, নাটক, উপন্যাস, গল্প—যাহাই হউক না কেন, সাহিত্য বলিয়া গণ্য হইতে হইলে রোমান্টিক হইতেই হইবে। সেন মহাশয়ের এই রোমান্টিক রসতত্ত্ব পাঠে পুলকিত হইয়া উঠিতেছিলাম, অকস্মাৎ দেখি কাচিৎ কলঙ্কিতা নবীনকালী সেন মহাশয়কে পথভ্রষ্ট করিয়াছে। তিনি লিখিতেছেন—

নবীনকালী দেবীর 'কামিনী-কলঙ্ক' (১২৭৭) গদ্যেপদ্যে রচিত...একটি বিশিষ্ট কাব্য। বইটির কাহিনীতে রচয়িত্রীর আত্মকথার ছায়া আছে বলিয়া মনে হয় এবং তাহা হইলে এটিকে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম বাস্তব উপন্যাসের মর্যাদা দিতে হয়।—পৃ. ১৭

বইটির শেষে পয়ারে যে "গ্রন্থকর্ত্রীর পরিচয়" আছে তাহাতে মনে হয় যে কামিনী-কলঙ্ক আত্মকথামূলক আখ্যায়িকা।—পৃ. ১৮

সেন মহাশয়কে আমরা সংযত পুরুষ বলিয়াই আশা করিয়াছিলাম। একটি কলঙ্কিতা কামিনীকে দেখিয়া তিনি এতটা বেসামাল হইয়া যাইবেন, তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারি নাই। গদ্যেপদ্যে লেখা একটি কাব্য একেবারে বাংলা সাহিত্যের প্রথম বাস্তব উপন্যাস হইয়া দাঁড়াইল? এই নবাবিষ্কৃত প্রথম বাস্তব উপন্যাসের অন্তত এক যুগ আগে লেখা প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলালে'র বাস্তবতা এবং ঔপন্যাসিকতা সম্পর্কে সেন মহাশয়কে প্রশ্ন করিব ভাবিতেছি,

হঠাৎ দেখি 'আলালের ঘরের দুলাল' সেন মহাশয়ের কলমের এক আঁচড়েই উপন্যাসের ক্ষেত্র হইতে একেবারে বাংলা প্রহসনেরও অধম নকশা শ্রেণীতে অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। সেন মহাশয় 'গদ্যেপদ্যে অথবা গদ্যে রচিত' যে সব নকশায় বাঙ্গালা প্রহসনের পূর্বরূপ' পাইয়াছেন, ভবানীচরণের 'নববাবুবিলাস', 'নববিবিবিলাস', বিশ্বনাথ মিত্রের 'কলিরাজার মাহাত্ম্য', রামধন রায়ের 'কলিচরিত', নারায়ণ নটরাজ গুণনিধির 'কলিকুতূহল' এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' তাহার অন্তর্ভুক্ত। "এই সকল নিবন্ধে বাঙ্গালা প্রহসনের প্রথম খসড়া দেখা দিয়াছিল।" (পৃ. ১২) বেচারা প্যারীচাঁদ! গ্রাজুয়েট বঙ্কিমচন্দ্রের ছোট আদালতে তিনি যে রায় পাইয়াছিলেন, তিনি কি ভাবিয়াছিলেন যে পঞ্চাশ ষাট বৎসর যাইতে না যাইতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ডক্টরের উচ্চ-আদালতে তাঁহার মামলা এই ভাবে ডিসমিস হইয়া যাইবে? কিন্তু প্যারীচাঁদের আফসোস করিবার কারণ নাই, মধুসূদন গিরিশচন্দ্র এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রও একই দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। চালাকি চলিবে না, বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু পুরস্কার, বহু স্বর্ণপদক এবং আশুতোষ-গ্রিফিথ-পি. আর. এস.-পি. এচ. ডি.-উপাধিক সুকুমার সেন! চাট্টিখানি কথা নয়, গিরিশ-মধু-বঙ্কিমকে একেবারে ঘোল খাওয়াইয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।

* * *

সেন মহাশয় সাহিত্যে একেবারে 'মিরাক্‌ল'-বাদী। মধুসূদন সম্বন্ধে বলিতেছেন—

> মধুসূদন বাঙ্গালা নাটক এবং কাব্য রচনা করিতে যে অন্তরের কোন বিশেষ প্রেরণা অনুভব করিয়াছিলেন তাহা নহে।...বাঙ্গালা কাব্যে হাত দিয়াছিলেন অনেকটা bravado বা জেদ করিয়া।...এই জেদের ফলে বাঙ্গালা কাব্যে যুগান্তর ঘটিয়া গিয়াছে।
> —পৃ. ১৫৩

অর্থাৎ বর্তমান প্রেরণা ছাড়াও সাহিত্য রচনা চলে, এবং শুধুমাত্র জেদের বশেই 'মেঘনাদবধে'র মত মহাকাব্য অনায়াসে লিখিয়া ফেলা যায়! মধু-প্রতিভার কি গভীর অন্তর্দৃষ্টি! আধুনিক বাংলা নাটক ও কাব্য-সৃষ্টির জন্মরহস্য সম্বন্ধে কি গূঢ় ঐতিহাসিক তথ্য-আবিষ্কার!

এই বার! তত্ত্ববিচারের নমুনা দেখুন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাপণ্ডিতের কাছে সাহিত্যবিচারক্ষেত্রে ভক্তিগদগদ ভাবোচ্ছ্বাস আশা করিবেন না। আপনাদের 'মহাকবি' এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন,—

গিরিশের নাটকে উঁচুদরের সাহিত্যশিল্পের পরিচয় নাই, এবং তাহা থাকিবারও কথা নয়। গিরিশ যাহাদের জন্য নাটক লিখিতেন তাহাদের রস-বোধের পরিধি তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং cheap sentimentality বা sob stuff এবং stage trick তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই, এবং ইহার দ্বারা তিনি নাটকে যেমন আসর জমাইতে পারিয়াছিলেন এমন উপন্যাসে অনুরূপ ক্ষমতাশালী খুব কম লেখকই পারিয়াছিলেন।...পদ্যাংশে মাঝে মাঝে কবিত্বের পরিচয় আছে কিন্তু তাহা একান্তভাবে নাটকীয় বলিয়া জমিয়া উঠে নাই। গদ্য সংলাপের ভাষা প্রায়ই হয় নাটকীয় নয় কলিকাতার -slang বা ইতরভাষা মিশ্রিত।—পৃ. ৩১৪

মন্তব্য করিবার সাহস আমাদের নাই। কেবল আর একটি কথা বাকি আছে, "গৈরিশ ছন্দে (sic) গিরিশচন্দ্রের আবিষ্কার নয়, তাঁহার পূর্বে ব্রজমোহন রায় নাটকে এবং রাজকৃষ্ণ রায় কাব্যে ভাঙা পয়ার (মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর) ছন্দের অল্পস্বল্প ব্যবহার করিয়াছিলেন, [পৃ. ৩৬৯]"।

জানি পাঠকগণের ধৈর্যচ্যুতি হইতেছে। কাজেই আমরা আর কাহারও কথা উচ্চারণমাত্র না করিয়া কেবল বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে সেন মহাশয়ের নির্দেশনামা উদ্ধার করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস মাত্রই রোমান্টিক [যায় 'বিষবৃক্ষ' 'কৃষ্ণকান্তের উইল' পর্যন্ত] এবং সেন মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, প্রত্যেকখানি গ্রন্থই ত্রুটিবিচ্যুতিতে পূর্ণ। তবু ভদ্রলোক সস্তা উপন্যাস লিখিয়া সাধারণ পাঠকসমাজকে তৃপ্তি দিয়াছিলেন বলিয়া সেন মহাশয় তাঁহার পিঠ চাপড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু গীতা-ফীতার নিগূঢ় তত্ত্ব লইয়া তাঁহার অনধিকারচর্চা সেন মহাশয় কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারেন নাই। তিনি লিখিতেছেন—

বঙ্কিমের অধ্যাত্ম-দৃষ্টি গভীর ছিল না, তাই ব্রহ্মোপলব্ধিসঞ্জাত গভীর অনুভূতি তাঁহার ধর্মতত্ত্বে কোন স্থান পায় নাই। বঙ্কিম ছিলেন জীবনের উপরতল-বিহারী নিষ্কামকর্ম-চঞ্চল, তাই ধ্যানগম্য আনন্দরসোপলব্ধির প্রতি তাঁহার আস্থা বা আগ্রহ ছিল না।

গীতোক্ত নৈষ্কর্ম্যবাদের পিছনে যে কতখানি ধ্যানধারণার ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দীর্ঘ ভূমিকা থাকা একান্ত আবশ্যক তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই।—পৃ. ২২০

গ্রাজুয়েট এবং হবু-গ্রাজুয়েটদের অর্বাচীন রচনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেরা অনবরতই পরীক্ষা করিতেছেন এবং এই জাতীয় মন্তব্য তাঁহাদের সর্বদাই জিহ্বাগ্রে প্রস্তুত থাকে। গ্রাজুয়েট বঙ্কিমের উপর ডক্টর সেনের বেপরোয়া মন্তব্যের অধিকার বিশ্ববিদ্যালয়ই সেন মহাশয়কে দিয়াছে। অতএব সহ্য করিতেই হইবে। সেন মহাশয় ২১৭ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, "পাশ্চাত্য দৃগ্‌ভঙ্গি লইয়া সাহিত্য-সমালোচনার সূত্রপাত" বঙ্কিমচন্দ্রই করিয়াছেন। খুশি হইয়া উঠিলাম, লোকটা শুধু নিন্দাই করে না, প্রশংসা করিতেও জানে। কিন্তু হায় রে, দৈনিক সমালোচনারীতি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান থাকিলে কি আর এতটা অসতর্ক হইতে পারিতাম! সেন মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রকে একটি মাত্র আছাড়ে বধ করিবার জন্যই তাঁহাকে মুহূর্তমাত্র আকাশে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। পরপৃষ্ঠায়ই তিনি লিখিতেছেন—

বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যরসবোধ খুব গভীর ছিল না, তাই তাঁহার কাব্যসমালোচনা সাধারণত গতানুগতিক হইয়াছে।—পৃ. ২১৮

যেখানে 'সূত্রপাতে'র কথা আছে, সেখানে 'গতানুগতিকতা' আসে কি করিয়া তাহা সাধারণ যুক্তি বা বুদ্ধির অধিগম্য নয়। কাজেই সে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া লাভ নাই। কিন্তু আমরা ভাবিতেছি, যে-বঙ্কিম উত্তরচরিত, শকুন্তলা মিরন্দা ও দেস্‌দিমোনা, কিংবা বিদ্যাপতি ও জয়দেব লিখিয়া রবীন্দ্রনাথকে 'প্রাচীন সাহিত্য' বিচারের পথ করিয়া দিয়াছিলেন, যে-বঙ্কিম আর কিছু না হউক ঈশ্বর গুপ্ত, প্যারীচাঁদ এবং দীনবন্ধুর সাহিত্য সম্বন্ধে শেষ-কথা বলিয়া গিয়াছেন, সেই বঙ্কিমের কাব্যরসবোধ ছিল না? পাঠকগণ, সত্যই বলিতেছি, বিংশ শতাব্দীর শহুরে সভ্য পরিবেশের কথা ভুলিয়া গিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর গ্রামবৃদ্ধের মত বদ-জোবানি করিতে ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু এই যুগের রসবোধ তাহা ক্ষমা করিবে না।

(আগামীবারে সমাপ্য)

অধঃপতন

ভোটপর্ব্বের পালা অনেককাল হইতে চলিতেছিল। এবার তাহার সুফলটা বোঝা গেল! বহু যোগ্য এবং যোগ্যতর ব্যক্তিকে ডিঙাইয়া ছোটমামা সাপ্লাইয়ে একজন কর্ণধার হইয়া বসিলেন।

সকালেই খবর পাইয়াছিলাম। দেখা করিতে গেলাম বৈকালে। না গেলে অবশ্য ওপক্ষের বিশেষ কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। আমাদের মত অতি অগণ্য নগণ্য মানুষদের ছোটমামা বড় একটা স্মরণে রাখেন না। কিন্তু আমাদের তরফ হইতে সম্বন্ধ বজায় রাখিবার ত্রুটি নাই। আমাদের ক্রমক্ষয়িষ্ণু আভিজাত্যের শেষ গৌরব হিসাবে তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধটুকুকে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া রাখিয়াছি। যখন যাহার কাছে আত্মমর্যাদা বাড়াইবার প্রয়োজন অনুভূত হয়, তখনই ছোটমামার গৌরবময় পদমর্য্যাদাটাকে সম্মুখে আগাইয়া ধরি।

ছোটমামা অন্যদিন আমাদের বড় একটা গ্রাহ্যই করেন না। আজিকার বহুবাঞ্ছিত পদগৌরববৃদ্ধির উল্লাসেই মনটা বোধ হয় প্রফুল্ল ছিল। প্রসন্নমুখে বলিলেন, খবর শুনেই এসেছিস বুঝি? বেশ বেশ। তোর ছোটমামী আজ ঘরে প্রচুর পাটিসাপটা বানিয়েছে। একটু মিষ্টিমুখ ক'রে যাস।

ছোটমামীমা পাশের ঘরেই ছিলেন। একঘর জিনিসপত্র ছড়ানো— কমলালেবু, আঙুর, সন্দেশ, মাছ হইতে শুরু করিয়া কাশ্মীরী কার্পেট হইতে সোনার ঘড়ি অবধি। বড় সাহেবকে ডালি পাঠাইবার বিবিধ বিচিত্র উপকরণ। মামীমা ফলের রাশি হইতে দাগী ফলগুলা বাছিয়া আলাদা করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া হাসিমুখে বসিতে বলিলেন। মামীমার সর্ব্বাঙ্গ নূতন ঝকঝকে গিনি-সোনার গহনায় মোড়া। দামী ঢাকাই শাড়ির জরির আঁচল অযত্নে মাটিতে পড়িয়া লুটাপুটি খাইতেছে। আগুনের মত উজ্জ্বল সে সোনার রঙের তীব্র দীপ্তিতে চোখে যেন ধাঁধা লাগিয়া যায়। অকারণেই মনে পড়িয়া যায়, মার কানের ফুলজোড়াটা পাশের বেনেবাড়িতে গত সাত মাস যাবৎ সাড়ে পাঁচ টাকায় বাঁধা দেওয়া আছে। মামীমা ফুল তোলা রুমাল দিয়া থরে থরে সাজানো থালা ঢাকিতেছিলেন। অকারণেই হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, গত তিন মাস যাবৎ মিনু একখানা আস্ত শাড়ি চাহিয়া

কান্নাকাটি করিতেছে। স্নান করিয়া উঠিয়া পরিবার কাপড়সুদ্ধ নাই।

মামীমার থালা গুছানো শেষ হইয়াছিল। দাগী ফলগুলা হইতে দুইটি কমলালেবু বাছিয়া মামীমা আমাকে দিলেন। বাকি আঙুর নাশপাতি লেবু ঝি তুলিয়া লইয়া গেল।

একথালা পাটিসাপটা সাজাইয়া মামীমা আমার সামনে রাখিলেন, বলিলেন, রস যেন বেশি খাস নি, গা জ্বালা করবে। দুটো মানুষ, এত চিনি আনেন! রোজই ঘরে খাবার করি, তবু ফুরোয় না, কি যে করি! আজ তবু একটা ভাল উপলক্ষ্য পাওয়া গেল।

সবিস্ময়ে বলিলাম, অনেক চিনি পান? কেমন ক'রে পান? সবই তো র‍্যাশান্‌ড।

মামীমা মুখ মচকাইয়া হাসিলেন, বলিলেন, সে তো আছেই সকলের জন্যে, তবু যুদ্ধের কল্যাণে ভাবতে হয় না, সবই ঘরে মজুত থাকে। মামীমা ভাঁড়ার খুলিয়া দেখাইলেন। সরু মিহি সীতাশাল চাল, চিনি, সুজি, কাগজ, কয়লা, কেরোসিন, ফিনাইল আর স্পিরিট—অজস্র, প্রয়োজনের ঢের বেশি! থাকিবে না কেন? পয়সা আছে আর আছে প্রতিপত্তি—অগাধ অজস্র খাতির।

আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, তা তোর এমন হাল কেন? চশমাটায় দু রকম ফ্রেম জুড়েছিস! ছেঁড়া জামা জুতো! গাল তোবড়া, চোখের কোল বসা! এই কি সাতাশ বছরের ছেলের চেহারা? চুলগুলোতে যেন ধুলো উড়ছে। ক্যান্থারআইডিন মাখলেই পারিস। দামেও খুব সস্তা। মোটে সাড়ে তিন টাকা ক'রে শিশি।

চুলের আর দোষ কি! নারিকেল তৈল বাজার হইতে আত্মগোপন করিয়াছে। দেড় টাকা সেরের সরিষার তেলে, টানাটানি করিয়াই রান্না চালাইতে হয়। মাথায় মাখিয়া তেল নষ্ট করা আমাদের ধর্ম্মে পোষায় না। মামীমাকে কেমন করিয়া বুঝাইব, চেহারার কোন দোষ নাই! ভোরবেলা একখানা বাসী হাতরুটি চিবাইয়া ছেলে পড়াইতে যাই। সেখান হইতে ফিরি বাজার সারিয়া। ফিরিয়াই আজ থলিঝুলি কাঁধে করিয়া র‍্যাশান শপে ছুটিয়াছিলাম। দুই ঘণ্টা

সেখানে পালা গনিবার পর র‍্যাশান মিলিল না। মিলিয়াছে অজস্র গালমন্দ। হিসাবের একটি পয়সা কম পড়িয়া গিয়াছিল। আতপ-চালের ক্ষুদ আর আটার ভূষি আর সহ্য হয় না। দেড় বছর যাবৎ ক্রনিক আমাশয়ে ভুগিতেছি।

কিন্তু এসব কথা মামীমাকে বুঝাইয়া কোন ফল নাই।

দুই-চার টাকার ফল দাগী হইলে ইহারা অনায়াসে ঝি-চাকরকে বিলাইয়া দেয়। মানসম্ভ্রম, অর্থ, প্রতিপত্তি আর যুদ্ধের কল্যাণে, ইহারা প্রতিদিন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়। তাই ম্লান বিশীর্ণ হাসি হাসিয়া বলিলাম, চেহারার এসব যা বলছ, এও তো যুদ্ধের কল্যাণে।

*　　*　　*　　*

চারটি মুড়ি আর এক কাপ চা সামনে রাখিয়া মা বলিলেন, আজ বিনা চিনিতেই চা খাও বাবা। মিনুটার সাত দিন জ্বর। চারবার ক'রে পালো খাচ্ছে; ওকে দিতেই সব চিনি শেষ হয়ে গেল। অনু নন্তু তো চায়ে চিনি নেই দেখে কাঁদতে বসেছে। রোগা মেয়েটাকে যে ওবেলা পথ্য দেব কি ক'রে জানি না। র‍্যাশানেও তো গোলমাল হ'ল, পেলি না। তবু ফের এবেলা একবার নন্তুকে পাঠালাম।

মামীমার হাতের ঘন চিনির রসে তখনও পেট গুলাইতেছে। কি মনে পড়িতেই পকেটে হাত ঢুকাইয়া দুইটা রসসিক্ত পাটিসাপটা আর আধখানা লেবু বাহির করিয়া মার হাতে দিয়া বলিলাম, অনু আর নন্তুকে দিও, মিনুকে লেবুটা। ওরা তো কিছুই ভালমন্দ খেতে পায় না। মামীমার ওখানে অনেক দিয়েছিল, ওইটুকু লুকিয়ে নিয়ে এলাম। কত যে নষ্ট হ'ল, ফেলা গেল—আঙুর, বেদানা; লজ্জায় চাইতে পারলাম না।

পকেটটা অনুভব করিয়া বলিলাম, এঃ, রসে একেবারে ভিজে গেছে, কাল কি প'রে যাব আপিসে?

মা লুব্ধনেত্রে পকেটটার পানে চাহিয়াছিলেন। সাগ্রহে বলিলেন, থাক থাক, আলগোছে খুলে দে ওটা। আস্তে জলে চুবিয়ে রসটা ছেঁকে নিয়ে ওটা কেচে দেব 'খন। এবেলা মিনুর পথ্যিটা চুকে যাবে।

*　　*　　*　　*

মামীমার মেজাজটা আজ ভালই ছিল। আমার পেটের অসুখ

শুনিয়া এক পোয়া সরু পুরানো চাল দিয়াছিলেন। সেটাকে সযত্নে তাকের এক কোণে তুলিয়া রাখিতেছিলাম। বউদি ঘরে আসিলেন, বলিলেন, ওটা কি রাখলে ভাই ঠাকুরপো? বউদির পেটরোগা ছেলেটার কথা মনে পড়িল। তাড়াতাড়ি বলিলাম, ও কিছু নয়। সময়ে মুষ্টিভিক্ষে দিতে হয় কিনা, তাই চাট্টি চাল সরিয়ে রাখলাম।

মেঝেতে দুই-চারিটা চাল পড়িয়া গেল। বউদি কুড়াইয়া হাতে করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন।

বাঃ, খুব মিহি চাল তো, পুরনো নিশ্চয়, ভাল চাল, না ঠাকুরপো?

আমতা আমতা করিয়া বলিলাম, না, তা খুব খারাপ নয় বোধ হয়।

* * * *

কলিকাতার বুকে সন্ধ্যা নামিয়াছে। ব্ল্যাকআউটের সন্ধ্যা। পাশের বড় লাল বাড়িটা হইতে লুচিভাজার গন্ধ উঠিতেছে।

ছোট ভাই নন্তু বিকালের ভাঙা বাজার হইতে ছয় পয়সায় একটা আধপচা কাঁঠাল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। উঠানের এক কোণে সেটাকে ভাঙিয়া সকলে মিলিয়া বিচিত্র আনন্দ-কলরবে ঘিরিয়া বসিয়াছে। লাল বাড়ির মেয়ে দুইটি দামী সাবানে গা ধুইয়া রঙিন শাড়ি পরিয়াছে। খোঁপায় চমৎকার বেলফুলের মালা জড়াইয়া জানালায় দাঁড়াইয়া রাস্তার লোক দেখিতেছে। রসা কাঁঠাল, লুচির পোড়া ঘি আর বেলফুলের মিশ্রিত গন্ধে বাতাস বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে।

ডাক্তারের বাড়ি হইতে ফিরিতেছিলাম। ডাক্তারবাবু বার বার তাগাদা দিয়াছেন। অসুখ ঔষধের সাত টাকা বিল ছয় মাস বাকি পড়িয়া আছে।

স্বল্পালোকিত ঘরে ঢুকিতেই মনে হইল, কে যেন ছায়ার মত সরিয়া যাইতেছে! আমার সম্মুখে পড়িতেই সে মৃদু করুণকণ্ঠে কহিল, নান্টুর তিন মাস ধ'রে পেট ধরছে না, তাই ভাবলাম এমন সরু পুরনো চাল—দুটো ভাত রেঁধে দিই ছেলেটাকে।

লজ্জারুণ অপ্রস্তুত মুখে বউদি একরকম ছুটিয়াই চলিয়া গেলেন।

* * * *

বউদির আঁচল হইতে কয়েকটা চাল মাটিতে ছড়াইয়া গিয়াছিল সে কটাকে সযত্নে খুঁটিয়া খুঁটিয়া তুলিয়া রাখিলাম।

"বহ্নি"

বাদী

সন্ধ্যার পর বারান্দার কোণটিতে চুপচাপ করিয়া একটা ঈজিচেয়ারে বসিয়া আছি। একটি ঘনপল্লবিত জামরুলগাছের নীচে এইখানটায় অন্ধকার বেশ জমাট হইয়া নামে। আজকাল এই সময় মনটা তেমন ভাল থাকে না। সমস্ত দিন কলিকাতার রাস্তাঘাটে মৃত-বুভুক্ষিতের অসহ্য দৃশ্য, কোথাও একটু গল্প করিতে বসিলেই ওই আলোচনা, খবরের কাগজের পাতা খুলিলেই ওই কথা—যতই দিনের অবসান হইতে থাকে মনটা ভারাক্রান্ত হইয়া আসে। সন্ধ্যা পর্যন্ত আর চলাফেরা করিবার উৎসাহ থাকে না, এইখানটিতে আসিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকি। এই যে অন্ধকার গাঢ় হইয়া অভিশপ্ত পৃথিবীটা লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, কাছে-পিঠে কোথাও একটা প্রদীপের শিখা পর্যন্ত নাই যে, সে-অন্ধকারকে খণ্ডিত করিয়া সেই পৃথিবীর খানিকটা ব্যক্ত করিয়া ধরে—এইটি বেশ লাগে। ইচ্ছা করিয়া কিছু ভাবি না, অথবা আরও যথাযথভাবে বলিতে গেলে—কিছু না ভাবিবারই ইচ্ছা লইয়া বসিয়া থাকি। কিন্তু তবু আসিয়াই পড়ে ভাবনা—নানান রকম, বিশৃঙ্খল। কি অদ্ভুতভাবে মরা! মৃত্যুকে কি অদ্ভুত ব্যঙ্গ! যাহারা মারে তাহারাই আশ্বাসের কথা বলে, বাঁচাইবার অভিনয় করে, দানছত্র খোলে!…হইবে না?—কত বড় জাতির উত্তরাধিকারী! ইহাদেরই পূর্বপুরুষরা তো বিশ্বমাতার মূর্তি কল্পনা করিয়াছিল—এক হাতে ছিন্নমুণ্ড, এক হাতে বরাভয়! আপনি চটিলেন? বলিতেছেন, ওটা তত্ত্বের দিক? হয়তো ঠিক; বুঝি না। আমি শুধু ভাবি, তত্ত্বটা কি ফল ফলাইল, অথবা—আপনারই কথা ধরিয়া বলি—তত্ত্বই যদি তো সেটি এই বিষবৃক্ষের গোড়াতেই কুঠার হানিতে পারিল না কেন?

অন্তরের সঙ্গে বাহিরের অন্ধকারও গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, একটি মাঝবয়সী লোক শ্রান্ত গতিতে আসিয়া বারান্দার নীচেটিতে বসিল। অন্ধকারে যতটা বুঝিলাম, মনে হইল, এতই শ্রান্ত যে পা ঠিক রাখিতে পারিতেছে না। ছেঁড়া ময়লা কাপড়, গায়ে আধ-ফরসা একটা ছেঁড়া জামা ঝলঝল করিতেছে; অন্ধকারে মুখের যতটুকু দেখা গেল, মনে হইল, ক্ষৌরকার্যের সঙ্গে অনেকদিনই কোন সম্পর্ক নাই। লোকটার কোলে

একটা বছর ছয়েকের রোগা মেয়ে, গায়ে একটা নূতন ছিটের পেনি—নিতান্ত হীন বলিয়া মনে হয় না, কোন গৃহস্থের বাড়িতে ভিক্ষা করিয়া পাইয়া থাকিবে।

লোকটা মেয়েটাকে কোলে লইয়াই উবু হইয়া বসিল এবং বসিয়াই নিজের হাঁটুর উপর কনুই রাখিয়া ডান হাতে কপালের অবিন্যস্ত চুলগুলা খামচাইয়া ধরিয়া মাথাটা গুঁজড়াইয়া দিল।

লুকাইব না, মনে মনে বেশ একটু বিরক্ত হইলাম। সমস্ত দিন তো এই দেখিয়াই কাটাইলাম; বাড়িতে প্রবেশ করিব, এই চর্চাই হইবে। এক মুঠা অন্ন মুখে তুলিতে যাইব, চারিদিকে ইহাদেরই হাহাকারে বিষ হইয়া উঠিবে। মাঝখানের এই একটু অবসরের চেষ্টা, ইহার উপরও যদি ইহারা এমনভাবে সশরীরে আসিয়া হানা দেয় তো লোকে বাঁচে কি করিয়া? একটু নিশ্বাস ফেলিবারও সময় দিবে তো?

ঠিক কঠোর না হইলেও একটু রুক্ষ কণ্ঠেই বলিলাম, বাপু, একটু ক্ষ্যামা দাও দিকিন, লোকে একটু নিরিবিলি দেখে বসবে তা…তুমি না হয় ওই সদরের দিকে যাও; যদি কিছু দিতে পারে…আর দেবেই বা কোথা থেকে বল মানুষে?…তবুও যাও, দেখ; আমায় একটু ছাড়।

শুধু গোঁজড়ানো মুখে উফ করিয়া একটা শব্দ হইল, নড়নচড়নের কোন লক্ষণ নাই। মেয়েটা আমার পানে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া ছিল, মনে হইল, তাহার ঠোঁট দুইটি যেন একটু থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। চোখ দুইটিও দুই বিন্দু জলে চকচক করিয়া উঠিল।

না, অব্যাহতি নাই; প্রশ্ন করিলাম, খাবি কিছু?

মেয়েটি কিছু বলিবার আগেই লোকটা মুখটা অল্প একটু আমার পানে ফিরাইয়া কতকটা রুদ্ধ কণ্ঠেই বলিল, না, ওর খাবার কষ্ট থাকতে দিই নি বাপু, ওর যা কষ্ট তা—

শেষ না করিয়াই মেয়েটাকে বুকে আরও চাপিয়া ধরিল, তাহার পর তাহার মাথার উপর নিজের মুখটা চাপিয়া একটু দুলিয়া দুলিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া ভাঙা ভাঙা ভাবে বলিয়া যাইতে লাগিল, তোকে আমি তো দোব না খাবার কষ্ট বেটী; দিই? বল্ বল্—বল্ না, সোনা আমার, মানিক আমার, খাবার কষ্টও দোব না, পরবার কষ্টও দোব না; তার জন্যে

আমায় ভিক্ষে করতে হয়, চুরি করতে হয়, গাঁটকাটা সাজতে হয় সেও স্বীকার ; না খেয়ে তোকে মরতে দোব না।…বল্ না বাবুকে, আমি নিজে সমস্ত দিন খেয়েছি কিছু ? খেয়েছি ? তোর মুখে তুলে দিই নি সবটুকু ? বল্ না বাবুকে ; আমি না দিলে তোকে দেবে কে ? আর আছে কে ?

দুই হাতে আরও নিবিড়ভাবে জড়াইয়া দুলিয়া দুলিয়া আদর করিতে লাগিল, মা আমার, সোনা আমার, হীরে আমার—

দৃশ্যটা ক্রমেই মর্মন্তুদ হইয়া উঠিতে লাগিল। দুর্ভিক্ষেরই একটা দিক,—সবাই গিয়াছে, বাপ বুকে করিয়া লইয়া দ্বারে দ্বারে বেড়াইয়া ফিরিতেছে, নিজেকে বঞ্চিত করিয়া মুখের অন্ন তুলিয়া দিতেছে ; একাধারে মা, বাপ, ভাই, বোন—সব।

প্রশ্ন করিলাম, তা হ'লে তুমি কিছু খাবে ? দেখি, দাঁড়াও, যদি কিছু পাই। আর বাপু, গেরস্থই বা করে কি বল ?

উঠিতেই লোকটা কতকটা সেই ভাবে মাথা গুঁজিয়াই ডান হাতটা বাড়াইয়া আমার একটা পা চাপিয়া ধরিল, প্রায় পড়পড় হইয়া গিয়াছিল, কোন রকমে সামলাইয়া লইয়া একটু সেই ভাবেই থাকিয়া বলিল, না বাবু, আপনি বসুন ; আগে সবটা একটু শুনুন। খাব আর কোন্ মুখে ? এ প্রাণ রেখেই বা আর কি হবে ? রাখতুম, ভেবেছেন বাবু? রেখেছি শুধু এইটের জন্যে। মা আমার, সোনা আমার, কি যে তোর নামটি বল্ তো ? শুনিয়ে দে তো বাবুকে একবার।

মেয়েটিকে একটি চুম্বন করিয়া তাহার মুখের খুব কাছে মুখ রাখিয়া চাহিয়া রহিল। মেয়েটি কেমন বিহ্বল এবং হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছে, হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত আর ভীতিজনক অবস্থায় পড়িলে শিশুরা যেমনটা হইয়া পড়ে : লোকটার মুখের পানে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে কহিল, লক্ষ্মী।

লোকটা আবার মেয়েটাকে চাপিয়া ধরিল, কয়েকটা উচ্ছ্বসিত চুম্বন দিয়া বলিল, লক্ষ্মী ! লক্ষ্মী ! লক্ষ্মী, না হাতী…সে তো ওদের দেওয়া নাম, আমি কি নাম দিয়েছি তাই বল্ না।

মেয়েটি কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, আবাগী।

লোকটা আবার মুখটা গোঁজড়াইয়া সামনের কেশগুচ্ছটা খামচাইয়া ধরিল, তাহারই মধ্যে অল্প একটু মুখ ঘুরাইয়া আমার পানে চাহিয়া গাঢ়

স্বরে বলিল, রাখব না 'আবাগী' নাম বাবু? কম দুঃখে রেখেছি? যার বাপ...ওফ!

আবার মুখটা গুঁজিয়া নীরব হইয়া রহিল।

মেয়েটি কেন এত বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে, এতক্ষণে যেন কতকটা আন্দাজ হইল। প্রশ্ন করিলাম, তোমার মেয়ে নয়?

লোকটা একেবারেই মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল, একটা কিসের আঘাতে, কি যেন কে কাড়িয়া লইতেছে—এইভাবে যেন একটা হঠাৎ ভয়ে নাড়া খাইয়া উঠিল; মেয়েটাকে আরও নিবিড় বন্ধনে বুকে চাপিয়া আরও গাঢ় স্বরে বলিয়া উঠিল, অমন কথা বলবেন না বাবু, তা হ'লে আমি বাঁচব না। তুই আমার মেয়ে নয়? তুই আমায় ছেড়ে চ'লে যাবি? 'আবাগী' বলি ব'লে তুই রাগ করলি? হবি না আর আমার মেয়ে? বল্ না বাবুকে, সোনা আমার, মানিক আমার, বল্ না, বাবুকে, তুই কার মেয়ে?...

একটু কেমন কেমন বোধ হইতেছে। শোকে অভাবে লোকটার কি মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে? এমন মর্ম্মন্তুদ ঘটনাও তো হইতেছে আজকাল।

ক্ষুধার চোটে বসিয়াও শরীর ঠিক রাখিতে পারিতেছে না, যেন টলিয়া পড়িবে, তবু আহারে প্রবৃত্তি নাই, কথার তেমন বাঁধুনি নাই,—সব হারাইয়া সব চেতনা এই শেষ সম্বলটুকুর উপর জড়ো হইয়া উঠিয়াছে ভয়ে আতঙ্কে মস্তিষ্কের বিকৃতিতে...

বল্ না, বল্ বাবুকে, নয় তুই আমার মেয়ে? বল্ না বাবুকে, কার মেয়ে তুই?

সেই রকম বিহ্বল দৃষ্টিতেই চাহিয়া মেয়েটা যেন ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল, তোমার।

ওই শুনুন বাবু, আমারই আবাগী, আমারই সোনা। বলব না আবাগী বাবু? এই হাহাকার, চারিদিকে লোক কিউয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প'ড়ে ম'রে যাচ্ছে, বাড়িকে বাড়ি ম'রে সাফ হয়ে গেল, আর তুই বাপ হয়ে কিনা মদ গিলে এই দুধের বাছাটাকে—

আবার রহস্যাবৃত হইয়া পড়িতেছে; বাপ নয় তাহা হইলে।

তোমার ভাইঝি নাকি?—বলিয়া প্রশ্ন করিতে যাইতেছিলাম, লোকটা একটু বিরতি দিয়াই যেন হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল, গাল দিই সাধে বাবু? আরও দোব। একশবার দোব, ম'রে উরকুর উঠে যাচ্ছে চারিদিকে, আর তুই শালা কিনা মদ গিলে এই দুধের বাছাটাকে ফুট-পাথের ওপর ফেলে রেখে···হ্যাঁ বাবু, আপনি বোধ হয় পেত্যয় যাবেন না—ফুটপাথের ওপরে, একপাল ভিখিরীদের কাচ্চাবাচ্চাদের মধ্যে ব'সে হাপুস নয়নে কাঁদছে, বাবা গো, ওগো বাবা গো! বুক ফেটে যায় বাবু শুনলে···মদের দোকানের সামনে বাবু, মদের দোকানের সামনে! হাজার ন্যাকড়া পরা হোক, না খেতে পেয়ে হাজার মর মর হয়ে পড়ুক, তবু ভিখিরীদের কাচ্চাবাচ্চাগুনো ওর চেয়ে ঢের সুখী—তাদের মা আছে, বাপ আছে···যার নেই তার নেই, আলাদা কথা; কিন্তু এ আবাগীর যে থেকেও নেই বাবু। মদের দোকানের সামনে ব'সে হাপুস নয়নে কাঁদছে, কে হাতে একটা প্যাজের বড়া দিয়ে গেছে, হাতেই আছে, ওই এক বুলি—বাবা গো, ওগো বাবা গো! বললাম, কোথায় তোর বাবা? মুখের পানে সে যে কি ফ্যালফ্যাল চাওয়া—পাষাণও গ'লে যায় দেখলে। ওর তো মুখে রা নেই, একটা ভিখিরীর মেয়ে এঁটো খুঁটে খাচ্ছিল, বললে, বলছে, ওর বাপ ওই মদের দোকানটায় সেঁদোচে গো। বলনু, খা এসে, তা ··কি যে হ'ল মনে বাবু!···ইচ্ছে করল, সে আঁটকুড়ীর সন্তানের কাঁচা মাথাটা যদি—

লোকটা একদমে অনেকগুলা কথা বলিয়া যেন ক্লান্ত হইয়া একটু চুপ করিল, কপালের উপরের চুলগুলা খামচাইয়া অল্প অল্প ধুঁকিতে লাগিল।

বলিলাম, ওর বাপ তোমার যেন কেউ হয় ব'লে—

লোকটা ঝাঁকড়া চুলগুলা নাড়িয়া একটু উগ্রভাবেই আমার পানে ঘোলাটে চোখে চাহিয়া বলিল, ওর বাপ নেই বাবু, দয়া ক'রে তার নামটা আর করবেন না আমার সামনে। ওকে তো তাই বলনু, নেই তোর বাপ, মরেছে, নইলে তোকে এক পহর থেকে এই ভিখিরীর দলে ফেলে রাখে? আর থাকলেই কি উবগার হবে তোর সে বাপ দিয়ে? সে শালা মরুক, মরুক, মরুক সে শালা—

মেয়েটা হঠাৎ ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। লোকটার

ভাব সঙ্গে সঙ্গে বদলাইয়া গেল, তাড়াতাড়ি মাথাটা বুকে চাপিয়া বসিয়া বসিয়া দোলা দিতে দিতে অসীম দরদভরে বলিতে লাগিল, না না, আছে তোর বাপ—সোনা আমার, মানিক আমার, বাবা আছে রে—এই তো আমি রয়েছি, নয় আমি তোর বাপ? বলবি নি বাপ আমায়?

রহস্যটা বাড়িয়াই যাইতেছে। মেয়েটি ভাইঝি সম্বন্ধের নয়, কেন না, তাহা হইলে উহার বাপকে 'শালা' বলিয়া গাল পাড়িত না; নাতনী-জাতীয়ও নয়, তাহা হইলে আর বাপ হইতে যাইবে কি করিয়া। ভাবিবারও অবসর দিতেছে না। ইহা ঠিক যে, মেয়েটার বাপ লোকটার পরিচিত, খুবই সম্ভব প্রতিবেশী—কোন মাতাল প্রতিবেশী। দূরসম্পর্কের আত্মীয়ও হইতে পারে, যে স্তরের লোক বলিয়া মনে হইতেছে, তাহাতে ভাই সম্পর্কের লোককে রাগ বা আক্রোশের মাথায় শালা বলা এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কিন্তু হউক নিম্নস্তরের, লোকটার প্রাণ আছে—নিজের পেটে অন্ন নাই, নিজের মুখের গ্রাস মেয়েটির মুখে তুলিয়া দিয়াছে। মেয়েটার গায়ে যে নূতন জামাটা, রাস্তার ধার হইতে কেনা হইলেও টাকা দেড়েকের কম নয় এই বাজারে। নিজের গায়ে ন্যাকড়া, তবুও—

চিন্তার মধ্যেই আমি হঠাৎ যেন ধাক্কা খাইয়া সচকিত হইয়া উঠিয়া বসিলাম, মেয়েটা সত্যই বদ্ধ এক পাগলের হাতে পড়ে নাই তো? গোড়ায় একটু লাগিয়াছিল ধোঁকা, আবার সেটা কাটিয়া গিয়াছিল, এবার কিন্তু ধারণাটা বদ্ধমূল হইয়া গিয়া আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা যেন পরিষ্কার হইয়া আসিতে লাগিল। কথার বেশ বাঁধুনি নাই, বেশ বলিয়া যাইতেছে, হঠাৎ মাঝখানে এক-একটা কথা অসংলগ্ন বেখাপ্পা; বলার ভঙ্গীও সেই রকম, কতকটা স্পষ্ট, কতকটা অর্দ্ধস্পষ্ট, কতকটা একেবারেই যেন জিবে জড়াইয়া যাইতেছে। হয়তো অতিরিক্ত দুর্ব্বলতা; কিন্তু সেখানেও যে পাগলামিরই লক্ষণ—সমস্ত দিন খায় নাই, অথচ আহার্য দিতে গেলে পা জড়াইয়া বারণ করে। যতই ভাবিতে লাগিলাম, আন্দাজটা ততই যেন পুষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। পাগলই, এখন যে ভাবেই হউক, আর যে কারণেই হউক, এই মেয়েটার উপর ঝোঁক গিয়া পড়িয়াছে, ওকে বাঁচাইতে হইবে—শুধু বাঁচানো নয়,

ভাল পরাইয়া, ভাল খাওয়াইয়া বাঁচানো। যে করিয়াই হউক একটা জামা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে, সমস্ত দিনে আহার্য যেটুকু যোগাড় হইয়াছিল উহারই মুখে তুলিয়া দিয়াছে। এ ঝোঁকের কারণ অনেক রকমই হইতে পারে, এ মহামারীর বাজারে তো অপ্রতুল নাই, হয়তো প্রাণের চেয়ে প্রিয়তম নিজের সন্তানটিকেই হারাইয়াছে,—বস্ত্র নাই, অন্ন নাই, অসহায়-ভাবে চাহিয়া দেখিয়াছে, জঠরের অগ্নি তাহারই চোখে নীচে তাহাকে তিল তিল করিয়া দগ্ধ করিয়া ফেলিল। পাগল করিয়া দেওয়ার দৃশ্য নয়? যদি নিজের নাই হারাইয়া থাকে তো রাস্তার দুই ধারে প্রতিদিনের প্রতি-মুহূর্তের দৃশ্যও কি যথেষ্ট নয়? মনে পড়িয়া গেল, আজ হাওড়ার পুলের সামনে একটি দৃশ্য—একটি ভদ্রলোক, প্রকৃতই শিক্ষিত ভদ্রলোক ট্রামের প্যাভিলিয়নের নীচে দাঁড়াইয়া ভগবান হইতে আরম্ভ করিয়া বড়লাট, মন্ত্রী, পেয়াদা,হিটলার, রুজভেণ্ট, টোজো—একধার হইতে সকলকে গাল পাড়িয়া যাইতেছে—ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী, যখন যে ভাষায় জোর পাইতেছে। সোজা গালাগাল নয়, গালাগালের লেকচার, রীতিমত বাগ্মিতা। লোক জড়ো হইয়া গিয়াছে, গলার কপালের শির ফুলাইয়া গালাগাল দিয়া যাইতেছে। দুইজন পুলিস লইয়া একটা সার্জেণ্ট ভিড় ঠেলিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। ভদ্রলোকের চেহারাটা একেবারে বদলাইয়া গেল—রাগের ভাবটা আছে, তবে তাহার সঙ্গে গুরুগাম্ভীর্য। সার্জেণ্ট কিছু বলিবার পূর্বেই তর্জনী নির্দেশ করিয়া বলিল, You are late, mind you! (দেরি ক'রে ফেলেছ, মনে থাকে যেন!) সঙ্গে সঙ্গেই বিচারকের ব্যাণ্ড অর্থাৎ গলাবন্ধের মত করিয়া রুমালটা গলায় ঝুলাইয়া বিচারকেরই দৃপ্ত ভঙ্গীতে একজন মাড়োয়ারী দর্শকের পানে দেখাইয়া বলিল, Swear him—the profiteer first; I hold my court here (আমি এখানে আদালত করছি, আগে এই মুনাফা-রাক্ষসকে শপথ করাও।)

ততক্ষণে পুলিস দুইটার সম্বিৎ হইয়াছে, কিছু না বুঝিলেও বেটন তুলিয়া অগ্রসর হইল। সার্জেণ্ট বলিল, মারো মট্, পাগলা হ্যায়, ঘর চালান দেও।

শুধু তো দেহের বিনাশ নয়, উৎকট অমানুষিক দৃশ্যে কত মস্তিষ্কও

যে এ রকম বিকৃত হইয়া যাইতেছে, কে তাহার হিসাব রাখে! এ শিক্ষিত নয়, বিচারের কথা বোঝে না, আত্মলোপের বিকারে মাতিয়া উঠিয়াছে।

বোঝা গেল।

কিন্তু একটা কথা, পাগলের হাতে এ রকম একটা কচি মেয়েকে তো ছাড়িয়া দেওয়া নিরাপদ নয়; এখন ঝোঁক ধরিয়াছে বাঁচাইবার, যে-কোন মুহূর্তেই কিন্তু সেটা যে আছাড় মারিবার ঝোঁকে পরিণত হইয়া যাইতে পারে। রহস্যের চিন্তা ছিল, রহস্যটা কাটিয়া গিয়া একটা দুশ্চিন্তা আসিয়া জুটিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, শেষে ঠিক করিলাম, কোন প্রকারে মেয়েটিকে উদ্ধার করা যাক আপাতত, তাহার পর ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা ব্যবস্থা করা যাইবে, থানায় দাখিল করিয়াই দিই, বা অনাথ-আশ্রমেই ভর্তি করিয়া দিই, কিছু একটা ব্যবস্থা হইবেই।

বলিলাম, *তোমার মনটা যে কত দরাজ, কর্তা, যতই ভাবছি যেন আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। আমাদের ভদ্দরলোকদের মধ্যেও এতটা দয়া-মমতা চোখে পড়ে না আজকাল, কে কাকে দেখছে বল? বেশ বেশ, এই রকম আমরা যদি পরস্পরকে না দেখি তো বাঙালী জাতটা টেঁকবে কি ক'রে এ দুর্দিনে? বাইরের লোকদের দরদ তো দেখতেই পাচ্ছি। বড় আনন্দ হ'ল; নিজে না খেয়ে, না প'রে—*

গোঁজড়ানো মুখ দিয়া 'উফ' করিয়া একটা আওয়াজ হইল, মুঠাটা চুলের ঝুঁটিটাকে আরও একটু জোরে যেন খামচাইয়া ধরিল। মনে হইল, ওষুধ যেন লাগিতেছে।

বলিলাম, ভগবান তোমার ভাল করবেন বাপু; নিশ্চয় করবেন, তাঁর কাছে তো আর ইতর-ভদ্র নেই। কিন্তু আমি একটা কথা বলছি, মেয়েটিকে তুমি এ রকম ভাবে কাঁহাতক নিয়ে ঘুরবে বেড়াবে ঘাড়ে ক'রে? আমি বলি কি, আমার এখানে না হয় রেখে দাও, ছেলেমানুষ এক মুঠো খাবে, থাকবে, তোমার যখন খুশি এক-একবার ক'রে দেখে যাবে। একটা কচি মেয়ে, চোখে পড়ল, আমাদেরও তো একটা-দেখা উচিত।

'উফ' করিয়া আবার একটা শব্দ, বেশি টানা, সঙ্গে সঙ্গে মাথার একটা ঝাঁকানি, যেন নিজের মাথাটাকেই নিজে একটা নাড়া দিল। আশা হইল, প্রস্তাবটা উহার পক্ষে কষ্টকর হইলেও বোধ হয় রাজি হইবে। হঠাৎ খেয়াল হইল, এই সময় যদি পেটে কিছু পড়ে তো বোধ হয় মাথাটা একটু ঠাণ্ডাও হইতে পারে, উহারই মধ্যে একটু ভাবিয়া দেখিবার শক্তি আসিতে পারে। বলিলাম, আর এক কাজ কর, তুমিও এক মুঠো কিছু খেয়ে নাও, বামুনের বাড়িতে এসে পড়েছ, খালি পেটে ফিরে যাবে? নিজের পেট কেটেও তো লোকেদের দিতে হচ্ছে যা হয় কিছু, তুমি একটা ভাল লোক, অভুক্ত গেলে—

ছেলেটাকে ডাকিয়া বলিলাম, ওরে, এক মুঠো ভাত, একটু ডাল, আর যা হয়েছে একটু নিয়ে আয় তো একটা কিছুতে ক'রে শীগগির; আর এক ঘটি জল।

লোকটা হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া জামরুল গাছের নীচে দুইটা নেবুর ঝাড়ে অন্ধকারটা যেখানে আরও গাঢ় হইয়া গিয়াছে সেই দিকটায় দুই-তিন পা আগাইয়া গেল—মেয়েটাকে ছাড়িয়াই। সঙ্গে সঙ্গে আবার তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া মেয়েটাকে বাঁ কোলে তুলিয়া লইল, যেন হঠাৎ বেহাত করিয়া ফেলিতেছিল; তাহার পর গটগট করিয়া ঝোঁপের দিকে চলিয়া গেল—মনে হইল, পকেটে একটা ভারী গোছের কিছু ছিল, যেন বেশ ভাল করিয়া মুঠাইয়া ধরিয়াছে। ঘরের একটু কোণ পড়ে, তাহার ওদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নিরতিশয় বিস্ময়কর ব্যাপার। ইচ্ছা হইল, যাই পিছুনে পিছনে; কিন্তু গাটা ছমছম করিয়া উঠিল। পকেটে কি? ছুঁড়িয়া মারিবে না তো, আরও সাংঘাতিক কিছুও হইতে পারে—পাগলের কাণ্ড। বোধ হয় মিনিট দুই-তিন আমি একটু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়াই বসিয়া রহিলাম। লোকটা যায় নাই, খড়খড় করিয়া একবার শব্দ হইল, তাহার পরই মেয়েটা 'ও বাবা গো' বলিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ছেলেটা আমার একটা লণ্ঠন হাতে ভাত লইয়া আসিতেই ছিল, বলিলাম, 'শীগগির এস, পা চালিয়ে।

ছেলেটার হাত থেকে লণ্ঠন লইয়া অগ্রসর হইব, দেখি, ঘরের

কোণ ঘুরিয়া লোকটা চলিয়া আসিতেছে, কোলে মেয়েটা, সেই রকম বিহ্বল স্তম্ভিত দৃষ্টি, বোধ হয় আরও বেশি।

পা দুইটা এবার আরও টলিতেছে, পকেটে ইট-পাটকেলও নয়, রিভলভারও নয়, লণ্ঠনের আলোয় নিজের উপরার্ধটা নিঃসংশয়ভাবে প্রকাশ করিয়া একটি বোতল। মদের গন্ধেও হাওয়াটা হঠাৎ বোঝাই হইয়া গেছে।

বাঁ কোলে মেয়েটাকে ভাল করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া ঝড়ে-টলানো তালগাছের মত খানিকটা টলিয়া লইয়া একটু স্থির হইয়া দাঁড়াইল, তাহার পর রক্তাভ চক্ষু দুইটা আমার মুখে ন্যস্ত করিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিল, ভদ্দল্লোক! আর আমরা হলুম ইতোর! কেয়া মেরা ভদ্দল্লোক্ রে! মদ টেনে নিজের পেটের মেয়েকে পথে বশ'স্তে রেখেসি—ভদ্দল্লোকের কাশে বিচার চাইতে এলুম—দু ঘা দে উত্তমমধ্যম ক'রে, তা না, কুটুম-আদরে এককাঁশি ভাতের ব্যবস্থা—বড়া আমার ভদ্দল্লোক—ছোঃ ছোঃ! চল্ বেটী—

একটা ঝাঁকানি দিয়া ঘুরিয়া টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল।

ইহার পরেও কিছু বলিবার আছে, তবে সেটা শুনিতে কি রকম হইবে জানি না।

দুঃখিত হই নাই মোটেই, বরং সেদিন যতক্ষণ জাগিয়া ছিলাম, মনটা খুবই প্রফুল্ল ছিল। একটু আশ্চর্য, কিন্তু কথাটা সত্য। আজ কয় মাস ধরিয়া 'ফেন দাও মা'-র একঘেয়ে শব্দের মধ্যে একটা অভিনবত্ব অন্তত একটা লোকের ভিতর চোখে পড়িল, যাহার ভিক্ষা চাওয়ার প্রয়োজন হয় নাই, নেশা করিবার মত মনের অবস্থা আছে, নেশা করিবার মত ফালতু পয়সাও আছে, মৃতের গাদার মধ্য দিয়া যে নিজের খেয়াল লইয়া নিজের পথ ধরিয়া যাইতে পারিতেছে। আপনাদের খারাপ লাগিতেছে নিশ্চয়, জানি লাগিবেই। একটা মাতাল যে আমার মনে সে রাত্রে কতবড় একটা স্বস্তি আনিয়া দিয়াছিল, আমার মনকে অষ্টপ্রহরব্যাপী একটা উৎকটা চিন্তা হইতে কি অদ্ভুতভাবেই না কয়েক ঘণ্টার জন্য মুক্তি দিয়াছিল, সে কথা আমি কি করিয়া বুঝাইব আপনাদের?

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বাংলা প্রবাদ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পাঁচ

অনেকগুলি সংস্কৃত বাক্যাংশ এত প্রচলিত যে সেগুলি প্রায় বাংলা প্রবাদ হইয়া গিয়াছে; যেমন—'শুভস্য শীঘ্রম্', 'মধুরেণ সমাপয়েৎ', 'গতস্য শোচনা নাস্তি', 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ', 'নারাণাং মাতুলক্রমঃ', 'স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ংকরী', 'অন্নচিন্তা চমৎকারা' ইত্যাদি। কিন্তু কতকগুলি বাক্য আবার সংস্কৃত হইতে বাংলায় আসিবার সময় কিঞ্চিৎ বেশ-পরিবর্তন করিয়া লইয়াছে; যেমন 'কা কস্য পরিদেবনা' বাক্যটি 'কা কস্য পরিবেদনা' হইয়া অধিকতর সুবোধ্য ও সচল হইয়াছে। আরও কৌতুককর পরিবর্তনের উদাহরণ হইতেছে—'একেন পাপ, শতেন পাপ', 'আপ্তচ্ছিদ্র ন জানাতি পরচ্ছিদ্র পদে পদে', 'মুখেন মারিতং জগৎ', 'ন চাষা সজ্জনায়তে', 'গয়ংগচ্ছরূপে চলা', 'মূর্খস্য নাস্ত্যোষধম্' স্থলে 'মূর্খস্য লাঠ্যৌষধম্', 'কতরং বা ভাবষ্যাতি' স্থলে 'কত রম্ভা ভাবিষ্যাতি, আরো কিবা আছে গতি' প্রভৃতি আধা-সংস্কৃতের টুকরা, অথবা সংস্কৃত ও বাংলার অপূর্ব ও সরস খিচুড়ি। আবার কতকগুলি বাংলা প্রবাদ স্পষ্টই সংস্কৃতের অনুবাদ, যেমন—

মাথা নেই তার মাথাব্যথা,—শিরো নাস্তি শিরোব্যথা॥

দুর্ভিক্ষ অল্পকাল, স্মরণ থাকে চিরকাল,—

দুর্ভিক্ষমল্পং স্মরণং চিরায়॥

আশা আশা পরম সুখ, নিরাশাই পরম দুখ,—

আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরম সুখম্॥

বৃহন্নলা সারথি যার, পরাজয় কোথা তার,—

বৃহন্নলা রথী যস্য কুতস্তস্য পরাভবঃ॥

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা,—কণ্টকেনৈব কণ্টকম্॥

কুপুত্র যদিও হয়, কুমাতা কখনো নয়,—

কুপুত্রোঃ কুত্রচিৎ সন্তি ন কদাপি কুমাতরঃ॥

এক চাঁদে জগৎ আলো,—একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি॥

এক চাকায় রথ চলে না,—যথা হ্যেকেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ॥

ঘি দিয়ে ভাজ নিমের পাত, নিম ছাড়ে না আপন জাত,—

পয়সা সিঞ্চিতো নিত্যং ন নিম্বো মধুরায়তে॥

এই ধরণের কতকগুলি প্রবাদ, ঠিক অনুবাদ না হইলেও, প্রাচীন ভাবের প্রতিধ্বনি করে। যেমন—

জামাইয়ের জন্যে মারে হাঁস, গুষ্টি শুদ্ধ খায় মাস॥

এই প্রবাদ-বাক্যে 'জামাত্রর্থং শ্রপিতস্য সুপাদেরতিথ্যুপকারকত্বং' এই লৌকিক ন্যায়ের ২৪ প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। কিন্তু মনে হয়, অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে পণ্ডিতেরাও যেমন কতকগুলি সংস্কৃত বাক্যকে বাংলা করিয়াছেন, তেমনই কতকগুলি বাংলা বাক্যকেও চল্‌তি সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়াছেন। যেমন—

চালে ফলে কুষ্মাণ্ড, হরির মায়ের গলগণ্ড॥

এই প্রবাদ-বাক্যকে বেবাক্ পণ্ডিতী সংস্কৃতে করা হইয়াছে—

চালে ফলতি কুষ্মাণ্ডং হরিমাতুর্গলে ব্যথা॥

এইরূপ হিন্দী, মৈথিলী প্রভৃতি ভাষা হইতেও অনেক প্রবাদ-বাক্য হয়ত বাংলায় গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু তাহা কতদূর বা কিভাবে হইয়াছে, তাহার আলোচনা হয় নাই। তবুও মনে হয়, এমন অনেক বাংলা প্রবচন আছে, যাহা ভাষান্তর হইতে আপন বেশে বা ছদ্মবেশে আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে বাংলা প্রবাদের আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা যাইতে পারে। পরিচিত পৌরাণিক ঘটনা, বস্তু বা ব্যক্তি উপলক্ষ্য করিয়া বাংলায় বহুসংখ্যক প্রবাদ-বাক্য বা বাক্যাংশ প্রচলিত আছে, যাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রবাদের মধ্যে আমরা পাই—রামায়ণ-বিষয়ক—

একা রামে রক্ষা নেই, সুগ্রীব তার দোসর॥
আজ মরে লক্ষণ, ওষুধ দেয় কখন॥
রাম মারলেও মারবে, রাবণ মারলেও মারবে॥
রাম না হতে রামায়ণ॥
এক নিঃশ্বাসে সাতকাণ্ড রামায়ণ॥
সাতকাণ্ড রামায়ণ প'ড়ে সীতা কার ভার্য্যা॥
কালনেমির লঙ্কাভাগ॥
কোথায় রাম রাজা হবে, কোথায় রাম বনবাসে যাবে॥

---

২৪ সংস্কৃত লৌকিক ন্যায় ঠিক প্রবাদ নয়। যেমন, আধুনিক Hobbesian রাজনীতি war of every man against every man in a state of nature প্রতিফলিত হইয়াছে 'মাৎস্য ন্যায়ে'—এক মাছ অন্য মাছকে খাইয়া ফেলে,—কিন্তু ইহা প্রবাদ নয়।

বড় বড় বানরের বড় বড় পেট।
লঙ্কা ডিঙোতে সব মাথা করে হেঁট॥
সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই॥
যে যায় লঙ্কায়, সে হয় রাবণ॥
রাবণের দোষে সমুদ্র-বন্ধন॥
রাম লক্ষ্মণ দুটি ভাই, রথে চ'ড়ে স্বর্গে যাই॥
রামের বাণে মরি সেও ভাল, বাঁদরের দাঁতখিঁচুনি সয় না॥
রামের ভাই লক্ষ্মণ আর কি॥
ঘরের শত্রু বিভীষণ॥
লঙ্কায় সোণা সস্তা॥
লঙ্কায় গেলেন দরিদ্রা, নিয়ে এলেন হরিদ্রা॥
আমার ভাই রাবণ রাজা, আমি শূর্পনখা।
ধরামাঝে এমন জোড়া পারিস যদি দেখা॥
লঙ্কা বহুদূর॥
লঙ্কায় রাবণ ম'লো, বেহুলা কেঁদে রাঁড় হলো॥
লঙ্কায় বাণিজ্য ক্ষেতের কোনা॥
কাঠবিড়ালের সাগর বাঁধা॥
রাবণের পুরী ছারখার॥
ঘরসন্ধানে রাবণ নষ্ট॥
যাবৎ সীতা তাবৎ দুঃখ, মরবে সীতা ঘুচবে দুঃখ॥
রাজ্য পেল রামচন্দর, কলা খেল যত বান্দর॥
এই যদি তোর ছিল মনে তবে সাগর বাঁধলি কেনে॥

তেমনই মহাভারত ও পুরাণ অবলম্বনে—

যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে॥
মহাভারত অশুদ্ধ হবে না॥
সখা যার জনার্দ্দন, তার সঙ্গে সাজে রণ?
বৃহন্নলা সারথি যার, পরাজয় কোথা তার॥
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ গেল, শল্য হ'ল রথী।
চন্দ্র-সূর্য্য অস্ত গেল জোনাকি ধরে বাতি॥
এক পালি ধানে মহাভারত॥
তোমারে মারিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে॥
কানু ছাড়া গীত নেই॥
না বিইয়ে কানাইয়ের মা॥

কত দুঃখের নীলমণি, জানে তা দিদি রোহিণী॥
রাজার নন্দিনী প্যারী, যা করে তা শোভা পায়॥
নিজের ধন পরকে দিয়ে, দৈবকী বেড়ায় মাথায় হাত দিয়ে॥
যশোদা কি ভাগ্যবতী, পরের পুত্রে পুত্রবতী॥
নাম কিনলেন যশোদারাণী, কুঁতিয়ে ম'ল দৈবকী॥
সবে মিলে খাবে ননী, ধরা পড়বে নীলমণি॥
সবাই সতী কবলায় ধরা পড়েছে রাধা॥
দেবতার বেলা লীলাখেলা, পাপ লিখেছে মানুষের বেলা॥
শিবের ষাঁড়কে কি বাঘে ধরে না॥
শিব গড়তে বাঁদর॥
সাপ মারলে শিবকে লাগে॥
শনির দৃষ্টি নাহি নড়ে, গণেশের মাথা খসে পড়ে॥
শবের দুঃখে শিব কাঁদে॥
থাকে যদি চূড়ো বাঁশী, রাধা হেন মিলবে দাসী॥
কেষ্ট বিষ্টুর মধ্যে একজন॥
যেমন দেবা, তেমনি দেবী॥
লক্ষ্মী হলেন লক্ষ্মীছাড়া, শঙ্কর ভিখারী॥
কৃষ্ণ কেমন? যার মনে যেমন॥
লক্ষ্মীর ঘরে কালপেঁচা॥
যেমন দেবী, তেমনি বাহন॥
শালগ্রামের ওঠা-বসা॥
তুলসীগাছে কুকুর মুতে, তবু পুজো হয় জগতে॥
রাখালসভাতে যা, রাজসভাতেও তা॥
লক্ষ্মীর মা ভিক্ষা পায় না॥
রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী॥

প্রবাদ-বাক্যাংশ হিসাবে কয়েকটি উদাহরণ—

অগস্ত্যযাত্রা। হরিহর-আত্মা। কংসমামার আদর। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড। লঙ্কাকাণ্ড। কুম্ভকর্ণের নিদ্রা। কুব্জার মন্ত্রণা। খাণ্ডবদাহন করা। গরবিণী রাই। সবেধন নীলমণি। গোকুলের ষাঁড়। চতুর্ভুজ হওয়া। জড়ভরত। জরাসন্ধ বধ। ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ। দক্ষযজ্ঞ। ত্রিভঙ্গ মুরারি। দর্পহারী মধুসূদন। লক্ষ্মীর পেঁচা। গোবর-গণেশ। ময়ূর-ছাড়া কার্তিক। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। দাতা কর্ণ। শকুনি মামা। দেবর লক্ষ্মণ। দুর্যোধনের মত জলস্তম্ভ ক'রে থাকা।

লক্ষ্মণের ফল ধরা। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। বক-ধার্মিক। ধনুক-ভাঙা পণ। পিতামহ ভীষ্ম। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। পূতনা রাক্ষসী। শিব-রাত্রের সলতে। বিদুরের ক্ষুদ। বিন্দে দূতী। বিশ্বকর্মার ছুঁচ গড়া। বিশকর্মার বেটা বেয়াল্লিশকর্মা। ব্যাস-কাশী। ভুশণ্ডির কাক। নারদের ঢেঁকি। শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ। মুষল পর্ব্ব। যজ্ঞের ঘোড়া। রামের হনুমান। উদ্যোগ পর্ব্ব। রাবণের চিতা। সদাশিব। রাবণের বোন শূর্পনখা। ব্রজের দুলাল। নাড়ুগোপাল। ঠুঁটো জগন্নাথ। রামরাজ্য। হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গ। ইন্দ্রের ভুবন। কুরুক্ষেত্র। পরশুরামের কুঠার। কীচক বধ। গন্ধমাদন আনা। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ। কানায়ে ভাগনে। জটায়ু পক্ষীর রথগেলা। মতলব দ্বৈপায়ন হ্রদে ডুবিয়ে রাখা। গজকচ্ছপের যুদ্ধ।

অনেকগুলি প্রবাদে জাতীয় ইতিহাসের টুকরা রহিয়া গিয়াছে, যাহা অন্যত্র পাওয়া যায় না। যেমন—

হুসেন শাহের আমল॥
ধান ভানতে মহীপালের গীত॥
কানু ছাড়া গীত নেই॥
পিঁড়েয় ব'সে পেঁড়োর (=পাণ্ডুয়ার) খবর॥
মগের মুল্লুক॥
হিল্লী দিয়ে দিল্লী যাওয়া॥
মোষের শিং ভেড়ার শিং, তারে বলি কি শিং।
সিংএর মধ্যে সিং ছিল এক গঙ্গাগোবিন্দ সিং॥
দিনে ডাকাতি॥
রাজা নবকৃষ্ণ আর কি॥
ঘোড়ার ক্ষুরে উড়ে গেল পলাশী পরগণা॥
নবাব খাঞ্জা খাঁ॥

তেমনই স্থানীয় ঘটনা, প্রথা বা ব্যক্তিবিশেষের কথা অনেক প্রবাদে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—

হরি ঘোষের গোয়াল॥
গোপাল সিংহের বেগার॥
লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন॥
রমানাথের এঁড়ে, বইবে না বইতে দেবেও না॥
দেভুবুড়ির ভাড়ানী, চাটগাঁয়ে বরাত॥
একে রামানন্দ, তার ধুনার গন্ধ॥

কালে বাণ্ডও পণ্ডিত হ'ল ॥
ভূঁইশূন্যে রাজা ক্ষেত্রমোহন ॥
কুকুরের বিয়ের লাখ টাকা খরচ ॥
উঠল বাই ত কটক যাই ॥
নুনের ভাঁড়, তেলের ভাঁড়, তাকে কি বলি ভাঁড়।
ভাঁড়ের মধ্যে ছিল এক নদের গোপাল ভাঁড় ॥
উদুখলে ক্ষুদ নেই, চাটগাঁয়ে বরাত ॥
কালীঘাটের কাঙালী ॥
কালীঘাটের চণ্ডীপাঠ ॥
কুড়ের বাথান বৈদ্যনাথ ॥
জগন্নাথের আটকে বাঁধা ॥
কালো হাঁড়ি, কেয়াপাত, তবে যাবি জগন্নাথ ॥
হাতে কড়ি, পায়ে বল, তবে চলি নীলাচল ॥
গৌরচন্দ্রিকা ॥

সামাজিক ইতিহাস, স্থানীয় গাল-গল্প বা রসিকতা—যাহাকে ফরাসী ভাষায় বলে blasons populaires,—অথবা প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা বা বিদ্রূপ অনেক প্রবাদে স্পষ্ট পাওয়া যায়—

সাজা, বাজা, বেশ, বাংলা দেশে বেশ ॥
হুনুরে চীন, হুজ্জুতে বাঙ্গাল ॥
বাঙ্গাল মনুষ্য নয়, উড়ে এক জন্তু ॥
উত্তরের মেয়ে, পূবের নেয়ে ॥
পশ্চিমে সাধু, পূবে বাবু, মাঝে মাঝে আছে কেবল কতকগুলি হাবু ॥
হিন্দুর বাড়ী, মোছলমানের হাঁড়ি ॥
মুখুটি কুটিল বর, বন্দ্যঘটি সাদা।
এদের মাঝে বসে আছেন চট্ট হারামজাদা ॥
ঘোষ, বোস, মিত্র, এরা কুলের অধিকারী।
অভিমানে বালীর দত্ত যান গড়াগড়ি ॥
উলোর মেয়ে কুলুজী, অগ্রদ্বীপের খোঁপা।
শান্তিপুরের হাতনাড়া, গুপ্তিপাড়ার চোপা ॥
আমড়া, কুমড়া, ধান, এই তিন নিয়ে বর্দ্ধমান ॥
লম্বা কোঁচা, কাছা টান, তবে জানবে বর্দ্ধমান ॥
কলাপাতা, কাঠের আঁটি, এই নিয়ে বৈদ্যবাটি ॥
বেটী, মাটি, মিথ্যাকথা, এই তিন নিয়ে কলকাতা ॥

কলকাতার ছিষ্টি, গুড়ে নেই মিষ্টি, তেঁতুলে নেই টক, কলকাতার ঢপ॥
আঁকুড়া বাঁকুড়াবাসী, মুড়ি খায় রাশি রাশি॥
পোস্ত, টক, কলাইয়ের ডাল, এই তিন বীরভূমের চাল॥
ধান, খুন, খাল, তিন নিয়ে বরিশাল॥
চাল, চিঁড়ে, গুড়, তিন নিয়ে দিনাজপুর॥
কুমড়া, কাওয়ারী, নুর, এ তিন নিয়ে মেদিনীপুর॥
মুখে পান, হাতে চুণ, তবে জানবে মানভূম॥
তরকারিতে দেয় না নুন, বাড়ি কোথা না আমারুণ॥
কালো কাপড়, মাথায় চুল, বাড়ি কোথা না ভাটাকুল॥
দাঁতে মিশি, কাপড় বাসি, বাড়ি কোথা না কুড়মন পলাসী॥
বাঁকা সিঁথে, লম্বা ছোট, তবে জানবে পঞ্চকোট॥
তেল থাকতে রুখু গা, খরসান খাবি ত সামন্তভূম যা॥
রাঁড়, ষাঁড়, সন্ন্যাসী, তিন নিয়ে বারাণসী॥

কতকগুলি এমন প্রবাদ আছে যাহা সাময়িক আচার-ব্যবহার, লোকপ্রথা বা বিশ্বাস না জানিলে বোঝা যাইবে না। যেমন—'কুড়ে কৃষাণ অমাবস্যা খোঁজে'—এই বাক্যটি অমাবস্যায় হলচালনের নিষেধ হইতে প্রচলিত হইয়াছে।

আষাড়ে না হ'লে সুত, হা সুত জো সুত।
ষোলতে না হলে পুত, হা পুত জো পুত॥

কারণ, আষাড়ান্ত বেলা দীর্ঘকালস্থায়ী, তাই সুতা কাটিবার উপযুক্ত ও যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। অতিশয় অলস ব্যক্তিকে বুঝাইতে 'গোঁফ-খেজুরে', বা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দশজনে ষড়যন্ত্র করিলে 'দশচক্রে ভগবান্ ভূত', নির্বুদ্ধিতার উদাহরণস্বরূপ 'খইয়ে বন্ধনে পড়া' প্রভৃতি প্রবাদ কোন কৌতুককর কাহিনী বা কিম্বদন্তী হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। পেটভাতায় বেগার দেওয়ার রেওয়াজ হইতে

বেকারের চেয়ে বেগার ভাল॥
বেগার-ঠেলা কাজ॥
অরাজ্যে বামুন বেগার॥
বেগারের দৌলতে গঙ্গা স্নান॥
দিল্লী ও-পার, ত নেই বেগার॥

প্রভৃতি বহু প্রবাদ রচিত হইয়াছে। মুসলমান আমলের কাজী ও কাজীর বিচার সম্বন্ধে প্রবাদগুলি সুপরিচিত। 'চাষা না জানে মদের সোয়াদ'—এই প্রবচন হইতে মনে হয় যে, তখনও ধান্যেশ্বরীর খোলা ভাটির আস্বাদ

গ্রামের মধ্যেও বিস্তৃত হয় নাই। সতীদাহ প্রথা উপলক্ষ্য করিয়াও দুই-একটি প্রবাদ আছে। যেমন, মরণে দৃঢ়সঙ্কল্প মেয়ের সম্বন্ধে—

মেয়ে যেন আমের ডাল ধরেছে॥

এই প্রবাদটির উৎপত্তি হইয়াছে, সতীদাহে দৃঢ়সঙ্কল্প গতভর্ত্তৃকার একটি আমের ডাল ধরিয়া দাঁড়াইবার প্রথা হইতে। ভুল করিয়া কোন কলু বউকে অন্যের চিতায় দাহ করিবার উপলক্ষ্যে, বলপূর্ব্বক সতী-দাহের নিষ্ঠুর প্রথার নিদর্শন রহিয়াছে একটি প্রবাদে—

কার আগুনে কে বা মরে, আমি জাতে কলু॥
মা আমার কি পুণ্যবতী, বলছে—দে' উলু॥

চারিটি প্রধান একাদশী (শয়ন, উত্থান, পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও ভীম) এবং শিবচতুর্দ্দশী ও দুর্গাষ্টমী পালন সম্বন্ধে প্রবাদ রহিয়াছে—

শয়ন উত্থান পাশমোড়া, তার মধ্যে ভীমে ছোঁড়া।
ক্ষেপাব চোদ্দ, ক্ষেপীর আট, এই ধ'রে বছর কাট॥

এইরূপ বহু প্রবাদে পুরাতন স্মৃতির বা লোকাচারের চূর্ণ অংশ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

বাংলা প্রবাদের বিশেষ রূপ ও রসের কিঞ্চিৎ আভাস উল্লিখিত আলোচনা ও দৃষ্টান্ত হইতে পাওয়া যাইবে, কিন্তু বাংলা প্রবাদের এত বিভিন্ন দিক আছে যে, সামান্য বিবরণও এখানে সম্ভবপর নয়। জাতির আভ্যন্তরীণ বাস্তব বিবরণ, তাহার ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও রসিকতা, তাহার জীবন্ত ভাষা ও বিচিত্র ভূয়োদর্শন, তাহার ধর্ম্মকর্ম্ম, বিদ্যাশিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষবাস, আচার-ব্যবহার, শাসন-শিক্ষা, সমাজের সকল শ্রেণীর ও সকল স্তরের বৈশিষ্ট্যের যথেচ্ছ চিত্র প্রবাদগুলিতে ব্যাপ্ত হইয়া আছে—যাহা কল্পনার রঙে রঙিন বা ভাব-মাধুর্য্যে অতীন্দ্রিয় নয়, নিতান্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বাস্তব-বুদ্ধির ঈক্ষণে সরস ও সজীব।

শ্রীসুশীলকুমার দে

ঢেলে সাজো

"ঢুটো বাজে সই, বোতলটা কই, কণ্টোলে তোরা বাবিনে ওলো"—
কোথা এ যুগের দাঠাকুরদল, জ্ঞানভাণ্ডার খোল হে খোল।
এই পঞ্চাশী মন্বন্তরে বাংলা দেশের দুখীদের ঘরে
হাজারো প্রবাদ বরবাদ হায়, হাজারো প্রবাদ আবাদ হলো।
ওজন দরেতে কাঁকর বেচিতে রেশন কথাটা ছিল কি আগে,
নিজের ক্ষেতের ধান খেতে হলে জান কত টাকা সেলামী লাগে?
ঘুষ ও ঘুসকি ভাল অভিধানে চালু হয়ে গেল কে তা বল জানে,
খাজা নাজিমের আমলে এবার শায়েস্তা খাঁ লাজেই ম'ল।

মহাস্থবির জাতক

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আজ আশ্বিনের বুকে আষাঢ়ের নবঘন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছে। ছাতের ঘরে জানলার ধারে ব'সে আছি, সামনে আমার জাতকের খাতা খোলা। খেয়ালী প্রকৃতির দাপাদাপি চলেছে আমাকে ঘিরে—আমার মনকে ঘিরে। আমার উদাসীন মন ফিরে চলেছে স্মৃতির সরণী বেয়ে সুদূর অতীতে। গাঢ় বিস্মৃতির যবনিকা ভেদ ক'রে চ'লে গেছি একেবারে অতীতের অন্তস্তলে, যেখানে আমার মানসরচিত রাজ্য প'ড়ে আছে সুপ্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে। সেখানে কত বিরাট প্রাসাদ, জ্যোতির্ম্ময় হর্ম্ম্য, বজ্রমণির দেওয়াল, মরকতের ছাদ। উপবনে গুচ্ছে গুচ্ছে ফুল মূর্চ্ছিত হয়ে নুয়ে পড়েছে মাটির দিকে। ঘরে ঘরে কত নরনারী—বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—আমার নর্ম্ম সহচর, আমার আত্মার সহধর্ম্মিণী তারা, সকলেই ঘোরতর সুপ্তিতে আচ্ছন্ন। স্মৃতির সোনার কাঠির পরশ পেয়ে কত বন্ধু বান্ধবী জেগে উঠতে লাগল, তারই মধ্যে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল আমার গোষ্ঠদিদির বিষণ্ণ মুখখানি—আমার দুঃখিনী গোষ্ঠদিদি।

আমারা তখন কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীটের বাড়ি ছেড়ে গলির মধ্যে একটা নতুন বাড়িতে উঠে গিয়েছি। গলির মধ্যে বাড়িগুলো প্রায় সবই গায়ে-গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি, মধ্যে এক আঙুল পরিমিতও জায়গা নেই। আমাদের বাড়ির ছাতে উঠলে পাশাপাশি প্রায় পাঁচ-ছটা বাড়ির ছাতে যাওয়া যেত। বাড়ি সব পাশাপাশি থাকায় এবাড়ি ওবাড়ির মেয়েদের মধ্যে আলাপচারীও চলত। আমরা তখন সবে গিয়েছি, আশপাশের প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে মাদের তখনও পরিচয় ভাল ক'রে জমে নি। কৌতূহলসূচক চাহনি ও মাঝে মাঝে উভয় পক্ষ থেকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত দু-চারটে প্রশ্নোত্তর চলছে মাত্র।

মনে পড়ছে, তখন আশ্বিন মাস, পুজোর ছুটি চলছে। নিস্তব্ধ দুপুর-বেলা দুই ভাই ঘুড়ি-লাটাই নিয়ে ছাতে উঠেছি। পাশের বাড়ির মস্ত

ছাত দেখে লোভ হ'ল; অতি সন্তর্পণে সেখানে গিয়ে ঘুড়ি চড়ানো গেল।

দুপদাপ শব্দ হয়ে পাছে নীচের লোকেরা টের পেয়ে যায়—এই ভয়ে খুব সাবধানেই চলাফেরা করছিলুম; কিন্তু কিছু দূরেই আর একখানা ঘুড়ি উড়ছে দেখে আত্মহারা হয়ে গেলুম। অস্থির চেঁচিয়ে উঠল, দু—য়ো লাল বুলুক্—কো—ও—ও—ও—, সুতো ছাড়ে না, জুতো খায় এক্—কো—ও—ও—ও—; সুবরে, নীচে পড়, নীচে পড়, মার টান, মার টান—ভো কাট্টা—হো-হো-হো—

জয়ের আনন্দে উল্লসিত হয়ে অস্থিরের মুখের দিকে চেয়েছি মাত্র, এমন সময় সে লাটাইটা ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, ওরে বাবা, পাহারাওয়ালা রে! তারপরে এক দৌড় ও তিন লাফে এ ছাত পেরিয়ে নিজেদের ছাতে পালিয়ে গেল।

সামনের দিকে চেয়ে দেখতে পেলুম একজন মেয়ে, ইয়া লম্বা-চওড়া, রংটি ময়লা, মাথার ওপরে চূড়ো ক'রে বাঁধা একরাশ চুল—কোমরে একখানা হাত, দুটি টানা টানা বিশাল চোখে অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে।

আমার হাতে ঘুড়ি, পালাতে পারি না। অপ্রস্তুত হওয়া সত্ত্বেও যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি ঘুড়ি নামাতে লাগলুম। মিনিট দুয়েক পরে সে আমার কাছে এসে বললে, তুমি কাদের বাড়ির ছেলে?

পাশের বাড়ির।

ও, তোমরা নতুন ভাড়াটে এসেছ বুঝি?

হ্যাঁ।

যে পালাল, সে তোমার কে হয়?

আমার ভাই।

দেখ, দুপুরবেলায় ওই উঁচু ছাতটায় উঠো না, বুঝলে?

পরের ছাতে উঠে ধরা প'ড়ে এত সহজে পরিত্রাণ পাবার আশা করি নি। আশা করেছিলুম, ধমকধামক—অন্তত কিছু বিরক্তিও সে প্রকাশ করবে। কিন্তু কিছুই না ক'রে বেশ প্রসন্ন মুখেই সে বললে, ওই ছাতের নীচে যে ঘর সেখানে আমার শ্বশুর থাকেন।

দুপুরবেলা তিনি ঘুমোন কিনা, ছাতের ওপরে দুপদাপ শব্দ হ'লে তিনি ঘুমুতে পারবেন না।

সেদিন আর কোন কথা না ব'লে সে নীচে নেমে গেল। এরই দু-তিন মাস পরে এক শীতের দ্বিপ্রহরে মাতে আর গোষ্ঠদিদিতে কথা

গোষ্ঠদিদি বলছিল, দুপুরবেলাটা আর কাটতে চায় না মা। গড়িয়ে গড়িয়ে কিছুক্ষণ কাটাই, তারপরে এঘর-ওঘর ঘুরি, খানিকক্ষণ ছাতে বেড়াই, আবার এসে গড়াই—

মা বললেন, দুপুরে পড় না কেন, গল্পের বই-টই? বেশ কেটে যাবে।

কোথায় পাব মা গল্পের বই? শ্বশুরের লাইব্রেরির আলমারিতে গাদা গাদা সব ইংরিজী বই ঠাসা, একখানিও বাংলা বই নেই। মধ্যে মধ্যে বাংলা বই আনিয়ে পড়ি, রোজ তো আর পাই না।

আচ্ছা, তোমার স্বামী কখনও আসেন?

আসেন বইকি মা। ব্রহ্মচর্য্যটা যখন অসহ্য হয়ে ওঠে, তখন আসেন।—ব'লেই সে হাসতে লাগল। হাসি থামতে বললে, স্বামীর কথা আর জিজ্ঞাসা করবেন না, রাম-লক্ষ্মণ রয়েছে, ওদের সামনে আর—

গোষ্ঠদিদি আমাদের দুই ভাইয়ের নাম রেখেছিল রাম-লক্ষ্মণ। আমি রাম, অস্থির লক্ষ্মণ।

গোষ্ঠদিদির জীবন বিচিত্র। বাংলা দেশের কোন এক অখ্যাত গ্রামে অতি দরিদ্র পরিবারে তার জন্ম হয়েছিল। জ্ঞান হবার আগেই তার বাপ মা মারা যায়। মাতুল ছিল, সেও অতি দরিদ্র। তবুও সে অনাথিনী ভাগ্নীকে তুলে নিয়ে গিয়ে নিজের পরিবারে পালন করতে লাগল। দু-তিন বছর যেতে না যেতে মামাও মারা গেল। মামী নিজের তিন-চারটে অপোগণ্ড শিশু ও গোষ্ঠদিদিকে নিয়ে বাপের বাড়িতে গিয়ে উঠল। তাদের অবস্থাও এদের চাইতে খুব উন্নত ছিল না। বরাতে নেহাত অনাহারে মৃত্যু নেই ব'লে মরণ হয় নি। তবু কিন্তু এতদিন চলছিল মন্দ নয়। কারণ নিজের বাড়ি থেকে মামার বাড়ি ও মামার বাড়ি থেকে মামার শ্বশুরবাড়ির মধ্যে পথের দূরত্ব থাকলেও অবস্থার

বৈষম্য বিশেষ কিছু ছিল না। কাজেই স্থানভেদে ব্যবস্থার কিছু ইতর-বিশেষ ঘটলেও তার মধ্যে বৈচিত্র্য কিছু ছিল না। বৈচিত্র্য এল বিয়ের পর।

গোষ্ঠদিদির শ্বশুরঘর ছিল বিচিত্র। ব্রাহ্মণ ছিল তারা। শ্বশুর কোন সরকারী আপিসে বড় চাকরি করতেন, দুশো টাকা পেন্সন পেতেন। আমরা যখন তাঁকে দেখেছি, তখন তাঁর বয়স সত্তর পেরিয়ে গিয়েছে। ধপধপে সাদা বাবরি চুল ঘাড়ের ওপর লতিয়ে পড়েছে, সেই অনুপাতে লম্বা সাদা দাড়ি। ধুতি ও আলখাল্লা গেরুয়া রঙে ছোপানো। জুতো পায়ে দিতেন না, খড়ম পায়ে দিয়েই পেন্সন আনতে যেতেন।

আমি আর অস্থির এঁর নাম দিয়েছিলুম—পাগলা সন্ন্যেসী।

পাগলা সন্ন্যেসীর দুই ছেলে। বড়কে তিনি বিলেত পাঠিয়েছিলেন লেখাপড়া শেখবার জন্যে। সেখানে সে বছর পাঁচেক রহস্যজনকভাবে কাটিয়ে নামের পেছনে গুটিকয়েক রহস্যজনক অক্ষর জুড়ে ফিরে এসে বর্মায় কি এক রহস্যজনক ব্যবসা করত ও প্রতি মাসে দশ তারিখের মধ্যে বাপকে দুশো টাকা নিয়মিতরূপে পাঠাত। একদিন আমি তাঁকে বড় ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন, সে কোথায় থাকে, কি করে, কিছুই জানি না। চিঠিপত্র সেও লেখে না, আমিও লিখি না। গরু আমার বটে, কিন্তু কাদের মাঠে ঘাস খায়, তা জানি না; তবে দুধ নিয়মিত পাচ্ছি, তাতেই খুশি আছি।

পাগলা সন্ন্যেসীর ছোট ছেলে যিনি, তিনিই আমাদের গোষ্ঠদিদির দেবতা। ছেলেবেলাতেই ইস্কুল-টিস্কুল ছেড়ে দিয়ে নেশা করতে শেখে। মা-মরা ছেলে, বাপ কোনদিনই কিছু বলতেন না তাকে। পাগলা সন্ন্যেসী ছিলেন সেই পুরনো দিনের ইংরেজীওয়ালা, তার ওপরে মাসে পাঁচশো টাকা মাইনেওয়ালা সরকারী চাকরে। কলকাতায় প্রায় পনেরো কাঠা জমির ওপর পৈত্রিক ভিটে—লোকে তাঁকে বড় লোক ব'লেই জানত। তাই ষোলো-সতরো বছর বয়েস হতে না হতে ছেলের চরিত্র সংশোধন করবার জন্যে একটি প্রায় সমবয়সী সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ধুমধাম ক'রে ছোট ছেলের বিয়ে দিয়ে দিলেন।

আদিমযুগে মানুষ ছিল যাযাবর। পশু পাখী কীট পতঙ্গ যাবতীয়

প্রাণী যখন নিজেদের বাসা বেঁধে বাস করতে শিখেছে, মানুষ তখনও নিজের নীড় বাঁধতে শেখে নি। নেহাত প্রয়োজন ও বিপদ মানুষকে বাসা বাঁধতে শেখালেও অনেকের মনেই এই যাযাবর-প্রবৃত্তির বীজ সুপ্ত থাকে। অনুকূল অবস্থা পেলেই তা জেগে ওঠে। তাই মানুষের ইতিহাসের গোড়া থেকেই দেখা যায়, ঘরের বউ পালাচ্ছে, ঝি পালাচ্ছে, ছেলেপিলে পালাচ্ছে। এর মধ্যে বিস্মিত হবার কিছু নেই, বৈচিত্র্যও কিছু নেই।

একদিন সকালবেলা শয্যাত্যাগ ক'রে পাগলা সন্ন্যেসী দেখলেন, তাঁর ছোট ছেলে সপরিবারে হাওয়া হয়েছে।

এ রকম একটা ব্যাপার বাড়িতে ঘটলে পাড়ার লোকে আইনত আশা করে যে, খুব একটা হৈ-চৈ হবে। কিন্তু পাগলা সন্ন্যেসী এ নিয়ে কোনও অনুসন্ধান, এমন কি কোনও উদ্বেগও প্রকাশ করলেন না। তাঁর একটানা জীবনযাত্রা যেমন চলছিল, তেমনিই চলতে লাগল। তাঁর পুত্রবধূর বাপের বাড়ির অবস্থা ভাল ছিল, তারা পুলিসে খবর দিলে। কিন্তু তাতেও তাদের সন্ধান পাওয়া গেল না। শেষকালে তারা রটাতে লাগল যে, বুড়ো বাড়িখানা বড় ছেলেকে দেবার মতলবে ছোট ছেলে ও তার বউকে কোথায় উড়িয়ে দিয়েছে।

পাড়ার লোকদের তিনি অত্যন্ত তুচ্ছ করতেন ব'লে তারাও তাঁর ওপর বিশেষ সন্তুষ্ট ছিল না। এই ব্যাপারের পর তারা খোলাখুলি-ভাবেই ব'লে বেড়াতে লাগল,—লোকটা অতি বদমাইশ।

বছর পাঁচ-ছয় এই ভাবে কাটবার পর একদিন সকালবেলায় পাগলা সন্ন্যেসীর নির্জ্জন গৃহকুঞ্জ 'হর হর বোম্ বোম্' শব্দে ধ্বনিত হয়ে উঠল।

ব্যাপার কি! তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তিনি দেখলেন, পুত্র ও পুত্রবধূ ফিরে এসেছে। পুত্র একেবারে মহাদেব, পুত্রবধূ সাক্ষাৎ পার্ব্বতী। পুত্রের কোমরে ন্যাঙট, সর্ব্বাঙ্গ বিভূতিলিপ্ত, হাতে মাথা-সমান উঁচু ত্রিশূল। পুত্রবধূর অঙ্গ গৈরিক শাড়িতে আবৃত, মাথায় চূড়া ক'রে চুল বাঁধা, হাতে ত্রিশূল। উভয়ের চক্ষুই রক্তবর্ণ।

পাগলা সন্ন্যেসী তো এই দৃশ্য দেখে পরম পুলকিত হয়ে উঠলেন। বাইবেলের উদার পিতা ছেলের গৃহ-প্রত্যাগমনে উল্লসিত হয়ে সর্ব্বাপেক্ষা

স্থূল মেষশাবকটি বধ করেছিলেন, কিন্তু মেষপালনের কারবার এঁর ঘরে ছিল না, তাই তিনি ছেলের অভিনন্দনে মুরগী বধ করলেন গোটা পাঁচ-সাত। তাঁর এক মুসলমান চাকর ছিল, তাঁর নিজের যা কিছু কাজ সেই করত। সকালবেলা তিনি বউমার হেঁসেলে খেতেন আর রাত্রের রান্না করত এই চাকর—একটি বড় মুরগীর রোস্ট, গ্রেট ঈস্টার্ন হোটেলের চারপয়সাওয়ালা একখানা রুটি দিয়ে তিনি নিত্য এই রোস্টের সদ্ব্যবহার করতেন।

ছেলে ও বউমা ফিরে আসায় দু-বেলা মুরগী বধ হতে লাগল। বাড়িতে মহোৎসব শুরু হ'ল। ছোট ছেলে যে এমন 'তালেবর' হবে, এ কথা তিনি কোনদিন কল্পনা করতে পারেন নি। গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থের এমন Synthesis ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যেরও সাধ্যের অতীত ছিল।

পাড়ার অধিকাংশ লোকই তাঁকে অপছন্দ করলেও অনেকে কৌতূহল পরবশ হয়ে ছেলে ও ছেলের বউকে দেখতে আসতে লাগল। ছেলে বাবার সামনেই গাঁজা ও চরস ফুঁকতে লাগল সারাদিন, রাত্রে কারণ উড়তে লাগল বোতল বোতল।

এতদূর অবধি চলছিল মন্দ নয়, কিন্তু পুত্রবধূও যখন শ্বশুরের শ্মশ্রু গাঁজার ধোঁয়ায় ধূমায়িত করতে আরম্ভ করলেন, তখন পাড়ার লোকে গালাগালি দিতে লাগল। আমাদের পাগলা সন্ন্যেসী কিন্তু এসব ভ্রূক্ষেপ করতেন না। বেলেল্লাপনা করুক, কিন্তু ছেলে-বউ যাতে বাড়িতেই থাকে, সে বিষয়ে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নি; কিন্তু গৃহাশ্রমে ব'সেই সাধনমার্গে চলবার সর্ব্বরকম সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও একদিন তারা আবার চ'লে গেল।

বছর ছয়েক পরে একদিন পুত্র বাড়ি ফিরে এল, সঙ্গে স্ত্রী নেই। বছর খানেক ধ'রে পেটের নানা রকম অসুখে ভুগে হরিদ্বারে তিনি দেহ-রক্ষা করেছেন। গৃহস্থ ভদ্রলোকের মেয়ে গাঁজা, চরস ও কারণ এই সব দেবভোগ্য জিনিস বেশি দিন সহ্য করতে পারলেন না।

ছেলে বাড়িতে ফিরে সন্ন্যাসীর বহির্ব্বাস অর্থাৎ ল্যাঙট ছেড়ে আবার ধুতি পরা শুরু ক'রে দিলে। স্ত্রীর শোকে অনেকে গৃহত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস গ্রহণ করে, কিন্তু এ ব্যক্তি স্ত্রীর শোকে সন্ন্যাস ত্যাগ ক'রে গৃহী হবার

দিকে মন দিলে। পাগলা সন্ন্যেসী বছরখানেক ছেলের হালচাল দেখে আবার তার বিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

পছন্দ-অপছন্দের বালাই যদি না থাকে, তবে কোনো দেশে কোনো কালে কোনো ছেলেমেয়েরই বিয়ে আটকায় না। পাগলা সন্ন্যেসীর ছেলের বিয়েও আটকাল না। আমাদের গোষ্ঠদিদি শিশুকাল থেকে মনে মনে শিবপূজো করত, তাই প্রজাপতি তাকে শিব জুটিয়ে দিলেন।

গোষ্ঠদিদির যখন বিয়ে হ'ল, তখন তার পনরো-ষোলো বছর বয়স। বাড়ন্ত গড়ন ব'লে তাকে বয়সের চেয়ে অনেক বড় দেখাত। সে সময়ে বারো বছরের মধ্যে মেয়ের বিয়ে দিতে না পেরে কত বাঙালী বাপ-মা যে নরকস্থ হ'ত, একমাত্র চিত্রগুপ্তই তার হিসাব দিতে পারেন। কিশোর বয়সে এই সুন্দরী ধরণী রঙিন স্বপ্নের মতন যখন মেয়েদের মনে অতি সন্তর্পণে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে, মেঘমণ্ডিত বর্ষার প্রভাতে ক্ষীণ রবিকরের মত স্তিমিত যৌনচেতনা যখন তার অবজ্ঞাত মানসলোকে ঈষৎ চাঞ্চল্য জাগিয়ে তোলে, অজানিত সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যৎজীবন অনভিজ্ঞ সংসারবুদ্ধির প্রতিফলকে যখন রঙিন হতে থাকে, জীবনের সেই পরম সন্ধিক্ষণে অভিভাবকদের আর্ত্তনাদ—গেল রাজ্য, গেল কূল, চোদ্দ পুরুষ বুঝি নরকস্থ হ'ল রে—অন্তর ও বাহিরের এই বিষম হট্টগোলের মধ্যে গোষ্ঠদিদির জীবনে একদিন সানাইয়ের সাহানা বেজে উঠল।

বিয়ে দিয়ে ঘরে এনেই পাগলা সন্ন্যেসী বউমাকে ছেলের গুণের কথা সব খুলে বললেন। অতীতকালে যিনি তাঁর পুত্রবধূরূপে ঘরে এসেছিলেন, স্বামীর সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে তিনি কি নির্ব্বুদ্ধিতা করেছিলেন, সে সম্বন্ধে কয়েকদিন ধ'রে তাকে বিধিমতে তালিম দিলেন।

এদিকে ছেলে নতুন খেলনা পেয়ে দিনকতক খুব খুশি রইল। গৃহাশ্রমে ফিরে এলেও সন্ন্যাসাশ্রমের নেশাপত্র কখনও সে ছাড়ে নি। একলা ঘরে ব'সে নেশা করায় কোন মজা নেই। কিছুদিন যেতে না যেতে সে বউকেও গাঁজা ও মদ খাবার জন্যে জেদ করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। কিন্তু গোষ্ঠদিদি কিছুতেই নেশা করতে রাজি নয়। শেষকালে

অবাধ্য স্ত্রীর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে আবার একদিন সে বাড়ি ছেড়ে উধাও হয়ে গেল।

পাগলা সন্ন্যেসী শুনে বললেন, গেছে যাক, আবার ফিরে আসবে, তুমি কিছু ভেবো না বউমা।

এই ইতিহাস আমরা কিছু পাগলা সন্ন্যেসীর মুখে ও কিছু গোষ্ঠ-দিদির মুখে শুনেছি।

এই পাগলা সন্ন্যেসী ও তাঁর পুত্রবধূ ছিল আমার ও অস্থিরের প্রাণের বন্ধু। গোষ্ঠদিদি আমাকে রাম-ভাই আর অস্থিরকে লক্ষ্মণ-ভাই ব'লে ডাকত। পাগলা সন্ন্যেসী আমাদের রামবাবু আর লক্ষ্মণবাবু ব'লে ডাকতেন। আমরা তাঁকে ডাকতুম পাগলা সন্ন্যেসী ব'লে। তিনি বলতেন, আমার বাপ-মা, ছেলেপুলে, বন্ধু-বান্ধব কেউ আমার আসল নাম ধ'রে ডাকে নি। তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি আছে, এই আমার আসল নাম, এই আমার স্বরূপ, এই আমার সারা জীবনের পরিচয়।

একদিন বিকেলে আমরা গোষ্ঠদিদির সঙ্গে ব'সে গল্প করছি, এমন সময়ে পাগলা সন্ন্যেসী সেখানে এসে আমাদের দুই ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ ক'রে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন।

ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখি, আট-দশটা দরজাওয়ালা মস্ত বড় হলঘর। একটি কি দুটি মাত্র দরজা খোলা, সমস্ত ঘরখানাই প্রায় অন্ধকার। দেওয়ালের গায়ে ঘেঁষানো বড় বড় সারবন্দী আলমারিতে বই ঠাসা। এক ধারে একখানা সরু খাট, তাতে বিছানাপাতা। বিছানার চাদর, বালিশের খোল সব গেরুয়া রঙের। খাটের ওপরে বালিশের চারিপাশে অগোছাল-ভাবে একরাশ বই ছড়ানো।

পাগলা সন্ন্যেসী খাটের ওপরে বসলেন। সামনেই মান্ধাতার আমলের পুরনো গোটা দুই সোফা, তারই ওপরে আমাদের বসিয়ে গল্প জুড়ে দিলেন। ডফ সায়েবের ইস্কুলে পড়ি শুনে ডফ সায়েব সম্বন্ধে, ক্রীশ্চান ইস্কুল ও তাঁদের আমলের ইংরেজ অধ্যাপকদের হালচাল ইত্যাদি অনেক মজার গল্প শোনালেন। ওঠবার সময়ে বললেন, দেখ, তোমাদের সঙ্গে যখন বন্ধুত্ব হ'ল, তখন রোজ আসবে, বুঝলে ?

পাগলা সন্ন্যেসীর মত সর্ব্ববিষয়ে এমন উদার ও অদ্ভুত লোক আমি

জীবনে ছুটি দেখি নি। আমাদের বয়েস তখন দশ-বারো বৎসর ও তাঁর বয়স সত্তর-বাহাত্তর, অথচ আমাদের সঙ্গে কোথাও কোন বিষয়েই তাঁর বাধত না। আমাদের লাট্টু ঘোরানো, ঘুঁড়ি ওড়ানো, জানোয়ার পোষা প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ আমাদের চাইতে কিছু কম ছিল না। পাড়ার লোকেরা কেন যে তাঁকে বদমাইশ বলত, তা আমরা ভেবে ঠিক করতে পারতুম না। এঁরই বাড়ির ভেতর দিয়ে বিকেলে আমরা লতুদের বাড়ি পালিয়ে যেতুম। তাঁর কাছে আমাদের গোপন কিছুই ছিল না। আমরা কোথায় যাই আর কেমন ক'রে যাই, কি ক'রে ঘাসওয়ালাকে ফাঁকি দিয়ে লতুদের বাড়িতে যাবার ব্যবস্থা করেছি, সেসব শুনে তিনি খুব উপভোগ করতেন আর হো-হো ক'রে হাসতে থাকতেন।

সে সময়ে শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রায় সকলেই কথায়-বার্তায় ব্রাহ্মদের খোঁচা দিতেন, কিন্তু পাগলা সন্ন্যেসীর মুখে কখনও ব্রাহ্মদের নিন্দা শুনি নি। ব্রাহ্মসমাজের কথা উঠলে তিনি হেসে বলতেন, ওদের খেয়াল হয়েছে, সমাজ সংস্কার করবে, তা করুক না।

একদিন, বোধ হয় সেদিন শনিবার, বেলা তিনটে হবে, আমরা পাগলা সন্ন্যেসীর ঘরে গিয়ে দেখি তিনি খাটে আধ-শোওয়া হয়ে কি একখানা বই পড়ছেন। আমরা ঘরে ঢুকতেই তিনি বই রেখে উঠে ব'সে বললেন, এস এস, রামবাবু, লক্ষ্মণবাবু, ব'স, মন আমার তোমাদেরই খুঁজছিল, ঠিক সময়ে এসে পড়েছ।

জিজ্ঞাসা করলুম, কি পড়ছিলেন ?

আরে, সেইজন্যেই তো তোমাদের খুঁজছিলুম। পড়ছি শেলী ; একলা প'ড়ে মজা নেই ব্রাদার, বড় সুসময়ে এসেছ।

এই ব'লে বই রেখে তিনি উঠে পড়লেন। একটা বেঁটে আলমারি খুলে একটা সজারু-কাঁটার বাক্স বের ক'রে নিয়ে আবার খাটে এসে বসলেন। আমাদের উদগ্রীব দু-জোড়া চোখ বাক্সর ওপর গিয়ে পড়ল। তিনি বাক্স থেকে বার করলেন এক-হাত-টাক লম্বা টকটকে লাল একটা তাঁমার কলকে। কলকে একটা অতি সাধারণ জিনিস, কিন্তু তার এমন সুন্দর রূপ হতে পারে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। সেটাকে হাতে

নিয়ে দেখবার ইচ্ছা হ'তে লাগল, কিন্তু সাহস ক'রে কিছু বলতে পারলুম না। তারপরে বেরুল একটা মোটা ছোট্ট চন্দনকাঠের চাকতি, একটা সুন্দর ঝিনুকের বাঁটওয়ালা চকচকে ছুরি। তারপরে রূপোর পানের ডিবে থেকে কি কতকগুলো জড়িবুটি বের ক'রে বেছে নিয়ে তাতে কয়েক ফোঁটা গোলাপজল দিয়ে টিপতে টিপতে শেলী সম্বন্ধে গল্প বলতে লাগলেন। কি ক'রে তিনি বাড়ির লোকদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বিয়ে করলেন, স্ত্রীর সঙ্গে বনল না, আবার জীবনে নতুন সঙ্গিনী এল। বাড়িঘর ছেড়ে চ'লে গেলেন কোন্ বিদেশে, তারপরে জলে ডুবে মৃত্যু—উপন্যাসের কাহিনীর চেয়ে চিত্তাকর্ষক কবির সেই জীবন-কথা শুনতে শুনতে আমাদের বালক-মন ব্যথিত হয়ে উঠতে লাগল।

কথার সঙ্গে সঙ্গে হাত সমানভাবেই চলছিল। বেশ ক'রে গাঁজায় কয়েকটি দম লাগিয়ে ঘরের মধ্যে দস্তুরমতন একটি মেঘলোক সৃষ্টি ক'রে পাগলা সন্ন্যেসী আগের বইখানা তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলতে লাগলেন, তোমাদের কাছে শেলীর কবিতা পড়ব। ভয় পেও না, আমি বুঝিয়ে দোব, কোন কষ্ট হবে না বুঝতে।

এই ব'লে একটা পাতা বের ক'রে বললেন, এ কবিতাটার নাম Alastor।

প্রথমে তিনি Alastor কবিতাটার ভাবার্থ ব'লে গেলেন, তারপরে সমস্ত কবিতাটি আবৃত্তি ক'রে পড়লেন। এ রকম অসামান্য আবৃত্তি এর আগে আমরা শুনি নি। মেঘগর্জ্জনের মতন সেই কণ্ঠস্বর প্রকাণ্ড হলঘরের প্রতিধ্বনিকে জড়িয়ে নিয়ে গমগম ক'রে আমাদের কানের মধ্যে দিয়ে সমস্ত দেহটাকে ঝঙ্কার দিতে লাগল। কবিতার ভাষা বোঝবার মতন বিদ্যে আমাদের ছিল না, তার ভাবার্থ একটু আগেই শুনেছি মাত্র। শুধু ধ্বনি ও সুর মনের মধ্যে একটার পর একটা ছবি ফুটিয়ে তুলতে লাগল। চোখের সামনে যেন দেখতে লাগলুম, Alastor-এর কবি চলেছে দূরে, সুদূরে—তার অন্তরে যে চেতনা জেগেছে তারই সন্ধানে। চলেছে, চলেছে—কত দেশ, কত মেয়ে এল তার জীবনে, তবুও সে চলেছে বিরামবিহীন। চলতে চলতে জরায় তার দেহ শুকিয়ে গেল। অমন যে সুন্দর কিশোর, তাকে দেখলে তখন

ভয় হয়, চেনা যায় না। তার বুকের মধ্যে যে অতৃপ্তি, দুর্লভকে লাভ করবার যে পিপাসা, তারই আগুন শুধু দুই চোখে ধকধক ক'রে জলছে। গ্রামের লোকেরা দয়া ক'রে তাকে দুটি খেতে দেয়, সে আবার চলা শুরু করে। পাহাড়ের চুড়োয় চুড়োয় সে ঘোরে, লোকেরা মনে করে, সে বুঝি ঝড়ের অন্তরাত্মা, মানুষের রূপ ধরেছে। শিশুরা তাকে দেখে সভয়ে জননীর বুকে মুখ লুকোয়। দুনিয়ার কেউ তার মনের কথা বোঝে না। সকলেই সভয়ে, সবিস্ময়ে বা শ্রদ্ধায় তাকে পথ ছেড়ে দিয়ে অবাক হয়ে থাকে। শুধু—

Youthful maidens, taught
By nature, would interpret half the woe
That wasted him, would call him with false names
Brother and friend, would press his pallid hand
At parting, and watch him through tears, the path
Of his departure from their father's door.

কত অদ্ভুত প্রাকৃতিক দৃশ্য! সুন্দরে ভয়ালে কি আশ্চর্য্য সংমিশ্রণ—তারই মধ্যে দিয়ে আমাদের কবি চলল মৃত্যুর দিকে। মুখে তার এক মন্ত্র—

—'Vision and love'
—I have beheld
The path of thy departure, Sleep and death
Shall not divide us long!

তারপরে একদিন অতি দূর দুর্গম শান্ত সুন্দরী প্রকৃতির কোলে তার শ্রান্ত দেহ বিছিয়ে দিলে—শান্তিময়ী মৃত্যু এসে তাকে নিয়ে চ'লে গেল।

পড়া শেষ ক'রে পাগলা সন্ন্যেসী বই বন্ধ ক'রে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তার পরে একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে বললেন, তবুও তো Alastor-এর কবির বরাতে—

One silent nook
Was there. Even on the edge of that vast mountain
···that seemed to smile
Even in the lap of horror.

ছিল হে রামবাবু! আমাদের বরাতে যে তাও জোটে না, কি বল?

ব'লেই তিনি হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন। অন্ধকার হয়ে এলেও স্পষ্ট দেখতে পেলুম, তাঁর চোখ থেকে একসঙ্গে কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝর-ঝর ক'রে ঝ'রে পড়ল। আমার চোখও জলে ভ'রে উঠেছিল, অস্থিরের দিকে ফিরে দেখলুম, তার চোখও অশ্রুতে পরিপূর্ণ।

সেদিন থেকে পাগলা সন্ন্যেসীর সঙ্গে আমাদের অন্তরঙ্গতা খুবই বেড়ে গেল। তাঁর কাছে গিয়ে কবিতার আলোচনা হতে লাগল। আলোচনা মানে, তিনি শেলীর কবিতা প'ড়ে আমাদের শোনাতেন আর ব্যাখ্যা করতেন, আর আমরা তার মধ্যে থেকে চটকদার কথা বেছে নিয়ে মুখস্থ করতুম।

একদিন পাগলা সন্ন্যেসী বল্লেন, আজ রামবাবু, তুমি একটা কবিতা আবৃত্তি কর।

নিজেদের কোন একটা কেরামতি দেখিয়ে তাঁর কাছ থেকে একটু প্রশংসা পাবার ইচ্ছা সর্ব্বদাই মনের মধ্যে জাগ্রত ছিল। গোষ্ঠদিদি আমাদের মুখের সামনে ও আমাদের আড়ালে যার কাছে নিয়ত আমাদের প্রশংসা করত আর বাহাদুরি দিতে থাকত। সে কথায় কথায় বলত, আমার রাম-লক্ষ্মণ ভাই আছে, আমার ভাবনা কিসের? কিন্তু পাগলা সন্ন্যেসী আমাদের গুণাগুণ সম্বন্ধে কোন শ্রুতিসুখকর মন্তব্য করতেন না ব'লে ক্ষুন্ন না হ'লেও সে সম্বন্ধে মনের মধ্যে একটা উদগ্রীব আকাঙ্ক্ষা ছিল। সেদিন আবৃত্তি করার প্রস্তাব করা মাত্র মনে হ'ল, আজ একটু কায়দা দেখিয়ে দেওয়া যাক তা হ'লে।

ইস্কুলে প্রাইজ-টাইজ না পেলেও প্রাইজের জলসায় আমার খাতির ছিল। প্রায় প্রতি বছরেই প্রাইজের সময় আমাকে একটা ইংরিজী ও

একটা বাংলা কবিতা আবৃত্তি করতে হ'ত। সঙ্গে সঙ্গে হাততালিও পেতুম, যদিও সে হাততালির অর্থ তখন সম্যক বুঝতে পারি নি।

সে সময়ে বাংলা দেশের সর্বত্রই হেমচন্দ্রের 'বাজ রে শিঙ্গা বাজ ঐ রবে' কবিতাটির খুব আদর ছিল। সভা-সমিতি জমাবার ঐটি ছিল একটি অব্যর্থ বাণ। দু-তিন বার কবিতাটি আমিও আবৃত্তি করেছিলুম। পাগলা সন্ন্যেসী বলামাত্র আমি তড়াক ক'রে উঠে বুক চিতিয়ে এমন চীৎকার ক'রে আবৃত্তি শুরু ক'রে দিলুম যে, বাড়ির ভেতর থেকে গোষ্ঠ-দিদি দৌড়তে দৌড়তে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গেল।

আবৃত্তির পর ঘরখানা গমগম করতে লাগল। গোষ্ঠদিদির সঙ্গে চোখোচোখি হতে দেখলুম, তার মুখে চোখে প্রশংসা উপচে পড়ছে।

গোষ্ঠদিদি বাড়ির ভেতরে চ'লে গেল, আমিও কৌচে ব'সে পড়লুম। বোধ হয় মিনিট খানেক চোখ বুজে চুপ ক'রে ব'সে থেকে পাগলা সন্ন্যেসী বললেন, কি শিঙ্গে ফোঁকার কবিতা আবৃতি করলে হে রামবাবু! ছিঃ, তোমার কাছ থেকে এ আশা করি নি।

ইস! একেবারে দ'মে গেলুম।

এক মুহূর্ত্ত পরে পাগলা সন্ন্যেসী বললেন, আচ্ছা লক্ষ্মণবাবু, এবার তুমি একটা আবৃত্তি কর।

অস্থির উঠে বিনিয়ে বিনিয়ে আবৃত্তি করলে—

"আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে
হের ঐ ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া কাঙ্গালিনী মেয়ে"।

অস্থিরের আবৃত্তি শেষ হতে না হতে পাগলা সন্ন্যেসী ব'লে উঠলেন, বা বা লক্ষ্মণবাবু, তুমি ফুল মার্কস পেলে। ছি ছি রামবাবু, তোমার কাছ থেকে এ আশা করি নি। শেষে কিনা ঐ শিঙ্গে ফোঁকার কবিতা আবৃত্তি করলে!

সজারু-কাঁটার বাক্স বেরুল। গাঁজা টিপতে টিপতে বললেন, এ বিদ্যেটা আমায় ছোট ছেলে শিখিয়েছে। তা না হ'লে আমরা ছেলেবেলা থেকে সরাব-টরাব খাই। গাঁজা খেতে শেখালে আমার ছোট ছেলে আর বউমা—তোমাদের গোষ্ঠদিদির সতীন।

তিন চারটি দম লাগিয়ে কলকেটি উল্টে রেখে পাগলা সন্ন্যেসী জিজ্ঞাসা করলেন, লক্ষ্মণবাবু, যে কবিতাটি আবৃত্তি করলে, সেটি কার লেখা?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের।

ঠাকুর! কোথাকার ঠাকুর? পাথ্‌রেঘাটার, না জোড়াসাঁকোর?

জোড়াসাঁকোর।

ও, তা হ'লে দেবেন ঠাকুরের ছেলে হবে। হ্যাঁ, দেবেন ঠাকুরের ছেলেরা খুব তালেবর বটে। বেশ লিখেছে হে ছোকরা—"মাতৃহারা মা যদি না পায় তবে আজ কিসের উৎসব"! ছি ছি রামবাবু, তোমার ওটা কি কবিতা! লক্ষ্মণবাবু তুমি আজ ফুল মার্কস পেয়েছ।

আমাদের বাড়িতে পুজো কিংবা বড়দিনের ছুটির সময় এক ভদ্রলোক এসে দিনকয়েক ক'রে থাকতেন। এঁর নাম ছিল বিপিন চক্রবর্ত্তী। ইনি মফঃস্বলে সরকারী চাকরি করতেন। বিপিনবাবু ছিলেন কবি এবং সে সময় একখানা কবিতার বইও ছাপিয়েছিলেন, নাম তার বুদ্‌বুদ।

কবিতা লেখবার ক্ষমতা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কতখানি ছিল তা বলতে পারি না, তবে তাঁর দূরদৃষ্টি যে খুবই ছিল তা বইয়ের নামকরণ দেখেই বোঝা যায়।

কিন্তু কাব্যপ্রতিভা থাক আর নাই থাক, বিপিনবাবুর প্রকৃতিটি ছিল একেবারে কবির মতন—যা কবিদের মধ্যে-ও দুর্লভ। এক কথায় বলতে গেলে তিনি অতি 'মহাশয় ব্যক্তি' ছিলেন। আমার আর অস্থিরের একটা আলাদা ঘর ছিল। বিপিনবাবু আমাদের বাড়িতে এলে আমাদের ঘরেই তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হ'তে, আর তাঁর সমস্ত কিছু তদারকের ভার আমাদের দুই ভাইয়ের ওপরে পড়ত।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে তাঁর যাওয়া-আসা ছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় এবং রবীন্দ্রনাথের একজন মহাভক্ত ছিলেন। সে সময়ে সাহিত্যচর্চ্চা অতি অল্প লোকই করতেন, যাঁরা করতেন তাঁদের মধ্যে সত্যিকারের রসগ্রাহী লোক খুব কমই ছিল। ব্রাহ্মসমাজের কেউ কেউ এবং ব্রাহ্মসমাজের বাইরে গোনাগুনতি কয়েকজন ছাড়া রবীন্দ্রনাথের কবিতা উপভোগ করা তো দূরের কথা, সকলে তাঁকে গালাগালিই দিত। এমন লোকও আমরা দেখেছি,

যারা অন্ত সাহিত্যিকদের যে সব দোষগুলোকে গুণ ব'লে কীর্ত্তন করত, সেই সব দোষ রবীন্দ্রনাথের ওপর আরোপ ক'রে তাঁকে গালাগালি দিতে থাকত। এই সব ব্যক্তিগত আক্রমণের সঙ্গে কবিতা সমালোচনার কোন যোগ না থাকলেও রবীন্দ্র-কাব্যের রস গ্রহণ তারা ঐ মাপকাঠি দিয়ে করত। এখন মনে হয়, দেশশুদ্ধ লোক রবীন্দ্রনাথের এমন ভক্ত কি ক'রে হয়ে উঠল!

যাই হউক, রাত্রে ঘুমোবার আগে বিপিনবাবুর সঙ্গে আমাদের কাব্য আলোচনা হ'ত। আলোচনা শুরু হতেই আমরা কায়দা ক'রে শেলীকে এনে ফেললুম। তারপরে এতদিন ধ'রে পাগলা সন্নেসীর যে সব চটকদার বাক্য আমরা মুখস্থ করেছিলুম, গড়গড় ক'রে বিপিনবাবুর কাছে তা ওগরাতে আরম্ভ ক'রে দিলুম।

আমাদের বয়েসী ছেলেদের মুখে সেই সব বিজ্ঞজনোচিত বাক্য শুনে বিপিনবাবুর চক্ষু একেবারে চড়কগাছে উঠে গেল। আমরা তাঁকে দম নেবার সময় না দিয়ে Episychidion, Prince Alhanase, Ode to Intelectual Beauty, The Revolt of Islam-এর Dedication থেকে ছাঁকা ছাঁকা লাইন, যা সব এই রকম সুযোগে ছাড়বার জন্যে মুখস্থ ক'রে রেখেছিলুম, তাই পাগলা সন্ন্যেসীর অনুকরণে আমি আবৃত্তি করতে লাগলুম, আর অস্থির চোখ বুঁজে বুড়ো মানুষের মতন ধরা ধরা গলায় বলতে লাগল, আহা-হা, এর কি তুলনা আছে!

বিপিনবাবু তো খুব খুশি। এমন কি আমাদের হালচাল দেখে ভদ্দরলোক দস্তুরমতন ভড়কেই গেলেন। একদিন তিনি মাকে ডেকে বললেন, ঠাকরুন, আপনার এই স্থবির ও অস্থির এরা মহাপুরুষ।

মা বললেন, হ্যাঁ, আমাদের ছলনা করতে এসেছেন!

তিনি হেসে বললেন, দেখে নেবেন আপনি, এদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় তখনও জ'মে ওঠে নি। ব্রহ্মসঙ্গীতের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে সব গান ছিল তার সুর, বাঁধুনি ও প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে যে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তা বুঝতে পারতুম মাত্র। 'কথা ও কাহিনী'র দু-একটা কবিতার সঙ্গে যা পরিচয় হয়েছিল, তা খুব ভাল লাগত; কিন্তু কেন যে ভাল লাগত তা প্রকাশ

করতে পারতুম না। যদিও অন্য বাংলা কবিতার সঙ্গে তার আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে তা অনুভব করতুম মাত্র। আমাদের কাব্যালোচনার মজলিসে বাংলা কবিতার কথা উল্লেখ করবার জো ছিল না। তখনকার দিনে বাঙালীরা হেম, নবীন, মধুসূদনকে—অধিকাংশ স্থলে না প'ড়েই, দেবতা জ্ঞান করত। পাগলা সন্ন্যেসী যখন তাঁদেরই নস্যাৎ ক'রে দিতেন, তখন আর সেখানে রবীন্দ্রনাথের কথা তুলতেই সাহস হ'ত না, রসভঙ্গ হবার ভয়ে।

বিপিনবাবুর সঙ্গে আমাদের ভাব খুব জ'মে ওঠবার পর আমরা তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর কাব্য সম্বন্ধে যে সব কথা শুনতে লাগলুম, তাঁর ছন্দ, তাঁর প্রকাশভঙ্গী, কবিতার বিষয়নির্ব্বাচন ও ব্যঞ্জনা—এই সব কথা পাগলা সন্ন্যেসীর কাছে অতি সন্তর্পণে ছাড়তে আরম্ভ ক'রে দেওয়া গেল, আর পাগলা সন্ন্যেসীর বাক্যাবলী বিপিনবাবুকে গিয়ে বলতে লাগলুম। ফলে উভয় স্থানেই দিনে দিনে আমাদের খাতির বেড়ে যেতে লাগল।

এমনই দিন চলেছে, এরই ফাঁকে ফাঁকে লতুদের বাড়িও যাওয়া-আসা ঠিক চলেছে, এমন সময় একদিন রাত্রে বিপিনবাবু আমাদের রবীন্দ্রনাথের 'অসময়ে' ও 'দুঃসময়' এই কবিতা দুটি শোনালেন। রবীন্দ্রনাথ যে খুব বড় কবি মনে মনে সে কথা নিশ্চিত স্বীকার করলেও স্রেফ মুরুব্বীয়ানা ক'রে পাগলা সন্ন্যেসীর বুকনিগুলো শোনাবার লোভে বিপিনবাবুর কাছে আমরা সে কথা স্বীকার করতুম না। কিন্তু এই কবিতা দুটি আমাদের মুখ থেকে পাণ্ডিত্যের মুখোস একেবারে উড়িয়ে নিয়ে চ'লে গেল। 'অসময়' ও 'দুসময়' আমাদের এত ভাল লাগল যে, তখুনি দুই ভাই কবিতা দুটি মুখস্থ ক'রে ফেললুম।

কয়েক দিন পরে পাগলা সন্ন্যেসীর কাছে কোন ছুতোয় রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ তুলে দুজনে সেই দুটো কবিতা তাঁকে আবৃত্তি ক'রে শুনিয়ে দিলুম।

কবিতা দুটো শুনে ভদ্রলোক কিছুক্ষণ আমাদের মুখের দিকে হক-চকিয়ে চেয়ে থেকে একেবারে উছলে উঠলেন। আহা, অদ্ভুত, অদ্ভুত!

খুব কবিতা লিখেছে হে তোমাদের রবীন্দ্রনাথ। কোনো বাঙালী এর আগে এমন কবিতা লিখতে পারে নি।

চটপট উঠে সজারুকাঁটার বাক্স নিয়ে এসে গাঁজা তৈরি করতে করতে বলতে লাগলেন, রবীন্দ্রনাথের বই কোথায় পাওয়া যায় আমায় বল তো। ওরা নাটক লিখে বাড়িতে অভিনয় করে শুনেছি, কিন্তু এমন কবিতা লেখে তা জানতুম না।

গাঁজা-টাজা টেনে পাগলা সন্ন্যেসী ভোম হয়ে কিছুক্ষণ ব'সে রইলেন। তারপর হঠাৎ একবার উছলে উঠে বললেন, আহা হা, কি কথাই বলেছে হে—

তবু একদিন এই আশাহীন পন্থ রে—

বল না রামবাবু, আমার কি ছাই জানা আছে, তুমি বল, তোমার সঙ্গে আমিও বলি।

কিশোর কণ্ঠের সঙ্গে বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর গর্জ্জে উঠল—

তবু একদিন এই আশাহীন পন্থ রে
অতি দূরে দূরে ঘুরে ঘুরে শেষে ফুরাবে,
দীর্ঘ ভ্রমণ একদিন হবে অন্ত রে
শান্তি সমীর শ্রান্ত শরীর জুড়াবে—

রামবাবু, লক্ষ্মণবাবু এই শেষ বয়সে তোমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হ'ল। তোমাদের এখনও অনেক দূর চলতে হবে। দেখবে জীবনে কত দুঃখ কত ব্যর্থতা, কত অশান্তি আসবে। কারুর মুখেই শুনবে না যে, সে বেশ ভাল আছে। এই জীবনের মধ্যে দাঁড়িয়ে কে এমন ক'রে বুক ঠুকে আশ্বাস দিতে পারে—

"তবু একদিন এই আশাহীন পন্থ রে
অতি দূরে দূরে ঘুরে ঘুরে শেষে ফুরাবে ?"

ভাগ্যে তোমাদের সঙ্গে ভাব হয়েছিল।

ক্রমশ

"মহাস্থবির"

ক্ষণিকা

ভোজ

শিল্পীর শিরে পিল্‌পিল্‌ করে আইডিয়া ;
লেখেন যখন পুস্তক তিনি তাই দিয়া—
উইপোকা কয়, চল এইবার খাই গিয়া।

শরবত

পর্ব্বত বলে, শরবত খেতে চাই,
দারুণ গ্রীষ্মে প্রাণ করে আই ঢাই।
সারা দেহ দিয়া বাহিরায় তার ঘাম
ঝরঝর ধারে ঝ'রে যায় অবিরাম।
সে ধারা নামিয়া এসে
লবণাম্বুতে মেশে—
সমুদ্র বলে, ধন্য পাহাড় ভাই,
তোমারি কৃপায় শরবত খেতে পাই।

মেঘদূত

পয়লা আষাঢ় মেঘ এল অম্বরে !
মনে ভাবি, এরে কোথায় পাঠাই দূত ?
প্রিয়া তো কাছেই আছেন—রান্নাঘরে
পেঁয়াজ-খিচুড়ি করিছেন প্রস্তুত।
কহিলাম মেঘে, চ'লে যাও তুমি ফ্রণ্টে,
দেখে এস সব নিজে ;
ফিরে এসে ব'লো কানে কানে মৃদুকণ্ঠে
সত্য কথাটা কি যে !

"চন্দ্রহাস"

সংবাদ-সাহিত্য

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ—মাত্র এই বাইশ বৎসরের মধ্যে জন্মলাভ করিয়া বঙ্গমাতার যে কয়জন সুসন্তান রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের চিন্তা ও সাধনাকে স্থায়ী ও কার্যকরী রূপ দিয়া বিশ্বের দরবারে স্বদেশ ও স্বজাতিকে চিরসম্মানিত করিয়াছেন, তাঁহারা সংখ্যায় খুব নগণ্য ছিলেন না ; আচার্য জগদীশচন্দ্র (১৮৫৮) হইতে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯)—মাঝখানে রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, বিবেকানন্দ, চিত্তরঞ্জন, অরবিন্দ প্রভৃতি নামের সমারোহ! পৃথিবীর যে কোনও দেশে যে কোনও জাতির মধ্যে এতগুলি কৃতীপুরুষ এত অল্পকালের ব্যবধানে অর্থাৎ প্রায় একসঙ্গে কদাচিৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রায় সব কয়টিই একে একে নির্বাপিত হইয়াছেন। বাঙালী জাতির সাম্প্রতিক মনীষা-দৈন্য ভয়াবহরূপে প্রকট করিয়া শুধু চারিজন চারিদিকপালের মত স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে স্ব স্ব মহিমায় শেষপর্যন্ত বিরাজমান ছিলেন ; ধর্ম ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অরবিন্দ, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রফুল্লচন্দ্র, শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ এবং পলিটিক্স ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সরোজিনী নাইডু। গত ২রা আষাঢ় (১৬ জুন) তারিখে চিত্তরঞ্জনের ঠিক তিরোধান-দিবসে কর্মী ও মনীষী প্রফুল্লচন্দ্র বিদায় লইলেন। বাকি যাঁহারা রহিলেন, তাঁহাদের সহিত বাঙালী জাতির কর্মের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ যোগ নাই—অর্থাৎ প্রফুল্লচন্দ্রের মৃত্যুতে বাংলা দেশের হৃদয়বরেণ্য সর্বজনমান্য শেষ মহদাশয় ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিল, বাঙালী সর্বশেষ নির্ভরযোগ্য আশ্রয় হারাইল।

প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন চমকপ্রদ হইলেও শিক্ষাপ্রদ, তাঁহার জীবন আদর্শ জীবন। বিদ্যাসাগরের পর এত বড় আদর্শ গৃহীজীবন আর দেখিতে পাই না। সৌভাগ্যের বিষয়, নিজের জীবনী তিনি স্বয়ং বিস্তৃতভাবে লিখিয়া গিয়াছেন ; তাহার জন্য আমাদিগকে সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠা এবং কর্তাভজা ব্যক্তিদের অলৌকিক গালগল্প হাতড়াইয়া ফিরিতে হইবে না। প্রায় সাতচল্লিশ বৎসর পূর্বে তদানীন্তন 'প্রদীপ'-সম্পাদক

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রফুল্লচন্দ্রের একটি চমৎকার সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনা করিয়া নিজের পত্রিকায় প্রকাশ করেন। অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্রের বয়স তখন মাত্র পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। মহাপুরুষের সেই প্রথম জীবনীটিও *Acharyya Ray Commemoration Volume* (Calcutta, 1932)-এ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। আচার্য রায়ের সপ্ততিবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে যে জয়ন্তী অনুষ্ঠান হয়, তাহারই উদ্যোক্তাগণ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্নের সভাপতিত্বে এই চমৎকার পুস্তকটি প্রকাশ করেন। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, আচার্য জগদীশচন্দ্র, হীরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, Dr. F. G. Donnan, Dr. M. O. Forster, Dr. Gilbert, J. Fowler, রায় বাহাদুর হীরালাল, ডাক্তার শিশিরকুমার মৈত্র, Dr. A. R. Normand, Dr. J. L. Simonsen প্রভৃতি সংক্ষেপে প্রফুল্লচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার ও কীর্তির পরিচয় দিয়াছেন। প্রফুল্লচন্দ্র যে কত বৃহৎ ও মহৎ ছিলেন, এই একটি মাত্র স্মৃতি-গ্রন্থে তাহার সাক্ষ্য রহিয়া গিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্রের রসায়ন-বিজ্ঞানঘটিত দান পৃথিবীর সর্বদেশের বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার লিখিত হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসের দ্বারা প্রাচীন ভারতের মহতী কীর্তি পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারিত ও স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু আমরা জানি, তিনি এই বিভাগে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন শুধু নিজের দানের দ্বারাই নয়; শিষ্যপ্রশিষ্য সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া বাংলা দেশে তথা ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-চর্চায় যে আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, বিজ্ঞানানুশীলনকে যে স্থায়ী মর্যাদা দিয়াছেন, তাহাই তাঁহার চরম কীর্তি হইয়া থাকিবে। ভারতবর্ষের আর কোনও বৈজ্ঞানিক নিজেকে এভাবে বিলুপ্ত করিয়া শিষ্যসম্প্রদায়ের কীর্তির মধ্যে বাঁচিতে চেষ্টা করেন নাই। প্রাচীন ভারতে ঋষি-গুরুর গোত্রে গৌরবান্বিত শিষ্যেরা যে ভাবে দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন, আচার্য রায়-গোত্রীয় বৈজ্ঞানিকেরা তেমনই আজ সারা ভারতবর্ষে খ্যাতি ও মহিমা অর্জনের দ্বারা গুরুকেই জয়যুক্ত করিতেছেন; ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চা পৃথিবীর দরবারে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ব্যবসায়ে বাঙালীকে প্রতিষ্ঠাদান করিবার জন্য প্রফুল্লচন্দ্রের সাধনা ও উদ্যম তাঁহার অন্য স্মরণীয় কীর্তি। বাঙালী আজ ঔষধের কারবার, বস্ত্রের কারবার, তৈল-ঘৃত-দুগ্ধের কারবার করিয়া জাতীয় সম্পদ যতটুকু বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছে, আচার্য রায়ের উৎসাহ ও উদ্দীপনা তাহার প্রায় সবটুকুরই মূলে। একমাত্র-চাকুরিজীবী পরান্নভোজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীকে ব্যবসায়ের পথ দেখাইয়া প্রফুল্লচন্দ্র একরূপ নবজীবন দান করিয়াছেন। আর্থিক ক্ষেত্রে বাঙালী যদি কোনও দিন স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে, প্রফুল্লচন্দ্রকে সেদিন তাহারা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতে বাধ্য হইবে। তাঁহার একার চেষ্টায় বাঙালী জাতির জীবন ও কর্মের আদর্শ যে অনেকখানি পরিবর্তিত হইয়াছে, ইতিহাস একদিন তাহার সাক্ষ্য দিবে।

আর্ত ও পীড়িতের সেবাকাজে তাঁহার নিজের অক্লান্ত চেষ্টা ও অযাচিত দান যদিও বা কোনদিন আমরা বিস্মৃত হই, এই কাজে বাঙালী তরুণ সম্প্রদায়ের সংগঠন-শক্তিকে উদ্রিক্ত করিয়া তিনি যেভাবে বারংবার নানা বিপদের মধ্যে দেশকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ইতিহাসের পাতা হইতে তাঁহার সে কীর্তি কোনও দিনই মুছিবে না। একমাত্র তাঁহারই আদর্শে ও চেষ্টায় আর্তসেবার কাজ একটা জাতীয় কাজে পরিণত হইয়াছে। বাঙালীর সেবাধর্মের মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্র চিরজীবিত থাকিবেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের স্বদেশবাৎসল্য ও স্বজাতিপ্রীতি তাঁহাকে চিরকাল সর্বসাধারণের বরণীয় ও আদরণীয় করিয়া রাখিবে। তিনি যখন বিজ্ঞানের ছাত্রহিসাবে এডিন্‌বরায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখনই *India before and after the Mutiny* পুস্তকে দেশের পরাধীনতা ও দুরবস্থার জন্য তাঁহার অন্তরজ্বালা প্রকট হইয়া উঠে। দেশকে স্বাধীন করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধীর ব্রতে সায় দিয়া তিনি খদ্দরবাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্বদেশী ও খদ্দর প্রচারে বিরত থাকেন নাই। বাঙালী জাতির মস্তিষ্কের অপব্যবহার দেখিয়া তিনি যৌবনকাল হইতেই মর্মাহত ছিলেন এবং ভারতবর্ষে বাঙালীকে প্রতিষ্ঠা দিবার জন্য পাগলের মত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার

সরল জীবন, অমায়িক ব্যবহার এবং অশনে বসনে অনাড়ম্বরতা তাঁহাকে উচ্চ নীচ সকলেরই আপনার করিয়াছিল। তাঁহার দেশহিতৈষিতা সকলেরই শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র বাঙালী জাতি আত্মীয়-বিয়োগের বেদনা অনুভব করিতেছে। সেই বেদনা আরও মর্মান্তিক হইয়া উঠিয়াছে তাঁহার অনুরূপ আর কেহ আশে-পাশে নাই বলিয়া। বাঙালী যদি কোনও দিন মানুষ হইয়া উঠে, সেদিন প্রফুল্লচন্দ্রের নিম্নলিখিত কথাগুলি স্মরণ রাখিয়াই তাঁহারা তাঁহাকে অন্তরের পূজা নিবেদন করিবে—

বাঙালী আজিও সচেতন হইল না। বার বার একই কথা বলিতে বলিতে আমার জিহ্বার জড়তা আসিল, দুঃখ-দুর্দ্দশার একই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমার চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হইল, আমার যৌবনের শক্তি বার্দ্ধক্যের জড়তায় বিলীন হইতে বসিল—বাঙালী কিন্তু জাগিল না। আমার মুখে একঘেয়ে নিন্দাবাক্য শুনিতে শুনিতে লোকে আমার প্রতি বীতরাগ হইয়াছে, বাঙালী-নিন্দুক বলিয়া আমার অখ্যাতি রটিয়াছে, নানা জনে নানা উপহাস-বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, আমি সঙ্কীর্ণমনা এমন কথাও যে দুই একজন না বলিয়াছে তাহা নয় তবু আমি দুর্ম্মুখের মত কথা বলিতে ছাড়ি নাই। সে কি বাঙালীকে ঘৃণা করি বলিয়া? আমি বাঙালী, সুজলা সুফলা বাংলা দেশকে আমি ভালবাসি। বাঙালী সবল হউক, সুস্থ হউক, আপনার পায়ে আপনি নির্ভর করিয়া দাঁড়াক, ইহাই আমি নিরন্তর কামনা করি। আমার এই আন্তরিক কামনাই আমাকে কটুভাষী করিয়াছে।

—

আমরা গতবারে বাংলা সাহিত্যে রুশ-আতিশয্য সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহাকে কম্যুনিজ্‌ম-বিরোধী আক্রমণ মনে করিয়া সাম্যবাদী নামে সাধারণ্যে পরিচিত একদল ঝানু সুবিধাবাদী আমাদিগকে বুর্জোয়াসম্মত নানা গালিগালাজ করিয়াছেন। সুবিধা-বাদীদের সুবিধাই এই যে, তাঁহাদের উক্তিতে যুক্তির বালাই না থাকিলেও চলে; গোটাকয়েক উপমা এবং খানকয়েক অনুপ্রাস প্রয়োগ করিয়া ইহারা সে-যুগের হাফ-আখড়াই-কবিদের মত জনসাধারণের চিত্ত জয় করিতে চান। বদজোবানের সঙ্গে ঢাকের বাদ্যির চাট মিশাইয়া already-মাতালদের মত্ততা আনিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। বিলাতী কোম্পানির মারফৎ সাম্রাজ্যবাদীদের মাসিক ঘুষ খাইয়া যাহাদিগকে জীবিকা নির্বাহ করিতে হয়, সাম্যবাদের মন্ত্র যে

তাহাদের মুখে মানায় না, একদিন সত্যকারের সাম্যবাদীরা তাহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন—এ বিশ্বাস আমাদের আছে। দেশের লাখো লাখো দরিদ্র যখন অন্নাভাবে মৃত্যু বরণ করে তখন প্রত্যহ সন্ধ্যায় হোটেলে মদের পাত্র হাতে মত্ততা-বিলাস করিতে যাহারা লজ্জিত হয় না, তাহারা যতই কার্লমার্ক্স আওড়াক আর যতই স্টালিনের জীবনী লিখুক, আসলে তাহারা যে সেই পুরাতন মা-কালীর সেবাইৎই আছে তাহাতে সংশয় করিবার মত দুর্বুদ্ধি যেন সাম্যবাদীদের না হয়। কপালের সিঁদুরের ফোঁটাটা লাঙ্গল-কাস্তের রূপ লইলেই কিছু দোষহীন হইয়া যায় না।

* * *

আমাদের গত বারের একটি উদ্ধৃতিতে সত্যকারের কম্যুনিস্ট বন্ধুরাও বিরক্ত হইয়াছেন। কিছুকাল হইতেই একটা ব্যাপার তাঁহাদের সম্বন্ধে ইহাই লক্ষ্য করিতেছি যে, তাঁহারা প্রতিবাদে অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন, যুক্তি দিয়া যুক্তি খণ্ডন করিবার ধৈর্য তাঁহারা ধরিতে চান না। পৃথিবীর একজন প্রসিদ্ধ চিন্তানায়ক যে বলিয়াছেন, "Bolshevism combines the characteristic of the French Revolution with those of the rise of Islam"—বাংলা দেশের বলশেভিকবাদ সম্বন্ধে তাহা খুব বেশি করিয়াই খাটে দেখিতেছি। তিনি বলিতেছেন—

But the method by which they aim at establishing Communism is a pioneer method, rough and dangerous, too heroic to count the cost of the opposition it arouses. I do not believe that by this method a stable or desirable form of Communism can be established. Three issues seem to me possible from the present situation. The first is the ultimate defeat of Bolshevism by the forces of capitalism. The second is the victory of the Bolshevists accompanied by a complete loss of their ideals and a regime of Napoleonic imperialism. The third is a prolonged world-war, in which civilazation will go under, and all its manifestations (including Communism) will be forgotten....

There is another aspect of Bolshevism from which I differ more fundamentally. Bolshevism is not merely a political doctrine; it is also a religion, with elaborate dogmas and inspired scriptures. When Lenin wishes to prove some proposition, he does so, if possible, by quoting texts from Marx and Engels. A full-fledged Communist is not merely a man who believes that land and capital should be held in common, and their produce distributed as nearly equally as possible. He is a man who entertains a number of elaborate and dogmatic beliefs—such as philosophic materialism, for example—which may be

true, but are not, to a scientific temper, capable of being known to be true with any certainty. This habit, of militant certainty about objectively doubtful matters, is one from which, since the Renaissance, the world has been gradually emerging, into that temper of constructive and fruitful scepticism which constitutes the scientific outlook. I believe the scientific outlook to be immeasurably important to the human race. If a more just economic system were only attainable by closing men's minds against free inquiry, and plunging them back into the intellectual prison of the middle ages, I should consider the price too high. It cannot be denied that, over any short period of time, dogmatic belief is a help in fighting. If all Communists become religious fanatics, while supporters of capitalism retain a sceptical temper, it may be assumed that the Communists will win, while in the contrary case the capitalists would win.

—

আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে "সত্যেন্দ্র-স্মৃতি" প্রসঙ্গে শ্রীমমতা ঘোষ লিখিয়াছেন—

আষাঢ় মাস হ'ল। কবি সত্যেন্দ্রনাথকে মনে পড়ে যায় বৃষ্টির আওয়াজে।

এত বড় মর্মান্তিক মিথ্যা এ বাজারে আর কেহই লেখেন নাই। আকাশে এখন পর্যন্ত (আজ ৬ই আষাঢ়) মেঘের ঘনঘটা নাই, একে ফোঁটা বৃষ্টির নামগন্ধ নাই, বাংলা দেশের মাটি গুড আর্থের মত চড় চড় করিয়া ফাটিতেছে। এই অবস্থায় কল্পিত বৃষ্টির আওয়াজে সত্যেন্দ্রনাথকে যিনি মনে করিতে পারেন, তিনি কবি সন্দেহ নাই, কিন্তু সত্যবাদী নহেন। আমাদের তো ভয়ই হইতেছে কর্তৃপক্ষ যেভাবে ওয়েদার-রিপোর্ট কণ্ট্রোল করিতে চাহিতেছেন, তাহাতে কণ্ট্রোলিত ঔষধাদির মূল্যের মত তাপমানযন্ত্রে উত্তাপ হুহু করিয়া চড়িতেছে এবং হরলিক্সের মত বৃষ্টি একদম উধাও হইয়াছে। এখন এই সম্পর্কে একজন অফিসার বসানোর অপেক্ষা মাত্র।

—

'ভারতবর্ষ' আষাঢ়ের প্রথম প্রবন্ধ এস-ওয়াজেদ আলির "বাঙালী না মুসলমান" সকল বাঙালীকে পড়িয়া দেখিতে বলি। ধর্মের দাবির তুলনায় মাটির দাবিও যে তুচ্ছ নয়, ইসলাম-ধর্মশাস্ত্রের নজিরেই ওয়াজেদ আলি সাহেব তাহা বলিতে পারিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার এই কথাগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—

বাঙলা সাহিত্যে যে মুসলিম কৃষ্টির সম্যক বিকাশ হয়নি তার জন্য দায়ী হিন্দুরা নন, তার জন্য প্রধানতঃ দায়ী হচ্ছেন মুসলমানেরা। বাঙালী মুসলমানের মধ্যে সাহিত্য-বোধ এখনও সম্যক ভাবে জাগেনি। বাঙালী মুসলমান বই কেনেন না, বই

পড়েন না। উচ্চশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা বাঙলা লেখেন না। এরূপ অবস্থায় মুসলমানের কৃষ্টি, মুসলমানের প্রকাশ-ভঙ্গী সাহিত্যে কি করে প্রবেশ করবে? বাঙলা সাহিত্যে মুসলমানের প্রভাবের অভাবের প্রধান কারণ হচ্ছে—বাঙালী মুসলমানের অবহেলা এবং ঔদাসীন্য। তা ছাড়া গোঁড়ামিও আছে। রাজনীতিতে জোর করে একজন প্রতিভাহীন লোককে ভোটের সাহায্যে মন্ত্রীর পদে কিম্বা অন্য কোন উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করা চলে। সাহিত্যে কিন্তু বঙ্কিম কিম্বা রবীন্দ্রনাথের স্থান পেতে হলে, তাঁদের মত দেশের সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করতে হলে, স্বভাবদত্ত প্রতিভার দরকার, অমানুষিক সাধনার দরকার। হুজুক করে আর দল পাকিয়ে এ গৌরব লাভ করা যায় না।

—

রুশ-সাহিত্যের বর্ণনায় বাঙালী লেখকেরা যে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিতেছেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত প্রশস্তিটুকুতেই প্রমাণিত হইবে। লেখক বাক্যের লাভাস্রোত উদ্গার করিয়াছেন, তবু যেন আসল কথাটি বলা হয় নাই।—

বিশ্ব-সাহিত্যের মধ্যে গোর্কির লেখায় অমন সূক্ষ্ম অলংকারিক পারিপাট্য, অমন মাখমের মতো দরদ, আবার ঋজু ভংগি,—ঘন সন্তমসে [?] যেন স্বণি [?] তুলি বীর-ভংগিতে সমুদ্যত.—কোনো বাধা গ্রাহ্য সে করে না, কারুর বিধি-নিষেধে কর্ণপাত করবার মতো অবসর তার নেই, সে ঝড়ের মতো উদ্দাম, প্রপাতের মতো দুর্বার, দুর্দান্ত, আবার একই সাথে নির্ঝরিণীর মতো কোমল, স্বচ্ছ।

রাস্তা নোংরা করিলে পাঁচ আইন আছে, অথচ কাগজের এই নিদারুণ অভাবের দিনে বেপরোয়া সাদা কাগজ নোংরা করিয়া একদল ব্যক্তি যে পার পাইয়া যাইতেছে, ইহাতে সরকার বাহাদুরকে কি বলিব?

—

কাজী মোহাম্মদ ইদ্‌রিস জ্যৈষ্ঠের 'মাসিক মোহাম্মদী'তে "জাতীয় সাহিত্যের কথা" বলিতে গিয়া একটা বজ্জাতীয় উক্তি করিয়া ফেলিয়াছেন—

হিন্দুসাহিত্যে দেবর-বৌদির চিত্রে দেবর শব্দের প্রথমার্দ্ধের [দে] চাইতে দ্বিতীয়ার্দ্ধের [বর] লীলা বেশী প্রকট বলে মুসলিম সাহিত্যিকের লেখায় অনুরূপ লীলা চিত্রিত হলে হিন্দু সুধীসমাজ তাকে সাহিত্যের মর্য্যাদা হয়তো দেবেন। কিন্তু হিন্দু-সমাজে দেবর-বৌদির সম্পর্কে লোভনীয় রসের প্রেরণার যতই উৎস থাক না কেন, মুসলিম সমাজে ওঁদের সম্পর্কে অনুরূপ রসের কোনই অবকাশ নাই।

এই অশোভন উক্তির উপর মন্তব্য করিতে গেলে অনেক পবিত্র সম্পর্ক ধরিয়াই টানাটানি করিতে হইবে, তাহার প্রয়োজন নাই। লেখককে শুধু এই কথাটাই স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, জাতীয় সাহিত্যের কথা ইহা নয়।

—

বুদ্ধদেব বসুর মৌলিকতার ক্ষেত্রে কোনও দুষ্টগ্রহের বক্রী দৃষ্টি বরাবরই পড়িয়া আছে; তিনি কবিতা-উপন্যাস লেখেন তাহা অনুবাদ বলিয়া প্রমাণিত হয়, কাব্য-উপন্যাস-গল্পের নামকরণ করেন সেগুলি রবীন্দ্রনাথের কবিতার পংক্তিবিশেষ বলিয়া ধরা পড়ে। তিনি রাগ করিয়া একেবারে চানাচুর-বাদামভাজা সিরিজের "এক পয়সায় একটি" কবিতা বাহির করিলেন। এখন দেখিতেছি, মৃত জেম্‌স জয়েস তাঁহার *Poems Penny Each*-এ সে মৌলিকতাও আগে হইতে মারিয়া বসিয়া আছেন। আমরা দুঃখিত।

—

বীর সাভারকর বৃদ্ধি পাইতে পাইতে মহাবীর সাভারকর হইয়া বসিয়াছেন, সব ব্যাপারেই দাঁতমুখ খিঁচাইতেছেন। কস্তুরীবাঈ গান্ধীর স্মৃতি-ভাণ্ডারে সকলকে চাঁদা দিতে নিষেধ করাটা এই অকারণ মুখ খিঁচানির একটি দৃষ্টান্ত মাত্র।

—

পাঞ্জাব ধর্মের উপরে জাতীয়তাকে স্থান দিয়া ভারতবর্ষের বৃহত্তম সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করিতেছেন। মুসলিম লীগের সহিত সংঘর্ষে পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রীর দৃঢ়তা এবং মুসলমান সদস্যদের সমর্থন লাভ একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। অনুরূপ ঘটনা হইতেছে হিন্দু জাঠ মন্ত্রী (লোকাল সেল্‌ফ্ গবর্মেণ্ট) সার্ ছোটুরামকে হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে জাঠসম্প্রদায় কর্তৃক "রহবরে আজম" উপাধি দান। "রহবরে আজম" ও "কায়েদে আজম" একই কথা, অর্থ—যিনি পথ দেখাইয়া লইয়া যান অর্থাৎ নেতা।

—

গত ১লা চৈত্র 'তত্ত্ব-কৌমুদী' পত্রিকার ১৮৪ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত যোগানন্দ দাস লিখিয়াছেন—

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের একবালীন সম্পাদক ('সেক্রেটারি') পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

হইলে আপত্তির কোনই কারণ ছিল না, কিন্তু সত্যের খাতিরে প্রতিবাদ করিয়া বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় কখনও ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন না। তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক ছিলেন। ১৭৮১ শকের বৈশাখ মাস পর্যন্ত তিনি ওই পদে ছিলেন, তাহার পর সভা উঠিয়া যায়। রাজনারায়ণ বসু এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

...এই সময়ে অর্থাভাবে তত্ত্ববোধিনী সভাও অনেক ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছিল। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শেষ পর্যন্ত তাহার সম্পাদক ছিলেন। তিনি দেবেন্দ্রবাবুর পরামর্শক্রমে অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে ১৭৮১ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে তত্ত্ববোধিনী সভার অবলম্বিত কার্য্য ও তাহার সমুদয় সম্পত্তি ব্রাহ্ম সমাজে অর্পণ করিয়া তাহার শরীরে তত্ত্ববোধিনী সভাকে লীন করিয়া দিলেন।

এই সমাজের প্রথম সম্পাদক হন—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন।

সকল বাধা সকল অসুবিধা সত্ত্বেও পুস্তক-প্রকাশের কাজ অদম্য গতিতে চলিয়াছে, মসীজীবী বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ এক্ষেত্রে কিছুতেই হার মানিবে না বলিয়া দৃঢ়সঙ্কল্প। এই বাজারে এ এক অভাবনীয় ব্যাপার! গুড্, ব্যাড্, ইণ্ডিফারেণ্ট সকল জাতীয় পুস্তকই প্রত্যহ প্রকাশিত হইয়া প্রমাণ করিতেছে যে, আঁটন বজ্রাদপি দৃঢ় হইলেও গেরো ফস্কাইতে পারে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে ৪২নং সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা 'গোবিন্দচন্দ্র রায় দীনেশচরণ বসু' বাহির হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রবাবু অনেক যত্নে পূর্ববঙ্গের এই দুই বিস্মৃত কবিকে সকলের গোচরে আনিয়াছেন। "কতকাল পরে বল ভারতরে" গানের লেখকের পরিচয় পাইয়া অনেকে আনন্দিত হইবেন। দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলীর কাজ দ্রুত সমাপ্তির দিকে চলিয়াছে, এই মাসে 'দ্বাদশ কবিতা' ও 'বিবিধ' খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী-সম্পাদিত 'কালিকামঙ্গলে'র ২য় সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণে 'সঞ্চয়িতা' দুই খণ্ড রবীন্দ্রনাথের কৈশোর হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুর পরেও প্রকাশিত যাবতীয় কবিতা ও কাব্য হইতে প্রথম সম্পূর্ণ সঙ্কলন। উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, "আফ্রিকা" পর্যন্ত নির্বাচন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কৃত। সর্বশেষে সংযোজিত "গ্রন্থ-পরিচয়" অংশ অতিশয় মূল্যবান। ইহাতে এমন অনেক সংবাদ আছে, যাহা কৌতূহলী পাঠকের কাজে লাগিবে। শ্রীরাণী চন্দ লিখিত 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথে'র দ্বিতীয় সংস্করণও প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা অনেক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, বইটি এবারে সত্যসত্যই সুসম্পাদিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ-গ্রন্থমালায় মাসাধিক কালের মধ্যেই প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা', অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'জমির মালিক', শান্তিপ্রিয় বসুর 'বাংলার চাষী', শচীন সেনের 'বাংলার রায়ত ও জমিদার' এবং অনাথনাথ বসুর 'আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা' প্রকাশকদের নিষ্ঠা ও তৎপরতার পরিচায়ক।

সুশীল গুপ্ত কর্তৃক ইংরেজী ফরাসী (ইংরেজী অনুবাদে) প্রভৃতি ভাষার বহু প্রসিদ্ধ বিশ্ববিশ্রুত পুস্তকের সচিত্র মনোরম প্রকাশ বর্তমান-কালে বিস্ময়কর। অধিকাংশ পুস্তকের বিষয়বস্তু কিঞ্চিৎ আদিরসপ্রধান হইলেও এই সকল পুস্তকের গল্প বলার ভঙ্গী অপরূপ। অবশ্য *Pastime Tales of a French Cavalier* ও *Three Don Juans*-এর সঙ্গে *Frankenstein* ও ফিট্‌জেরাল্ডের *Rubaiyat of Omar Khayyam*-ও আছে। Sex Psychology সম্বন্ধে যাঁহাদের ঔৎসুক্য আছে, তাঁহারা *Kama-Sutra of Vatsyayana, Urban Morals in Ancient India* ও *The Art of Love in the Orient* প্রভৃতি পুস্তক হইতে যথেষ্ট রসদ সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

জেনারাল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড পরিমল গোস্বামী লিখিত নাটিকা-সংগ্রহ 'ঘুঘু' এবং তাঁহারই সম্পাদিত মন্বন্তরী গল্পসংগ্রহ 'মহামন্বন্তর' প্রকাশ করিয়াছেন। গোস্বামী মহাশয় আমাদের মনকে একসঙ্গে লঘুহাস্যে এবং গভীর বেদনায় ভরিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া যুগোপযোগী সাম্যবাদের মর্যাদা রাখিয়াছেন।

বেঙ্গল পাবলিশার্স বিনয় ঘোষের 'শ্রীবৎসের নানাপ্রসঙ্গ'

ছাপিয়াছেন। বইখানি সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি পলিটিক্স নানাপ্রসঙ্গে লেখা, খুব জোরালো লেখা। নন্দগোপাল সেনগুপ্তের 'কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথে' মুরুব্বিয়ানা একটু অধিক থাকিলেও সুখপাঠ্য। পরিমল গোস্বামীর 'আষাঢ়ে দেশে' এবং নীহার গুপ্তের 'অদৃশ্য শত্রু' ছেলে-মেয়েদের আনন্দের খোরাক জোগাইবে।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক উপন্যাস 'উপনিবেশে'র প্রথম পর্ব এবং দিলীপকুমার রায়ের নাটক 'শাদা-কালো' প্রকাশ করিয়াছেন। 'উপনিবেশ' ইতিমধ্যেই লেখকের ক্ষমতা সম্বন্ধে পাঠককে নিঃসংশয় ও আশান্বিত করিয়াছে। দিলীপবাবুর নাটকটিতে অনেক গভীর অনুভূতির কথা আছে, অথচ পরিবেশ বাস্তবতাবর্জিত নয়। কথা অত্যন্ত বেশি, সুতরাং অভিনয়ের সম্ভাবনা কম।

দি বুক এম্পোরিয়াম লিঃ কর্তৃক প্রকাশিত প্রিয়রঞ্জন সেনের 'বাংলা সাহিত্যের খসড়ায়' সংক্ষেপে বাংলা সাহিত্যের কথা গোড়া হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত চমৎকার ভঙ্গীতে বলা হইয়াছে। খসড়া নামটি সার্থক।

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে শুভব্রত রায় চৌধুরীর দ্বিতীয় নাটক 'উদ্বোধন' প্রকাশিত হইয়াছে। এই নাটকটিতে যে আদর্শের জয় ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহা অনুসৃত হইলে বাংলা দেশে নবযুগের উদ্বোধন হইবে সন্দেহ নাই। ভাবাবেগ অধিক, তথাপি নাটকীয়ত্ব ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

অভিযান সিরিজের দ্বিতীয় গ্রন্থ অখিল নিয়োগীর 'গ্রহে-উপগ্রহে' বাংলা দেশের কিশোর-কিশোরীদের যথেষ্ট আনন্দ দিবে।

আরতি এজেন্সি গজেন্দ্রকুমার মিত্রের দাম্পত্যপ্রেমমূলক মিঠা গল্প-সংগ্রহ 'নববধূ'কে চমৎকার বহির্বাস পরাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

মিত্রালয় হইতে প্রকাশিত ভূপেন্দ্রনাথ বসু-অনূদিত টুর্গেনিভের 'স্মোক' অনুবাদ-সাহিত্যে নূতন সংযোজন।

আনন্দময়ী বুক ডিপোর রেজাউল করীম লিখিত 'বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ' পুস্তকখানি কৃতজ্ঞতার সহিত পাঠ করিলাম। লেখকের সত্যনিষ্ঠা তাঁহাকে দুঃসাহসী করিয়াছে। ভবিষ্যতে যদি বাংলা দেশে কখনও হিন্দু-মুসলমানের সৌহার্দ্য আবার প্রতিষ্ঠিত হয়, সেদিন

হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই এই পুস্তকখানির জন্য রেজাউল করীম সাহেবকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিবে। সার্ যদুনাথ সরকারের দীর্ঘ ভূমিকা বইটির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত (জে. এন. গুপ্ত, আই. সি. এস) প্রণীত 'স্মৃতি ও চিন্তা' পুস্তকখানি এ যুগের সকল বাঙালীকে পড়িয়া দেখিতে বলি। লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের প্রসঙ্গ তাঁহার আদর্শবোধ ও সহৃদয়তাগুণে সর্বসাধারণের আদরের জিনিস হইয়া উঠিয়াছে। পড়িয়া নিজের সম্বন্ধেও চিন্তা জাগে।

গুরুপদ হালদারের 'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস' আমাদের আয়ত্তের অতীত হইলেও গ্রন্থটির বিরাটত্বে মুগ্ধ হইয়াছি।

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্তের নাটিকাসংগ্রহ 'মীরপুরের মেলা' ও 'বিচিত্র ভানু' সুলিখিত।

ধীরেন্দ্রনাথ মল্লিকের কবিতাগ্রন্থ 'দূরবীক্ষণ' ও 'নাগরী'তে তরুণ লেখকের শক্তির পরিচয় স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে।

আবুবকরের 'ভোরের আজানে'র বিষয়বস্তু প্রধানত ইসলামীয় হইলেও প্রাণের প্রাচুর্যে সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিবে।

"ছোটদের আসর"-গ্রন্থমালার প্রথম বই নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'জীবনের জয়গান'। এই আসরে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ যাদুকর। 'জীবনের জয়গানে' যাদু অক্ষুণ্ণ আছে।

সাহিত্য-গ্রন্থিকা বাংলা সাহিত্যে নূতন উদ্যম। প্রথম গ্রন্থ 'বাংলার কবিগান'—বিস্মৃত লোকসাহিত্যের পরিচয়।

অসিতকুমার হালদারের 'মেঘদূত' কাব্যানুবাদ—আসল সচিত্র পুস্তকের খসড়া মাত্র। কবি-শিল্পীকে একত্র দেখিবার জন্য আমাদের আগ্রহ জাগিতেছে।

আমেরিকান রেড ক্রশ কর্তৃক প্রকাশিত কলিকাতা, আগ্রা, দিল্লী, করাচী ও বোম্বাইয়ের গাইড-বইটি পরিব্রাজকদের বহু প্রয়োজন সাধন করিবে।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শনিবারের চিঠি
১৬শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৫১

বাংলার নবযুগ ও স্বামী বিবেকানন্দ

৭

শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে দীক্ষালাভ করিবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার স্বভাবের ভিতরকার এই বিরোধকে স্বীকার করিতে না চাহিলেও অস্বীকার করিতেও পারেন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম হইতেই তাঁহার চরিত্রের এই অসাধারণত্ব লক্ষ্য করিয়াছিলেন—সে অসাধারণত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাঁহার সেই পৌরুষ-বীর্য্যে; তাঁহার অন্তরের সিংহমূর্ত্তির সেই স্ফুরিত কেশরদাম গুরুকে চমকিত ও চমৎকৃত করিয়াছিল। যে-আত্মার সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ", ইহা সেই আত্মার সেই পৌরুষ, তাই ইহা মৃত্যুঞ্জয় মায়াজয়ীও বটে। কিন্তু মায়াকে জয় করিতে হইলে তাহাকে হনন করিতে হয় না—সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া আত্মার ইষ্টসাধন করা যায়। যে-প্রেম সেই মায়ার—সেই ছলনাময়ী প্রকৃতির—বন্ধনপাশ, তাহাই দুর্ব্বলতা, তাহাই মোহ; সে-প্রেম দুঃখকে জয় না করিয়া তাহার অধীন হয় বলিয়াই দুর্ব্বল আত্মার পক্ষে পলায়ন অথবা আত্মহত্যা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। এই দুঃখকে—কপিল-বুদ্ধের মত—কোন অর্থেই 'অসৎ' বলা যাইবে না; এই দুঃখচেতনা হইতেই অস্তিত্বের চেতনা—জীবন-চেতনা; এই দুঃখ হইতেই নর-জীবনের যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ সেই প্রেমের জন্ম হয়। জীবন ও জগৎ যদি দুঃখহেতু বলিয়া 'অসৎ' হয়—সেও দুর্ব্বল আত্মার মোহ, একরূপ অবিদ্যাজনিত ভ্রান্তি; সেরূপ অদ্বৈত-জ্ঞানের অভিমান আত্মার আত্ম-প্রবঞ্চনামাত্র। বরং ওই জগৎকে—ওই দুঃখকে সেই এক 'সৎ'-বস্তুর অন্তর্গত করিয়া দেখিতে পারিলেই প্রকৃত অদ্বৈত-সিদ্ধি সম্ভব। বিষ যদি কোথাও থাকে, তবে তাহার সঙ্গে বিষঘ্ন ঔষধও রহিয়াছে; শুধু তাহাই নয়, যে প্রেমের শক্তি দুঃখকে নির্ব্বিষ করিয়া তোলে তাহারও জন্ম হয় ওই দুঃখ হইতে; ওই প্রেম পূর্ণজ্ঞানেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, অতএব উহাও 'সৎ'—অসৎ হইতে সৎ-এর উৎপত্তি হইতে পারে না। দুঃখকে

আমরা যে দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি—সে সম্বন্ধে আমাদের যে সংস্কার—আমাদের অজ্ঞান ও অশক্তিই তাহার কারণ।

গীতা বলিয়াছেন—"উদ্ধরেদাত্মানাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ", আত্মার দ্বারাই আত্মাকে তুলিয়া ধরিবে, আত্মাকে অবসন্ন হইতে দিবে না; "আত্মৈবহ্যাত্মনো বন্ধু রাত্মৈবরিপুরাত্মনঃ"—আত্মাই আত্মার বন্ধু, আবার আত্মাই আত্মার শত্রু। ইহার অর্থ, আত্মার মোহই সকল ভয় ও সকল অশক্তির মূল—মোহমুক্ত আত্মার ভয় কি? তাহার মত শক্তিমান কে? সে অবস্থায়, পারমার্থিক হিসাবে জগৎ যাহাই হউক—ব্যবহারিক হিসাবে তাহা সত্য হইলেও ক্ষতি কি? তখন 'আমি'ই একমাত্র সত্য বলিয়া আর সকলই মিথ্যা নয়; বরং সেই 'আমাতে'ই সকলে অবস্থান করিতেছে—ওই 'বহু'ও আমরই 'আমি', এই জ্ঞান দৃঢ় হইয়া থাকে। সেই আত্মজ্ঞানে যখন বুঝি, আমি কে—আমিই বিরাট ও বিশ্বম্ভর, তখন আমার যে আত্মস্ফূর্ত্তি হয়, তাহা ক্ষুদ্র-আমির আত্মম্ভরিতা নয়—আত্মবিস্ফারের আনন্দ; এই আনন্দময় আত্মবিস্ফারের অনুভূতিই জগৎ-অনুভূতি। আমি 'এক'ও বটে, আমি 'অনেক'ও বটে—আমার বিভূতির কি সীমা আছে? দ্বৈত ও অদ্বৈত—দুই তত্ত্বই এক; যেখানে বিরোধ-বোধ আছে সেখানে আত্মারই আত্মজ্ঞানের অভাব—তাহাই মোহ, তাহাই অবিদ্যা। অতএব জগৎকে অস্বীকার করিবার যে জ্ঞান-বিজৃম্ভিত মনোভাব তাহাও অজ্ঞান আত্মার আত্ম-সঙ্কোচ। অদ্বৈত হইতে দ্বৈতে—অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে জগতে, আত্মার এই গতায়াত আত্মারই "যোগমৈশ্বরম্"। ইহা যদি দুঃখপ্রসূ হয়, তবে দুঃখও এই হিসাবে সত্য যে, তাহা আত্মার সেই অনন্ত শক্তিকে প্রেমরূপে আস্বাদন করিবার একটি সহায়। আমারই এতগুলি 'আমি' দুঃখ পাইতেছে—নিজের প্রতি নিজেরই এই অনুকম্পা—ইহাই সেই 'রস' যাহা অভিনয়ের দ্বারা আস্বাদন করিবার জন্য আত্মা এই জগৎরূপে ব্যক্ত হইয়াছেন। এ অভিনয় অনন্তকাল চলিয়াছে ও চলিবে। এ দুঃখ আমারই দুঃখ—সর্ব্ব-শক্তিমান, নিত্যমুক্ত স্বাধীন যে-'আমি' সেই 'আমি'র দুঃখ, তাই সে দুঃখ পাপীর দুঃখ নয়—সেই দুঃখীও দয়ার পাত্র নয়। এই দুঃখকে অস্বীকার করিয়াও স্বীকার করিতে হয়—নতুবা, যে নিত্যমুক্ত তাহার

আবার দুঃখ কি? ওই প্রেমের কারণেই 'আমি'গুলির দুঃখ অসহ্য হইয়া উঠে, সেই দুঃখশৃঙ্খল মোচন করিবার জন্য যে অধীর আবেগ, তাহার মূলে আছে যেমন আত্মপ্রেম, তেমনই তাহা মানব-প্রেমও বটে। আত্মার এই শক্তি, তথা আনন্দ ও প্রেমের তত্ত্ব অতি প্রাচীন ভারতীয় তত্ত্বই বটে—গীতার তত্ত্বও মূলত ইহাই; কেবল এই ভাষ্য নূতন,—শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যদৃষ্টিতে ও বিবেকানন্দের জীবনে, সেই ব্রহ্মসূত্রের—সেই আত্মোপনিষদের—এক অভিনব মানব-ভাষ্য প্রণীত হইয়াছে; নবযুগের নবধর্ম্মের অন্তর্গত সেই পাশ্চাত্য Humanism-কে একটি অতি গভীর তত্ত্বের আলোকে উজ্জ্বল ও পরিশুদ্ধ করা হইয়াছে।

ত্যাগী সন্ন্যাসীও যে কি কারণে কিরূপ প্রেমিক হইতে পারে আমার সাধ্যমত তাহার আলোচনা একটু বিস্তৃতভাবেই করিলাম। এই প্রেম যে জ্ঞানের অন্তরায় নয়; আত্মার আত্মজ্ঞানের পৌরুষ ও এই প্রেম যে এক বস্তু; এই সন্ন্যাসও যে প্রাচীন বা মধ্যযুগের সেই সন্ন্যাস নয়—ইহাতে জগৎ-সত্যকে অস্বীকার করিবার প্রয়োজনও যেমন নাই, তেমনই আত্মার বন্ধন-ভয়ও নাই;—বিবেকানন্দের চরিত্র ও জীবন তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সেই অদ্বৈতজ্ঞানী, আত্মৈকবিশ্বাসী, কর্ম্ম-বীর্য্যাবতার সন্ন্যাসী আপন-মনুষ্যহৃদয়যোগে যে বন্ধনকে স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রাণের পূর্ণস্ফূর্ত্তি ছিল, মনের মোহ ছিল না। কিন্তু জ্ঞানের সহিত প্রেমের এই যোগ-সাধন, অথবা জ্ঞানের অন্তস্তলে এই প্রেম-বীজের আবিষ্কার যে দৃষ্টির দ্বারা হইয়াছিল, তাহাকে সেই দৃষ্টির সৃষ্টি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে কাহাকেও গুরু বলিয়া স্বীকার করিবে না—কখনও করিত কি না সন্দেহ, সে সহসা এমন এক প্রেমকে শরীরীরূপে প্রত্যক্ষ করিল—যাহা জ্ঞানেরই যেন বিগলিত রূপ! সে-রূপ দেখিয়া তাহার চিত্তে ব্রহ্ম ও মানবের ভেদজ্ঞান আর রহিল না, জ্ঞান ও প্রেমের এই অদ্বৈত-সিদ্ধি তাহাকে চিরজীবনের মত জয় করিয়া লইল। এমনই করিয়া বাংলার এক অখ্যাত পল্লীর নিভৃত মন্দির-প্রাঙ্গণে, ভারতবর্ষের সেই চিরাগত সাধনাই—এখনও যাহা অনুগত, তাহাকে বরণ করিয়া লইল; সেই এক গঙ্গোত্তরী-ধারায় জাহ্নবী-তীরে সমগ্র মানব-জগতের জন্য এক নূতন বারাণসীর প্রতিষ্ঠা হইল।

৮

বিবেকানন্দের সেই দীক্ষালাভ ঠিক কোন্ ক্ষণে কি উপায়ে হইয়াছিল সে রহস্য চিরদিন আমাদের অজ্ঞাত হইয়াই থাকিবে। তিনি গুরুর অপর কোন্ মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন যাহার ফলে তাঁহার সারাজীবন শান্তিময় ধ্যানের পরিবর্ত্তে একটা অশান্ত কর্ম্ম-ব্যাকুলতায় নিঃশেষ হইয়াছিল,—সে কথা তিনি নিজেও প্রকাশ করেন নাই, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "It is a secret, that will die with me" অর্থাৎ "সে কথা আমি ভিন্ন আর কেহ জানিবে না।" সেই ধীর, শান্ত, সহাস্য, ক্ষণে-ক্ষণে সমাধিস্থ, ভাববিহ্বল, আত্মানন্দী পুরুষের সেই যে পরমহংস-রূপ আর সকলে প্রত্যক্ষ করিত, তাহার অন্তরালে কোন্ অপর মূর্ত্তি কূটস্থভাবে বিদ্যমান ছিল? সেই বাহ্যিক প্রশান্তি ও পূর্ণ স্থিরতার মধ্যেই কি প্রচণ্ড গতিবেগ লুক্কায়িত ছিল, যাহার একটুকু স্পর্শে বিবেকানন্দের সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব পরাস্ত হইয়াছিল—অন্তরের শান্তিপিপাসার উপরে বাহিরের সংগ্রাম-বাসনা জয়ী হইয়াছিল? তাঁহার জীবনে যাহা প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা যে সেই গুরুদীক্ষার ফল, তাহাতে সন্দেহ করিবার উপায় নাই; গুরুর যে দিকটি লোকচক্ষুর অগোচর ছিল, সেই দিকটি তাঁহার মধ্য দিয়াই উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সেই দিক যে কিরূপ, তাহা বিবেকানন্দ হইতেই আমরা জানি; কেবল এই সংশয় কিছুতেই ঘোচে না যে—সেই দিক কি সত্যই দক্ষিণেশ্বরের সেই কোমল-দেহ ও কোমলপ্রাণ, সংসারভীরু, বিবিক্তসেবী, জগৎব্যাপারে অনভিজ্ঞ, উদাসীন, নির্লিপ্ত, ভাবনিমগ্ন পুরুষেরই অপর দিক? তাঁহার যে মূর্ত্তি বাহিরে প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা সেই 'শান্তং শিবং অদ্বৈতম্'; আর এ মূর্ত্তি শক্তির প্রকট মূর্ত্তি, এ মূর্ত্তি আর কেহ দেখে নাই, বিবেকানন্দই দেখিয়াছিলেন। তিনি যে-শিবের আদর্শকে বিশুদ্ধ অদ্বৈত-তত্ত্বরূপে বরণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, পরমহংস-দেবের মধ্যে তিনি সেই শিবেরই অপর রূপ দেখিয়া—দ্বৈতাদ্বৈতের অভেদ প্রত্যক্ষ করিয়া—সর্ব্বসংশয়মুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যে তত্ত্বের মূর্ত্ত বিগ্রহ, সেই তত্ত্বই জগৎকে—সৃষ্টিকে—একটি নূতন অর্থে যেন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, মানবজীবনকে একটা নূতন মহিমা

দান করিয়াছে। সেই তত্ত্বের দার্শনিক সমস্যা বর্ত্তমান প্রসঙ্গের বহির্ভূত। তথাপি আমার নিজের মত করিয়া ওই তত্ত্বের একটু ব্যাখ্যা করিব।

জীবনকে তথা সৃষ্টিকে 'সৎ' বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে, সৎ-অসৎ, নিত্য ও অনিত্য, এক ও অনেক, স্থিতি ও গতি, ধ্রুব ও অধ্রুব প্রভৃতি 'দ্বন্দ্ব' বা 'বিপরীত' তত্ত্বের সম্মুখীন হইতে হয়; এই দ্বৈতজ্ঞান যেমন অনিবার্য্য—দুইয়ের কোনটাকেই বর্জ্জন করা যায় না, তেমনই অবিকারী, স্বপ্রতিষ্ঠ, স্বয়ম্পূর্ণ একটা কিছুর জন্য মানবাত্মার গভীরতর আকূতি নিবারণ করাও অসম্ভব। এক দিকে এই আত্মান্তিক প্রয়োজন, অপর দিকে সৃষ্টি ও সেই পরম তত্ত্ব এতই বিপরীত যে, ওই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় প্রায় অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। বেদান্ত এই দুইয়ের নানা সম্বন্ধ নানা দিক দিয়া স্বীকার করিয়াছে, তাহাতে যেমন 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'—অর্থাৎ বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদের 'ঘোষণা' আছে—তেমনই, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত প্রভৃতি নানা তত্ত্ববাদের দ্বারা সেই পরম তত্ত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এই অপর-তত্ত্বকে কোনরূপে কিঞ্চিৎ স্বীকার করার বা অস্বীকার-না-করার উপায়ও আছে—সে যেন স্বীকার-অস্বীকারের একরূপ লুকাচুরি। আমি এই সব সূক্ষ্ম তত্ত্ববাদের মধ্যে প্রবেশ করিব না, কেবল এই সকলের মধ্যগত একটা প্রশ্নকে অবলম্বন করিয়া আমার এই ব্যাখ্যার সৌকর্য্য-বিধান করিব—তাহাতে পাঠকগণের ত্রস্ত হইবার কারণ নাই, বরং তাঁহাদের কৌতূহল জাগ্রত ও চরিতার্থ হইবে, এমন আশা করি। ধরা যাক—এই 'সৃষ্টি'র ঠিক বিপরীত যাহা তাহার নাম 'লয়'; এটুকু আমরা ধারণা করিতে পারি। যদি সৃষ্টিকে মিথ্যা বা অসৎ বলিয়া ধারণা করিতে হয় তাহা হইলে সহজ বুদ্ধির সহজ বিচারে লয়কেই সত্য বলিতে হয়—এই লয়ই তাহা হইলে সৎ-বস্তু? আবার, সৃষ্টি যদি হয় একটা কিছুর নিরন্তর গতিক্রিয়া, তবে ওই লয়কে একটা চিরন্তন স্থিতির অবস্থা বলিতে হইবে; ওই গতিক্রিয়াকেই যদি শক্তিরূপা বলিয়া ধারণা হয় এবং 'শক্তি' অর্থে ওই 'গতি'—ওই নিরন্তরপ্রবাহী ক্ষণবুদ্বুদময়ী সৃষ্টিধারা বুঝায়, তাহা হইলে নিষ্ক্রিয় গতিহীন, অর্থাৎ শক্তিবিক্ষোভহীন ধ্রুব-শাশ্বত একটা কিছুকে 'লয়ে'র অবস্থা বলিতে হইবে। এই দুই তত্ত্ব

এমনই পরস্পরবিরোধী যে এই দুইয়ের একটাকেই মানিতে হয়, দুইয়ের সমন্বয় করা বড়ই দুরূহ। বেদান্ত এমন একটা তত্ত্বের সন্ধান করিয়াছে, যাহা মূলে দ্বৈতাদ্বৈত, সদসৎ প্রভৃতি সর্ব্ববিশেষণবর্জ্জিত। এই বস্তু ধ্যানগম্য —অপরোক্ষ অনুভূতির বিষয়; ইহা বুদ্ধি বা বাক্যের গোচর নয়। বুদ্ধ ইহাকে গঞ্জিকা বলিয়া উড়াইয়া দিলেন, তিনি মানবীয় সহজ বুদ্ধির বীর্য্যবলে কার্য্যকারণের শেষতম গ্রন্থি মোচন করিয়া সৃষ্টির অসারত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইলেন, এবং তাহার বিপরীত তত্ত্ব সেই লয়-তত্ত্বকে সহজ অর্থেই গ্রহণ করিলেন, অর্থাৎ সৎ বা কোনরূপ অস্তিত্বকেই স্বীকার করিলেন না—সৃষ্টি যেমন মিথ্যা, তেমনই সেই মিথ্যার প্রতিদ্বন্দ্বী আর কোন সত্তা নাই—যাহা আছে তাহা শূন্য। তাঁহার মতে লয় অর্থে শূন্যই বটে। তন্ত্র বেদান্তকেই অনুসরণ করিয়া ওই দুই বিপরীত তত্ত্বের মধ্যে একটা রফা করিল। বেদান্তমতে সকল দ্বৈতই মিথ্যা—সৃষ্টিও নাই, প্রলয়ও নাই; অতএব লয়তত্ত্বও অ-তত্ত্ব; তথাপি সৃষ্টিকে 'মায়া' বলিয়াও স্বীকার করিয়াছে—তন্ত্রের পক্ষে ওইটুকুই যথেষ্ট। ইহার পর, যদি স্থিতিতত্ত্ব ও গতিতত্ত্বকে—লয় ও সৃষ্টিকে—একই শক্তির অবস্থাভেদ, অর্থাৎ 'স্বগতভেদ' (অতএব, সেই অদ্বৈতের অবিরোধী) বলিয়া উপলব্ধি করা যায়, তাহা হইলে সৃষ্টি আর মিথ্যা হয় না—তাহার মূল ধাতুটা যে 'সৎ' তাহা স্বীকার করিতে হয়। তথাপি তন্ত্রমতে, বেদান্তের নিগুর্ণ ব্রহ্মের মত, একটা নিষ্কল শিবের তত্ত্বও আছে, সকল গতি সেই পরম স্থিতিতে অবসানপ্রাপ্ত হয়। এই স্থিতি হইতেই গতির উৎপত্তি—এই শিবই শক্তিরূপে সৃষ্টিতে গতিমান বা অনন্ত রূপস্রোতে প্রবহমান। তন্ত্রমতে এই দুই অবস্থার দুই সত্তা একই—এক হইতে অপরে এই যে উদ্ভবন—ইহা সেই পরম তত্ত্বের বিকৃতি নয়—ইহাই তাহার স্বভাব।

তন্ত্রের এই তত্ত্ব সৃষ্টিকে, যে অর্থেই হউক, পূর্ব্বাপেক্ষা একটু বিশেষ-রূপে স্বীকার করিয়াছে; কিন্তু তাহাতেও স্থিতি ও গতি—শিব ও শক্তি —ব্রহ্ম ও জগৎ—এই দুইয়ের একটা পারমার্থিক ভেদ রহিয়া গিয়াছে। তথাপি তন্ত্র একটা খুব বড় সমস্যার কতকটা মীমাংসা করিয়াছে। কারণ এই সৃষ্টিকে উড়াইয়া দেওয়া—একেবারে একটা প্রকাণ্ড ফাঁকি বলিয়া অগ্রাহ্য করা কিছুতেই সম্ভব নয়; ইহার সকল বাহ্য আবরণ

নিঃশেষে মোচন করিলেও শেষ পর্য্যন্ত একটা এমন-কিছু থাকিয়া যায়, যাহাকে তত্ত্বরূপে স্বীকার না করিলেও একটা অনির্দ্দেশ্য, দুর্ব্বোধ্য কিছুরূপে স্বীকার করিতেই হয়, এবং সেই কিছুকে 'মায়া' নাম দিলেও সে নস্যাৎ হইয়া যায় না। তন্ত্র ইহাকে স্বীকার করিয়া—সেই মায়াকেও পরমতত্ত্বের অঙ্গীভূত করিয়াছে বটে, শক্তিকে শিব-শক্তিরূপেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি এই সৃষ্টিকে—আমাদের 'জগৎ ও জীবন'কে —একটা আপেক্ষিক সত্তা মাত্র দান করিয়াছে; কারণ, এই সৃষ্টিরও একটা লয়ক্রম আছে—শিব-শক্তিও নিষ্কল শিবে লীন হইয়া থাকে। সৃষ্টিক্রমে যাহা জগৎ, লয়ক্রমে তাহা আর থাকে না, থাকিলেও বিকৃত-নামরূপের পরিবর্ত্তে স্বরূপ-নামরূপের অতি সূক্ষ্ম অবস্থায় বিরাজ করে। অতএব সৃষ্টি হয় কালে—এবং কালেই 'লয়'-প্রাপ্ত হয়। তন্ত্রমতে এই লয়-যোগের সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা—জীবদেহে কুণ্ডলিনীরূপা এই শক্তিকে—এই সৃষ্টি-বাসনাকে—ঊর্দ্ধগামিনী করিয়া পরমশিবে লয় করিতে হয়। তাহা হইলে ইহাতে একটা ঊর্দ্ধ ও নিম্ন আছে—একটা হইতে আর একটাতে আরোহণ, একটার পরিণামে আর একটায় পৌঁছানো আছে—অর্থাৎ, সৃষ্টির যে মূল্য তাহাও আপেক্ষিক; জীবন ও জগৎ এই অর্থে সত্য যে, তাহার সেই গতি-ক্রিয়া শিব-শক্তিরই ক্রিয়া। শিব ও শক্তির যে ঐক্য-তত্ত্ব তাহাতে একটা প্রবর্ত্তন ও নিবর্ত্তনের—উদয়-বিলয়ের ক্রমাবস্থা রহিয়াছে। অতএব, এই শিব-শক্তিবাদের দ্বারাও সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ বা নিরপেক্ষ 'সৎ' বলিয়া মানিয়া লওয়া গেল না।

একটা উপমার সাহায্যে ব্যাপারটা আর একটু বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। 'সৎ' বা সেই পরম তত্ত্ব, সেই শিব—যেন একটি অক্ষয় অব্যয় অশ্বত্থবীজ; এই বীজের মধ্যে তাহার উদ্ভেদ-শক্তি সংহৃত বা সমাহিত হইয়া আছে—তখন সেই বীজ ও তাহার শক্তিতে কোন ভেদ নাই। বরং সেই শক্তিরই যেন সমাহিত অবস্থার রূপ ওই বীজ; অতএব শক্তি অর্থে স্থিতি ও গতি দুই-ই। তথাপি ওই বীজের অবস্থা বা স্থিতির অবস্থাই মূল অবস্থা। ইহাই সেই নিষ্কল শিবের অবস্থা। শক্তি যখন হইতে গতির উন্মুখী হয়, তখনই সেই শিব একটু বিশেষিত হইয়া শিব-শক্তি অবস্থা পাইয়া থাকেন। সেই বীজই যেন অঙ্কুরিত বিকশিত হইয়া

বিশাল শাখাপল্লবময় সৃষ্টিরূপ ধারণ করে; কিন্তু তখনও বীজ তেমনই থাকে, অর্থাৎ বীজ ও বৃক্ষ আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে—স্থিতি স্থিরই থাকে, তাহা হইতেই শক্তির উদ্ভব ও ক্রমবিস্তার হয়। এই গাছটাই সেই গতির রূপ—সেই রূপ পূর্ণ পরিণতির পরে আবার ওই বীজে ফিরিয়া যায়—শক্তি শিবে লীন হয়। উপমাটিতে হয়তো তত্ত্বের সূক্ষ্মতা ধরা পড়িল না; ততখানি সূক্ষ্মতার প্রয়োজনও এখানে নাই; কেবল ইহাই লক্ষ্য করিতে হইবে যে, শক্তির এই বিকাশের মুখে স্থিতি ও গতি পৃথক হইয়া রহিল—বীজ বৃক্ষে লয় পাইল না। বরং, যেন ওই বীজের উপরেই ভর করিয়া বৃক্ষ তাহার শাখাপ্রশাখা-বিকাশের গতিবেগ সঞ্চয় করিতেছে। আবার ওই গতি-শক্তি আপনাকে সংহরণ করিয়া—সৃষ্টিকে সংহার করিয়া—ওই স্থিতি-বীজে লয় পাইবে। ইহাকেই বলে সৃষ্টি-ক্রম ও লয়-ক্রম—দুই-ই একই শক্তির দ্বিবিধ গতিলীলা। তথাপি, একটি অপরের সমধর্ম্মীও নয়, সমকালিকও নয়, তাই এই গতির বিকাশ-রূপ যে সৃষ্টি তাহার মধ্যে যেমন স্থিতি নাই, তেমনই তাহা স্বপ্রতিষ্ঠও নয়। অতএব শিব-শক্তিবাদের দ্বারা সৃষ্টিকে যতখানি শোধন করিয়া লওয়া যাক না কেন—উহার সত্তা স্বয়ংসিদ্ধ নয়; স্থিতির তুলনায় গতি কালাতীত নয়, বরং কালসাপেক্ষ; ওই গতির মূলে যে স্থিতি—শেষ পর্য্যন্ত তাহাতে পৌঁছিতে না পারিলে মহাকালের শাসন-মুক্ত হওয়া যায় না। এইজন্যই সেই দুইয়ের, সেই নিত্য ও অনিত্যের, স্থিতি ও গতির দ্বন্দ্ব ইহাতেও নিরস্ত হইল না; সৃষ্টিকে—জগৎ ও জীবনকে—একটা নিরপেক্ষ সত্যের সামিল করা গেল না।

ভারতীয় দর্শন ও সাধন-তত্ত্ব ওই দুইয়ের দ্বন্দ্ব-নিরসনে যতগুলি পন্থা নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে তন্ত্রের পন্থাই প্রশস্ততম, সৃষ্টিকে ইহার অধিক মর্য্যাদা দেওয়া ইতিপূর্ব্বে আর সম্ভব হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণই প্রথম একটা অতিশয় নূতন দিকে সেই পুরাতনকে ফিরাইলেন। তিনিই গতি ও স্থিতিকে, জগৎ ও ব্রহ্মকে—একই দেশে ও কালে অভেদরূপে বিদ্যমান দেখিলেন; শিব ও শিবশক্তি, স্থিতি ও গতি, লয় ও সৃষ্টি একই তত্ত্বের এ-পিঠ ও ও-পিঠ; গতির সঙ্গে স্থিতি, স্থিতির সঙ্গেই গতি অভিন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছে; এক দিক হইতে দেখিলে যাহা

ব্রহ্ম, অপর দিক হইতে দেখিলে তাহাই জগৎ। একটাকে পার হইয়া অপরটায় পৌছিতে হয় না; কেবল, সেই দৃষ্টি লাভ করা চাই—সিঁড়ি দিয়া ছাদের উপর উঠিতে পারিলে, ছাদ, সিঁড়ি ও নিম্নতল সবই একই বস্তু বলিয়া নিমেষে অন্তরগোচর হইবে। জড়বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যাইতে পারে static ও dynamic—দুই-ই এক শক্তির এককালীন স্ফূর্তি; যে মুহূর্তে সৃষ্টি হইতেছে, লয়ও সেই মুহূর্তে হইতেছে; স্থিতির উপরেই ভর করিয়া গতির ক্রিয়া চলিতেছে; নিশ্চল শিবের বুকের উপরে আমরা যে নৃত্যোন্মত্তা শক্তিমূর্ত্তি দেখিয়া থাকি তাহার গূঢ় অর্থ এইরূপ কিছু একটা হইবে। অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের ভাষায় ব্রহ্ম ও জগৎ তত্ত্বত অভেদ—এই জগৎ-ব্রহ্ম-অভেদ তত্ত্বের প্রতীক—শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনবিগ্রহ, তাঁহার সেই ইষ্টদেবতা 'কালী'।

৯

এই তত্ত্বই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে সাক্ষাৎ বাণীরূপ ধারণ করিয়াছিল—শ্রীরামকৃষ্ণ এই বাণীরই অবতার। তত্ত্বটা নূতন নয়; কিন্তু জীবন সম্পর্কে তাহার এমন অর্থ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ পায় নাই; নূতন যে নয়, তাহার প্রমাণ, একজন তন্ত্রতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত তন্ত্রের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

Its purpose is to give liberation to the Jiva (জীব) by a method according to which monistic truth is reached through the dualistic world; immersing its-Sadhakas (সাধক) in the current of Divine Bliss by changing duality into unity, and then evolving from the latter a dualistic play, thus proclaiming the wonderful glory of the spouse of Paramashiva (পরমশিব) in the love embrace of matter and spirit (জড় ও চৈতন্য)।

এই প্রসঙ্গে একটা অদ্ভুত ঘটনার কথা মনে পড়িল—যতই অদ্ভুত বা অবিশ্বাস্য হউক, তাহাতে এমন কয়েকটি লক্ষণ আছে, যাহার জন্য সেই ঘটনাটিকে বড়ই অর্থপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। কথিত আছে, একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের সেবক ও প্রতিপালক মথুরবাবু আপনার কক্ষ হইতে বাহিরের অদূরস্থ ঠাকুরবাড়ির দিকে অন্যমনস্কভাবে চাহিয়া ছিলেন; সেই সময়ে হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি পড়িল ঘরের বারান্দায় পায়চারিরত শ্রীরামকৃষ্ণের উপর, এবং যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার ভয় ও বিস্ময়ের অন্ত রহিল না। পরমহংসদেব সেই বারান্দাটিতে পায়চারি করিবার সময় যখন এদিকে ফিরিতেছেন তখন তাঁহার মুখ কালীর মুখ,

যখন আবার অপর দিকে ফিরিতেছেন তখন সেই মুখই মহাদেবের মুখ! এই যে দর্শন, ইহাকে 'psychic' একটা কিছু বলা যাইতে পারে; কিন্তু সে যাহাই হউক, যদি ইহা স্বপ্নও হয়, তাহা হইলেও যে তত্ত্বটি উহাতে প্রতীকরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, সে তত্ত্ব মথুরবাবুর মত একজন অজ্ঞানী-ভক্ত স্বপ্নেও কল্পনা করিল কেমন করিয়া? কিন্তু সে প্রশ্ন আমার নয়, আমি এই স্বপ্নের ঘটনাকেও বাস্তব ঘটনা অপেক্ষা সত্য মনে করি, এবং এই ভাবিয়া আশ্চর্য্য হই যে, এক মথুরবাবু ছাড়া আর কোন শিষ্য বা ভক্ত ওই শ্রীরামকৃষ্ণ-তত্ত্বকে এমন চাক্ষুষ করে নাই! মথুরবাবু করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনিও ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই; মর্ম্ম কি আর কেহ বুঝিয়াছে! আমার মনে হয়, এই তত্ত্বকেই বিবেকানন্দও, পৌরাণিক প্রতীকের ভাষায় নয়—তাঁহার গুরুর মধ্যে অপরোক্ষ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি প্রকাশ্য কথায় ও বিবেকানন্দের প্রতি তাঁহার উপদেশ ও আদেশের মধ্যে ইহার কিন্তু স্পষ্ট প্রমাণও আছে। একবার অর্দ্ধ-আবিষ্ট অবস্থায় তিনি জীবকে 'দয়া' নয়—'শিব'জ্ঞানে পূজা করিতে হইবে—এই কথা একটি সত্য-মন্ত্রের মত ঘোষণা করিয়াছিলেন। সিঁড়ি দিয়া বাড়ির ছাদে উঠিয়া যে সত্যদর্শন হয়—রূপকের ছলে সেই তত্ত্বকথা তিনি প্রায় বলিতেন, পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি; আবার, বিবেকানন্দকে তাঁহার সেই ভর্ৎসনা—"তোর মন এত ছোট যে তুই জগতের ভাবনা না ভাবিয়া নিজের মুক্তির জন্যই এমন অস্থির!"—তাহাও স্মরণীয়। এই সকল হইতেই স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, পরমহংসদেবের বাণী সেই পুরাতন সন্ন্যাস-বৈরাগ্যের বাণী নয়—এ বাণী একেবারে নূতন না হইলেও, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে একটা বিশেষ তত্ত্ব ইহাতে উঁকি দিতেছে। সে তত্ত্ব কি তাহা পূর্ব্বে যথাসাধ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। ওই যে একই মুখ শিব ও শক্তির মুখ, কেবল দিকপরিবর্ত্তন মাত্র; ওই যে জীব—কেবল তত্ত্বের দিক দিয়াই শিব নয়, তথ্যের দিক দিয়াও শিব; এ সকলের অর্থ অতিশয় স্পষ্ট—যে সত্য ব্রহ্মের সত্য, জগতের সত্যও তাহাই; সিঁড়ি ও ছাদ ভিন্ন বটে—সিঁড়ি দিয়া ছাদে উঠিতে হয়, কিন্তু ছাদে উঠিলে ছাদ ও সিঁড়ি, উপরতল ও নিম্নতল, ভিত্তি ও শিখর, সবই সমান ও সর্ব্বাঙ্গীণ একরূপ বলিয়া উপলব্ধি হয়।

আমি উপরে এই তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা করিয়াছি কেহ যেন তাহার দার্শনিক মূল্য যাচাই না করেন—দার্শনিক পরিভাষা বা দার্শনিক যুক্তিপ্রণালী—কোনটাই আমার অভ্যস্ত বা আয়ত্ত নহে; আমি নানা উপায়ে পরিচিত শব্দ ও উপমার সাহায্যে প্রাণপণে একটা তত্ত্বের আভাস দিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র—আমি নিজে যে ভাবে বুঝিয়াছি সেই ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি; পাঠকগণকে কেবল সেই ইঙ্গিতমাত্র সহায় করিয়া নিজ নিজ বিদ্যা ও জ্ঞানের দ্বারা তত্ত্বটির ব্যাখ্যা পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। আধুনিক দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক ভাষায় যে তত্ত্বটিকে গতিতত্ত্ব ও স্থিতিতত্ত্বের সমন্বয় বলা যাইতে পারে তাহাই ভারতীয় অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের ভাষায় ব্রহ্ম ও জগৎ—শিব ও শক্তির অদ্বৈত-তত্ত্ব। ওই স্থিতি ও গতিকেই লয় ও সৃষ্টি বলা যাইতে পারে; এবং লয় যদি নিরপেক্ষ এবং সৃষ্টি আপেক্ষিক হয়, তবে একটির গৌরব অপরের তুলনায় অধিক হয়, এবং দুইয়ের মধ্যে একটা অবস্থাগত প্রভেদ ও কালগত ব্যবধানও থাকে; লয়ের অবস্থা সৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়া থাকে, এজন্য সৃষ্টিকে পূর্ণ সত্যরূপে গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু যদি এমন হয় যে, এই দুই সর্ব্বত্র অবিচ্ছেদে বর্ত্তমান রহিয়াছে—সৃষ্টি-স্রোতের প্রতি তরঙ্গে, প্রতি মুহূর্ত্তে, ওই স্থিতি ও গতি সমভাবে অনুস্যূত হইয়া আছে, তবে সৃষ্টিকে ব্রহ্ম হইতে একটা পৃথক কিছু মনে করিবার কারণ থাকে না। এই প্রসঙ্গে, আমাদের কালের এক চিন্তাশীল বাঙালী পণ্ডিতের এই মূল্যবান উক্তি উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করি, তিনি লিখিয়াছেন—

Shakti being either static or dynamic, every dynamic form must have a static background. A purely dynamic activity (which is motion in its physical aspect) is impossible without a static support or ground (আধার). Hence the philosophical doctrine of absolute motion or change, as taught by old Heraclitus, and the Buddhist, and by modern Bergson, is wrong; it is based neither upon correct logic, nor upon clear intuition. The constitution of an atom reveals the static-dynamic polarisation of Shakti; other and more complex forms of existence also do the same.

এক্ষণে আবার বিবেকানন্দের কথাই বলি। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে তাঁহার এই 'জগৎ-সত্য' মন্ত্রে দীক্ষালাভ হইয়াছিল যে, জীবই শিব—উপনিষদের সেই 'আত্মা'ই মানুষরূপে এই জগতের সুখদুঃখের ভোক্তা হইয়া—শুধু সাক্ষী হইয়া নয়—তাহাকে তীর্থ-গৌরব দান করিয়াছে।

মন্ত্র সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি; শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে সেই মন্ত্রস্বরূপ হইয়া যেন একটি উপযুক্ত আধার খুঁজিতেছিলেন—নরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র তাঁহার আনন্দের অবধি রহিল না। বালক যেমন তাহার ঈপ্সিত খেলনা দেখিয়া তাহা পাইবার জন্য অধীর হইয়া উঠে, তিনিও তেমনই অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। নরেন্দ্রের মধ্যে তিনি কি দেখিয়াছিলেন তাহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি,—এক দিকে মুক্ত শুদ্ধ আত্মার অত্যুৎকৃষ্ট জ্ঞানধাতু, অপর দিকে ব্যক্তি-আত্মার বা মানুষ-সত্তার যাহা শ্রেষ্ঠ উপাদান—সেই পৌরুষ; উভয়ের এমন মিলন ক্বচিৎ হইয়া থাকে। নরেন্দ্রের এই পৌরুষই তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়াছিল—তাহার সেই স্বাতন্ত্র্যাভিমান, উদ্ধত আত্মপ্রত্যয়, ও ভক্তি প্রভৃতি সর্ব্ববিধ চিত্ত-দৌর্ব্বল্যের প্রতি যেন একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা তাঁহাকে বড়ই আশান্বিত করিয়াছিল। তিনি জানিতেন, কোন্ শক্তি কোন্ তেজ তাহাকে এমন অশান্ত করিয়াছে; আত্মার সকল রহস্য অবগত ছিলেন বলিয়া তিনি এই পৌরুষের মধ্যেই প্রেমের সুপ্ত বীর্য্য দর্শন করিয়া পরম কৌতুক অনুভব করিতেন। নরেন্দ্রের দেহাবয়বেও তিনি তাহার অন্তর-পুরুষের পরিচয় পাইয়াছিলেন; মুখমণ্ডলের নিম্নার্দ্ধে সেই প্রশস্ত গণ্ড, সুগঠিত চিবুক ও সুমিলিত ওষ্ঠাধর যেমন ইস্পাতস্বরূপ দৃঢ়তার—অতি কঠিন সঙ্কল্পনিষ্ঠার পরিচায়ক, তেমনই, তাহার সেই পল্লবভারাকুল দীর্ঘায়ত দুই চক্ষু! সেই চক্ষু দুইটির গবাক্ষপথে তিনি নরেন্দ্রের আত্মার যে রশ্মিচ্ছটা দেখিতে পাইতেন, তাহাতে তাঁহার আর কোন সংশয় থাকিত না; তাই বড় স্নেহে তিনি তাহাকে 'কমলাক্ষ' বলিয়া ডাকিতেন। এই দুষ্ট বালকের দুষ্টামি তিনি যেমন পরম স্নেহে উপভোগ করিতেন, তেমনই কেমন করিয়া তাহাকে অতি সহজে বশ করিবেন তাহাও জানিতেন বলিয়া, তিনি সে বিষয়ে কিছুমাত্র ব্যস্ততা বোধ করেন নাই। আরও কিছুদিন যাক, আরও কিছুদিন দুরন্তপনা করুক; কল ঘুরাইবার চাবিটি যে তাঁহার হাতেই আছে। এমন জ্ঞানের সহিত যখন এমন পৌরুষ রহিয়াছে, তখন ভাবনা কি? ওই অভিমান যে আত্মারই অভিমান, উহাতে যে এতটুকু ব্যক্তি-স্বার্থের বা ক্ষুদ্রতার কলঙ্কচিহ্ন নাই! অবোধ বালক, তোমার ওই অভিমান দিয়াই তোমাকে জব্দ করিতেছি। এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের

'নীতি'-জ্ঞান কম ছিল না—পরম-জ্ঞানীর অবস্থা বালকের মত অবস্থাই ঘটে, কিন্তু সে বালকোচিত অজ্ঞতার অবস্থা নয়। তাই শেষে একটি মাত্র কৌশলে তিনি নরেন্দ্রকে জয় করিয়া লইলেন। নরেন্দ্র কেবলই নির্ব্বিকল্প সমাধির—'সুখং আত্যন্তিকং' আস্বাদন করাইবার জন্য তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিত—স্পষ্টই বলিত যে, তাহাই পরম পুরুষার্থ। নরেন্দ্রের বিশ্বাস, পরমহংসদেবের মত ব্রহ্মপরায়ণ মহাপুরুষ তাহার এই কামনাকে প্রশ্রয় দিবেন—ইহাতে তিনি তাহার প্রতি আরও খুশি হইয়া উঠিবেন। কিন্তু একদিন সহসা সেই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষও তাহার ওই কথা শুনিয়া কঠিন ভর্ৎসনা ও ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"এই বুঝি তোমার পৌরুষ, এই বুঝি তোমার আত্মগৌরব—এই বুঝি তোমার বীরত্ব! তুমি জগতের আর সকলকে ফেলিয়া নিজের মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইয়াছ!" এই গ্লানিবোধ নরেন্দ্রের চিত্তে পূর্ব্ব হইতে যে ছিল, সাংসারিক সংকটে তাহার সেই দারুণ অন্তরসংগ্রামেই সে পরিচয় আমরা ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছি; কিন্তু সংগ্রামশেষে নরেন্দ্র সংসার ত্যাগ করিতেই চাহিয়াছিল, তখনও তাহার জীবনে ওই স্পর্শমণির স্পর্শলাভ ঘটে নাই, তখনও সেই অপূর্ব্ব তত্ত্বকে সে 'দর্শন' করে নাই। আজ তাহার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল—যে ব্রহ্ম দর্শন করিয়া, ব্রহ্মভূত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহারও মুখে এ কি কথা! মানুষের সেবাকে সেও মুক্তি-সন্ধানের তুল্যই, অথবা তাহারও অধিক মূল্যবান মনে করে! অথবা তাহার মতে, সে-ই যথার্থ মুক্তি ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছে—যে জগৎকে তুচ্ছজ্ঞান করে না; এ বড় অপূর্ব্ব কথা!" কিন্তু নরেন্দ্র সে কথা, এবং কথার তত্ত্বকেও দূরে ঠেলিয়া, তাহার মস্তিষ্কে নয়—প্রাণের মধ্যে এক প্রবল প্লাবন অনুভব করিল, এবং এতদিন পরে শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আপনাকে সাষ্টাঙ্গে লুটাইয়া দিল। ইহার পর, সেই মহাপুরুষের সম্বন্ধে কেবল একটা কথাই তাঁহার মুখে বার বার শোনা যাইত—'I felt his wonderful love'। বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে আর কি দেখিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে আর কি দিয়াছিলেন—সে সকল কথা তিনি জগৎকে জানানো আবশ্যক মনে করেন নাই।

১০

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সেই প্রেম যে কত বড়—বিবেকানন্দ তাঁহার মধ্যে কোন্ প্রেমের রূপ দেখিয়াছিলেন, বিবেকানন্দকে পাইয়া তাঁহার এত আনন্দ কেন, তাহার সম্পর্কে একটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে। মঃ রোলাঁ তাঁহার 'বিবেকানন্দ-চরিত' নামক গ্রন্থে স্বামীজীর সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি উক্তি বিশেষ মূল্যবান বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন; উক্তিটি এই—

The day when Naren comes in contact with suffering and misery the pride of his character will melt into a mood of infinite compassion. His strong faith in himself will be an instrument to re-establish in discouraged souls the confidence and faith they have lost. And the freedom of his conduct, based on mighty self-mastery, will shine brightly in the eyes of others, as a manifestation of the true liberty of the Ego.

শিষ্যের সম্বন্ধে গুরুর এই ভবিষ্যৎবাণী যে সত্য হইয়াছিল তাহা আমরা জানি, এবং ইহাতে, বিবেকানন্দের অন্তরতম অন্তরের পরিচয় যে তিনি কিরূপ নিঃসংশয়রূপে অবগত ছিলেন, তাহারও প্রমাণ রহিয়াছে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তিটিতে কেবল তাহাই নয়, কেবল শিষ্যের নয়—গুরুরও যে পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, সে দিকটি কেহ অনুধাবন করেন নাই। পরমহংসদেবের ওই বাণীর মধ্যে তাঁহার নিজেরই প্রাণের আকৃতি ধরা পড়িয়াছে—এমন আর কোথায়ও পড়ে নাই; ইহা সেই আকৃতি যাহার বশে এক মহাপ্রেম যুগে যুগে অতি ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে অবতরণ করিতে বাধ্য হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে যে দুঃখের উল্লেখ করিতেছেন তাহার ব্যাপ্তি ও পরিমাণ তিনি বুঝিলেন কেমন করিয়া? বিবেকানন্দের জীবনের এক মাহেন্দ্রক্ষণে যাহা সত্যই ঘটিয়াছিল, মঃ রোলাঁ তাহারও এইরূপ ব্যাখ্যা ও বিবৃতি করিয়াছেন—

This meeting with suffering and human misery—not only vague and general—but definite misery, misery close at hand, the misery of his people, the misery of India—was to be the flint upon the steel, whence a spark would fly to set the whole soul on fire. And with this as its foundation stone, pride, ambition and love, faith, science and action, all his powers and all his desires were thrown into the mission of human service and united into one single flame.

—ইহাই যদি শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ব্ব হইতে দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং শিষ্যের সম্বন্ধে সেই আশাই করিতেন, তবে তাহারই বা অর্থ কি? তিনি

তাঁহার সেই পল্লীপ্রান্তের ঘরখানিতে বসিয়া—গান, কীর্ত্তন, পুরাণ-প্রসঙ্গ, ভক্তিবিহ্বলতা ও ঘন ঘন সমাধি-অবস্থায় মগ্ন থাকিয়া—দুঃখের সে মূর্ত্তিকে দেখিলেন কি উপায়ে? তাঁহার প্রাণাধিক শিষ্যকে দুঃখের সে রূপ দেখাইবার জন্য তিনি এত অধীর কেন? আর সকলকে তিনি ত্যাগ, ভক্তি ও আত্মশুদ্ধির উপদেশ দিতেন, তাঁহার অন্তরের এই মানবপ্রেম ও জগৎ-হিতচিন্তার সম্যক পরিচয় তো আর কেহ পায় নাই! তাই, পারমার্থিক কল্যাণ বা ব্যক্তিগত অধ্যাত্মসাধনার সেই প্রাচীন ধর্ম্ম-মনোভাব লইয়াই আর সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিত। কিন্তু নরেন্দ্রের উপরেই তাঁহার এই যে ভরসা—এবং তাহার বিবেকানন্দ-জীবনে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা হইতে, শ্রীরামকৃষ্ণ যে কোন্ প্রয়োজনে এই যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—জগতে যে মহামন্বন্তর আজ আরম্ভ হইয়াছে সেই মন্বন্তরের মুখেই তাঁহার সেই আবির্ভাব যে কত সময়োচিত হইয়াছিল—তাহা অনুমান করা দুরূহ হইবে না। তথাপি জগতের এই আসন্ন মহাদুঃখ-দিনের সংবাদ তাঁহাকে কে দিয়াছিল? সেই কালেই জগৎময় অধর্ম্ম ও অন্যায়ের যে বিষবাষ্প মানুষের সংসারে ছড়াইয়া পড়িতেছিল সে সংবাদই বা ওই বিদ্যাহীন সংসারজ্ঞানহীন গ্রামবাসী সরল ব্রাহ্মণ জানিলেন কোথা হইতে? কবির ভাষায় আমাদেরও কি বলিতে ইচ্ছা হয় না—

> Oh closed about by narrowing nunnery walls
> What knowest thou of the world, and all its lights
> And shadows, all the wealth and all the woe?

কিন্তু ইহাই তো পরমাশ্চর্য্য! এইজন্যই, বিবেকানন্দের সেই শৈব-শক্তির মূলে যে এক গভীরতর বৈষ্ণবীশক্তির প্রেরণা ছিল, একথা আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারি না। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই 'স্থিতি'রূপের মধ্যেই যে কি প্রচণ্ড 'গতি'-বেগ ছিল, এবং তাঁহাতে ওই দুইয়ের যে কি সমন্বয় হইয়াছিল, সে তত্ত্ব আজিও আমাদের জ্ঞানগোচর হয় নাই। ভগিনী নিবেদিতাও যে তাঁহার গুরুর অন্তরালে এই মহাগুরুকে সর্ব্বদা দেখিতে পান নাই তাহার প্রমাণস্বরূপ তাঁহার দুইটি উক্তি এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি, যথা—

Sri Ramkrishna had been, as the Swami himself said once of him, "like a flower" living apart in the garden of a temple, simple, halfnaked,

orthodox, the ideal of the old time in India, suddenly burst into bloom, in a world that had thought to dismiss its very memory. It was at once the greatness and the tragedy of my own master's life that he was not of this type. His was the modern mind in all its completeness. In his consciousness, the ancient light of the mood in which man comes face to face with God might shine, but it shone on all those questions and all those puzzles which are present to the thinkers and workers of the modern world.

—এ কথা অস্বীকার করিবে কে? সহজ দৃষ্টিতে ও প্রত্যক্ষ প্রমাণে ইহাই তো সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই মূর্ত্তির বহির্মুখ ওইরূপই বটে, কিন্তু বিবেকানন্দের অন্তর্মুখ? ভগিনী নিবেদিতা বলিতেছেন, "the ancient light...might shine, but it shone..."—এই 'might shine'টাই শ্রীরামকৃষ্ণ নিবারণ করিয়াছিলেন, এবং ওই "but it shone"—উহার জন্যই সেই মহাপুরুষ এই বালককে দেখিবামাত্র—শুধু বুকে নয়, মাথায় করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, ইহার দ্বারাই তাঁহার প্রাণগত কামনা সিদ্ধ হইবে, সে যেন সকল সিদ্ধিলাভের অধিক; পূর্ব্বোদ্ধৃত ওই ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে তাঁহার প্রাণের সেই আশ্বাস ব্যক্ত হইয়াছে। তাই যখন ভগিনী নিবেদিতার মুখেই আবার শুনি—

The sudden revelation of the misery and struggle of humanity as a whole, which has been the first result of the limelight irradiation of facts by the organisation of knowledge, had been made to him also as to the European mind. We know the verdict that Europe has passed on it all. Our art, our science, our poetry, for the past sixty years or more, are filled with the voices of our despair. A world summed up into the growing satisfaction and vulgarity of privilege, and the growing sadness and pain of the dispossessed; and a will of man too noble and high to condone the evil, yet too feeble to avert or arrest it; this is the spectacle of which our greatest minds are aware. Reluctant, wringing her hands, it is true, yet seeing no other way, the culture of the West can but stand and cry, "To him that hath shall be given, and from him that hath not shall be taken away even that which he hath. Vae Victis! Woe to the vanquished!"...Is this also the verdict of the Eastern wisdom? If so, what hope is there for humanity? I find in my master's life an answer to this question.

—যখন বর্ত্তমান মানব-সংসারের দুঃখ-দুর্গতির চিত্র ওই অতি-গভীর কথাগুলির মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে দেখি, তখনও শ্রীরামকৃষ্ণের সেই ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়ে—এবং যে পুরুষ-বীরের ললাটে তিনি স্বহস্তে গৌরবের মুকুটচূড়া ও শুভাশিসের মাল্যচন্দন পরাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার সম্মুখেও যেমন মাথা আপনি নত হইয়া পড়ে, তেমনই, ইহাও

ভাবিয়া বিস্মিত হই যে, বিবেকানন্দ যাহা সমক্ষে দেখিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা বহুপূর্ব্বেই অন্তরে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। একজন চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করিবে না, এবং দেখিলেও হয়তো তাহাকে আর এক রূপে দেখিত—কারণ, বিশুদ্ধ জ্ঞানের দৃষ্টিতে জাগতিক ব্যাপারের মূল্যই অন্যরূপ; অপর পুরুষ যেন জ্ঞানের উপরে প্রেমের দৃষ্টিকে জয়ী করিয়া সাক্ষাৎ-দর্শন ব্যতিরেকেই তাহাকে অন্তরে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; এবং আর একজনের জ্ঞান-চক্ষুতে সেই প্রেমের অঞ্জন কবে কেমন করিয়া লাগিবে তাহা জানিতেন বলিয়াই, জ্ঞান ও পৌরুষের বজ্রবিদ্যুৎরূপী সেই মহাশক্তিমান শিশুকে এমন একটি শ্যামল সজল মেঘখণ্ডে বাঁধিয়া দিলেন যাহা অচিরে গগনব্যাপী হইয়া উঠিবে; এবং শেষে সেই অন্তর্গূঢ় বিদ্যুতের অসীম বেদনায় বিক্ষুব্ধ হইয়া সেই মেঘ গলিয়া যাইবে—তাহারই অপর্য্যাপ্ত ধারাবর্ষণে তপ্তধরণী শীতল হইবে। ওই 'Eastern wisdom'-এর পূর্ণ ঘনীভূত বিগ্রহ যিনি—বিবেকানন্দ যাহার স্রোতোবেগোচ্ছ্বসিত নির্ঝর-রূপ, ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার প্রতীচ্য-সংস্কারবশে তাহার সেই স্থিরতাকে, গতির তুলনায় সমান প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত বিবেকানন্দের অন্তরতর যোগের কথা এই পর্য্যন্ত। অতঃপর আমি, বিবেকানন্দের চরিত-কথায় আরও কিছুদূর অগ্রসর হইব। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই ভবিষ্যদ্বাণী হইতেই আমরা জানিয়াছি, নরেন্দ্র কবে কেমন করিয়া বিবেকানন্দরূপে দ্বিজত্ব লাভ করিবেন —তাঁহার জীবনের ব্রত নির্দ্দিষ্ট হইয়া যাইবে। এই প্রসঙ্গে মঃ রোলাঁর একটি উক্তি যেমন যথার্থ, তেমনই সংক্ষিপ্ত-সুন্দর; আমি তাহারই সূত্র ধরিয়া কাহিনীর এই অংশ সমাপ্ত করিব। তাঁহার সেই উক্তিটি এই—

> But this consciousness of his mission only came and took possession of him after years of direct experience, wherein he saw with his own eyes and touched with his own hands the miserable and glorious body of humanity—his mother India in all her tragic nakedness.

আমি এইবার ওই "miserable and glorious body of humanity" এবং তাহার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ের ফলে নরেন্দ্রনাথের সেই নবজন্মের কথা বলিব।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

ভালবাসা

সেদিন সকালে সখী, বড় মিঠে লেগেছিল
মুখখানি আঁকা যেন বালিশে—
যদিও আগের রাতে নিশি ভোর করেছিলে
অবিরল অভিযোগ ও নালিশে।
সেদিন দুপুরে সখী, বড় মিঠে লেগেছিল
রেঁধেছিলে আলু আর ওলেতে,
যদিও মসলা দিতে ভুল হয়েছিল তাতে
দুনো নুন ঢেলেছিলে ঝোলেতে।
বেলা প'ড়ে এলে পরে বড় মিঠে লেগেছিল
গেলে যবে হাতে লয়ে তোয়ালে—
যদিও খাবার কালে তীব্র শাসন ক'রে
খোকাকে আমার কোলে শোয়ালে।
সন্ধ্যার অবসাদে বড় মিঠে লেগেছিল
কবরীতে জড়ানো সে মালাটি,
যদিও সকল দোষ মোর 'পরে আরোপিলে
ভুল চাবি দিয়ে ভেঙে তালাটি।
রজনীর ঘন ঘোরে বড় মিঠে লেগেছিল
ক্লান্ত হাসিটি তোর সই লো,
যদিও জগৎব্যাপী যত পাপ দোষ ত্রুটি
কারো নয় শুধু আমা বই লো।

শ্রীমধুকরকুমার কাঞ্জিলাল

প্রসঙ্গ কথা

(পূর্বানুবৃত্তি)

দেউড়ির দারোয়ান

সেন মহাশয় জাঁদরেল ভাষাতত্ত্ববিদ। তিনি সাহিত্য-সমালোচনায় যে নূতন পরিভাষা রচনা করিয়াছেন, তাহারও সামান্য পরিচয় পণ্ডিত-সমাজে সবিনয়ে উপস্থাপিত করিতেছি। প্রথমেই উপমা-সৌকুমার্যের বহু নিদর্শনের মধ্যে মাত্র একটি উদ্ধৃত করিলাম।

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিতেছেন—

> ইংরেজি উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ দ্রুতগতি এবং রোমান্টিক কল্পনা তিনি "একশ্রেণীর লোকের উপাখ্যানে" সঞ্চারিত করিয়া দিয়া বাঙালা সাহিত্যবৃক্ষকে এক নূতন কাণ্ড প্ররূঢ় ও পল্লবিত করিয়া দিলেন।—পৃ. ১৯

এই প্রশংসাপত্র পাঠ করিয়া স্বর্গ হইতে বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই লেখককে অজস্র আশীর্বাদ করিতেছেন, কারণ 'সাহিত্যবৃক্ষে এক নূতন কাণ্ড প্ররূঢ় ও পল্লবিত' করিয়া দিবার মত ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা যে বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল, তাহা ইতিপূর্বে কেহই বলিতে পারেন নাই। কিন্তু 'এহ বাহ্য'। সেন মহাশয়ের সাহিত্য-সমালোচনার পরিভাষা-সৃষ্টির কৃতিত্ব অতুলনীয়। স্থানাভাববশত সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠা-সংখ্যা দেওয়া গেল না, পাঠকগণ গ্রন্থখানি লইয়া পর পর পাতা উল্টাইয়া গেলেই দেখিতে পাইবেন—

> ভদ্রশ্রেণীর অন্তর্গত হইয়াও যাহারা down and out; মধুসূদনের representative কাব্য; smutty উপন্যাস; sensational ইংরেজি নভেল; নায়ক-নায়িকার understanding-এ উপন্যাসের সমাপ্তি; আয়েষা চরিত্র stately; জগৎসিংহ নববিবাহিত বাঙালী যুবক-প্রেমিকের মত colourless; বিবেকানন্দের বক্তৃতা impassioned নয়, intellectual; grandiloquent বাগাড়ম্বর; বঙ্কিমের humanistic মনোভাব; রবীন্দ্রনাথের adolescent কবিচিত্ত; মিলনের frustration; এই motife রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব; এবার বিশেষত্ব হইতেছে personal note।

অলং বিস্তরেণ। সেন মহাশয়ের বুকের পাটা আছে—এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বাংলা সাহিত্য-সমালোচনার প্রারম্ভ হইতে আজ পর্যন্ত কোন লেখকই এইরূপ অকুতোভয়ে ইংরেজী শব্দ এতটা বেপরোয়াভাবে ব্যবহার করিতে সাহস করেন নাই। বাংলা শব্দভাণ্ডারে বিদেশী উপাদান বর্ধিত হইল দেখিয়া সেন মহাশয়ের গুরুদেব নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবেন। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই, ভাষা-ব্যবহারে এই-জাতীয় অসংযত বর্বরতা ক্ষমার্হ কি না? যিনি কথায় কথায় ইংরেজী শব্দ ব্যবহার না করিলে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিতে সক্ষম নহেন, কোন্ স্পর্ধায় তিনি বাংলা সাহিত্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন? সাহিত্য-বুদ্ধি এবং সাহিত্য-বিচার-ক্ষমতা তো পরের কথা,

ব্যাকৃত্তিও যাঁহার হয় নাই, তাঁহার সাহিত্যের ইতিহাস রচনার দুরাকাঙ্ক্ষা পণ্ডিত-সমাজে প্রশ্রয় লাভ করে কেন?

সেন মহাশয়ের ছন্দ-জ্ঞানেরও একটিমাত্র নমুনা দেওয়া ভাল। মধুসূদনের 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটকে'র একটি গান সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন,—"দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে এই গানটি আর কিছু না হউক অন্তত ছন্দের খাতিরে সেকালের পক্ষে সম্পূর্ণ অভিনব

হায়, কুহু, কুহু, কুহু কোকিলের নাদ!
বসন্ত এল সহ অনঙ্গ উন্মাদ!
[হায়] যৌবন-মুকুল তব, শুনি ওই কুহুরব,
বিকশিলে ঘটিবে প্রমাদ?
[হায়] জ্ঞানহীন মধুকর, ভ্রমে দেশ দেশান্তর,
কে ভুঞ্জিবে মদন-প্রসাদ?
হায় তুমি রতিসমা, অতি[শয়] নিরুপমা,—
এ বয়েসে হরিবে বিষাদ?"

ছন্দ-সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও চক্ষু বুজিয়া বলিয়া দিতে পারিবেন যে, ইহা ৮+৮+১০ অক্ষরের দীর্ঘ ত্রিপদী মাত্র। প্রথম দুই চরণ ৮+৬ [=১৪] অক্ষরের; বসন্ত শব্দের যুক্তাক্ষর সংগীতের খাতিরে দুই মাত্রা এবং শেষ চরণের দ্বিতীয় পর্বের 'শয়'-পাপড়ি যে-কারণেই হউক লুপ্ত হইয়াছে। সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পড়িয়া সীতা কার বাপের মতই সমগ্র প্রাচীন বাংলা সাহিত্য মন্থন করিয়া অতি প্রাচীন ত্রিপদীছন্দকে 'সেকালের পক্ষে সম্পূর্ণ অভিনব' আখ্যা প্রদান করা বুদ্ধিমত্তা ও পাণ্ডিত্যের এক অপূর্ব নিদর্শন।

* * *

সাহিত্য-ঐতিহাসিকের চতুরঙ্গ কৃত্যের কথা আমরা বলিয়াছিলাম। তিনটি অঙ্গের আলোচনা শেষ হইয়াছে, এইবার চতুর্থ অঙ্গের কথা। অর্থাৎ ঐতিহাসিক মালমসলার বিচার। কেবল সাল তারিখ ও তালিকা-রচনা লইয়াই ইহার আলোচনা। বলা বাহুল্য, এই চতুর্থ কৃত্য সম্পাদনে বিদ্যা-বুদ্ধি বা গভীর পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় কেবল অধ্যবসায় এবং নিষ্ঠার। সেন মহাশয় সগর্বে স্বীকার করিয়াছেন

যে, এইখানেই তাঁহার কৃতিত্ব। তিনি "বহু অজ্ঞাত ও বিস্মৃত রচনার প্রতি সাহিত্যরসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ" করিয়া গভীর আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, ইহাই সেন মহাশয়ের স্বাধিষ্ঠান-ক্ষেত্র। সুতরাং এতক্ষণ আমরা মিথ্যাই বাগাড়ম্বর করিয়াছি। স্বাধিষ্ঠান ক্ষেত্রে তাঁহার কৃতিত্ব বিশ্লেষণ করিলেই আমাদের কর্তব্য সমাপ্ত হইতে পারিত।

গ্রন্থের শেষে সেন মহাশয় 'গ্রন্থ ও গ্রন্থকার নির্ঘণ্ট' দিয়াছেন। উক্ত নির্ঘণ্ট ৪৯ পৃষ্ঠা স্থান দখল করিয়াছে। প্রতি পৃষ্ঠায় দুই স্তম্ভে তালিকা সজ্জিত। প্রতি স্তম্ভে সাতাশটি হইতে ত্রিশটি নাম আছে। সুতরাং খুব উদারভাবে ধরিলেও এই গ্রন্থে তিনি ৫০ × ৩০ × ২ = ৩০০০ জ্ঞাত ও অজ্ঞাত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নামোল্লেখ করিয়াছেন। এই পুঁজি লইয়াই সেন মহাশয়ের এত আস্ফালন! সেন মহাশয় হয়তো কল্পনাও করিতে পারিবেন না যে, যে সময়ের মাত্র তিনহাজারী তালিকা প্রস্তুত করিয়াই তিনি আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়াছেন, সেই সময়ে অন্তত ত্রিশ হাজার গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচিত হইয়াছিল। কাজেই সংখ্যার কথা তুলিয়া সুবিধা হইবে না।

প্রথমেই সেন মহাশয়ের দুই-একটি আপ্তবাক্যের কথা বলি। তিনি 'শর্ম্মিষ্ঠা' [১৮৫৯] নাটক হইতে আট ছত্র পয়ার উদ্ধার করিয়া লিখিয়াছেন, "ইহাই বোধ হয় মধুসূদনের বাঙ্গালা কবিতা রচনার প্রথম প্রচেষ্টা"। মধুসূদনের জীবনেতিহাস বোধ করি সাহিত্য-ক্ষেত্রে সর্বাধিক আলোচিত হইয়াছে। যোগীন্দ্রনাথ বসুর [গ্রন্থের নাম উল্লেখেরও আবশ্যক হয় না] গ্রন্থ খুলিলেই ১০০-১০১ পৃষ্ঠায় মধুসূদনের 'শিক্ষাবস্থা —কবিতা রচনার আভাস' প্রসঙ্গে 'বর্ষাকাল' ও 'হিমঋতু' দুই দুইটি পয়ারবন্ধে রচিত আট ছত্র ও বারো ছত্রের কবিতা দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু যোগীন্দ্রনাথ বসু সম্ভবত সেন মহাশয়ের স্পৃশ্য নয়।

পৃ. ৫৩৭, অক্ষয়কুমার বড়াল সম্বন্ধে সৈনিক আপ্তবাক্য—"নারীপ্রেম অক্ষয়কুমারের কাব্যের একমাত্র উপজীব্য"। সেন মহাশয়কে অধিক পরিশ্রম করিতে বলিব না, বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইণ্টারমিডিয়েট বাংলা সিলেক্‌শনে' উদ্ধৃত অক্ষয়কুমারের 'মানব-বন্দনা' কবিতাটি পড়িয়া দেখিতে বলিব।

পৃ. ৫৪৪, কামিনী রায়ের 'আলো ও ছায়া' [১৮৮৯] কাব্যগ্রন্থের 'মহাশ্বেতা' ও 'পুণ্ডরীক' কবিতা আলোচনায় ঋষি-বাক্য উচ্চারিত হইয়াছে, "সংস্কৃত সাহিত্যের চরিত্র অবলম্বনে কাব্য রচনা ইহাই প্রথম"। এখানেও আমরা সেন মহাশয়কে অধিক দূর যাইতে বলিব না। আধুনিক বাংলা কাব্যের স্রষ্টা মধুসূদনেই সীমাবদ্ধ থাকিলে চলিবে। তিনি অনুগ্রহ করিয়া 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র [১৮৬৬] পৃষ্ঠা উল্টাইয়া সীতা দেবী, সুভদ্রা, উর্ব্বশী, দুঃশাসন, হিড়িম্বা, পুরূরবা, শকুন্তলা প্রভৃতি কবিতা একবার পড়িয়া দেখিবেন কি?

সৈনিক গবেষণার আর এক দিকের একটু নমুনা দিতেছি। 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপাইতে বোধ করি তাঁহার জুড়ি নাই। বাংলা সাহিত্যে স্বর্ণকুমারী দেবীর স্থান কোথায়, তাহা নূতন করিয়া বলার প্রয়োজন নাই। তাঁহার সমগ্র গ্রন্থরাজিও লোকলোচনের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সম্মুখেই রহিয়াছে। স্বর্ণকুমারী বহু গ্রন্থই লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সেন মহাশয়ের আদেশে তাঁহাকে আর একখানি নূতন গ্রন্থ লিখিয়া দিতে হইয়াছে। সেন মহাশয় লিখিতেছেন, "স্বর্ণকুমারী দেবীর দ্বিতীয় উপন্যাস 'কোরকে কীট' (১৮৭৭)।" একেবারে সন-তারিখ-যুক্ত নাম দেখিয়া ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলাম। এতদিন কেহই জানিত না যে, স্বর্ণকুমারী 'কোরকে কীট' নামেও একখানা উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। তাঁহার কোনও গ্রন্থাবলী বা গ্রন্থশেষের পরিচয়পত্রে বা সাময়িক-পত্রের সমালোচনায় দ্বিতীয় উপন্যাস হিসাবে 'কোরকে কীট'এর নামমাত্র নাই, বরং স্পষ্টাক্ষরে দ্বিতীয় উপন্যাস হিসাবে 'ছিন্নমুকুলে'রই নাম আছে। কিন্তু সৈনিক গবেষণার প্রতি শ্রদ্ধাবশত সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা ঘাঁটিয়া দেখিলাম যে, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-রচিত 'কোরকে কীট' নামে একটি 'সামাজিক চিত্র' মুদ্রিত হইয়াছিল। ১২৮৪ সালের ফাল্গুনের 'ভারতী'তে তাহার সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। এই যোগেন্দ্রনাথই সেন মহাশয়ের যোগপ্রভাবে স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে অভিন্নসত্ত্ব হইয়া উঠিয়াছেন।

যেখানে একজন সম্পর্কহীন পুরুষের কীর্তি এক প্রখ্যাতনাম্নী মহিলার স্কন্ধে আরোপিত হইতে পারে, সেখানে নাম-সাদৃশ্য থাকিলে তো

আর কথাই নাই! 'ভুবনমোহিনী-প্রতিভা'র নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ বাংলা-সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আরও কয়েকখানি গ্রন্থ আছে। কিন্তু সেন মহাশয় 'ভুবনমোহিনী-প্রতিভা'-রচয়িতার 'সমাজসংস্করণ' নামে একখানি নূতন গ্রন্থের সন্ধান দিয়াছেন। তাঁহার জানা নাই যে, 'সমাজসংস্করণে'র নবীনচন্দ্র পৃথক ব্যক্তি। লাইব্রেরির ক্যাটালগ-সর্বস্ব বিদ্যায় ইহা জানিবার অবশ্য উপায় নাই। কিন্তু 'সমাজসংস্করণ'খানি একবার উল্টাইয়া দেখিলেই তিনি জানিতে পারিতেন যে, এই গ্রন্থের লেখক 'বোড়াল বঙ্গবিদ্যালয়ে'র শিক্ষক ছিলেন; আর 'ভুবনমোহিনী-প্রতিভা'-রচয়িতা নবীনচন্দ্র "বর্ধমান বলগোনা পোস্টের অধীন বুড়ার গ্রাম নিবাসী ছিলেন"। ১৩০১ সালে প্রকাশিত আর্যসঙ্গীত, ২য় ভাগের শেষে কবি নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর যে তালিকা দেওয়া আছে, তাহা দেখিলেও সেন মহাশয় এরূপ ভুল করিতেন না। 'সমাজসংস্করণ' কতকগুলি ছাত্রপাঠ্য নিবন্ধের সমষ্টি মাত্র।

গবেষণার ঐন্দ্রজালিক শক্তির আর একটি পরিচয় দিলে ভাল হইবে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শেষ মৌলিক নাটক 'স্বপ্নময়ী' [১২৮৮] যখন প্রকাশিত হয় তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র বিশ বৎসর। কিন্তু সেন মহাশয় প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কনিষ্ঠের পরবর্তী সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে এই নাটকটি চুরি করিয়াছেন। ভাষাটি শুনুন,—

> নাটকটির পরিকল্পনায় ও রচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সুস্পষ্ট। সুরজমলের মধ্যে ঘরে-বাইরের সন্দীপের পূর্বাভাস নিতান্ত ক্ষীণ হইলেও লক্ষ্য করা যায়। কুকরামের ভূমিকায় ছায়া রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনায় পরিলক্ষিত হয়। রাজা পণ্ডিতবর্গ এবং রহিম খাঁ ভূমিকায় দ্বারা নাটকটিতে যে কৌতুকরসের যোগান দেওয়া হইয়াছে তাহাও রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট পদ্ধতি। নাটকের গতাংশ সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্রনাথের লেখা বলিয়া অনুমান করি। পৃ. ৩১১-১২

তস্কর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এতদিন কনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের লেখা চুরি করিয়া মৌলিক নাটক বলিয়া চালাইয়া আসিতেছিলেন, সৈনিক গবেষণায় সব বেফাঁস হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই চৌর্যবৃত্তিতে অলৌকিকত্ব আছে সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথের ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে লেখা 'ঘরে বাইরে'র চরিত্রকেও

তিনি পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে চুরি করিয়া রাখিয়াছিলেন !! কাণ্ডজ্ঞানহীন প্রলাপোক্তি সহ্য করিবারও একটি সীমা আছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়-পুষ্ট এই 'নাদাপেটা হাঁদারামে'র 'আচাভুয়ার বোম্বাচাক' অসহায় ছাত্রদিগকে ঘুরাইতেই হইবে !

গবেষণার কথা আর কত বলিব ! সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ঘাঁটিয়া তিনি মাত্র সাড়ে সাতজন মুসলমান লেখকের সন্ধান পাইয়াছেন। সব কথা বলিবার সময় নাই। ইঁহাদের সম্বন্ধে সেন মহাশয়ের জ্ঞান ও গবেষণার পরিধির কথা একটু মাত্র বলি। মীর মশাররফ হোসেন উনবিংশ শতাব্দীর বরণীয় বাংলা সাহিত্যিকগণের অন্যতম। তিনি অন্তত পঁচিশখানি ছোট বড় গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেন মহাশয় তন্মধ্যে মাত্র দুইটি নাটক, একটি প্রহসন, একটি আখ্যায়িকা-উপন্যাস এবং একখানি গদ্যগ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'বিষাদ-সিন্ধু' সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা মাত্র ৮টি শব্দে সমাপ্ত হইয়াছে, "মীর মশাররফ (sic) হোসেনের তিন পর্ব্ব 'বিষাদ-সিন্ধু' (১২৯১-৯৭) উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ"। সেন মহাশয়ের বিচার-বুদ্ধির উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কলঙ্কিতা কামিনী সম্বন্ধেই তিনি তাঁহার সমগ্র উচ্ছ্বাস অস্থানে নিঃশেষিত করিয়া দিয়াছেন, কাজেই 'বিষাদ-সিন্ধু'র জন্য এক বিন্দু অশ্রুও অবশিষ্ট না থাকিলে আফসোস করিয়া লাভ নাই। অন্যে পরে কা কথা, সেন মহাশয় উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি 'কায়কোবাদে'র নাম পর্যন্তও কখনও শুনিয়াছেন বলিয়া জানা গেল না। বয়সে রবীন্দ্রনাথের দুই বৎসরের বড়, এই কবি হেম-নবীনের আদর্শে 'মহাশ্মশান', 'বিরহ-বিলাপ', 'কুসুম-কানন', 'অশ্রুমালা' প্রভৃতি কাব্য রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

* * *

সাল-তারিখ এবং গ্রন্থাদির নামোল্লেখ সম্বন্ধে সেন মহাশয় নিরঙ্কুশ। সাল-তারিখের ভুলভ্রান্তি সম্বন্ধে কোনও ঐতিহাসিকই বোধ হয় ইতিপূর্বে এতটা নির্লজ্জ এবং বেপরোয়া হইতে পারেন নাই। গ্রন্থ প্রকাশের তারিখনির্ণয়ে যে একটা দায়িত্ব থাকিতে পারে এবং ঐতিহাসিক আলোচনায় যে তাহার বিশেষ মূল্য আছে, এই চেতনা লেখকের থাকিলে

তিনি পাতায় পাতায় অসংখ্য ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেন না। লেখকগণের সম্পর্কে রায়দান প্রসঙ্গে যেমন তিনি মুক্তকচ্ছ, গ্রন্থের উল্লেখ-অনুল্লেখ এবং প্রকাশকাল প্রভৃতি নির্ধারণেও তেমনই কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত। বিভিন্ন লাইব্রেরির ক্যাটালগ হইতে যে সব গ্রন্থের নাম তিনি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, পাঠ্য-অপাঠ্য, সাহিত্য-অসাহিত্য বিচারের অপেক্ষা না করিয়াই তিনি সেগুলিকে গ্রন্থে স্থান দিয়া ইতিহাসের কলেবর বৃদ্ধির আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু সাহিত্য কাহাকে বলে, এই জ্ঞান সেন মহাশয়ের থাকিলে তিনি মুদ্রাযন্ত্রের জঞ্জালকে এই ভাবে একত্র স্তূপীকৃত করিয়া সাহিত্যের ইতিহাস নাম দিয়া তাহা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। কোনও ভাষায় মুদ্রিত যে-কোনও বিষয়ের গ্রন্থই যে সাহিত্য নয়, এবং সাহিত্যের ইতিহাস-রচনায় মুদ্রিত গ্রন্থমাত্রই যে স্থান লাভের অধিকারী নয়, এই কথা সেন মহাশয়কে বুঝাইবে কে ?

কিন্তু তাহাও পরের কথা। গ্রন্থ-প্রকাশের তারিখ তিনি নির্ভুলভাবে সংগ্রহ করিবেন এতটা উচ্চাশা তাঁহার সম্বন্ধে আমরা পোষণ করি না। সবচেয়ে বিস্মিত হইতে হয় এই কথা ভাবিয়া যে, উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিতে যিনি প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ওই শতাব্দীর কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের জন্মসাল পর্যন্ত নির্ভুলভাবে জানিবার ধৈর্য এবং ঔচিত্যবোধ তাঁহার জন্মে নাই। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, বিহারীলাল চক্রবর্তী, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, দীনেশচরণ বসু, আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রমুখ সাহিত্যিকগণের জন্মসাল তাঁহার জানা নাই। ভূদেবের জন্ম তাঁহার মতে ১৮২৫ খ্রীঃ। কিন্তু ভূদেব প্রকৃতপক্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তার দুই বৎসর পরে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি। ৪২০ পৃষ্ঠায় নবীনচন্দ্র সেনের জন্মবৎসর তিনি ১৮৪৬ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু নবীনচন্দ্রের জন্ম তাহার পরের বৎসর হইয়াছিল। নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' সেন মহাশয় পড়েন নাই, 'আমার জীবনে'র পাতা উল্টাইলেই তিনি নবীনচন্দ্রের জন্মবৎসর জানিতে পারিতেন। বিহারীলাল চক্রবর্তীর জন্মবৎসর তিনি নির্দেশ করিয়াছেন ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ। কিন্তু বিহারীলালের জন্ম

হইয়াছিল ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২, ২১ মে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। ত্রৈলোক্যনাথের জন্মবৎসর তাঁহার জানা নাই। তিনি সেখানে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করিয়াই নিজের দায়িত্ব সমাপ্ত করিয়াছেন। কিন্তু 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থ পড়িলেই ত্রৈলোক্যনাথের জীবনী হইতে তিনি জানিতে পারিতেন যে, ১২৫৪ সালে ৬ই শ্রাবণ বুধবার, অর্থাৎ ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দীনেশচরণ বসুর মৃত্যুবৎসর সেন মহাশয়ের মতে ১৮৯৯, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি অবশ্যই তাহার পূর্ববৎসর লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। আনন্দচন্দ্র মিত্রের জন্মবৎসরও সেন মহাশয়ের অজ্ঞাত। জানিবার আগ্রহ থাকিলে তিনি অবশ্যই জানিতে পারিতেন, আনন্দচন্দ্র তাঁহার 'মিত্রকাব্যে'র (৩য় সং) ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "গ্রন্থকারের বয়ঃক্রম যখন বিংশতি বর্ষ, ক্ষুদ্রাকারে প্রকাশিত হইয়াও, মিত্রকাব্য তখনই সাহিত্য সমাজের যথেষ্ট স্নেহলাভ করিয়াছিল।" 'মিত্রকাব্য' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মে-জুন মাসে। চুয়াত্তর হইতে বিশ বৎসর বাদ দিলেই আনন্দচন্দ্রের জন্মবৎসর পাওয়া যাইত।

আশা করি, পাঠকগণ ইতিমধ্যেই সেন মহাশয়ের ঐতিহাসিক তথ্য-প্রকাশ সম্বন্ধে নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধের যথার্থ পরিচয় পাইয়াছেন। গ্রন্থ-খানির পাতায় পাতায় এত অসংখ্য ভুল আছে যে, সেন মহাশয়ের কোন কথাকেই কোন ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে ভরসা পাইবেন না। এই অসংখ্য ভ্রমপ্রমাদের মাত্র কয়েকটি আমরা নমুনা হিসাবে নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম।—

পৃ. ৭—অক্ষয়কুমার দত্তের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'-এর প্রথম ভাগের প্রথম প্রকাশকাল দেওয়া আছে ১৮৫২, উহা হইবে ১৮৫১। 'চারুপাঠ' প্রথম ভাগের প্রকাশকাল ১৮৫২ স্থলে হইবে ১৮৫৩। পৃ. ১৪১—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শরীর সাধনী বিদ্যার গুণোৎকীর্তন'-এর প্রকাশকাল দেওয়া আছে ১৮৬৯। উহা প্রকৃতপক্ষে ওই তারিখের নয় বৎসর পূর্বে ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয়। ২০ আগস্ট ১৮৬০ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' এই গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। ১১৬ পৃষ্ঠায় হরিশ্চন্দ্র মিত্রের গ্রন্থাদির নাম করিতে গিয়া তিনি লিখিতেছেন, 'শুভশু (শুভস্ত হইবে) শীঘ্রং' এবং 'ঘর থাকতে

জেজে' সম্ভবত ইহারই রচনা। 'সম্ভবত' কেন? বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে তৃতীয় সংস্করণের 'ঘর থাকতে বাবুই ভেজে' পুস্তকের এক খণ্ড আছে এবং উহার আখ্যাপত্রে গ্রন্থকার হিসাবে হরিশ্চন্দ্র মিত্রের নাম স্পষ্টাক্ষরে মুদ্রিত আছে। ওই পুস্তকেরই মলাটের ৪র্থ পৃষ্ঠায় হরিশ্চন্দ্র মিত্রের গ্রন্থাবলীর যে তালিকা আছে তাহাতে 'শুভস্য শীঘ্রং' পুস্তকেরও স্পষ্ট উল্লেখ আছে। পৃ. ১৮৫—হরিনাথ মজুমদারের 'পদ্ম পুণ্ডরীক'-এর তারিখ দেওয়া আছে ১৮৬৬, প্রকৃতপক্ষে উহা হইবে ১৮৬২। পৃ. ২৬৪—সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, "ইন্দ্রনাথের দ্বিতীয় গদ্যগ্রন্থ 'ক্ষুদিরাম' (১৩০৮)।" প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রনাথের দ্বিতীয় গদ্যগ্রন্থ 'পাঁচু-ঠাকুর'। 'ক্ষুদিরামে'র প্রথম প্রকাশকাল ১৩০৮ নহে; ইহা চৈত্র ১২৯৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। পৃ. ২৬৫—যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'কালাচাঁদে'র প্রকাশকাল দেওয়া হইয়াছে ১৮৮৯। কিন্তু ইহার বিভিন্ন খণ্ড (১-৫ পর্ব) ২ ডিসেম্বর ১৮৮৯ হইতে ১৭ মে ১৮৯০ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। 'চিনিবাস-চরিতামৃত' ১৮৯০ নয়, ইহা ২৭ জুন ১৮৮৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'মহীরাবণের আত্মকথা' ১৩১৩ সালে নয়, তার ১৮ বৎসর পূর্বে ১২৯৫ সালে প্রকাশিত হয়। যোগেন্দ্রচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী' ১৩০৩-০৯ সালে নয়, উহার তৃতীয় ভাগের দশম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত 'জন্মভূমি'তে (পৌষ ১৩০২—জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫) প্রকাশিত হয়। ইহা প্রথমে খণ্ডে খণ্ডে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম তিন ভাগ একত্রে (পৃ. ৫২৮) প্রকাশিত হয় ১৫ জুন ১৯০২ তারিখে। ইহার আরও তিনটি ভাগ প্রকাশিত হইয়াছিল। পৃ. ২৭১—ত্রৈলোক্যনাথের 'মুক্তমালা'র প্রকাশকাল সেন মহাশয় দিয়াছেন ১৩২৬। প্রশ্নবোধক চিহ্নের চং অবশ্য যুক্ত আছে, কিন্তু সংশয়ের কোনই অবকাশ ছিল না, ইহা প্রকাশিত হয় ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে। তেমনই 'পাপের পরিণাম'-এর প্রকাশকাল ১৩২০ নহে, উহা পাঁচ বৎসর পূর্বে ১৩১৫ সালেই প্রকাশিত হইয়াছিল। পৃ. ৩৩৩—'অপূর্ব সতী নাটক'-এর প্রকাশকাল ১২৮১ নহে, উহা হইবে ৩রা শ্রাবণ ১২৮২। আনন্দচন্দ্র মিত্রের অনেকগুলি পুস্তকেরই উল্লেখ সেন মহাশয় করিয়াছেন। এমন কি, বিদ্যালয়-পাঠ্য কয়েকখানি পুস্তকও তিনি বাদ দেন নাই। কিন্তু

'কবিতাকুসুম', 'মিত্রপাঠ' ও 'ব্যবহার দর্শন' এই তিনখানির সন্ধান পান নাই বলিয়াই উল্লেখ করেন নাই। আনন্দচন্দ্রের একখানি বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থেরও সংবাদ সেন মহাশয়ের জানা নাই। তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভজন-কাব্য 'মাতৃমঙ্গল'ই সেন মহাশয়ের তালিকা হইতে বাদ পড়িয়া গিয়াছে। তারিখের গোলমাল থাকিবেই। 'হেলেনা কাব্য' দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশকাল দেওয়া আছে ১৮৭৪, প্রকৃতপক্ষে উহা হইবে ১৮৭৭। পৃ. ৪৭৮—সেন মহাশয়ের মতে "বিহারীলালের প্রথম প্রকাশিত পুস্তক হইতেছে 'সঙ্গীত শতক'।" বলা বাহুল্য, ইহা ভুল। বিহারীলালের প্রথম প্রকাশিত পুস্তক হইল 'স্বপ্নদর্শন', প্রকাশকাল ১৮৫৮। সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, "বিহারীলাল 'অবোধবন্ধু' পত্রিকা পরিচালনা করেন (১২৭৩-৭৬)"। এই তারিখও ভুল। বিহারীলালের 'অবোধবন্ধু' পরিচালনার সময় হইল পৌষ ১২৭৫-১২৭৬। বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী'র দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল তিনি দিয়াছেন ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। আবার ওই পৃষ্ঠারই পাদটীকায় উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ প্রসঙ্গে কবির বক্তব্য উদ্ধার করা হইয়াছে—"...অদ্য ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পূর্ণ হইল। ৪ঠা ফাল্গুন বসন্তপঞ্চমী সরস্বতীপূজা, ১২৬৮ সাল।" সাল-তারিখ সম্বন্ধে সেন মহাশয়ের কাণ্ডজ্ঞান ও দায়িত্ববোধ থাকিলে তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, পাদটীকায় উদ্ধৃত ১২৬৮ সাল কখনই ইংরেজী ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ হয় না। প্রকৃতপক্ষে উভয় সালই ভুল। 'বঙ্গসুন্দরী'র দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল হইবে ১৮৮০। পৃ. ৪৯৭—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রসঙ্গে আছে,—"'সবিতা-সুদর্শন' ও 'ফুলরা' নামক গাথা কবিতা দুইটি ১২৭৫ সালে রচিত হইয়া ১২৭৭ সালে পুস্তিকাকারে বাহির হইয়াছিল"। 'ফুলরা' কখনও পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। ইহা কবির মৃত্যুর পর ১৩০০ সালে ৪র্থ ও ৫ম এবং ১৩০১ সালে ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যায় 'চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণে' প্রথম প্রকাশিত হয়। সুরেন্দ্রনাথের 'রাজস্থান' এবং 'বিশ্বরহস্য' প্রকাশের তারিখও ভুল আছে। 'রাজস্থানে'র প্রথম প্রকাশকাল ১২৮০-৮৫ স্থলে ১২৭৯-৮০ হইবে এবং 'বিশ্বরহস্য' ১৮৭৭-৭৮ না হইয়া ১৮৭৭ (১ কার্তিক ১৯৩৪ সংবৎ) হইবে।

ভুলের ফসল আর কুড়াইতে ইচ্ছা হইতেছে না। অখ্যাতনামা লেখকগণের প্রসঙ্গ আমরা উত্থাপনই করিতে চাহি নাই। অক্ষয়কুমার দত্ত, বিহারীলাল চক্রবর্তী, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রমুখ উনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট লেখকগণেরও রচনা প্রকাশের সাল-তারিখ সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান অর্জন না করিয়াই যিনি সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহার সম্বন্ধে এত কথা বলারই কোন প্রয়োজন ছিল না। গ্রন্থের শেষে সেন মহাশয় তাঁহার ভুল-ত্রুটি সংশোধন করিয়া এবং নূতন তথ্যাদি সন্নিবেশ করিয়া একটি "সংযোজন" অংশ যোজনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ভ্রম-সংশোধক এই সংযোজন অংশও ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ। একটি মাত্র উদাহরণ দিতেছি। পৃ. ৫৬২—বলদেব পালিত প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, "বঙ্গদর্শনে বলদেবের 'কাব্যমঞ্জরী'র ও 'ভর্তৃহরি কাব্য'এর সংক্ষিপ্ত সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। সেই সঙ্গে 'কাব্যমালা'-প্রণেতা অজ্ঞাতনামা কবির 'ললিতকবিতাবলী'ও (১৮৭০) সমালোচিত হইয়াছিল। 'ললিতকবিতাবলী'র কবিতাগুলি সংস্কৃত ছন্দে লেখা। 'কাব্যমালা' (১৮৭১) বৃহত্তর গ্রন্থ। অনেকে এই কাব্য দুইটিও বলদেব পালিতের রচনা বলিয়া মনে করেন। কিন্তু…"। সেন মহাশয় 'কাব্যমালা' ও 'ললিতকবিতাবলী' স্বচক্ষে দেখিয়াছেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। 'ললিত-কবিতাবলী' 'কাব্যমালা'র পরে প্রকাশিত হয়। 'ললিতকবিতাবলী' 'কাব্যমালা'-প্রণেতা অজ্ঞাতনামা কবির রচিত—এই কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ তিনি 'ললিতকবিতাবলী'র প্রকাশকাল ১৮৭০ এবং 'কাব্যমালা'র প্রকাশকাল ১৮৭১ নির্দেশ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে 'কাব্যমালা' এবং তৎপরে 'ললিতকবিতাবলী' একই বৎসরে—১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সেন মহাশয় 'কাব্যমালা' ও 'ললিতকবিতাবলী' যে বলদেব পালিতের রচনা, সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই পুস্তক দুইখানি আদিরস-ঘটিত বলিয়াই সম্ভবত বলদেব পালিত নাম প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। তবে ৩০ ডিসেম্বর ১৮৭০ তারিখের বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় 'ললিতকবিতাবলী'র প্রকাশকরূপে

'Buldeb Palit of Bankipur'এর উল্লেখ আছে। ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে উক্ত গ্রন্থ, এবং 'একই লোকের লেখা' বলিয়া 'কাব্যমালা'ও, বলদেব পালিতেরই রচনা।

পাঠকগণ মনে করিবেন না, এই কয়েকটিমাত্র ভুলই সেন মহাশয় করিয়াছেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, পাতায় পাতায় অসংখ্য ভ্রমপ্রমাদের মধ্যে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ এইখানে করা হইয়াছে। স্থান থাকিলে এই ভুলের তালিকা অন্তত দশগুণ বর্ধিত করা যাইত। অথচ সেন মহাশয় ইচ্ছা করিলে 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ' হইতে প্রকাশিত 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র সাহায্যে অতি অনায়াসেই এই সমস্ত ভ্রম-প্রমাদ হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। বিশ্ব-পাণ্ডিত্যে ঘা লাগিবে বলিয়াই কি তিনি সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার সুযোগ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন? এই আত্মম্ভরিতাই তাঁহার সর্বনাশের মূলে রহিয়াছে।

সেন মহাশয়ের জন্য সত্যই আমাদের দুঃখ হয়। কিন্তু পৃথিবীতে এই জাতীয় লোকেরও অভাব নাই। ছাত্রজীবনে সেন মহাশয় যদি টডের 'স্টুডেন্টস ম্যানুয়েল' বইখানিও একবার পড়িতেন, তাহা হইলেও তাঁহার কিছু শিক্ষা হইতে পারিত। এখন অবশ্য অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু উক্ত গ্রন্থ হইতে তাঁহার মত লোকের জন্য লিখিত অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। টড লিখিতেছেন—

Some of the most laborious men and diligent authors pass through life without accomplishing anything desirable, for the want of what may be called a well-balanced judgment. The last theory which they hear is the true one, however deficient as to proof from facts; the last book they read is the most wonderful, though it may be worthless; the last acquaintance is the most valuable, because least is known about him. Hence multitudes of objects are pursued, which have no use in practical life; and there is a laborious trifling—operose nihil agendo—which unfits the mind for anything valuable. It leads to a wide field, which is barren and waste.

ইহার প্রত্যেকটি কথা সেন মহাশয় সম্বন্ধে প্রযোজ্য। কিন্তু আফসোস করিয়া লাভ নাই, অভিভাবকেরাই সেন মহাশয়ের সু-কু বিচারের শক্তি মারিয়া দিয়াছেন।

বন্দনা

দাও দাও আরো দাও, যত পার দিয়ে যাও, আমি আজ বুভুক্ষু ভিখারী,
একদা গায়ের জোরে নিয়েছি আদায় ক'রে, তখন ছিলাম ক্রূর শিকারী।
শিকারের পিছে পিছে ঘুরিয়া মরেছি মিছে,
ধরা দেয় নাই কেউ; মরিয়া পায়ের নীচে
মিটায়েছে ক্ষুধা হায়, আজ সেই লজ্জায়, করুণার কণা ফিরি যাচিয়া—
মরিয়া দিয়েছ ঢের, ইতিহাস অতীতের—আজ যাহা পার দাও বাঁচিয়া।

তোমাদের ছাড়া আজ বিফল সকল কাজ, তোমরা ভরসা-আশা জীবনে,
ছিন্ন কাঁথাটি মোর দিয়ে প্রেম-স্নেহ-ডোর বাঁচায়েছ প্রত্যহ সীবনে।
ছিঁড়ে খুঁড়ে একাকার তবু আমি বার বার
করেছি আদায় তাই, নাই যাতে অধিকার,
তোমাদের করুণায় মৃতজনে প্রাণ পায় রঙ ধরে পাথরেরও বক্ষে,
তোমাদের জয় হোক জল-ভরা দুটি চোখ পড়ে যেন অনাদৃত লক্ষ্যে।

তোমরা শতেক রূপে হাঁকে ডাকে চুপে চুপে সুন্দর কর মোর ধরণী,
আসলে তো একজন, বহু দেহ এক মন, এক ছবি, বিচিত্রবরণী।
দেখিয়া অবাক হই, ভালবাসি বুকে লই,
ডুবে যাই গভীরেতে তবু নাহি পাই থই,
তোমরা জান না নিজে কি বা আছে দাও কি যে মণি দিয়ে কাচ নাও খুশিতে
পারি না বুঝিতে আজো তাহাদের রণসাজ-ও এত সোজা-মন যার তুষিতে।

জীবনের রূঢ় পথে এত দূর কোনমতে আসিয়াছি তোমাদের দয়াতে,
যদি মরণেরো পরে ক্ষুধা রয় এ অধরে, তোমরা পিণ্ড দিও গয়াতে।
দাও দাও দাও আরো যতখানি দিতে পারো,
তোমরাই হও খুশি পরিণামে যদি হারো,
মোদের দস্যুপনা তোমাদের কৃপাকণা পারিত কি সংগ্রহ করিতে,
তোমরা বাসিয়া ভাল যদি না করিতে আলো, কে পারিত এ আঁধার তরিতে?

কাগজ-নিয়ন্ত্রণ

ভারত সরকার সম্প্রতি কাগজ-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে রূঢ় কঠিন এবং প্রাণঘাতী আদেশ জারি করিয়াছেন, তাহার সমর্থনে কি না বলিতে পারি না, 'দি ষ্টেটসম্যান' একটি গল্প প্রচার করিতেছেন। চীনা পণ্ডিতের নিকট হইতে ভারতীয় লেখকেরা স্বভাবতই কিছু শিক্ষালাভ করিবেন—এই বিশ্বাসে হয়তো গল্পটি প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ভুলিয়া গিয়াছেন যে, দেড় গজ ছাতার কাপড়ে চীনাদের লজ্জা নিবারণ হয়, আর এগারো হাতেও আমাদের এদিকে তনু ঢাকিতে ওদিকে উদাস হইয়া পড়ে। যাহা হউক, চীনা পণ্ডিতের গল্পটি শুনুন।—

একজন চীনা পণ্ডিত চুরানব্বই বৎসর বয়সে হঠাৎ মারা গেলেন, ছাপাখানার জন্যে তাঁর পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হবার আগেই এই দুর্ঘটনা ঘটল। বইটি আকারে অবিশ্যি খুবই ছোট হ'ত—উক্ত মনীষীর জীবনব্যাপী চিন্তার সার-সংগ্রহ। লেখকের যখন মাত্র পঁচাত্তর বছর বয়স তখনই বইটির প্রথম খসড়া সম্পূর্ণ হয়, কিন্তু তিনি পাকা পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার আগে আর একবার অবসর মত সমস্ত বিষয়টা বিচার ক'রে দেখতে মনস্থ করলেন। এই চৈনিক ঋষি পাশ্চাত্য লেখকদের সামনে এক মহৎ আদর্শ স্থাপন ক'রে গেছেন। যদি তাঁর বন্ধুরা তাঁকে ভবিষ্যৎ-বংশধরদের ঋণজালে বদ্ধ করবার জন্যে তাঁর জীবনের দর্শন লিপিবদ্ধ করতে একান্ত অনুরোধ না করতেন, তা হ'লে তিনি কখনই বইখান লিখতেন না। বিশেষ অনিচ্ছার সঙ্গে তিনি এই কাজে সম্মত হয়েছিলেন, কারণ সময়টা তিনি অন্য অনেক মূল্যবান কাজে ব্যয় করতে পারতেন। তা ছাড়া তাঁর বরাবরই সন্দেহ ছিল বই লেখবার মত যথেষ্ট অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল কিনা।

নিউইয়র্ক টাইম্‌স ম্যাগাজিনে এল. এইচ. আর. লিখিয়াছেন :

শনিবার রাত্রে সপ্তাহের গুরুতর পরিশ্রমের পর যখন ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফিরি, তখন স্বভাবতই খবরের কাগজ ও সাময়িক পত্রের ষ্টলের সামনে শিলিং খানেকের "খুন" কেনবার জন্যে দাঁড়াই। খুনগুলি সারবন্দী সাজানো থাকে—লাল মলাটে 'সূর্য্যোদয়ে খুন'; সবুজ মলাটে 'মধ্যাহ্নে খুন' এবং নীল মলাটে 'সূর্য্যাস্তে খুন'। চোখের আরামদায়ক কমলা রঙে 'বেলা চারটের খুনে'র থাক প্রায় সিলিং পর্য্যন্ত ঠেকে আছে দেখি। আমি জানি আসছে শনিবার পর্য্যন্ত এর একখানিও অবশিষ্ট থাকবে না—হলুদরঙা 'প্রাতরাশের সময় খুন' ওই জায়গা দখল করবে। খুন-ছুট উপন্যাসের প্রকাশে বারংবার বিলম্বের জন্যে এদিকে প্রকাশকেরা কাগজ-ঘাটতির দোহাই দিয়ে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন, কিন্তু "খুনে" উপন্যাসের বহর দেখে মনে হয় নিয়ন্ত্রণ-আদেশ এগুলির জন্যে নয়। দোকানদার বলে, যুদ্ধের ব্যাপার বুঝতেই পারছেন, লোকের উত্তেজনা নিবৃত্তির জন্যে কিছু তো দিতে হবে!

মহাস্থবির জাতক

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সুজাতার মৃত্যুর পরদিন অতি প্রত্যুষে বাবা দরজা ধাক্কা দিয়ে আমাদের দুই ভাইকে ঘুম থেকে তুলে হেদোয় বেড়াতে নিয়ে গেলেন। সেখানে পাক পাঁচেক চক্কর দিয়ে বাড়িতে এসেই বললেন, জামা-টামা ছেড়ে বই নিয়ে এসে পড়তে ব'স।

তিনি হয়তো মনে করেছিলেন, সব দিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টির অভাব ঘটাতেই আমাদের পক্ষে এমন বেয়াড়া হয়ে পড়া সম্ভব হয়েছে। পড়তে বসামাত্র আমার ইতিহাসের বইখানা হাতে তুলে নিয়ে প্রশ্ন করলেন, কুতবউদ্দিন কে ছিল ?

আমার মন তখন কুতবউদ্দিনের চেয়ে অনেক বড় বড় ঐতিহাসিক ব্যক্তি—Mary Godwin, Emily Vivianaর চিন্তায় মশগুল। কুতব-উদ্দিনের মতন লোক সেখান থেকে চিরদিনের জন্যে নির্ব্বাসিত হয়েছে। বাবার মুখে সে নাম শুনে কুতবমিনারের চিন্তায় কড়িকাঠের দিয়ে চেয়ে আছি, এমন সময় খটখট শব্দ শুনে সামনে চেয়ে দেখি যে, ধীর পদক্ষেপে পাগলা সন্ন্যেসী আসছেন আমাদের পড়বার ঘরের দিকে।

খড়ম পায়ে খটখট শব্দ করতে করতে তিনি আমাদের ঘরে এসে ঢুকলেন। ঘরের মধ্যে একখানা তক্তাপোশ আর তার ধারে খানকয়েক চেয়ার সাজানো থাকত। আমরা বসতুম তক্তাপোশে আর বাবা বসতেন চেয়ারে। ঘরের মধ্যে কোনও গুরুজন থাকলে চেয়ারে বসা আমাদের বারণ ছিল। যাই হোক, পাগলা সন্ন্যেসী ঘরের মধ্যে আসতেই বাবা তাঁকে নমস্কার ক'রে বললেন, বসুন।

পাগলা সন্ন্যেসী মিনিটখানেক চুপ ক'রে ব'সে থেকে আমাদের দেখিয়ে বললেন, আমি এই রামবাবু আর লক্ষ্মণবাবুর বন্ধু।

আমরা প্রমাদ গুনতে লাগলুম। মনে হ'ল, ফাঁড়া এখনও কাটে নি বোধ হয়, নইলে পাগলা সন্ন্যেসীর মতন লোক এমন কাঁচা কাজ করবে কেন ?

বাবা তো একেবারে অবাক! আমাদের দিকে একবার চেয়ে তাঁর দিকে মুখ করতেই তিনি বললেন, আমরা এদের রাম-লক্ষণ ব'লে ডাকি। স্থবির-অস্থির আবার কোন্ দেশের নাম মশায়?

বাবা একটু হাসবার চেষ্টা করলেন মাত্র।

পাগলা সন্ন্যেসী আমাদের দেখিয়ে বললেন, এ দুটি কি আপনার ছেলে?

হ্যাঁ।

এদের মা বেঁচে আছেন?

হ্যাঁ।

মা বেঁচে থাকতেই এই!

বাবা মনে করলেন, তিনি বোধ হয় আমাদের নামে কোন গুরুতর অভিযোগ করতে এসেছেন। একটু সঙ্কুচিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন এসব প্রশ্ন করছেন বলুন তো?

একটু কারণ আছে। দেখুন, রামবাবু আর লক্ষ্মণবাবু আমার বন্ধু—বিশেষ বন্ধু। আপনি কাল রাতে এদের ওপর যখন অমানুষিক অত্যাচার করছিলেন, তখন আমার উচিত ছিল আপনার হাত থেকে এদের রক্ষা করা। কিন্তু আমি বৃদ্ধ, হয়তো সামর্থ্যে আপনার সঙ্গে আমি পারব না, তাই ভেবে তখন আসি নি। কিন্তু আপনি এদের যত মেরেছেন, তার প্রত্যেকটি আঘাত আমায় লেগেছে। বারদিগর এমন হ'লে আমাকে আসতে হবে।

এমন সব কথা বাবার মুখের সামনে কেউ বলতে পারে, তা আমাদের কল্পনারও অতীত ছিল। বাবা সব শুনে একটু আমতা আমতা ক'রে বললেন, বড় অবাধ্য ছেলে মশাই, কিছুতেই কথা শুনতে চায় না। বড় বদ ছেলে, আপনি চেনেন না এদের।

আমি চিনি না এদের!

পাগলা সন্ন্যেসীর হাসি শুনে বাবা চমকে উঠলেন।

আমি চিনি না এদের! আপনি চেনেন না এদের। আমার তো মনে হয়, এরা মহাপুরুষ। আপনার ভাগ্য যে, এমন সব ছেলে আপনার

ঘরে জন্মেছে। কিন্তু এদের মানুষ করতে পারবেন না আপনি, আমি দিব্যচক্ষুতে দেখতে পাচ্ছি।

বেশ বোঝা গেল, আমাদের প্রশংসা শুনে বাবা খুশি হয়েছেন। তিনি বললেন, দেখুন, কথা না শুনলে আমার বড় রাগ হয়, আর একবার রাগলে আমার জ্ঞান থাকে না। এদের বিকেলে বাড়ি থেকে বেরুতে বারণ করি, কিন্তু কিছুতেই ওরা সে কথা গ্রাহ্য করে না। কি করি বলুন তো?

কেন বাড়ি থেকে বেরুতে বারণ করেন?

বাইরে বদ সঙ্গী জুটতে পারে।

আচ্ছা, আপনি আর ক বছর এদের বাড়িতে বন্ধ রাখবেন, জিজ্ঞেস করি? ওরা ইস্কুলে যায়, সেখানে তো বদ সঙ্গী জুটতে পারে। তা হ'লে ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ ক'রে দিয়ে ছেলেদের সিন্ধুকে তুলে রেখে দিন।

বাবা একটু হাসলেন মাত্র।

পাগলা সন্ন্যেসী আবার শুরু করলেন, আপনি তো এদের বাইরে যেতে বারণ ক'রে দিয়েই নিশ্চিন্ত হলেন। তারপর, বাইরে এদের বন্ধুবান্ধব রয়েছে, খেলা রয়েছে, কত রকম উত্তেজনা রয়েছে, তার বদলে বাড়িতে কি ব্যবস্থা করেছেন শুনি? মশাই, এই দাড়ি পাকতে সত্তর বছর লেগেছে আমার, ছেলে-বয়েস আপনারও একদিন ছিল, ছেলেদের মনটা সেই বয়েস দিয়ে একবার বুঝতে চেষ্টা করবেন।

বাবা আমাদের বললেন, যাও, তোমরা বাড়ির ভেতরে যাও।

আজ্ঞা পাওয়ামাত্র আমরা বই গুটিয়ে নিয়ে উঠে গেলুম।

তারপর পাগলা সন্ন্যেসীর সঙ্গে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ধ'রে বাবার আলাপ-আলোচনা চলল।

সেদিন খেতে ব'সে বাবা ঘোষণা করলেন, আচ্ছা, তোমরা বিকেলে ঘণ্টাখানেক ক'রে বেড়িয়ে আসবে। সন্ধ্যের আগেই বাড়ি ফিরতে হবে, বুঝলে?

গোষ্ঠদিদির সঙ্গে আমাদের বাড়ির সবারই খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ ক'রে আমার ও অস্থিরের ছিল সে প্রাণের বন্ধু। সেই মিষ্টভাষী, স্বামীপরিত্যক্তা অসহায়ার চরিত্রে এমন একটা মাধুর্য্য ছিল যে, দুদিনেই

সে অপরিচিতকে আপনার ক'রে নিতে পারত। অথচ সবার চেয়ে আপনার করার যাকে প্রয়োজন, সেই স্বামীকে সে কোনও আকর্ষণেই বাঁধতে পারে নি।

গোষ্ঠদিদির শ্বশুর তাঁর পেন্‌সনের টাকা ও বড়ছেলে যে টাকা পাঠাত সে টাকা তার কাছেই রেখে দিতেন খরচের জন্যে। ভদ্রলোক কখনও তার কাছে কোনও হিসাব চাইতেন না। এজন্যে গোষ্ঠদিদির তহবিল সর্ব্বদা পূর্ণ থাকত। আমরা তার জন্য লুকিয়ে সেকরা ডেকে আনতুম, সে গয়না গড়াত। খাওয়া-দাওয়া তো প্রায় নিত্যই হ'ত। শুক্ল-পক্ষের সময় আগে থাকতে সে পয়সা দিয়ে রাখত আর আমরা লতুদের বাড়ি থেকে ফেরবার মুখে এক চ্যাঙারি খাবার কিনে এনে তার কাছে জমা রেখে বাড়িতে আসতুম। অনেক রাত্রে আমাদের বাড়ি ও পাড়া নিঝুম হয়ে পড়লেও আমরা দু ভাই বাতি নিবিয়ে জেগে প'ড়ে থাকতুম, তারপরে গোষ্ঠদিদির সঙ্কেতধ্বনি শোনামাত্র নিঃশব্দে তাদের ছাতে চ'লে যেতুম। গোষ্ঠদিদি আগে থাকতেই মাদুর বালিশ, কুঁজো গেলাস নিয়ে এসে রাখত। আমরা আগে ভরপেট খেয়ে নিয়ে তারপরে গল্প করতুম। সেই তার ছেলেবেলাকার জীবন; অত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও কদিনের জন্য কার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল, কে তাকে কোন দিন কি মিষ্টি কথা বলেছিল,—কত লোকের কথা, তার স্বামীর কথা, তার অদ্ভুত শ্বশুরের কথা।

আমরাও বলতুম, আমাদের ইস্কুলের কথা, লতুদের কথা, দিদিদের কথা।

গোষ্ঠদিদির সঙ্গে আমাদের সব কথা হ'ত। তার স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করলে বলত, ও আমার মাছ খাওয়ার টিকিট।

শ্বশুর মারা গেলে যে তার কি হবে, তাই নিয়ে আমরা তিনজনে যে কত চিন্তা করেছি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ ক'রে ছাতে ব'সে ভেবেছি, তার ঠিকানা নেই। গোষ্ঠদিদি থেকে থেকে বলত, তোরা আমার রাম-লক্ষ্মণ ভাই রয়েছিস, আমার ভাবনা কি?

মাঝে মাঝে সে আমাদের গল্পের বই নিয়ে আসবার জন্যে তাগাদা দিত। আমরা মধ্যে মধ্যে লতুদের বাড়ি ও দিদিদের ওখান থেকে বই এনে দিতুম। কিন্তু তার ছিল বিপুল অবসর, আর আমাদের যোগান ছিল

অল্প,-কাজেই তার বইয়ের পিপাসা কিছুতেই মেটাতে পারতুম না। আমাদের পাড়ায় একটা কনসার্টের আখড়া ছিল, সেখানে তিন-চারটে আলমারি থাকত বইয়ে ভরা। পাড়ার ছেলেরা এটাকে লাইব্রেরি বলত। একদিন আমি সাহস ক'রে এই ক্লাবের একজনের কাছে বই চাইলুম। ক্লাব-ঘরে তখন আর কেউ ছিল না।

আমি বই চাইতেই লোকটা একটু আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি, খোকা, এই বয়সেই নভেল পড়তে শুরু করেছ?

খোকা যে স্রেফ দয়া ক'রে নভেল লেখা শুরু করে নি, সে কথা তো আর সে জানত না। যা হোক, সে অমর্য্যাদা উপেক্ষা ক'রে বললুম, আমি পড়ব না, গোষ্ঠদিদির জন্যে চাইছি।

লোকটা আমার কথাগুলো ভাল ক'রে শুনতে পায় নি। সে একেবারে খেঁকিয়ে উঠে বললে, গোষ্ঠদা! কে তোমার গোষ্ঠদা? সে কি লাইব্রেরির মেম্বার?

বললুম, গোষ্ঠদা নয়, গোষ্ঠদি।

আহা! মুহূর্ত্তের মধ্যেই কি অপূর্ব্ব রূপান্তর! তবু দুর্জ্জনেরা বলে, বাঙালী নারীর সম্মান জানে না।

গোষ্ঠদির নাম শুনেই সে আমায় খাতির ক'রে বসিয়ে ঠারে-ঠুরে তার চেহারাটা কি রকম, তা জানবার চেষ্টা করতে লাগল।

সন্ন্যেসীর ছোট ছেলের বউ বললে না?

হ্যাঁ।

ও, ওদের বাড়ির ছাতে সন্ধ্যেবেলায় দেখেছি বটে। রংটা খুব ফরসা, না?

হ্যাঁ, একেবারে দুধে আলতায়।

মুখখানা তো তেমন ভাল নয়।

কেন, গোষ্ঠদির চমৎকার মুখ, যেমন চোখ তেমনই নাক, যেন তুলি দিয়ে আঁকা। আপনি তা হ'লে অন্য কারুকে দেখেছেন।

হ্যাঁ, আমি দুজনকে দেখেছি, তার মধ্যে কোন্‌টি তোমার গোষ্ঠদি, তা তো জানি না।

বলা বাহুল্য, গোষ্ঠদিদের বাড়ি দ্বিতীয় স্ত্রীলোক কেউ ছিল না।

লোকটা কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে আবার বললে, তা গোষ্ঠদি বুঝি তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলে?

হঁ্যা।

তা দেখ, বিকেলবেলা এস। এখন চাবি নেই, তখন বই বের ক'রে দোব, খুব ভাল বই দোব।

বিকেলে লোকটার কাছে যেতেই সে একখানা চটি বই দিয়ে বললে, এর পরে মোটা বই দোব।

তখন তাড়াতাড়ি লতুদের বাড়ি যেতে হবে, তাড়াতাড়ি বইখানা গোষ্ঠদিকে দিয়েই মারলুম দৌড়, তবু বইখানার নাম মনে আছে,—গয়ার ভূত, প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

পরের দিন গোষ্ঠদির সঙ্গে দেখা হতেই সে বললে, হঁ্যা রে, কার কাছ থেকে বই এনেছিলি?

কেন?

কেন কি রে! তার মধ্যে চিঠি দিয়েছে।

সত্যি! দেখি।

প'ড়ে দেখি, লোকটা গোষ্ঠদিকে একখানা দু-পৃষ্ঠাব্যাপী প্রেমপত্র ছেড়েছে। কোন একখানা বটতলার নভেলের সর্ব্বনাশ ক'রে চোখা চোখা প্রেমবাণ ছেড়েছে গোষ্ঠদির উদ্দেশে।

গোষ্ঠদি বললে, বইখানা ফিরিয়ে দিয়ে আয়।

আমরা বললুম, তুমি বেশ ক'রে গালাগালি দিয়ে একখানা চিঠি লেখ।

আমি গালাগালি জানি না।

তাতে কি হয়েছে, আমরা শিখিয়ে দিচ্ছি।

না না, কি হতে কি হবে, বইটা ফেরত দিগে যা।

বইখানা নিয়ে বাড়িতে রেখে দেওয়া গেল। রাত্রে পড়াশুনো সেরে নিজেদের ঘরে এসে দুই ভাইয়ে মিলে লোকটাকে গালাগালি দিয়ে একখানি চিঠির খসড়া করা গেল। খিস্তিবিদ্যার আদ্য ও মধ্য পরীক্ষা তখন আমরা পার হয়েছি, কাজেই ভাষার অভাব হ'ল না। গোষ্ঠদিদিই

যেন লিখছে, এই ভাবে শুরু করা গেল। তাতে লোকটার পিতৃ ও মাতৃ-পুরুষের সমস্ত গুরুস্থানীয়ার সঙ্গে তার অসম্ভব, অসঙ্গত ও অনৈসর্গিক সম্বন্ধ আরোপ ক'রে শেষে লেখা হ'ল, এমন চিঠি আর যদি আসে, তবে তার মুণ্ডপাত অনিবার্য্য।

পরের দিন 'গয়ার ভূতে'র মধ্যে চিঠি ভ'রে লোকটাকে ফিরিয়ে দিয়ে এলুম। তারপরে অনেকদিন পর্য্যন্ত লোকটা আমাদের দেখলেই মুখ তুলে চেয়ে থাকত। তার মুখ দেখে মনে হ'ত, যেন সে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চায়, কিন্তু কোনদিন কিছু জিজ্ঞাসা করে নি।

গোষ্ঠদিদি সব সময়েই বেশ হাসিখুশিই থাকত, কিন্তু মাঝে মাঝে তার কি হ'ত জানি না, সে দিনের পর দিন বিষণ্ণ হয়ে থাকত।

একদিন মনে পড়ে, অনেক রাতে ছাতের ওপরে গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছি, হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতেই উঠে বসলুম। দেখি, এক পাশে অস্থির প'ড়ে ঘুম লাগাচ্ছে, আর এক দিকে গোষ্ঠদি দূর দিগন্তের দিকে চেয়ে ব'সে আছে। কৃষ্ণপক্ষের রহস্যময় জ্যোৎস্নার সঙ্গে শরৎশেষের হিমানীর জাল বোনা চলেছে—ঘুমন্ত নগরীর ওপরে কে যেন আবরোঁয়ার মশারি ঢেকে দিয়েছে। দূরে ও কাছের বাড়িগুলো যেন একটা অদ্ভুত আকারের জীব, গাছের মতন তাদেরও প্রাণ আছে, কিন্তু চলবার শক্তি নেই। চারিদিকে দেখতে দেখতে আমার মনটা কেমন ঔদাস্যে ভ'রে উঠতে লাগল। পাশে অস্থির ঘুমিয়ে আছে; গোষ্ঠদিদি তখনও সেই ভাবে দূরে চেয়ে। আমার মনে হতে লাগল, আমরা তিনজন যেন কোন দূর নক্ষত্রের দেশ থেকে এইমাত্র এখানে এসে পড়েছি। আমরা এখানকার কারুর নয়, এখানে আমাদেরও কেউ নেই। এ জগতে এইমাত্র যেন আমার চেতনা আরম্ভ হ'ল। তিনজনে কতদিন একসঙ্গে চলব? সেই মুহূর্ত্তেই মনের মধ্যে কে যেন বললে, তুমি একা। কেন জানি না, আমার মনে হতে লাগল, এদের সঙ্গে বিচ্ছেদ হবে, দীর্ঘ জীবন-পথ এদের ছাড়াই চলতে হবে। তারপরে কোনদিন কোন লোকে দেখা হতেও পারে, নাও হতে পারে। বুকের মধ্যে সহস্র নিষেধ হাহাকার ক'রে উঠল। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে ডেকে উঠলুম, গোষ্ঠদি!

কি ভাই?

তুমি কদিন থেকে অমন মনমরা হয়ে রয়েছ কেন ? তোমার কি দুঃখ, আমাকে বলবে না ভাই ?

গোষ্ঠদি ঘুরে দু হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে আমার গালে মুখ রেখে কাঁদতে লাগল। কয়েক মিনিট সেই ভাবে থেকে মুখ তুলে বলতে লাগল, আমার দুঃখ তো তোরা জানিস। মনে কর, ছেলেবেলায় করে বাপ-মা হারিয়েছি মনে নেই। মামার ছেলেমেয়ের সঙ্গে মানুষ হচ্ছিলুম, তারা যাকে মা বলে আমিও তাকে মা ব'লে জানি, হঠাৎ একদিন জানতে পারলুম আমার মা নেই, সেদিনকার সে দুঃখ তোরা কল্পনা করতে পারবি না। পূজোর সময় একখানা নতুন কাপড় কখনও পাই নি। তারপরে অন্নকষ্ট। ভগবান শত্রুকেও যেন তা না দেন।

তা বিয়ে হওয়ার পর তোমার সে কষ্ট তো আর নেই।

না, তা নেই বটে, কিন্তু অন্নকষ্ট মিটলেই কি সব কষ্ট মিটে যায় ?

ছেলেবেলা থেকে পথে-ঘাটে ভিখিরীর আকূতি শুনে, চাকর-বাকরদের দারিদ্র্য ও অতি সামান্য আহার্য্য দেখে কি জানি মনের মধ্যে ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, অন্নকষ্টই মানুষের জীবনের একমাত্র কষ্ট। এটি কোন রকমে এড়াতে পারলে জীবন সুখময় হয়। অন্নকষ্ট পরমসুখে নিবৃত্তি হওয়ার অনিবার্য্য পরিণামরূপে যে আরও নানা রকম কষ্ট আসতে আরম্ভ করে, তার স্পষ্ট ধারণা তখনও হয় নি।

আমাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে গোষ্ঠদিদি আবার বলতে আরম্ভ করলে, এই নির্জ্জন প্রেতপুরীর মধ্যে একলা জীবন কাটে, একটা লোক নেই যে, মনের কথা দুটো বলি। স্বামী থেকেও নেই, এ কি কম দুঃখ রামভাই !

গোষ্ঠদিদিকে বললুম, তোমার স্বামী যখন তোমাকে ভালবাসে না, তখন তুমিও অন্য কারুকে ভালবাসতে আরম্ভ কর না কেন ?

তাতে লাভ কি ?

তার সঙ্গে চ'লে যাবে, সে তোমায় যেখানে নিয়ে যায়।

মাঝে মাঝে তাই ইচ্ছে হয়, কিন্তু বাবা রে !

কেন ?

যার সঙ্গে যাব, সে যদি কোনদিন ফেলে পালায়! সারাজীবন ভাত-কাপড়ের কষ্ট পেয়েছি, আবার যদি সেই কষ্ট পাই, এখানে দুটি খেতে পাচ্ছি তো।

ভাত-কাপড়ের পাছে অভাব হয়, সেই ভয়ে গোষ্ঠদি পালায় নি; কিন্তু ভবিষ্যতে অনেক মেয়ের মুখে শুনেছি ও নিজেও দেখেছি, যারা ভাত-কাপড়ের অভাব ঘোচাবার জন্যে বাড়ির বাইরে পা বাড়িয়েছে।

●

শচীনের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে আমাদের সন্ন্যাসব্রত তখনকার মত ভেঙে গিয়েছিল বটে, কিন্তু বছর খানেক যেতে না যেতে আবার আমাদের যুক্তি শুরু হয়ে গেল। প্রমথ গোড়াতেই সাবধান ক'রে দিলে, এবার আর শচেটাকে ভিড়তে দেওয়া নয়।

খুব গোপনে ও সাবধানেই আয়োজন ও পরামর্শ চলছিল, কিন্তু তবুও শচীন একদিন টের পেয়ে গেল। সে অনুতপ্ত হয়ে বললে যে, তখন সে সংসারকে ভাল ক'রে চিনতে পারে নি, এখন সংসারের প্রতি সত্যিই তার আর কোন মায়া নেই, জগৎকে ভাল ক'রেই সে চিনে নিয়েছে।

তিনজনে মিলে আবার পরামর্শ শুরু হ'ল। সেদিন থেকে এ দিনের এক বছরের তফাত। বয়সে মাত্র এক বছর বাড়লেও এরই মধ্যে দশ বছরের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। গাধার পিঠে মাল চাপিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়লেই যে শান্তি ও তপস্যামার্গে বিচরণ করতে পারা যায় না, সে বুদ্ধি টনটনে হয়েছে। তাই প্রথমেই আমরা হিংস্র জানোয়ারদের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে অস্ত্র সংগ্রহ করতে আরম্ভ ক'রে দিলুম।

অস্ত্র-আইন থাকলেও তখন বাজারে ভাল ভাল দিশী ও বিলিতী ছোরা কিনতে পাওয়া যেত। আমরা পয়সা জমিয়ে প্রথমেই তিনটি ভাল ছোরা কিনে ফেললুম। তারপরে তিনটি পাকা বাঁশের লাঠি। কামারের দোকানে ইস্পাত দিয়ে তিনটে চমৎকার ধারালো বর্শাফলক বানানো হ'ল। এ ছাড়া প্রমথর গুরুদত্ত সেই মারাত্মক বাণগুলো তো আছেই।

অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া ধান, কাঁচামুগ ইত্যাদি কেনা হ'ল চাষ করবার জন্যে। দেশলাই নেওয়া হ'ল বারো ডজনের একটি বড় বাণ্ডিল। দেশলাই

ফুরিয়ে গেলে শুকনো পাতা সংগ্রহ ক'রে তাতে আগুন ধরাবার জন্যে একটি বড় আতস-কাঁচ ইত্যাদি সব প্রমথদের বাড়ির একটা অন্ধকার ঘরে জমা হ'তে লাগল। এসব ছাড়া ইস্ক্রুপ, পেরেক ও ছুতোর-মিস্ত্রির যন্ত্রপাতিও যোগাড় হ'ল, জঙ্গলে থাকবার মতন অন্তত একখানা ঘরও তৈরি করতে হবে তো!

আবার এক শনিবারে ইস্কুলের ছুটির পর সেই বিরাট বোঝা তিন ভাগে ভাগ ক'রে নিয়ে একটা খাবারের দোকানে ব'সে ভরপেট খেয়ে আমরা গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড অভিমুখে যাত্রা করলুম। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড আমার চেনা ছিল, অনেকদিন আগে দাদার সঙ্গে এসে দেখে গিয়েছিলুম।

হাওড়ার পোল পেরিয়ে, মাঠের ধার দিয়ে গিয়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের কাছে এসে কি রকম সন্দেহ হ'ল, এই রাস্তাটা সেই রাস্তা কি না! বোঝার ভারে তখন আমাদের তিনজনেরই অবস্থা কাহিল। পথের ধারে বোঝা নামিয়ে পরামর্শ করতে লাগলুম, অতঃপর কি করা যায়!

কিছুক্ষণ বাদে স্থির হ'ল, আগে কোন লোককে জিজ্ঞাসা ক'রে নেওয়া যাক, আসলে এটাই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড কি না। তখন বেলা প্রায় পাঁচটা হবে, হাওড়ার মাঠে বোধ হয় কোন খেলা-টেলা ছিল, দলে দলে লোক মাঠের দিকে যাচ্ছিল। দুটি নিরীহগোছের ভদ্রলোক সেই দিকেই যাচ্ছিল, আমি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, হ্যাঁ মশায়, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডটা কোন্ দিকে?

তাদের মধ্যে একজন মিনিট খানেক আমার মুখের দিকে কটমট ক'রে চেয়ে থেকে আমাকে বললে, কোথায় যাবে? গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড?

হ্যাঁ।

তোমার বাড়ি কোথায়?

আমার বাড়ি ওতোরপাড়া, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারেই।

লোকটা এবার টপ ক'রে আমার একখানা হাত ধ'রে তার সঙ্গীকে বললে, দেখ, আমার মনে হচ্ছে, এ ছোকরা বাড়ি থেকে পালিয়েছে।

আমি কাঁধ থেকে পুঁটলিটা নামিয়ে এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিলুম। ততক্ষণ প্রমথ ও শচীন কাছে এসে তাদের জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছে মশায়, ওকে ধ'রে টানাটানি করছেন কেন?

তোমরা কে ?

শচীন বললে, আমরা এর বন্ধু।

তোমাদের বাড়ি কোথায় ?

শচীন বললে, অত হাঁড়ির খবরে তোমাদের দরকার কি হে ? যাও না, যেখানে যাচ্ছ সেদিকে এগিয়ে পড়।

ব্যাপারটা হয়তো সহজেই মিটে যেত, কিন্তু আমাদের মুখে ওই রকম চোটপাট জবাব তারা বরদাস্ত করতে পারলে না, তাদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগল। একজন বললে, ধর এদের। ছোঁড়াগুলো নিশ্চয় বাড়ি থেকে ভেগেছে।

একজন প্রমথর হাত চেপে ধ'রে বললে, চল, তোমাকে থানায় যেতে হবে।

প্রমথ ছিল রোগা, তার গায়েও মোটে জোর ছিল না। সে হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু পারলে না। আমি গিয়ে লোকটার হাত ছাড়িয়ে দিলুম। ইতিমধ্যে তাদেরই আরও দু-তিনজন বন্ধু মাঠের দিকে যাচ্ছিল, তারা ওই রকম হুটোপাটি দেখে জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছে হে ?

একজন বললে, এই ছোঁড়াগুলো বাড়ি থেকে পালাচ্ছে, চল, এদের ধ'রে থানায় নিয়ে যাওয়া যাক।

তারাও আগের লোক দুটোর সঙ্গে জুটে গিয়ে আমাদের টানাটানি আরম্ভ ক'রে দিলে। আমরা ছেলেমানুষ হ'লেও নেহাত দুর্ব্বল ছিলুম না। ব্যায়াম করে না এমন দু-তিনজন যুবকে মিলেও চট ক'রে আমাদের কাবু করতে তো পারতই না, বরং বিপদে পড়ত। তার ওপরে মারামারির প্রতি আমার ও শচীনের এমন একটা সহজাত আকর্ষণ ছিল যে, যেখানে সামান্য দু-চারটে কথা-কাটাকাটি হয়ে মিটে যেতে পারে, সেখানে হাঙ্গামা না বাধিয়ে আমরা পারতুম না। এই যে চার-পাঁচজন লোক, তাদের প্রত্যেকেরই বয়স বোধ হয় চব্বিশ-পঁচিশের কম হবে না, তবুও মারামারির গন্ধ পেয়ে আমি আর শচীন একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠলুম, শুধু ভয় হচ্ছিল, কখন তারা পোঁটলা খুলে দেখে ফেলে।

মিনিট দু-তিনের মধ্যে হৈ-হৈ ব্যাপার লেগে গেল। একজন আমাকে কোল-পাঁজা ক'রে তুলে ধরামাত্র তার থুঁতনিতে জুতো সমেত এমন একটি লাথি লাগালুম যে, তার দাড়ি কেটে দরদর ক'রে রক্ত ঝরতে লাগল। আমাদের জামা-কাপড় ছিঁড়ে গেল, সর্ব্বাঙ্গ কেটে রক্ত পড়তে লাগল।

আমরা এদিকে যখন আক্রমণে ও আত্মরক্ষায় ব্যস্ত, সেই অবকাশে একটা লোক প্রমথ বেচারীকে ধ'রে খুব ঠেঙাতে আরম্ভ ক'রে দিলে। মারের চোটে প্রমথ ক্ষিপ্ত হয়ে শেষকালে পুঁটলি থেকে বর্শা বের ক'রে নিয়ে আততায়ীর উরুতে ঘ্যাঁচ ক'রে বসিয়ে দিলে।

ব্যাপারটি যে এতদূর গড়াবে, ওরা তা কল্পনাও করতে পারে নি। বর্শার আঘাত পেয়েই সে লোকটা—ওরে বাবা, ছুরি মেরেছে রে! ব'লেই রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল। প্রমথ তার পোঁটলা তুলে নিয়ে মারলে দৌড়।

লোকটা শুয়ে পড়তেই আমাদের আততায়ীরা ও যে যে সব লোক চারপাশে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ মজা দেখছিল, তারা আমাদের ছেড়ে সেদিকে ছুটল। সে সময় রাস্তার ওপর দিয়েই মার্টিন কোম্পানির ছোট রেল চলত, ভাগ্যক্রমে একটা ট্রেন এসে পড়ায় যে যার চারদিকে ছিটকে পড়ামাত্র আমি আর শচীন পোঁটলা তুলে নিয়ে মারলুম দৌড়। দূর থেকে এক-আধটা চীৎকার—পাকড়ো, পাকড়ো, পুলিস ইত্যাদি শোনা যেতে লাগল।

ছুটতে ছুটতে হাওড়া টাউন হলের কাছে এসে দেখি, প্রমথ সেখানে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। আমরা আর বাক্যবিনিময় না ক'রে দৌড়ে হাওড়া স্টেশনের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। আধ ঘণ্টাটাক স্টেশনের ভিড়ের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বুক-ধড়ফড়ানি ক'মে গেলে পোল পেরিয়ে বড়বাজারে এসে পড়লুম। সেখানে একটা পানের দোকানে দাঁড়িয়ে পান কেনা হ'ল। দোকানে একটা বড় আয়না ছিল, তাতে আমাদের চেহারা দেখে একেবারে আঁতকে উঠলুম। মুখময় কালাশিরে, জামা ছিঁড়ে কুটিকুটি, চুল উস্কখুস্ক, শচীনের মাথার খানিকটা চুলই নেই, প্রমথর বাঁ কানটা ছিঁড়ে গেছে, রক্ত গড়িয়ে গলা অবধি নেমেছে—সে এক বীভৎস দৃশ্য!

পরামর্শ ক'রে বাড়ি ফেরাই সাব্যস্ত হ'ল, এত বড় বাধা যে ওপরওয়ালারই ইঙ্গিত তা মেনে নিয়ে আমরা ক্ষুণ্ণমনেই বাড়িমুখো হলুম। প্রমথকে পৌঁছে দিয়ে আমি যখন বাড়ি ফিরলুম, তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। সেই অল্প আলো অল্প অন্ধকারে কাঁধের বোঝা এক জায়গায় লুকিয়ে চুপিচুপি নিজের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি, এমন সময়—যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়—

ইস্কুল থেকে আমার ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে মা ছটফট করছিলেন। তিনি বোধ হয় কিছু সন্দেহ ক'রে আমাদের ঘরে এসে জিনিসপত্র ওটকাচ্ছিলেন। এমন সময় আমার সেই মূর্ত্তি দেখে একেবারে শিউরে উঠলেন।

বললুম, টেরিটিবাজারে গিয়েছিলুম এক বন্ধুর জন্যে খরগোশ কিনতে। পথে তিন-চারটে ফিরিঙ্গী ছেলে খরগোশ কেড়ে নেবার চেষ্টা করায় ভয়ানক মারপিট হয়ে গিয়েছে।

মা আর দ্বিরুক্তি না ক'রে আমার পিঠে গদাগম পাঁচ-সাতটি কিল চাপিয়ে বললেন, পোড়ারমুখো ছেলে ডনকুস্তি ক'রে আর বাদাম-বাটা খেয়ে গুণ্ডা হয়েছ, না! সন্ধ্যেবেলা গুণ্ডামি ক'রে বাড়ি ফেরা হ'ল।

তারপরে টানতে টানতে কলতলায় নিয়ে গিয়ে গা থেকে কাদা তুলতে আরম্ভ ক'রে দিলেন। শরীরের কত জায়গায় যে কেটে ছিঁড়ে গিয়েছিল তার আর ঠিকানা নেই, যেখানেই জল লাগে সেখানটাই জ্বালা করতে থাকে।

স্নান ক'রে উঠে সর্ব্বাঙ্গে তাপ্পি মেরে পাগলা সন্ন্যেসীর কাছে যাওয়া গেল। তিনি বাড়িতে বউমা ও ঝি-চাকরদের ওপরে হোমিওপ্যাথির হাত পাকাতেন। সেখানে গিয়ে এক ফোঁটা ওষুধ খেয়ে টেরিটিবাজারে ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে মারপিটের এক লোমহর্ষণ বর্ণনা করা গেল তাঁর কাছে। আর এক প্রস্থ বর্ণনা গোষ্ঠদিদির কাছেও করতে হ'ল। সেখান থেকে ফিরে বাবার কাছে আরও বাড়িয়ে বলা গেল। বাবা সব শুনে বললেন, বাড়িতে কিছু না জানিয়ে টেরিটিবাজারে যাওয়াটা তোমার অত্যন্ত অন্যায় হয়েছিল, কিন্তু তোমরা যে মার খেয়ে পালিয়ে আস নি, তাদেরও মেরেছ, এতে আমি খুবই খুশি হয়েছি।

সত্যি কথা বলতে কি, বার কয়েক সেই কাল্পনিক ফিরিঙ্গী-নন্দনদের সঙ্গে মারামারির বর্ণনা ক'রে হাওড়ার মাঠের ধারের ব্যাপারটা মন থেকে এক রকম মুছে যেতে লাগল, আর সেই জায়গায় টেরিটিবাজারের মারামারির একটা ছবি সমুজ্জ্বল হতে আরম্ভ হ'ল।

সন্ধ্যেবেলা লতুদের ওখান থেকে অস্থির ফিরে এসে আমার সর্ব্বাঙ্গে ওই রকম তাপ্পি আর পটি মারা দেখে অবাক হয়ে গেল। আমাদের পলায়নের সমস্ত খুঁটিনাটিই অস্থির জানত। এও ঠিক ছিল যে, সন্ন্যেসী-লাইনে কিছু উন্নতি করতে পারলেই তাকে খবর দোব, আর সেও এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। কিন্তু সে লাইনে পা দিতে না দিতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমার চেহারার ওই বিষম পরিবর্ত্তন দেখে সে বেচারী শঙ্কিত হয়ে পড়ল।

রাত্রে শোবার সময় আসল ঘটনাটি অস্থিরকে খুলে বলা গেল। তার পরে গুপ্তস্থান থেকে পোঁটলাটি বের ক'রে বর্শা, ছোরা, করাত, র‍্যাদা প্রভৃতি যন্ত্রগুলিকে লুকিয়ে ফেলা হ'ল।

পরের দিন বিকেল হতে না হতে লতুদের ওখানে যাত্রা করা গেল। টেরিটিবাজারে ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে মারামারির কাহিনীটি সেখানে বেশ সমারোহ ক'রে ব'লে বাহাদুরি নেবার জন্যে মনটা ছটফট করছিল। কিন্তু সেখানে গিয়ে চাকরের কাছে শুনলুম, বাবা, মা, ললিত ও তার ছোট বোন কোথায় গিয়েছে, শুধু বড় দিদিমণি অর্থাৎ লতু বাড়িতে আছে।

খবরটা শুনে নিরুৎসাহ হয়ে পড়া গেল। তবুও লতুকেই গল্পটা শোনানো যাবে স্থির ক'রে তিন লাফে ওপরে উঠে গিয়ে এঘর ওঘর খুঁজে দেখলুম, লতু নেই। শেষকালে ছাতের ঘরে তাকে আবিষ্কার করা গেল, সে জানলার ধারে বাইরের দিকে চেয়ে ব'সে আছে।

আমি ঘরে ঢুকতেই লতু আমার দিকে ফিরে এক অদ্ভুতভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আবার মুখ ফিরিয়ে বাইরের দিকে চাইলে। আমার ওপরে অভিমান হ'লে সে ওই রকম করত। আমি তার পাশে ব'সে জিজ্ঞাসা করলুম, অসুখ করেছে লতু?

লতু আমার দিকে ফিরে চাইলে, চোখে তার অশ্রু। লতু বললে, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, সত্যি বলবি?

লতুকে এতখানি গম্ভীর হতে কখনও দেখি নি। বললুম, বলব।

তুই নাকি কাল বাড়ি থেকে চ'লে গিয়েছিলি সন্ন্যেসী হবার জন্যে ?

আমি একেবারে স্তম্ভিত, বাক্যহীন।

বল্।

কে বললে ?

অস্থির।

চুপ ক'রে ব'সে অস্থিরের বিশ্বাসঘাতকতার কথা ভাবছি, লতু আমায় ঠেলা দিয়ে বললে, কেন গিয়েছিলি বল্—কোন্ দুঃখে ?

লতুর কথার মধ্যে কি শক্তি ছিল বলতে পারি না, আমার মনে হতে লাগল, যেন ঘোরতর দুঃখ আমাকে ঘিরে ফেলেছে। নইলে আমার বয়সী ছেলে কোথায় হেসে খেলে দিন কাটাবে, তা না ক'রে সে বাড়ি ছেড়ে জঙ্গলে চ'লে যেতে যাবে কেন ? তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চোখে জল এসে গেল। ধরা গলায় বললুম, তুমি জান না লতু। আমার যা দুঃখ, তা কেউ বুঝতে পারবে না। আমাকে কেউ ভালবাসে না, কার জন্যে থাকব ?

লতুর চোখ থেকে এক ফোঁটা জল গালের ওপরে গড়িয়ে পড়ল। সে আবার বললে, একটা কথা সত্যি বলবি ?

বলব।

তুই কারুকে ভালবাসিস ?

ঘাড় নেড়ে জানালুম, হ্যাঁ।

কাকে ভালবাসিস, বলতে হবে।

সে তুই জেনে কি করবি ? কোনও লাভ নেই তোর।

হ্যাঁ, আমার লাভ আছে, বলতেই হবে।

লতুর মুখের দিকে চাইলুম। তার চোখে অপূর্ব্ব আলো, অশ্রুতে তা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, ঠোঁট দুটো থরথর ক'রে কাঁপছে। আমার বুকের মধ্যে অদ্ভুত একটা কষ্টদায়ক অনুভূতি হতে লাগল।

বুক ঠুকে ব'লে ফেললুম, আমি তোকে ভালবাসি।

বলামাত্র লতু ঝাঁপিয়ে আমার বুকের ওপরে পড়ল। তারপরে চুম্বনে অশ্রুতে কোলাকুলি।

* * * *

স্তব্ধ বনস্থলীতে হঠাৎ ঝড় উঠলে প্রথমে যেমন দূর—বহুদূরাগত জয়-ধ্বনির মত শব্দ হতে থাকে, তারপরে সেই অখণ্ড আওয়াজ বাড়তে বাড়তে সমস্ত অরণ্যব্যাপী উল্লাস জাগে, এসেছে, এসেছে, ওরে এসেছে রে! বিশাল বনস্পতি থেকে আরম্ভ ক'রে শিশু বৃক্ষলতা পর্য্যন্ত উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। যে জননী ধরণী নিয়ত স্তন্যদানে তাদের পোষণ করেছে, তার বুক ছিঁড়ে এই নবচেতনার উন্মাদনায় ভেসে যেতে চায়, কামদেবের ফুলধনুর স্পর্শমাত্র সেই কৈশোরেই আমার মনের অবস্থা সেই রকম হয়ে পড়ল। মনের সমস্ত বৃত্তি, জীবনের সমস্ত কামনা লতুকে ঘিরে—সে যেন আমার চোখের সেই অঞ্জন, যা লাগলে পৃথিবীর সব কিছুই সুন্দর ঠেকে। ধরণী আমার কাছে সুন্দরতর হয়ে উঠল।

একদিন পাগলা সন্ন্যেসী বললেন, রামবাবু, তোমাকে ব্রাদার কিছুদিন থেকে যেন কেমন-কেমন দেখছি! লভে-টভে পড়েছ নাকি?

গোষ্ঠদিদিকে আগেই লতুর সব কথা বলেছিলুম, সেদিন তাঁকেও বললুম।

আমার কথা শুনে পাগলা সন্ন্যেসী বললেন, সাবাস ব্রাদার! কাল থেকে বায়রন পড়া যাবে, কি বল?

জিজ্ঞাসা করলুম, আচ্ছা পাগলা সন্ন্যেসী, আপনি কখনও প্রেমে পড়েছিলেন?

তিনি হেসে উঠলেন, কিন্তু সে কাষ্ঠহাসি তখুনি থেমে গেল। অশ্রু-রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, সে কথা কি আর মনে আছে! আমাদের জীবন বৃথাই কেটেছে ব্রাদার, বৃথাই কেটেছে—

> **Like the ghost of a dear friend dead**
> **Is Time long past**
> **A tone which is now forever fled,**
> **A hope which is now forever past**
> **A love so sweet it could not last**
> **Was Time long past.**

ক্রমশ

"মহাস্থবির"

বিজয়িনী

অশ্রুধারায় চোখে পড়িয়াছে ছানি
আব্‌ছা হয়েছে ধরার মূরতিখানি
এখন কেবল কানে শুনি তার বাণী
বিচিত্র ধ্বনিজাল কাঁসর ঘণ্টা ঝাল !
তার মাঝে কলকুহরণ শুনি কার—
তরুণী আধুনিকার !

গর্জ্জিয়া ধায় বিমান ট্যাক্সি জিপ
ছুটে চলে ট্যাঙ্ক্ মত্ত সরীসৃপ
শঙ্কায় ঢাকা নগর অপ্রদীপ !
সে সময় ফুটপাথে চটুল চরণ-পাতে
লঘু চঞ্চল পদধ্বনি শুনি কার—
তরুণী আধুনিকার !

রেডিওযন্ত্রে হুঙ্কারে ওস্তাদ !
বিলাতী ঐক্যবাদন সিংহনাদ !
প্রোপাগাণ্ডার উগ্র বিসম্বাদ !
সহসা মধুচ্ছ্বাসে উর্ম্মিল কলভাষে
উচ্ছলি বহে স্বর-সুরধুনী কার—
তরুণী আধুনিকার !

চারিদিকে ওঠে ঘন কান্নার রোল
চীৎকার হানাহানির গণ্ডগোল
কামানের মুখে বল্ হরি হরি বোল !
এ সবার মাঝখানে নির্ভয় কেবা আনে ?
হাসির মুকুতা সযতনে চুনি কার—
তরুণী আধুনিকার !

দুর্য্যোগ নিশা ; অন্তরে ব্যাকুলতা—
অভ্র গরজে কুলিশ-কঠোর কথা—
জলদের বুকে শিহরে তড়িল্লতা !
মত্ত ঝঞ্ঝাবাতে শ্রাবণ-গহীন রাতে
চরণছন্দে বাজে রুমুঝুনি কার—
তরুণী আধুনিকার !

মুখর ধরার বিপ্লব মাঝে, অয়ি
বিজয়িনী, তুমি যুদ্ধে হয়েছ জয়ী
কণ্ঠে নূপুরে কঙ্কণে বাঙ্‌ময়ী !
অশ্রু-নদীর তীরে তুহিন-কঠিন নীরে
প্রাণের আগুনে জলজল ধ্বনি কার—
তরুণী আধুনিকার !

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

পিঞ্জর

চরের ওপরে বনঝাউয়ের দল ঢুলছে সারি সারি। মহানন্দা ম'রে গেছে, এখানে ওখানে সমুদ্ধত বালুচরের মধ্য দিয়ে তিন-চারটি জলরেখা। ছোট বড় নানা জাতের বক সেই চরের আনাচে-কানাচে হাঁটু অবধি ডুবিয়ে উদ্‌গ্রীব চোখে জলের দিকে তাকিয়ে আছে, মাছের ঠিকানা পেলেই জলে ছোঁ মারবে। ভাঙা পাড়ের গায়ে গাং-শালিকের গর্ত—কোন-কোনটায় মেছো-আলাদ সাপের আস্তানা। আধডুবো নৌকোর জীর্ণ মাস্তুলের গায় নীলরঙের মাছরাঙা ধ্যানস্থ।

হাতে যখন কোনও কাজ থাকে না আর পড়তে পড়তে যখন মাথাটায় ঝিম ধ'রে ওঠে, তখন চশমা খুলে বই বন্ধ ক'রে সুবোধ সামনের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকায়। মহানন্দার বুকে দিনান্ত। বাঁ দিকে অনেক দূরে

নিমাসরাই স্তম্ভের উঁচু মাথাটা কালো হয়ে আসছে রাত্রির রঙে। ওপারে আমের বনগুলো ক্রমেই একাকার হয়ে যাচ্ছে, ভাঙা পাড়ের গায়ে গৃহপ্রত্যাশী গাং-শালিকেরা কোলাহল করছে। একটির পর একটি বক মহানন্দার চর ছেড়ে উঠছে আকাশে, তীক্ষ্ণ কর্কশ চীৎকার ক'রে পাখা মেলে ম্লানায়মান দিগন্তের দিকে উড়ে যাচ্ছে। মহানন্দার জল-রেখাগুলো সূর্য্যের শেষ আলো নিয়ে ঝলমল করছে এখনও।

ওই নিমাসরাই স্তম্ভটার নীরব গম্ভীর মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে সুবোধ নিস্তব্ধ হয়ে ব'সে থাকে। ওটা কিসের প্রতীক, কে জানে! জনশ্রুতি ওটা নিয়ে নানা কাহিনী রচনা করে। কেউ বলে, ওটা কারও বিজয়-স্তম্ভ; কেউ বলে, যখন দূরে শত্রু আসবার সংবাদ পাওয়া যেত, তখন ওই স্তম্ভের গায়ে অজস্র মশাল জ্বালিয়ে দিয়ে গৌড়ের অধিবাসীদের আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক ক'রে দেওয়া হ'ত। কোন্‌টা যে সত্যি, কেউ বলতে পারে না। গৌড়ের রণ-গর্জ্জিত কলমুখর ইতিহাসের যেদিন অবসান হয়ে গেছে, সেদিন থেকেই ওই স্তম্ভটাও চির-নীরবতায় ডুব দিয়েছে।

চাকর আলো নিয়ে এসে রাখলে ঈজি-চেয়ারের হাতলে। আর খবরের কাগজ। মুখ তুলে সুবোধ বললে, ডাক এসেছে?

এই তো এল।

চিঠিপত্র?

কিছু নেই বাবু।

চিঠি আসে নি। সুবোধ নিরাশ হ'ল না। চিঠি কে লিখবে তাকে! রাজবন্দীর নিঃসঙ্গ নির্জ্জন জীবন—বাংলা দেশের এক প্রান্তে সে অন্তরীণ হয়ে আছে। আত্মীয়স্বজনের গণ্ডি তার প্রসারিত নয়, বাপ-মাকে ভাল ক'রে মনে করতে পারে না। খুড়োর সংসারে মানুষ। খুড়ো আগে খোঁজখবর নিতেন, কিন্তু সম্প্রতি সরকারী উকিলের পদপ্রাপ্তি ঘটায় তিনি কিছুটা নীরব হয়ে গেছেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি স্নেহপ্রবণ হয়ে উপজীবিকাকে বিপন্ন করবার কোনও অর্থ হয় না।

একটা নিশ্বাস ফেলে সুবোধ খবরের কাগজ খুললে। বাংলা দেশে

অশান্তি। রাজনৈতিক বিক্ষোভ। পার্লামেণ্টে হোম সেক্রেটারির অপভাষণ। ব্যবস্থাপক সভায় বিভিন্ন দলীয় সদস্যদের মধ্যে হাতাহাতি। মোহনবাগান দলের অপ্রত্যাশিত পরাজয়। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের দীভারে সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনা। কচুরিপানা সম্পর্কে নির্ব্বোধ গবেষণা। কাটোয়া লাইনের কোন্ এক স্টেশনে আলোর সুবন্দোবস্ত না থাকায় যাত্রীদের ধন প্রাণ বিপন্ন হচ্ছে—পত্রপ্রেরকের সোচ্ছ্বাস ক্রন্দন।

চোখ বুলিয়ে সুবোধ খবরের কাগজ নামিয়ে রাখলে। মন ভরে না। এ কি বাংলা দেশের খবর? এ কোন্ বাংলা দেশ? ব্যবস্থাপক সভায় যে বাংলা দেশের মন্ত্রিত্ব-সংকট উদ্দাম হয়ে উঠেছে, তার সঙ্গে এর যোগসূত্র কোথায়? এই থানায় আজ দেড় বছর সুবোধ অন্তরীণ হয়ে আছে। ওই তো মহানন্দার ওপারে জেলেদের গ্রাম। এই দেড় বছরেই ওই গ্রামটার কি সুস্পষ্ট রূপান্তর সুবোধের চোখে পড়ল! বছর বছর নদী ম'রে যাচ্ছে, উত্তর-বাংলার প্রধান প্রাণপথ এই মহানন্দার অপমৃত্যু দুপাশেও শ্মশান রচনা ক'রে চলেছে। নদীতে মাছ পড়ে না। ম্যালেরিয়া নিচ্ছে মহামারীর রূপ। জেলেদের ওই গ্রামটির অতীত সমৃদ্ধি এখনও বোঝা যায় ওর মাটকোঠা আর টিনের চালা দেখে। কিন্তু যে মাটকোঠা একবার ভেঙে পড়েছে, সে কোঠা আর গ'ড়ে ওঠে না, যে খড়ের চালা একবার ঝড়ে পড়েছে, সে চালা আর মাথা তোলে না। চৈত্র মাসে গম্ভীরা গানের সমারোহ গত বারের চাইতে এবারে অনেক কম। সন্ধ্যাপ্রদীপের শিখাগুলো দিনের পর দিন ম্লান হয়ে আসছে। শুধু আশ্বিন-কার্ত্তিকে বাঁ দিকের শ্মশান-ঘাটটায় গেল বছরের চাইতে এবারে চিতা জ্বলেছে অনেক বেশি।

এই বাংলা দেশ। মন্ত্রীসভায় এর সত্যিকার সংকট প্রকাশ পায় না। কচুরিপানার সমস্যাও হয়তো এর চূড়ান্ত সমস্যা নয়। যক্ষ্মার মত নিঃশব্দ আর অনিবার্য্য মৃত্যু এর শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ছে। বিদ্যুতের আলোয় মাইনাস পাওয়ার চশমা চোখে এঁটে এ. পি.র সংবাদকে আশ্রয় ক'রে যারা বাংলা দেশের অবস্থা নিয়ে নিবন্ধ লিখছে,

এই মৃত্যু-জর্জর গণদেবতা তাদের কাছ থেকে পাচ্ছে কোন্ সঞ্জীবনীর মন্ত্র, অভাবপক্ষে কতটুকু সান্ত্বনার বাণী!

সমস্ত শরীর জ্বালা করছে, টিপটিপ করছে মাথাটা। মস্তিষ্কের মধ্যে কে যেন পেরেক ঠুকে চলেছে ক্রমাগত। ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে কয়েকটা অ্যাস্‌পিরিন আনাতে হবে আবার। কিন্তু বাংলা দেশ। ওপারে আমবাগানে ডেকে উঠছে শেয়াল—শবযাত্রার পথে যেন উল্লসিত হরিধ্বনি। আজ যদি সে বাইরে থাকত, কত কাজ করবার ছিল তার! নিরুদ্ধ কর্ম্মপ্রেরণা বুকের মধ্যে নিষ্ফল আক্রোশে আঘাত করছে।

পড়লেন কাগজ?

থানার দারোগা এসে দাঁড়ালেন। মুসলমান ভদ্রলোক, অমায়িক স্বল্পভাষী। সুবোধের এই বন্দিত্বের জন্যে যেন তিনিই অপরাধী, এই জাতীয় একটা সংকোচ সব সময় তাঁকে কুণ্ঠিত ক'রে রাখে।

সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে সুবোধ বললে, বসুন।

দারোগা বসলেন। ধড়াচূড়া ছেড়ে একখানা লুঙ্গি আর একটা সিল্কের শার্ট প'রে এসেছেন। আরাম ক'রে হাত-পা ছড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালেন, আর একটা এগিয়ে দিলেন সুবোধকে। বললেন, তারপর, আজকের খবর কি বলুন?

নতুন খবর আর কি থাকবে! সেই পুরনো কপচানি।

তা ঠিক। আরামের একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন দারোগা। খবরের কাগজে কিছুই পড়বার থাকে না আজকাল।

দারোগার মনের ভাব সুবোধ বোঝে। খবরের কাগজে বিশেষ কিছু না থাকলেই খুশি হন তিনি। এত খবর, এত কোলাহল, মানুষের মস্তিষ্ক আর স্মৃতির ওপর অহেতুক অত্যাচার ছাড়া আর কিছু নয়। কি হবে এত খবর দিয়ে! দৈনন্দিন জীবনে কোলাহলের অন্ত নেই, অভাব নেই সমস্যার। চুরির এজাহার লিখতে হয়, ফেরারীর খবর রাখতে হয়, দাগীদের ওপর মেলে রাখতে হয় সজাগ দৃষ্টি; ডাকাতির সংবাদ এলেই ঘোড়া ছুটিয়ে দিতে হয় হন্তদন্ত হয়ে; তার ওপর জাতীয় আর আন্তর্জ্জাতীয় সমস্যা এসে ভিড় করলে জীবনধারণ দুঃসহ হয়ে ওঠে। খবরের কাগজ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা দৈনিক আলাপের মুখবন্ধ মাত্র।

আপনার থানায় নিশ্চয় খবরের অভাব নেই ?

নিশ্চয় নেই। দারোগা এতক্ষণে ধাতস্থ হয়ে বসলেন। থানার খবরের ভাবনা কি! এই তো সকালে কাশিমপুর ছুটতে হয়েছিল। আল ভেঙে লাঙল দিয়েছিল, তাইতে মস্ত হাঙ্গামা হয়ে গেল। তিনটের মাথা ভেঙেছে, একটা বোধ হয় বাঁচবে না।

ধরলেন আসামী ?

একটা হাই তুলে উদাসকণ্ঠে দারোগা বললেন, হ্যাঁ, দু পক্ষের গোটা দশ-বারোকে ধ'রে চালান দিয়ে দিলাম। আর বলেন কেন মশায়, যত ঝকমারির কাজ। সাতজন্মের পাপ না থাকলে পুলিসের দারোগা হয় না কেউ।

বাঃ, ইংরেজ রাজত্বে আপনারাই তো লাট সাহেব। এমন সম্মান আর প্রাপ্তিযোগ—

সম্মান আর প্রাপ্তিযোগ! দারোগা ভ্রূকুটি করলেন: সে সব লাস্ট সেঞ্চুরির মিথ মশায়। সম্মান তো দিনরাত 'শালা' বলছে। আর প্রাপ্তিযোগ! দারোগা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি আন্দোলিত করলেন: লোকে আজ-কাল চালাক হয়ে গেছে। ঘুষ দূরে থাক, পাঁচটি টাকা সেলামির লোভ করলে টানাটানি!

তা হ'লে খুব দুঃসময় যাচ্ছে আপনাদের।

দুঃসময় ছাড়া আর কি! গাধার মত খাটনি আর ইন্সপেক্টার থেকে এস. পি. পর্য্যন্ত তিন শো তেত্রিশ দেবতার পূজো। জান-প্রাণ বেরিয়ে গেল।

এদিকে আমবাগানের জংলা গলিপথে লণ্ঠনের আলো পড়ল। চ্যারিটেব্‌ল ডিস্‌পেন্সারির সরকারী ডাক্তারবাবুর বাসা ওখানে। পাশা খেলায় ডাক্তারবাবুর দুর্দ্দান্ত নেশা। যেদিন সন্ধ্যায় কল থাকে না, সেদিন পাশার ছক আর গুটি নিয়ে ডাক্তার এসে বসবেনই। সেইজন্তে সবাই ডাক্তারের নাম দিয়েছে শকুনি। তাই ব'লে ভদ্রলোক শকুনির মত মারাত্মক মোটেই নন—প্রবীণ এবং সদানন্দ।

দারোগা বললেন, শকুনি আসছে।

কিন্তু যে এল, সে ডাক্তার নয়। আগে আগে লণ্ঠন হাতে

ডাক্তারখানার সুইপার মধু, পেছনে একটি ষোড়শী—ডাক্তারবাবুর বড় মেয়ে সীতা। একখানা থালার ওপরে তিন-চারটে বাটি সাজানো। বললে, মা পাঠিয়ে দিলেন।

সুবোধ হাসলে। যে রকম দেখছি, তাতে আমার রান্নাবান্নার পাট তুলে দিয়ে তোমাদের ওখানে পাকাপাকি বন্দোবস্ত ক'রে নিলেই পারি।

সীতা সলজ্জ মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলে, বেশ তো।

ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর খাবারটা ঢেকে রাখলে সীতা। একটা কাচের গেলাসে জল ভ'রে রাখলে তার পাশে। তারপর তাকিয়ে দেখলে বিছানাটার দিকে। ভদ্রলোক কি অসম্ভব অগোছালো! বেড-কভারটা অর্দ্ধেক লুটিয়ে আছে মাটিতে, বিছানার ওপর স্তূপাকারে বই ছড়ানো। ফাউন্টেনপেনটা প'ড়ে আছে খোলা অবস্থায়, বালিশের ওপরে খানিকটা কালি ছিটানো। সুটকেসের পাল্লাটা আধ হাত ফাঁক হয়ে আছে, যা ইঁদুর এখানে, ভেতরে ঢুকে কেটে কুটে সব শেষ ক'রে দেবে। এক মুহূর্ত্ত ইতস্তত করলে সীতা। তারপর যত্ন ক'রে ঝেড়ে দিলে বিছানাটা, বই আর কলম তুলে রাখলে, সুটকেসের কল দুটোকে আটকে দিলে। শান্ত সুন্দর মুখখানার ওপর আকস্মিক লজ্জার একটা অরুণিমা ছায়া ফেলে গেল, মৃদু নিশ্বাস পড়ল নিজের অজ্ঞাতেই।

যাওয়ার সময় সীতা বললে, একটু লক্ষ্য রাখবেন, বেরালে খেয়ে না যায়।

সুবোধ মাথা নেড়ে জানালে, আচ্ছা।

দারোগা জিজ্ঞাসা করলে, তোর বাবা কোথায় রে সীতু?

বাবা? সীতা হেসে দাঁড়াল। আঁচলের খুঁট আঙুলে জড়াতে জড়াতে বললে, টাউনে গেছেন। ফিরতে রাত হবে।

আমবাগানের অন্ধকারে লণ্ঠনের আলোটা মিলিয়ে গেল।

ওঃ, তা হ'লে আজ আর পাশা জমবে না। ওঠা যাক, কি বলেন?

আসুন।

তিন পা এগিয়ে দারোগা ফিরে তাকালেন একবার।—ভাল কথা, অসুবিধে হচ্ছে না তো কোনও রকম? কোনও কম্‌প্লেন—

না, কিছু না।

আচ্ছা। দারোগা চ'লে গেলেন।

আবার একা। মহানন্দার বুক থেকে আসছে ভিজে বাতাস লণ্ঠনের শিখাটা একটু একটু শিউরে উঠছে। নিমাসরাই স্তব্ধ অন্ধকারে নিমগ্ন। বালুচর আর জলধারাগুলো যেন তামায় তৈরি—অস্পষ্ট আর অনুজ্জ্বল, তারার আলোয় লালাভ। গাং-শালিকের কোলাহল স্তব্ধ হয়ে গেছে। ওপারে জেলেপাড়ায় একটা আগুনের কুণ্ড জ্বলছে, বোধ হয় গাবের রস জ্বাল দিচ্ছে ওরা।

কি আশ্চর্য্য জীবন! কর্ম্মহীন, ঔৎসুক্যহীন—একটা চূড়ান্ত নির্ব্বেদ সমস্ত স্নায়ুগুলোকে সমাচ্ছন্ন ক'রে রয়েছে। কবে একদিন বুকের মধ্যে আগুন জ্ব'লে উঠেছিল, দ্বীপান্তরের পার থেকে একদিন কার কাতর কান্না এসে স্বপ্নাতুর নিশ্চিন্ত ছাত্রজীবনকে জোয়ারের তরঙ্গে দুলিয়ে দিয়েছিল। এই মৃত্যুকে ছেদন করতে হবে—দূর করতে হবে এই ভয় আর অন্যায়ের শাসনকে। ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোমার নিঃসংকোচ মস্তক তোল আকাশে; মনে রেখো, দেবতার দীপ হাতে 'রুদ্রদূতরূপে আবির্ভূত হয়েছ তুমি, যত শৃঙ্খল, যত বন্ধন তোমার চরণ বন্দনা ক'রে নমস্কার জানাচ্ছে। সত্যের মৃত্যু নেই।

সেই সব উন্মত্ত চঞ্চল দিন। অগ্নি-দীক্ষা। আদর্শের পায়ে নির্ব্বিচার প্রাণবলি। আজ মহানন্দার পারে এই শান্ত সন্ধ্যায়, তারায় সমুজ্জ্বল এই বিবর্ণ আকাশের নীচে সে চঞ্চলতা কোথায়! কোনও কিছুতে আসক্তি নেই, বন্ধন নেই, আদর্শের সেই আগ্নেয় প্রেরণাও কি নিবে গেছে? মরে-যাওয়া নদীর মত মন্থর গতিহীন সময়। তাড়া নেই, তাগিদ নেই কিছু। বৃহৎ বাংলা, বৃহত্তর ভারত—কারও রূপই মনের সামনে বিশ্বরূপ হয়ে দেখা দেয় না। এখানে বাংলা দেশ বলতে ওই জেলেদের গ্রাম, ওদের নির্ব্বিরোধ অপ্রসর জীবন—চিন্তাভাবনা যা কিছু সব যেন ওর সঙ্গেই একাকার হয়ে গেছে। বিপ্লবের বহ্নিময় প্রেরণা নয়, খানিকটা গভীর বেদনা আর সহানুভূতি।

চাকর এসে বললে, বাবু, খেয়ে নিলে হ'ত না? রাত হয়ে গেছে।

সুবোধ চমকে উঠল। সোজা হয়ে উঠে ব'সে বললে, আজ তোর ভাত নষ্ট হ'ল কৈলাস। ডাক্তারবাবুর বাসা থেকে খাবার দিয়ে গেছে।

কৈলাস এক গাল হাসলে সে আমি আগেই জানতুম বাবু, রান্না তো করি নি।

হাত-মুখ ধুয়ে সুবোধ খেতে বসল। মাছ, মাংস, ডিমভাজা, ঘি-ভাত, এক বাটি পায়েস। এসব সীতার নিজের হাতের রান্না। সীতার মা কিছুদিন থেকে হার্ট-ডিজিজে শয্যাগত—ওইটুকু মেয়ের ওপর সংসারের সমস্ত ভার পড়েছে। বাপ-মা-ভাই-বোন সকলের পরিচর্য্যা ছাড়াও এত রান্নাবান্না সে করে কখন, করেই বা কি ক'রে! চমৎকার মেয়ে এই সীতা। যেমন লক্ষ্মীর মত চেহারা, তেমনই লক্ষ্মীর মত মিষ্টি আর শান্ত স্বভাবটি।

খেতে খেতে চোখ পড়ল বিছানার ওপর, তার পর শেল্‌ফের দিকে, সুটকেসের দিকে। একটি কল্যাণী নিপুণ হাতের ছোঁয়া যেন সোনার লেখার মত তাকের ওপরে জ্বলজ্বল করছে। এই রকম একটি কল্যাণ-করস্পর্শ জীবনে কত দিন—

সঙ্গে সঙ্গে গায়ে কে যেন সাঁ ক'রে একটা কি বসাল, আচমকা একটা কামড় পড়ল জিভের ওপর। এসব কি ভাবছে সে? এ সমস্ত কিসের প্রলোভন? এ তার আদর্শ নয়, এ তার দীক্ষার অঙ্গ নয়। পথ যাকে ডাক দিয়েছে, এমন মোহ কেন তাকে আচ্ছন্ন করে? পঁয়ত্রিশ বছরের নির্য্যাতিত অগ্নিশুদ্ধ জীবনে আজ কি মলিনতার ছোঁয়া লাগল?

মনের মধ্যে রমলা এসে দাঁড়াল। প্রথম যৌবনের বিপ্লবী নায়িকা। আগুনের মত লাল টকটকে শাড়ি তার আগুনের শিখার মত উজ্জ্বল দেহকে জড়িয়ে আছে। চোখে আগুন। কিন্তু সেই আগুন একদিন নিবে গিয়েছিল রমলার চোখ থেকে, উচ্ছলিত জল সেখানে ছলছল ক'রে উঠেছিল। কালো চুলের রাশি দিয়ে সমস্ত মুখখানা ঢেকে আর্ত্তকণ্ঠে রমলা বলেছিল, আমি পারব না, আমি পারব না। আমি দুর্ব্বল। তুমি তুলে নাও আমাকে।

ঘৃণায় আর বিরক্তিতে সমস্ত মনটা বিষদগ্ধ হয়ে গিয়েছিল সুবোধের। প্রশান্ত কঠিন স্বরে বলেছিল, আমি চললুম, আর দেখা হবে না।

চোখ মুখ থেকে চুলের রাশি সরিয়ে একবারটি সজল দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল রমলা। আর কিছু বলে নি, কোন অনুরোধ জানায় নি। রমলা জানত, অনুরোধে কোন ফল হবে না। নিঃশব্দে উঠে গিয়ে পাশের ঘরের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়েছিল।

সুবোধ আর দাঁড়ায় নি। দাঁড়াবার সময়ও ছিল না তার। সে ফেরারী, তিনটে ওয়ারেন্ট তখন তাকে সন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছে। তা ছাড়া কত কাজ! দলের মধ্যে বিভীষণ দেখা দিয়েছে, জেলায় পার্টি বিপন্ন। জিনিসপত্রগুলো রাতারাতি সরিয়ে ফেলতে হবে। দ্রুত চরণে সুবোধ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

ঘূর্ণির মত জীবন। ফেনিল উন্মাদনা। কোথায় মিলিয়ে গেল রমলা—মিলিয়ে গেল সুবোধের মন থেকেও। এতটুকুও দুঃখ হয় নি। রমলাকে সে ভালবাসত, রমলাকে সে কামনা করেছিল তার কর্ম্মজীবনের পাশে পাশেই। কিন্তু সেই রমলা যখন নিবে গেল, নীড় বাঁধতে চাইল দুর্য্যোগভীরু অসহায়া কপোতীর মত, সেদিন সুবোধ আর তাকে ক্ষমা করতে পারে নি। তার প্রেম অযোগ্যের জন্য নয়।

তারপরে দশ বছর জেল। বেরিয়ে দু মাস কাজ করতে না করতেই আবার অন্তরীণ। কোন্ এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে রমলার। ভালই হয়েছে। বড় গাছে নৌকো বেঁধেছে রমলা, ঝড়-জলের ভয় নেই। আই. সি. এস. পুত্র আর সোসাইটি-গার্ল কন্যার জন্ম দিয়ে মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করবে নিঃসন্দেহ।

সুবোধ উঠে পড়ল। আর খাওয়ার স্পৃহা নেই। মাথার মধ্যে লোহার পেরেকগুলোর ওপর হাতুড়ির ঘা পড়ছে ক্রমাগত। কপালের রগগুলো যেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে সুবোধ বিছানায় এসে বসল। কত কাজ আছে, কত কি করবার আছে তার! বাইরের জগৎ ডাকছে হাতছানি দিয়ে। সমস্ত দেশ রাত্রির কালো আকাশের মত গভীর বেদনাতুর চোখ মেলে যেন তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে। অসহায় বন্দিত্ব, কঠিন শৃঙ্খল। এই বন্দিত্ব থেকে তুমি মুক্ত কর আমাকে, এই

শৃঙ্খল চূর্ণ ক'রে দাও। তুমি এস। সুবোধের বুকের মধ্যে বাজতে লাগল একটা আর্ত্ত কলধ্বনি।

দূরে মহানন্দার চরে সনসন ক'রে কাঁদতে লাগল বনঝাউয়ের দল।

রাত কেটে গেল, এল সকাল। দিনের পরে দিন। সময়ের সমুদ্রে ঢেউ ওঠে, ঢেউ ভাঙে। বৈশাখের শেষাশেষি সারারাত বৃষ্টি হয়ে গেল, মহানন্দার জল বেড়ে উঠল—বনঝাউয়ের দল অর্দ্ধমগ্ন দেহ তুলে রইল গেরুয়া-রাঙা স্রোতের ওপর। চড়াগুলো তলিয়ে গিয়ে তিন-চারটে ধারা এক ধারায় রূপান্তরিত হ'ল। ওপারের উঁচু ডাঙা এর মধ্যেই ঝুপ-ঝাপ ক'রে ভাঙতে শুরু ক'রে দিয়েছে।

সব সহজ আর স্বাভাবিক হয়ে আসে। দারোগা নিয়মিত খবর নেন। পাশার ছক পেতে ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার গালে হাত দিয়ে চাল ভাবেন। অপ্রত্যাশিতভাবে একটা বারো-পাঞ্জা-সতরো পড়তে মুহুরী-বাবু আনন্দে লাফিয়ে ওঠেন বিকচ্ছ হয়ে।

দারোগা মাঝে মাঝে বলেন, কত ভাগ্যে যে আপনার মত লোককে আমাদের মধ্যে পেয়েছিলাম সুবোধবাবু! পুলিসে চাকরি করতে এসে তো আর ভদ্রলোকের মুখ দেখি না।

সুবোধ হাসে। চিরদিনই আপনাদের মধ্যে আমাকে এই ভাবে আটকে রাখতে চান নাকি?

দারোগা জিভ কাটেন। ছি, ছি, কি যে বলেন! পুলিসের চাকরি যে কি লজ্জা আর ধিক্কারের ব্যাপার, সেটা তখনই বুঝতে পারি, যখন আপনাদের মত লোককেও আটকে রাখতে হয়।

সুবোধ বলে; ছেড়ে দিন না, চ'লে যাই।

দারোগা ম্লান হয়ে যান। নতমস্তকে বলেন, কেন লজ্জা দেন? আমাদের ক্ষমতা যে কতটুকু, সে তো জানেন। পেটের দায়ে যা কিছু করি, নইলে—

তা সত্যি। দারোগার গলায় আন্তরিকতার সুর স্পষ্ট। আইন আর পেষণ-যন্ত্র মানুষের মনকেও কি হত্যা করতে পারে? দেশের, জাতির অপমান আর নির্য্যাতন তাকেও সত্যি সত্যিই দুলিয়ে তোলে।

জীবিকা দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যক্ষ আর নিষ্ঠুর সমস্যা। সবাই মহামানব হতে পারে না, নিঃস্বার্থভাবে নিজেকে বিলিয়ে দেবার যোগ্যতা থাকে না সকলের। তবু দারোগার এই অনুতাপবিদ্ধ কণ্ঠস্বরে অপমানিত মানুষটি নিজেকে ব্যক্ত করবার চেষ্টা করে।

দারোগাকে ভাল লাগে সুবোধের। রাগ হয় না, অভিযোগ করতে ইচ্ছে হয় না। সবাই দেবতা নয়। সুবোধ ভালবাসে মানুষকে। ত্রুটি আছে মানুষের, স্বার্থবুদ্ধি আছে, আছে সংকীর্ণতা, কিন্তু মানুষ চিরন্তন আর চিরঞ্জীব—তার হৃদয়ের মৃত্যু নেই কখনও।

ডাক্তারবাবু বলেন, আর একটু দেরি ক'রে চা খাবেন সুবোধবাবু। সীতা কি দু-চারটে খাবার তৈরি করেছে, পাঠিয়ে দেবে।

সুবোধ সলজ্জভাবে বলে, ছি ছি, এ ভারী অন্যায়। সীতা তো রোজই খাওয়াচ্ছে। প্রত্যেক দিন আপনাদের এই ভাবে বিব্রত করা—

ডাক্তারবাবু সস্নেহে হাসেন। আমি আপনার বাবার বয়সী সুবোধবাবু। ভদ্রতাটা আমার সঙ্গে আর নাই করলেন। বিদেশে নির্ব্বান্ধব দেশে প'ড়ে আছেন, কত অসুবিধে—সামান্য এতটুকুও তো করতে পারি না আপনার জন্যে।

এর ওপর কথা চলে না।

দিন কাটে। আকাশে নববর্ষার নীল মেঘ দেখা দেয়। নিমাসরাই স্তম্ভটাকে কুয়াশায় আচ্ছন্ন ক'রে নামে ঘনধারার বর্ষণ। মহানন্দা পাড় ভাঙে, তার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়ে গাং-শালিকের বাসা। নদীর জল দুলে ওঠে, ফুলে ওঠে, গর্জ্জন করে। মহানন্দা প্রখর আর প্রবল রূপ নিয়েছে। বনঝাউয়ের দল কোথায় গেছে তলিয়ে, সেখানে এখন দশ হাত লগির থই মেলে না। জেলেদের গ্রামগুলো বৃষ্টিতে অস্পষ্ট হয়ে যায়—'ফটিকজল'পাখী ঝাঁক বেঁধে আকাশের বুকে নাচতে শুরু করে।

আকাশ, বাতাস, মহানন্দা—সকলের সঙ্গে একটা সহজ প্রীতির সম্পর্ক। বই পড়তে পড়তে ক্লান্ত বোধ করলেই বাইরের জগৎটা এসে সুবোধের মনের সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে নেয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে ব'সে থাকতে পারে ওই নিমাসরাই স্তম্ভ কিংবা মহানন্দার চলস্রোতের

দিকে তাকিয়ে। তা ছাড়া দারোগা আছেন, ডাক্তার আছেন, কম্পাউণ্ডার আছেন। একটা বিচিত্র পরিবেষ্টনী।

বন্দী-জীবন পীড়িত করে মনকে। খবরের কাগজ বিক্ষুব্ধ ভারতবর্ষের সংবাদ ব'য়ে আনে। মিলে শ্রমিক ধর্ম্মঘট। মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতা। বিলাতে রক্ষণশীল দলের অনমনীয় মনোভাব। কাজের অন্ত নেই। আজ যদি বাইরে থাকত, তবে কত কাজ সে করতে পারত! পঁয়ত্রিশ বছর মাত্র বয়স, সে বুড়ো হয় নি। গায়ে শক্তি আছে, মনে জ্বলছে অনুপ্রেরণার অনির্ব্বাণ মশাল। আজ দশ বছর ধ'রে অবশ্য দেশের চিন্তাধারার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সংস্রব নেই। দেশ কতটা এগিয়ে গেছে, তাও সে স্পষ্ট জানে না। আজকের কর্ম্মীদের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে, চিন্তা মিলিয়ে নিতে হয়তো সময় লাগবে খানিকটা। তা লাগুক, তবুও আজ তার বাইরে থাকা একান্তই দরকার।

অনেকক্ষণ থেকে আকাশ গুমট ক'রে ছিল, হঠাৎ ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি নামল। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই সীতা ভিজতে ভিজতে এসে দাঁড়াল সুবোধের ঘরের বারান্দায়।

এস এস, ঘরে এস সীতা। দুপুরবেলায় কি মনে ক'রে?

ভিজে আঁচলটা গায়ে ভাল ক'রে জড়িয়ে নিয়ে লজ্জারুণ মুখে সীতা বললে, মা একখানা বই চাইছিলেন, তাই—

বই! তা ব'স, ব'স, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে যেন কিসের একটা ছোঁয়া বাঁচিয়ে সীতা চেয়ারের একপাশে বসল। সুবোধ শেল্‌ফের দিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে বললে, বাংলা বই তো আমার কাছে দেখছি না, দু-একটা পত্রিকা আছে খালি। তাই নিয়ে যাবে?

দিন।

পত্রিকা নিয়ে সীতা উঠে যাওয়ার উপক্রম করলে। কিন্তু বাইরে অবিরাম আর অঝোর ধারে বৃষ্টি। নদীর জল ফুটে উঠছে টগবগ ক'রে, ঝুপঝুপ শব্দে পাড় ভেঙে পড়ছে। সুবোধ বললে, এই বিষ্টির মধ্যে যাবে কি ক'রে? একটু দাঁড়িয়ে যাও।

চেয়ারের হাতলটা ধ'রে সীতা দাঁড়িয়ে রইল সসংকোচে। অলকে

জলের বিন্দু মুক্তাচূর্ণ ছড়িয়েছে। লজ্জিত মুখখানিতে যেন পূর্ব্বরাগের রক্তিম স্পর্শ। চঞ্চল কালো চোখের দৃষ্টি একবার স্নবোধের মুখের ওপর ফেলে সীতা চোখ নামালে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাল, সে বিদ্যুৎ দুটি কৃষ্ণ তরল তারার ওপরেও চমক লাগিয়ে গেল।

আর চমকে উঠল স্নবোধ। সীতার চোখের এই দৃষ্টিটাকে সে চিনতে পেরেছে। এমনিই দৃষ্টি সে দেখেছে আর একজনের চোখে—সে রমলা। কিন্তু সে দিনটি হারিয়ে গেছে—রমলাকে জীবন থেকে সরিয়ে দিয়েছে সে। সেদিনকার পৃথিবী ছিল বিরাট আর বহুব্যাপ্ত, সেদিন কর্ম্মশক্তি ছিল অব্যাহত। কিন্তু আজ?

সীতা আবার মাথা তুললে, আবার নামিয়ে নিলে। তার গালের লালিমা আরও ঘন হয়ে এসেছে। জরিপাড় আঁচলটা একমনে জড়িয়ে চলেছে আঙুলে।

কিন্তু আজ? স্নবোধ ভাবতে লাগল। আজ কি তেমন চলবার ক্ষমতা আছে? খবরের কাগজে বৃহত্তর সমস্যা আর তো তাকে বিব্রত ক'রে তোলে না? সমস্ত দেশের আকুল আহ্বান সত্যিই কি তেমন ক'রে তাকে চঞ্চল ক'রে তোলে? তার চাইতে অনেক সত্য হয়ে উঠেছে এই মহানন্দা, এই আকাশ, ওই নির্ব্বাক স্তম্ভটা। ওপারের মৃত্যুজীর্ণ জেলেদের গ্রামটা তার চাইতে অনেক বেশি বাস্তব। নিজেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত না ক'রেও কি দেশকে ভালবাসা যায় না?

সামনে এখনও দাঁড়িয়ে আছে সীতা। ষোড়শী, স্নন্দরী—লক্ষ্মীর মত শান্ত আর মধুর কমনীয়তায় অপরূপ। জীবনের সমস্ত রুক্ষতার ওপরে এমনই একটা স্নধাস্নিগ্ধ ধারাবর্ষণ।

সীতা!

স্নবোধের গলার স্বরে বুকের ভেতর রক্ত চলকে উঠল সীতার। চোখের দৃষ্টি মাটিতেই বন্দী রইল, উঠল না।

কাল একবার আসবে দুপুরে? অনেক কথা বলবার আছে তোমাকে, আসবে?

আবছায়া ভীরু গলায় জবাব এল, আসব।

আমি তোমার জন্যে প্রতীক্ষায় থাকব। আসবে তো?

আবিষ্ট আচ্ছন্ন চোখ তুলে সীতা আবার বললে, আসব।

বৃষ্টির জোরটা ক'মে গেছে, কিন্তু ঝিরঝির ক'রে পড়ছে এখনও। সীতা আর দাঁড়াল না, নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল বাইরে। যাওয়ার সময় ভুলে পত্রিকাগুলো ফেলে গেল চেয়ারের ওপর। সুবোধ আর তাকে ফিরে ডাকলে না। ওপারে মহানন্দা পাড় ভেঙে চলল অবিশ্রাম।

বৃষ্টি থামল। বিকেল গেল, এল সন্ধ্যা। সুবোধের যেন বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না। সমস্ত দেহমন একটা মদির আর মধুর অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আজ আর কোনও কাজ নয়, কোনও ভাবনা নয়, খানিকটা স্বপ্নাতুর আলস্য। সীতা প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে, কাল সে আসবেই। আদর্শ—নিষ্ঠা? কিন্তু চলার পথে একটি ছায়াতরু। তার তলায় এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম ক'রে নেওয়াটা এমন কি অপরাধ?

ছপছপ ক'রে একরাশ জল-কাদা ভেঙে দারোগা শশব্যস্তে প্রবেশ করলেন। আনন্দ-উচ্ছল কণ্ঠে বললেন, সুবোধবাবু, কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স।

কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স! সুবোধ বিছানা ছেড়ে উঠে বসল।—ব্যাপার কি?

স্বার্থপরের মত আপনাকে আটকে রাখতে পারলেই ভাল হ'ত আমাদের পক্ষে। কিন্তু তার উপায় নেই আর। আপনার রিলিজের অর্ডার এসেছে।

রিলিজ!

এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে সুবোধের মন আনন্দে উচ্ছলিত হয়ে উঠল কি না কে জানে! সে বিহ্বলভাবে তাকিয়ে রইল।

তিন ঘণ্টার মধ্যে আপনাকে শহরে রওনা হতে হবে। তারপর সকালের ট্রেনে কলকাতা। আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল থেকে আপনাকে খালাস দেওয়া হবে। জরুরি অর্ডার।

কিন্তু এত শর্ট নোটিসে—! আমার জিনিসপত্র—

সব পরে যথাসময়ে আপনাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, কোনও চিন্তা নেই। কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স এগেন। কিন্তু আমাদের ভুলে যাবেন না সুবোধবাবু। অনেক অপরাধ করেছি, আপনার যোগ্য মর্য্যাদা দিতে

পারি নি। কিন্তু তার জন্তে আমরা দায়ী নই—দায়ী আমাদের—থাক, মনে রাখবেন সম্ভব হ'লে।

আশ্চর্য্য, লণ্ঠনের আলোয় পুলিসের দারোগার নিষ্ঠুর কঠিন চোখ ছলছল ক'রে উঠল। সুবোধ তেমনই ক'রে তাকিয়েই রইল।

রাত এগারোটায় মহানন্দার খরস্রোতে ভাসল নৌকো। আজ সে মুক্ত, আজ বাইরের পৃথিবীতে আবার তার উদার আমন্ত্রণ। কিন্তু এই কি মুক্তি? একেই কি এমন একান্ত ক'রে কামনা করেছিল সে? তা হ'লে বুকের মধ্যে কেন এই এমন তীব্র বেদনাবোধ, কেন মনে হচ্ছে, কি যেন একটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে, কিসের একটা আঘাত রক্তাক্ত ক'রে দিচ্ছে সমস্ত হৃদয়কে?

সীতা কাল দুপুরে আসবে ব'লে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

এর পরে মুক্তি। জনবহুল, কর্ম্মবহুল কলকাতা। বহুর অরণ্যে সে হারিয়ে যাবে, তলিয়ে যাবে কর্ম্মের অশ্রান্ত ঘূর্ণিপাকে। আজ দশ বছর সে বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা থেকে পিছিয়ে আছে, সে ক্ষতি তাকে পূরণ ক'রে নিতে হবে, সময় নেই তার। ফিরতে পারবে না, পেছনে তাকাতে পারবে না। সমস্ত দেশ জুড়ে জগন্নাথের রথ চলেছে, সেই রথযাত্রায় পেছনের ভিড় তাকে ঠেলে নিয়ে যাবে, ঠেলে নিয়ে যাবে সম্মুখে, ঠেলে নিয়ে যাবে তার আদর্শ আর ব্রত উদ্‌যাপনের পথে। কিন্তু—

এই 'কিন্তু'র জবাব সুবোধ মন থেকে খুঁজে পেলে না। মহানন্দায় ভরা বর্ষার ক্ষুরধারা, স্রোতের টানে নৌকো চলেছে সম্মুখে। পেছনে থানার আলোটা মিলিয়ে এল, মিলিয়ে এল জেলেদের গ্রাম, আর অন্ধকারে অস্পষ্ট হয়ে এল নিমাসরাই স্তম্ভের নির্ব্বাক মূর্তিটা।

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সংবাদ-সাহিত্য

গত ১২ জুন 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের কাগজ-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত নূতন আদেশ প্রকাশিত হয়। ২২ জুন 'কলিকাতা গেজেটে' সেই আদেশই পুনর্মুদ্রিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা কেহই জানিতে পারি নাই। কিন্তু তৎপূর্বেই বহু বাংলা পত্রিকার শ্রাবণ-সংখ্যার কাজ অগ্রসর হইয়াছিল, আমাদেরও হইয়াছিল। ওই আদেশে বলা হইয়াছে যে, ১২ জুন তারিখের পরে প্রকাশিত যাবতীয় সাময়িক পত্রিকা, যাঁহারা দেশী মিলের কাগজ ব্যবহার করেন, পূর্ববর্তী আকারের শত-করা ত্রিশ ভাগ আকার গ্রহণ করিয়া প্রকাশিত হইতে পারিবে, অন্যথায় ভারতরক্ষা বিধি অনুসারে কাগজের কর্তৃপক্ষ দণ্ডনীয় হইবে। 'শনিবারের চিঠি'র পূর্ববর্তী আকার গড়পড়তায় প্রায় দেড়শত পৃষ্ঠা ছিল, সুতরাং আইনত আমরা ৪৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বাহির করিবার অধিকারী; ফর্মা হিসাবে ৪৫ পৃষ্ঠা ছাপা চলে না, সেই কারণে কর্তৃপক্ষ আমাদিগকে আইনের বলেই তিন ফর্মা অর্থাৎ ৪৮ পৃষ্ঠা ছাপিবার অনুমতি দিবেন। পোষ্টাপিসের আইন অনুসারে ডাকখরচার সুবিধা পাইতে হইলে এই ৪৮ পৃষ্ঠার অর্ধেক সংবাদ ও গম্ভীর লেখা দিতে হইবে, বাকি অর্ধেকে বিজ্ঞাপন গল্প উপন্যাস ইত্যাদি হালকা বিষয় থাকিতে পারে। বিজ্ঞাপনের আয় ছাড়া পত্রিকা চলিতে পারে না, সুতরাং আমরা ওই অর্ধেক ২৪ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপনই দিব। আইন পরিবর্তিত না হইলে আগামী ভাদ্র সংখ্যা হইতে আমাদিগকে মাত্র ২৪ পৃষ্ঠার মধ্যে লেখা সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। এই ২৪ পৃষ্ঠা বস্তুর মূল্য ছয় আনা লইতে পারি না। সুতরাং আমরা কাগজের দাম কমাইতে বাধ্য, কিন্তু বৎসরের এই শেষ দুই মাসের জন্য (কার্তিক হইতে আমাদের বর্ষারম্ভ) দামের পরিবর্তন নগদ গ্রাহকদের জন্য সম্ভব হইলেও বার্ষিক গ্রাহকদের জন্য সম্ভব নয়। এই দুই মাসের জন্য আমাদের গ্রাহক ও নগদ ক্রেতা উভয় সম্প্রদায়কেই কিঞ্চিৎ ঠকাইতে আমরা বাধ্য হইব। নূতন বৎসরেও এইরূপ চলিতে থাকিলে নগদ মূল্য ও বার্ষিক মূল্য উভয়ই হিসাবমত হ্রাস করা হইবে। ইতিমধ্যে আমরা দৈনিকপত্রে ব্যবহৃত বৈদেশিক কাগজ ব্যবহারের অনুমতি লইয়া পূর্ব আকৃতি বাহাল রাখিবার চেষ্টা করিতেছি, যদি তাহা না পাই, কর্তৃপক্ষের পুনর্বিবেচনা পর্যন্ত আমাদিগকে ক্ষীণকায় হইয়াই বাঁচিতে হইবে।

* * *

কিন্তু আমাদের অসুবিধার অন্ত থাকিবে না। পাঠকেরা গল্প চান, কবিতা চান, ক্রমশ-প্রকাশ্য উপন্যাসেরও যথেষ্ট চাহিদা আছে। এ সকলই নূতন

ব্যবহার বর্জন করিতে হইবে। বহু বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে আমাদের বাৎসরিক চুক্তি আছে, স্থানাভাবে তাহা খেলাপ করিতে বাধ্য হইব। ক্রেতাদের সঙ্গেও একটা অলিখিত চুক্তি আছে মালের পরিমাণ লইয়া। সে চুক্তিও ভঙ্গ হইবে। পত্রিকার অফিসের এবং ছাপাখানার কাজের পরিমাণ স্বভাবতই শত-করা সত্তর ভাগ কমিয়া যাইবে, সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই লোকসংখ্যা কমাইতে হইবে। ফলে সহস্র সহস্র কর্মক্ষম ব্যক্তি বিনা দোষে বেকার হইয়া পড়িবে। ইহার ফল যে কতদূর পর্যন্ত গড়াইবে, ভাবিতে সাহস হয় না। গবর্মেণ্ট নিজের প্রয়োজনে আদেশ জারি করিয়াছেন, কিন্তু তাহার জন্য অসামরিক নিরীহ প্রজাদের যে অসুবিধা হইবে, তাহা নিরাকরণের কোন চেষ্টা করিতেছেন কি না প্রকাশ নাই।

* * *

কাগজ-সঙ্কোচের মূল তত্ত্বকথা লইয়া বোম্বাইয়ে সভা হইয়া গিয়াছে, বহু প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি একক ও সমবেতভাবে নানা সভাসমিতির মারফৎ অথবা সাময়িক পত্রিকার মারফৎ এই তত্ত্বের যুক্তিযুক্ততা অথবা ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কথার উপরে কথা বাড়িয়াছে মাত্র; সাধারণের পক্ষে অতিশয় দুর্বোধ্য কথা জমিয়া জমিয়া হিমালয়প্রমাণ হইয়াছে। আমরা এইটুকু মাত্র বুঝিতে পারিয়াছি যে, সামরিক প্রয়োজনে অসামরিক কাগজের ব্যবহার এতখানি কমাইবার কোনই আবশ্যকতা ছিল না। শুনিতেছি, এই সকল কথার ফলে গবর্মেণ্ট সাময়িক পত্রিকাগুলি সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করিতেছেন, তাঁহারা সহৃদয় হইলে শত-করা ত্রিশ ভাগ শত-করা সত্তর ভাগ হইতে বাধা নাই।

* * *

কিন্তু একটা ব্যাপারে আমরা সত্যসত্যই শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছি। গবর্মেণ্ট বিভিন্ন পত্রিকার বিষয় সমবেতভাবে বিচার না করিয়া স্বতন্ত্র বিবেচনার যে ইঙ্গিত দিয়াছেন, তাহা অতিশয় ভীতিপ্রদ। দেশের কল্যাণের পক্ষে কোন্ কাগজের উপকারিতা কত, তাহা নির্ণয়ের ভার গবর্মেণ্ট লইলে সুবিচার হইতে পারে না; কারণ শাসক ও পরাধীন শাসিতের স্বার্থ কখনই এক হয় না। দেশের পক্ষে যাঁহারা ক্ষতিকর কাজ করিতেছেন, গবর্মেণ্ট অর্থ ও অন্যান্য সুবিধা দিয়া তাঁহাদিগকেই পুষ্ট করিতেছেন—এইরূপ মানবীয় দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তাহা ছাড়া স্বতন্ত্র বিবেচনা অর্থেই সুপারিশ-সম্বলিত বৃহতের সুবিধা, সহায়সম্বলহীন ক্ষুদ্রের মৃত্যু। ইহাতে পত্রিকাজগতে মনোমালিন্য এবং বিশৃঙ্খলা মাত্র বৃদ্ধি করা হইবে, ন্যায়বিচার হইবে না। ইতিমধ্যেই অ্যাসোসিয়েশনের ওজুহাতে কেহ কেহ ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্পাদন করিয়া আসিয়াছেন, সঙ্ঘ স্থাপন করিয়াও সকলের

অজ্ঞাতসারে ব্যক্তিগত সুবিধার দরখাস্ত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ফলে অ্যাসোসিয়েশন অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে, সকল চাচাই আপন বাঁচাইতেছেন। ক্ষুদ্রচেতা স্বার্থপর জাতিকে অধিকতর স্বার্থপর করিবার জন্য গবর্মেণ্ট এই যে ফাঁদ পাতিয়াছেন, তাহাতে আমাদের সর্বনাশই হইবে, কল্যাণ হইবে না।

* * *

ঠেলায় পড়িয়া এইরূপ গুরুগম্ভীর রচনায় মগ্ন ছিলাম, হঠাৎ অর্ধোন্মাদ গোপালদার আবির্ভাব হইল। প্রবেশপথেই "বাস" থামাইবার ভঙ্গীতে হাঁক দিলেন, এই, রোখ কে। আমি থতমত খাইয়া তাঁহাকে সাদর-সম্ভাষণও জানাইতে পারিলাম না। গোপালদা সামনের চৌকিতে আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিতে বসিতে বলিলেন, থাক, তোমার আর সংবাদ-সাহিত্য লিখে কাজ নেই। বাজে বকা তোমার অভ্যেস, এই কাগজ-কণ্ট্রোলের বাজারে সমান মাল যদি পাঠককে দিতে চাও, তোমাদের পুরোনো জলধর-পটল সিষ্টেমে তা চলবে না, মডার্ন এস্‌পারাণ্টো সিষ্টেম চাই, জেমস্‌জয়েস-এজরাপাউণ্ডের কম্বিনেশন চাই। আমি একটা সিষ্টেম ইভল্‌ভ করেছি। তোমার সংবাদ-সাহিত্য ও পুস্তক-পরিচয় নতুন ধারায় লিখেও এনেছি। এই নাও। ছেপে দাও। পাঠকদের পছন্দ হ'লে প্রত্যেক মাসে দোব।

মন-মেজাজ ভাল ছিল না। নিজের পক্ষে কিছু লেখা কঠিন হইত। একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলাম। মনে হইল, বাঁচিয়া গেলাম। এবারকার মত গোপালদার সাহায্যই লইলাম। ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যৎ জানে।

একটা কথা এখানে বলা আবশ্যক। এই পদ্ধতি মোটেই নূতন নয়, বিশেষত যে দেশে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" "জন্মাদ্যস্য যতঃ" প্রভৃতি ব্রহ্মসূত্র, "সহর্নৈষঃ' প্রভৃতি ব্যাকরণসূত্র (মুগ্ধবোধ !) এবং "হ্রীং ক্রীং" প্রভৃতি তন্ত্রমন্ত্র অবাধে প্রচারলাভ করিয়াছে, সেখানে, ইঙ্গিত যতই সংক্ষিপ্ত হউক, কাহারও বুঝিবার পক্ষে বাধিবে না। ইংলণ্ডেও ডিকেন্স তাঁহার *Pickwick Papers*-এ Jingle এর মুখে এই ভাষা চালাইয়াছেন। যথা—

"Tall lady—mother—five children—eating sandwiches—forgot arch—crash—knock—children look round—mother's head off—sandwich still in hand—no mouth to put it in—head of family off—shocking." কর্তাদের আদেশে আমাদের ভাষার **head off** হইলেও যে বিশেষ আটকাইবে, তাহা মনে হয় না। **Shocking** ঠেকিলেও সহ্য করিতে হইবে।

১৩৫১

আবার রাস্তা নোংরা—চাট্টি খেতে দাও মা—গবর্নরের রেডিও বক্তৃতা—কিন্তু চট্টগ্রাম—বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত—*People's War*—হোর্ডিং যথা পূর্বং তথা পরং—গবর্মেণ্ট নির্বিকার—চাল ডাল খরিদ্দারের টেণ্ডার—বুঝ লোক যে জান সন্ধান—মধ্যবিত্ত—সাবধান।

পাকিস্থান

মহাত্মা গান্ধী > রাজাগোপালাচারী > জিন্না—গবর্মেণ্ট + সি. পি. আই. = পাকিস্থান।

লীজ অ্যাণ্ড লেণ্ড

ছুঁচ—কাল।

লীগ

মোহনবাগান ১-০—টিপু সুলতান স্কুল হাউস—থান ইট—ধর্ম বনাম খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি—মায়া।

সমস্যা

মাসিক বেতন ১০০৲—পরিবার চার জন—বাড়িভাড়া ২৫৲—আলো + দুধ + কয়লা-ঘুঁটে—কেরোসিন + ধোপানাপিত + স্কুলের মাইনে ইত্যাদি ২৫৲—রেশন ৭৲ × ৪ = ২৮৲—দৈনিক বাজার মাছ (২৷০ সের) একপোয়া = ।৶০ + আলু (।৶০ সের) আধ সের = ।/০ অন্যান্য তরিতরকারী ।০—ঘি তেল ইত্যাদি ।/০—মোট ১৷০—৩০ × ১৷০ = ৪৫৲—২৫৲ + ২৫৲ + ২৮৲ + ৪৫৲ = ১২৩৲—থিয়েটার বায়োস্কোপ সিগারেট ট্রাম বাস শাড়ি ধুতি সাবান খবরের কাগজ মাসিক পত্রিকা বই? ঘুষ চুরি উপবাস আত্মহত্যা?

সমাধান

কন্যাদায় = স্কুলকলেজ—সি. পি. আই.—সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্ট—কফি হাউস সিনেমা—পার্টি-মীটিং—বিদেশী সৈন্য—স্বদেশী অসবর্ণ—সিভিল ম্যারেজ—উদ্ধার।

বঙ্গদেশ

ডাক্তার বি. সি. রায়—আপীল—মহামারী, বসন্ত নবেম্বর '৪৩ থেকে এপ্রিল '৪৪, ১১৭ ৭৪১—কলেরা ঐ—ঐ ৯২৫০০—দুর্ভিক্ষ হাটিহাটি পা পা।

গদ্যকবিতা

শ্রীকুমার বন্দ্যো—'ভারতবর্ষ' শ্রাবণ, ১৩৫১ পৃ. ৮২

"আজকাল পদ্যের রাজ্যে গদ্যের অনধিকার প্রবেশ সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ

শুনা যায়। এ অভিযোগ সত্য হইলেও গদ্যের সাহিত্যক্ষেত্র হইতে সুদীর্ঘ নির্বাসনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। পদ্য জ্যেষ্ঠাধিকারের সুবিধা লইয়া গদ্যের যে সমস্ত রাজ্য আত্মসাৎ করিয়াছিল, বয়ঃপ্রাপ্ত কনিষ্ঠভ্রাতা তাহা পুনরুদ্ধার করিয়া এখন জ্যেষ্ঠের খাসতালুকে অভিযান চালাইয়াছে।"

এটি স্বীকারোক্তি। বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই স্বয়ং একটি গদ্যকবিতা।

পেপার কণ্ট্রোল

'কবিতা' আষাঢ়, ১৩৫১, পৃ. ২৬৩

"রূপ মোরে দিলো ডাক।
রূপ, রূপ, রূপ দিলো ডাক।
সন্ধ্যার আরক্ত মেঘে
রূপ দিলো ডাক। নীরব প্রশান্তি মাঝে রূপ দিলো ডাক
দুরন্ত ঝড়ের বেগে
রূপ জয় ক'রে নিলো···
রূপ এলো, রূপের ঝটিকা!···
দুর্নিবার সম্মোহনে রূপ গেল ডেকে।"

সেভেন্টি পার্সেন্ট কাটের পর এই দাঁড়িয়েছে। অরিজিন্যাল কেমন হতে পারত ভাবুন!

খাঁটি গদ্য

কোনো সাম্যবাদী পত্রিকা থেকে—

"মাটি-খচ্চর যে যার মতোন দখল করেছিলো অনেকদিন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিরাট রোম কিন্তু টেকসই হলো না—বিপুল হয়ে থাকলেও একদিন হিঁচড়ে-ঘেঁসে হুমড়ে ধ্বসে পড়লো;"

ইস্কুলপাঠ্য প্রবন্ধ

'প্রবাসী' শ্রাবণ, ১৩৫১—"বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ"—অধ্যাপক শ্রীকালীকিঙ্কর দাশ।

"বাংলার অমর কবি জয়দেব হইতেই বাংলা সাহিত্যের যথার্থ ইতিহাসের আরম্ভ।···প্রকৃতপক্ষে চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সমুজ্জ্বল স্তম্ভস্বরূপ।···শ্রীকৃষ্ণকীর্তনই বাংলা ভাষায় রচিত বাঙালীর আদিকাব্য।"

'প্রবাসী' কৈচেগন্ডূষ,—হাবাগুড়ি—সাবাস!

মৃগনাভি

'মাসিক মোহাম্মদী', আষাঢ়।

"দিক হোতে দিগন্তরে বন-মৃগ-মন—
উন্মাদের পারা কস্তুরী হরিণ সম—
কেঁদে কেঁদে খুঁজে ফেরে নাভি আপনার—"

How?

হক্‌কথা

'প্রভাতী', শ্রাবণ, ১৩৫১, পৃ. ৮৬।

"ভারত গভর্ণমেণ্ট কাগজ কমানোর যে নির্দেশ দিয়েছেন তাতে বাংলার মাসিক, সাপ্তাহিকগুলো আতঙ্কনিগ্রহ বটিকার হ্যাণ্ডবিলে পরিণত হবে। গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধকালে শত বাধা নিষেধের মধ্যেও সাহিত্যের অভূতপূর্ব প্রসারে আতঙ্কিত হয়ে কতখানি স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ করতে পারেন তার নমুনা দিয়েছেন। নূতন পত্রিকা প্রকাশের পথ রুদ্ধই ছিল এখন প্রাচীনদের পালা। এবার তাহলেই সব শেষ। কিন্তু বিদেশী গভর্ণমেণ্টের এ সাহস কে জুগিয়েছে? অনেকে মুখস্থ বলবেন, আমাদের অনৈক্য। আমরা বলব, আমাদের লোভে ঐক্য। সংবাদপত্রগুলি কিসের প্রত্যাশায় কংগ্রেসের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে কংগ্রেসবিরোধী প্রচারে গভর্ণমেণ্টের হাতে রাখী বেঁধেছিল। সরকারী বিজ্ঞাপন, কাগজের কোটা, বিজ্ঞাপনের নির্ধারিত দর প্রভৃতির ব্যাপারে এরা যে দুর্বলতা দেখিয়েছে, গভর্ণমেণ্টের কাগজ নিয়ন্ত্রণের সাহস তারই প্রায়শ্চিত্ত মাত্র। সুতরাং এ আমাদের প্রাপ্য।"

ত্রিবেণী সঙ্গম

'মাসিক বসুমতী', আষাঢ় ১৩৫১, কবিতা "অহিংস"।

লেখক—মোহম্মদ নওলকিশোর।
বিষয়—বুদ্ধদেব।

আধুনিক কবিতা

ঢাকা-হল বার্ষিকী 'শতদল'। সম্পাদক সত্যব্রত বসু। সম্পাদকীয়—

প্রশ্ন। "আধুনিক' কবিতা নামে পরিচিত কবিতাগুলি পড়িয়া মনে হয় দুর্বোধ্যতা, শুধু দুর্বোধ্যতা বলিলে ভুল হইবে, অর্থহীনতাই বুঝি "আধুনিক" কবিতার স্বাব্যলক্ষণ। "আধুনিক" বাংলা কবিতায় নূতন যুগের নূতন কথা বলিবার চেষ্টা হয়তো আছে। স্বভাবতই সাহিত্যে যুগের সাধনা কামনা এবং

আদর্শ রূপ পাইতে চায়। কিন্তু তাই বলিয়া কোন তত্ত্ব বা "বাদ"এর প্রভাবে রসোপলব্ধির ব্যাঘাত ঘটিলে উহা সাহিত্যপর্য্যায়ভুক্ত হইবে না। যে আবেগ হইতে কবিতার জন্ম হয় "আধুনিক" কবিদের সেই আবেগের সঙ্গেই যেন পরিচয় নাই। আধুনিক কবিতাগুলিতে নূতনত্ব আছে, টেক্‌নিক আছে, বিদেশী কবিতার বিকৃত অনুকরণ আছে (ষ্টাইল নহে)—একটা যেন ভঙ্গিমা আছে, কিন্তু প্রাণ কোথায় ?"

উত্তর। বালিগঞ্জের "কবিতাভবনে"।

বেদব্যাস ও শঙ্কর

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়—(মূল)

"অমৃত-সরস-পরশ-পিয়াসী দেহ,
বাহির হইতে চাহি যে তোমারে বুকে
অণু-পরমাণু চাহে প্রেম-অনুলেহ।
—"প্রভাতী" 'প্রবাসী' শ্রাবণ, পৃ. ২৮৩

ইউসুফ—(টীকা)

"দেহের যৌন অনুভূতিপ্রবণ প্রত্যেক অংশই সময় সময় পরিতৃপ্তি লাভের জন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়ে এবং একথাও ঠিক যে প্রত্যেক নারী ও পুরুষই কোন না কোন সময় দেহ-কামনা চরিতার্থ করবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা অনুভব করেচেন।"
—'নরনারী', পঞ্চম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, পৃ. ১১২

[আমাদের মন্তব্য। এ বিষয়ে প্রভাতকাল অপ্রশস্ত। রবীন্দ্রনাথের "রাত্রে ও প্রভাতে" দ্রষ্টব্য]

নজরুল ইসলামের স্বরূপ

আষাঢ় 'মাসিক মোহাম্মদী'—"পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় কবি"—মুজিবর রহমন খাঁ—

"নজরুল ইসলাম নিজে পাকিস্তানের নিন্দা করুন, আর সমর্থন করুন—আসলে তাঁর লেখায় যাকে বলা হয় পাকিস্তানবাদ, তারই জয়গান ঘোষিত হয়েছে। কবির পরিচয় তাঁর কাব্যেই ভাল করে পাওয়া যায়। নজরুল ইসলাম তাই সব চাইতে ভাল করে ধরা দিয়েছেন তাঁর গানে ও কবিতায়। এখানে তাঁকে আমরা পাকিস্তানবাদের প্রথম সফল রূপকার হিসাবেই দেখতে পাই।"

পাকিস্তানী মন্ত্রীমণ্ডলী—মানহারা ? আজাদ-বিরোধিতা ?

অতিশয় সম্ভব

'মন্দিরা', আষাঢ়—শ্রীগীতা বসু—কবিতা—"প্রসন্নবতা"—

"চাই না আমি টাকা
তাবলে চাইনা আমি দারিদ্র্যেভরা জীবন ফাঁকা!
যখন যা আমার প্রয়োজন, কেউ যদি দেয় মিটিয়ে,
কি হবে তাহলে আর টাকা নিয়ে?"

এখন পর্যন্ত এইটেই রেওয়াজ, সুতরাং—সম্ভব।

A Warning

মোহাম্মদ আবদুল হক—"সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা"—'মাসিক মোহাম্মদী', আষাঢ়—

"বর্ত্তমানে কোনো কোনো হিন্দু সাহিত্যিক মুসলমান সমাজের একটু আধটু ছবি আঁকিবার চেষ্টা করিতেছেন; তাঁহাদের প্রতি আমার বক্তব্য, মুসলমান নামধারী নরনারীর কাহিনী লিখিলেই মুসলমান সমাজের ছবি আঁকা হয় না। যে-কোনো সমাজের কাহিনী লিখিতে গেলে কাহিনীর শিকড়কে সেই সমাজের স্তরে স্তরে এমনভাবে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া জীবনরস আহরণ করিতে হইবে যে, সেই কাহিনীকে সেই সমাজভূমি হইতে উৎপাটন করিলে উনুনে দেওয়া ছাড়া আর কোনো গতি যেন তার না হয়।...মুসলমান সমাজকে হিন্দুরা চিরদিন দূরে রাখিয়াছেন এই অভিযোগ কৃত্তিবাস-চণ্ডিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-বিভূতিভূষণ-তারাশংকর পর্যন্ত সকলের প্রতিই করা যায়। হিন্দু-মহাসভা-কংগ্রেসী নীতি সাহিত্যেও হুবহু অনুসরণ করা হইয়া থাকে।"

বিপন্নের আর্ত্তনাদ

"কাগজের ব্যবহার কমাইবার জন্ত দায়ী ভারত-সরকার, দেশবাসী নয়। কয়লার উৎপাদন আজ কমে নাই, বৎসরাধিক কাল যাবৎ কয়লা-বিভ্রাট চলিতেছে। এই সময়ের মধ্যে উত্তর-আমেরিকা হইতে কাগজ আনা যাইত না ইহা কেহ বিশ্বাস করিবে না। শুধু তাই নয়, ভারত-সরকারের লাইসেন্স প্রদানের গোলযোগে ব্রিটেন হইতে যত কাগজ আনা যাইতে পারিত তাহাও আসে নাই, ইহাও প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। সময় থাকিতে কাগজ আমদানীর চেষ্টা না করিয়া ভারত-সরকার ছাপাখানা ও সাময়িক পত্রগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া তাহাদের ব্যবহার্য কাগজ টানিয়া লইয়া নূতন এক বেকার সমস্যার সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

শনিবারের চিঠি
১৬শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫১

নিগুর্ণ মনুষ্য-সমাজ

অথবা

সমাজতন্ত্র ও গীতার নিষ্কাম কর্ম্মবাদ

রুশিয়ার ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ভয়ঙ্কর বিপ্লবের পর হইতে সোশ্যালিজ্ম বা সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকলেই অত্যন্ত উৎসুক হইয়া উঠিয়াছেন এবং ইহা লইয়া জল্পনা-কল্পনা ও তর্ক-বিতর্কের আর অন্ত নাই। বর্ত্তমান বিশ্ব-সংগ্রামে রুশিয়ার অদ্ভুত রণকৌশল ও কূটনীতি শত্রু মিত্র সকলকে পরাস্ত করিয়া বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে এবং দোজ-হ্-হ্যাভ-দের হৃদয়ে নূতন ত্রাসের ও দোজ-হ্-হ্যাভ-নট-দের প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার করিয়াছে। আর উভয় দলের মধ্যবর্ত্তী চতুর মধ্যবিত্ত শ্রেণীও নূতন করিয়া ফন্দি-ফিকির আঁটিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। এদেশেও সোশ্যালিজ্মের ভেক ধারণ করিয়া অনেকেই নূতন খেলা খেলিতে শুরু করিয়াছেন। ফলে সোশ্যালিষ্টদের মধ্যেও নানা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে এবং খাঁটি ও মেকীর পার্থক্য করা সাধারণ লোকের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। সোশ্যালিজ্মের দীর্ঘ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত না হইয়া আমি এই বহুনিন্দিত ও বহুপ্রশংসিত তত্ত্ব সম্বন্ধে মাত্র একটা দিক হইতে এখানে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিব। বিষয়টির এই দিক দিয়া পূর্ব্বে আর কখনও আলোচনা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

ক্যাপিট্যালিজ্ম, ফ্যাসিজ্ম, সোশ্যালিজ্ম বলিতে আমরা সাধারণত তিনটি বিভিন্ন প্রকৃতির ও আকৃতির সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিকল্পনা করিয়া থাকি এবং উহাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচার করিবার সময়ও মানুষকে বাদ দিয়া কন্‌ষ্টিটিউশনাল মেশিন বা শাসন-প্রণালীগুলিরই তুলনামূলক বিচার করিয়া থাকি। বিভিন্ন তন্ত্রের রাষ্ট্রপতিগণের ব্যক্তিত্বের বিচার হয়তো তাহাতে স্থান পাইয়া থাকে; কিন্তু সর্ব্বসাধারণের মতিগতির বিচারের স্থান সেখানে নাই,—থাকিলেও উহা গৌণ, মুখ্য নহে। এইরূপ বিচারের প্রধান দোষ এই যে, ইহা সমাজ-ব্যবস্থা বা শাসন-প্রণালীকে মানুষের উপরে বা আগে স্থান দেয় এবং মনুষ্য-স্বভাবকে বাদ দিয়া নূতন সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার কল্পনা করে। সেইজন্যই সোশ্যালিজ্মকে নস্যাৎ করিতে গিয়া উহার অনুরাগী ও শিষ্যগণকে আমরা কোমল মনোবৃত্তিহীন, বিবাহবন্ধনে অবিশ্বাসী, অধার্ম্মিক, সর্ব্বপ্রকার খ্রীষ্টীয় সদাচার ও নীতিবিবর্জ্জিত কিম্ভূতকিমাকার জীব হিসাবে নিন্দা করিয়া থাকি। ইহার অর্থ

এই যে, সমাজতন্ত্রের 'আদর্শানুযায়ী সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিলে তাহা হইতে এইরূপ মানবগোষ্ঠীরই সৃষ্টি হইবে।' সুতরাং এই পথে আমাদের যাওয়া সঙ্গত নহে। কিন্তু আমার মনে হয়, কার্য্যকারণ সম্বন্ধ-নির্ণয়ে আমরা এখানে গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়া থাকি। কারণ সমাজতন্ত্র হইতে এই প্রকার মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে ইহা যতটা সত্য, তদপেক্ষা অধিক সত্য এই প্রকার মানুষ সৃষ্টি হইতেছে বলিয়াই সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে। এই সহজ সত্যটি যদি আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া না যাইত, তাহা হইলে আমরা ফ্যাসিজ্‌ম বা সোশ্যালিজ্‌মের তত্ত্ব বা আদর্শকে গালমন্দ না দিয়া, এমন কি ঐ ঐ সমাজের মনুষ্যশ্রেণীকে দোষারোপ না করিয়া মনুষ্য-সমাজের এই ক্রমবিবর্ত্তনের কারণ অনুসন্ধানে অধিকতর অবহিত হইতাম। আমাদের সমাজে আজও সোশ্যালিজ্‌মের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং হইতে এখনও বহু বিলম্ব আছে বলিয়াই মনে করি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইতিমধ্যেই বহু খাঁটি ও মেকী সোশ্যালিষ্ট আমাদের মধ্যে জন্মিয়াছে এবং সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের আওতায় ও সংস্কারে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত আমাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। কাজেই আমি যাহা বলিতে চাহিতেছি তাহা হইতেছে এই যে, ক্যাপিট্যালিজ্‌ম, ফ্যাসিজ্‌ম বা সোশ্যালিজ্‌ম বলিতে আমরা বিশেষ কোন সমাজ-ব্যবস্থা বা শাসন-প্রণালীকে বুঝিলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহারা বিশেষ চরিত্রের বা টাইপের মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব বা অস্তিত্বকেই প্রকাশ করিয়া থাকে।

এই যে নূতন ধরনের জীব, ইহারা গুরুজনকে গুরুজন বলিয়া বিশেষ সম্মান দেখাইবার প্রয়োজন বোধ করে না। প্রণাম বা নমস্কার করা ইহাদের সহজে আসে না। প্রশ্নের জবাব ইহারা পারতপক্ষে দেয় না, দিলেও অতি সংক্ষেপে। গৃহের সর্ব্বপ্রকার সুখস্বাচ্ছন্দ্য ইহারা স্বাধিকারে, অবলীলাক্রমে গ্রহণ করে, কিন্তু অপর পক্ষে তাহাদের উপর গৃহেরও যে কিঞ্চিৎ অধিকার থাকিতে পারে, উহাদের ভাবসাবে তাহা মনে হয় না। ইহারা বিনয়ে যেমন বিশ্বাস করে না, অনাবশ্যক ঔদ্ধত্যও বড় দেখায় না। যাহা প্রয়োজন, তাহা উহারা নীরবে আত্মসাৎ করে বা ব্যবহার করে—বারণ করা চলে না। ইহারা পরকে আপন করে, আপনাকে করে পর। কবিতা ইহারা লেখে না, ইহাদের শিষ্যদের অনেকে লিখিয়া থাকে, কিন্তু আমাদের নিকট তাহাদের ভাষা ও ভঙ্গী দুইই হয় অবোধ্য। তরুণ বয়সে ইহারা প্রেমে পড়ে না, কিন্তু বান্ধবী করে; এবং বিবাহ করিলেও প্রেমের উচ্ছ্বাসজনিত যাতনা ইহারা ভোগ করে না। সময়ের জ্ঞান ইহাদের নাই; ধর্ম্মের ধার ইহারা ধারে না। মুখে ইহাদের কঠিন আবরণ, ভাল করিয়া

ইহারা হাসে না, কাঁদিতে সম্ভবত একেবারেই জানে না। ইহাদিগকে আমরা বুঝিতে পারি না; স্বার্থপর, 'কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন, দয়ামায়াশূন্য বলিয়া রাগ করি; তাহারা বিস্মিত হয়, অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকে, কিছু বলে না, আপনার পথে নির্ব্বিকারচিত্তে আবার চলিতে থাকে। উহাদের নির্ব্বিকার, নির্লিপ্ত স্বার্থপরতা যেমন আমাদের নিকট অবোধ্য, আমাদের সকরুণ হৃদয়াবেগ ও উচ্ছ্বাসও উহাদের নিকট তেমনই অনাবশ্যক ন্যাকামি।

সোশ্যালিজ্‌মের সহিত এইরূপ চরিত্রের মানুষের অভেদ সম্পর্ক সম্বন্ধে এইখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে। তাহার উত্তর দিতে হইলে সোশ্যালিজ্‌মের মূল তত্ত্বটা কি. তাহা একবার চিন্তা করা দরকার। ব্যক্তিগত ধনাধিকার ও অর্থের মধ্যস্থতায় উৎপন্ন পণ্য ক্রয়বিক্রয় যেমন ধনতন্ত্রের ভিত্তি, তেমনই ব্যক্তিগত ধনাধিকারের বিলোপ এবং প্রধানত মানুষের ভোগের জন্য পণ্য-সম্পদের সৃষ্টি (অর্থের মধ্যস্থতায় ক্রয়বিক্রয়ের জন্য নহে) হইল সমাজতন্ত্রের আদর্শ। ব্যক্তিগত বা পরিবারগত ধনাধিকারকে অস্বীকার করা মানেই হইল সাংসারিক বন্ধন ও ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষিত ধর্ম্মকে অস্বীকার করা। আমার জমি, আমার বাড়ি, আমার স্ত্রী, আমার গরু (এখন মোটর), সেন্স অফ পজেশনের এই যে মজ্জাগত সংস্কার, ইহাকে লঙ্ঘন করিবার জন্য কতখানি সংস্কারমুক্ত, নির্লিপ্ত কঠিন হৃদয়ের প্রয়োজন, তাহা চিন্তা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব। প্রশ্ন উঠিতে পারে, ইহার জন্য স্ত্রী বা ধর্ম্ম পরিত্যাগের প্রয়োজন কি? প্রকৃত প্রস্তাবে স্ত্রীকে বর্জ্জন করিবার কথা সমাজতন্ত্র কোথাও বলে নাই; জমি, বাড়ি, গরু, ঘোড়া, ভেড়ার সহিত প্রেমরসে জড়িত যে স্ত্রী, উহাতেই তাহাদের আপত্তি। কিন্তু তাহাকে শোধন করিয়া "কম্‌রেড" হিসাবে গ্রহণ করিতে ইহাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই। ইহাদিগকে গৃহিণী বলিলে ব্যাকরণ কিঞ্চিৎ অশুদ্ধ হইবে; কারণ যেখানে গৃহের অভাব, সেখানে গৃহিণী কোথায় থাকিবেন। চরণদাসীও ইহারা নহেন। কিন্তু সহধর্ম্মিণী বা জীবনসঙ্গিনী লাভে কোন বাধা সমাজতন্ত্রে নাই। তারপর কথা উঠিতে পারে, বেশ, ইহা না হয় বুঝিলাম, কিন্তু ধর্ম্ম কি দোষ করিয়াছে? তাহার উত্তর এই যে, শাশ্বত বা প্রাকৃত ধর্ম্ম দোষ কিছু না করিয়া থাকিলেও ধনতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষিত ধর্ম্মগুলিকে ইহাদের মতে মার্জ্জনা করা যায় না। এই সকল ধর্ম্ম শ্রেণীবৈষম্য ও ধনবৈষম্যকে গোড়া হইতেই পূরাপূরি স্বীকার করিয়া লইয়া মানবজীবনে দুঃখবাদকে সম্মানের আসন দান করিয়া দুনিয়ার দীনদুঃখী ও দাসজীবীকে যীশুখ্রীষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ কিংবা খোদাতালার মুখপানে তাকাইয়া সকল নির্য্যাতনকেই নীরবে হজম করিতে উপদেশ দিয়াছে। দক্ষিণ গালে চড় মারিলে

বাম গাল বাড়াইয়া দিতে, কলসীর কানা মারিলেও প্রেম বিতরণ করিতে এবং মন্বন্তর, মহামারী, মহারণ প্রভৃতি সবকিছু দুর্য্যোগে দৈব বা অদৃষ্টের উপর সকল দোষ চাপাইয়া দিয়া চিরশান্তি লাভ করিতে শিক্ষা দিয়াছে। এই সব অনুশাসনের দ্বারা সবল ও ধনীর পথ মসৃণ ও সুগম করিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহাদের অনাচার ও অত্যাচারকে জাগতিক বিধানের একটা স্বাভাবিক নিয়ম হিসাবে মানুষের সম্মুখে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। এইরূপ ধর্ম্মের অহিফেন সেবন করিয়া ও পরিবারের বন্ধনে বন্দী হইয়া পৃথিবীর নিঃস্বলেরা মুষ্টিমেয় ধনী মালিকের ঘানিগাছে উদয়াস্ত ঘুরিতেছে এবং তাহাদের রক্ত-জল-করা তৈলে উহারা ফাঁপিয়া ফুলিয়া ঢোল হইয়া উঠিয়াছে। অতীতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, কৃষি-শিল্প, এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসারে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন ও সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে, ইহা অস্বীকার করিলে সত্যকে অস্বীকার করা হইবে। কিন্তু ইহার অন্তর্নিহিত মূলগত বিরোধ ও বৈষম্য (কন্ট্রাডিক্‌শন অ্যাণ্ড ইন্‌ইকুইটি) আজ ইহাকে এমন একটা স্থানে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে, যেখানে শ্রেণী ও জাতিবিরোধ সমগ্র মানবকে নিঃশেষ ও নির্ম্মূল করিতে উদ্যত হইয়াছে। ফলে হ্যাভ-নটদের পরিবার ছত্রভঙ্গ হইয়াছে, আমার বা আমিত্বের শখ মিটিয়াছে, ধর্ম্মের ঘোর কাটিয়াছে। সেইজন্যই মানুষ আজ অনুপায়ে প্রকৃতির ন্যায় নির্ম্মম ও নির্ব্বিকার হইয়া উঠিয়াছে। মানব-সভ্যতার ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনেরই ইহা অবশ্যম্ভাবী ফল।

এই ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের মূলে কোন্ শক্তি প্রধানত কাজ করিতেছে। এখন তাহাই বিবেচনা করা আবশ্যক। সোশ্যালিষ্টদের মতে, পণ্যোৎপাদনের প্রণালী এবং জীবনসংগ্রামের গুরুত্বই মানব-সমাজের ও সভ্যতার রূপকে দেশে দেশে যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত করিয়া আসিয়াছে। সুতরাং এই পরিবর্ত্তনের ধারাকে অনুসরণ করিতে হইলে অর্থনৈতিক পটভূমিকায় ফেলিয়াই তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। অর্থাৎ ইতিহাসের ব্যাখ্যা করিতে হইলে ধর্ম্মের কঠিন শাসন ও রাজশক্তির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপকেও লঙ্ঘন করিয়া অলক্ষ্য কিন্তু অমোঘ অর্থনৈতিক প্রভাবের প্রতিই আমাদের সন্ধানী দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করিতে হইবে। ইহাকেই সোশ্যালিষ্ট বা কম্যুনিষ্টবাদীরা মেটিরিয়ালিষ্টিক (অর ইকনমিক) ইন্‌টারপ্রিটেশন অফ হিষ্ট্রি বলিয়া থাকেন। ইতিহাসের এই ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করা সহজ নহে, যদিও ক্ষাত্রশক্তি ও ধর্ম্মের অনুশাসন অপেক্ষা অর্থনৈতিক প্রভাবকে উচ্চতর স্থান দিতে আমাদের মধ্যে অনেকেরই ঘোরতর আপত্তি আছে। কিন্তু আজ যে আমরা আমাদের অনেকগুলি সযত্নপুষ্ট কোমল হৃদয়বৃত্তি ও সামাজিক

আচার-ব্যবহার এবং ধর্মকে ইচ্ছাসত্ত্বেও কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিতেছি না, তাহার মূলে যে এই জীবন-সংগ্রাম বা অর্থসঙ্কটই কাজ করিতেছে, তাহা কি আমরা অস্বীকার করিতে পারি? এই জীবন-সংগ্রাম বা অর্থনৈতিক ব্যাপার হইতেই যে ভ্রাতৃবিরোধ, পারিবারিক কলহ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা, বিশ্বব্যাপী লড়াই, তাহাও কি অস্বীকার করা যায়?

প্রাণীমাত্রেরই বাঁচিয়া থাকিবার যে প্রকৃতিদত্ত সহজাত ধর্ম, তাহা আর সব হৃদয়াবেগ বা মনোবৃত্তিকে অতিক্রম করিয়া সকলের উর্দ্ধে স্থানলাভ করিতে চাহিবে ইহা সমাজতন্ত্রীদের মত বলিয়াই আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। সেইজন্যই সৃষ্টির আদি হইতে অধুনা পর্য্যন্ত মনুষ্য-সমাজে বা ইতরপ্রাণী-জগতে কোথাও বিরোধ, সংঘর্ষ বা লড়াই বন্ধ থাকে নাই। যে রাজশক্তি বা ধর্ম্মযাজক ইহাকে দমন বা প্রতিরোধ করিবেন, তাঁহারা নিজেরাই অতি ভয়ঙ্কর অশান্তি ও অনাচারের সৃষ্টি করিয়া ইতিহাসের বহু পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। এমন কি ধর্মের নামে এবং রাজাদেশেই বহু অনাচার-অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সভ্যতা রক্ষার নামে নগ্ন বর্ব্বরতার বিশ্বব্যাপী যে বীভৎস তাণ্ডবলীলা আজ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, আদিম বর্ব্বর যুগে কিংবা সভ্যতার মধ্যযুগে, এমন কি বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে কাহারও পক্ষে ইহা কল্পনা করাও কি সম্ভব ছিল? প্রেম, প্রীতি, দয়াদাক্ষিণ্য, ক্ষমা, তিতীক্ষা, অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, সুনীতি, সদাচার, আত্মসংযম ও পরার্থপরতা প্রভৃতি মনুষ্যত্বের যে সব উচ্চ আদর্শকে আমরা এতকাল স্বীকার ও প্রচার করিয়া আসিয়াছি, সেগুলির উন্মেষসাধনে নিশ্চয়ই ইহা সহায়তা করিতেছে না। পরন্তু দুর্লোভ, দুর্নীতি, নীচতা ও নিষ্ঠুরতা বিশ্বময় আজ যে রাজটীকা ও রাজকীয় অভ্যর্থনা লাভ করিল, ইহার পর এই গৌরবের আসন হইতে ইহাদিগকে নামানো কি রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয় বা ধর্মের সাধ্যায়ত্ত? অতীতেও তাহা সম্ভবপর হয় নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না। কোন আদর্শকেই শুধু উচ্চাঙ্গের তত্ত্বকথা বলিয়া বা ধর্মের দোহাই দিয়া রক্ষা করা যাইবে না—যদি আমরা এই বিরোধ বা সংঘর্ষের মূল কারণের উচ্ছেদ সাধন করিতে না পারি অর্থাৎ আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা বা জীবন-সংগ্রামকে একটা নূতন বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম না হই। তাহা করিবার জন্যই সংস্কারমুক্ত এই নূতন মানুষের প্রয়োজন হইয়াছে। আমরা না চাহিলেও ধনতান্ত্রিক সমাজের অন্তর্নিহিত বিরোধ ও বৈষম্যই ইহাদিগকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছে। যে ধনতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ অবদান এই বিংশ শতাব্দী ও তাহার বিজ্ঞানারূঢ় এই অপূর্ব্ব সম্পদ, সেই ধনতন্ত্রই তাহার সেই অপূর্ব্ব সৃষ্টিকে

সহস্রমুখী মারণাস্ত্রে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য উন্মত্তের মত ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে!

এই আত্মঘাতী আচরণের মূল খুঁজিতে হইলে ধনতন্ত্রের ভিতরকার গলদ কোথায়, তাহা জানা আবশ্যক। এখন অতি সংক্ষেপে তাহাই এখানে আলোচনা করিব। সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে যাইয়া ধনিকসম্প্রদায় এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়া থাকেন যে, ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি যদি না থাকে, এত সম্পদ এত ঐশ্বর্য্য তাহার কিছুই যদি নিজের না হয়, তাহা হইলে মানুষের ধনোৎপাদনের উৎসাহ, উদ্যম থাকিবে কেন? কর্ম্মপ্রেরণার মূল উৎসই তো তাহা হইলে শুষ্ক হইয়া যাইবে। ইহার উত্তরে সমাজতন্ত্রের পক্ষ হইতে পালটা প্রশ্ন করা হইয়া থাকে—এতকাল যে অগণিত শ্রমিক ও শিল্পী ঐশ্বর্য্য সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে, তাহার কতটুকুতে তাহাদের নিজেদের অধিকার বা স্বামিত্ব ছিল? এযাবৎকাল উৎপাদন (প্রোডাকৃশন) যাহা হইতেছে তাহা তো সকলের সমবেত চেষ্টায় সমাজতান্ত্রিক প্রথায়ই হইতেছে; শুধু বণ্টন-(ডিস্ট্রিবিউশন)-এর বেলায় ওই বিশাল পণ্যসম্ভারের উপর মালিকী স্বত্ব জন্মিতেছে গুটিকয়েক ধনীর। সমস্ত ব্যবস্থার এইখানেই তো অস্বাভাবিকতা এবং ইহাই তো মূল ব্যাধি। এই ব্যবস্থায়ও যদি সৃষ্টির কাজ জোরে চলিয়া আসিয়া থাকিতে পারে, তবে সবাই যখন সৃষ্ট সম্পদের স্বত্বাধিকারী না হইলেও, তুল্য ভোগাধিকারী হইবে, তখন কর্ম্মের উৎসাহ কমিবে কেন? আর এত বিতর্কেরই বা প্রয়োজন কি? কমিয়াছে কি বাড়িয়াছে, রুশিয়া তো তাহার চাক্ষুষ প্রমাণই দিতেছে। দুর্দ্ধর্ষ, অপরাজেয় জার্মানশক্তির সম্মুখে দুনিয়ায় যখন কেহই দাঁড়াইতে পারিতেছিল না, তখন একমাত্র রুশিয়া তাহাকে শুধু রুখিল না, ভয়ঙ্কর রকমে ঘায়েল করিল।

যে কথা বলিতেছিলাম। ধনতন্ত্রের ভিতরকার গলদের আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা তাহার মার্ক্‌সীয় ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত না হইয়া একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত হইতে তাহা আরও সহজে বুঝিতে পারিব। রবার্ট ওয়েন স্কটল্যাণ্ডের একজন বিখ্যাত কাপড়ের কলের মালিক ছিলেন। কিন্তু সাধারণ ধনিকের মনোবৃত্তি তাঁহার ছিল না। তিনি ছিলেন আদর্শবাদী, চিন্তাশীল ও দরদী লোক। তাঁহার কারখানার শ্রমিকদের সকল রকম মঙ্গলের জন্য তাঁহার মনোমত আদর্শ বন্দোবস্ত করিবার পরও তিনি কিছুতেই মনে শান্তি পাইতেছিলেন না, এবং পরিশেষে শ্রেষ্ঠ সামাজিক সম্মান, বিপুল বিভব ও ভোগবিলাস সমস্ত ত্যাগ করিয়া কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে ধনীর দীনদোহনের

(এক্সপ্লয়টেশনের) বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার "রেভলিউশন ইন মাইণ্ড অ্যাণ্ড প্র্যাক্টিসে" (১৮৪৮) লিখিয়াছেন, "আমার কারখানার ২৫০০ শ্রমিক আজ মানুষের জন্য যে পরিমাণ পণ্য প্রস্তুত করিতেছে, অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে উহা প্রস্তুত করিতে ৬০০০০০ শ্রমিকের প্রয়োজন হইত। আমি নিজেকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম,—২৫০০ লোকে যে পণ্য আজ ভোগ করিতেছে এবং ৬০০০০০ লোকে যে পণ্য পূর্ব্বে ভোগ করিত, এই দুইয়ের মধ্যে যে পার্থক্য তাহার কি হইল? সেই পণ্য কোথায় গেল?" প্রশ্নের উত্তরও তিনি নিজেই দিয়াছেন, "ইহার উত্তর খুব সহজ ; এই পণ্য মূলধনের উপর শতকরা পাঁচ পাউণ্ড সুদ দিতে এবং তদুপরি তিন লক্ষ পাউণ্ড লভ্যাংশ দিতে ব্যবহৃত হইয়াছে।" তাহাই আবার অভিজাত-সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতি ও ভোগবিলাসের খোরাক এবং এক-একটা সর্ব্বনাশা লড়াইয়ের ইন্ধন যোগাইতে ধোঁয়া হইয়া উড়িয়া যাইতেছে। এইভাবে আর কতদিন চলিবে? তাই আমাদের মধ্যে একদল অদ্ভুত নূতন মানুষের অভ্যুদয়।

সমাজতন্ত্রীদের মেটিরিয়ালিষ্টিক ইন্টারপ্রিটেশন অফ হিষ্ট্রিকে যদি এতটা প্রাধান্য দিতে রাজি না-ও হই, কিন্তু থিওরি অফ ইভলিউশনকে স্বীকার করি, তাহা হইলেও নূতন মানুষের আবির্ভাবের জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কথা হইতে পারে, ক্রমবিবর্ত্তনের নিয়মানুসারে আমরা যদি বানর হইতে মানুষ হইয়া থাকি, তাহা হইলে এক্ষণে মানুষ হইতে আমাদের দেবতা হইবার কথা। এরূপ অধঃপতন হইবার তো কথা নহে। ঠিক কথা। কিন্তু যাহাকে আমাদের পুরাতন চোখে অধঃপতন মনে হইতেছে, তাহা কি সত্যই তাই? সেন্টিমেন্ট বা ইমোশন-বিবর্জ্জিত মানুষ আমাদের অপরিচিত বলিয়াই যে নীচুস্তরের মানুষ, ইহা ধরিয়া লওয়া কি একদেশদর্শিতা হইবে না? গীতার নিষ্কাম কর্ম্মবাদ তো ইমোশন-বিবর্জ্জিত আদর্শ মানুষের কল্পনাই করিয়া গিয়াছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত সেই উচ্চ আদর্শে আমরা এতকাল চেষ্টা করিয়া কয়জন পৌঁছিতে পারিলাম? ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির বিলোপ-সাধনের প্রস্তাব করিয়া সমাজতন্ত্রীরা যদি নিষ্কাম কর্ম্মসাধনায় সিদ্ধিলাভের সেই সহজ পথটি নির্দ্দেশ করিতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের ক্ষুণ্ণ না হইয়া তো উল্লসিত হইবার কথা। তা ছাড়া, আধুনিক জগতে ভাবপ্রবণ সদ্গুণবিশিষ্ট মানুষের যখন টিকিয়া থাকা আর সম্ভবপর হইতেছে না, তখন দুর্গুণবিশিষ্ট মনুষ্য-সমাজ অপেক্ষা এই নির্গুণ মনুষ্য-সমাজকে স্বীকার করিয়া লইয়া নিষ্কাম কর্ম্ম-সাধনায় লাগিয়া যাইতে আপত্তি কি? ইহাতে সংসারধর্ম্ম বিনাশপ্রাপ্ত হইবে না,

অধ্যাত্ম-ধর্ম্মও বজায় থাকিবে এবং সর্ব্বোপরি আমাদের সনাতন ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ হিতোপদেশেরও জয় হইবে। সম্পাদক মহাশয় মেকী সমাজতন্ত্রীদের দ্বারা অত্যন্ত তিক্ত-বিরক্ত হইয়া থাকিলেও, এই দিক দিয়া বিষয়টা একবার ভাবিয়া দেখিবেন।

শ্রীঅনাথগোপাল সেন

মহাস্থবির জাতক

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমার জীবনে লক্ষ্য করেছি, একটা সুখের কারণ ঘটলেই ঠিক সেই ওজনের একটা দুঃখও এসে জোটে। সুখদুঃখের নাগরদোলায় এই ওঠানামার ওপর এমন একটা মানসিক মৌতাত আমার জন্মেছে যে, সরল একটানা জীবনযাত্রায় আমি হাঁপিয়ে উঠি, লৌকিক ও সাংসারিক বিধিমতে সে জীবন সুখের হ'লেও। লতুর সঙ্গে আমার এই যে নতুন পরিচয় ঘটল, তারই আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমি দিন কাটাতে লাগলুম। লতু একদিন বললে, ভাল ক'রে পড়াশোনা কর।

সেদিন থেকে পড়ায় এমন মন লাগালুম যে, বাবা পর্য্যন্ত খুশি হয়ে উঠলেন। মনে পড়ে, এই সময় আমাদের ইস্কুলে একজন নতুন শিক্ষক এলেন। ক্লাসের মধ্যে আমি, শচীন ও প্রমথ একেবারে দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠেছিলুম। তর্ক, মারামারি ও নানারকম উৎপাতের জন্য শিক্ষক-সম্প্রদায় সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত থাকতেন। ক্লাসের মধ্যে আমরা তিনজন সবার চাইতে বেশি মার খেলেও অধিকাংশ শিক্ষকই আমাদের পছন্দ করতেন বেশি। তাঁদের আশা ছিল, একদিন, যেদিন আমাদের সদ্‌বুদ্ধি হবে, সেদিন আমরা সব বিষয়েই সব ছেলের চাইতে ভাল হয়ে যাব।

আমাদের এই নতুন শিক্ষকটি আসামাত্র তাঁর সঙ্গে কি জ্যাঠামো করায় তিনি আমার ও শচীনের বেশ ক'রে কান রগড়ে দিলেন। নতুন মাস্টারের হাতে কানৌটি খেয়ে আমাদের মাথায় দুষ্ট-সরস্বতী চেপে বসল। আমরা রকম-রকমের বুলিচালি কাটতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। শেষকালে তিনি রেগে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ঠিক সেই সময় শচীনের বাবা অর্থাৎ আমাদের ইস্কুলের যিনি কর্তা, তিনি কি একটা কাজে এসেছিলেন। নতুন মাস্টারটি একেবারে তাঁর কাছে গিয়ে উৎপাতের কথা বলতেই আমাদের ডাক পড়ল। আমরা লাইব্রেরি-ঘরে যেতেই আমাদের ওপর বেত্রাঘাতের হুকুম দিয়ে তিনি চ'লে গেলেন। ঠিক হ'ল, ইস্কুলের ছুটির পর সব ছেলের সামনে আমাদের বেত মারা হবে। নতুন মাস্টার অর্থাৎ যাঁর ক্লাসে আমরা হাঙ্গামা করেছিলুম, তিনি বেত্রাঘাত করবেন—তাঁর যত ঘা খুশি।

ইস্কুলের ছুটি হতে সব ছেলেরা ও মাস্টারেরা উঠনে ভিড় ক'রে দাঁড়াল। উঠনের মাঝখানে একটা বেঞ্চি পেতে তার ওপরে আমাকে চড়ানো হ'ল। মাস্টার মশায় একখানা হাত-তিনেক লম্বা বেত নিয়ে এলেন। রাগে তখনও তিনি কাঁপছিলেন। প্রথমেই তিনি আমার পায়ে ঘা পাঁচ-সাত গায়ের জোরে মারতেই আমি একেবারে ব'সে পড়লুম। পায়ের যন্ত্রণায় মাথা পর্য্যন্ত ঝনঝন করছিল, তবুও রসিকতা করবার প্রলোভন সামলাতে পারলুম না। বললুম, পায়ে মারবেন না সার্। পা ভেঙে গেলে আর ইস্কুলেও আসতে পারব না, আপনার হাতে মার খাবার সৌভাগ্যও আর হবে না।

আমরা তখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়তুম। ওপরের ও নীচের সব ক্লাসের ছেলেরাই আমাদের পছন্দ করত। আমাদের ওপরে এই সাজার ব্যবস্থাটা তাদের মনঃপূত হয় নি। আমার ওই কথা শুনে তারা একেবারে হো-হো ক'রে হেসে উঠল।

অন্য মাস্টারেরা ছেলেদের এই ধৃষ্টতা দেখে চীৎকার ক'রে উঠলেন, এই, চুপ চুপ, হাসতে লজ্জা করে না তোমাদের! ইত্যাদি বলায় তারা চুপ করলে।

তারপরে মাস্টার মশায় এলোধাপাড়ি প্রায় পনরো মিনিট ধ'রে আমাকে প্রহার দিয়ে হুঙ্কার ছাড়লেন, কোথায় শচীন্দ্রনাথ?

শচীন্দ্রনাথ সেইখানেই দাঁড়িয়েছিল। আমি নেমে যেতেই সে টপ ক'রে বেঞ্চির ওপরে উঠে দাঁড়াল। মাস্টার মশায় বেত আপ্সাতে আপ্সাতে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কোথায় মারব?

শচীন ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিলে, তারই ওপরে সাঁই সাঁই বেত

পড়তে লাগল। পনরো-বিশ ঘা বেত মারার পর তিনি বললেন, ও হাত পাত।

এই হাতেই মারুন না সার্, আবার ও হাত কেন?

ও, তা হ'লে তোমার এখনও কিছু হয় নি!

হবে আবার কি সার্! আপনার বগলে বাঁচি আওরে যাবে, তবু আমার কিছু হবে না।

শচীনের এই কথা শুনে ছেলের দল হো-হো ক'রে হেসে উঠল। মাস্টারেরা কিছুতেই সে গোলমাল থামাতে পারে না, শেষকালে প্রথম শ্রেণীর একজন মুরুব্বী গোছের ছাত্র মাস্টারদের বললে, সার্, ওদের সঙ্গে আমাদেরও কেন সাজা দিচ্ছেন, খিদে পেয়েছে, এবার বাড়ি যাই।

প্রথম শ্রেণীর ছেলেরা বেরিয়ে যেতেই তাদের সঙ্গে আরও অনেক ছেলে বেরিয়ে গেল। দর্শকের সংখ্যা ক'মে যাওয়ায় মাস্টার মশায়ের উৎসাহও ক'মে গেল। তিনি শচীনকে নামতে ব'লে বেত রাখতে গেলেন। আমরা দুজনে অন্য ছেলেদের সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় মাস্টার মশায় আমাদের ডেকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন, এই শাস্তিই তোমাদের শেষ মনে ক'রো না। আমি তোমাদের ইতিহাস পড়াব, এই আরম্ভ জেনে রেখো।

রাস্তায় চলতে চলতে শচীন বললে, এবার থেকে তো Salium (শালা শব্দের Latin, অবশ্য আমাদের তৈরি শব্দশাস্ত্র অনুসারে) হরদম পিটবে রে।

তাই তো, কি করা যায় বল তো? দোব নাকি Saliumকে কম্বল চাপা দিয়ে—বেশ ক'রে?

পরামর্শ ঠিক ক'রে বাড়ি যাওয়া হ'ল।

আমাদের দুখানা ইতিহাস পড়া হ'ত। একখানা অধর মুখোপাধ্যায়ের ভারতবর্ষের ইতিহাস আর একখানা Townsend Warner-এর ইংলণ্ডের ইতিহাস। দুখানা মিলিয়ে প্রায় পাঁচশো পৃষ্ঠা হবে। ঠিক হ'ল, বই দুখানা ঝাড়া মুখস্থ ক'রে ফেলা যাবে। তা সত্ত্বেও যদি মারধর করে তো বাধ্য হয়ে একদিন কম্বল চাপা দিতে হবে।

দিন তিন-চার অসুখের অছিলায় ইস্কুলে গেলুম না। সারা দিনরাত্রি

ধ'রে দুখানি বই গড়গড়ে মুখস্থ ক'রে ফেলা গেল। কামাইয়ের পর যে দিন দুই বন্ধুতে ইস্কুলে গেলুম, সেই দিনই নতুন মাস্টারের ক্লাস ছিল।

সেদিন ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়া ছিল। মাস্টার মশায় ক্লাসে বেত নিয়ে ঢুকলেন।—এ দৃশ্য এই ইস্কুলে নতুন দেখলুম।

জিজ্ঞাসা করলেন, কতদূর পড়া হয়েছে?

ইতিহাসখানা সম্পূর্ণ পড়া হয়ে গিয়েছিল, তখন গোড়া থেকে দ্বিতীয় বার পড়া হচ্ছিল। মাস্টার মশায় শুনে বললেন, আচ্ছা, কার কত দূর তৈরি হয়েছে, আমি একবার ক্লাস-সুদ্ধ ছেলেকে পরীক্ষা করতে চাই। স্থবির শর্ম্মা, উঠে এস।

উঠে মাস্টার মশায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। তিনি একটা প্রশ্ন করলেন, আমি টপ ক'রে তার সঠিক উত্তর দিয়ে দিলুম। একটা প্রশ্নে রেহাই হ'ল না। বোধ হয় তিনি প্রহার দেবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েই এসেছিলেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন চলতে লাগল। আর আমিও টপটপ তার জবাব দিতে লাগলুম। মাস্টার মশায় অবাক, ক্লাসের ছেলেরা একেবারে থ। শেষকালে তিনি বললেন, আচ্ছা, তুমি এই-খানেই দাঁড়াও। শচীন্দ্রনাথ, এধারে এস।

শচীন উঠে গটগট ক'রে এগিয়ে এল। একটা প্রশ্ন করা মাত্র সে উত্তর দিয়ে দিলে। মাস্টার মশায় আর একটা প্রশ্ন করার জন্যে বইয়ের পাতা উল্টোচ্ছেন, এমন সময় শচীন বললে, সার্, অভয় দেন তো একটা কথা নিবেদন করি।

বল।

প্রশ্ন খোঁজবার জন্যে অত পাতা উল্টোবার দরকার কি, এক কাজ করুন, বইয়ের গোড়া থেকে শেষ অবধি আমি ব'লে যাচ্ছি, তার মধ্যে আপনি সব প্রশ্নেরই উত্তর পাবেন। আর মারবারই যদি ইচ্ছে থাকে তো ঘা কয়েক দিয়ে ছেড়ে দিন, গিয়ে ব'সে পড়ি।

শচীনের কথা শুনে রাগে মাস্টার মশায়ের মুখ লাল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, কি! গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত বলবে?

হ্যাঁ সার্, ও তো সামান্য। এটা কি আর ইতিহাস! ওর চেয়ে বড়

বড় ইতিহাস আমার মুখস্থ আছে, সে সব বইয়ের নাম পর্য্যন্ত ইস্কুলের কেউ জানে না।

মাস্টার মশায় বললেন, আচ্ছা, বল।

শচীন বইয়ের গোড়া থেকে গড়গড় ক'রে মুখস্থ ব'লে যেতে লাগল, মাস্টার মশায় স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন।

ঘণ্টা কাবার হয়ে গেল। মাস্টার মশায় আমাকে আর শচীনকে ক্লাস থেকে ডেকে নিয়ে লাইব্রেরি-ঘরে চললেন। সেখানে মাস্টারদের ভিড় ক'মে যাওয়ার পর বললেন, দেখ হে বাপু স্থবির শর্ম্মা এবং শচীন্দ্রনাথ! তোমাদের এমন merit, এমন intelligence হেলায় হারিও না। তোমরা ইচ্ছে করলে জগতে অনেক উন্নতি করতে পারবে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, তোমরা নষ্ট হয়ে যাবে।

আমি ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি বহু সন্ন্যাসী, সাধু, সন্ত, সাঁইবাবা, ফকির, মোহান্ত, মঠধারী ও জ্যোতিষীকে আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু এক কথায় আমাদের সম্বন্ধে এমন মোক্ষম ও নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী আর শুনি নি।

দিনগুলি বেশ কাটছিল। পড়াশোনার উৎসাহ, পাগলা সন্ন্যেসীর লেকচার ও কবিতাপাঠ, লতু, গোষ্ঠদিদি ইত্যাদি মিলিয়ে নিরুপদ্রবে কাটছে। বিকেলবেলায় ছুটি পাওয়ায় মনের মধ্যে মুক্তির আনন্দ অনুভব করছি, এমন সময় এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘ'টে গেল।

এই সময় আমাদের আর একজন নতুন মাস্টার এলেন। নতুন মাস্টার দেখলেই আমাদের দুষ্টুমি করবার উৎসাহ বেড়ে যেত চতুর্গুণ। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হ'ল না। দু-চার দিনের মধ্যেই একদিন প্রমথকে তিনি বেধড়ক প্রহার দিলেন। এর পরেই তাঁর মেজাজ একেবারে দস্তুরমতন খেঁকী হয়ে উঠল। সকলকেই মারতে উদ্যত। কয়েক দিনের মধ্যেই ক্লাসের একটি ভাল এবং ভালমানুষ ছেলের ওপরে কি কারণে রেগে গিয়ে ভদ্রলোক মেরে তাকে একেবারে আধমরা ক'রে দিলেন।

ইস্কুলে মারধর খাওয়াটা আমরা খুব একটা অপমানজনক কাণ্ড ব'লে মনে করতুম না। মাস্টাররা মারবে জেনেই আমরা ক্লাসে দুষ্টুমি

করতুম। কখনও কখনও প্রহারের মাত্রা বেশি হয়ে যেত সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের দুষ্টুমি ও মাস্টার-জ্বালানো কায়দাগুলোও যে কোনও সময়েই মাত্রা ছাড়িয়ে যেত না, এমন কথাও হলপ ক'রে বলতে পারি না।

পরের দিন বেলা দশটার সময় ইস্কুলে যাচ্ছি, দেখি, পথে—ইস্কুল থেকে একটু দূরেই—আমাদের ক্লাসের ছেলেরা দাঁড়িয়ে জটলা করছে। তারা আমাকে আটকে বললে, আজ আর ইস্কুলে যাওয়া হবে না।

কেন ?

উপেনকে কি রকম মেরেছে নতুন মাস্টার! ওর কোনও দোষ নেই। মিছিমিছি মারার জন্যে আমরা ধর্ম্মঘট করেছি, এর বিহিত না হওয়া পর্য্যন্ত কেউ ইস্কুলে যাব না।

বহুৎ আচ্ছা।—ব'লে আমিও দাঁড়িয়ে গেলুম।

বেলা সাড়ে এগারোটা অবধি দাঁড়িয়ে থাকার পর অনেকেই বাড়ি চ'লে গেল। আমি আর শচীন 'হেদো'য় গিয়ে ব'সে রইলুম। বেলা দুটো আড়াইটে নাগাদ ইস্কুলের একটা চাকর আমাদের দেখতে পেয়ে ইস্কুলে গিয়ে খবর দিয়ে দিলে।

পরের দিন ইস্কুলের মালিক মশায় ক্লাসে এসে খুব ধমকধামক করলেন। বললেন, তোমরা আমাকে না জানিয়ে এই রকম ধর্ম্মঘট ক'রে অত্যন্ত অন্যায় করেছ। তোমাদের দলপতিকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

বেলা তিনটে নাগাদ ইস্কুলময় র'টে গেল, দ্বিতীয় শ্রেণীর একজন ছাত্রের নাম কাটা যাবে। কে সে ?

পরের দিন আমাদের ক্লাসে একজন মাস্টার পড়াতে পড়াতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন, স্থবির শর্ম্মা, আমি শুনলুম, তোমাকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

ম্যালেরিয়ার দেশে জন্মালেও পিলে-চমকানো অনুভূতিটা যে ঠিক কি রকম, তা অধিকাংশ বঙ্গবাসীই বোধ হয় জানেন না। সে রস অবর্ণনীয়। মাস্টারের মুখে এই মনোরম সংবাদটি শুনে আমার পিলে চমকে উঠল। জিজ্ঞাসা করলুম, কেন সার্ ?

তুমি নাকি সেদিনকার ধর্ম্মঘটের Ring-leader ছিলে।

ক্লাস-সুদ্ধ ছেলে একবাক্যে এই অভিযোগের প্রতিবাদ ক'রে উঠল। তারা বললে, স্থবির আগে কিছু জানত না সার্, আমরাই ওকে ইস্কুলে আসতে বারণ করেছিলুম। ওকে তাড়িয়ে দিলে আমরা আবার ধর্ম্মঘট করব।

মাস্টার মশায় বললেন, ঠিক জানি না, ওই রকম কি একটা শুনছিলুম।

মাথার মধ্যে ভোঁ ভোঁ করতে লাগল। বাড়িতে ফেরবার পথে অস্থির বললে, স্থব্‌রে, তোকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবে শুনছি।

কি হবে ভাই ?

তুই এক কাজ কর। বাড়ি থেকে লম্বা দে, নইলে বাবা মেরে ফেলবে।

লতুকে বললুম। সে সব শুনে বললে, কি হবে ?

লতু কাঁদতে লাগল। দীর্ঘদিনের আবছায়ায় আচ্ছন্ন সেই অশ্রুমুখী কিশোরীর মুখখানি আজ আমার মানসপটে ফুটে উঠছে আর মনে হচ্ছে, জীবনপ্রভাতে সেই ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিনে তার আর অস্থিরের সহানুভূতি যদি না পেতুম, তা হ'লে কি করতুম !

লতু দুহাত থেকে দু-গাছা চুড়ি খুলে আমায় দিয়ে বললে, এই দুটো বিক্রি ক'রে পালিয়ে যা। টাকার দরকার হ'লেই আমায় লিখিস, আমি পাঠিয়ে দোব, কেউ জানতে পারবে না।

গোষ্ঠদিদিকে সব বললুম। পালিয়ে যাব ঠিক করেছি শুনে সে বললে, অমন কাজ করিস নি।

বললুম, না পালিয়ে উপায় নেই। ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে শুনলে বাবা মেরে ফেলবেন।

গোষ্ঠদি জিজ্ঞাসা করলে, পালাবি যে, টাকা পাবি কোথায় ?

আমি ভেবেছিলুম, পালাবার কথা শুনলে গোষ্ঠদিদি নিজে থেকেই আমাকে টাকা দেবে। লতু আমায় চুড়ি দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আমার বয়সী ছেলে স্যাকরার দোকানে চুড়ি বিক্রি করতে গেলে নিশ্চয় তারা সন্দেহ ক'রে হাঙ্গামা বাধাবে—এই ভয়ে চুড়ি নিই নি। গোষ্ঠদিদি প্রায়ই

বলত, আমার টাকা ও গয়না যা কিছু আছে, সবই তো তোদের দুই ভাইয়ের, তোদের ভাবনা কি ?

সেই গোষ্ঠদিদি যখন জিজ্ঞাসা করলে, টাকা পাবি কোথায় ?—তখন আমার ভয়ানক অভিমান হ'ল। আমার চোখ দিয়ে ঝরঝর ক'রে জল পড়তে লাগল। ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবে, তার পর বাড়িতে সে কি হাঙ্গামা হবে—এই চিন্তা আমাকে আকুল ক'রে তুলছিল, কিন্তু গোষ্ঠদিদির কথায় আমার সমস্ত আশঙ্কা অবসন্ন হয়ে পড়ল। শুধু মনে হতে লাগল, এতদিন ধ'রে এই নারী কথার মোহে আমাদের শুধু ছলনাই ক'রে এসেছে। গোষ্ঠদিদির জন্যে না করতে পারতুম এমন কাজ আমরা কল্পনাই করতে পারতুম না। ইস্কুল কোনদিনই আমার প্রিয় ছিল না। সেখান থেকে বিনা দোষে তাড়িত হ'লে লজ্জারও কোনও কারণ নেই। তবুও ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দিলে বাবা যে মেরে ফেলবেন, সে কথা গোষ্ঠদিদি যে না জানত তা নয়। এসব জেনে-শুনেও সে যখন আমাকে সাহায্য করলে না, তখন মনে হ'ল, আমরা তাকে যতখানি নিজের ব'লে মনে করেছি, সে তা করে না।

আমাকে কাঁদতে দেখে গোষ্ঠদিদি আমাকে জড়িয়ে ধ'রে বললে, আমাকে ছেড়ে যেতে তোর কষ্ট হবে না ?

অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললুম, কিচ্ছু কষ্ট হবে না। কেন কষ্ট হবে ? আমি ম'রে গেলে যদি তোমার কষ্ট না হয় তো তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার কিসের কষ্ট ?

গোষ্ঠদিদি আমাকে আরও জোরে চেপে ধরলে। আমি বললুম, ছেড়ে দাও, যাই।

আমার মুখখানা একবার তুলে দেখে গোষ্ঠদিদি প্রাণপণে আমাকে বুকের মধ্যে চেপে ধ'রে কাঁদতে কাঁদতে বললে, না, তুই যেতে পারবি না, কিছুতেই তোকে ছাড়ব না।

ঠিক হ'ল, ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দিলে বাবা যখন মারতে থাকবেন, সে সময় গোষ্ঠদিদি গিয়ে মাঝে প'ড়ে আমাকে উদ্ধার করবে। সে গিয়ে পড়লে মারের মাত্রা কম হবে।

কয়েক দিন ইস্কুলে কিন্তু আর কোনও কথাই উঠল না। মনে হ'ল,

ফাঁড়া বুঝি কেটে গেল। হঠাৎ একদিন ক্লাসে চাকরে এক টুকরো কাগজ এনে মাস্টার মশায়ের হাতে দিলে। তিনি চেঁচিয়ে প'ড়ে ক্লাসসুদ্ধ ছেলেকে শুনিয়ে দিলেন,—ক্লাসে অনবচ্ছিন্ন অসদ্ব্যবহারের জন্য (continuous ill-behaviour) স্থবির শর্ম্মার নাম ইস্কুলের খাতা থেকে কেটে দেওয়া হ'ল।

দণ্ডাজ্ঞা শুনেই আমার দুই কানের মধ্যে একবার ঝমঝম ক'রে ঝাঁজর বেজে উঠল। তার পর সমস্ত চিন্তা এক কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে চীৎকার করতে লাগল, কি হবে?

ক্লাসশুদ্ধ ছেলে স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল। মাস্টার মশায় পড়ানো বন্ধ ক'রে দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে বললেন, স্থবির, তোমার জন্যে আমি দুঃখিত—অত্যন্ত দুঃখিত।

মাস্টার পড়া শেষ ক'রে চ'লে গেলেন, অন্য মাস্টার এসে পড়ানো শুরু করলেন; কিন্তু খানিকটা শব্দ ছাড়া আর আমার কানে কিছুই গেল না। ছুটির কিছু আগে হেডমাস্টার আমায় ডেকে একখানা চিঠি দিয়ে বললেন, এখানা তোমার বাবাকে দিও।

ছুটির পর ক্লাসের বন্ধুরা আমাকে সহানুভূতি জানালে ও কর্ত্তৃপক্ষের এই অবিচারের জন্যে তারা ইস্কুল ছেড়ে দেবে বললে। আমার কানে কিন্তু কোনও কথাই যাচ্ছিল না। মনের মধ্যে এক প্রশ্ন খোঁচা দিতে লাগল, কি হবে, কি করব?

বাড়িতে এসে মাকে চিঠিখানা দিয়ে সোজা ছাতে চ'লে গেলুম। সেদিন গোষ্ঠদিদির সঙ্গে দেখা করলুম না, লতুদের বাড়িতেও যাওয়া হ'ল না। শুধু অস্থিরের সঙ্গে পরামর্শ চলতে লাগল, কি হবে, কি করব?

রাত্রে বিছানায় শুয়ে প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হতে লাগল, এতক্ষণে বোধ হয় চিঠিখানা বাবার হাতে পড়েছে, এইবার বুঝি ডাক পড়ে। রাত্রি বারোটা বেজে গেল, তখনও ডাক পড়ল না। মনে হতে লাগল, পাঁচ বছর আগে মেয়েদের ইস্কুলে পড়বার সময় তিন পয়সা চুরির মিথ্যা অভিযোগে প'ড়ে এই রকমই এক নিদ্রাহীন রাত্রি কেটেছিল—সেই আট বছর বয়সে হেদোর জলে ডুবে সব হাঙ্গামা চুকিয়ে দেবার সংকল্প

করেছিলুম, আজ তার চেয়েও অনেক বড় বিপদে আত্মহত্যার কথা বারে বারে মনে হতে লাগল, কিন্তু লতুর মুখ আমার সে সংকল্পকে ভাসিয়ে দিলে। কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরকে ডাকতে লাগলুম, হে ভগবান, আমার ছোট্ট জীবনে কতবার কত বিপদে তুমি উদ্ধার করেছ, এইবার বাঁচাও।

কে যেন ছাতের দরজায় টোকা দিলে। উৎকর্ণ হয়ে উঠে বসলুম। আবার টোকা! আবার টোকা!

তাড়াতাড়ি বাতি জ্বালিয়ে দেখলুম, অস্থির অগাধ নিদ্রায় অভিভূত। টপ ক'রে বাতি নিবিয়ে দিয়ে তিন লাফে ছাতের সিঁড়ি পার হয়ে সন্তর্পণে দরজাটা খুলতেই এক ঝলক জ্যোৎস্না আমার মুখের ওপরে এসে পড়ল। মুখ বাড়িয়ে দেখি, গোষ্ঠদিদি এসে দাঁড়িয়ে আছে। তার অঙ্গে ধপধপে সাদা একখানা শাড়ি, তার ওপরে চাঁদের আলো প'ড়ে অপূর্ব্ব সুষমায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। জ্যোৎস্নালোকপ্লাবিত নিস্তব্ধ রাত্রে গোষ্ঠদিদির সেই স্বভাববিষণ্ণ মুখে মৌন নিরুক্ত অভয়-আশ্বাসে আমার উদ্বেলিত মন জুড়িয়ে গেল। মনে হ'ল, আমার প্রার্থনা শুনে চাঁদের দেশ থেকে নেমে এসেছে আমার আসল মা, তার হাত ধ'রে ফিরে চ'লে যাব আমার কল্পলোকে, কাল সকাল থেকে আমাকে আর কেউ দেখতে পাবে না। সকলে বলবে, আহা, ছেলেটা বেশ ছিল, কোথায় চ'লে গেল!

গোষ্ঠদিদি বললে, কি রে, হাঁ ক'রে কি দেখছিস? দু ঘণ্টা ধ'রে দরজায় টোকা দিচ্ছি, শুনতেই পাস না।

আমি আর কথা বলতে পারলুম না, প্রাণপণে গোষ্ঠদিকে জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিলুম।

দুজনে চ'লে গেলুম ছাতের এক কোণে। গোষ্ঠদিদি বলতে লাগল, তোর কোনও ভয় নেই। যেমন ক'রে পারি মায়ের হাত থেকে তোকে বাঁচাবই। স্থবির, তুই জানিস নে, তোকে আমি কত ভালবাসি, বড় হ'লে বুঝতে পারবি। তোর জন্যে আমি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি।

রাত্রি তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। গোষ্ঠদিদি আমার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে নীচে পাঠিয়ে দিলে। বিছানায় শুয়ে বোধ হয় একটু তন্দ্রা এসেছিল, এমন সময় মার কণ্ঠস্বরে আমার ঘুম ভেঙে গেল।

তাড়াতাড়ি উঠে মুখ ধুয়ে চায়ের জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হলুম। তখনও বাড়ির আর কেউ সেখানে হাজির হয় নি। চা খাবার আগেই মাকে জিজ্ঞাসা করলুম, হ্যাঁ মা, বাবাকে চিঠিখানা দিয়েছিলে?

না, কিসের চিঠি ওখানা?

আমাকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

আমার কথা শুনে মা এমন চেঁচামেচি করতে শুরু ক'রে দিলেন যে, বাবা সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। মা বললেন, তোমার গুণধর ছেলেকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

বাবা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, কেন?

সত্যি কথা বলতে কি, ঠিক কোন্ বিশেষ অপরাধটির জন্য আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল, তার স্পষ্ট ধারণা আমার নিজেরই ছিল না।

আমি বললুম, জানি না।

সেইখানেই কিল, চড়, লাথি এক পক্কড় হয়ে গেল। তারপরে তিনি একটা ঘরে আমায় নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে প্রথমে হেডমাস্টারের দেওয়া চিঠিখানা পড়লেন। তারপরে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তাড়িয়ে দিয়েছে বল, আজ তোমার শেষ দিন।

আজ যে আমার শেষ দিন সে জ্ঞান আমারও ছিল, তবুও শেষ মিনতি ক'রে বললুম, কেন তাড়িয়ে দিয়েছে তা সত্যিই আমি জানি না। আপনি হেডমাস্টার মশায়কে জিজ্ঞাসা ক'রে তারপরে আমাকে যা ইচ্ছা হয় করুন।

বাবা সে কথা গ্রাহ্য না ক'রে আমায় মারতে শুরু করলেন। আমার চীৎকার শুনে গোষ্ঠদিদি এসে দেখলে, দরজা বন্ধ। ঘরের ভেতরে আমি চীৎকার করতে লাগলুম, বাইরে দরজা ধ'রে গোষ্ঠদিদি কাঁদতে লাগল, আর আমার চীৎকারের সঙ্গে অস্থিরও তারস্বরে চেঁচিয়ে কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিলে। সেই ভোর থেকে বেলা নটা অবধি প্রহার দিয়ে বাবা আমাকে নিয়ে চললেন হেডমাস্টার মশায়ের বাড়ি।

মার খেয়ে আমার চেহারা এমন বদলে গিয়েছিল যে, হেডমাস্টার আমাকে দেখে একেবারে চমকে উঠলেন। তিনি বাবাকে বললেন, এমন ক'রে প্রহার করা আপনার উচিত হয় নি। ইস্কুল থেকে বিতাড়িত

হবার মতন কোনও অপরাধ স্থবির করে নি। ইস্কুলের মালিক মশায় চান না যে, ও ওখানে পড়ে।

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, কেন?

হেডমাস্টার মশায় আমতা আমতা করতে লাগলেন। তারপরে বাবাকে একটা আলাদা ঘরে নিয়ে গিয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা ধ'রে কি সব বললেন।

বাবা আমাকে নিয়ে বাড়িতে ফিরে এসে বললেন, যাও, চান-টান ক'রে ইস্কুলে যাও।

আমি ইস্কুলে যেতে লাগলুম। ঠিক হ'ল, বছরটা পুরো না হওয়া পর্য্যন্ত আমি সেইখানেই পড়ব। আসছে বছরে অন্য ইস্কুলে গিয়ে ভর্ত্তি হব।

এই ঘটনায় আমার জীবন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল। পড়াশুনার প্রতি যে অনুরাগ ও মনোযোগ এসেছিল, তার মূল পর্য্যন্ত মন থেকে উৎপাটিত হয়ে গেল। বাবা আমার কোনও আবেদন ও মিনতি গ্রাহ্য না ক'রে আগে শাস্তি দিয়ে পরে বিচার করলেন, এজন্য তাঁর ওপর এমন জাতক্রোধ হ'ল যে, মনে মনে একেবারে দৃঢ়সংকল্প ক'রে ফেললুম, এবার মারতে এলে আমিও দু-এক হাত এমন চালাব যে ভবিষ্যতে আমাকে প্রহার করবার সময় আক্রমণ ও আত্মরক্ষা দু দিকেই তাঁকে সমান নজর রাখতে হবে। কিন্তু আমার বয়স তখন মাত্র তেরো। সেই বয়সেই আমরা যথেষ্ট শারীরিক শক্তি অর্জ্জন করেছিলুম বটে, কিন্তু বাবার সঙ্গে পেরে ওঠবার শক্তি কোথায় পাব? তাই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম, সবার আগে গায়ের জোর বাড়াতে হবে।

লতুদের বাড়িতে যাবার রাস্তায় একটা মাঠ পড়ত। এই মাঠের অনেকখানি জায়গা ঘিরে নিয়ে পাহারাওয়ালারা কুস্তির আখড়া করেছিল। সেখানে প্রকাণ্ড একখানা পাথরের গায়ে তেল-সিঁদুর দিয়ে মহাবীরের মূর্ত্তি আঁকা ছিল ও মাঝে মাঝে খুব ধুমধাম ক'রে পুজো হ'ত। মহাবীরের পুজোর জন্যে অনেক মহিষ ও গরুর গাড়ির গাড়োয়ান ও চৌধুরী অর্থাৎ তাদের সর্দ্দার সেখানে ব্যায়াম করতে আসত। তা

ছাড়া অনেক সাংঘাতিক চরিত্রের গুণ্ডাও সেখানে আসত যেত। আমরা দু ভাই মাঝে মাঝে আখড়ার মধ্যে ঢুকে তাদের কুস্তি দেখতুম ও দু-একজনের সঙ্গে একটু আধটু মৌখিক ভাবও হয়েছিল। বাবাকে মারবার উত্তেজনায় আমরা এই আখড়ায় গিয়ে ভর্ত্তি হলুম ও রোজ ইস্কুল থেকে ফিরে সেখানে গিয়ে কুস্তি সেরে সেখানেই স্নান ক'রে পরিষ্কার হয়ে লতুদের ওখানে যেতে আরম্ভ করলুম। গোষ্ঠদিদি রোজ আমাদের জন্যে বাদাম ও মিছরির শরবত তৈরি ক'রে রাখত ও সপ্তাহের মধ্যে তিন-চার দিন দুটি ক'রে মুরগীর বাচ্চা রোস্ট হতে লাগল।

আমরা প্রতিদিন দুই ভাই নিয়ম ক'রে মহাবীরের মাথায় ফুল ও বাতাসা চড়াতে লাগলুম। এসব পয়সা অবিশ্যি গোষ্ঠদিদির তহবিল থেকেই খরচ হ'ত। ব্রাহ্ম-বাড়িতে আমাদের জন্ম হয়েছিল। পরিবারে ও পরিবারের ধর্ম্মবন্ধুদের কাছে নিশিদিন শুনেছি যে, পুতুলপুজো ক'রে হিন্দুরা ঈশ্বরের অবমাননা করে, এ সব সংস্কার সত্ত্বেও স্রেফ প্রাণের দায়ে আমাদের পুতুলের শরণাপন্ন হতে হ'ল। তার ওপর অতি নিম্নস্তরের সেই গরুর গাড়ির সর্দ্দার ও গুণ্ডা হিন্দুদের মহাবীরের ওপর নিষ্ঠা দেখে আমরাও মহাবীরের মহাভক্ত হয়ে উঠলুম। মহাবীরকে শত শত ধন্যবাদ! তিনি আমাদের শরীরে শক্তি তো দিলেনই, উপরন্তু বাবাকেও সুমতি দিলেন, কারণ এর পর আমাকে তিনি আর কখনও সে রকম প্রহার করেন নি। বাড়িতে দিনরাত ভয়ে ভয়ে থাকা তো চুকলই, বরং কলকাতার সেরা সেরা গুণ্ডা এবং গরু ও মোষের গাড়ির সর্দ্দারদের প্রাণের ইয়ার হওয়ার ফলে আমরা নিজেরাই এক-একটি ভয়ের কারণ হয়ে উঠলুম। মহাবীরকে ধন্যবাদ! সে শক্তি ও প্রতিপত্তির অপব্যয় আমরা কখনও করি নি।

একদিন বিকেলে অস্থিরের শরীরটা ভাল না থাকায় আমি একলাই বেরিয়েছিলুম। সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরে অস্থিরের মুখে শুনলুম যে, কাল রাত্রে পাগলা সন্ন্যেসী আমাদের দুজনকে নেমন্তন্ন করেছেন।

রাত্রে গোষ্ঠদিদি এসে মাকে আবার ব'লে গেল, কাল ওরা দুজনে আমাদের ওখানে খাবে—শ্বশুর মশায় নেমন্তন্ন করেছেন।

পরদিন একটু তাড়াতাড়ি লতুদের বাড়িতে যাওয়া হ'ল। উদ্দেশ্য

দিন থাকতে ফিরে পাগলা সন্ন্যেসীর ঘরে গিয়ে জমা যাবে, আড্ডা সেরে উঠব উঠব মনে করছি, এমন সময় লতু আমায় আলাদা ডেকে নিয়ে বললে, একটা খুব গোপনীয় কথা আছে, না শুনে যেতে পাবে না।

বল।

না, এখন বলব না। সেই সন্ধ্যের পর বলব, তার আগে যাওয়া হবে না ব'লে দিচ্ছি।

ওরে বাবা! আজ সন্ধ্যের সময় পাগলা সন্ন্যেসীর ওখানে নেমন্তন্ন আছে, ঠিক সময়ে না গেলে ভদ্রলোক বড্ড দুঃখিত হবেন।

সে সব জানি না।—ব'লে লতু ফিরে চলল। আমি তাকে টেনে নিয়ে বললুম, বল না লতু, লক্ষ্মী লতু আমার।

লতু আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে কানে কানে বললে, না না না, এখন যাওয়া হবে না।—ব'লে ছটকে পালিয়ে গেল।

কি বিপদেই পড়লুম, লতুটা যে কি করে!

খানিক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে আবার গিয়ে সবার সঙ্গে বসা গেল। লতু আগেই এসে সেখানে জুটেছিল। তার হুকুম না পেলে আমার যাবার যে জো নেই, সে বিষয়ে সে একেবারে নিশ্চিন্ত। ওদিকে অস্থির তাড়া দিতে লাগল, কি রে যাবি না?

শেষকালে অস্থিরকে বলতে হ'ল, তুই যা, আমার যেতে একটু দেরি হবে।

সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ব'লে দিলুম, বাড়িতে আমার খোঁজ হ'লে ব'লে দিস, সে সন্ন্যেসীর ঘরে আছে।

অস্থির চ'লে গেল। সন্ধ্যে হ'ল, কিন্তু লতু কোন কথাই বলে না। ওদিকে আমার মনের অবস্থা খুবই চঞ্চল হতে লাগল। লতুটা যে কি করে!

ইতিমধ্যে সে যে উঠে কোথায় চ'লে গেল, আধ ঘণ্টা কোন খোঁজ নেই। শেষকালে লতুকে ফাঁকি দিয়েই পালাব মনে ক'রে সবার কাছে বিদায় নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গুটিগুটি কয়েক পা এগিয়েছি, এমন সময় কোথা থেকে লতু এসে আমায় ধ'রে বললে, চোর! গুটিগুটি পালানো হচ্ছে।

তুমিই তো পালিয়েছিলে। তুমি আসছ না দেখে চ'লে যাচ্ছিলুম। কি প্রাইভেট কথা আছে, বল ?

এখানে না, ছাতে চল।

দুজনে ছাতে উঠলুম। লতু বললে, এ ছাতে নয়, ওই ওপরের ছাতে।

লতুদের ছাতের ওপরে একটা বড় ঠাকুর-ঘর ছিল। তারও ছাতে ওঠা যেত। সেটা ছিল তাদের পাড়ার সবচেয়ে উঁচু ছাত। সেই ছাতে ওঠা হ'ল।

সেদিন বোধ হয় শুক্লা-ত্রয়োদশী তিথি ছিল। আকাশ ও ধরণীতে জ্যোৎস্নার প্লাবন ছুটেছে—যতদূর চোখ যায় আলোয় আলো, যেন আনন্দের মুক্তধারা, কোথাও কোন মালিন্য নেই।

লতু আমায় ছাতের এক কোণে ডেকে নিয়ে গেল। তারপর বুকের ভেতর থেকে একটা মোটা বেলফুলের মালা বের ক'রে আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে প্রণাম করলে।

আমার মনে হ'ল, চারিদিকের সেই জ্যোৎস্নারাশির সঙ্গে আমি যেন রেণু রেণু হয়ে একাকার হয়ে গেছি। ফুলমালার স্পর্শে অস্থিমাংসের অস্তিত্ব যেন আমার লোপ পেয়েছে, বায়বীয় শরীর নিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

লতু উঠে দাঁড়াতেই আমার গলা থেকে মালাটা নিয়ে তার গলায় পরিয়ে দিলুম। তারপরে প্রাণপণে আমরা পরস্পরকে আঁকড়ে ধরলুম। আমার মনে হতে লাগল, সেই জ্যোৎস্নাসাগরে আমরা দুটিতে ভেসে চলেছি—লক্ষ তরঙ্গের আলোড়নে শত সহস্র জন্মের অভিজ্ঞতা মথিত হয়ে উঠতে লাগল আমাদের চারিদিকে। সেই বিরাট নিস্তব্ধতার মধ্যে কানে শুধু একটা আওয়াজ শুনতে লাগলুম, ধক—ধক—ধক।

সেটা কার বুকের আর্ত্তনাদ, তা ঠিক বলতে পারি না।

লতু বললে, আজ আমাদের বিয়ে হ'ল। এই বিয়ের সাক্ষী রইল ওই চাঁদ। এ কথা চিরদিন গোপন থাকবে, শুধু জানলে ওই চাঁদ—আজ থেকে চাঁদের সঙ্গে আমাদের এই সম্বন্ধ বাঁধা রইল। আমি মরবার আগে এ কথা আর কারুকে ব'লো না।

আবার প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আমাদের বাঁধন দৃঢ়তর হ'ল। আমায় একটা চুমু খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে পিঠে ভুম ক'রে একটা কিল মেরে লতু বললে, যা তোর পাগলা সন্ন্যেসীর কাছে।

হায়, পাগলা সন্ন্যেসী, এমন সন্ধ্যেটি কি তোমার ঘরে কাটাবার জন্যে তৈরি হয়েছিল!

লতুদের ওখান থেকে এক রকম দৌড়ে পাগলা সন্ন্যেসীদের বাড়িতে গেলুম। বাড়িতে ঢুকেই অস্থিরের হাসির হর্‌রা কানে গেল। আমাদের দুই ভাইয়েরই খুব চেঁচিয়ে হাসার অভ্যাস ছিল। এই অসভ্যতার জন্য বাড়িতে প্রায়ই বকুনি খেতে হ'ত। অস্থিরের হো-হো হাসি শুনে তিন লম্ফে সিঁড়ি পার হয়ে ঘরে ঢোকামাত্র অস্থির চীৎকার ক'রে বললে, স্থবরে, এতক্ষণে এলি, আমরা এক্ষুনি উঠছিলুম খাবার জন্যে।

পাগলা সন্ন্যেসী খাটের ওপরে আধশোয়া হয়ে ব'সে ছিলেন। তিনি উঠে ব'সে বললেন, রামবাবুর বুঝি এতক্ষণে মজলিস ভাঙল?

আমি একটু লজ্জিত হয়ে অস্থিরের পাশে বসামাত্র সে বললে, পাগলা সন্ন্যেসী, স্থবরেকে একটু ওষুধ দিন তো।

কি ওষুধ রে?

মধু মধু, এ ওষুধ খেলে যে কোন ব্যারাম সেরে যাবে। এই ব'লে সে আমার মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে হা দিলে। একটা বিশ্রী গন্ধ পেলুম। এমন গন্ধ ইতিপূর্ব্বে কখনও নাকে যায় নি। কিন্তু খুব সম্ভব পূর্ব্বজন্মের অভিজ্ঞতার ফলে তখনই বুঝতে পারলুম, সেটা কিসের গন্ধ।

খাটের ওপর থেকে কতকগুলো বই সরিয়ে পাগলা সন্ন্যেসী একটা কালো পেট-মোটা অদ্ভুত আকারের বোতল বের করলেন। খাটের ওপরে ব'সেই ঘাড় নীচু ক'রে খাটের তলা থেকে তিনটে বেঁটে পল-কাটা কাচের গেলাস টেনে খাটের ওপরে তুলে সেগুলোর মধ্যে ওষুধ ঢালতে আরম্ভ করলেন। দৃশ্যটি আমি জীবনে এই প্রথম দেখলুম। অস্থির কিন্তু এমন একটা ভাব দেখাতে লাগল যে, এ রকম ব্যাপার তার চোখের সামনে সর্ব্বদাই ঘটছে।

দেখলুম, পাগলা সন্ন্যেসী একটি গেলাসে অনেকখানি আর দুটিতে

একটু একটু ক'রে মধু ঢাললেন, তারপরে ঘটি থেকে একটু ক'রে জল সবগুলোতে দিয়ে একটা গেলাস আমার এগিয়ে দিয়ে বললেন, এস রামবাবু।

গেলাসটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে নিলুম। অস্থির যে আমার চাইতে এককাঠি বেড়ে যাবে, তা সহ্য হচ্ছিল না। গেলাসটা মুখের কাছে নিয়ে যেতেই একটা বিশ্রী তীব্র গন্ধ পেলুম। দ্বিতীয় বার গেলাসটাকে নাকের কাছে আনবার আগেই অস্থির বললে, এই, 'চিন চিন' করলি না ?

অস্থির নিজের গেলাসটা বাড়িয়ে পাগলা সন্ন্যেসীর গেলাসে ঠন ক'রে ঠেকালে। আমিও দেখাদেখি আমার গেলাস বাড়িয়ে তাদের গেলাস দুটোতে ঠেকালুম। পাগলা সন্ন্যেসী বললে, To your future.

আমরাও সমস্বরে বললুম, To your future.

আমাদের হাতেখড়ি হ'ল। অস্থিরের বয়েস বারো, আমার বয়েস চোদ্দ আর পাগলা সন্ন্যেসীর বয়েস তিয়াত্তর।

পাগলা সন্ন্যেসী বলতে লাগল, রামবাবু আর লক্ষ্মণবাবু, ব্রাদার, তোমাদের একটা কথা বলবার জন্যে ডেকেছি। পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে তোমাদের দু ভায়ের সঙ্গে ভাব হয়ে এই কটা বছর আমার পরমানন্দে কাটল। আমি চ'লে যাব, তোমরা এখনও অনেকদিন থাকবে, আমার কথা মনে রেখো ভাই।

সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, তোমাদের বয়েস যদি বেশি হ'ত কিংবা আমার বয়েস যদি কিছু কম হ'ত—

বেশ হাসিখুশি হুল্লোড় চলছিল, হঠাৎ এই সব কথায় ঘরের মধ্যে যেন একটা বিষাদের ছায়া এসে পড়ল। পাগলা সন্ন্যেসী ব'লে যেতে লাগলেন, একটা অনুরোধ তোমাদের কাছে করব ব্রাদার, রাখতে হবে।

বলুন।

আমার অবর্ত্তমানে বউমাকে অর্থাৎ তোমাদের গোষ্ঠদিদিকে তোমরা দেখো, বুঝলে ?

তারপর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, বাড়ি-ঘর সব রইল, টাকা-পয়সার অভাব আমি রেখে যাব না। তোমরা শুধু দেখবে, ও

যেন ভেসে না যায়। ও তোমাদের ভালবাসে, তোমাদের কথার অবাধ্য হবে না।

পাগলা সন্ন্যেসীর ওখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে বাড়িতে এসে শুতে প্রায় সাড়ে এগারোটা বেজে গেল। ভোরবেলা গোষ্ঠদিদির আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। তাদের বাড়ির দু-তিনটে গরাদবিহীন জানলা খুললে আমাদের বাড়ির সব দেখা যেত। এই একটা জানলা খুলে গোষ্ঠদিদি ডাকছিল, মা, মা, মাগো, একবার এদিকে আসুন না।

মা নীচে ছিলেন, বোধ হয় গোষ্ঠদিদির আওয়াজ কানে যায় নি। আমি তড়াক ক'রে বিছানা ছেড়ে জানলার ধারে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, কি হয়েছে দিদি?

গোষ্ঠদিদি কাঁদতে কাঁদতে বললে, বাবা ম'রে গেছে রাম-ভাই!

চেঁচামেচি শুনে বাবা মা দাদা সবাই সেখানে এসে উপস্থিত হ'ল। আমরা তখুনি জানলা টপকে পাগলা সন্ন্যেসীর ঘরে গিয়ে দেখলুম, চিত হয়ে তিনি শুয়ে আছেন, বুকের ওপরে হাত দুটি জোড় করা। মুখ ঈষৎ ফাঁক, চোখের দুই পাশে অশ্রুর রেখা, যেন নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমুচ্ছেন।

পাগলা সন্ন্যেসীর বাড়িতে এই ক বছরের মধ্যে কখনও কোনও আত্মীয়স্বজনকে দেখি নি, কিন্তু তিনি মারা যাওয়ামাত্র বোধ হয় ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আহিরীটোলা থেকে চ'লে এল ভাগ্নের দল, লেবুতলা থেকে এসে গেল ভাইপোর দল, পৌত্র ও দৌহিত্রে বাড়ি ভ'রে গেল। বড় ছেলের কাছে টেলিগ্রাম গেল, দিন ছয় বাদে সেও এসে পড়ল। যে যেখানে ছিল, সবাই এল, শুধু এল না আমাদের গোষ্ঠদিদির দেবতা।

শ্রাদ্ধশান্তি হয়ে যাবার পর সমস্যা উঠল, গোষ্ঠদিদির খরচ চলবে কি ক'রে? সে থাকবে কোথায়?

ভাসুর জানালেন, বাবা তো কিছুই রেখে যান নি, আমারও এমন কিছু অবস্থা নয় যে, ভাদ্রবউকে নিয়ে গিয়ে রাখি। বউমা তাঁর নিজের লোকজনের কাছে গিয়ে থাকুন, আমার যখন সুবিধে হবে, আমি কিছু কিছু ক'রে সাহায্য করতে পারি।

ভাদ্রবউ জানালেন, তিন চুলোয় কেউ থাকলে আপনার ভাইয়ের

সঙ্গে আমার বিয়ে হ'ত না। কারুর সাহায্যে আমার দরকার নেই। আমার স্বামী নিরুদ্দেশ, সেজন্যে এই বাড়ির অর্দ্ধেক ভাগে আমার অধিকার আছে। বাড়ি বিক্রি ক'রে অর্দ্ধেক টাকা আমায় দেওয়া হোক।

ভাসুর পরম পুলকিত হয়ে জানালেন, বাবা বাড়ি বন্ধক রেখে গিয়েছেন। বিক্রি ক'রে পাওনাদারদের সব দেনা মিটবে কি না সন্দেহ।

এটা যে একেবারে মিথ্যে কথা সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না, কিন্তু গোষ্ঠদিদির হয়ে কে লড়বে? সে সব শুনে চুপ ক'রে রইল।

আমাদের বাড়িতে কয়েকটি বিধবা ও অনাথ ছেলে থাকত। এরা ছিল বাবার পেটোয়া। আমাদের ওপর বাবার শাসন যতই কঠিন হোক না কেন, এদের প্রতি তাঁর সহৃদয়তার মাত্রা প্রায় অপরাধের সীমায় গিয়ে পৌঁছত। এরা হাজার অন্যায় করলেও কারুর কিছু বলবার জো ছিল না। এদের নিয়ে মার সঙ্গে বাবার খিটিমিটি বাধত এবং তাই নিয়ে সংসারে মাঝে মাঝে ভারী অশান্তি হ'ত। আমরা মার দলে থাকলেও ভরসা ক'রে কাউকে কিছু বলতে পারতুম না। গোষ্ঠদিদির বাসস্থানের সমস্যা উঠতেই আমরা দু ভাই পরামর্শ ক'রে ঠিক করলুম, তাকে আমাদের বাড়িতেই এনে রাখতে হবে। এও ঠিক হ'ল, প্রস্তাবটা বাবার কাছে পাড়তে হবে, কারণ বাড়িতে যে কয়টি মেয়ে আছে তাদের নিয়েই মা ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছেন, নতুন আগন্তুকের সম্ভাবনাকে তিনি আমলই দেবেন না।

একদিন বিকেলে সাহস ক'রে বাবাকে গোষ্ঠদিদির কথা ব'লে ফেলা গেল। দুজনে মিলে গোষ্ঠদিদির অবস্থার এমন বর্ণনা করলুম যে, বাবার চোখে জল এসে গেল। ছেলেবেলায় বাবা অনেক সাংসারিক দুঃখকষ্ট পেয়েছিলেন, বোধ হয় সেইজন্যে দুঃখীজনের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক মমতা অত্যন্ত প্রবল ছিল। আমাদের কথা শুনে তিনি বললেন, নিশ্চয় নিশ্চয়, আমরা থাকতে গোষ্ঠ আবার যাবে কোথায়! যাও, তাকে এখুনি নিয়ে এস, বল গিয়ে, তোমার কোন ভাবনা নেই, আমরা আছি।

আমরা কাজ ফতে ক'রে উৎফুল্ল হয়ে চলেছি, এমন সময় বাবা

বললেন, আচ্ছা, দাঁড়াও, আজ আর তাকে কিছু ব'লো না, তোমাদের মাকে একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার।

সে রাত্রে বাবা গোষ্ঠদিদিকে নিয়ে আসবার প্রস্তাব করা মাত্র মা একেবারে তেলে-বেগুনে জ্ব'লে উঠে বললেন, তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়ে গেল?

এক ধমকেই বাবা চুপ হয়ে গেলেন। তিনি হয়তো ভাবতে লাগলেন, বুদ্ধিশুদ্ধি তাঁর যে কোনকালে ছিল, সে কথাটা তাঁর স্ত্রী তা হ'লে পরোক্ষভাবে স্বীকার করছেন।

কিন্তু ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হয়ে যায় দেখে আমরা দুজনে একটু একটু ক'রে গোষ্ঠদিদির হ'য়ে বলতে লাগলুম। দু-চারটে কথা বলতে না বলতে মা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, চুপ কর তোরা, এই বয়েস থেকেই বাপের ধারা নিচ্ছেন আর কি!

মা বাবাকে বলতে লাগলেন, গোষ্ঠকে যে বাড়িতে নিয়ে আসবে বলছ, একবার তার স্বামীর কথা ভেবে দেখেছ? ও এখানে থাকুক, তারপর একদিন সেই মাতাল বদমাইসটা এসে এখানে উঠুক আর বাড়িতে মদ আর গাঁজার হল্লা চলুক।

মদ গাঁজার নাম হতেই বাবা একেবারে চমকে উঠলেন, না না না, ও কথাটা আমার মনেই হয় নি, তুমি ঠিকই বলেছ, না না না।

গোষ্ঠদিদির ভাসুর মাস তিনেক কলকাতায় থেকে বাড়ি বিক্রি ক'রে শ পাঁচেক টাকা তার হাতে দিয়ে বললেন, বাড়ি বেচে পাওনাদারদের দেনা ও অন্য খরচ চুকিয়ে হাজারটি টাকা বেঁচেছে। তার পাঁচশো তোমায় দিলুম। আমি পরশু মঙ্গলবারের স্টীমারে চ'লে যাচ্ছি। বাড়ি যারা কিনেছে তারা এক মাসের সময় দিয়েছে, এই এক মাসের মধ্যে অন্য কোন জায়গা ঠিক ক'রে তুমি চ'লে যাও।

সেই রাত্রেই গোষ্ঠদিদি সব কথা ব'লে আমাদের বললে, একদিনের মধ্যে যেখানে হোক আমার জন্যে একখানা ঘর ঠিক ক'রে দে।

কলিকাতা শহরে ইলেক্‌ট্রিক ট্রাম যখন প্রথম চলতে আরম্ভ করে, তখন সেই ঘোড়াবিহীন গাড়ি দেখবার জন্যে সকালে সন্ধ্যায় কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের দুই ফুটপাথে বিপুল জনতা হ'ত। রাত্রির অন্ধকারে ট্রলির

চাকায় ও গাড়ির চাকায় ঝকঝক ক'রে বিদ্যুৎ ঝলকাত। বিনি পয়সায় এই আতসবাজি দেখবার জন্যে বিশেষ ক'রে রাতেই লোক জমত বেশি। আমাদের তো কোনও পরব ফাঁক যাবার জো ছিল না। প্রায় রোজই রাত্রে পড়াশুনা শেষ হবার পর বাড়ি থেকে দশ মিনিটের ছুটি নিয়ে ঘণ্টা দেড়েক ধ'রে ট্রাম-বাজি দেখে বাড়ি ফিরতুম। এই রকম এক রাত্রে তামাসা দেখে বাড়ি ফিরছি, এমন সময় দেখি, একটি ছোট্ট মেয়ে, বয়স বোধ হয় তার সাত-আট বছর হবে, পথ হারিয়ে 'মা গো' 'মাসী গো' ব'লে প্রাণপণে চীৎকার করছে আর কাঁদছে। মেয়েটির চারদিকে বেশ একটি ভিড় জমেছে, সবাই তাকে নানা প্রশ্নে আরও ব্যস্ত ক'রে তুলেছে। মেয়েটির দিকে এগিয়েই আমরা তাকে চিনতে পারলুম। আমাদের ইস্কুলের পথে একটা গলির মধ্যে প্রায়ই তাকে খেলতে দেখতুম।

অস্থির তার কাছে গিয়ে বললে, খুকী, তোমার অমুক জায়গায় বাড়ি না?

সে হাঁ না কিছুই বললে না, শুধু কাঁদতে লাগল। চল খুকী, তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিই।—ব'লে আমরা তাকে নিয়ে চললুম। ভিড়েরও কেউ কেউ আমাদের সঙ্গে চলল।

আমরা ঠিকই আন্দাজ করেছিলুম। মেয়েটিকে নিয়ে তাদের বাড়িতে গিয়ে দেখি যে, তার মা আর মাসী মড়াকান্না জুড়েছে, মেয়ের শোকে যায়-যায়, এমন সময় আমাদের সঙ্গে তাকে দেখামাত্র দুজনে মিলে প্রহার দিতে আরম্ভ করলে। অনেক কষ্টে তাদের কবল থেকে তাকে রক্ষা ক'রে সে রাত্রে বাড়ি ফেরা গেল।

এর পর থেকে ইস্কুলে যাবার মুখে অথবা ফেরবার পথে প্রায়ই আমরা তাদের বাড়িতে গিয়ে মেয়েটির খোঁজ করতুম। মেয়েটি নাম ছিল শৈল, সবাই তাকে শৈলী ব'লে ডাকত। শৈলর মা ও মাসী আমাদের দুই ভাইকে 'বেম্মজ্ঞানীদের ছেলে' ব'লে ডাকত। মা ও মাসী উভয়েই ছিল রুগ্ণা, কিন্তু কথাবার্ত্তা ছিল ভারী মিষ্টি। তাদের পরিবারে পুরুষ কেউ ছিল না, মা মাসী কাজও কোথাও করত না, কি ক'রে তাদের সংসার চলত তা জানি না। মাসী মাঝে মাঝে পিঠে ও গজা বানিয়ে আমাদের খেতে দিত। বেশ লোক ছিল তারা।

একটা অতি পুরাতন বাড়ির একতলায় ছুখানা ঘর ভাড়া নিয়ে তারা থাকত। একতলায় আরও কতকগুলো অন্ধকার ঘরে ভাড়াটে ভর্ত্তি ছিল। বাড়ির দোতলায় একখানা মাত্র ঘর ছিল, কিন্তু সে ঘরখানার পাঁচ টাকা ভাড়া ছিল ব'লে ভাড়া হ'ত না।

গোষ্ঠদিদি ঘর ঠিক করবার কথা বলামাত্র আমরা শৈলীর মা ও মাসীর কাছে গিয়ে তাদের বাড়ির দোতলার ঘরখানা তার জন্যে ঠিক ক'রে ফেললুম। গোষ্ঠদিদির ভাসুর বর্ম্মা যাবার আগেই তাকে নিয়ে গিয়ে শৈলদের দোতলায় তার নতুন সংসার পেতে দিলুম।

আমি একাধিক সাধুমুখে শুনেছি যে, সাধকেরা যদি বুঝতে পারেন, দৈহিক অপটুত্ব তাঁদের যোগে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তা হ'লে নতুন কলেবর লাভের জন্য তাঁরা স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন। এও শুনেছি, অনেক সাধক মনোমত শিষ্য পেলে তাকে দীক্ষা দিয়েই দেহত্যাগ করেন। আমার মনে হয়, পাগলা সন্ন্যেসী উপযুক্ত শিষ্যবোধে আমাদের দু ভাইকে মাধুর্য্য-সাধনের দীক্ষা দিয়ে ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন।

যে অজ্ঞাত শক্তি এই বিশ্বপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করছে, সেদিনকার সেই রাত্রিটুকুর মধ্যে সে আমার জীবনে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রবাহ নিয়ে এল তা ভোলবার নয়। সন্ধ্যার সময় লতুর সঙ্গে গান্ধর্ব্ব বিবাহে আবদ্ধ হওয়া, রাত্রি নটা নাগাদ জীবনে সর্ব্বপ্রথম মধুর আস্বাদন ও শেষরাত্রে পাগলা সন্ন্যেসীর অকস্মাৎ রঙ্গমঞ্চ থেকে অপসরণ, আমাকে একেবারে বিহ্বল ক'রে ফেললে।

গোষ্ঠদিদিকে শৈলদের বাড়িতে স্থিতি ক'রে দিয়ে সন্ধ্যেবেলায় যখন বাড়ি ফিরলুম, তখন আমাদের বিষণ্ণ মুখ দেখে মা বাবা পর্য্যন্ত সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। তবুও গোষ্ঠদিদি ও পাগলা সন্ন্যেসী যে আমাদের কি ছিল, তা বাড়ির কেউ জানত না। যে বাড়ি একরকম আমাদের নিজেরই ছিল, পাগলা সন্ন্যেসী আর পাঁচ-সাত বছর জীবিত থাকলে হয়তো যে বাড়ির মালিকই আমরা হতুম, সে বাড়ির সদর-দরজায় তালা পড়ল। দোতলার বারান্দায় ইংরেজী ও বাংলায় কার্ড ঝুলল—বাড়ি ভাড়া। রাত্রে বাতি নিবিয়ে বিছানায় শুয়ে ছাতের দরজায় কখন পাঁচটা টোকা পড়বে তা শোনবার জন্যে আর উৎকর্ণ হয়ে থাকতে হয়

না। জ্যোৎস্নারাতে মনে হতে লাগল,—আমাদেরই একান্ত গোষ্ঠদিদি শৈলর মা-মাসীকে নিয়ে ছাতে ব'সে গল্প করছে।

অদৃষ্ট সেদিন আমাদের সঙ্গে কি ছলনাই করেছিল, সে কথা মনে হয়ে হাসিও যেমন পায়, বিস্ময়ও তেমনই জাগে।

মনের যখন এই রকম অবস্থা, ঠিক সেই সময় আমাদের বাড়িওয়ালা নোটিস দিলে, এক মাসের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে, তার যক্ষ্মা হয়েছে, সে কলকাতায় এসে চিকিৎসা করাবে।

ভালই হ'ল। সেই অবস্থা আমার ও অস্থিরের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠছিল। আমরা আবার কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে আমাদের সেই পুরোনো বাড়ির কাছেই একটা বড় বাড়িতে উঠে গেলুম।

আগামীবারে সমাপ্য

"মহাস্থবির"

হরি হরি

গৃহিণী ঘুমান শয্যায় হয়ে কাত
চুলের তলায় এলায়ে শিথিল হাত—
ভাবি, আহা মরি মরি!
জেগে উঠে ক'ন—'গরমে প্রাণটা যায়
দুজন কি শোয়া চলে এক বিছানায়!'
শ্রীবিষ্ণু হরি হরি।

সকাল বেলায় মেছুনী গয়লা সাথে
তর্ক করেন দৃপ্ত ভঙ্গিমাতে—
ভাবি, আহা মরি মরি!
খেতে ব'সে শুনি, উদাস কণ্ঠে কন—
দুধ ও মাছের হয় নাই আয়োজন!
শ্রীবিষ্ণু হরি হরি।

তরুণ ঘোষের সাথে যবে কন কথা,
কি হাসি রঙ্গ! কটাক্ষ চপলতা!
ভাবি, আহা মরি মরি!

পালা ভেঙে যায় যখন সে যায় চলি,
গম্ভীর মুখে পড়েন গীতাঞ্জলি
শ্রীবিষ্ণু হরি হরি।

নূতন শাড়িটি অঙ্গে জড়ায়ে পরি'
ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখান্ বাখান করি'—
ভাবি, আহা মরি মরি !
দোকানদারের বিল্ যবে দেয় হানা
একশো সাতাশ টাকা ও এগারো আনা
শ্রীবিষ্ণু হরি হরি।

আয়নায় আঁখি রাখিয়া বাঁধেন চুল
কবরী ঘিরিয়া জড়ান অশোক ফুল,
ভাবি, আহা মরি মরি !
মোরে কন, আমি চললাম সিনেমায়,
নেমন্তন্ন করেছে অশোক রায়—
শ্রীবিষ্ণু হরি হরি।

মাসের পয়লা মাহিনা পাইলে, উনি
সলীল ভঙ্গে হাসিমুখে নেন গুনি
ভাবি, আহা মরি মরি !
সে টাকাগুলির কড়া-ক্রান্তি আর
দেখিতে পাই না নাগাদ মাসকাবার—
শ্রীবিষ্ণু হরি হরি।

পঞ্চশরের উত্তাপে দ্রব হিয়া
বিগলিত হয়ে করে যবে পিয়া পিয়া—
ভাবি, আহা মরি মরি !
কাছে যাই ; তিনি বিরস কণ্ঠে চাপা
যাহা কন, তাহা কাগজে যায় না ছাপা—
শ্রীবিষ্ণু হরি হরি।

"চন্দ্রহাস"

রামপীরিত

রামপীরিত এককালে খুব প্রবল-প্রতাপান্বিত পুরুষ-সিংহ-জাতীয় লোক ছিল। জমি-জমা হাঁক-ডাক লোকজন কি না ছিল তার! জমিদারের দক্ষিণহস্ত ছিল সে। কালক্রমে কিন্তু আস্তে আস্তে সব গেল। প্রতাপ গেল, প্রভুত্ব গেল, বুড়ো হয়ে পড়ল ক্রমশ। একদিন শুনলাম, অসুখ করেছে। আলাপ ছিল, দেখা করতে গেলাম। দেখি, ঘরের এক কোণে চুপ ক'রে শুয়ে আছে। আমাকে দেখে ধীরে ধীরে উঠে বসল। একটা বিশ্রী পোড়া গন্ধ ছাড়ছিল।

জিজ্ঞাসা করলাম, গন্ধ কিসের রামপীরিত?

ইঁদুর পোড়াচ্ছি।

কেন?

খাব।

খাবে? বল কি!

আমার এক মরাই ধান, কুড়ি বস্তা গম সব ওরা নিঃশেষ করেছে। ঘরে একটি দানা খাবার নেই। ওরা আমার খাবার খেয়েছে, আমি ওদের ধ'রে ধ'রে খাচ্ছি তাই।

হাসল। কিন্তু চোখ দুটো দপ ক'রে জ্ব'লে উঠল তার।

পরিশ্রান্ত-পুরুষকার ক্লান্ত-পদ ক্ষুব্ধচিত্ত হয়ে ফিরে হঠাৎ সেদিন রামপীরিতকে মনে পড়ল।

"বনফুল"

সুরাসুর

কাক বলে, আমি কালো, কোকিলো তো তাই;
তার চেয়ে আমি কিন্তু কিছু ভাল ভাই।
গলা বটে রুক্ষ তবু শিখেছি সভ্যতা,
কোকিলের মুখে কিন্তু কেবলি কু-কথা।
কোকিল হাসিয়া বলে, তা হ'লে কি হয়,
মিষ্ট সুরে করিয়াছি ভুবন বিজয়।
বেসুরে বলিলে 'বাবা' শোনে না তা কেউ,
সুরে 'শালা' বলো—ওঠে আনন্দের ঢেউ।

বাংলার নবযুগ ও স্বামী বিবেকানন্দ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১১

একটা কথা পুনরায় বলা আবশ্যক—আমি বিবেকানন্দের যে চরিতকথা বিবৃত করিতেছি তাহা বাংলার নবযুগের প্রধান প্রবৃত্তির সম্পর্কে; সে প্রবৃত্তি যে কি, তাহা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি কেবল এই প্রসঙ্গে, আমি যুগের অতীত যাহা তাহারও আলোচনা না করিয়া পারি নাই; এমন আলোচনা পূর্ব্বেও করিয়াছি। এবার এই লোকোত্তর চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গে আমাকে একটু বেশি করিয়া সেই ধরণের আলোচনা করিতে হইয়াছে, আশা করি, তাহা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় নহে। নবযুগের মানবধর্ম্ম—মানবপূজা, মানবত্বের মহিমাবোধ, প্রভৃতি নূতন ভাবস্রোতের উৎপত্তি ও বিকাশ, এবং সেই স্রোতোধারার বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গ—সমাজে, সাহিত্যে, ধর্ম্মে ও রাষ্ট্রে তাহার নব নব অভিব্যক্তির ধারা ও ধরণ—আমার বর্ত্তমান নিবন্ধের মুখ্য বিষয়। মানুষের মহিমার সেই রহস্য-সন্ধান একবার আরম্ভ করিলে তাহার কি শেষ আছে? যুগ, জাতি, দেশ ও কালকে অতিক্রম করিয়াও, দেশে ও কালে তাহার প্রকাশ সীমাহীন ও বিচিত্র; আবার যাহা নৈর্ব্যক্তিক তাহা ব্যক্তির মধ্যেই প্রকাশ পায়, সেই ব্যক্তিত্বই নৈর্ব্যক্তিককে যেমন প্রত্যক্ষ তেমনই রহস্য-গভীর করিয়া তোলে। মানবতা বলিতে কোন তত্ত্ব বা ভাববস্তু নয়, কারণ, তত্ত্বমাত্রেই নিরাকার—জগৎ ও জীবনের সম্পর্কে তাহার কোন মূল্যই নাই। ব্যক্তি বা বিশেষকে বাদ দিয়া একটা নির্ব্বিশেষ কিছুর ধ্যান যখন আমরা করি, তখনই বস্তুকে হারাই; আমরা যাহাকে সার্ব্বজনীন বলি তাহা সৃষ্টির বহির্ভূত—আমাদেরই মনঃকল্পিত একটা ধারণা মাত্র। আমি এই আলোচনায় তেমন কোন তত্ত্বকে বস্তুস্পর্শশূন্য করিয়া, ভাবকে রূপবিবর্জ্জিত করিয়া তাহারই মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছি না; একটা জাতি ও একটা যুগের প্রতিনিধিরূপে এক এক ব্যক্তির সাধনায় সেই তত্ত্বের প্রকাশ যতটুকু প্রত্যক্ষগোচর করা যায়, আমি তাহারই পরিচয় দিবার চেষ্টা করিতেছি। এজন্য বিবেকানন্দের মধ্যেও কেবল একটা তত্ত্ব নয়, তাঁহার যে ব্যক্তিস্বরূপ, সেই সুগভীর মানবতারই একটি বিশেষ রূপে—সকল তত্ত্বকেও যেন গৌণ করিয়া, এমন প্রবলতার সহিত ফুটিয়া উঠিয়াছে—আমি তাহাকেই প্রাধান্য

দিতে চাই। বিবেকানন্দ নিজেও তাঁহার সেই অতি উন্নত ও অতি বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক আদর্শকে নিজ আত্মার নিঃসঙ্গ-নির্জ্জনে নিজের জন্যই গোপন রাখিয়া তাঁহার মানবীয় প্রেমকেই নর-জীবনে পূর্ণ মুক্তি দিয়াছেন; তাঁহার সেই প্রেমই তাঁহার সর্ব্বকর্ম্মের একমাত্র প্রেরণা হইয়াছিল, এবং সেই প্রেম যে অর্থেই আধ্যাত্মিক হউক (সে আলোচনা পূর্ব্বে করিয়াছি) তাহা যে নির্ব্বিশেষ নয়, বিশেষ,—নিরাকারধর্ম্মী নয়, সাকারধর্ম্মী, এবং সেই জন্যই তাহা জগৎ-সত্য ও জীবন-সত্যের সম্পূর্ণ অনুগত—ইহা লক্ষ্য করিলে, নবযুগের Humanism এই পুরুষ-অবতার মহাপ্রেমিকের জীবন-বাণীতে যে Gospel of Humanity-র রূপ ধারণ করিয়াছিল তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

গুরুর দেহত্যাগের পর বরানগরের ক্ষুদ্র আশ্রমটিতে যে একটি তরুণ ব্রহ্মচারীদল ধ্যান, তপস্যা ও কঠোর সন্ন্যাসের সাধন-চক্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, নরেন্দ্র তাহারই অভিভাবক হইয়া কিছুদিন স্থিরভাবে কাটাইয়াছিলেন; শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহারই উপরে এই ভাইগুলির ভার অর্পণ করিয়া যান। কিন্তু নরেন্দ্র এইরূপ শান্ত আশ্রমজীবন সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না, শীঘ্রই সর্ব্ব বন্ধন ত্যাগ করিবার—নামহারা গৃহহারা হইয়া মুক্ত আকাশ-তলে, গন্তব্যহীন পথে ভ্রমণ করিবার বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল; মাঝে মাঝে তিনি অল্পাধিক কালের জন্য নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতে লাগিলেন। এ সময়ে তাঁহার একমাত্র কাম্য ছিল—লোকালয় হইতে দূরে, একান্ত নির্জ্জনে আত্মার নিঃসঙ্গতা—খাঁটি সন্ন্যাস-জীবনের পরমসুখ উপভোগ করা। তবু কে যেন ধরিয়া আনে—প্রাণ বেশিক্ষণ সেই নিষ্প্রাণতার সাধনা সহ্য করিতে পারে না। এই দুর্ব্বলতাকে যেন জয় করিবার জন্যই একদা, শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পাঁচ বৎসরের মধ্যেই, শেষ মমতাবন্ধন সবলে ছিন্ন করিয়া তিনি একেবারে বাহির হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্বে আর একবার এইরূপ নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন, সে আর এক কারণে; তখন হিমালয়ের আলমোড়া প্রদেশে অবস্থানকালে এক দারুণ দুঃসংবাদ এতদূরেও পৌঁছিয়াছিল—তাঁহার শৈশব-সঙ্গিনী ভগিনীর মৃত্যুসংবাদ; এই ভগিনীকে তিনি অতিশয় ভালবাসিতেন, বিবাহের পর শ্বশ্রূগৃহে অতিশয় দুরবস্থায় তাহার জীবনান্ত হয়। এ সংবাদে বাণবিদ্ধ কেশরীর মত যন্ত্রণায় অধীর হইয়া তিনি নিবিড়তর পর্ব্বতগহনে প্রস্থান করিয়াছিলেন, কিছুদিন কোন সংবাদই ছিল না। এই একটিমাত্র ঘটনাতেই বিবেকানন্দের মনুষ্য-হৃদয়ের যে পরিচয় আছে—সন্ন্যাসীর পরিচয়ও তাহাতেই উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। প্রেম যত বড়, যত উদার ও ব্যাপক হউক, তাহার মূলে দেহের আত্মীয়তা যেমন,

তেমনই একটা সাকার বিগ্রহ থাকিবেই; বিবেকানন্দের মানব-প্রেমও দেশ ও জাতিকে লঙ্ঘন করিয়া একটা নির্ব্বিশেষ মহামানবের ধ্যানে চরিতার্থ হইতে পারে নাই; স্পর্শ করিবার, স্পন্দন অনুভব করিবার মত একটা দেহ তাহার চাই। যে প্রেম সমগ্র মানব-জগৎকে বুকে করিবার জন্য বাহুবিস্তার করিতে পারে, সে প্রেম, অতি নিকট যাহা তাহারই—অধর, উরস বা চরণ-সরোজের পূজায় দুই চক্ষে আরতি-দীপ জ্বালাইবেই। যে মানুষকে ভালবাসে, সে স্বজনকে ভালবাসে নাই; যে বিশ্বকে সত্যই আত্মীয় জ্ঞান করে, সে আপন সমাজকে, আপন দেশকে মায়ের মত প্রণয়ীর মত ভালবাসে নাই, ইহা কখনও হইতে পারে না। বিবেকানন্দ দেশ-জাতি নিরপেক্ষভাবে মানুষকে যে চক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি, কিন্তু সেই দৃষ্টির মূলে ছিল স্বজাতি-প্রেম; দেশকে এমন ভালবাসা বোধ হয় ভারতবর্ষে পূর্ব্বে আর কেহ বাসে নাই। এইবার সেই কথাই আসিতেছে।

উপরে বিবেকানন্দ-জীবনের যে ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি, তাহার অল্পকালের মধ্যেই—১৮৯০-৯১ সালে, তখন তাঁহার বয়স ২৭ বৎসর—হঠাৎ তাঁহার প্রাণে এক অদ্ভুত প্রেরণা জাগিল। তখন তিনি হিমালয়ের তুঙ্গ গিরিভূমির এক নির্জ্জন স্থানে সর্ব্ব-বিস্মৃতির ধ্যান-সুখ ভোগ করিতেছিলেন; যেন তাহারই প্রতিক্রিয়া-বশে সহসা সেই বিজনতার পরিবর্ত্তে এমনই সজনতার পিপাসা জাগিল যে, তিনি সেই হিমালয় হইতে পদব্রজে কন্যাকুমারী তীর্থে পৌছিয়া তথাকার মন্দিরে পূজা নিবেদন করিবার ব্রত গ্রহণ করিলেন। উত্তর সীমান্ত হইতে দক্ষিণ সীমান্ত পর্য্যন্ত এই মহাদেশের ধূলি তিনি স্পর্শ করিবেন; যত মানুষের যত সমাজ, যত গৃহ আছে সর্ব্বত্র অতিথি হইবেন—সেই বিপুল জন-সাগরের কোন স্রোত কোন তরঙ্গ তাঁহার বক্ষের অপরিচিত থাকিবে না! তাহাই হইল; পূরা দুই বৎসর পরিব্রাজকরূপে তিনি সেই মহামাতৃভূমির শীর্ষ হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত তাহার বিরাট দেহের সকল দৈন্য ও সকল ঐশ্বর্য্য চাক্ষুষ করিয়া, বেদনা ও বিস্ময়ে, ভক্তি ও করুণায় এমন এক দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন, যাহা আর কোন সন্তান এ পর্য্যন্ত লাভ করে নাই। বস্তুতঃ ইহাই তাঁহার জীবনের চরম দীক্ষা; এতদিনে তিনি দ্বিজত্ব লাভ করিলেন—ইহার পরেই তাঁহার বিবেকানন্দ-জীবনের আরম্ভ, তাঁহার চরিত্র-বিকাশের তথা চরিতকথার শেষ এইখানে।

বিবেকানন্দের জ্ঞান-চক্ষু পূর্ব্বেই উন্মীলিত হইয়াছিল, এইবার প্রাণ-চক্ষু উন্মীলিত হইল—সন্ন্যাসীকেও প্রেমে পড়িতে হইল। বিরাট ভারতবর্ষের

খণ্ড-বিখণ্ড দেহে, নিজেরই প্রাণের সাহায্যে, তিনি এক অখণ্ড প্রাণশক্তিকে আবিষ্কার করিলেন। সেই মলিনবসনা, নিরাভরণার সর্ব্বদেহে তিনি "সর্ব্বার্থসাধিকা গৌরী নারায়ণী"র রূপ অসংশয় দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিলেন। এই যে প্রত্যক্ষ করা ইহাই বিবেকানন্দের তপস্যার শেষ ফল। তিনি যে দৃষ্টি দ্বারা ভারতবর্ষকে দেখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সেই তপস্যালব্ধ শক্তিকে পূর্ণ প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল; সেই দৃষ্টিকে, ত্রিকালদর্শীর মত, অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত তিন কালের সাক্ষী করিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমানের যতকিছু দুর্দ্দশা তিনি স্থির দৃষ্টিতে ও দৃঢ়চিত্তে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে কিছুমাত্র নিরাশ হন নাই। তিনি সেই যুগসঞ্চিত ভস্মস্তরের তলদেশে ভারতের চির-অনির্ব্বাণ আত্মাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। ভাবে নয়, স্বপ্নে নয়, কল্পনায় নয়—একেবারে বাস্তবের রূঢ়তম পরিচয়ের মধ্যে তিনি তাহার সেই মহিমা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেই বাস্তব পরিচয়ের কিঞ্চিৎ আভাস না দিলে বিবেকানন্দের সেই দিব্যদৃষ্টিলাভের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইবে না, তাই আমি সেই বিষয়ে দুইটি গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু বিবৃতি ও মন্তব্য উদ্ধৃত করিব। মঃ রোলাঁ এই ঘটনার সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

"The great Book of Life revealed to him what all the books in the libraries could not have done, which even Ramakrishna's ardent love had only been able to see dimly as in a dream.......He was not only the humble little brother who slept in stables or on the pallets of beggars, but he was on a footing of equality with every man, today a despised beggar sheltered by pariahs, tomorrow the guests of princes. Conversing on equal terms with Prime Ministers and Maharajas...ever teaching ever learning—gradually making himself the Conscience of India, its Unity and its Destiny."

"Everywhere he shared the privations and the insults of the oppressed classes. In Central India he lived with a family of outcast sweepers. Amid such lowly people who cower at the feet of society, he found spiritual treasures, while their misery choked him."

* * * *

"He had traversed the vast land of India upon the soles of his feet... When he arrived at Cape Comorin, he was exhausted, but having no money to pay for a boat to take him to the end of his pilgrimage, he flung himself into the sea and swam across the shark-infested strait; ...and when he had stepped on to the terrace of the tower he had just

climbed at the very edge of the earth with the panorama of the world spread before his eyes, the blood pounded in his ears like the sea at his feet; he almost fell...He had seen the path he had to follow. His mission was chosen."

ইহার পর ভগিনী নিবেদিতার উক্তি—

"When we read his speech before the Chicago Conference...we find ourselves in presence of something gathered by his own labours, out of his own experience. The power behind all these utterances lay in those Indian wanderings of which the tale can probably never be complete. It was of the first-hand knowledge, then, and not of vague sentiment or wilful blindness, that his reverence for his own people and their land was born. It was a robust and cumulative induction, moreover, be it said, ever hungry for new facts and dauntless in the face of hostile criticism...And more than this, it was the same thorough and first-hand knowledge that made the older and simpler elements in Hindu civilization loom so large in all his conceptions of his race and country." *

১২

দেশকে এমন করিয়া দেখা বোধ হয় আর কেহ দেখে নাই ; শুধু সেই দেহ হাত দিয়া স্পর্শ করাই নয়, ওই-জ্ঞান ও ওই প্রেমের দৃষ্টি দ্বারা একেবারে একাত্ম হইয়া এ যেন তাহার অন্তরের অন্তরকে দেখিতে পাওয়া ! এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, বিবেকানন্দ নামক যে পুরুষ এবং তাঁহার যে বাণীকে আমি একটা বৃহত্তর কালধর্ম্মের অভিব্যক্তি বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহার জন্ম হইয়াছিল তাঁহার মহাজীবনের এই মহালগ্নে ; সেই পুরুষের যে জ্ঞানী-আত্মা এতদিন বিদেহী ছিল, এইবার তাহা যেন মানবদেহ ধারণ করিল ; সেই মানবই একাধারে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি-মানব ও ব্যূহ-মানব—Man ও Humanity। যাহা পরম সত্য বা Absolute—তাহা বর্ণহীন শুভ্র—একটা নিরাকার ভাবময় সত্তা মাত্র ; সে সত্য সৃষ্টির বহির্ভূত, তাহা জগতের বা মানুষের ইতিহাসগত নয় ; সেই সত্যই যখন প্রেমের 'খাদ'-যুক্ত হয়, তখনই তাহাতে সৃষ্টির গঠন-কর্ম্ম

* এই দীর্ঘ ইংরেজী বচনগুলির বাংলা অনুবাদ দেওয়া খুবই উচিত ছিল, কিন্তু পৃষ্ঠা-সংক্ষেপের প্রয়োজনে উপস্থিত তাহা হইয়া উঠিল না ; সে জন্য ইংরেজী-অনভিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট ত্রুটি স্বীকার করিতেছি।—লেখক

সম্পন্ন হয়, অরূপ রূপ পরিগ্রহ করে, নিরাকার ভগবান সাকার হইয়া উঠে। কিন্তু তখন ওই 'খাদ'কে অস্বীকার করিয়া, তাহার মলিনতার ত্রুটি নির্দ্দেশ যে করে, সে সৃষ্টিকেই অস্বীকার করে। সেই Universal, সেই নির্ব্বিশেষ যখন বিশেষের আলিঙ্গনে বদ্ধ হয় তখনই প্রেমের জন্ম হয়, এই নিয়ম ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল প্রেমের পক্ষেই সমান। বিবেকানন্দ মানুষের আত্মাকেই সকলের উপরে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, সেই আত্মার কোন দেশ বা জাতিভেদ নাই; তাহাই পরম সত্য, কিন্তু সেই সত্যের তত্ত্বমাত্রকে যে উচ্চ চিন্তা বা উৎকৃষ্ট রস-রূপে উপভোগ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে, সে মানুষের জীবনের মধ্যস্থলে কখনও আসিয়া দাঁড়ায় নাই,—ভগ্নজানু, দুর্গত মানুষকে আপন স্কন্ধে তুলিয়া উদ্ধার করিবার বাস্তব সমস্যা-সঙ্কটে সে কখনও পড়ে নাই। বিবেকানন্দ মানব-প্রেমের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই, নিজের বুকে সেই প্রেম অনুভব করিবার প্রয়োজন তাঁহার হইয়াছিল এবং নিজের জাতি ও দেশের দুরবস্থাই তাঁহাকে প্রেমের এমন অনুভূতি-ধনে ধনী করিয়াছিল। তিনি আগে, ভারতবর্ষনামক যে মানবগোষ্ঠী তাহাকে আপন হৃদয়ের সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করিয়াছিলেন, এবং পরে পৃথিবীর সর্ব্বত্র সেই ভারতবর্ষকেই পূজা করিয়াছিলেন। সূর্য্যরশ্মি যেমন শূন্যে তাপ বিকিরণ করে না, উষ্ণতা উৎপাদনের জন্য তাহার একটি অবয়বী পদার্থের আশ্রয় চাই, তেমনই প্রেমকে ক্রিয়াশীল হইতে হইলে তাহার একটা আধার চাই, সেই আধারকে ধরিয়াই সে আপনাকে নিরাধার করিতে পারে; প্রেম যদি সত্যকার প্রেম হয়, তবে সেই আধারে বদ্ধ হইয়াই সে উচ্ছ্বসিত আবেগে সকল সীমা লঙ্ঘন করে। প্রেমের এই পরম রহস্য বিবেকানন্দের জীবনে যে আকারে ও যে মাত্রায় আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে, তাঁহার স্বদেশ-প্রেম ও জগৎ-প্রেমের সেই অপরূপ সমন্বয়ের কথা—তাহার অন্তর্গত সেই গভীরতর সত্যের কথা, অতঃপর আমি পূর্ব্বোক্ত মনীষীদ্বয়ের উক্তির সাহায্যেই সুস্পষ্ট ও মনোজ্ঞ করিবার চেষ্টা করিব, কারণ, তেমন করিয়া বলিবার ক্ষমতা আমার নাই।

বিবেকানন্দের সর্ব্বজাতি-প্রেম ও স্বজাতিবাৎসল্য এই দুই বিপরীত প্রকৃতির উল্লেখ করিয়া ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন—"পাশ্চাত্য দেশে তাঁহাকে আমরা হিন্দুধর্ম্মের প্রচারকরূপেই দেখিয়াছিলাম, এবং তাহাতে, নিখিল মানবের মধ্যে সেই একই আত্মার মহিমা-ঘোষণাই ছিল তাঁহার উপদেশের সারমর্ম্ম; তাঁহার সেই কর্ম্মের অন্তরালে ভারতবর্ষের জন্য কোন ভাবনা বা তাহার হিতসাধনের কোন অভিপ্রায় প্রকাশ পাইত না। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আমি তাঁহার সহিত

ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলাম, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাঁহার মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত আমি আমার গুরুদেবের মধ্যে আর এক অগ্নির নিরন্তর দহন-জ্বালা লক্ষ্য করিয়াছি; সে কোন তত্ত্ব, কোন আধ্যাত্মিক সত্যের উপাসনা বা উন্মাদনা নয়—দেশ ও জাতির দুর্দ্দশা-নিবারণের প্রাণান্ত প্রয়াস ও তাহার নিষ্ফলতার জন্ম মর্ম্মান্তিক যাতনা-ভোগ।" ভগিনীর নিজের ভাষায়—

"It was the personality of my Master himself, in all the fruitless torture and struggle of a lion caught in a net. For, from the day that he met me at the ship's side till that last serene moment, when, at the hour of cow-dust, he passed out of the village of this world, leaving the body behind him, like a folded garment, I was always conscious of this element inwoven with the other, in his life."

"It was the personality of my Master."—বাক্যটি সত্যই অতি গভীর। অন্যত্র—

"He neither used the word 'nationality', nor proclaimed an era of 'nation-making'. 'Man-making', he said, was his own task. But he was born a lover, and the queen of his adoration was his Motherland.... He was hard on her sins, unsparing of her want of worldly wisdom, but only because he felt these faults to be his own."

তিনি নিজে স্বামিজীর এই স্বজাতি-বাৎসল্যের সহিত তাঁহার মানবপ্রেমের সম্বন্ধ এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"Like some great spiral of emotion, its lowest circles held fast in love of soil and love of nature; its next embracing every possible association of race, experience, history, and thought; and the whole converging and centring upon a single definite point, was thus the Swami's worship of his own land."

ভারতবর্ষকে ভালবাসার আরও কারণ ছিল—সে কারণ আরও স্পষ্ট। ভারতবর্ষই যে তাঁহার নিজের সেই জ্ঞান-চৈতন্যের জননী—তিনি যে তাহারই অমৃত-স্তন্য পানে আত্মার অনন্ত শক্তি ও অসীম আশ্বাস লাভ করিয়াছিলেন; তিনি যে একান্তই সেই ভারতের সন্তান, এ চেতনা তাঁহাকে কখনও ত্যাগ করে নাই। নিবেদিতাও তাহা বলিয়াছেন, যথা—

"Student and citizen of the world as others were proud to claim him, it was yet always on the glory of his Indian birth that he took his

stand. And in the midst of the surroundings and opportunities of princes, it was more and more the monk who stood revealed."

সর্ব্বশেষে, ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার গুরুর সহিত বুদ্ধের তুলনা করিয়া বলিতেছেন—"খ্রীষ্ট-পূর্ব্বকালে বুদ্ধের ধর্ম্মচক্র দুই বিভিন্ন মুখে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল ; এক দিকে তাঁহার সেই ধর্ম্মের উৎস-মূল হইতে একটি প্রবল স্রোতোধারা বহির্গত হইয়া দেশ-দেশান্তর প্লাবিত করিয়াছিল ; সেই বাণী-প্রচারের ফলে প্রাচ্য-মহাদেশে কত জাতির নব জন্ম হইয়াছিল—কত নব নব সমাজ, নূতন সাহিত্য, নূতন শিল্পকলার উদ্ভব হইয়াছিল ; কিন্তু আর এক দিকে, ভারতবর্ষের চতুঃসীমার মধ্যে তাহার কাজ হইয়াছিল অন্যরূপ—

"The life of the Great Teacher was the first nationaliser. By democratising the Aryan culture of the Upanishads, Buddha determined the common Indian civilization, and gave birth to the Indian nation of future ages."

—সেইরূপ বিবেকানন্দের মহাজীবনেও একই কালে দুইটি পৃথক অভিপ্রায়-সিদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়—"One of world-moving, and another, of nation-making"। আমার মনে হয়, এই ঐতিহাসিক তুলনাটি বড় যথার্থ হইয়াছে, একটা অতীত ঘটনার সাক্ষ্য বর্ত্তমানের ঘটনাটিকে সহজবোধ্য করিয়াছে। মঃ রোলাঁ একটি মাত্র কথায় বিবেকানন্দের এই স্বদেশপ্রেমের একটি বড় সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিয়াছেন, যথা—"His universal soul was rooted in its human soil"। আমি নিজে এ সম্বন্ধে যত কথা বলিয়াছি, এ যেন তাহারই ঘনীভূত নির্য্যাস। ওই "human soil" কথাটিই এ সম্বন্ধে আমারও আদি ও শেষ কথা। বিবেকানন্দের জীবন ও চরিত-কথা এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

সংবাদ-সাহিত্য

কাহিল অবস্থায় সার্ ষ্টাফোর্ড ক্রীপ্‌সকে স্তোকবাক্যস্বরূপ ভারতবর্ষে পাঠানো হইয়াছিল, তিনি সর্বদলমিলন-শর্তের ধোঁকা বা ধাপ্পা দিয়া কর্তাদের মুখ রক্ষা করিয়া বিদায় লইয়াছিলেন। গান্ধীজীর ভারসাম্যরক্ষাকারী ওয়ার্কিং কমিটির মাধ্যাকর্ষণ-শক্তিসমূহ তখনও কারাগার-অন্তরালে স্তম্ভিত হয় নাই; তিনি "ত্যজ ভারত" প্রস্তাব দ্বারা ক্রীপ্‌স-ধাপ্পার জবাব দিয়াছিলেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের কথা ইহা। তাহার পর দ্রুতগতিতে যে সকল চমকপ্রদ ঘটনা ও দুর্ঘটনা ভারতবর্ষের বুকে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার সঠিক ইতিহাস এখনও কঠিন-কবায় ভারতরক্ষা আইনের কবলায়িত হইলেও আমাদের অনেকের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত। ইংরেজ বেকায়দায় পড়িয়াও হাল ছাড়ে নাই, কিন্তু কোয়াদে-আজম জনাব জিন্নাকে বাজারে ছাড়িয়াছিল। তাহার সংকল্প সম্ভবত ইহাই ছিল যে, মরি তো সবসুদ্ধ মরিব—অর্ধত্যাগী পণ্ডিত হইয়া বাঁচিয়া থাকিব না।

* * *

কিন্তু একা জনাব জিন্নাকে দিয়া কাজ হইত না। তাঁহার মর্জি ও মেজাজ দিয়া তাঁহাকে বিচার করিতে গেলে বলিতে হয় তিনি বারুদখানাবিশেষ; তাঁহাকে কার্যকরী করিয়া রাখিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে একটি ছুঁচাবাজির প্রয়োজন; কুরু-পাণ্ডব-সংঘর্ষে শকুনির মত শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীকে সেই প্রয়োজন-সাধনে কে নিযুক্ত করিয়াছিল জানি না, কিন্তু সেইকালে আমরা দেখিয়াছিলাম ওয়ার্কিং-কমিটি-শাসিত কংগ্রেস ইঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া সভয়ে ইঁহাকে পরিহার করিয়াছিলেন, রহস্য-মধুর বৈবাহিক সম্পর্কের বাঁধনেও কলির ধৃতরাষ্ট্র ধর্মচ্যুত হন নাই। ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি সম্মানার্হদের শাসনও ইহার কারণ হইতে পারে।

* * *

তাহার পর সহসা একদিন দুর্ভেদ্য কারাপ্রাচীরের অন্তরালে সকল সমস্যা ও সমাধান একই কালে আশ্রয় লাভ করিয়া বহিষ্কৃত রাজাগোপালাচারীকে নূতন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ দান করিল। তখনও-রাহুগ্রস্ত-কিন্তু-মোক্ষমুখী চতুর ইংরেজ মহাসমারোহে ইঁহারই জয়-ঘোষণায় মুখর হইয়া উঠিল, ইঁহাকে গোকুলে বৃদ্ধি পাইবার অবকাশ দিল। পশ্চিম ও পূর্ব রণাঙ্গনে কালের চাকা ঘুরিবে ঘুরিবে বলিয়া যেদিন নিশ্চিত আভাস পাওয়া গেল, সেদিনও সুকৌশলী ইংরেজ দয়া ও ন্যায়পরতার ভান করিতে ছাড়িল না। যখন চোখ রাঙাইয়া শাসন করা স্বাভাবিক ও সহজ হইত, তখনই গান্ধীজীকে বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়া হইল।

ইংরেজ জানিত, ওয়ার্কিং-কমিটিহীন গান্ধীকে বারুদ এবং বাক্তির সার্থকপ্রয়োগে একেবারে বানচাল করিয়া দেওয়া কঠিন হইবে না।

*　　*　　*

ইংরেজের এই জানায় ভুল হয় নাই। সমস্ত বহিঃপৃথিবীর নিকট মুখরক্ষা করিয়া ভারতবর্ষকে পূর্ববৎ অথবা পূর্বাপেক্ষা দৃঢ়ভাবে শোষণ করিবার ওজুহাত সৃষ্টির জন্য যুদ্ধজয়ের ঠিক পূর্বমুহূর্তে ইংরেজ যে চাল চালিয়াছে, তাহাতে গান্ধী-জিন্না সকলেই মাত হইতে বসিয়াছেন, শুধু অজ্ঞাত অন্ধকারের অন্তরালে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং-কমিটির সদস্যেরা সভয়ে এই ভয়াবহ অপকৌশলের খেলা দেখিতেছেন। গান্ধীভক্ত কংগ্রেসী এবং গান্ধীবিরোধী সি-পি-আই যে কোন্ স্বার্থে এবং কোন্ কৌশলে একই ঐকতানবাদনে একই পাকিস্তানী নৃত্যে মাতিয়াছে সাভারকরপ্রমুখ "মহাবীর"দের কোলাহলে তাহার কৌতুকাবহ দিকটা আজ আমাদের লক্ষ্যগোচর হইতেছে না বটে, কিন্তু যে মুহূর্তে ইংরেজের ডুগডুগি-বাদ্য অকস্মাৎ থামিয়া যাইবে সেই মুহূর্তেই কংগ্রেসীরা লজ্জার সহিত অনুভব করিবে যে, সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তাহাদিগকে দুইদণ্ড নাচিবার সুযোগ দিয়া ইংরেজ ইহারই মধ্যে আপনার মতলব হাসিল করিয়া লইয়াছে। অপর পক্ষ চিরকালই ন্যাংটা, বাটপাড়ের ভয় তাহারা না করিতেও পারে।

*　　*　　*

আসলে দেওয়ার মালিক ইংরেজ। দেওয়ার কালে মহামান্য চার্চিলের ষাঁড়কুত্তায় "না" যে কিছুতেই "হাঁ"তে পরিণত হইবে না, এতদিন তাহাদের সহিত একত্র ঘর করিয়াও যাঁহারা এই সামান্য সত্যটা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, তাঁহারা মহাত্মা হইতে পারেন, পথভ্রান্তের পথপ্রদর্শক বা কোয়াদে-আজম হইতে পারেন, কিন্তু বুদ্ধির দৌড়ে প্রতিপক্ষের কাছে যে তাঁহারা শিশু, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে জিন্না সাক্ষাৎ ইংরেজের সৃষ্টি, এবং যে ইংরেজের উপস্থিতির উপরেই জনাব জিন্নার মহিমময় অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে, তিনি কখনই গান্ধীজীর শতেক প্ররোচনাসত্ত্বেও সেই ইংরেজকে "কুইটে"র নোটিশ দিবেন না; তিনি বারংবার অসুস্থ হইবেন, বারংবার চাল ও শর্ত বদল করিবেন, ভয়ও দেখাইবেন হয়তো, কিন্তু ইংরেজহীন ভারতবর্ষে গান্ধীজীর কাঁধে কাঁধ মিলাইবেন না। ইহা জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধের কথা, সম্পাদ্য বা প্রতিপাদ্য নয়। গান্ধীজী বৃথাই আত্মাবমাননা উপেক্ষা করিয়া মুহুর্মুহু জিন্নার চরণ-ধূলার তলে মাথা নত করিতেছেন।

*　　*　　*

বুঝিতে পারিতেছি, বার্ধক্যের গৌরবে গান্ধীজীর হৃদয় অধিকতর নমনীয় ও উদার হইয়াছে, হয়তো সময় অল্প বুঝিয়া তিনি তাড়াতাড়ি অথবা রাতারাতি জীবনের স্বপ্নকে সফল করিবার পথ খুঁজিতেছেন, কিন্তু স্বল্পতর অভিজ্ঞতা লইয়া আমরা বলিতে পারি, এত সহজে, দুই হিমালয়-সদৃশ ব্যক্তির চুক্তিতেও সমগ্র ভারতবর্ষের দুঃখ মিটিবে না। ইহার জন্য অনেক দুঃখ আমরা সহিয়াছি, আরও অনেক দুঃখ সহিতে হইবে। অন্তত আমাদের এই হতভাগ্য বাংলা দেশের গত পঁয়তাল্লিশ বৎসরের ইতিহাস সেই ইঙ্গিতই দিতেছে। আমরা জানি, গান্ধীজী রূঢ় ধাক্কা খাইয়া আবার প্রকৃতিস্থ হইবেন। তিনি স্বয়ং এই গুরু বিষয়ে সকলকে স্বাধীন চিন্তার অবকাশ দিয়াছেন, সেই স্বাধীন চিন্তাই আমাদিগকে বলিতেছে যে, আপোস-নিষ্পত্তির অর্থ একপক্ষের একান্ত আত্মসমর্পণ নয়—আপাতকৌশলময় সর্বস্ব সঁপিয়া দিবার স্বীকৃতিও নয়, ইহার মূল শর্ত হইতেছে সকলের সমান মর্যাদাবোধ। বর্তমান চুক্তিতে তাহারই অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে।

* * *

বহুর কল্যাণে এক বা একাধিককে বলি দেওয়ার প্রথা আদিমকাল হইতেই আছে, কিন্তু সেখানে বলি স্বেচ্ছাবলি হওয়া প্রয়োজন। অবোধ ছাগশিশুর মাথা হাড়িকাঠে গুঁজিয়া মানুষের কল্যাণের জন্য খড়্গাঘাতে ছিন্ন করিবার প্রাচীন প্রথা গান্ধীজী নিশ্চয়ই ন্যায়সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করেন না, কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমান চুক্তিতে প্রকারান্তরে তিনি তাহাই করিতে যাইতেছেন। ইংরেজ আমাদিগকে পাকিস্তান হিন্দুস্থান কিছুই দিবে না, কিন্তু সুযোগ বুঝিয়া গান্ধীজীর মত কংগ্রেস-প্রধানের অনুমোদন আদায় করিয়া সে একদিন তাহা কাজে লাগাইবে।

* * *

আসল কথা, যুদ্ধ শেষ হইয়া আসিতেছে, এ সকলের আর কিছুই প্রয়োজন হইবে না। ইংরেজের তপ্ত স্নেহচ্ছায়ায় আমরা দুই পক্ষ এখনও দীর্ঘকাল পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া রক্তাক্ত ভালবাসাবাসি করিতে পারিব।

বাগাড়ম্বর আর চলিল না, চিনি ও দুধের পাত্র হস্তে সহসা গোপালদা দর্শন দিলেন। হায় রে, সেই গোপালদা! যিনি একদিন এ-আর-পির সৌজন্যে ধর্মপত্নীর সন্তোষবিধানের জন্য ভাঁড়ার-ঘরে চিনি-মিছরির ঢালাও শ্রীক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনিই আজ বামনাবতারের রূপ লইয়া বলির দরবারে যেন ছলিতে আসিয়াছেন। লজ্জা হইল। গৃহিণী যথেষ্ট তৎপরতার সহিত গোপালদাকে চা পরিবেশন করিয়া গেলেন, তিনি আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া ঢুলিতে ঢুলিতে পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগিলেন। বুঝিলাম, মেজাজ শরিফ আছে। চায়ের

পেয়ালাটা নামাইয়া রাখিয়া হঠাৎ বলিলেন, দেখ ভায়া, গতবারে তোমার উপর দিয়ে বড় একটা ধাষ্টামো করা গেছে, বেদান্তের যা বীজরূপ তার ধারে কাছে কি যেতে পেরেছি? ওই ডট আর ড্যাশের জটলার মধ্যে কাগজ-সমস্যার কি কিছু মীমাংসা হবে?

বলিলাম, কাগজ-সমস্যার যাই হোক গোপালদা, আপনার মুগ্ধবোধ-সংবাদ-সাহিত্যের ফলে আমি রসিক-সমস্যায় বড়ই বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছি। আমাদের পাঠকেরা অনবরত উড়ুক্কু জার্মান বোমার মত সংক্ষিপ্ত সংবাদ পাঠাতে শুরু করেছেন, এই দেখুন এই মাত্র একটা এল। পড়িয়া শুনাইলাম—

"ট্রামারোহণে নামা—অদ্ভুত জামা—স্থানাভাবে বামা—বিরক্ত রামাশ্যামা—দুই টিকিটের দামা—মহিলার ঘামা—বলতে হবে মামা—২৪শে অক্টোবর যুদ্ধ থামা—বলা এবং নামা।"

* * *

গোপালদা মাথা নাড়িলেন, বলিলেন, এ হ'ল ফক্কুড়ি, বাগবাজারী ফক্কুড়ি। যে ভারতবর্ষ একদিন বেদান্তের সংক্ষিপ্ত সাস্ত সূত্রের মধ্যে অসীম অনন্তকে বিধৃত করতে সক্ষম হয়েছিল, এ ইয়ার্কি সেখানে চলবে না। দেখ, আমি গোটা গত মাসটা ধরে এ বিষয়ে অনবরত ভেবেছি এবং শেষ পর্যন্ত পথ খুঁজে পেয়েছি। সূত্রবীজ আমি আবিষ্কার করেছি। যে কোনও বিষয়ে বল, আমি এই সূত্র প্রয়োগ করতে পারব, বিরাট বিরাট মহাভারতের মত ব্যাপার চারটি কি ছটি সূত্রে জল ক'রে ছেড়ে দোব। পেপার কণ্ট্রোলের একেবারে নিকুচি ক'রে ছাড়তে পারবে এর সাহায্যে। পরীক্ষা করতে পার আমাকে।

মাথার মধ্যে গান্ধীজিন্না-ব্যাপারটাই ঘুরপাক খাইতেছিল, বলিলাম, এই পাকিস্তান-সংবাদ সূত্রাকারে বলুন। গোপালদা ক্ষণকাল চক্ষু বুজিয়া বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর সাহায্যে কপাল টিপিতে লাগিলেন। তারপর স্বপ্নোত্থিতের মত বলিয়া উঠিলেন, লিখে নাও।

কাগজ পেন্সিল হাতের কাছেই ছিল। প্রস্তুত হইলাম। গোপালদা সহসা কাগজ ও পেন্সিল আমার হাত হইতে প্রায় ছিনাইয়া লইয়া নিজেই লিখিলেন—

"শেষ মীমাংসা বা কংগ্রেসান্তদর্শনম্ বা অখাণ্ড-সূত্রম্

১। কাদি, ২। গাজি, ৩। পাহি, ৪। হল্লা।"

পড়িয়া আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লইয়া তাঁহার দিকে চাহিলাম। গোপালদা হাসিয়া বলিলেন, ব্যস ফিনিশ্‌ড, গোটা সিচুয়েশানটা ওই চারটি সূত্রের মধ্যে নিবদ্ধ আছে।

আমার দৃষ্টি বিহ্বলতর হইতেই বলিলেন, অবিশ্যি টীকা আবশ্যক। সে ভার তোমরা নেবে। আপাতত এখানেই আরম্ভ ব'লে ধর্তাইটা আমি ধরিয়ে দিচ্ছি।

আমি নির্বাক। স্মরণ হইল—ব্রহ্মসূত্র, বেদান্তদর্শন, ব্যাসসূত্র, উত্তর-মীমাংসা, বাদরায়ণ সূত্র, শারীরক সূত্র, শারীরক মীমাংসা, বেদান্তসূত্র প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত মাত্র ৫৫৫টি (মতান্তরে ৫৫৮টি) সূত্রের সহস্রাধিক বিপুলায়তন ভাষ্যের কথা, স্মরণ হইল শাঙ্কর-ভাষ্যের শঙ্করকে, শ্রী-ভাষ্যের রামানুজকে এবং তাহারও পূর্বে বোধায়ন, উপবর্ষ, টঙ্ক, দ্রামিড়, গুহদেব, কপর্দী, ভারুকী প্রভৃতি পূর্বাচার্যগণকে। মনে পড়িল মধ্বাচার্য, নিম্বার্কাচার্য, বল্লভাচার্য, বলদেব বিদ্যাভূষণকে, বিজ্ঞানভিক্ষু, অবধূতাচার্য, ভাস্করাচার্যকে, মনে পড়িল মাত্র এক পৃষ্ঠায় মুদ্রিতব্য এই ৫৫৫টি সূত্রের কৃপায় অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্ট-শিবাদ্বৈতবাদ, সমন্বয়বাদ, পরিণামবাদ. কর্মবাদ, ভেদাভেদবাদ, দ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ প্রভৃতি নানাবিধ বাদানুবাদের কথা। মাত্র চার অধ্যায় এবং চার × চার = ষোল পাদের কেরামতি ভাবিয়া বিমূঢ় হইয়া গেলাম। কাগজ-সমস্যার সহজ সমাধান বটে!

গোপালদা যেন আমার মনের কথা টের পাইলেন। বলিলেন, যা ভাবছ তা নয়, এই নতুন অশ্বাণ্ডসূত্রের টীকা শুরুতে একটু আধটু প্রয়োজন হবে বটে, কিন্তু ধাতস্থ হয়ে গেলে তোমার পাঠকদের সূত্রেই উপলব্ধি হবে। টীকার প্রয়োজন হবে না।

—কিন্তু ওই কলি গাজি-পাহি হল্লা?

—আমার এই দর্শনে চার অধ্যায়ে চারটি সূত্র মাত্র। প্রথম অধ্যায়ে সমন্বয়—কলি, দ্বিতীয় অধ্যায়ে অবিরোধ—গাজি, তৃতীয় অধ্যায়ে সাধন—পাহি এবং চতুর্থ অধ্যায়ে ফল-নির্ণয়—হল্লা। অবশ্য শেষ-মীমাংসার আগে পূর্ব ও উত্তর মীমাংসা কল্পনা করে নিতে হবে। কলি অর্থাৎ কংগ্রেস ও লিগের এই সমন্বয়ের পূর্বে বিরোধের আভাস স্বতই পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মীমাংসার সম্ভাবনা দেখা দিল, আমরা দ্বিতীয় অর্থাৎ অবিরোধ অধ্যায়ে এসে পড়লাম। এই অবিরোধ ঘটালে কে? না গাজি—অর্থাৎ গান্ধী ও জিন্না। গান্ধী ও জিন্নার মিলনের পূর্বাপর সমগ্র ইতিহাসটি এই অধ্যায়ের টীকার অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা সাধনের অধিকারী হলাম। কি সাধন? পাহি অর্থাৎ পাকিস্তান-হিন্দুস্থান সাধন। সে সাধন অতিশয় কঠিন, শেষ মীমাংসা অর্থাৎ জ্ঞানমার্গের অন্তর্গত হ'লেও আসলে এটি কর্মকাণ্ড এবং এরই ফল চতুর্থ অধ্যায়ে হল্লা—কি না হরি ও আল্লার যোগ।

হল্লার এই তাৎপর্যে তাজ্জব বনিব বনিব করিতেছি, গোপালদা বলিয়া উঠিলেন, এ ছাড়াও এই সূত্র কটির স্বতন্ত্র বিশিষ্ট তাৎপর্যও আছে। তা এই যে, এই কলিকালে গাজির শরণাপন্ন না হ'লে পরিত্রাণ (পাহি) নাই এবং হল্লাই এ যুগের ধর্ম। আরও লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, গান্ধী-জিন্না সূত্রে গান্ধী প্রথম স্থান পেলেও শব্দব্রহ্মের কৃপায় গাজি শব্দটি হয়ে উঠেছে মুসলমান-প্রধান এবং পাকিস্তান-হিন্দুস্থান সূত্রে পাকিস্তানকে আগে দাঁড় করিয়েও সংস্কৃত পাহির লীলা প্রকট হয়ে পড়েছে। প্রথম সূত্রেও কংগ্রেসের গুরুত্বে কলি হিন্দু। চতুর্থ সূত্রে হরি আগে স্থান পেলেও যুক্তাক্ষরের গুরুত্বে ভারসাম্য রক্ষা পেয়েছে।

—তা হ'লে ?

হল্লা কর।—বলিয়া গোপালদা ঠাণ্ডা চায়ের পেয়ালায় পুনর্বার চুমুক দিলেন। কাগজ-সমস্যার সমাধানে নিরাশ হইয়া আমরাও ব্রহ্মসূত্র "সংবাদ-সাহিত্যে"র আশায় জলাঞ্জলি দিলাম।

—

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক গ্রামে দুর্ভিক্ষপীড়িত নিরন্নের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া এবং পৈতৃক ভিটার ধ্বংসোন্মুখ মূর্তির চিত্র ছাপিয়া ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত 'পিপলস্ ওয়ার' তাঁহাকে খেলো করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ডক্টর মুখোপাধ্যায় নিশ্চয়ই ইহার প্রতিবাদ করিতে পারিবেন না, কারণ খোদ রাশিয়া হইতে বর্তমানে চিত্র ও সংবাদ-সংগ্রহ তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না।

—

হজরৎ মহম্মদ-বাক্য—

The bringers of grain to the city to sell at a cheap rate gain immense advantage by it, and whoso keepeth back grain in order to sell at a high rate is cursed.

সুতরাং মহাপুরুষ-মতে বাংলা দেশে হাসেম-কাসেম-ইস্পাহানীর দল নিশ্চয়ই immense advantage gain করিতেছেন !

—

যে দেশে দস্যু-তস্করাদিকে উপযুক্ত সময়ে প্রতিনিবৃত্ত করিবার সঙ্গত ব্যবস্থা নাই, সেই দেশেই চুরি-ডাকাতির পর পুলিস-"এনকোয়্যারি"র বহর দেখিলে তাক লাগিয়া যায়, অবশ্য এই ঘনঘটায় বর্ষণ যে কদাচিৎ হয় তাহা বলাই বাহুল্য। দুর্ভিক্ষও একজাতীয় আক্রমণ, ইহাকে ঠেকাইবার ব্যবস্থা না থাকিলেও দুর্ভিক্ষান্তে কমিশন যথারীতি বসিয়া থাকে—এবারেও বসিয়াছে। সার্ জন উডহেড অনেক আশা লইয়াই আসিয়াছেন, কোনও আশা দিয়া যাইতে পারিবেন

কি না বুঝা যাইতেছে না। দুর্ভিক্ষক্লিষ্টদের মৃত্যুসংখ্যা নির্ধারণও কমিশনের কার্যতালিকায় আছে। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত মানুষের আদমসুমারির সময় যে সরকারী প্রথা অবলম্বিত হইয়াছিল, সেই প্রথায় মৃতের তালিকা নির্ধারণও অত্যন্ত সহজসাধ্য ; মৃত্যুসংখ্যা ঠিক কত দেখানো সঙ্গত—আগে হইতে জানিয়া লইলে কমিশন অনেক অনাবশ্যক পরিশ্রমের হাত হইতে রক্ষা পাইবেন।

—

রক্তমাংসের দেহে রবীন্দ্রনাথ যে এত লোকের সঙ্গে এতখানি ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁহার জীবিতকালে আমরা তাহা অবগত ছিলাম না। আমরা এক বনমালী ওরফে নীলমণিকেই জানিতাম, যে শেষবয়সে রবীন্দ্রনাথের রক্তমাংসের সর্বাধিক সান্নিধ্যের দাবি করিতে পারিত। কিন্তু লোকটি এতই অসম্ভব বিনয়ী যে, গত তিন বৎসরে রবীন্দ্র-স্মৃতি-কল্পে অনুষ্ঠিত বহুসহস্রাধিক সভার কোনটিতেই সে আপনার দাবি পেশ করে নাই। ফলে অপেক্ষাকৃত কম সৌভাগ্যশালী লোকেরা একটু বেশিই দাবি করিয়া বসিতেছে। আমাদের এখনও ভরসা আছে চৈতন্যদাস-গোবিন্দদাসের কড়চার মত বনমালীর কড়চা একদিন আত্মপ্রকাশ করিয়া রক্ত-মাংসের সমুদায় দ্বন্দ্বের নিরসন করিয়া দিবে।

* * *

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-স্মৃতি-প্রতিষ্ঠার কথা স্বতই মনে হইতেছে। যাঁহারা রক্তমাংসের সান্নিধ্যের কথা আজ ঘটা করিয়া জ্ঞাপন করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই বড়লোক ; ইচ্ছা করিলে ইঁহারা এককই রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করিতে পারিতেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে সাড়ম্বরে 'অল-ইণ্ডিয়া রবীন্দ্রনাথ মেমোরিয়াল কমিটি'র প্রতিষ্ঠা ও কীর্তির জয়ঘোষণা শুনিয়াছিলাম। অনেক হোমরাচোমরার নাম এই কমিটিতে ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রক্তমাংসের মত সে কমিটিও আজ ভস্মশেষমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে—মাত্র কয়েক হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া ইঁহারা সম্ভবত সেফকাষ্টডিতে রাখিয়া কর্তব্য সমাধা করিয়াছেন, অথচ এদিকে মাত্র কয়েক মাসের চেষ্টায় কস্তুরবা-স্মৃতি-তহবিলে একা বাংলা দেশ প্রায় নয় লক্ষ টাকা প্রণামী দিয়াছে। ইহা লইয়া দুঃখ করিয়া লাভ নাই, রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা গান্ধীর পরিবার ছিলেন না।

* * *

তবু বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ কবির প্রতি বাঙালীর একটা কর্তব্য থাকিয়া যায়, সে কর্তব্য বর্তমান যুগের পরিবেশের মধ্যে শুদ্ধমাত্র কাব্যপাঠেই শেষ হইয়া যায় না ; রবীন্দ্রনাথের নামে জাতির কল্যাণকর গৌরবময় একটা কিছু স্থাপনের প্রয়োজন হয়। কলিকাতা ম্যুনিসিপাল গেজেটের ১২ আগষ্টের সংখ্যায় শ্রীযুক্ত

অমল হোম রবীন্দ্রনাথের জন্ম ও মৃত্যু-ক্ষেত্র কলিকাতায় একটি আর্টগ্যালারি প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন—সেই মন্দিরে রবীন্দ্র-সাহিত্যের উত্তরাধিকারী বাঙালীরা শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও নানাবিধ শিল্পচর্চায় সমবেত হইবে, সেখানে রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত একটি মিউজিয়াম ও একটি লাইব্রেরি রক্ষিত হইবে। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি ইহা অপেক্ষা সুষ্ঠুতর ভাবে আর রক্ষিত হইতে পারে না এবং ঠাকুর-পরিবারের বসতবাটীটিকেই এই প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে পারিলে কাহারও বলিবার কিছু থাকে না। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির নামে ব্যক্তিগত জয়-ঘোষণায় না মাতিয়া সমগ্র বাঙালী জাতি যদি এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়, তাহা হইলে জাতীয় কলঙ্কের কতকটা ক্ষালন হইতে পারে।

আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্য লইয়া আমরা বহুবার বহুভাবে—ব্যঙ্গচ্ছলে অথবা গম্ভীর ভাবে—আলোচনা করিয়াছি। আমরা এখন পর্যন্ত দেখিতেছি, ইহাতে ভঙ্গী আছে, ভান আছে, ঢং আছে, হঠাৎ এক একটা এলোমেলো শব্দ অথবা পংক্তি অথবা বহুবিখ্যাত কবিতার চরণবিশেষ বসাইয়া চমক লাগাইবার প্রয়াস আছে—ভাবের একটা পূর্বাপর সঙ্গতি নাই, একটা কিছু বলিবার বা প্রকাশ করিবার চেষ্টা নাই। ছন্দ আসে খামোকা, শব্দ আসে অকারণ—কোনও কিছুরই সুষমা বা সামঞ্জস্য নাই। আসল কথা, অন্তরের যে প্রেরণা হইতে কাব্যের জন্ম, এই সকল কবিতায় সেই প্রেরণারই অভাব—sincerityর একান্ত অভাব। সমালোচক হিসাবে যাঁহারা এই সকল কবিতা লইয়া মাতামাতি করেন, লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি—তাঁহারা কেহই সামাজিক জীব নহেন, বর্বর বাউণ্ডুলে সম্প্রদায়ের লোক; তাঁহাদের অন্তরের কথা হইতেছে—"এলোমেলো করে দে মা লুটেপুটে খাই" জাতীয়।

* * *

শুনিতে পাই খাঁটি ইংলণ্ডীয় আদর্শ হইতে এই সকল আধুনিক বাংলা কবিতার জন্ম। ভঙ্গীর অনুসরণ তো বটেই, অনেক ক্ষেত্রেই এগুলি ভাবে ও ভাষায় অনুবাদ মাত্র। অর্থাৎ মূলের স্বরূপ নির্ধারণ করিতে পারিলে নকলেরও কতকটা হদিস পাওয়া যাইতে পারে। সাহিত্যে এবং জীবনে সর্ববিধ সংস্কার-মুক্তি যে ডি. এইচ. লরেন্সের আজীবন সাধনা ছিল, তিনিও আধুনিক ইংরেজ কবিদের সম্বন্ধে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—

Poets of to-day feel often that their feelings are foolish. So they splash something about shirt-sleeves or oysters quickly into every sentimental sentence, to prevent us laughing at them before they have laughed at themselves.

আধুনিক কবিতা দেখিয়া এই ধরনের অনুভূতি আমাদেরও হইয়াছে। অন্তরের মধ্যে যাহা অস্পষ্ট অনুভব করিয়াছি, তাহা সম্প্রতি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রে অত্যাশ্চর্যরূপে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী সাহিত্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে তাহা সর্বৈব প্রযোজ্য। তিনি বলিতেছেন—

"আমাদের সমসাময়িক বিদেশী সাহিত্যকে নিশ্চিত প্রত্যয়ের সঙ্গে বিচার করা নিরাপদ নয়। আধুনিক ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে আমি যেটুকু অনুভব করি সে আমার সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে, তার অনেকখানিই হয়তো অজ্ঞতা। এ সাহিত্যের অনেক অংশের সাহিত্যিক মূল্য হয়তো যথেষ্ট আছে, কালে কালে তার যাচাই হতে থাকবে। আমি যা বলতে পারি তা আমারি ব্যক্তিগত বোধশক্তির সীমানা থেকে। আমি বিদেশীর তরফ থেকে বলচি, অথবা তাও নয়—একজন মাত্র বিদেশী কবির তরফ থেকে বলচি—আধুনিক ইংরেজি কাব্য-সাহিত্যে আমার প্রবেশাধিকার অত্যন্ত বাধাগ্রস্ত। আমার এ কথার যদি কোনো ব্যাপক মূল্য থাকে তবে এই কথা বলতে হবে এই সাহিত্যের অন্য নানা গুণ থাকতে পারে, কিন্তু একটা গুণের অভাব আছে যাকে বলা যায় সার্বভৌমিকতা, যাতে করে বিদেশ থেকে আমিও একে অকুণ্ঠিত চিত্তে মেনে নিতে পারি। ইংরেজের প্রাক্তন সাহিত্যকে তো আনন্দের সঙ্গে মেনে নিয়েছি, তার থেকে যে কেবল রস পেয়েছি তা নয়, জীবনের যাত্রাপথে আলো পেয়েছি। তার প্রভাব আজও তো মন থেকে দূর হয় নি। আজ দ্বাররুদ্ধ য়ুরোপের দুর্গমতা অনুভব করচি আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে। তার কঠোরতা আমার কাছে অনুদার বলে ঠেকে, বিদ্রূপপরায়ণ বিশ্বাসহীনতার কঠিন জমিতে তার উৎপত্তি, তার মধ্যে এমন উদবৃত্ত দেখা যাচ্চে না, ঘরের বাইরে যার অকৃপণ আহ্বান। এ সাহিত্য বিশ্ব থেকে আপন হৃদয় প্রত্যাহরণ করে নিয়েছে, এর কাছে এমন বাণী পাইনে যা শুনে মনে করতে পারি যেন আমারি বাণী পাওয়া গেল চিরকালীন দৈববাণীরূপে। দুই একটা ব্যতিক্রম যে নেই তা হতেই পারে না। মনে পড়চে রবার্ট ব্রিজেসের নাম। আরো আছে।

"আমাদের দেশে তরুণদের মধ্যে কাউকে কাউকে দেখেছি যাঁরা ইংরেজি কাব্য কেবল যে বোঝেন তা নয় সম্ভোগও করেন। তাঁরা আমার চেয়ে আধুনিক কালের অধিকতর নিকটবর্তী বলেই য়ুরোপের আধুনিক সাহিত্য হয়তো তাঁদের কাছে দূরবর্তী নয়। সেইজন্য তাঁদের সাক্ষ্যকে আমি মূল্যবান বলেই শ্রদ্ধা করি। কেবল একটা সংশয় মন থেকে যায় না। নূতন যখন পূর্ববর্তী পুরাতনকে

উদ্ধতভাবে উপেক্ষা ও প্রতিবাদ করে তখন দুঃসাহসিক তরুণের মন তাকে যে বাহবা দেয় সকল সময়ে তার মধ্যে নিত্য সত্যের প্রামাণিকতা মেলে না। নূতনের বিদ্রোহ অনেক সময়ে একটা স্পর্ধামাত্র। আমি এই বলি, বিজ্ঞানে মানুষের কাছে প্রাকৃতিক সত্য আপন নূতন নূতন জ্ঞানের ভিত্তি অবারিত করে, কিন্তু মানুষের আনন্দলোক যুগে যুগে আপন সীমানা বিস্তার করতে পারে কিন্তু ভিত্তি বদল করে না। যে সৌন্দর্য যে প্রেম যে মহত্ত্বে মানুষ চিরদিন স্বভাবতই উদ্বোধিত হয়েছে তার তো বয়সের সীমা নেই, কোনো আইনষ্টাইন এসে তাকে তো অপ্রতিপন্ন করতে পারে না, বলতে পারে না বসন্তের পুষ্পোচ্ছ্বাসে যার অকৃত্রিম আনন্দ সে সেকেলে ফিলিষ্টাইন। যদি কোনো বিশেষ যুগের মানুষ এমন সৃষ্টিছাড়া কথা বলতে পারে, যদি সুন্দরকে বিদ্রূপ করতে তার ওষ্ঠাধর কুটিল হয়ে ওঠে, যদি পূজনীয়কে অপমান করতে তার উৎসাহ উগ্র হতে থাকে, তাহলে বলতেই হবে এই মনোভাব চিরন্তন মানবস্বভাবের বিরুদ্ধে। সাহিত্য সর্বদেশে এই কথাই প্রমাণ করে আসছে যে, মানুষের আনন্দ-নিকেতন চিরপুরাতন। কালিদাসের মেঘদূতে মানুষ আপন চিরপুরাতন বিরহ-বেদনারই স্বাদ পেয়ে আনন্দিত। সেই চিরপুরাতনের চিরনূতনত্ব বহন করছে মানুষের সাহিত্য, মানুষের শিল্পকলা। এই জন্যেই মানুষের সাহিত্য, মানুষের শিল্পকলা, সর্বমানবের। তাই বারে বারে এই কথা আমার মনে হয়েছে বর্তমান ইংরাজি কাব্য উদ্ধতভাবে নূতন, পুরাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীভাবে নূতন, যে তরুণের মন কালাপাহাড়ী সে এর নব্যতার মদিররসে মত্ত, কিন্তু এই নব্যতাই এর ক্ষণিকতার লক্ষণ। সে নবীনতাকে অভ্যর্থনা করে বলতে পারিনে—

> "জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল
> লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

"তাকে যেন সত্যই নূতন বলে ভ্রম না করি, সে আপন জরা নিয়েই জন্মেছে, তার আয়ুস্থানে যে শনি সে যত উজ্জ্বলই হোক তবু সে শনিই বটে।

"এতটা কথা কেন বললুম তা বলি। ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশত ইংরেজি কবিমণ্ডলীর প্রতি আমার আকর্ষণ যখন প্রবল ছিল, তখন সেই প্রীতির টানেই তাদের কাছে যাবার চেষ্টা করেছি। সেই প্রীতির প্রতিদানও পেয়েছিলেম। তখন কালের মধ্যে নমনীয়তা ছিল। এখন তার পরিবর্তন হয়ে গেছে, এ যেন অনাবৃষ্টির যুগ। মরুতে যে গাছ ওঠে তার টেকনিক কাঁটার টেকনিক, সে কেবলি বলে দূরে থাকো, যে যার আপন আপন চণ্ডীমণ্ডপে। এখন ঐ মণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করতে আমার সাহস হয় না—

ওরা এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করে যাতে ওদের আমরা বুঝিনে, ওরাও আমাদের বুঝতে চায় না।"

—

কবি বুদ্ধদেব বসুর কাব্যপ্রতিভা যে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের প্রবল প্রভাবে আপন স্বকীয়তা হারাইয়া পরকীয়াধর্মী হইয়া উঠিতেছে, ইহাতে বাংলা সাহিত্যের ক্ষতিই সূচিত হইতেছে। কবি যাহা হারাইয়াছেন তাহার জন্ত আর্তনাদ স্বাভাবিক কিন্তু সর্বগ্রাসী "কবিতা-ভবন"-সম্রাটের নিকট হইতে আমরা আরও দৃঢ়তা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। আমাদের মনে হয়, এখনও সময় যায় নাই, স্বকীয় মহিমায় তিনি পুনর্বার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন—যদি স্বধর্মে ফিরিয়া আসেন। পুরান-পল্টনী যেমন বালিগঞ্জী হইতে পারেন না, বুদ্ধদেবের পক্ষেও তেমনই রবীন্দ্রনাথ হওয়া সম্ভব নহে। কবির আত্মজ্ঞান টন্‌টনে আছে, ইহাই ভরসা। তিনি নিজেই বলিতেছেন—

"হায়রে মূঢ়, হায়রে দৃষ্টিহীন।
এ-সব কথা একেবারেই ফাঁকা
আত্মপ্রেমের আতরটুকু মাখা!
তাইতে অত ভালো লাগে, কাব্য ক'রে মনের ঘরে সাজাই।
যদি হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে, বাইরে তাকে যাচাই
করতে গিয়ে দেখি,
বুকের রক্তে লালন-করা
এ-পসরা
মেকি, মেকি, মেকি।"

মেকি তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু মেকিত্ব যখন ধরা পড়িয়াছে, তখন কবি নিশ্চয়ই সাবধান হইতে পারিবেন।

—

পাকিস্তান হউক বা না হউক, বাংলা দেশে পূর্ব-পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইলে সেই পাকিস্তানী সাহিত্যের রূপ যে কি হইবে 'মাসিক মোহাম্মদী'র (শ্রাবণ-ভাদ্র যুগ্মসংখ্যা, ১৩৫১) কৃপায় আমরা তাহা স্পষ্টাস্পষ্টি জানিতে পারিয়া কৃতজ্ঞ বোধ করিতেছি। কলিকাতায় কিছুদিন পূর্বে "পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ-সম্মেলন" অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেখানে প্রদত্ত যাবতীয় অভিভাষণ 'মোহাম্মদী'তে একত্র মুদ্রিত হইয়াছে। এগুলি হইতে আমরা স্পষ্ট জানিতে পারিতেছি যে

রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বাংলার হিন্দু মুসলমান এক জাতি কি না তাহার বিচার না করিয়া ইঁহারা সাংস্কৃতিক, সুতরাং সাহিত্যিক, বিচারে দুই জাতিকে স্বতন্ত্র বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র পর্যন্ত যে সাহিত্য, মূল সভাপতি আবুল মনসুর আহ্‌মদের ভাষায় তাহা

"পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্য নয়। কারণ, এটা বাঙলার মুসলমানের সাহিত্য নয়। এ-সাহিত্যে মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য কোনো দান নাই, শুধু তা নয়, মুসলমানদের প্রতিও এ-সাহিত্যের কোনো দান নেই। অর্থাৎ এ-সাহিত্য থেকে মুসলিম সমাজ-প্রাণ-প্রেরণা পায় নি এবং পাচ্ছে না। এর কারণ আছে। সে কারণ এই যে, এ-সাহিত্যের স্রষ্টাও মুসলমান নয়, এর বিষয়বস্তুও মুসলমান নয়; এর স্পিরিটও মুসলমানী নয়; এর ভাষাও মুসলমানের ভাষা নয়।"

এইরূপ এবং ইহা অপেক্ষাও চমকপ্রদ হাজারো দৃষ্টান্ত এই এক সংখ্যা পত্রিকা হইতে দেওয়া যাইবে। কিন্তু তাহা অনাবশ্যক। মূল সভাপতির মনোভাব-বিচারই আমাদের কাজের পক্ষে যথেষ্ট। লেখক যদি সাংবাদিক না হইয়া সামান্যমাত্র সাহিত্যিকবুদ্ধিসম্পন্ন হইতেন তাহা হইলে জানিতে পারিতেন, সাহিত্যপদবাচ্য পৃথিবীর সকল সাহিত্যেরই বিষয়বস্তু আসলে মানুষ, তা সে লুঙ্গিই পরুক, আর টিকিই রাখুক। শেক্‌স্‌পীয়র, মিল্টন, শেলী, কীট্‌স্‌, ডস্টয়-ভ্‌স্কি, টলস্টয়ের সাহিত্য হইতে রসসংগ্রহে যদি তাঁহাদের আটকাইয়া না থাকে এখানেও আটকাইবার কথা নয়। আজিকার অস্বাভাবিক উত্তেজনায় যে মনোবৃত্তি এই সকল বুদ্ধিমান ভদ্রলোক প্রকাশ করিতেছেন, ইহাই যদি তাঁহাদের চিরন্তন মনোবৃত্তি হয় তাহা হইলে কোরান ছাড়া কোনও সাহিত্যই ইঁহাদের পাঠ্য ও পঠ[illegible] হইবে না—সাদী, হাফিজ, রুমি, ওমর, ইকবাল পর্যন্ত বাদ পড়িবেন—পূর্ব-পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় কবি কালীভক্ত নজরুল ইসলাম তো বটেই। কতকগুলা কথা সাজাইয়া সভা করিয়া সদম্ভে প্রচার করাটার মধ্যে কোনই বাহাদুরি নাই, যদি তাহার মধ্যে মানুষের চিরন্তন সত্য না থাকে। আদালতে উকিলরা মক্কেলকে বাঁচাইবার বা মজাইবার জন্য অহরহ কথার তুবড়ি ছুটাইয়া থাকেন, সেই পর্বতপ্রমাণ কথাগৌরবে তাহ্‌জীব ও তমদ্দুনের কিছুই আসিয়া যায় না।

—

এই তো গেল এক দিক। অন্য দিকে ফ্যাসিবিরোধী সাম্যবাদীদের 'অভিবাদন'ও রক্তাক্ত হইয়া উঠিয়া আমাদিগকে বিপর্যস্ত করিতে ছাড়িতেছে না।

"রক্ত !

মাত্র কয়েক ফোঁটা রক্তের অভাবে রমজান দিনদিন কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে। হয়তো একদিন মরেই যাবে !

তবুও একটুখানি রক্ত পাবার যো আছে না কি ?

রক্ত তার শরীরের জন্ত প্রয়োজন নয়, রক্ত সে পান করতে চায়।

একদিন সে রক্ত পান করেছিল,—নিজের ছেলের রক্ত। সে স্বাদ কি সহজে ভোলা যায় ! কেমন নোন্‌তা নোন্‌তা অদ্ভুত এক স্বাদ।

সেই থেকেই একটা প্রচণ্ড বাসনা তার মানুষের রক্ত পানের। এ বাসনা সর্বদা তার মনে তুষের আগুনের মত ধিকি ধিকি জ্বলে। ঘুমন্ত স্বপ্নেও তার রসনায় রস গড়ায়। জাগ্রত অবস্থায় মাঝে মাঝে সে উন্মাদের মত হয়ে ওঠে।

না, রমজান উন্মাদ নয়। সাধারণের মতই অতি সাধারণ মানুষ। ব্যতিক্রম শুধু ঐখানে—মানুষের রক্ত পানের অমানুষিক তৃষ্ণায় সর্বদা সে উদ্‌ভ্রান্ত।...

মানুষের রক্ত চাই তার !

কিন্তু মানুষের রক্ত পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। রাস্তার চৌমাথায়, গলির মোড়ে যে সব মানুষেরা ফ্যা ফ্যা ক'রে ঘোরে, ডাষ্টবিনে খাবার খুঁটে খায় বা দোরে দোরে হত্যে দেয় ঠিক কুকুরের মত, ঘুমোয় বাড়ির রকে, গাড়ি বারান্দার নিচে কিম্বা গাছতলায় আর মরে হেগে-মুতে গাড়ি-চাপা পড়ে—তাদের রক্ত চায় না রমজান। ও চায় সুন্দর সবল মানুষের রক্ত—যারা প্রচুর খায় আর প্রচুর ওড়ায় আর প্রচুর ছড়ায়। দোতালা থেকে যারা চেঁচায়, দূর হ' দূর হ', মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে বলে, বেরো বেরো, পেছন থেকে দরোয়ান লেলিয়ে দিয়ে হাঁকে, ভাগ্‌ ভাগ্‌। কেমন স্বাদ ওদের রক্তের ? পাতলা লাল রক্ত, ক্রমে ক্রমে ঘন হয়—সেই ঘন রক্ত চুক চুক করে চুষে খেতে কী তৃপ্তি ! গলার ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে বুকের মধ্যে পৌঁছায় সমস্ত শরীরে অদ্ভুত এক শিহরণ এনে। কিম্বা ঘন রক্ত যখন জমে যায়, একেবারে কালো হয়ে যায়—তখন সেই তাল তাল রক্ত চিবিয়ে চিবিয়ে খাওয়ার কী অসহ্য আনন্দ !

কল্পনা করেও মনে মনে এক পাশবিক উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয় রমজান, জিব দিয়ে কেমন চুক চুক শব্দ করতে করতে তন্ময় হয়ে যায় ও। মাড়ির পেশীগুলো কড়মড় করে। হাতের শিরাবহুল পেশীগুলো শক্ত হয়ে ফেটে পড়বে যেন !"

এখানেই লেখকের বীভৎসতার শেষ নয়, হঠাৎ রসিক হইবার লোভে তিনি

বীভৎসতর হইয়া উঠিয়াছেন; লেখার শেষে নিম্নলিখিত মন্তব্যটি যোজনা করিয়া তিনি সাইকলজিকাল হইতে চাহিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

"আমাদের মনেও সর্বদা মানুষের রক্তপানের একটা অত্যুগ্র বাসনা তুষের আগুনের মত ধিকি ধিকি জ্বলে। কিন্তু মানুষের রক্ত পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। তাই প্রিয়জনকে যথেচ্ছ চুমো খেয়ে সে সাধ মেটাই!"

লেখককে ব্লাড-ব্যাঙ্কের কোনও কাজে লাগাইয়া দিলে হয় না? তাঁহার প্রিয়জনদের তরফ হইতেই কথাটা বলিতেছিলাম, নতুবা আমাদের আর কি!

—

কবি অমিয় চক্রবর্তী আষাঢ়ের 'চতুরঙ্গে' "সেইদিন" কবিতায় "মহাত্মাজি যদি মারা যান" তাহা হইলে কি হইবে, সেই সমস্যা তুলিয়াছেন। তিনি বিশ্ব-বখাটে বলিয়াই পারিয়াছেন, অন্য যে কেহ হইলে এই প্রশ্নটা তুলিতে পারিত না।

"মহাত্মাজি যদি মারা যান
আকাশ হবে না খান্ খান্
পৃথিবী ঘুরবে।
কঠিন প্রাণ নেবে কিনে
মাঠে অগণ্য চাষী
জলে রোদে দিনে দিনে।
ধনিক বনিক আর বহু বেতনিক
দুমুঠো পুরবে;
উপবাসী
তিনি চলে গেলে।"

মানেটা যদিও স্পষ্ট বুঝা গেল না তবুও অনুভবে বুঝিলাম, কি কি কাণ্ড ঘটিবে। শুধু একটা বিষয়ের কথা কবি স্বাভাবিক বিনয়বশত উল্লেখ করেন নাই, মহাত্মাজীর মৃত্যুর পরে অমিয় চক্রবর্তীর কদর আরও একটু বাড়িবে, যেমন বাড়িয়াছে অ্যাণ্ড্রুজ সাহেবের এবং রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে।

—

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতি আন্দোলন সম্পর্কে অনেক বিস্মৃত ও অজ্ঞাত তথ্য শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল আমাদিগকে শুনাইতেছেন। তাঁহার 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' ও 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' ইতিমধ্যে ঐতিহাসিকের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে। সদ্যপ্রকাশিত *Beginnings of*

Modern Education in Bengal : Women's Education পুস্তকখানি তাঁহার গবেষণামূলক খ্যাতি বর্ধন করিবে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় দি ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি, দি লেডিজ সোসাইটি, দি লেডিজ অ্যাসোশিয়েশন, দি শ্রীরামপুর মিশন প্রভৃতি বাংলা দেশের স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে কিভাবে কাজ করিয়াছিলেন, তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া যোগেশবাবু বেথুন (বীটন) কলেজের পত্তন ও প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত সেই ইতিহাসকে টানিয়া আনিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বীটন ও রাধাকান্ত দেবের পত্রগুলি অতিশয় মূল্যবান বিবেচিত হইবে।

—

'মহাস্থবির জাতকে'র প্রথম পর্ব আগামী আশ্বিন সংখ্যায় শেষ হইবে, ইহা সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকাকারেও বাহির হইতেছে। অন্যান্য পর্বগুলি আর ধারাবাহিক ভাবে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না, একেবারে বই হইয়া বাহির হইবে।

কার্তিক সংখ্যা হইতে "বনফুলে"র বিচিত্র উপন্যাস 'সপ্তর্ষি' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইবে।

ডক্টর সুশীলকুমার দের 'বাংলা প্রবাদ' সম্বন্ধে অনেকেই সন্ধান চাহিতেছেন, ইহা সুবৃহৎ পুস্তক, মুদ্রণ সময়সাপেক্ষ। আশা করা যায়, বড়দিনের পূর্বে বইখানি আত্মপ্রকাশ করিবে।

'শনিবারের চিঠি'র আশ্বিন সংখ্যা পূজা-সংখ্যারূপে ভাদ্রের শেষ সপ্তাহে বাহির হইবে।

—

'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র প্রচলিত সংগ্রহের অষ্টাদশ খণ্ড কাগজের নানা অসুবিধা সত্ত্বেও সগৌরবে বাহির হইয়াছে। রচনাবলীর যাহা বৈশিষ্ট্য—রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণভাবে পাওয়া—এই খণ্ডেও তাহা বজায় আছে। 'শেষ সপ্তক'-এর "সংযোজন" অংশে এই সম্পূর্ণ পাওয়ার পরিচয় মিলিবে। শেষবর্ষণ, নটীর পূজা, নটরাজ, গল্পগুচ্ছের কিয়দংশ এবং সঞ্চয়, পরিচয় ও কর্তার ইচ্ছায় কর্ম—এই খণ্ডে প্রকাশিত সকল রচনা সম্বন্ধেই সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলি রচনাবলীর পাঠে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অশ্বঘোষের বুদ্ধ-চরিত' এবং প্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত দুইটি সুখপাঠ্য বই। বুদ্ধচরিতের অনুবাদ অতি চমৎকার হইয়াছে। লেখার গুণে প্রমথনাথ বিস্মৃত অতীতকে জীবন্ত করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন—উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের "দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী" দ্রুত সমাপ্ত হইল, গত মাসেক কালের মধ্যে 'নবীন তপস্বিনী', 'সুরধুনী কাব্য' ও 'কমলে কামিনী নাটক' গ্রন্থাবলীর এই শেষ তিন খণ্ড বাহির হইয়াছে। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় 'ভূদেব মুখোপাধ্যায়' ও 'নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়'। বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক ভূদেবের এই পরিচয় সর্বত্র প্রচারিত হওয়া উচিত। নবীনচন্দ্রের ('ভুবনমোহিনী প্রতিভা'র কবি) আত্মজীবনী কৌতুককর।

এই বাজারে তাক লাগাইতেছেন সিগনেট প্রেস; রং ছবি ভাল ছাপা ও ভাল বাঁধাইয়ের মজুব লাগাইয়া দিয়াছেন—বইগুলির মহিমা তো স্বতন্ত্র আছেই! অবনীন্দ্রনাথের ক্ষীরের পুতুল, রাজকাহিনী (সম্পূর্ণ), সুকুমার রায়ের ঝালাপালা, বহুরূপী—যে অপূর্ব রূপসজ্জায় এ যুগের ছেলেমেয়েরা পাইতেছে তাহাতে তাহাদিগকে হিংসা হয়।

মেডিকাল বুক কোম্পানী হইতে কল্যাণমল্লের সুবিখ্যাত কামশাস্ত্র বিষয়ক পুস্তক 'অনঙ্গরঙ্গ'-এর ইংরেজী অনুবাদ বাহির হইয়াছে। অনুবাদক ত্রিদিবনাথ রায় অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত এই কাজ করিয়াছেন। তাঁহারই যত্নে এই বহুবাঞ্ছিত পুস্তকের একটি প্রামাণিক সংস্করণ আমাদের হাতে আসিল। সুশীল গুপ্ত প্রকাশ করিয়াছেন গত মন্বন্তরের সচিত্র কাহিনী—Ela Sen-এর *Darkening Days*, ও ভল্টেয়ারের *The Princess of Babylon*.

মিত্রালয় দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর শক্তিশালী উপন্যাস 'পিশাচ' ('শনিবারের চিঠি'তে অংশত প্রকাশিত), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাইরি "ঊর্মিমুখর" এবং গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'দেশবিদেশের ধর্ম্ম' প্রকাশ করিয়াছেন। গজেন্দ্রকুমারের 'নবযৌবন' নামক 'ছোটগল্পসংগ্রহ' বাহির হইয়াছে বুক ইণ্ডাষ্ট্রীজ হইতে।

বেঙ্গল পাবলিশার্স হইতে নবেন্দু ঘোষের নূতন উপন্যাস 'ডাক দিয়ে যাই' এবং মনোজ বসুর গল্পসংগ্রহ 'বনমর্মরে'র দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে।

—

বর্ত্তমান সংখ্যার ৩৪৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'সুরাসুর' কবিতাটি শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শনিবারের চিঠি
১৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩৫১

বাংলার নবযুগ ও স্বামী বিবেকানন্দ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১

"All great doctrine, as it recurs periodically in the course of the centuries, is coloured by reflections of the age wherein it appears; and it further receives the imprint of the individual soul through which it runs. Thus it emerges anew to work upon men of the age. Every idea as a pure idea remains in an elementary stage, like electricity dispersed in the atmosphere, unless it find the mighty condenser of personality"—M. Romain Rolland : *The life of Vivekananda.*

বিবেকানন্দের চরিত-কথা যতটুকু আলোচনা করিয়াছি, তাহার পর তাঁহার বাণীর কিছু পরিচয় দিলেই আমার প্রয়োজন সমাধা হইবে। সে বাণীর বিশেষত্ব এই যে, তাহা কেবল ভাবুকতা, চিন্তাশক্তি, অথবা, যাহা'কে উৎকৃষ্ট প্রতিভা বা মনীষা বলে—তাহারই জীবন-বিচ্ছিন্ন, বস্তুসম্পর্কহীন তত্ত্ব বা সত্য-প্রতিষ্ঠার বাণী নয়; তাহাতে বাস্তব জীবনের গূঢ়তম ও বৃহত্তম সমস্যার সম্মুখীন সত্তপরিত্রাণপ্রয়াসী এক অতিশয় শক্তিমান পুরুষের দুর্দ্দমনীয় উদ্যম স্ফুরিত হইয়াছে; বিবেকানন্দের জীবনও সেই বাণীকে সপ্রমাণ করিয়াছে। সেই সমস্যা মূলে এক হইলেও তাহার শাখা-প্রশাখা আছে, এই বাণীতেও তাহার কোনটাই বাদ পড়ে নাই। আমি বিশেষ করিয়া তাহার একটা দিকই লইব—যে দিকটির সহিত বর্ত্তমান আলোচনার সাক্ষাৎ যোগ আছে, যে দিকটি তাঁহার বাণীর খুব প্রয়োজনীয় ও সার্থক দিক বলিয়া মনে হয়। বিশুদ্ধ জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্রে, শাস্ত্র ও দর্শনঘটিত নানা তত্ত্বের মৌলিক ব্যাখ্যাও তাঁহাকে করিতে হইয়াছে—সে সকলও তাঁহার বাণীর অন্তর্গত, চিন্তার দিক দিয়া তাহাদের মূল্য কম নয়। কিন্তু মানব-ইতিহাসের এই মহাযুগান্তরকালে, তিনি নব জীবন-যজ্ঞের উদ্গাতারূপে যে প্রাণদ-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার প্রকৃত 'বাণী'; আমি সেই বাণীরই যথাসাধ্য পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

আমার মনে হয়, এই ভারতবর্ষেই—এই অতি-দুর্গত, মোহগ্রস্ত, ভয়ার্ত্ত ও বহু-শৃঙ্খলিত মানবাত্মার দেশেই,—সর্ব্বমানবের মুক্তিসংগ্রাম আরব্ধ হইয়াছে; এই দেশেই তাহার ক্রুশবিদ্ধ বিরাট দেহের অবতারণ ও পুনরুত্থানের মন্ত্রোচ্চারণ হইতেছে—এই মহাশ্মশানই যে মানুষের সেই নবজন্মের সূতিকাগাররূপে ক্রন্দন-শেষে হর্ষধ্বনিতে পূর্ণ হইবে, তাহা অসম্ভব নয়। মানুষের মধ্যে পুরুষোত্তমের দর্শন এই ভারতবর্ষেই হইয়াছিল, এই ভারতবর্ষই অল্পে সন্তুষ্ট না হইয়া ভূমার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিল—তমসার পারে হিরণ্যবর্ণ মহান্ পুরুষের চকিত দর্শন লাভ করিয়া, "যংলব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং

তত:”—তাহার লোভে আর সকল লাভকে তুচ্ছ করিয়াছিল; এবং অন্তরের অন্তরে সেই এক ভিন্ন আর কিছুকেই মূল্য দেয় নাই বলিয়া, পরমার্থ হইতে অর্থকে নিরতিশয় তিরস্কৃত করিয়া, অবশেষে এমন অবস্থায় নিপতিত হইয়াছে যে, তেমন অবস্থা আর কোন দেশে,—তাহার সমতুল্য কোন মানবসমাজে হয় নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাসেই, সেই ঊর্দ্ধতম সোপান হইতে নিম্নতম সোপান পর্য্যন্ত মানুষের উত্থান-পতনের চক্ররেখা সম্পূর্ণ হইয়াছে। ঐ গতি-চক্রের আবর্ত্তন অন্য জাতির জীবনে এখনও পূর্ণ হয় নাই; এখানে তাহা হইয়াছে বলিয়া, মানুষের উচ্চতম অধিকার এবং চরমতম অধোগতির উপলব্ধি এই জাতির জীবনেই ঘটিয়াছে। এ জাতির জীবনের সেই দুই প্রান্তকে—বর্ত্তমানকে প্রত্যক্ষ এবং অতীতকে জাতিস্মরের মত অপরোক্ষ করিয়া, বিবেকানন্দ মানুষের অদৃষ্টকে দৃষ্টিগোচর করিলেন। ঐ পশুবৎ-নিগৃহীত, ধূল্যবলুণ্ঠিত, আত্মচৈতন্যহীন মনুষ্যমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া দেখ—উহারা কি মানুষ? উহারা কি সেই দেশ ও সেই জাতির বংশধর যাহারা অমৃতের জন্য পাগল হইয়াছিল, যাহারা সর্ব্বপ্রথম পৃথিবীর সর্ব্বমানবকে “অমৃতস্য পুত্রাঃ” বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল? ইহারাই কি সেই মহাতীর্থের অধিবাসী, ইহাদেরই আদিকালাগত বংশধারা কি সেই গঙ্গোত্রী ধারায় অভিষিক্ত হইয়াছে?—যাহার উদ্দেশে আধুনিক কালের এক অমৃতপিপাসু য়ুরোপীয় মনীষী আকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠেন—

Man must rest, get his breath, refresh himself at the great living wells, which keep the freshness of the eternal. Where are they to be found, if not in the cradle of our race on the sacred height, whence flow on the one side the Indus and the Ganges, on the other, the torrents of Persia, the rivers of Paradise?—(Michelet : *The Bible of Humanity*. রোমাঁ রোলাঁ কর্ত্তৃক তাঁহার 'শ্রীরামকৃষ্ণ'-গ্রন্থের মুখ-পত্রে উদ্ধৃত।)

সেই জাতির সেই দেহের দিকে বিবেকানন্দ চাহিয়াছিলেন—কোন্ দৃষ্টিতে, তাহা বলিয়াছি। এক দিকে যেমন গভীর মমতায়, অপরিসীম অনুকম্পায় তাঁহার হৃদয় আপ্লুত হইয়াছিল, অপর দিকে তেমনই, যেন তাঁহার ললাটের তৃতীয় নয়নে, এই দুর্গতির নিম্নাভিমুখী ধারায় যুগ-যুগান্তর উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। সেই স্থির অপলক দৃষ্টি যতই গভীর হইয়া উঠিল, ততই যেন সেই দুই প্রান্তের ব্যবধান—সেই দেবত্ব ও পশুত্বের বৈসাদৃশ্য—লোপ পাইতে লাগিল। সোনায় কখন কলঙ্ক ধরে না, আত্মার কখন অধোগতি হয় না; কালের ধারায় কেবল রূপ-বিবর্ত্তন হয়, তাহা বিবর্ত্তন মাত্র—পরিণাম নয়। এই বিবর্ত্তনকেই স্বীকার করিতে হইবে—পরিণামকে নয়। তিনি যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন, ঐ দেহ মৃত বা পতিত নয়—ঐ মোহ সাময়িক মূর্চ্ছা মাত্র; বরং ঐ দেহেই আত্মার পুনর্জাগরণ সুসাধ্য। ইতিহাসও মিথ্যা নয়, এক অর্থে—তাহা সত্য; তাহা, সেই এক অবতারী আত্মার জাতি-যুগ-দেশ-ব্যাপী লীলাভিনয়-কাহিনী;

তাহাতে, আত্মার বন্ধন নয়—তাহার স্বেচ্ছা-বিহারের অসীম সামর্থ্যই সূচিত হয়। এই দৃষ্টির মূলে ছিল সেই ভারতীয় আত্মদর্শন ; তাই আত্মার এই ঘোরতর লাঞ্ছনাও আত্মার সেই মহিমাকেই এক উর্জ্জ্বল দীপ্তিতে অধিকতর দীপ্যমান্ করিয়া তুলিল। মনুষ্যত্বের ঊর্দ্ধ হইতে অধস্তল এমন এক পলকে পর্য্যবেক্ষণ করিবার—সেই দুই সীমাকে এমন যুক্ত করিয়া লইবার অবকাশ ভারতবর্ষের মনুষ্য-সমাজেই সম্ভব হইয়াছিল।

২

কিন্তু বিবেকানন্দের এই যে 'মানুষ' বা 'মানবাত্মা'—ইহার স্বরূপ একটু ভাল করিয়া বুঝিয়া না লইলে, তাঁহার বাণীর মর্ম্ম, তথা মহামানব-বাদ, পরবর্ত্তীকালের নানা ভাব-চিন্তা ও মতবাদের মধ্যে হারাইয়া যাইবে। এক দিকে তিনি যেমন ঘোরতর অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক—'আত্মা' বলিতে এক অখণ্ড নির্ব্বিশেষ বিশ্বাত্মায় বিশ্বাসী, তেমনই, 'মানুষ' বলিতে সেই 'আত্মা'র বহু-বিচিত্র বিশেষ রূপকেও তিনি মানিয়া লইয়াছেন। মানবজাতি সেই এক "পুরুষে"র সৃষ্টিযজ্ঞে উৎসর্গীকৃত অবয়বী রূপ ; এই বিরাট অবয়ব যেমন একই আত্মার নিশ্বাস-বায়ুতে পূর্ণ, তেমনই ঐ সৃষ্টিও বৈচিত্র্যের রস-রূপে সীমাহীন। এই বহুত্ব—এই particularity—না মানিলে সৃষ্টিও অবাস্তব হইয়া যায়। বিবেকানন্দ এই এক ও বহুকে সমদৃষ্টিতে দেখিবার মহাজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার গুরুর নিকটে—শ্রীরামকৃষ্ণের 'কালী'কে তিনি যে শেষে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি। ঐ 'একে'র দৃষ্টি যেমন জ্ঞানের দৃষ্টি ; তেমনই ঐ 'বহু'র দৃষ্টিই প্রেমের দৃষ্টি ; প্রেম যখন ঐ জ্ঞানের দ্বারা পরিশুদ্ধ ও দৃঢ়ীকৃত হয়, তখনই এক-'মানুষ' ও সর্ব্বমানব, এক জাতি ও সর্ব্বজাতি, সেই প্রেমে অভিন্ন হইয়া উঠে। এই universal বা নির্ব্বিশেষ 'একে'র তত্ত্বে উঠিবার একমাত্র সোপান কিন্তু ঐ particular ; যে দৃষ্টিতে এই দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য আর থাকে না—সেই দৃষ্টিই দিব্যদৃষ্টি ; সে দৃষ্টি বুদ্ধিজীবী তার্কিকের নাই ; সেই অপরোক্ষ-জ্ঞান একরূপ অধ্যাত্মশক্তি-সাপেক্ষ। সেই 'বোধি' ন্যূনাধিক মাত্রায় সাধক, কবি ও প্রেমিকের মধ্যে উদয় হইতে দেখা যায় ; এজন্য আধুনিক কালের কাব্যজিজ্ঞাসাতেও এই তত্ত্ব ক্রমশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। "Whoever grasps this particular grasps the universal also with it"—মহাকবি ও মহামনীষী গেটের (Goethe) এই উক্তির ভাষ্যকার একজন আধুনিক কাব্য-সমালোচক বলিতেছেন, "He is not speaking of the same universals and particulars as the logician"। কারণ, সেরূপ কবি-দৃষ্টিতে, "another faculty than conceptual thinking is at work. Goethe was perfectly clear about that. What he was really saying is that in the true poetic activity of the mind the logical distinction between particulars and universals is ignored, because it is

invalid for that activity of mind." ইহার পর যে কথাটি বলিয়াছেন তাহার মত গভীর ও মূল্যবান কথা আর নাই—"In poetry, qua poetry, there are neither particulars or universals, abstracts or concretes." ইহা শুধুই কাব্যের তত্ত্ব নয়—জগৎ-ব্রহ্মের এই অভেদ-তত্ত্বই পরমতত্ত্ব বলিয়া, এতকাল পরে ভারতবর্ষের সেই পুরাতন বাণীই এক নূতন রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—জ্ঞান ও প্রেম, কাব্য ও আধ্যাত্মিকতত্ত্ব, অস্তি-ভাতি ও নামরূপ, এক অখণ্ড সত্যের অধীন হইয়াছে।

কিন্তু ইহাতেও একটু গোল থাকিবার আশঙ্কা আছে, কারণ বর্ত্তমানে আমাদের দেশে 'বিশ্বমানব'-বাদ নামে এক অভিনব তত্ত্ব সুলভ কুলচুর-বিলাস ও অজ্ঞতামূলক প্রাজ্ঞতার পক্ষে বড়ই উপাদেয় হইয়া উঠিয়াছে। 'বিশ্বমানব' নামটার কোন দোষ নাই—বরং আমরা যে 'মানব'-তত্ত্বের আলোচনা করিতেছি, ঐ নাম তাহার খুবই উপযোগী; কিন্তু যে অর্থে উহার প্রয়োগ হইয়া থাকে তাহাতে 'ভাবের ঘরে চুরি' আছে। একজন প্রসিদ্ধ বাঙালী দার্শনিক পণ্ডিত বোধ হয় উহারই অনুবাদ করিয়াছেন—'Cosmic Man', যদিও তাহার অর্থ ঠিক রাখিয়াছেন। বিবেকানন্দের Humanity যে অর্থে Universal, সে অর্থে Particular-ই তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ ও পরিচয়; তাহাতে বৈচিত্র্যও যত বেশি, সেই একের মহিমাও তত প্রকট; 'অনেকে'র মধ্যেই সেই 'একে'র গভীরতর উপলব্ধি সম্ভব—বিশেষই নির্ব্বিশেষের নামাঙ্কিত পাদপীঠ। কিন্তু ঐ 'বিশ্বমানব'—সর্ব্ব-মানবের একটা পিণ্ডীভূত সত্তা, একটা বর্ণহীন রূপহীন ভাবনির্য্যাস মাত্র। বিবেকানন্দে ধ্যান-ধৃত যে বিশ্বমানব তাহা ইতিহাসের ধারায়, দেশ-কাল-পাত্রের নানা রূপে ও নানা অবস্থায় নিত্য-নব প্রকাশশীল; তাই অতি প্রাচীন হইতে অতি-আধুনিক পর্য্যন্ত মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতির সেই বিচিত্র ও বিশেষ প্রকাশ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ ও কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তিনি Universal-এর চক্ষে Particular-কে দেখিতেন না, Particular-এর মধ্যেই Universal-কে দেখিতেন। এই দেখার দুই একটি সহজ দৃষ্টান্ত দিব। ইটালি-ভ্রমণকালে রোমের প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন সকল তাঁহাকে যেমন অভিভূত করিয়াছিল, তেমনই, খ্রীষ্টীয় উপাসনা-মন্দিরের অভ্যন্তর-দৃশ্য ও উপাসনার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপ কিছুমাত্র বিজাতীয় বলিয়া মনে হয় নাই—"He was profoundly touched by the memories of the first Christians and martyrs in the Catacombs, and shared the tender veneration of the Italian people for the figures of the infant Christ and the Virgin Mother." তেমনই, একবার ইংলণ্ড যাত্রাকালে তাঁহার জাহাজ যখন জিব্রাল্টার প্রণালীতে প্রবেশ করিল, তখন, ঐখানে আফ্রিকা হইতে আরব-মূরগণের স্পেন-আক্রমণের সেই ঐতিহাসিক দৃশ্য মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি সেই মূরগণের সঙ্গীত 'দীন্ দীন্'-শব্দে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার একটি উক্তি বড়ই যথার্থ, তিনি লিখিয়াছেন—

"That which emerges most clearly is his 'universal sense'—he had hopes of democratic America, he was enthusiastic over the Italy of art, culture, and liberty. He spoke of China as the treasury of the world. He fraternised with the martyred Babists of Persia. He embraced in equal love the India of the Hindus, the Mahomedans and Buddhists. He was fired by the Moghul Empire."

তাঁহার জীবনচরিতকার (*Life of the Swami Vivekananda*, by His Disciples) লিখিয়াছেন—

"In Egypt he was specially interested in the Cairo Museum, and his mind often reverted, in all the vividness of his historic imagination, to the reigns of those Pharaohs who made Egypt mighty and a world-power in the days of old....And here in Egypt it seemed as if he were turning the last pages in the Book of Experience."

এই সকল হইতে বিবেকানন্দের "Universal Sense" যে কি অর্থে Universal তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। এই যে 'Book of Experience', ইহা কিসের 'experience'?—কোন্ মানুষের পরিচয়-কাহিনী? 'বিশ্বমানব' যদি একটা ভাবগত বস্তু হয়—বাস্তব মানব-সত্তা হইতে কতকগুলি সাধারণ মানবীয় গুণকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, সেইগুলির সমবায়ে গঠিত একটা নির্ব্বিশেষ আইডিয়াল বা মানস-বিগ্রহকে 'বিশ্বমানব' নাম দিয়া, যদি তাহারই পূজা করা হয়, তবে তাহা এই Universal মানুষ নয়,—যে মানুষ এক হইয়াও বহু,—যে মানুষ সর্ব্বত্র Concrete বা রূপময়। এজন্য ঐ 'বিশ্বমানব' নামটির অর্থবিভ্রাট নিবারণের জন্য আমি উহার নাম দিব 'মহামানব' এবং ইহার অর্থ আর একটু স্পষ্ট করিবার জন্য, ইহার একটা সাহিত্যিক ব্যাখ্যাও দিব।

৩

মহাকবি শেক্স্পীয়রের কবি-দৃষ্টিতে (কবিরও এই দৃষ্টির কথা আগে বলিয়াছি) এই Humanity বা মহামানবই কত অপরূপ রূপে ধরা দিয়াছিল। তাঁহার সৃষ্ট সেই ব্যষ্টি-মানবের অগণিত অনন্য-সদৃশ চরিত্ররাজিতে সেই এক মানুষই সর্ব্বময় হইয়া বিরাজ করিতেছে। পূর্ব্বোক্ত ইংরেজ কাব্যসমালোচক সেই কথাই বলিয়াছেন, যথা—

It was Shakespeare's prerogative to have the universal which is potential in each particular, opened out to him, the *homo generalis*, not as an abstraction from observation of a variety of men, but as the substance capable of endless modifications.

এই *home generalis*-ই সেই মহামানব—যাহা পিণ্ডীভূত সমষ্টির abstraction বা ভাবনির্য্যাস নয়, বরং এমন একটা বস্তু যাহার ব্যষ্টি-রূপের অন্ত নাই। তথাপি শেক্স্পীয়র particular-এর মধ্য দিয়াই সেই universal-এর উপলব্ধি

করিয়াছিলেন, কারণ, উহাই খাঁটি কবি-কল্পনার জ্ঞানযোগ ; এবং "whoever has a living grasp of this particular grasps the universal with it, knowing it either not at all, or long afterwards"। আমাদের রবীন্দ্রনাথেরও কবিজীবনের পূর্ণযৌবনে—particular হইতে universal নয়, universal হইতে particular-এ. তাঁহার কল্পনার আসক্তি লক্ষ্য করা যায় ; তাঁহার সুবিখ্যাত 'বসুন্ধরা' কবিতাটি তাহারই পরিচয় বহন করিতেছে। সেখানে কবি তাঁহার ব্যষ্টি-জীবন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াই, যাহা সর্ব্ববৈচিত্র্যের মূল উৎস—বিরাট প্রাণধারার সেই মূলাধার 'বসুন্ধরা'র নিমজ্জিত হইয়া, বহুত্বের—particular-এর রস আস্বাদন করিতে অধীর হইয়াছেন—

ওগো মা মৃন্ময়ি,
তোমার মৃত্তিকামাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই,
দিগ্বিদিকে আপনারে দিয়া বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মত।···
···শৈবালে শাদ্বলে তৃণে
শাখায় বল্কলে পত্রে উঠি সরসিয়া
নিগূঢ় জীবন-রসে।

তার পর—

ইচ্ছা করে মনে মনে
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্ব্বলোক সনে
দেশে দেশান্তরে। উষ্ট্রদুগ্ধ করি পান
মরুতে মানুষ হই আরব-সন্তান
দুর্দ্দম স্বাধীন। তিব্বতের গিরিতটে
নির্লিপ্ত প্রস্তরপুরীমাঝে, বৌদ্ধমঠে
করি বিচরণ। দ্রাক্ষাপায়ী পারসিক
গোলাপকাননবাসী, তাতার নির্ভীক
অশ্বারূঢ়, শিষ্টাচারী সতেজ জাপান
প্রবীণ প্রাচীন চীন নিশিদিনমান
কর্ম্ম-অনুরত ; সকলের ঘরে ঘরে
জন্মলাভ ক'রে লই হেন ইচ্ছা করে।

—কিন্তু এই ইচ্ছাও সেই দৃষ্টিসম্ভূত নয়, যাহাতে—"there are neither particulars or universals, abstracts or concretes"। ইহাতে universal এর চেতনাই প্রবল ও মুখ্য—ইহা সেই শেক্‌স্‌পীরীয় দৃষ্টি নয়। কিন্তু এই সঙ্গে শেলীর কাব্যমন্ত্রের

তুলনা করিলে আমাদের ঐ জগৎ-ব্রহ্ম-অভেদের তত্ত্ব আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। শেলীর কল্পনা খাঁটি বৈদান্তিক—সর্ব্বপ্রকার Concrete ও particular-এর বিরোধী। শেলীর আদর্শ 'মানুষ' সর্ব্ববন্ধন ও সর্ব্ব-উপাধিমুক্ত 'মানবাত্মা'—

> The loathsome mask has fallen, the man remains
> Sceptreless, free, uncircumscribed, but man
> Equal, unclassed, tribeless, and nationless,
> Exempt from awe, worship, degree, the king
> Over himself ; just, gentle, wise : but man
> Passionless ;

—এই গুণগুলি সব একত্র অবস্থান করার উপায় না থাকিলেও, পড়িতে পড়িতে মনে হয়, মানবাত্মার আদর্শ-হিসাবে ইহা চূড়ান্ত বটে ; ইহাকে বিবেকানন্দের আদর্শও বলা যায়, আবার আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদীর আদর্শও প্রায় এইরূপ বটে ; কিন্তু সৃষ্টি-সত্যের সহিত কোনরূপ বোঝাপড়া ইহাতে নাই—যাহা বিবেকানন্দের বাণীতে আছে ; ইহার জন্য অপর সম্প্রদায়ের কোন মাথাব্যথাই নাই, কারণ শেলীর যাহা আদর্শ তাহাই তাহাদের বাস্তব ; তাহাদের চিন্তাভিত্তিও শেলীর সম্পূর্ণ বিপরীত। শেলীর ঐ আদর্শ বাস্তব-নিরপেক্ষ হইলেও, শেলী বাস্তবের বাধাকে অস্বীকার করিতে পারেন না বলিয়াই তাঁহার আক্ষেপের অন্ত নাই। মানুষের দেহটাই তাহার আত্মার ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির একটা বড় বাঁধা ; 'Chance and death and mutability'-র নিয়তি-নিগড় যদি না থাকিত তাহা হইলে ঐ আত্মা—

> Might oversoar
> The loftiest star of unascended heaven,
> Pinnacled dim in the intense inane.

—এমন একটা ভাবনার প্রশ্রয় দিতে আধুনিক মহাবস্তুবাদীরা শিহরিয়া উঠিবে, যদিও, আত্মাহীন বস্তু যে-মানুষ, তাহার অধিকার ঘোষণায় শেলীর কবিতার ঐ বিশেষণগুলিকে অগ্রাহ্য করিবে না।

৪

সাহিত্যিক ব্যাখ্যা এই পর্য্যন্ত, এখন সেই 'বিশ্বমানব' ও এই 'মহামানব'-বাদের পার্থক্য-বিচার শেষ করিব। একটিতে দেহদশাধীন মানুষকে বাস্তব নিয়তি-নিয়মের বন্ধনে, বিশিষ্ট গুণে ও রূপে, নানা অবস্থায় দেখিবার প্রয়োজন রহিয়াছে ; অপরটিতে দেশকাল প্রভৃতির ঊর্দ্ধে তুলিয়া তাহার একটা ভাব-রূপের ধ্যান মাত্র আছে ; এজন্য এই অপরটিতে—বিশ্বমানবের ঐ মানস-বিগ্রহ-পূজায়—মানুষ হিসাবেই মানুষকে যে শ্রদ্ধা, তাহার প্রতি প্রেমের যে বাস্তব-অনুভূতি—সেই বিশেষের প্রীতি নাই। বিবেকানন্দের বাণী যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহার প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে দিয়াছি ; তিনি সকল জাতির সকল

মানুষকেই একথা abstract, তথা universal মানবতার আইডিয়াল দ্বারা বিচার করিতেন না; প্রত্যেক জাতির মধ্যে সেই মানবতার বিশিষ্ট বিকাশকে বুঝিতে চাহিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। উপরে মূরগণকর্ত্তৃক স্পেন-বিজয়ের একটি ঘটনা স্মরণ করিয়া বিবেকানন্দের যে ভাবোল্লাস হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছি—তাহার কারণ ইহাই। তিনি মূরগণের সেই ধর্ম্মোন্মাদ-প্রজ্জ্বলিত বীরত্ব-বহ্নিকে তাহাদের জাতিসুলভ একটা গুণের পরাকাষ্ঠা বলিয়া, তাহাতেও মানবতার একটি বিশিষ্ট প্রকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। একবার পরিব্রাজক-বেশে কাশ্মীরভ্রমণকালে পিপাসার্ত্ত হইয়া তিনি এক কৃষক-রমণীর কুটীরে জল চাহিয়াছিলেন; পিপাসানিবৃত্তির পর তিনি গৃহস্বামিনীকে প্রশ্ন করিলেন, 'মাঈ, তোমার ধর্ম্ম কি?' তাহাতে সে এমন কণ্ঠে উত্তর করিল, 'খোদাকে ধন্যবাদ—আমি মুসলমানী' যে, বিবেকানন্দ তাহাতে মুগ্ধ হইলেন; তাহার কণ্ঠে ও মুখে চক্ষে একটি শান্ত গভীর সাত্ত্বিক আবেগ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, সেই সরল ভক্তির অন্তরালে একটি খাঁটি ভারতীয় মনোভাব রহিয়াছে; সম্প্রদায় যাহাই হউক—রক্তের ভারতীয় সংস্কৃতি মুছিবার নয়। এখানেও সেই একই কারণে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

বিবেকানন্দের Humanism বা মানবপ্রীতিও যে কিরূপ তাহার দৃষ্টান্তও প্রচুর আছে। যেমন জাতি, যেমন সমাজই হউক—তিনি মানুষের অপমান সহ্য করিতে পারিতেন না। আমেরিকায় তাঁহার গাত্রবর্ণদৃষ্টে অনেকে তাঁহাকে নিগ্রো বলিয়া স্থির করিয়াছিল, সেজন্য পথেঘাটে তাঁহাকে অনেক অসুবিধাও সহ্য করিতে হইয়াছে। নিগ্রোগণও তাহা বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে বহু সম্মানে তাহাদের সমাজে আহ্বান করিয়াছে এবং তাঁহার খ্যাতিতে গর্ব্ব অনুভব করিয়াছে। তিনি একদিনের জন্য তাহাদের সেই ভুল ভাঙিয়া দেন নাই। কেহ কেহ এ বিষয়ে অনুযোগ করিলে তিনি সরোষে বলিয়াছিলেন, 'কি! আমি মানুষের মনুষ্যত্বের অপমান করিয়া নিজের মান বাড়াইব!" একবার কথাপ্রসঙ্গে কোন আদিম অসভ্য জাতির পাথর-পূজা সম্পর্কে একজন অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে, তাহাতেও বিবেকানন্দ ব্যথিত হইয়া সেই জাতির পক্ষ সমর্থন করেন; সেই জাতির অপরিণত জ্ঞানবুদ্ধির দিক দিয়া দেখিলে ঐরূপ আচরণ যে দূষ্য নয়, বরং উহাতে মানব-মনের শৈশব-সারল্যের এমন একটি কল্পনা ও বিশ্বাস-প্রবণতা প্রকাশ পাইতেছে যে, উহাও শ্রদ্ধার যোগ্য—এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা সত্যই বলিয়াছেন—

It was his love of Humanity, and his instinct on behalf of each in his own place, that gave to the Swami so clear an insight.

There was the perpetual study of caste, the constant examination and restatement of ideas; and above all, the vindication of Humanity, never

abandoned, never weakened, always rising to new heights of defence of the undefended, of chivalry for the weak. Our Master has come and he has gone, and in the priceless memory he has left with us who knew him, there is no other thing so great, as this his love of man.

মানুষের প্রতি এই শ্রদ্ধা, এই প্রেম—ইহার মূলে, কেবল একটা বিশাল হৃদয় নয়, একটা বিরাট সত্যোপলব্ধি ছিল; সেই সত্যও কোন শাস্ত্রবচন ভগবদ্বাণীর উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়: যে তত্ত্বের উপরে তাহা প্রতিষ্ঠিত মানুষের জ্ঞান তাহার ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে-না। আমি এতক্ষণ সেই তত্ত্বেরই আলোচনা করিয়াছি; সেই 'মহামানব'-বাদই মানুষের চিন্তার ইতিহাসে বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ ও মৌলিক দান। এ সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতার গ্রন্থে যে একটি অতি মূল্যবান সংবাদ লিপিবদ্ধ আছে, তাহা এই—

"Did Buddha teach that the many was real and the ego unreal, while Orthodox Hinduism regards the One as the Real, and the many as unreal?" he was asked. "Yes," answered the Swami, "And what Ramakrishna Paramahansa and I have added to this is, that the Many and the One are the same Reality, perceived by the same mind at different times and in different attitudes."

—আইনষ্টাইনের Theory of Relativity-র তখনও জন্ম হয় নাই—এখানে আধ্যাত্মিক প্রশ্ন-মীমাংসায়, এক বেদান্তবাদী সেই তত্ত্বের ঘোষণা করিতেছে!

৫

বিবেকানন্দের এই বাণী শুধুই নবযুগের বাংলার বাণী নয়—পৃথিবীতে যে নবযুগ আসন্ন হইয়াছে তাহারই বাণী। মানুষকে, মানুষের জীবনকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করা—বৈরাগ্যব্যাধিকে মানুষের মনের কোণ হইতেও দূর করিয়া, এই জগৎকেই মহাতীর্থভূমিতে পরিণত করার যে প্রয়াস ইদানীন্তনকালে নানা আকারে দেখা দিতেছে,—মানুষের শুধুই দুঃখ মোচন নয়, এই জীবনেই তাহাকে স্বমর্য্যাদা ও স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করার যে আকুল কামনা জাগিয়াছে, আমার মনে হয়, বিবেকানন্দই তাহার প্রথম প্রফেট বা প্রবক্তা। মানুষ যে পাপী নয়—তাঁহার গুরুর এই মহাশিক্ষায় প্রবুদ্ধ হইয়া, হিন্দুর সর্ব্বোচ্চ চিন্তার দ্বারা তাহাকে মণ্ডিত করিয়া, এবং নিজের পৌরুষ-বিশ্বাসের অসীমশক্তি তাহাতে যুক্ত করিয়া, তিনিই মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিত্রাণ-মন্ত্র প্রচার করিয়াছেন; মানুষকে এমন দৃষ্টিতে পূর্ব্বে আর কেহ দেখে নাই। তাঁহার সেই মন্ত্র এক অভিনব শক্তি-মন্ত্র, মানুষকেই আত্মার অনন্ত শক্তির আধার বলিয়া বিশ্বাস করার মন্ত্র। তিনি বলিতেন, "I have never quoted anything but the Upanishads, and of the Upanishads, it is that one idea, *strength*"। এই শক্তিও মানুষের প্রাপ্য বা সাধনলভ্য কিছু নয়; সে তাহার birthright, তাহার আত্মার জন্মগত অধিকার—প্রাপ্ত-প্রাপ্তির মত। অতএব এই শক্তিলাভ কালসাপেক্ষ নয়, কোনরূপ

শিক্ষার দ্বারা তাহাকে ধীরে জাগাইতে হয় না; চাই কেবল চরিত্র-বল—দৃঢ় সংকল্প, তাহাতেই দুর্ব্বলতার বন্ধনপাশ নিমেষে ছিন্ন হইয়া যাইবে। কবি শেলীর উক্তি যদি এই হয় যে, "Man has but to will it, and there shall be no evil in the world," তবে বিবেকানন্দের উক্তি হইবে, "জগতে যত দুঃখ যত অমঙ্গলই থাক, মানুষ যদি বলবান বীর্য্যবান হয়, তবে কিছুমাত্র বিচলিত হইবে না"। বিবেকানন্দের নিকটে এই শক্তির চেতনাই শ্রেষ্ঠজ্ঞান—অশক্তির নামই অজ্ঞান; এই শক্তি হইতেই যে প্রেমের জন্ম হয় তাহাতেই মানুষের মধ্যে দেবতার দর্শন হয়। কবিদের চিত্তেও আর এক পথে যখন সেই দিব্যজ্ঞানের উদয় হয় তখন তাঁহারাও তাঁহাদের ভাষায়, সেই দিব্য-দর্শনের আভাস দেন, সেও যেন এক একটি ঋক্‌মন্ত্রের মত—'the human face divine'; 'They seek no wonder but the human face', অথবা, 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'; তাহারই গভীরতর প্রেরণায় মানব-প্রেমিক সন্ন্যাসীও বলিয়া উঠেন—

"Above all I believe in my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races."

এই শেষের কথাগুলিতে মানুষের নামেই এ যুগের 'তারকব্রহ্ম নাম' রচিত হইয়াছে। অধুনা যে নূতন মানবকল্যাণবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তাহা যতই বিলক্ষণ বা বিসদৃশ হউক —জগদ্ব্যাপী যে অন্যায় ও অধর্ম্মের বিরুদ্ধে তাহার অভিযান, তাহার ঘোষণা এমন ভাবে পূর্ব্বে কেহ করে নাই। সেই সমস্যাকেই বিবেকানন্দ সর্ব্বোপরি স্থান দিয়াছিলেন, এবং ভারতীয় অধ্যাত্ম দৃষ্টি অনুযায়ী তাহার সমাধান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি এত গূঢ় ও ব্যাপক না হইলেও তাহাতে জড়তত্ত্বের আস্ফালন অপেক্ষা মানুষেরই মাহাত্ম্যবোধ ছিল—পূরা আধ্যাত্মিক না হইলেও তাহা অধ্যাত্মমুখী ছিল; তিনিও মানুষের মনুষ্যত্বের উৎকর্ষকেই সর্ব্ববিধ জাগতিক উন্নতির মূল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তথাপি, বঙ্কিমচন্দ্রের যাহা অতি গভীর ও আন্তরিক ভাবনার বিষয় ছিল, বিবেকানন্দ তাহার বাস্তব মূর্ত্তিকে আরও প্রত্যক্ষগোচর করিয়া, কেবল উপায়-নির্দ্দেশ নয়—প্রতিকারের জন্য একটা কর্ম্মযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন; তাহাই ছিল তাঁহার সকল বাণী ও সকল কর্ম্মের একমাত্র লক্ষ্য। সত্য বটে এই সমস্যার সমাধানকল্পে তিনি জগৎ ও জীবনের একটা পারমার্থিক মূল্যই স্বীকার করিয়াছিলেন, তথাপি তাহাতেও তিনি তাঁহার সেই দুর্দ্ধর্ষ অধ্যাত্মবাদকে মানবহিতবাদেরই অধীন করিয়াছিলেন। দুঃখকে স্বীকার করিলেও, তাহার দ্বারা মানুষের আত্মার পরাজয় যে অবশ্যম্ভাবী, ইহা তিনি স্বীকার করিতেন না। আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের মূলমন্ত্র তাহার বিপরীত; সে মন্ত্র যেমন একান্তভাবে আত্মধর্ম্মী, এ মন্ত্র তেমনই অনাত্মধর্ম্মী। ইহাতে মানুষমাত্রের বাস্তবদশা-নিরপেক্ষ কোন মাহাত্ম্যই স্বীকার্য্য নয়, এবং ভিতরের সাম্য

অপেক্ষা বাহিরের সমানাধিকারই সর্ব্বাগ্রে গণনীয়। দুঃখেরও কোন আধ্যাত্মিক সত্তা নাই, অর্থাৎ তাহার অনুভূতি হয় দেহে; উহাও সামাজিক কুব্যবস্থার ফলে ঘটিয়া থাকে; ঐ দুঃখ দর্শনে যে দুঃখবোধ হয় তাহাও মিথ্যা, তাহাও অসুস্থ দেহের স্নায়বিক ব্যাধি মাত্র, অথবা, প্রকারান্তরে একরূপ আত্মপূজা; এই 'আত্মা'ই সর্ব্ববিধ ভণ্ডামি ও প্রবঞ্চনার আবরণ ও আশ্রয়। অতএব এই তত্ত্ব ও ইহার প্রয়োগবিধি সম্পূর্ণ বিপরীত। তথাপি ইহার উল্লেখ করিলাম এইজন্য যে, সমস্যার নিদান ও তাহার চিকিৎসা যতই বিসদৃশ হউক, এই সমস্যাই এ যুগের প্রধান সমস্যা, এবং বিবেকানন্দের জ্ঞান প্রেম ও কর্ম্মমন্ত্রের মূল প্রেরণা ছিল ইহাই। আজিও ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় তথা সামাজিক মুক্তিসাধনার যিনি কর্ম্মগুরু—তাঁহার ধর্ম্ম যেমনই হউক, কর্ম্মমন্ত্র প্রায় অক্ষরে অক্ষরে বিবেকানন্দের এই বাণীমন্ত্রের অনুবাদ; ভারতবাসীর পক্ষে তাহা বিস্মৃত হওয়া বা অগ্রাহ্য করা অসম্ভব নয়, কিন্তু বাঙালীও যে তাহা ভুলিয়াছে, ইহাই আশ্চর্য্য! অতঃপর আমি বিবেকানন্দের কয়েকটি বাণী উদ্ধৃত করিব—তাহাদের ভাষা ইংরেজী, তথাপি সেই ভাষারও মূল্য আছে কারণ সেই ভাষাতেও বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের চিহ্ন এমন পরিস্ফুট হইয়াছে যে, বাংলা অনুবাদে তাহার কিছুই থাকিবে না। তথাপি অনুবাদের হয়তো প্রয়োজন আছে, কিন্তু উপস্থিত তাহার স্থানাভাব। বিবেকানন্দের ভাষার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহার সম্যক পরিচয় এইরূপ বিচ্ছিন্ন বাক্যসমষ্টিতে মিলিবে না, নতুবা, তাঁহার ইংরেজী বক্তৃতাগুলি পাঠ করিলে সকলেই মঃ রোলাঁর সহিত একমত হইবেন; তিনি স্বামিজীর ভাষার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

His words are great music, phrases in the style of Beethoven, stirring rhythms like the march of Handel choruses. I cannot touch these sayings of his...without receiving a thrill through my body like an electric shock. And what shocks, what transports must have been produced when in burning words they issued from the lips of the hero!

৬

[প্রথমেই বিবেকানন্দের এমন এক উক্তি উদ্ধৃত করিব, যাহাতে তাঁহার একটি অতিশয় মৌলিক চিন্তা ব্যক্ত হইয়াছে]

Oh how calm would be the work of one who really understood the divinity of man. For such there is nothing to do save to open men's eyes. All the rest does itself.

* * *

He who does not believe in himself is an athiest.

* * *

One may desire to see again the India of one's books, one's studies one's dreams. My hope is to see again the strong points of that India reinforced by the strong points of this age, only in a natural way. The

new state of things must be a *growth* from within (এই শেষের বাক্যটি আজিকার দিনে বিশেষ করিয়া প্রণিধানযোগ্য।)

* * *

And here is the test of truth—anything that makes you weak physically, intelectually and spiritually, reject as poison ; there is no life in it, it cannot be true.

* * *

Individuality is my motto, I have no ambition beyond training individuals.

* * *

No religion on earth preaches the dignity of humanity in such a lofty strain as Hinduism, and no religion on earth treads upon the necks of the poor and the low in such a fashion, as Hinduism. Religion is not at fault, but it is the Pharisees and Saducees.

* * *

If your brain and your heart come into conflict, follow your heart.

* * *

Man never progresses from error to truth, but from truth to truth.

* * *

The greatest men in the world have passed away unknown. Silently they live and silently they pass away ; and in time their thoughts find expression in Buddhas and Christs.

* * *

Fools put a garland of flowers around Thy neck, O Mother, and then start back in terror and call Thee 'The Merciful'. ("One realised the infinitely greater boldness and truth of the teaching that God manifests through evil *as well as* through good."—Sister Nivedita.)

* * *

The history of the world is the history of a few men who had faith in themselves, That faith calls out the Divinity within. As soon as a man or a nation loses faith in himself, death comes. Believe first in yourself, and then in God.

* * *

Europe is on the edge of a volcano. If the fire is not extinguished by a flood of spirituality, it will erupt.

* * *

The next upheaval that is to usher in another era, will come from Russia or from China. I cannot see clearly which, but it will be either the one or the other. (ইহার অর্থ এই নয় যে, অতঃপর পৃথিবীতে, তথাকথিত কম্যুনিজম্ জয়ী হইবে—রুশ জাতি এখনও তাহার সাধনা শেষ করে নাই।)

* * *

As I grow older, I find that I look more and more for greatness in little things...Anyone will be great in a great position, even the coward will grow brave in the glare of the footlights. The true greatness

seems to me that of the worm doing its duty silently, steadily from moment to moment and hour to hour.

* * *

Everything seems to me to lie in manliness. This is my new gospel Do even evil like a man! Be wicked, if you must, on a great scale!

* * *

A strong and true type is always the physical basis of the horizon It is all very well to talk of universalism, but the world will not be ready for that for millions of years.

* * *

[সর্ব্বশেষে আমি একটি অপূর্ব্ব কবিতা উদ্ধৃত করিলাম—শুধু বাণী নয়, কাব্য-হিসাবেও ইহা অনবদ্য]

Awake, arise and dream no more!
This is the land of dreams, where Karma
Weaves unthreaded garlands with our thoughts,
Of flowers sweet or noxious,—and none
Has root or stem, being born in naught, which
The softest breath of Truth drives back to
Primal nothingness. Be bold and face
The Truth! Be one with it! Let visions cease.
Or, if you cannot, dream but truer dreams,
Which are Eternal Love and Service Free.

ক্রমশ

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

গৃহিণীর স্বপ্ন

পঞ্চাশ বৎসর বয়সে গৃহিণীর জীবনে একটা অঘটন ঘটিল। আজ একুশ দিন হইল, গৃহিণী শয্যাগতা। শৈশবে একবার নাকি তাঁহার ভয়ানক জ্বর হইয়াছিল, কিন্তু সেসব এখন রূপকথার ন্যায় মনে হয়। চারিটি সন্তানের মা হইয়াছেন, কিন্তু কখনও অসুস্থা হন নাই। শীতই হউক আর গ্রীষ্মই হউক, ঘড়িতে চারিটা বাজিতে না বাজিতে গৃহিণী শয্যাত্যাগ করেন, প্রথমেই প্রাতঃস্নান সমাপন করিয়া ঠাকুরঘরে প্রবেশ করেন। মিনিট পনরো পরে বাহির হইয়া ইলেকট্রিক বাতি জ্বালাইয়া তরকারি কুটিতে বসেন। কবে যেন কোন্ শাস্ত্রে পাঠ করিয়াছিলেন, পরিপাটিরূপে সংসারধর্ম্ম পালন করিলেই নারীজাতির দেবপূজা হইল; সেই হইতে সংসারপূজা করিয়াই তিনি দেবপূজার ত্রুটি সারিয়া লইতেছেন।

তরকারি কোটা সম্পন্ন হইলে গৃহিণী রন্ধনঘরে প্রবেশ করেন। ছেলেদের তরকারিতে পেঁয়াজ পড়িবে, কর্ত্তার তরকারিতে পেঁয়াজ পড়িবে না, মেয়েদের মাছে খুব ঝাল দিতে হইবে, ছেলেদের মাছে ঝাল পড়িবে না, ছোট ছেলের তরকারিতে বেগুন পড়িলে অনর্থ হইবে, আর ছোট মেয়ের তরকারিতে লাউ—পাচক-ঠাকুরটি পাঁচ বৎসর এ বাড়িতে কাজ করিয়াও রন্ধনের পাঠটি এখনও কণ্ঠস্থ করিয়া উঠিতে পারে নাই;

গৃহিণী চক্ষের আড়াল হইলেই সে অন্ধকার দেখে। বেলা একটার সময় কর্ত্তা এবং ছেলেদের খাওয়া হইয়া গেলে মেয়ে ও বউকে লইয়া গৃহিণী খাইতে বসেন। বড় বড় মাছগুলি সকলকে দিয়া গৃহিণীর ভাগে কিছুই থাকে না। বউ বলে, এ কি অন্যায় মা! আমাদের দিলেন এতগুলো মাছ, আর আপনার ভাগে কিছুই রইল না? গৃহিণী বলেন, মাছে বড় অরুচি ধ'রে গেছে, বুড়ো হয়েছি কিনা, ভাল লাগে না। বুড়া কিন্তু গৃহিণী হন নাই, মাথার চুল অধিকাংশই ঘন কৃষ্ণবর্ণ, নজর না দিলে পাকা চুল চোখে পড়ে না, পঞ্চাশ বৎসর বয়স্কা গৃহিণীর একটিও দাঁত পড়ে নাই। সারা দুপুর রোদে ব'সয়া বড়ি দিতে, এ ঘরের ভারী জিনিস ও ঘরে টানিয়া লইতে, গৃহিণীর এতটুকু কষ্ট হয় না।

এ-হেন গৃহিণী আজ একুশ দিন ধরিয়া শয্যাগতা। প্রথম কয়েকদিন দেহের উত্তাপ বিপজ্জনকভাবে বাড়িতেই চোখ লাল করিয়া ত্রস্তে গৃহিণী উঠিয়া ব'সলেন, এই যা! মটরডালের বড়ির সঙ্গে মুসুরডালের বড়ি মিশিয়ে ফেললে কে? ও বউমা! ওলটা যে শুকিয়ে গেল। গম্ভীর মুখে সকলে মিলিয়া তাঁহাকে শোয়াইয়া দিল।

আজও গৃহিণী শুইয়া আছেন, গত কুড়ি দিন পর কাল রাত্রে জ্বরের তাপ স্বাভাবিক হইয়াছে, দেহের অস্বস্তি-ভাব কাটিয়াছে; চোখ বুজিয়া ললাটের উপর একটা শিথিল বাহু রাখিয়া গৃহিণী শুইয়া আছেন।

নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া দুই মেয়ে প্রবেশ করিল। গৃহিণী চোখ খুলিয়া সেই দিকে চাহিলেন। মেয়েরা কাছে আসিল, মায়ের কপালে করস্পর্শ করিয়া কহিল, না, জ্বর নেই, আর একটু ঘুমোলে না কেন মা? শ্রান্ত দুই চোখ টানিয়া টানিয়া গৃহিণী কহিলেন, আর কত ঘুমোব, একুশ দিন ধ'রে তো খালি ঘুমোচ্ছি। ছোট মেয়ে রমা কহিল, কি স্বপ্ন দেখছিলে মা, চমকে উঠছিলে? রান্নাঘরের মাছ বেরালে খেয়ে গেল? না, বাঁদরে তোমার বড়ি নিয়ে উধাও হ'ল? মায়ের ঘরে কণ্ঠস্বর শুনিয়া ছোট ছেলে ছুটিয়া আসিল, মাকে আবার কে জাগালে, অ্যাঁ? দুর্ব্বল বাহু দিয়া গৃহিণী ছোট ছেলের বলিষ্ঠ হাতটা ধরিলেন, আমায় তো কেউ জাগায় নি, আমি তো জেগেই ছিলাম। ছেলে কহিল, হ্যাঁ, ঠিক কথা। এইবার উঠে রান্নাঘরে ছোট, তারপর পঞ্চ ব্যাঞ্জন রেঁধে পুত্রকন্যাকে—। বাধা দিয়া রমা কহিল, হ্যাঁ মা, জান তো? ডাক্তারবাবু ব'লে গিয়েছেন, সাত দিন তুমি বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না, আর চোদ্দ দিন তুমি রান্নাঘরে যেতে পাবে না। একটা রেকাবিতে কিছু ফল লইয়া বড় বধূ প্রবেশ করিল, ওষুধটা কি খেয়েছেন মা? তা হ'লে এই ফলটুকু এখুনি খেয়ে নিন। ছোট ছেলের হাত হইতে ঔষধ লইয়া গৃহিণী চক্ষু বুজিয়া খাইয়া ফেলিলেন, তাহার পর একটা ফল মুখে দিয়া বিকৃত মুখে কহিলেন, ফল আর কত খাব বাছা, একেবারে অরুচি ধ'রে গেছে, কুড়ি দিন ধ'রে তো এই গিলছি, মুখটা ভারী বিস্বাদ লাগছে। ছোট ছেলে চীৎকার করিয়া কহিল, উঁহু উঁহু, ওসব হচ্ছে না, দু ঘণ্টা পর পর তোমায় ফল খেতে হবে। এই বউদি, দাও তো আঙুরগুলো আমার হাতে।

ওপাশের দরজার কাছে খুট করিয়া শব্দ হইল—প্রথম একটি ছোট হাত, তাহার পর একটি ছোট্ট দেহ বাহির হইয়া আসিল। বড় ছেলের কনিষ্ঠ পুত্র নোটন। বড় চুপে চুপে নোটন আসিয়াছিল, ভাবিয়াছিল, গৃহিণীর ঘরে বুঝি কেহ নাই, এখন এতগুলি লোক দেখিয়া অত্যন্ত ভীত চক্ষে থমকিয়া দাঁড়াইল এবং পরক্ষণেই মুষ্টিবদ্ধ ডান হাতটা পিছন দিকে লুকাইল। বড়বধূ ফল রাখিয়া ত্রস্তে ছুটিয়া আসিল। ও মা! খেতে খেতে উঠে এসেছে, কি দস্যি ছেলে বাবা! ছুঁস নি, ছুঁস নি, এঁটো মুখে ঠাকুমাকে ছুঁস নি। নোটন কাহাকেও ছুঁইল না, কেবল ডান হাতটা আরও ভাল করিয়া লুকাইয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল। গৃহিণীর কনিষ্ঠ পুত্র হাবল এইবার খাট হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে নোটনের কাছে গিয়া বলিল, ও সোনা! সোনা! বলি তোমার ও ডান হাতখানাতে কি সোনা? দৃপ্তকণ্ঠে নোটন কহিল, তোমার জন্যে নয়, কখনও তোমার জন্যে নয়, ঠাক্‌মার জন্যে। বড় বধূ কহিল, ঠাকুরপো, ওকে ধ'রে দিয়ে এস না ভজুয়ার কাছে, হাত-মুখ ধুইয়ে দেবে। নোটন এই কথা শুনিয়া তাহাকে ধরার অপেক্ষা না রাখিয়াই পিছন ফিরিয়া ছুট দিল, কিন্তু তাড়াহুড়াতে এত যত্নের জিনিস হাত হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল, কয়েকটা চিংড়িমাছের ঠ্যাং। রমা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, ও মা দেখেছ? নোটন তোমার জন্যে চিংড়িমাছের ঠ্যাং এনেছিল। বড় বউ হাসিতে হাসিতে কহিল, ওঃ, তাই তো! আজ ভাত খাচ্ছে আর বলছে, মা, ঠাক্‌মা চিংড়িমাছও খেতে পাবে না, কিছুই খেতে পাবে না, খালি শুয়ে শুয়ে ওষুধ খাবে? গৃহিণীও হাসিলেন, ফলগুলি খাইতে খাইতে ব'ললেন, যাও বউমা, তুমি ও পাগলাটাকে দেখগে। হাবল, রমা সবাই রয়েছে, তুমি যাও। বড়বউ চলিয়া গেলে গৃহিণী বড় মেয়েকে প্রশ্ন করিলেন, আজ চিংড়ি পেলি কি ক'রে? বড় মেয়ে কহিল, সত্যি, আশ্চর্য্য মা! আজ এত বছর এ পোড়া দেশে এসেছি, চিংড়ির মুখ কখনও দেখি নি, কাল একটা লোক নিয়ে এসেছিল, বিশ্বাস করবে না, এই প্রকাণ্ড, তিনটেতে এক সের হ'ল। আমি বলছিলুম, আহা! মা ভাল থাকলে নিজে আজ রাঁধতে বসতেন। ধীরে ধীরে গৃহিণী বলিলেন, ঠাকুর সব ঠিকমত রাঁধতে পেরেছে তো? বড় মেয়ে কহিল, বড্ড দেরিতে মাছ এল মা। রাঁধতে রাঁধতেই দাদার খাওয়ার সময় হয়ে গেল, দেরি হ'লে বাবাও রাগ করবেন; মুড়ো আর ঠাকুর ভেজে দিতে পারলে না; দাদাই খেতে পেলে না মুড়ো ভাজা, তাই আমি বললাম, কারুরই খেয়ে কাজ নেই, ভেজে রেখে দাও, ওবেলা খাওয়া হবে। সেই ছোটবেলায় মুড়ো ভাজা নিয়ে দাদা আমার সঙ্গে কি রকম ঝগড়া করত, মনে আছে মা? রান্নাঘরের দিক হইতে ডাক আসিল, বড়দিদি, ছোটদিদি, আপনারা সব খেয়ে যান। ছেলে-মেয়েরা সকলে উঠিল। ছেলে কহিল, দিদি, রান্নাঘরের দিকের দরজাটা বন্ধ ক'রে যেও, নইলে দুপুরে মা গিয়ে চিংড়ি রাঁধতে বসবেন। মেয়েরা হাসিতে হাসিতে খাইতে গেল। ফলগুলি সব খাওয়া হয় নাই, গৃহিণী বিরক্ত মুখে ফলের পাত্রটা এক ধারে

সরাইয়া রাখিলেন, আজ একুশ দিন ধরিয়া গৃহিণী কেবল এই খাইতেছেন, ফলের পর ঔষধ, ঔষধের পর ফল।

মধ্যাহ্নের আহার সমাপ্ত করিয়া নাকের ডগায় চশমাটি বসাইয়া, খবরের কাগজ হাতে লইয়া কর্ত্তা প্রবেশ করিলেন। রোজ কর্ত্তা এই সময়টিতে আসেন, ক্ষীণকণ্ঠে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিয়া গৃহিণী বলেন, খাওয়া হ'ল? অতিরিক্ত আহারজনিত একটা শব্দ করিয়া কর্ত্তা বলেন, হ্যাঁ, বড় গুরুভোজন হয়ে গেছে। জ্বরতপ্ত মুখে গৃহিণী একটু তৃপ্তির হাসি হাসেন। আবার বলেন, তোমায় যেন বড় রোগা দেখাচ্ছে, স্বর্ণসিন্দুর, মকরধ্বজ বড় বউমা সব দিচ্ছে তো ঠিক ঠিক? কর্ত্তা মাথা হেলাইয়া বলেন, হ্যাঁ, সব ঠিক। গৃহিণী চুপ করেন। এবার কর্ত্তা প্রশ্ন করেন, তোমার জ্বরটা কি এখন একটু কম মনে হচ্ছে? জ্বর কিন্তু এ সময়ে বাড়ে। গৃহিণী বলেন, হ্যাঁ, বেশ কম মনে হচ্ছে। কর্ত্তা বলেন, মাথার যন্ত্রণাটা? গৃহিণীর মাথায় এই সময় হাতুড়ি-পেটা চলে। বলেন, হ্যাঁ, যন্ত্রণাটা আর নেই। কর্ত্তা তৃপ্ত মুখে নাকের ডগায় চশমাটা আর একবার ঠিক করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া যান।

আজও কর্ত্তা আসিলেন. গৃহিণী শুইয়া আছেন, নড়িলেন না। এই সময় গৃহিণী কখনও ঘুমান না। কর্ত্তা অবাক হইয়া গৃহিণীর কপালে হাত দিলেন,—আজ সত্যই জ্বর নাই। গৃহিণী তবুও কোন কথা বলিলেন না। কর্ত্তা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

মেয়েদের যাওয়ার পর সকলেই এক-একবার মাকে দেখিয়া গেল। মা অঘোরে ঘুমাইতেছেন। ছোট ছেলে এক ঘণ্টা কলেজ ফাঁকি দিয়া, ফল লইয়া মাকে ঔষধ খাওয়াইতে আসিয়াছিল, এ-ঘর ও-ঘর করিয়া সেও চলিয়া গেল। তাহার পর রান্নাঘরে ভৃত্যদের কণ্ঠস্বর শোনা গেল কিছুক্ষণ, তারপর বাসন মাজার ঠুংঠাং শব্দ, অবশেষে সব চুপ। গ্রীষ্মের শ্রান্ত মধ্যাহ্নের প্রশান্তিতে সকল কোলাহলের অবসান হইল।

গৃহিণী এতক্ষণ শুইয়া ছিলেন, ললাটের উপর দুর্ব্বল বাহু রাখিয়া ঠিক একই ভাবে শুইয়া ছিলেন। এইবার গৃহিণী উঠিলেন, খাটের বাজুর উপর বাহুতে ভর দিয়া, গৃহিণী নামিলেন। না, বেশ জোর পাইতেছেন দেহে। গৃহিণীর শুইবার ঘরের পিছনে ভাঁড়ার, তাহার পর রান্নাঘর। ভাঁড়ারঘরের দরজা এদিক হইতে খোলা ছিল, পা টিপিয়া টিপিয়া ভাঁড়ার পার হইয়া গৃহিণী রান্নাঘরের দরজা খুলিলেন। উনুন নিবানো রহিয়াছে, এক পাশে জালের বড় আলমারির ভিতর অনেক কিছু দেখা যাইতেছে। গৃহিণী আলমারি খুলিলেন, একটি বড় থালা চিংড়িমাছের মুড়া ভাজায় ভরিয়া উঠিয়াছে। গৃহিণী ক্ষিপ্র দৃষ্টিতে একবার এদিক চাহিলেন. ওদিক চাহিলেন, তাহার পর একটি মুড়া লইয়া, চক্ষু বুজিয়া মুখে পুরিলেন।

একুশ দিন জ্বরের পর পঞ্চাশ বৎসর বয়স্কা গৃহিণী আজ সারা দুপুর চিংড়িমাছের মুড়ার স্বপ্ন দেখিয়াছেন।

শ্রীঅলক রায়

সপ্তর্ষি

এক

হংস-শুভ্র

ক

শ্রীযুক্ত হংস-শুভ্র মুখোপাধ্যায় চিঠিখানা পেয়ে একটু বিরক্তই হয়েছিলেন। বিরক্ত হ'লে তিনি গম্ভীর হবার চেষ্টা করেন। বিরক্তি প্রকাশ করাটা, তাঁর মতে, হার-স্বীকার করারই নামান্তর। কার সাধ্য তাঁকে বিচলিত করতে পারে? তাঁকে, যাঁকে মহাকালের নিষ্ঠুর প্রহার পর্য্যন্ত একচুল বিচলিত করতে পারে নি, তিন-তিনজন উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু যিনি গম্ভীরভাবে সহ্য করেছেন—এক ফোঁটা চোখের জল না ফেলে, এত বড় পরিবারের এত বিভিন্ন রকম বিপর্য্যয় যিনি অবিচলিত হয়ে সহ্য করছেন, ধৈর্য্য হারান নি ক্ষণকালের জন্য, সারা জীবনের আদর্শ চোখের সামনে ভেঙে খানখান হয়ে গিয়েও যাঁকে কাবু করতে পারে নি—হঠাৎ কুন্দর মুখখানা মনে পড়ল তাঁর, গড়গড়ার ডাক বন্ধ হয়ে গেল, গম্ভীরভাবে হাঁটু দোলাতে লাগলেন তিনি।

সত্যি, বেশ বড় পরিবার তাঁর—এ অঞ্চলে শুভ্র-পরিবার নামে খ্যাত। পিতামহ যোগীশ্বর মুখোপাধ্যায় শুদ্ধ শান্ত আধ্যাত্মিক প্রকৃতির লোক ছিলেন ব'লেই বোধ হয় একমাত্র পুত্রের নাম রেখেছিলেন শিব-শুভ্র। তারপর থেকেই এ বংশে সকলের নামের সঙ্গে 'শুভ্র' শব্দটি যুক্ত হয়ে আসছে, এমন কি মেয়েদের নামের সঙ্গেও আ-কার যোগ দিয়ে—কুন্দ-শুভ্রা, ইন্দু-শুভ্রা, শুক্তি-শুভ্রা, মুক্তা-শুভ্রা ইত্যাদি।

শিব-শুভ্র ভদ্রলোক ছিলেন যদিও, কিন্তু ঠিক শিব-প্রকৃতির ছিলেন না। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তিনি মৃত্যুকালে নগদ বিশ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি তাঁর দুই পুত্র হংস-শুভ্র ও সোম-শুভ্রকে দিয়ে গিয়েছিলেন। আধ্যাত্মিক যোগীশ্বরের পুত্র কি উপায়ে এত বড় সম্পত্তি হস্তগত করলেন তার ইতিহাস এ কাহিনীর পক্ষে অবান্তর, এইটুকু শুধু সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, ইংরেজ-শাসনের প্রথম আমলে যেসব কৃতী পুরুষ এ দেশের জনসাধারণের সঙ্গে ইংরেজ-শাসনের যোগ স্থাপনের মধ্যবর্ত্তিতা ক'রে লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন, তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র, হংস এবং সোম, সে-যুগের লক্ষ্মী-সরস্বতীর সে-যুগীয় প্রভাব পেয়েছিলেন পূর্ণমাত্রায়। সাহেব মাস্টারের কাছে সাহেবী কেতায় কেবল ইংরেজী লেখাপড়াই শেখেন নি, পণ্ডিতের কাছে

শিখেছিলেন সংস্কৃত, ওস্তাদের কাছে শিখেছিলেন গান-বাজনা, পালোয়ানের কাছে শিখেছিলেন কুস্তি, গুরুজনদের কাছে শিখেছিলেন সহবৎ এবং সে-যুগের 'ইয়ংবেঙ্গল'দের সাহচর্য্যে শিখেছিলেন সে-যুগের রাজনীতি-চর্চ্চা। এই শেষোক্ত ব্যাপারটা হংস-শুভ্রকেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তখনকার কৃষ্ণদাস পাল, আনন্দমোহন বসু, সুরেন বাঁড়ুজ্যেরা যে রাজনৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিলেন, তার প্রভাব হংস-শুভ্র এড়াতে পারেন নি। কিশোর বয়স থেকেই তাঁর মন এসব ব্যাপারে সাড়া দিত। আই. সি. এস. সুরেন বাঁড়ুজ্যের যখন চাকরি গেল (আইনত যদিও সেটা তাঁর নিজের ত্রুটির জন্যই), তখন তা নিয়ে শিক্ষিত বাঙালী-সমাজে যে ক্ষোভ মথিত হয়ে উঠেছিল, কিশোর হংস-শুভ্রের মনেও ছাপ পড়েছিল তার। সেই অল্প বয়সেই তিনি বুঝেছিলেন যে,'যে অপরাধে সুরেন্দ্রনাথের চাকরি গেল সে অপরাধ হামেশাই সকলে ক'রে থাকে, তিনি শাস্তি পেলেন স্বাধীনচেতা বাঙালী ব'লে। কিন্তু এ নিয়ে আইন-সঙ্গত আন্দোলন ক'রেও যখন কোন ফল হ'ল না, তখন হংস-শুভ্রের মনে ধারণা হয়েছিল যে, দোষটা বোধ হয় সুরেনবাবুরই বেশি, কারণ বিলেতের সাহেবরাও যখন সব শুনে এর কোন প্রতিকার করলেন না, এমন কি ব্যারিস্টারি পড়বারও অনুমতি দিলেন না তাঁকে, তখন অপরাধটা লঘু নয় নিশ্চয়ই। সাহেবদের মহত্ত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হবার কল্পনাই কেউ করত না তখন। পরে এই সুরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কে এসে—(তাঁর কাছে ফ্রী চার্চ কলেজে প'ড়েই-ছিলেন তিনি)—তাঁর বাগ্মিতা-বিদ্যাবত্তা-স্বদেশপ্রাণতার যে পরিচয় পেয়েছিলেন, তা আজও যদিও তাঁর জীবনের অক্ষয় সম্পদ হয়ে আছে, কিন্তু একজন খাঁটি সাহেবের তুলনায় যে তিনি নিম্নতর স্তরের জীব এ বোধের জন্য লজ্জিত হন নি তিনি তখন, কারণ দেবতার সঙ্গে মানুষের তুলনায় দেবতাকে উচ্চতর স্থান দিতে কারও লজ্জা হয় না। সদ্য-আগত পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যে সকলেই মুগ্ধ তখন। তখন রামগোপাল, রাধানাথ, রসিকমোহনরাই সকলের আদর্শ। বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মত লোকেরাও পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণগানে পঞ্চমুখ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রদীপ্ত প্রতিভায় জ্বলছেন। বঙ্কিমচন্দ্র উদীয়মান। রাধাকান্ত দেব, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের দল শিক্ষিত-সমাজে উপহাসেরই খোরাক যোগাতেন তখন। স্বয়ং সুরেনবাবুই মনে-প্রাণে সাহেব ছিলেন, তাঁর বন্ধু রমেশ দত্ত, আনন্দমোহন বসুও। তখনকার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত-সমাজের উন্মুখ মনোবৃত্তিকে রূপ দেবার জন্যে সুরেন্দ্রনাথ যে

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত করেছিলেন, তাতেও যেসব বক্তৃতা হ'ত তা ইংরেজী কেতায় ইংরেজী ভাষায়। তখনকার দেশ-প্রেমের নিদর্শন ছিলেন রাণা প্রতাপ নয়, ম্যাৎসিনি। তাঁর বিপ্লববাদকে গ্রহণ করবার কল্পনাও কেউ করত না অবশ্য—তাঁর স্বদেশ-প্রেম, তাঁর আত্মত্যাগ নিয়েই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত তখন সবাই।

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন ব'লেই তাঁরা যে প্রত্যেকে ইংরেজের দাসখৎ-লেখা গোলাম ছিলেন, ঠিক তা নয়। বস্তুত একটা জাগরণের সাড়াই জেগেছিল তখন দেশে—প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহের আতপ্ত আবহাওয়ায় একটা অস্পষ্ট অধীরতাই যেন অনুভব করছিল সকলে এবং ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশও ক'রে ফেলছিল তা। সিভিল সার্ভিস মেমোরিয়েলের উত্তেজনাটা আজও ভোলেন নি হংস-শুভ্র। মারকুইস্ অব স্যালিস্‌বেরি আই. সি. এস. পরীক্ষা দেবার বয়স বাইশ থেকে কমিয়ে উনিশ ক'রে দিয়েছিলেন কেবল ভারতীয়দের জন্য। তখনকার কালে প্রধান রাজনৈতিক আন্দোলনই ছিল—রাজসরকারে অধিক-সংখ্যক চাকরি পাবার জন্যে আবেদন-নিবেদন করা। স্যালিস্‌বেরির এই ব্যবহারে দেশের লোক ক্ষেপে উঠলেন যেন। সিভিল-সার্ভিস-বিতাড়িত সুরেন্দ্রনাথ এই সিভিল সার্ভিস মেমোরিয়েলকে দেশ-ব্যাপী আন্দোলন ক'রে তুললেন। কংগ্রেস হবার বহুপূর্ব্বে এই আন্দোলনেই সর্ব্বপ্রথম নিখিল-ভারতের সঙ্ঘবদ্ধ জাতীয়তা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল সুরেন্দ্রনাথের প্রেরণায়। সেই সূত্রে হংস-শুভ্র প্রথমে নাম শুনেছিলেন পাঞ্জাবের দয়াল সিং মাঝিঠিয়ার, পণ্ডিত রামনারায়ণের, ডাক্তার সুরযবলের, উকিল কালীপ্রসন্ন রায়ের। সেদিনকার সার্ সৈয়দ আহমদ, পণ্ডিত অযোধ্যানাথ, পণ্ডিত বিশ্বম্ভরনাথ, রাজা আমীর হোসেন, বাবু ঐশ্বর্য্যনারায়ণ, বাবু হরিশ্চন্দ্র, রামকালী চৌধুরী, বিশ্বনারায়ণ মাণ্ডলিক, কাশীনাথ তেলাং, ফিরোজ শা মেটা, রাণাডেকে এখনও দেশের লোক মনে ক'রে রেখেছে কি না হংস-শুভ্র জানেন না, কিন্তু তখন এঁরাই ছিলেন দেশের অগ্রণী এবং এঁরা সবাই সেদিন বাঙালী সুরেন্দ্রনাথকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে যে ভাবে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন, তা হংস-শুভ্রের অন্তরে আজও স্পন্দন তোলে। আজকালকার বাঙালী-বেহারী হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মত কুৎসিত জিনিস তখনকার দিনে ছিল না—সার্ সৈয়দ আহমদ যদিও মুসলমান-সম্প্রদায়েরই মুখপাত্র ছিলেন এবং বিশেষ ক'রে মুসলমানদেরই উন্নতির জন্যে চেষ্টা করতেন, তবু তিনি সিভিল সার্ভিস মেমোরিয়েলে সই করেছিলেন।

জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলেই প্রতিবাদ করেছিল ভারতীয়দের প্রতি এই অবিচারের। এই সিভিল সার্ভিস আন্দোলন ভারতেই নিবদ্ধ থাকে নি কেবল। লালমোহন ঘোষ এ নিয়ে বিলেত পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন। টাকা দিয়েছিলেন মহারাণী স্বর্ণময়ী। বৃটিশ গভর্মেণ্ট দেশের দাবি মেনে নিয়ে উনিশ বছর কেটে যখন বাইশ বছর করলেন, তখন ইংরেজদের ন্যায়পরতায় ওপর বিশ্বাস আরও অগাধ হয়ে উঠল সকলের। ভারতবর্ষের সঙ্ঘবদ্ধ শিক্ষিত-সমাজের প্রথম বাঙ্ময় বিদ্রোহ যে কর্ত্তৃপক্ষের ভাল লাগে নি, তার প্রমাণ মিলল অবশ্য কিছুদিন পরেই। স্যালিস্‌বেরি কিছুদিন পরেই পাঠালেন লর্ড লিটনকে, দুটি সংঘাতিক 'অ্যাক্ট' তাঁর হাতে দিয়ে—ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট এবং আর্ম্‌স অ্যাক্ট। 'সাধারণী' 'সমাজ দর্পণ' 'সোমপ্রকাশ' 'হিন্দু হিতৈষিণী' উঠে গেল। পুলিস সবার হাত থেকে হাতিয়ার কেড়ে নিলে। হংস-শুভ্রের বাড়িতে যতগুলো বন্দুক, সড়কি, বল্লম ছিল সমস্ত বাজেয়াপ্ত হ'ল। দেশী ইংরেজী কাগজগুলোতে কড়া-মিঠে মন্তব্য প্রকাশিত হতে লাগল। হতভম্ব হয়ে পড়ল যেন সবাই। কিন্তু দেশের শিক্ষিত-সমাজের মনে ইংরেজ-ভক্তি তখনও অটুট। হংস-শুভ্রেরও মনে হ'ল যে, যে-ইংরেজ সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে ওয়ারেন হেষ্টিংসকে প্রকাশ্য ধর্ম্মাধিকরণে অভিযুক্ত করতে দ্বিধা করে নি, তারা নিশ্চয়ই অকারণে ভারতবাসীকে এমন নিরস্ত্র ও নির্ব্বাক ক'রে রাখবে না। নিশ্চয়ই ভেতরে কোন একটা কারণ আছে, হয়তো আফগান যুদ্ধ, হয়তো দাক্ষিণাত্যের কৃষক-বিদ্রোহ বা ওই রকম একটা কিছু। ওপরে 'মুভ' করলেই যথাকালে সব ঠিক হয়ে যাবে। 'মুভ' করাও হ'ল। এই সময়ে একটা বিষয়ে তাঁর খটকা লেগেছিল, দেশের জমিদার-সম্প্রদায় এ বিষয়ে কেউ টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করলেন না। জমিদারদের বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন একেবারে চুপ। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর গভর্মেণ্টের পক্ষে ভোট দিয়ে এলেন। কাউন্সিলে তখন জনসাধারণের ভোট নিয়ে সভ্য নির্ব্বাচিত হ'ত না, গভর্মেণ্ট যাঁকে মনোনীত করতেন তিনিই সভ্য হতেন। এ রকম সভ্য যে কর্ত্তৃপক্ষের বিরোধিতা করবেন, এ আশা দুরাশা হ'লেও, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ব্যবহারে দুঃখিত হয়েছিলেন তিনি। বিরোধিতা করেছিলেন রেভারেণ্ড কে. এম. ব্যানার্জি। হংস-শুভ্রের কাছে ওই খ্রীষ্টান ভদ্রলোকটি আজও পূজ্য হয়ে আছেন। তাঁর মত ইংরেজী-নবিস অথচ ভারতীয়, তাঁর মত স্পষ্টবক্তা অথচ মিষ্টভাষী, তাঁর মত বিধর্ম্মী অথচ ধর্ম্মপ্রাণ লোক আজকাল বড় একটা চোখে পড়ে না হংস-শুভ্রের। তখন

যদিও পলিটিকাল সভা রাজদ্রোহসূচক ব'লে গণ্য হ'ত না, তবু ইনি এবং কেচারেও ম্যাক্‌ডোনাল্ড থাকাতে সবাই যেন নির্ভয় হয়েছিল—তা ছাড়া এই দুজন গণ্যমান্য. খ্রীষ্টান ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিবাদ-সভায় যোগ দেওয়াতে প্রতিবাদের মূল্যও ঢের বেড়ে গিয়েছিল। টাউন হলে যে সভা হয়েছিল, তার ছবিটা এখনও মনে পড়ে হংস-শুভ্রের। তিলধারণের স্থান ছিল না। তখন সবাই, এমন কি রাজকর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত, রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতেন। সি-আই-ডি ব'লে কিছু ছিল না। সেদিনকার সভার ভিড়ে আর উত্তেজনায় হংস-শুভ্র সোনার ঘড়ি ঘড়ির-চেন হারিয়ে ফেলেছিলেন। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে চিঠি লেখা হয়েছিল গ্ল্যাড্‌স্টোনকে। চিঠি মুসাবিদা করেছিলেন সুরেন ব্যানার্জি, সংশোধন করেছিলেন কে. এম. ব্যানার্জি। স্বয়ং গ্ল্যাড্‌স্টোনকে চিঠি লিখতে পারাটাই মস্ত বড় একটা পৌরুষ ব'লে মনে হয়েছিল সেদিন এবং তাকে কেন্দ্র ক'রে সমস্ত দেশে যে উত্তেজনা জেগেছিল, আজকালকার সস্তা ওপেন লেটারের ছড়াছড়ির দিনে সে উত্তেজনার মূল্য কেউ বুঝবে না। ফল ফলেছিল সে চিঠির, কিন্তু আংশিকভাবে। গ্ল্যাড্‌স্টোন তাঁর 'মিড্‌লোথিয়ান ক্যাম্পেনে' দুটো অ্যাক্টের বিরুদ্ধেই যদিও বক্তৃতা করেছিলেন, কার্য্যকালে কিন্তু দেখা গেল, প্রাইম মিনিস্টার গ্ল্যাড্‌স্টোন একটা অ্যাক্টকেই বাতিল করেছেন। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট উঠে গেল, আর্ম্‌স অ্যাক্ট উঠল না। রিপন সাহেব এই শুভবার্ত্তাটি নিয়ে এলেন। এই উপলক্ষ্যে যেসব কৃতজ্ঞতা-গদগদ সভাসমিতি হ'ল, তাতে হংস-শুভ্র খুব প্রসন্নচিত্তে যোগ দিতে পারেন নি। আর্ম্‌স অ্যাক্টটা থেকে যাওয়াতে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন তিনি। ক্ষোভ কিন্তু বেশিদিন রইল না। লর্ড রিপনের মত বড়লাটকে বেশিদিন অগ্রাহ্য ক'রে থাকা সম্ভব ছিল না। সত্যিই তিনি ভারতের বন্ধু ছিলেন। তাঁর আমলেই স্থাপিত হয়েছিল লোকাল সেল্‌ফ-গভর্মেণ্ট। গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটি গড়বার ধুম প'ড়ে গেল। সুরেনবাবু এই নিয়ে মেতে উঠলেন একেবারে। স্বায়ত্তশাসনের কিঞ্চিৎ অধিকার পেয়ে শিক্ষিত-সমাজ আকাশের চাঁদই হাতে পেলে যেন। হংস-শুভ্রকেও এই সময় একটা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানগিরি করতে হ'ল দিনকতক। প্রথম প্রথম তাঁরও মনে হয়েছিল, সত্যি সত্যি আমরা স্বাধীনতার পথে কিছুটা এগোলাম বুঝি। কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি বিরক্ত হয়ে উঠলেন। লোকাল সেল্‌ফ-গভর্মেণ্টের ওপর নয়,

দেশের লোকের ওপর। মিউনিসিপ্যালিটিকে কেন্দ্র ক'রে যে জঘন্য দলাদলি স্বার্থপরতা নীচতা শঠতা অসাধুতা কুৎসিত আকারে আত্মপ্রকাশ করল, তা আরও বেশি ক'রে তাঁর ইংরেজ-ভক্তিকে বাড়িয়ে তুলল যেন। ইংরেজদের সঙ্গে তুলনা ক'রে নেটিভদের অযোগ্যতাই যেন তিনি দেখতে পেলেন প্রতি পদে। বিরক্ত হয়ে শেষে তিনি মিউনিসিপ্যালিটির সম্পর্ক ত্যাগই করলেন। তাঁর ধারণা হ'ল, এমন একটা সুযোগ পেয়েও যখন দেশের লোক কিছু করতে পারলে না, তখন এদের আর কোন আশা নেই। প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলেন ইংরেজ হবার। মাঝে মাঝে দু-একটা বদখত ইংরেজ তাঁর মেজাজ বিগড়ে দিত অবশ্য। একটা নীলকর সাহেব এবং দুর্দ্দান্ত ম্যাজিস্ট্রেটের জ্বালাতেই নিজের জমিদারি বিক্রি ক'রে দিয়ে কলকাতায় চ'লে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি, কিন্তু ইংরেজ-ভক্তি কমে নি তাঁর। কারণ আদালতে মকদ্দমা ক'রে উক্ত নীলকর সাহেবের কাছে তিনি খেসারৎ আদায় করে-ছিলেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকেও বদলি করিয়েছিলেন। ব্রিটিশ জাষ্টিসের ওপর ভক্তি অচলা ছিল তাঁর। সে ভক্তিও অবশ্য কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়েছিল সুরেন বাঁড়ুজ্যের কোর্ট-কনটেম্প্ট কেসে। কিন্তু সেটাকেও একটা ব্যক্তি-বিশেষের দোষ ব'লেই মনে হয়েছিল—ইংরেজ-জাতের ওপর চটবার কোন কারণ ঘটে নি। বরং এ নিয়ে আন্দোলন করলে যে ফল হবে, এও তাঁর আশা ছিল। আন্দোলন হয়েওছিল খুব। শালগ্রামশিলার ওপর যে খুব একটা ভক্তি ছিল তা নয়, কিন্তু জাষ্টিস নরিস সেটাকে আদালতে নিতে বাধ্য করাতে সকলের আত্মসম্মানে যেন ঘা লেগেছিল। সুরেনবাবু তা নিয়ে তাঁর 'বেঙ্গলী'তে যখন বেশ কড়ারকম একটা 'লিডারেট' লিখলেন, তখন সবাই উল্লসিত হয়ে উঠল। এই অপরাধে তাঁর দু মাস জেল হয়ে গেল। সমস্ত দেশে যেন ঝড় উঠল একটা। যেদিন তাঁর বিচার হয় আদালত-প্রাঙ্গণে হাজার হাজার লোক জমা হয়েছিল সেদিন। কলেজের সমস্ত ছেলেরা গিয়েছিল, হংস-শুভ্রও ছিলেন সে ভিড়ের মধ্যে। যখন রায় বার হ'ল, তখন সে কি উদ্দাম উত্তেজনা! আদালতের জানলার একটি কাচও অক্ষত থাকে নি। শহরের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল। শুধু কলকাতায় নয়, ভারতবর্ষের অন্যত্রও সাড়া জেগেছিল। সুরেনবাবুর অপমান সারা ভারতেরই অপমান ব'লে গণ্য হয়েছিল সেদিন। জাতীয়তা-বোধ জাগছিল ধীরে ধীরে। জেল থেকে বেরিয়ে সুরেন্দ্রনাথ আরও জাগিয়ে তুললেন সেটাকে। কিছুদিন আগে থেকে

ইল্‌বার্ট বিল নিয়ে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে সারা ভারতব্যাপী একটা গাত্রদাহ ছিলই—এ সম্পর্কে আলাব্যার্ট হলে সুরেনবাবুর বক্তৃতা ভোলবার নয়—এই সুরেনবাবুর অপমানে সারা দেশ যেন জেগে উঠল। সুরেনবাবু আর একবার ঘুরে এলেন ভারতের নানা স্থানে, ন্যাশনাল ফাণ্ডের জন্যে টাকা উঠল। জাষ্টিস নরিসের বিশেষ কিছু হ'ল না যদিও, কিন্তু এই উপলক্ষ্যে দেশের লোকের আত্মসম্মান-বোধ প্রবুদ্ধ হ'ল যেন। ঠিক এর পরই বসল ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্স। সভাপতিত্ব করলেন আনন্দমোহন বসু। এ ঠিক বিদ্রোহীর সভা নয়, উপযুক্ত পুত্র পিতার কাছে নিজের যোগ্যতা দেখিয়ে বৈষয়িক ব্যাপারে অধিকার দাবি করে যে ভাষায়, ভারতবাসীরাও ঠিক তেমনই ক'রে অধিকার দাবি করেছিলেন ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের কাছে। দাবি করেছিলেন—শাসন-পরিষদে জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি পাঠাবার, স্বায়ত্তশাসনের, শিক্ষাবিস্তারের, শাসনকর্ত্তা ও বিচারকের কর্ত্তব্য পৃথক পৃথক লোকের হাতে দেওয়ার এবং অধিক-সংখ্যক ভারতবাসীকে রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত করবার। এর কিছুদিন পরে যা ঘটল, তাতে মুগ্ধ হয়ে গেলেন সবাই। ইংরেজরা সত্যিই যে এই অধঃপতিত দেশকে উদ্ধার করতে এসেছেন, তাতে আর সন্দেহ রইল না কারও। কিছুদিন আগে রিপন সাহেব চ'লে গেছেন, এসেছেন লর্ড ডাফ্‌রিন। তাঁর আনুকূল্যে এবং হিউম সাহেবের প্রেরণায় বম্বেতে বসল ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস। ডব্লিউ. সি. বনার্জি হলেন তার সভাপতি এবং ইংরেজী ভাষায় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য-বিষয়ে যা বললেন, তাই তখনকার দিনে কাম্য ছিল—ইংরেজ গভর্মেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে ভারতকে সভ্য করা। এইই সকলে তখন চাইত এবং হবে ব'লে বিশ্বাস করত। হংস-শুভ্রেরও ধারণা ছিল, ভারতের উন্নতি-সৌধ উঠবে রাজ-ভক্তির বনিয়াদের ওপর এবং সে সৌধ অলঙ্কৃত হবে পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শে। হোয়াইট ম্যান্‌স বার্ডেনের আন্তরিকতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না তাঁর। তাই কংগ্রেসের প্রথম কয়েক বছর তিনিও নিষ্ঠাভরে দেশের বড় বড় নেতাদের সঙ্গে এই বার্ষিক পিক্‌নিকে যোগ দিতে যেতেন এবং রাজ-ভক্তির সঙ্গে দেশ-ভক্তি 'পাঞ্চ' ক'রে যে বক্তৃতা-সুরা প্রস্তুত হ'ত তারই নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতেন সারাটা বছর। এ নেশাও কিন্তু ছুটে যেতে লাগল মাঝে মাঝে। লর্ড ডাফ রিন যাবার সময় কংগ্রেসকে ঠাট্টাই ক'রে গেলেন, শিক্ষিত-সমাজকে ব'লে গেলেন—'মাইক্রস্‌কপিক মাইনরিটি'! দিনকতক পরে এক

সাহ্‌্লারে গভর্ণমেণ্ট-অফিসারদের কংগ্রেসে যোগ দিতে মানা করা হ'ল। এলাহাবাদে কংগ্রেস করাই অসম্ভব হয়ে উঠেছিল প্রায়—তাঁবু গাড়বার জায়গাই পাওয়া যাচ্ছিল না। তবু এঁরা ভগ্নোদ্যম হলেন না। ইংরেজদের ন্যায়পরতা ও সত্যনিষ্ঠার ওপর আস্থা রেখে তাঁদের কন্‌স্টিট্যুশনাল আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগলেন মোলায়েম ভাষায় এবং এর ফলেই সম্ভবত শাসন-পরিষদে জনসাধারণের নির্ব্বাচিত জনকয়েক দেশী সভ্যের স্থান হ'ল, শিক্ষারও বিস্তার হ'ল কিছু। কিন্তু কিছুদিন পরেই এলেন লর্ড কার্জন, তারপর ইউনিভার্সিটিজ অ্যাক্ট এবং তারই পিঠোপিঠি বেঙ্গল পার্টিশন। হংস-শুভ্রের সব স্বপ্ন ভেঙে গেল যেন হঠাৎ। তিনি আরও হতাশ হলেন পরবর্ত্তী নেতাদের সুর শুনে। তিলক নিজেকে 'ন্যাশনাল' ব'লে ঘোষণা করলেন এবং যে 'নেটিভ' কুপ্রথাগুলোকে এতকাল তাঁরা বিদ্রূপ ক'রে এসেছেন, সেইগুলোকে আস্ফালন ক'রেই 'ন্যাশানালিজ্‌ম্‌' জাগাতে চাইলেন সকলের। তিনি বাল্য-বিবাহের সপক্ষে দাঁড়িয়ে কন্‌সেণ্ট-বিলের বিরোধিতা করলেন, গো-হত্যা-নিবারণের জন্য বদ্ধপরিকর হলেন, গণেশ-পূজো নিয়ে মাতলেন, এবং ম্যাৎসিনি, গ্যারিবল্‌ডি, নেল্‌সন, নেপোলিয়নকে ছেড়ে শুরু করলেন শিবাজী-উৎসব। বাংলা দেশেও ধর্ম্ম-বাই জেগেছিল কিছুদিন আগে—ব্রাহ্ম হয়ে যাচ্ছিল অনেকে, পরমহংসকে নিয়ে নরেন দত্তর দল হৈ-হৈ করছিল, শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনেরা সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করছিলেন। এসব জিনিস হাসিরই খোরাক যোগাত হংস-শুভ্রের বিলিতী মদের আড্ডায়। কিন্তু এই সব জিনিসেরই পলিটিকাল রূপ দেখে ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। তাঁর মনে হ'ল, এই সব কুসংস্কারগুলোই যেন নূতন চেহারা নিয়ে হাজির হয়েছে অরন্ধন আর রাখীবন্ধনের হিড়িকে, কালীপূজো করবার আর 'সন্তান' হবার আগ্রহে। বঙ্গভঙ্গের জন্যে আন্দোলন করতে প্রস্তুত ছিলেন তিনি, সাময়িকভাবে বিদেশী জিনিস বয়কট করবার চেষ্টাও যে করেন নি তা নয়, কিন্তু বিদেশী সভ্যতাকে একেবারে বিসর্জ্জন দিয়ে পিসীমা সাজতে প্রস্তুত ছিলেন না মোটেই। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নিতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে যে 'আর্য্যামি' আত্মপ্রকাশ করছিল, তা কিছুতেই মানতে পারছিলেন না তিনি। তখনকার স্বদেশী সভা, সে সভা ভেঙে দেবার জন্যে পুলিসের বলপ্রয়োগ, রাস্তায় রাস্তায় স্বদেশী গান, পাড়ায় পাড়ায় লাঠিখেলা, সেকালের 'সন্ধ্যা' 'যুগান্তর' 'বন্দেমাতরম্‌', ফুলার সাহেবের হুমকি, সুরেন বাঁড়ুজ্যের বক্তৃতা তাঁর দেশ-

ভক্তিকে খুবই উদ্দীপ্ত ক'রে তুলেছিল, যে স্বদেশী তখন বাংলা দেশের আকাশে-বাতাসে, যে স্বদেশীতে তাঁর নিজের বন্ধুরা মেতেছেন, সে স্বদেশীকে তিনিও অস্বীকার করতে পারেন নি—কিন্তু প্রথম যৌবনে যে কব্‌ডেন ডিজ্‌রেলি বার্ক শেরিডন, যে শেক্‌স্‌পিয়র মিল্টন স্কট ডিকেন্স, যে ম্যাল্‌থস মিল কান্ট হেগেল, যে নিউটন ডারুবিন ওয়াট কেলভিন তাঁর চিত্তকে আলোকিত করেছিল, এই নতুন ঝড়ের ঝাপটায় তাদের শিখা নিবে যাবে এ কিছুতেই তিনি বরদাস্ত করতে পারলেন না। মাইকেলের কাব্য পড়ার পর হেমচন্দ্রের 'বাজ রে শিঙ্গা'ও যেমন তাঁর ভাল লাগল না, দেবেন ঠাকুরের ছেলের মিহি-সুরের ছড়াও তেমনই কানে লাগল না। ঝড় এলে লোকে যেমন ঘরদোর সামলাতে ব্যস্ত হয়, তিনিও তেমনই নিজের আদর্শ বাঁচাতে ব্যস্ত হলেন। ভিক্টোরীয় সভ্যতার যে উদাত্ত গম্ভীর আদর্শে তিনি মানুষ, কোন কারণেই তা যে বর্জ্জন করা সম্ভব, এ কথা ভাবতেই পারলেন না তিনি। মুখে স্বীকার করতে না পারলেও মনে মনে সাহেবই তখনও তাঁর কাছে দেবতা ছিল। স্তম্ভিত হয়ে গেলেন যখন 'বম' পড়ল মজঃফরপুরে। কিংস্‌ফোর্ড সাহেবকে লাগল না—মারা গেলেন দুজন নিরীহ মেমসাহেব। এর পর আর কংগ্রেসের সঙ্গে প্রাণের যোগ রাখা সম্ভব হ'ল না তাঁর পক্ষে। কংগ্রেসের খাতায় অবশ্য নাম রইল, কিন্তু 'মডারেট' দলে। এই মডারেটরাও কিছুদিন পরে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন ক'রে নিজেদের নতুন দল গড়লেন—গোখলের সঙ্গে তিলকের বনল না। তাতে যোগ দেবার আর উৎসাহ পান নি হংস-শুভ্র। নিজের আদর্শ নিয়ে একান্তভাবে নিজের পারিবারিক জীবনেই নিবদ্ধ হয়ে রইলেন তিনি। দেশে আন্দোলন অবশ্য চলছিলই এবং তার ফলাফলও শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি। বয়সও বাড়ছিল। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলেন, তাঁর ইংরেজ-প্রীতি অনেকটা ক'মে গেছে যেন। ইংরেজ-ভক্তির যে দুর্গে তিনি আত্মরক্ষা করছিলেন, ইংরেজরা নিজেরাই একটার পর একটা গোলা ছুঁড়ে সে দুর্গকে ভূশায়ী ক'রে ফেললেন ক্রমে। সিডিশাস মীটিং অ্যাক্ট, প্রেস অ্যাক্ট, মর্লি-মিণ্টো বিলের কৃপণতা, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের সেই আইনটার জোরে বিনা-বিচারে দেশের লোককে আটক রাখা—প্রত্যেকটি এক-একটি গোলা। খবরের কাগজে একটি প্রবন্ধ লেখার জন্যে তিলকের ছ বছর জেল হয়ে গেল—ম্যাণ্ডালেতে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল তাঁকে। বাংলা দেশের কৃষ্ণকুমার মিত্র, পুলিনবিহারী দাস, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, অশ্বিনীকুমার

দত্ত, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, সুবোধ মল্লিক, শচীন বোস, সতীশ চাটুজ্যে, ভূপেন নাগ, অরবিন্দ ঘোষ সবাই জেলে। 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর', 'বন্দেমাতরম্' সব উঠে গেল। দেশ ছেয়ে গেল সি-আই-ডির গুপ্তচরে। কিছুদিন পরে হঠাৎ আর একটা জিনিসও আবিষ্কার করলেন। তাঁর সমসাময়িক যেসব নেতারা বড় বড় স্বদেশী ছিলেন, এখন তাঁদের অধিকাংশই বড় বড় চাকরে হয়েছেন। সুব্রহ্মণ্য আয়ার থেকে শুরু ক'রে মাদ্রাজের যত আয়ার এবং নায়ারের দল, সুরেন বাঁড়ুজ্যে, এ. চৌধুরী, এস. পি. সিন্‌হা, প্রভাস মিত্তির, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, তেজ বাহাদুর সাপ্রু, হাসান ইমাম সকলেই গভর্মেণ্টের বড় বড় কর্ম্মচারী। মনে হ'ল, এই মোক্ষ-লাভের জন্যেই যেন এঁরা এতদিন আন্দোলন করছিলেন। ফিরোজ শা মেটাও 'সার্' হলেন। হলেন না কিছু কেবল গোখলে। তিনিই শুধু গোপালকৃষ্ণ গোখলে থেকে গেলেন। কিন্তু গোখলে কটা আছে? গোখলের সগোত্র যাঁরা, গভর্মেণ্টের বিরোধিতা করেছিলেন ব'লে তাঁরা সবাই জেলে। এর কিছুদিন পরে উপর্য্যুপরি কয়েকখানা বই তাঁর হাতে এসে পড়ল। ওয়েডারবার্নের লেখা হিউমের জীবনী, ডব্লিউ. সি. বনার্জ্জির লেখা 'ইন্‌ট্রোডাক্‌শন টু ইণ্ডিয়ান পলিটিক্‌স', লায়ালের লেখা 'লর্ড ডাফ্‌রিনের জীবনচরিত'। প'ড়ে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলেন, আমাদের দেশকে উদ্ধার করবার জন্যে নয়, আমাদের দেশের উদীয়মান স্বাধীনতা-স্পৃহাকে একটা ভদ্র গণ্ডিতে শৃঙ্খলিত ক'রে রাখবার জন্যেই হিউম সাহেব লর্ড ডাফ্‌রিনের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কংগ্রেস সৃষ্টি করেছিলেন। এর পর ইংরেজদের ওপরও আর ভক্তি রাখা গেল না। কিন্তু কংগ্রেসেও আর ফিরতে পারলেন না তিনি—তাঁর কাছে সমস্তই যেন বাজে হুজুক ব'লে মনে হতে লাগল। মনে হতে লাগল, এরা সব সুবিধাবাদীর দল, চাকরি বা বকশিশ পেলেই সব লম্ফঝম্ফ থেমে যাবে এদেরও।

ইংরেজ এবং দেশের লোক দুয়েরই ওপর আস্থা হারিয়ে হংস-শুভ্রের অবলম্বনহীন মন যখন আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছিল, তখন হঠাৎ একদিন নজর পড়ল বুড়ো দরোয়ানটার ওপর। দেশের বড়লাট কে হ'ল, না হ'ল, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই ওর। ও ঠিক ভোরবেলা উঠে গঙ্গাস্নান করে, তুলসী-তলায় জল ঢালে, পূজোপাঠ করে, রামায়ণ পড়ে, তিলক কাটে, ভজন গায়। বড়লাট রিপনই হোক বা মিণ্টোই হোক, ওর স্বাধীনতা হরণ করতে পারে নি কেউ। বাইরের উত্তেজনার অভাবে আমাদের মন যেমন ক্ষণে ক্ষণে নিরাশ্রয়

হয়ে পড়ে, ওর তেমন হয় না। ওর দিনচর্য্যা ঠিক আছে—কার্জনের আমলেও যেমন ছিল, হার্ডিঞ্জের আমলেও তেমনই আছে। অথচ মানুষ হিসেবে ও কারও চেয়ে ছোট নয়। হংস-শুভ্র ওকে যত বিশ্বাস করেন, নিজের ছেলে শশাঙ্ককে তত করেন না। হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল, ভুল করেছি, এতদিন তিলকই ঠিক বলেছিল। হিন্দুধর্ম্মই আমাদের সনাতন আশ্রয়—ওই আমাদের 'ন্যাশনালিজ্‌ম'—বাদ বাকি "সব ঝুটা হ্যায়"। গীতা মহাভারত প'ড়ে সে মত আরও দৃঢ় হ'ল। প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের সনাতন ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে অবশেষে তিনি যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। যেগুলোকে আগে কুসংস্কার ব'লে মনে হ'ত, সেইগুলোরই নূতন নূতন অর্থ যেন প্রতিভাত হতে লাগল তাঁর মানসচক্ষে। উগ্র সাহেব ছিলেন যিনি একদিন—খানসামা-বাবুর্চ্চী-ডিনার-লাঞ্চ-স্যুট-সিগারেট-সর্ব্বস্ব সাহেবই নয়, মনে-প্রাণে সাহেব, স্ত্রী কাঞ্চনমালাকে মেম মাস্টারনী রেখে মেমসাহেব করবার চেষ্টা পর্য্যন্ত যিনি করেছিলেন (সফল হন নি যদিও, কাঞ্চনমালা পানের বাটা ত্যাগ করতে রাজি হলেন না কিছুতে), ছেলেদের বিলেত পাঠিয়েছিলেন, মেয়েদের কলেজে পড়িয়েছিলেন, কোর্টশিপ করবার সুযোগ দিয়েছিলেন, বিধবা মেয়ের বিয়ে দিতে পর্য্যন্ত ত্রুটি করেন নি, তিনি শেষ বয়সে একেবারে উলটে গেলেন। এখন পাঁজি ছাড়া এক মুহূর্ত্ত চলে না। নামাবলী গায়ে, কানে খড়কে গোঁজা, তর্জ্জনীতে অষ্ট-ধাতুর আংটি অলঙ্কৃত এই লোকটির মধ্যে প্রাক্তন মিস্টার এইচ. এস. মোকার্জ্জিকে খুঁজে বার করা সত্যিই অসম্ভব এখন।

একই শিক্ষার ফলে এবং এক রকম আবহাওয়ায় মানুষ হয়ে দু ভাই কিন্তু ঠিক এক রকম হন নি। সোম-শুভ্রের ওপর এই শিক্ষার ফল ফলেছিল একটু ভিন্ন রকমের। তিনি ব্রাহ্ম হয়ে গিয়েছিলেন। সে-যুগে ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রহণের যে দুর্ভোগ, তা সবই ভুগতে হয়েছিল তাঁকে। পিতা বেঁচে থাকলে হয়তো ত্যাজ্যপুত্রই করতেন, বিষয় থেকেও বঞ্চিত হতে হ'ত, কিন্তু সে লাঞ্ছনাটা সইতে হয় নি, বিষয়ের অর্দ্ধেক ভাগ ঠিকই তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে ধর্ম্মান্তর গ্রহণের জন্য তাঁকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হয়েছিল। উগ্র সাহেব হংস-শুভ্র ব্রাহ্মদের দু-চক্ষে দেখতে পারতেন না, বিশেষ ক'রে কেশব সেনের মেয়ের বিয়ের পর থেকে। তাঁর কেমন যেন ধারণা জন্মেছিল, ওরা সবাই ভণ্ড। দাড়ি রেখে চশমা প'রে বেদ-উপনিষদের মুখস্থ বুলি আওড়ায় কেবল, মনের এতটুকু প্রসারতা নেই, স্বতঃস্ফূর্ত্ত জীবনী-শক্তি নেই,

চিবিয়ে চিবিয়ে গুছিয়ে গুছিয়ে চারদিক বাঁচিয়ে ওজন-করা কথা বলার প্রয়াসেই ওদের জীবনী-শক্তি নিঃশেষ হয়েছে। হয়তো হংস-শুভ্রের ধারণাটা ভুল, কিন্তু সেটা তাঁর বদ্ধ ধারণা হওয়াতে কিছুতেই তিনি সোম-শুভ্রের আকস্মিক ধর্ম্মান্তর-গ্রহণকে ক্ষমার চক্ষে দেখেন নি। সোম-শুভ্রকে পারিবারিক বন্ধন বিচ্ছিন্নই করতে হয়েছিল। তাঁর নিজের পরিবারও গ'ড়ে ওঠে নি, কারণ তিনি বিবাহই করেন নি। বিহার-অঞ্চলে খানিকটা জমি কিনে কৃষি-কর্ম্ম ক'রেই কাটিয়ে দিয়েছেন প্রায় সারা জীবনটাই। তাঁর এক কলেজী বন্ধু সুরেশ্বর চক্রবর্ত্তীর পরিবারের সঙ্গেই সোম-শুভ্রের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। সুরেশ্বরও ব্রাহ্ম। প্রায় বছর দশেক আগে তিনি মারা গেছেন একটিমাত্র ছেলে রেখে। ছেলেটির মা আগেই মারা গিয়েছিলেন। কৃষিকর্ম্ম এবং এই পিতৃমাতৃহীন পরমানন্দই সোম-শুভ্রের মনের আশ্রয় ছিল। পরমানন্দকে নিজের ছেলের মতই মানুষ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে সে এখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। সেদিন একটি মনোমত পাত্রীর সঙ্গে তার বিয়েও দিয়ে দিয়েছেন। পাত্রী অনামিকা তাঁর এক বন্ধুরই মেয়ে। এদের কেন্দ্র ক'রে সোম-শুভ্রের জীবন এক রকম কেটে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে নিজের ভাইপো-ভাইঝিদের খবর তিনি নিতেন, কিন্তু সেটা প্রকাশ্যে নয়, গোপনে। শশাঙ্ক-শুভ্র, মৃগাঙ্ক-শুভ্র এবং কুন্দ-শুভ্রাকে তিনি কোলে করেছেন, কিন্তু বাকি কজনের—সিতাংশু-শুভ্র, হিমাংশু-শুভ্র, সুধাংশু-শুভ্র, ইন্দু-শুভ্রা—এদের সংস্পর্শ পান নি তিনি। সিতাংশুর জন্ম হবার আগেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তার পর থেকেই ছাড়াছাড়ি। দেখা হয়েছে অবশ্য বহুবার। সেদিনও শশাঙ্ক তাঁর কাছ থেকে টাকা নিয়ে গেল। হিমাংশু যেবার ডি. এস-সি. হ'ল, সেবার সে নিজেই এসে কাকামণির সঙ্গে দেখা ক'রে গিয়েছিল। সিতাংশু ব্যারিস্টারি পাস ক'রে কলকাতায় এসে নামল যেদিন, সেদিন তিনি নিজেই স্টেশনে গিয়েছিলেন তার সঙ্গে দেখা করতে। সুধাংশুও অক্সফোর্ড থেকে বরাবর চিঠি লিখত তাঁকে। হিমাংশু, সিতাংশু কেউ নেই আজ, সব অকালে মারা গেছে। কুন্দও নেই—হয়তো সেও মরেছে, বেঁচে থাকলেও ভদ্রসমাজে তার অস্তিত্ব আর স্বীকার করা সম্ভব নয়। কুন্দর চিঠিখানা কিন্তু সোম-শুভ্রের কাছে এখনও আছে। মাঝে মাঝে চিঠিখানা এখনও খুলে দেখেন তিনি। ছোট চিঠি, দুটি ছত্র মাত্র লেখা—"কাকামণি, চললুম। আপনার বিদ্রোহ সমাজ মেনে নিয়েছে—আমার বিদ্রোহও যেদিন নেবে সেদিন ফিরে আসব, যদি বেঁচে

থাকি।" যদিও তিনি ব্রাহ্ম-সমাজে নীতিবাগীশ ব'লে বিখ্যাত, তবু কুন্দর জন্যে অন্তরের নিভৃত কন্দরে তিনি বেশ একটু দুর্ব্বলতা পোষণ করেন। মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয়—আহা, মেয়েটার ঠিকানাটা যদি পেতাম, দেখা ক'রে আসতাম গিয়ে। তার কচি সুন্দর মুখটা মনের ওপর ভেসে ওঠে। তাকে যখন তিনি শেষবার দূর থেকে দেখেছিলেন, তখন তার বয়স বছর দুই হবে। দূর থেকেই তিনি এতকাল দাদার পরিবারের খবর নিয়েছেন এবং ভেবেছিলেন, চিরকালই তাই হয়তো নিতে হবে, কিন্তু বছর দুই আগে হঠাৎ একদিন হংস-শুভ্রের এক চিঠি পেয়ে বিস্মিত হয়ে গেলেন তিনি। একটু পুলকিতও যে না হলেন তা নয়, কিন্তু একটু দুঃখও হ'ল। যে সংসার থেকে তিনি বিতাড়িত হয়েছেন, সে সংসার তো আর নেই। সে সংসারের সবচেয়ে বেশি আকর্ষণের বস্তু ছিলেন যিনি, সেই বউদিদিই নেই, হঠাৎ মারা গেছেন সেদিন।... হংস-শুভ্র রীতিমত সনাতন পদ্ধতিতে পত্র লিখেছিলেন।—

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

আশীর্ব্বাদভাজন শ্রীমান্ সোম-শুভ্র মুখোপাধ্যায়
পরমকল্যাণবরেষু,

গতকল্য আমার আশী বৎসর পূর্ণ হইল। অতীত জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলাম, জীবনে অনেক ভুল করিয়াছি। তোমার সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করাও একটা ভুল। ইহার জন্য অনেক দুঃখ ভোগ করিয়াছি, কিন্তু কখনও অনুতপ্ত হই নাই। কারণ মনে একটি সান্ত্বনা ছিল, যাহা করিয়াছি তাহা উচিত বলিয়াই করিয়াছি। আজ কিন্তু আর সে সান্ত্বনা নাই, তাই অনুতপ্তচিত্তে ভুল সংশোধন করিতে বসিয়াছি। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এতকাল যাহা ঠিক বলিয়া মনে হইয়াছিল, সে প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া আজ তাহাই বেঠিক বলিয়া মনে হইতেছে। হিন্দু কখনও পরমত-অসহিষ্ণু নয়। হিন্দুধর্ম্মে যত মত তত পথ এবং সব পথই এক লক্ষ্যাভিমুখী। হিন্দুধর্ম্মে মতের বিভিন্নতা আছে, অভিনবত্বের প্রতি শ্রদ্ধা আছে—কলহ নাই। বাস্তবধর্ম্মী পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে পড়িয়া তোমার সহিত মনোমালিন্য করিয়াছিলাম। সে মোহ কাটিয়াছে। তুমি আবার ফিরিয়া এস, আমি অনুতপ্তচিত্তে আমার নিষেধ প্রত্যাহার করিতেছি। তুমি সত্যই ফিরিয়া আসিবে কি না, তাহা অবশ্য তোমার বিচার্য্য। বলা বাহুল্য, আসিলে আমি অতিশয় সুখী হইব।

সংসারে কাহারও সহিত মতের মিল হয় না। ছেলেরা এবং নাতিরা যাহার যাহা খুশি করিতেছে। সৎ পরামর্শ দিলে কেহ শোনে না। নিজের মতামত আস্ফালন করিয়া অপরের জীবনযাত্রায় বিঘ্ন জন্মাইবারও প্রবৃত্তি নাই। তাই আমি দমদমের বাড়িতে তারাপদকে লইয়া একাই থাকি। ইন্দুও আমার কাছে থাকে। কেন যে থাকে, বুঝি না। বার বার তাহাকে বলি, তুমি একাই যদি থাকিতে চাও, পার্ক স্ট্রীটে তোমার আলাদা একটা বাড়ি আছে, সেইখানেই যাও না, আমার কাছে কেন? সে কোন উত্তর দেয় না, যায়ও না, আমার বকুনি শুনিবার জন্য আমার কাছে পড়িয়া থাকে।

তুমি যদি এ অঞ্চলে আস, আমার সহিত দেখা করিতে কুণ্ঠিত হইও না। সঙ্কোচের কোনই কারণ নাই। আমার আশীর্ব্বাদ লও। আশা করি ভাল আছ। ইতি আশীর্ব্বাদক

শ্রীহংস-শুভ্র মুখোপাধ্যায়

এ বছর দুই আগের ঘটনা।

তার পর থেকে সোম-শুভ্র মাঝে মাছে দাদার কাছে যান। গেলে দাদা মনে মনে আনন্দিতই হন নিশ্চয়ই, অন্তত সোম-শুভ্রের তাই ধারণা, কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ বা প্রমাণ বড় একটা পান নি তিনি। হংস-শুভ্র তাঁর সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করেন, তাঁর যাতে কোন রকম অসুবিধা না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন, কিন্তু ওই পর্য্যন্তই। ঠিক ভাইয়ের মত নয়, সম্মানিত অতিথির মত আলাপ করেন তাঁর সঙ্গে। সোম-শুভ্রের মনে হয়, ঠিক সুর যেন মিলছে না, কোথায় কিসের যেন একটা অভাব থেকে যাচ্ছে। তবু তিনি যান মাঝে মাঝে।

বাসন্তীর চিঠিখানা আর একবার প'ড়ে, হংস-শুভ্র অনুচ্চ কণ্ঠে স্বগতোক্তি করলেন, ছেলেটাকে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে—

পাশের ঘরেই ইন্দু ছিল। বাবার অনুচ্চ কণ্ঠস্বরও তার কর্ণ এড়ায় না, সে বেরিয়ে এল।

কিছু বলছ বাবা?

না।—একটু হাসবার চেষ্টা করলেন হংস-শুভ্র।

ডাক এল নাকি? কার চিঠি ওখানা?

তোমার বড়বউদিদির।—মুখে হাসি ফুটিয়ে গড়গড়ার নলটা আবার মুখে তুলে নিলেন, এমন একটা ভাব করলেন যেন খুব কৌতুকজনক একটা সংবাদ আছে চিঠিখানাতে। স্মিত মুখে নীরবে হাঁটু দোলাতে লাগলেন। ইন্দুর বুঝতে বাকি রইল না যে, বাবা বিরক্ত হয়েছেন, কিন্তু সে চুপ ক'রে রইল। বাবা যদি বুঝতে পারেন যে, সে তাঁর মনোভাব টের পেয়েছে, তা হ'লে আরও বিরক্ত হবেন তিনি। তাই সে হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হ'ল।

আজকের কাগজখানা দেখেছ? হিন্দু মহাসভা—

না, দেখি নি।

তারপর ইন্দুর মুখের দিকে চেয়ে আর একটু হেসে বললেন, কোন দিনই দেখি না। দেশের লোক দুটো পয়সা পাবে ব'লে কিনি।

সায় দিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

ইন্দুকে বলতে হ'ল, তা বটে, একটা খবরও সত্যি নয়।

কি করবে বেচারারা? পিঠের চামড়ার মায়া তো সবাই ত্যাগ করতে পারে না, মানুষের চামড়া গণ্ডারের চামড়ার মত শক্তও নয়, চাবকালে বেশ লাগে।

তোমার খড়মের ফিতেটা তারাপদ ঠিক ক'রে দেয় নি দেখছি এখনও।

ইন্দু একটু ঝুঁকে খড়মটা তুলে নিলে।

একটা ছোট পেরেক দিয়ে দিলেই তো হয়, আমিই দিচ্ছি, তারাপদর অবসর হবে না কোনও কালে।

খড়মটা নিয়ে ইন্দু চ'লে গেল। হংস-শুভ্র হাসলেন একটু। মেয়েটা সর্ব্বদাই প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে, ও অদরকারী নয়, খড়মের ফিতে থেকে আরম্ভ ক'রে বালিশের ওয়াড়ের ঝালর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র নিজের প্রতিপত্তিটুকু জাহির ক'রে রাখা চাই সর্ব্বক্ষণ। সহসা হংস-শুভ্রের কাঞ্চনমালার কথা মনে পড়ল। সব সময়ে সুযোগ পেত না যদিও, কিন্তু সেও সর্ব্বদা নিজের আয়ত্তের মধ্যে সব জিনিস রাখতে চাইত। খাওয়া-শোওয়া আসবাব পোশাক-পরিচ্ছদ তো বটেই, গামছা-খড়মের দরকার হ'লেও তার শরণাপন্ন না হ'লে পাওয়া যেত না। পুরুষদের স্বাধীনতা-হরণের এ কৌশলটা আজকালকার মেয়েদের ঠিক জানা নেই বোধ হয়। অনেক বাড়িতেই পুরুষদের আলাদা আলমারি, আলাদা ওয়াড্রোব স্ত্রী-সংস্পর্শ-বর্জ্জিত হয়ে খানসামার তদারকে থাকে। শশধর যেমন।

হঠাৎ মৃগাঙ্ক-শুভ্রের কথা মনে পড়ল। ভাবলেন, বিয়ে করলেই স্ত্রী-লাভ হয় না সকলের ভাগ্যে—কনকের মত অমন—

এই নাও। খড়মটা ঠিক ক'রে ইন্দু নিয়ে এল। হংস-শুভ্র পায়ে দিয়ে বললেন, বাঃ, বেশ হয়েছে! খড়মটা পরতে গিয়ে চিঠিখানা কোল থেকে মেঝেতে প'ড়ে গেল। সেটা তুলে নিয়ে পাশের তেপায়াতে রাখলেন, কোন মন্তব্য করলেন না।

কি লিখেছেন বউদিদি?

প'ড়ে দেখ।

ইন্দু চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগল।—

শ্রীচরণকমলেষু,

বাবা, আগামী রবিবারে আমাদের ছোট্ট খোকনের মুখে ভাত দেব ঠিক করেছি। রবিবার ছাড়া অন্য দিনে হওয়ার অসুবিধে। কারও ছুটি নেই। সেদিন মনে করেছি সবাইকে বলব। ছোটঠাকুরপোর বম্বে চ'লে যাওয়ার কথা, কিন্তু তাকে ধ'রে রেখেছি। কাজলের বাবা দানাপুর থেকে এসে পৌঁছবেন—মানে, পৌঁছবার কথা—আগামী শুক্রবারে। কাল তাঁকে টেলিগ্রাফ করেছি, ঠিক যেন আসেন। বিয়ের পর থেকে তিনি তো আসেনই নি, হয়তো ভাবছেন, আমরা কিছু মনে করেছি, এই উপলক্ষ্যে এসে তাঁর সে ধারণাটা দূর হোক। কনককে অনেক ক'রে লিখেছিলাম আসবার জন্যে, কোন উত্তর পাই নি। মুক্তা আর শুক্তিকে বোর্ডিং থেকে আনিয়ে নেব সেদিন, সে দুদিন ওরা আমার কাছেই থাকবে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অনুমতি পাওয়া গেছে, শুনলাম ঠাকুরপোর কাছে। ভারী কড়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। আমি 'ফোন' করাতে বললেন যে, গার্জেনের চিঠি না পেলে ছুটি দিতে পারবেন না। ভাগ্যিস ঠাকুরপো এখানে ছিল। ঠাকুরপোকে কতবার বলেছি, আমাকে ওদের লোকাল গার্জেন ক'রে দাও, ওদের মাসীর চেয়ে তো আমি বেশি আপনার—ঠাকুরপো মুখে প্রত্যেক বারই বলে, আচ্ছা, তাই ক'রে দেব, তোমরা ঝঞ্ঝাটে পড়বে ব'লেই করি নি। এতে ঝঞ্ঝাটটা কি বলুন তো? আর একটা কি মজা হয়েছে জানেন, কাকামণিও ঠিক সেই সময় এদিকে আসছেন। তিনি তো আমাদের পারিবারিক উৎসবে বড় একটা যোগ দেন নি কখনও, এবার আসবেন লিখেছেন। আমার বাবাকেও চিঠি লিখেছিলাম আসবার জন্যে। তিনি বুড়ো হয়েছেন, চোখে ভাল দেখতে পান না, তিনি

যে আসতে পারবেন সে আশা অবশ্য করি নি, তবু লিখতে হয়, লিখেছিলাম। টুনি লিখেছে, তিনি নাকি আসবার জন্যে ক্ষেপেছিলেন, গাড়ি রিজার্ভ করতে লোক পর্য্যন্ত পাঠিয়েছিলেন নাকি, শেষে মণি কর্নেল হাউডকে ডেকে এনে থামায় তাঁকে। তিনি আসবেন না বটে, কিন্তু কত জিনিস যে পাঠিয়েছেন নাতির ব্যাটার জন্যে, তা এলে দেখতে পাবেন। দিল্লী শহরের যত মেওয়া ছিল সব ঝুড়ি ঝুড়ি, তা ছাড়া কত রকম টফি লজেন্‌জ বিস্কুট, কত হরেক ধরনের শিশি বাক্স কৌটো—একটা ঘর ভ'রে গেছে একেবারে। এর ওপর পাঁচশো টাকার চেকও পাঠিয়েছেন একখানা। চেকটা ভাগ্যে ওঁর হাতে পড়ে নি, পড়লেই ফুট-কড়াই হয়ে যেত। ও আমি খরচ করব না, খোকনের নামে জমা ক'রে দেব। উপহার আরও অনেক এসে জুটেছে। ওঁর বন্ধু মেজর চণ্ডা চমৎকার একটা দোলনা কিনে পাঠিয়েছেন। ঠাকুরপো একরাশ রেশমের খদ্দরি বিছানা এনে হাজির করেছে। বললাম, যা মুতুড়ে ছেলে হয়েছে, ওকে রেশম কেন, এক গাদা অয়েল-ক্লথ কিনে দাও বরং। মুক্তি-মুক্তা দুজনে মিলে একটা পেরাম্বুলেটার দেবে বলেছে। নবনী তো বড় একটা আসে না, সেও সেদিন সুন্দর একটা ঝারা কিনে দিয়ে গেছে। ছেলের পাওনা-ভাগ্য খুব। শঙ্খ বলছে, আমি কিচ্ছু দেব না। কেবল কান ম'লে দিচ্ছে ব্যাটার। বেশ জোরে জোরে ম'লে দেয়—সেদিন তো ককিয়ে কেঁদে উঠেছিল। হিমু-ঠাকুরপো ঠিক অমনই ক'রে হীরুর কান ম'লে দিত—মনে আছে আপনার? কোথায় আজ হিমু-ঠাকুরপো, কোথায় বা হীরু! ভগবান যাদের নিয়ে নিয়েছেন, তাদের তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না, কিন্তু হীরু যে আমার থেকেও নেই। কবে যে জেল থেকে ছাড়া পাবে, কে জানে! দাদার ছেলে হয়েছে শুনে কি আনন্দ তার, কি চমৎকার চিঠি লিখেছে! কি নামই রেখেছিলেন ওর আপনি—হীরকের মতই উজ্জ্বল, হীরকের মতই কঠিন! আপনার দেওয়া নামের মর্য্যাদাও রেখেছে। সবই বুঝি, তবু কষ্ট হয়—মনে হয়, ও যদি কঠিন না হয়ে আর একটু কোমল হ'ত, হয়তো ওকে ধ'রে রাখতে পারতাম। রজতের ব্যাপার তো জানেন, সে এখানে থেকেও নেই, কাজল মাঝে মাঝে আসে, সে কিন্তু ঘর থেকে আর বেরোয় না। সেদিন গিয়ে অনেক ক'রে ব'লে এসেছি, যা খামখেয়ালী ছেলে আসবে কি না জানি না।

আপনি ইন্দুকে নিয়ে নিশ্চয় আসবেন। আমি আগের দিন বিকেলে

গাড়ি পাঠিয়ে দেব। বিকেলে মানে তুপুরবেলাই পাঠাব, আপনি যাতে তিনটে নাগাদ এখানে এসে পৌছতে পারেন। পাশাপাশি আরও তুখানা বাড়ি ভাড়া নিয়েছি—অনেকে আসবে তো, একটা বাড়িতে কুলোবে না। আমাদের একতলার দক্ষিণ দিকের ঘরগুলো আপনার জন্যে ঠিক ক'রে রাখছি, ওপরে আপনার কষ্ট হবে। বেশি কিছু জিনিসপত্র আনতে হবে না, প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড়গুলো আনবেন কেবল। পূজোর জিনিসপত্র আনবার দরকার নেই। আমি আপনার জন্যে এক সেট সব কিনে রেখেছি, এমন কি শ্বেতপাথরের বাসন পর্য্যন্ত। আপনাকে আসতেই হবে, অমত করবেন না। আপনার নাতির ছেলের অন্নপ্রাশনে আপনি না থাকলে চলে? ইন্দুকে আর আলাদা চিঠি লিখলাম না। আর তারাপদকেও আলাদা নিমন্ত্রণ-পত্র দিতে হবে না আশা করি।

আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন। ইন্দুকে আশীর্ব্বাদ দেবেন। ইতি—প্রণতা বাসন্তী

ক্রমশ

"বনফুল"

মাধুকরী

এক

এস সখি, চল যাই দূরে—
যেথা পাহাড়ের পথ ঘুরে
দূরান্তরে মিশে গেছে আকাশের কোলে,
তীব্র বায়ু-স্রোতে ঝাউ দোলে,
ঘন-মধুগন্ধভরা আকাশ-লতিকা
আঁকিয়াছে বনস্পতি-শিরে রাজটীকা
বহুবর্ণ অর্কিড-কুসুমে,
শৈবাল-আচ্ছন্ন দেহে ঘুমন্ত নিঝুমে
অতিকায় মহাশিলা যেথা—
চল সখি, চল যাই সেথা।

তারপর আরও দূরে ধরি মোর হাত
হে প্রেয়সি, অবহেলি সহস্র সংঘাত
ঝঞ্ঝা বৃষ্টি তুষারের বাধা না মানিয়া
ভয় ক্লান্তি কোন কিছু মনে না জানিয়া
চ'লে যাব মোরা দুইজনে
দুর্গম অরণ্যপথে গভীর গহনে
সহস্র শিখর লঙ্ঘি ;
তুমি শুধু চিরসঙ্গী ;
নব কিশলয়ে শয্যা রচিব শয়নে,
লক্ষ তারা চমকিবে তোমার নয়নে,
উষার রক্তিম আলো রাঙাইবে
মসৃণ কপোল ; ঘুম ভাঙাইবে
অজানা পাখীরা কলরবে,
হইলে প্রভাত তুমি যবে
হাসিয়া চাহিবে মোর পানে,
সলজ্জে কহিবে কানে কানে
প্রণয়ের বাণী,
হাতে ল'য়ে তব হাতখানি
চলিব আবার আরও দূরে
অনন্তের পথে ঘুরে ঘুরে।

দুই

হে সখা, নীরবে এস দখিনের বাতায়ন-পথে
যখন চন্দ্রমা যাবে পশ্চিমের বিশ্রাম-আলয়ে—
দীর্ঘ অভিসার তব অতিক্রমি নিস্তব্ধে নির্জ্জনে—
যেথা বায়ু বাজায় কঙ্কণ তার শিরিষের শুকানো কুসুমে,
আমের মঞ্জরী ঝরে প্রণয়ের অভিষেক সম ;
সহসা-জাগ্রত পাখী কলরব করে হেথা সেথা,
পুরানো দীঘির পাড়ে তাল শোভে প্রহরীর মত,
স্তব্ধ চরাচর, সুপ্ত প্রকৃতি-মায়ের কোলে যেন।
সেই পথে এস সখা, দখিনের বাতায়ন-পথে ;

জ্বালিয়া প্রদীপ আমি বিরহের উৎকণ্ঠায় একা
তোমার চরণশব্দ না শুনিয়া শুনিব অন্তরে।
আসিবে যখন সখা, পথক্লান্ত উত্তপ্ত নিশ্বাসে
ভাষিবে অস্পষ্ট ভাষে মোর কর্ণে প্রণয়-বারতা
শুনিবে না কেহ তাহা, জানিবে না যবে তুমি ধীরে
ভোরের আলোকরশ্মি-রঞ্জিত সে পুরাতন পথে
চ'লে যাবে আর বার শেফালি-বিকীর্ণ বনপথে।

তিন

তড়িৎ বহিয়া যায় অঙ্গে প্রিয়া, তুমি থাক যদি সঙ্গে,
এ কথা জেনেও সখি দূরে যদি চ'লে যাও
নিদয়ার সেরা তুমি বঙ্গে।
কি মায়া মাখানো তব হাস্য, নব নব রূপে ঢালা লাস্য,
স্তব্ধ মোহিত চোখে তোমারে হেরিয়া আমি
মেনে যে নিয়েছি চির-দাস্য।
বাক্যে তোমার মোহমন্ত্র, ও নয়ন মায়াবীর যন্ত্র,
নাগপাশে বেঁধেছ যে ওগো মায়াবিনী মোর,
সব হতে তুমি যে স্বতন্ত্র।
সাগরের ঢেউ মৃদুমন্দ, লীলায়িত চলনের ছন্দ,
হে রূপসী প্রিয়া মোর, প্রথমেই পরাজিত
তব সনে হ'লে কভু দ্বন্দ্ব।
আমি উন্মাদ তুমি শান্ত, তুমি নির্ভুল আমি ভ্রান্ত,
জীবনের সংঘাতে আহত পরাণে সখি,
তব পাশে যাই হয়ে ক্লান্ত।
দিনশেষে হয়ে আসে সন্ধ্যা, ওগো সুন্দরী মধুগন্ধা,
আজ নিশি ভোর হ'লে নবজীবনের উষা
হবে না মোদের তরে বন্ধ্যা।
আবার জাগিবে তব বক্ষে সে জীবনে সহসা অলক্ষ্যে
প্রণয় আমারই তরে স্থির দীপশিখা সম,
দেখিব সে আলো তব চক্ষে।

শ্রীমধুকরকুমার কাঞ্জিলাল

বঙ্গে কৌলীন্যপ্রথা

সংসারযাত্রা নির্ব্বাহে সাধারণ মানুষ কি চায়? চায়, পিতামাতার স্নেহচ্ছায়াশীতল সংসারে, ভ্রাতা ভগিনী স্ত্রী পুত্র কন্যা পরিবৃত হয়ে, যথাসম্ভব দুপয়সা রোজগার ক'রে, যথাসম্ভব তাদের সুখে স্বচ্ছন্দে রেখে নিজেও সুখে স্বচ্ছন্দে শান্তিতে থেকে, জীবনটা কাটিয়ে দিতে। কিন্তু বাংলা দেশে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থাদির মধ্যে কৌলীন্যপ্রথা নামে যে এক অদ্ভুত প্রথা গজিয়ে উঠেছিল, তার প্রভাবে, বিশেষ ক'রে ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে, ওই শান্তিময় স্বাভাবিক গৃহস্থজীবন একেবারে ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল। কুলীন ব্রাহ্মণগণ, পরিবার প্রতিপালনের দায় থেকে মুক্ত হয়ে অর্থলোভে একাদিক্রমে দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, এমন কি শতাধিক বিবাহ করতে কুণ্ঠিত হতেন না, এবং সমাজও এমনই মোহগ্রস্ত হয়েছিল যে তাদের কাছে মেয়ে দেবার লোকেরও অভাব হ'ত না। এই বহুবিবাহকারীগণের স্ত্রীদের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। স্বামীসুখে বঞ্চিত হয়ে, প্রায় বিধবার মত জীবনযাপন ক'রে, মাতুল বা ভাইয়ের সংসারে দাসীপনা ক'রে, দুঃখে, দারিদ্র্যে, লাঞ্ছনায় সারাজীবন এঁরা চোখের জল ফেলে চলতেন এবং পশুর অধম জীবনযাপন ক'রে অবশেষে মরণের কোলে এঁরা শান্তিলাভ করতেন। যে আমলে সহমরণ-প্রথা প্রচলিত ছিল, সে আমলে আরও চমৎকার ব্যবস্থা ছিল। স্বামীর মৃত্যু হ'লে, সে স্বামীকে জীবনে হয়তো চেনবার সুযোগও যাদের হয় নি, আর্য্যধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করতে তার মৃতদেহের সঙ্গে পুড়ে মরতে তখন সেই স্ত্রীগণের ডাক পড়ত। অনেক সময় জোর ক'রে, বা আফিম খাইয়ে বিবশ ক'রে, এক কুলীন স্বামীর সঙ্গে তার বহুসংখ্যক স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারা হ'ত। আর সমাজ এমনই হৃদয়হীন ও বিকৃতবুদ্ধি হয়েছিল যে, এই বীভৎস ব্যাপারের ঘৃণ্য কুশ্রীতা, হীন কাপুরুষতা কারও চোখেও পড়ত না। শুনতে পাই, আমাদের শাস্ত্রে নাকি বলে, এক নারীর অভিশাপে রাবণ সবংশে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। শাস্ত্র যদি সত্য হয়, তবে সময় সময় ভাবি, ভাবতে ভাবতে আপাদমস্তক শিউরে ওঠে যে, বাঙালী আমরা শত সহস্র নারীকে যে যুগ যুগ ধ'রে আজীবন অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে তিলে তিলে হত্যা ক'রেছি, বিধাতা আমাদের কপালে না জানি কত শতাব্দব্যাপী কত দুঃখ-দুর্গতি লিখে রেখেছেন!

এই অদ্ভুত প্রথা সমাজে কি ক'রে গ'ড়ে উঠল, অতি সংক্ষেপে এবার তার পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। আদৌ বাংলা দেশ অনার্য্য দেশ ছিল, তীর্থযাত্রা ছাড়া এদেশে এলে নাকি আর্য্যদের জাত যেত। ক্রমশ কিন্তু আর্য্য-সভ্যতা বিস্তৃত হতে হতে আসামের পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছে গেল। সদিয়ারও পঞ্চাশ মাইল পূর্ব্বদক্ষিণে পরশুরামকুণ্ড পর্য্যন্ত আর্য্যদের এক তীর্থস্থান হয়ে উঠল। বাংলা দেশ মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়েছিল এবং মহাভারতের বর্ণনা যদি সত্য হয়, তবে ভারত-যুদ্ধের আগেই বাংলা দেশে ও আসামে আর্য্য-রাজ্যসমূহ ও আর্য্য-সভ্যতা দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর্য্য-সভ্যতার ভাণ্ডারী

ব্রাহ্মণরাও যে এই দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেছিলেন, সেই বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন নাম লৌহিত্য। সেই প্রাচীন যুগে বাঙালী ব্রাহ্মণদের মধ্যে কারও কারও গোত্র ছিল লৌহিত্য। লৌহিত্য গোত্রের এক ব্রাহ্মণ পালকাপ্য হস্তীবিদ্যা শাস্ত্রের রচয়িতা। ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী একখানা তাম্রশাসনে ভূমি-গ্রহীতা ব্রাহ্মণের গোত্র ছিল লৌহিত্য। এঁরা যে খাঁটি পূর্ব্বভারতীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, তা তাঁদের লৌহিত্য গোত্র দেখেই বোঝা যায়। অনেকেরই সম্ভবত জানা আছে, প্রাচীন আমলে তামার পাতের ওপর দানপত্র লিখে গোত্র-বেদ উল্লেখপূর্ব্বক রাজা ব্রাহ্মণদের ভূমি দান করতেন। এই দানপত্র-সম্বলিত তামার পাতগুলিকেই তাম্রশাসন বলে। তাম্রশাসনগুলি প্রাচীন ইতিহাসের অমূল্য উপাদান। গুপ্তযুগ থেকে আরম্ভ ক'রে হিন্দু-আমলের শেষ পর্য্যন্ত বহু তাম্রশাসন এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। ঢাকা মিউজিয়মে এইরকম তাম্রশাসন এগারোখানা আছে। রাজশাহী মিউজিয়মে, কলকাতার বড় মিউজিয়মে, এশিয়াটিক সোসাইটিতে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মিউজিয়মে, আশুতোষ মিউজিয়মে এবং মালদহ মিউজিয়মে আরও অনেকগুলি তাম্রশাসন সংগৃহীত আছে। এই সমস্ত তাম্রশাসন থেকে নানা গোত্রের বহু ব্রাহ্মণের পরিচয় পাওয়া যায়। কামরূপরাজ ভূতিবর্ম্মা-কর্ত্তৃক প্রদত্ত এক তাম্রশাসনে দেখা যায়, তিনি বহু বিভিন্ন গোত্রের তিনশতের বেশী ব্রাহ্মণকে ভূমি দান ক'রে শ্রীহট্ট জেলার পঞ্চখণ্ড পরগণায় উপনিবিষ্ট করিয়েছিলেন।

এই ভাবে বাংলা দেশে অনেক ব্রাহ্মণের বসতি হয়েছিল। কিন্তু বাংলা দেশে আদিশূর নামে একজন রাজা হয়ে যখন বৈদিক যজ্ঞ করতে চাইলেন, তখন তিনি খোঁজ নিয়ে দেখেন, ব্রাহ্মণেরা বৈদিক যাগযজ্ঞ সব ভুলে ব'সে আছে। ভারতবর্ষে মধ্যদেশ বা কান্যকুব্জ সদাচারী ব্রাহ্মণগণের বাসস্থান ব'লে চিরপ্রসিদ্ধ। কান্যকুব্জের রাজা ছিলেন আদিশূরের শ্বশুর। তিনি যজ্ঞ করার জন্যে শ্বশুরের কাছে পাঁচজন ব্রাহ্মণ চেয়ে পাঠালেন। কান্যকুব্জরাজ পঞ্চ গোত্রের পাঁচজন ব্রাহ্মণ বাংলা দেশে পাঠিয়ে দিলেন। কথিত আছে যে, এই ব্রাহ্মণেরা মল্লবেশে ঘোড়ায় চ'ড়ে জুতো পায়ে দিয়ে পান চিবুতে চিবুতে রাজার দরজায় এসে হাজির হন। দ্বারী তাঁদের এই বীরবেশ দেখে রাজাকে গিয়ে জানায় এবং রাজা অশ্রদ্ধায় তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন না। ব্রাহ্মণেরা তাঁদের আশীর্ব্বাদী ফুল জল হাতী বাঁধবার একটা গজারী-খুঁটির ওপর রেখে বাসায় ফিরে যান। ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদের এমনই জোর যে, দেখতে দেখতে সেই গজারী-খুঁটি পাতা ছেড়ে বেঁচে উঠল। এই অদ্ভুত ব্যাপারে রাজা নূতন-আগত-ব্রাহ্মণদের মহিমা বুঝতে পারলেন এবং তাঁদের সমাদরের আর সীমা রইল না। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণই রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের পূর্ব্বপুরুষ। ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে এঁরা বাংলায় এসেছিলেন।

ক্রমে এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশ বাড়তে লাগল। কিছুদিন পরে উত্তরবঙ্গে পাল-রাজাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। আদিশূরের বংশধরেরা গঙ্গার দক্ষিণে রাঢ় প্রদেশে

এসে রাজ্য স্থাপন করলেন। কতক ব্রাহ্মণ তাঁদের সঙ্গে গঙ্গার দক্ষিণে রাঢ়ায় চ'লে এলেন, কতক আবার পাল-রাজাদের অধীনস্থ দেশ বরেন্দ্রীতেই রয়ে গেলেন। এই ভাবে ব্রাহ্মণেরা রাঢ়ী বারেন্দ্র দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেলেন। রাঢ়া দেশে ৫৬জন এসেছিলেন, আর বরেন্দ্রীতে রয়ে গিয়েছিলেন ১০০জন। এঁদের প্রত্যেকে নিজ নিজ রাজার নিকট থেকে এক একখানা গ্রাম দান লাভ করেন। পরবর্ত্তী কালে এঁদের বংশধরেরা এই গ্রামের নামে খ্যাত হয়ে পদবী নিলেন অমুক গ্রামীন্। এ ভাবে রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের ৫৬টি গাঞী বা পদবী এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের ১০০টি গাঞী বা পদবীর সৃষ্টি হয়। প্রকাণ্ড গঙ্গানদীর ব্যবধানে ক্রমশ রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণে বিবাহাদি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এইরূপে আদৌ এক হয়েও দেশান্তরে ও রাজ্যান্তরে বাস করার দরুন ব্রাহ্মণেরা দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীতে পরিণত হয়ে পড়েন।

প্রথমে সমস্ত ব্রাহ্মণই শ্রোত্রিয় ব'লে পরিচিত ছিলেন। ক্রমে তাঁদের মধ্যে দুই ভাগ দেখা দিলে। যাঁদের ধন মান কুল উচ্চতর, তাঁদের নাম হ'ল কুলাচল, বাকি সব শ্রোত্রিয়ই রইলেন। কিন্তু খ্রীষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দের প্রথম ভাগে প্রাচীন শূর-বংশের মেয়ে বিয়ে ক'রে সেন-বংশের বিজয় সেন রাঢ়ায়, অর্থাৎ বাংলা দেশের ভাগীরথী-পশ্চিমস্থ অংশে প্রবল হয়ে ওঠেন। এই সেন-বংশ দাক্ষিণাত্য থেকে এসে বাংলায় প্রবল হচ্ছিলেন। এই বিদেশী বংশ দেখলেন, বাংলায় ব্রাহ্মণেরা বেশ প্রবল, কিন্তু তাদের কুলে নানা দোষ প্রবেশ করেছে। পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসবার আগে বাংলা দেশে যে ব্রাহ্মণ ছিল, তারা সাতশতী নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিল। পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশধরগণ এই সাতশতীদের সঙ্গে ক্রমশ মিশে যাচ্ছিল। বিজয় সেনের ছেলে বল্লাল সেন ভারী কূটবুদ্ধি লোক ছিলেন। তিনি রাজা হয়েই বাংলা ও বিহার থেকে পালরাজত্বের শেষ চিহ্ন লোপ ক'রে দেন। এই ভাবে বাংলা ও বিহারে একচ্ছত্র হয়ে তিনি ব্রাহ্মণ দমনে মনোনিবেশ করলেন। রাঢ়ী বারেন্দ্র সাতশতী মিশে এক সমাজে পরিণত হ'লে তাদের জোর অনেক বেড়ে যেত। বল্লাল ব্রাহ্মণদের ডেকে বল্লেন, তোমাদের কুলে নানা দোষ প্রবেশ করছে, এস, তোমাদের কুল যাতে বিশুদ্ধ থাকে তার উপায় ক'রে দিই। ঘটকদের বইতে আছে, কুল বিচারের জন্যে রাজা একদিন এক সভা আহ্বান করলেন। সভায় কেউ এক প্রহরে, কেউ দ্বিপ্রহর-কালে, কেউ বা দিনের তৃতীয় প্রহরে উপস্থিত হলেন। রাজা স্থির করলেন, যিনি যত দেরি ক'রে এসেছেন, তিনিই তত সদাচারশীল ব্রাহ্মণ। কারণ ব্রাহ্মণের আচারনির্দ্দিষ্ট পূজা-অর্চ্চা করতে যে সময় লাগে, তা তো আর এক প্রহরে হবার কথা নয়, তিন প্রহর লাগাই স্বাভাবিক। কাজেই যাঁরা এক প্রহর-কালে এসেছেন তাঁরা সদাচারী নন, দ্বিপ্রহরে যাঁরা এসেছেন তাঁরা কিছুটা সদাচারী, তিন প্রহরে যাঁরা এসেছেন তাঁরাই পূর্ণ সদাচারী। ঢাকায় দেখি, নাটক-নৃত্যাদি উৎসবে নিমন্ত্রিতদের যিনি যত দেরি ক'রে আসেন, তিনিই তত এগিয়ে বসতে পারেন, কারণ এঁদের জন্যে সামনে অনেকগুলি জায়গা

খালি রাখা হয়। বল্লালী পদ্ধতিতে তেমনই ধারায় যেন কুলের বিচার হয়েছিল। তিন-প্রহরীরা হলেন কুলীন, দ্বিপ্রহরীরা হলেন গৌণকুলীন, আর একপ্রহরীরা শ্রোত্রিয়ই রয়ে গেলেন। রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের কুলগ্রন্থে লিখিত আছে, বেশির ভাগ ব্রাহ্মণই রাজার এই অদ্ভুত ব্যবস্থা মানতে রাজি হলেন না, কিন্তু ৫৬ গাঞীর মধ্যে ২২ গাঞীকে রাজা কুলের লোভ দেখিয়ে হস্তগত ক'রে ফেললেন। তাঁদের মধ্যে ৮ গাঞী কুলীন, আর বাকি ১৪ গাঞী গৌণকুলীন হলেন। প্রতিবাদকারী ৩৪ গাঞী ব্রাহ্মণ শ্রোত্রিয় রয়ে গেলেন। প্রতিবাদকারী অনেকে নাকি বল্লালের রাজ্য ছেড়ে উড়িষ্যা রাজ্যে মেদিনীপুর জেলায় চ'লে গেলেন। বর্ত্তমানে এঁদের বলা হয় মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, এঁদের মধ্যে বল্লালের কুলবিধি চলে না।

নিজের রাজ্যমধ্যে বল্লাল কিন্তু কুলবিধি চালিয়েছিলেন, এবং তার ফলে অখণ্ড ব্রাহ্মণ-সমাজ ভেঙে শতধা হয়ে গিয়েছিল। বল্লাল নিয়ম করলেন, শ্রোত্রিয়েরা কুলীনে কন্যাদান করলে তাদের সমাজে সম্মান বৃদ্ধি হবে। গৌণকুলীনের কন্যা কুলীনে গ্রহণ করলে কুলীনের কুল নষ্ট হবে বটে, তবে গৌণকুলীনের সম্মান বৃদ্ধি হবে। এই ব্যবস্থার ফলে কুলীনের বহুবিবাহের পথ খুলে গেল, গৌণকুলীন ও শ্রোত্রিয় সমাজের পুরুষদের জন্যে পাত্রীর অভাব ঘটতে লাগল। এদিকে কুলীনগণ গৌণকুলীন ও শ্রোত্রিয়ের মেয়ে বিয়ে করতে ব্যস্ত হওয়ায় কুলীনের ঘরের মেয়েরা অবিবাহিত থাকতে লাগল।

ব্রাহ্মণ-সমাজে এই ব্যবস্থার ফলে গোলযোগ বেড়েই চলল। সেন-বংশের পতন হ'লে দেশে ক্রমশ মুসলমান-অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বিশৃঙ্খলা আরও বেড়েই গেল। এই সময় সমাজে ঘটকদের বড় প্রতাপ ছিল, কারণ তারা ছিল কুলবিধির ও বংশ-মর্য্যাদার লিপিকার বা রেকর্ড-কিপার। তাদের কথায় লোকের জাত থাকত বা যেত। ঘটক-বংশে এই সময় দেবীবর ঘটক নামে একজন প্রতাপশালী ঘটক ছিলেন। তিনি দেখলেন, কুলীন-সমাজ নানাপ্রকার দোষে দুষ্ট হয়েছে। এই দেখে দোষ যাতে আরও না ছড়ায়, সেজন্যে দোষ বিচার ক'রে কতকগুলি পরিবার নিয়ে এক-একটি মেল বা সার্ক্‌ল সাব্যস্ত করলেন। এ যেন আমের দিনে আমের দোকানে দাগ ও পচার পরিমাণ দেখে আম বাছাইয়ের মত। চারি-দোষযুক্ত পরিবারগুলি শান্তিপুরের নিকটস্থ ফুলিয়া গ্রামের নাম অনুসারে ফুলে মেল হ'ল। এইরূপে সমান-দোষযুক্ত আরও কতকগুলি পরিবার নিয়ে খড়দহ গ্রামের নামানুসারে খড়দহ মেল হ'ল। এইভাবে বিরাট কুলীন-সমাজকে ৩৬টি মেলে ভাগ করা হ'ল। নিয়ম হ'ল, বিবাহ-ব্যাপারে নিজ মেলের বাইরে কেউ যেতে পারবে না, তা হ'লেই দোষ আর ছড়াবে না।

এই নিতান্ত ছেলেমানুষী সংস্কার-চেষ্টার বিষময় ফল দুই-এক পুরুষেই ফলতে আরম্ভ করল। কোন মেলে হয়তো পাত্র কম, কন্যা বেশি। এদিকে শ্রোত্রিয়েরা এবং গৌণ-কুলীন বা বংশজেরা অবিরাম কুলীন পাত্র সংগ্রহের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকতেন। ফলে

কুলীনের ঘরে দ্রুত পাত্রের অভাব ঘটতে লাগল। মেলের বাইরে গিয়ে বিয়ে করবার নিয়ম না থাকাতে, বহু কুলীন কন্যা অবিবাহিতা থাকতে লাগল, অথবা এক পাত্রে শত কন্যা নামেমাত্র বিবাহিতা হতে লাগল। অবস্থা গুরুতর দেখে ঘটকেরা অবশেষে দুটি-দুটি ক'রে মেল জোড় বেঁধে দিলেন; নিয়ম হ'ল, ওই দুটি মেলে আদান-প্রদান চলতে পারবে। কিন্তু মেল-বন্ধনের বিষময় ফল এতে নিবৃত্তি হ'ল না, কুলীন-সমাজের নিতান্ত দুর্দ্দশা উপস্থিত হ'ল। অনেক কুলীনের বিবাহ করাই ব্যবসা হয়ে দাঁড়াল, এবং অম্লান-বদনে তাঁরা আজীবন ৫০-৬০-৭০-৮০টা বিয়ে করতে লেগে গেলেন। কুলীন কন্যাগণের চোখের জলে বাংলার মাটি ভিজতে লাগল।

ব্রিটিশ আমলে ইংরেজী শিক্ষার ফলে জনসাধারণের হৃদয়ের এই অসাড় পঙ্গু ভাব কেটে যেতে লাগল,—কুলীন কন্যাগণের এই ভয়ানক দুর্দ্দশার প্রতিকারের উপায় অনেক সহৃদয় ব্যক্তি চিন্তা করতে লাগলেন। এই চিন্তার প্রথম ফল রামনারায়ণ তর্করত্ন নামক একজন পণ্ডিতের প্রণীত "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" নাটক। পরবর্ত্তীকালে "নীলদর্পণ" যেমন নীলকরগণের অত্যাচার লোকের চোখের সামনে তুলে ধরেছিল, এই নাটকও তেমনই কুলীন কন্যাগণের দুর্দ্দশা সম্বন্ধে বাঙালী জনসাধারণকে সজাগ ক'রে তুলতে লাগল। এই নাটক দেশময় অভিনীত হতে আরম্ভ হ'ল এবং এর কশাঘাতে সমাজ বেশ চঞ্চল হয়ে উঠল। এই নাটক প্রকাশের ১৩।১৪ বছর পরে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর "বহুবিবাহ" পুস্তক প্রচার করেন। এ পুস্তকে দেশময় প্রবল আন্দোলন জেগে উঠল। ঠিক এই সময়েই মহাপ্রাণ রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় পূর্ব্ববঙ্গে তাঁর "বল্লাল সংশোধিনী" নামক পুস্তক প্রচার ক'রে গ্রামে গ্রামে আন্দোলন ক'রে বেড়াতে লাগলেন।

রাসবিহারী চমৎকার গান রচনা করতে পারতেন। কুলীনের বিবাহের আসরে তিনি অনাহূত গিয়ে উপস্থিত হতেন, এবং লাঞ্ছনা অপমান স'য়েও গানে গানে আসর মাতিয়ে তুলতেন। একবার শোনা গেল, এক কুলীনপুঙ্গব বিশ বছর পরে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে চিনতে না পেরে নিজের স্ত্রীকেই 'মা' ব'লে সম্বোধন ক'রে ফেলেছেন। অমনই রাসবিহারী গান রচনা করলেন—

বহুদিন পরে এসেছি, চিনি নাকো শ্বশুরবাড়ি,
কোন্ পথে যাইব মা গো বিশ্বনাথ বাঁড়ুয্যের বাড়ি?
যারা ছিল ছেলেপেলে
তাদের হ'ল ছেলেপেলে
বিয়ে ক'রে গেছি ফেলে, ব'য়ে গেছে বছর কুড়ি।
দ্বিজ রাসবিহারী বলে, আর তো হাসি রাখতে নারি।
ওহে, যাকে তুমি মা বলিলে, সে বটে তোমারি নারী।

রাসবিহারীর এই রকম কৌতুকবিষে পূর্ণ অনেক গান আছে, এর ঘায়ে সমাজের বিবশ বিবেক ক্রমশ সচেতন হতে লাগল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ আইনবলে নিষেধ করবার জন্তে রাজদ্বারে আবেদন পেশ করলেন, পূর্ব্ববঙ্গে রাসবিহারীর নায়কতায় অনুরূপ আবেদন প্রেরিত হ'ল। নানা কারণে এই আইন বিধিবদ্ধ হয় নি বটে, কিন্তু কৌলীন্য-প্রথার বিষদাঁত ভেঙে গেছে। মেলবন্ধন সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে, বহুবিবাহও দেশ থেকে প্রায় লুপ্ত। স্ত্রীশিক্ষার দ্রুত প্রচারে মেয়েদের মেরুদণ্ডে জোর হয়েছে, তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের বিয়ে দেওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন আমরা সেই শক্তিশালী সমাজ-সংস্কারকের পথ চেয়ে ব'সে আছি, যিনি বজ্রকণ্ঠে এসে প্রচার করতে পারবেন যে, সমস্ত বঙ্গালী কৃত্রিম ভেদবন্ধন একান্ত মিথ্যা ও মূল্যহীন, সমস্ত ব্রাহ্মণ পদমর্য্যাদায় সমান এবং প্রকৃত মনুষ্যই ব্রাহ্মণত্বের একমাত্র মাপকাঠি।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

জেলিমাছ ও আনুরূপ্য

একটু ভাববার চেষ্টা *

১

অন্তত এক ধরনের জীব জগতে আছে, যা আঁকবার জন্তে, কলাভবনে শিক্ষালাভ করবার দরকার নেই ; সে হ'ল জেলিমাছ। একটা জ্যামিতিক গোলই আঁকুন, আর সেই গোলকে বাঁকিয়ে তুবড়ে অক্টাগন বা 'অষ্টাবক্র' ক'রেই আঁকুন, তলায় লিখে দিলেই হ'ল 'জেলিমাছ'। বৈজ্ঞানিক বা শিল্পী কেউ নিন্দে করতে পারবেন না। হয়তো প্রথম চেষ্টায় কেউ ফল আঁকবার সাধনায় নিযুক্ত। দামী পুরু কাগজের ওপর পেন্সিলের সরু ডগা দিয়ে তাঁকে আমদানি করতে হচ্ছে আম জাম কলা লিচু, কখনও বা বেগুন। যে ফলগুলির চেহারা উতরে গেল, ভালই ; কিন্তু যদি কোন ফলের চেহারা ভয়ানক অবাধ্যতা করে এবং এঁকে বেঁকে দুষ্টু ছেলের মত শরীর ভ্যাংচাতে থাকে, তখন তার উপযুক্ত শাস্তি হচ্ছে, তলায় লিখে দেওয়া—'এটা একটা জেলিমাছ'।

* ইংরেজী 'essay'র বাংলা কি ? আধুনিক ঘরোয়া সুরে লেখা যে রসরচনা 'essay' নামে খ্যাত, আমাদের 'প্রবন্ধ' বা 'নিবন্ধ' তার নামকরণের পক্ষে গুরুভার। 'জল্প' বা 'জল্পিতা' নাম দিলে যদি তা পাঠকপাঠিকার হাস্যোদ্রেক করে, এবং সম্পাদক মশায় যদি সেই সংবাদ সংগ্রহ ক'রে জানান, তবে ভবিষ্যতে সেই নামই দেওয়া যাবে ; কারণ, পাঠকপাঠিকার মুখে একটু হাসি ফুটলে লেখকের লাভ বই ক্ষতি নেই।—লেখক

ঠাট্টা নয়, জীবসৃষ্টি-মহাভারতের আদিপর্বেই জেলিমাছের আবির্ভাব। তখনও পৃথিবী ছিল সমুদ্র মুড়ি দিয়ে। জন্মানো এবং বাঁচা সহজ কাজ ছিল না। যদি বা সেই আকৃতিহীন একাকারের মধ্যে কোনক্রমে বিন্দু-জীবন লাভ করা যেত, সেই অনাসৃষ্টির তাড়নে একটা নির্দিষ্ট মূর্তি রক্ষা করা ছিল দুরূহ। রূপের যুগ সে নয়, সে ছিল উচ্ছাসের যুগ, তীব্র ঘোলাটে অনুভূতির যুগ। কি অগঠিত আনন্দে বেদনায় ভয়ে উত্তেজনায় সেই সমুদ্র সীমা থেকে সীমা পর্যন্ত কেঁপে উঠত, টলমল ক'রে উঠত, তার ঠিকানা নেই। সেই অপ্রকৃতিস্থ সমুদ্রের গর্ভে জন্মলাভ করল যে জেলিমাছ, সে বুঝে নিয়েছিল, চেহারা নিয়ে খুঁতখুঁত করাটা তার পক্ষে সুবুদ্ধির কাজ হবে না, বরং জলের বেগ আর চাপের খেয়ালের কাছে চেহারার দায়িত্ব সমর্পণ ক'রে দেওয়াই তার প্রাণধারণের একমাত্র উপায়। হোক না চেহারাটা কখনও লম্বা কখনও বেঁটে কখনও ফুলো কখনও চ্যাপ্টা, প্রাণটা তো বাঁচবে।

এই মানিয়ে নেবার ক্ষমতাকেই নাম দিচ্ছি আত্মরূপ্য। আধুনিক চিন্তাধারায় এই আত্মরূপ্য-ক্ষমতা বা adaptability মানুষের পক্ষেও একটা খুব বড় গুণ ব'লে স্বীকৃত ও প্রশংসিত। অবশ্য আত্মরূপ্যেরও স্তরবিভাগ আছে। মানুষ যখন নিজেকে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করে, তখন তার প্রক্রিয়াটা জেলিমাছের প্রক্রিয়ার চেয়ে নিশ্চয় স্বতন্ত্র আর উন্নত। তবু ভাবতে ব'সে মনে খটকা লাগে, সত্যই কি আত্মরূপ্য একটা বাঞ্ছনীয় গুণ? যদি তাই হয়, কোন্ ধরনের আত্মরূপ্য? মানুষের সভ্যতার প্রধান লক্ষণ কি এই আত্মরূপ্য-চেষ্টা, না তার ঠিক বিপরীত?

সর্বদেশের মানুষদের মধ্যে যারা সবচেয়ে সভ্য, সবচেয়ে শিক্ষিত, তাদের দিকে লক্ষ্য করুন। দেখবেন, তারা দাঁতে দাঁত চেপে ভীষণ প্রতিজ্ঞায় নিজের নিজত্ব বাঁচাচ্ছে, শুধু উদ্ভিদ পশু থেকে নয়, অপর মানুষ থেকেও; সযত্নে নিজের শরীর-মনের চেহারা বাঁচাচ্ছে, পাছে তা মিশিয়ে যায়, হারিয়ে যায়। তাই দেহের কত প্রসাধন আয়না সামনে রেখে, মনের কত প্রসাধন বই সামনে রেখে। এদের এই চেহারা আর চরিত্র তৈরির চেষ্টাকে কে নিন্দে করবে? কে চায়, সমস্ত মানুষ সমস্ত স্বাতন্ত্র্য, সব বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়ে একেবারে একরকম পিণ্ডাকার হয়ে যাক?

আবার অপর পক্ষে বলা যায়, নিজেকে সম্পূর্ণ এলিয়ে দেওয়ারও একটা আনন্দ আছে। শুধু আনন্দ নয়, বাঁচতে হ'লে অনেক সময় এ ছাড়া আর কোন উপায়ই থাকে না। এ পৃথিবী অহরহ নানা ভাব, নানা রীতিনীতি, নানা ইচ্ছা, চেষ্টার আন্দোলনে বিক্ষুব্ধ। এর বিরুদ্ধে সব সময় মনকে পাহাড়ের মত কঠিন, একগুঁয়ে ও উদ্ধত ক'রে রাখতে গেলে দিনের পর দিন বহু আঘাত নিতে হবে বুক পেতে। সইতে হবে অনেক ভূকম্প, অনেক ভূ-স্খলন, সযত্নে রক্ষিত চেহারার জায়গায় জায়গায় পড়বে প্রহারচিহ্ন, গভীর গহ্বরের মত ক্ষতগুলি কেড়ে নেওয়া বস্তুটুকুকে ফিরে পাবার আশায় হাঁ ক'রে থাকবে চিরকাল।

তার চেয়ে নিজেকে নরম, তরল ক'রে দেওয়াই ভাল। ঠেলা পেলে চল, বাধা পেলে থাম; আঁকাবাঁকা পথকে দাও বঙ্কিম আলিঙ্গন, সোজা খোলা রাস্তায় নিজেকে দাও ছড়িয়ে, যদি দেখ সামনে হঠাৎ ফাঁক—লাফিয়ে পড় দুরন্ত প্রপাতে।

সত্যি, ভাবতে ভাল লাগে, যেন পুরাণের দেবতাদের মত আমাদের নব নব রূপগ্রহণের ক্ষমতা হয়েছে। শুধু দেবতা কেন, রাক্ষসরাও আমাদের চেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান ছিল; খেত অবশ্য অসভ্যের মত, কিন্তু তাদের শরীর ছিল ইণ্ডিয়া রবারের চেয়েও স্থিতিস্থাপক। ঘটোৎকচ পড়ল কুরুকুল চেপে; আর আজকের দিনে এমন একটা প্রাণী নেই, যে, মিছামিছি যারা জগৎ-জোড়া যুদ্ধ বাধালে, তাদের চাপা দেয়। আর মনে কর, দেবতা বা রাক্ষসরা কোন অভিনয় করবে। ওই ষ্টেজের ভাড়াটা যা লাগবে, নইলে সাজপোশাক আর চেহারা-তৈরি বা মেক্-আপের জন্মে ভাবনা নেই। আর ফিমেল পার্ট—, থাক; আধুনিক নাট্য-সম্প্রদায়রা ভাববেন, বুঝি তাঁদের কটাক্ষ করা হচ্ছে।

আমার এই গোলমেলে ধরনের সাক্ষ্য দেবার চেষ্টা দেখে যদি ভারতীয় কোন মনীষীকে বিচারকের আসনে বসিয়ে দেওয়া হয় ও আমাকে কাঠগড়ায় হাজির করা হয়, তবে যে কথোপকথন হবে, তা অনেকটা এইরকম—

মনীষী—ঘটোৎকচের কথা কি বলছ? ওইরকম রূপগ্রহণ ক্ষমতাকে তুমি আনুরূপ্য বল নাকি?

আমি—আজ্ঞে, ওটা আমি একটা রূপক হিসেবে ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছি। সত্যি কি আর শরীরটা কমাতে বাড়াতে চাই, বা একবার জন্তু, একবার মানুষ, একবার জার্মান, একবার আমেরিকান হয়ে দেখতে চাইছি! সহানুভূতি ও কল্পনা দিয়ে নিজের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসা যায়, মনের দ্বারাই জগতের সব কিছুর রূপ পরিগ্রহ করা যায়, তারই কথা বলছিলুম।

মনীষী—কিন্তু তার আগে ঝরনা আর পাহাড়ের উপমা দিয়ে যে কথাটা বললে, তার সঙ্গে তো এর কোনই মিল নেই। কোন্‌টা তোমার আনুরূপ্য?

আমি—আজ্ঞে, দুটোই। ঝরনার আনুরূপ্য হচ্ছে এমন একটা জিনিস, যেটা সব মানুষকেই অল্পবিস্তর করতে হয়। রোগ শোক বিপদ বিঘ্ন এমন অনেক আছে, যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলে ঠকতে হয়; সেখানে বুদ্ধিমানই হোক আর বোকাই হোক, বীরই হোক আর কাপুরুষই হোক, সকলের পক্ষেই শ্রেষ্ঠ যুক্তি—পরাজয় স্বীকার ও যথাসম্ভব মানিয়ে নেওয়া, স্রোতের সঙ্গে ভাসা। যেমন একটা খরস্রোতা নদী পার হতে গেলে—

মনীষী—থাক, উপমা দিয়ে বিষয়টাকে আরও ঘোলাটে ক'রে তুলো না, সোজা ভাষায় বল।

আমি—আচ্ছা। তা হ'লে দু রকমকেই আমি বলছি আত্মরূপ্য। প্রথমটার আত্মরূপ্য না থাকলে প্রাণীর প্রাণ বাঁচে না, দেহীর দেহক্ষয় হয়, জ্ঞানীর জ্ঞান হয় অস্বাভাবিক, ভিত্তিহীন। কিন্তু দ্বিতীয় রকমের আত্মরূপ্য অনেক শিক্ষা অনেক সাধনার দ্বারা আয়ত্ত করতে হয়। প্রথম রকমের আত্মরূপ্য শেখানো যায় না, ও একটা জীবতত্ত্বের আদিম নিয়ম, দ্বিতীয়টার দ্বারাই মানুষ নিজেকে বিস্তৃত করে, উন্নত করে। প্রথমটা জেলিমাছের দশা, দ্বিতীয়টা—

মনীষী। মহাপুরুষের দশা। বেশ বোঝা যাচ্ছে, তুমি, এই রকম দশা—যাকে তুমি বলছ আত্মরূপ্য, কিন্তু আমি যাকে বলব সারূপ্য—তাই চাও। তা হ'লে স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিচ্ছিলে তার কি হবে ?

আমি। আজ্ঞে, স্বাতন্ত্র্যও তো চাই।

মনীষী। (রুষ্টস্বরে) স্বাতন্ত্র্যও চাও, সারূপ্যও চাও! দানা-বাঁধা মিছরিও চাও, অথচ সেই মিছরিকে জলে-গোলা মিছরির জল হিসেবেও চাও! মতি স্থির ক'রে তারপর প্রকাশ্যে কথাবার্ত্তা কইতে এস, বুঝলে ?

আমি। (ভয়ে ভয়ে) আপনি এ বিষয়ে কি বলেন ?

মনীষী। তুমিও তো ভারতীয়। কিন্তু 'যোগ' কথাটার মানে কখনও ভেবে দেখেছ কি ? বাইরের সঙ্গে অন্তরের যোগ, অনাত্মীয়ের সঙ্গে আত্মার যোগ। তুমি এত ঘটা ক'রে যা বলতে চাইছ, তা ভারতীয় মনীষীরা বহুকাল আগে থেকেই জেনেছেন, অভ্যাস করেছেন, এবং প্রচার করেছেন। তাঁরাই বলেছেন যে, নিজেকে বিস্তার ক'রে, স্বার্থের মধ্যে থেকে পরমার্থে বেরিয়ে এসে তবেই নিজেকে লাভ করা যায়; তাঁরাই দেখিয়েছেন, কোথায় কেমন ক'রে ওই সারূপ্য ও স্বাতন্ত্র্যের সমন্বয় করা যায়, কেমন ক'রে আমি 'আমি'ই থাকি, অথচ সেই আমিই আবার সোঽহম্, অর্থাৎ নিখিল বিশ্বের সঙ্গে সাম্য ও সারূপ্য—

আমি। (মরিয়া হয়ে) কিন্তু ভারতের পঁয়ত্রিশ কোটি লোক সকলেই তো আর মনীষী নয়। তা আশা করাও উচিত নয়। তাদের সঙ্কীর্ণ জগতে তারা কেমন ক'রে বাঁচবে, সেই হ'ল প্রশ্ন। তাদের জন্যে যোগের, সারূপ্যের একটা শিশু-সুলভ সংস্করণ দরকার নয় কি ? তারই নাম আমি দিচ্ছি আত্মরূপ্য। ইংরেজীতে যাকে বলে—

মনীষী। ইংরেজীতে কি বলে, আমি শুনতে চাই না। দেখতে পাচ্ছি, তাদের স্বাতন্ত্র্য আর তাদের আত্মরূপ্যের ধারণা ধার ক'রে তুমি চালাবার চেষ্টা করছ। [এইখানে আমার মুখটা হাসিহাসি হয়ে উঠল, মনীষী পর্যন্ত আমার 'আত্মরূপ্য' কথাটা ব্যবহার করছেন; ওটা তা হ'লে চলল!] ওদের স্বাতন্ত্র্য মানে কি জান, নিজেকে

চাবি দিয়ে রাখা, অহঙ্কারের উঁচু বাঁধ তুলে দিয়ে প্রীতি, সহানুভূতির স্রোতটাকে আটকে ফেলা। [আমি (স্বগত)—এবার কিন্তু ইনি নিজেই উপমা ব্যবহার করছেন!] মনের একটা দিকে একটু ছিদ্র ওরা খুলে রেখেছে, বুদ্ধির দিক। বাদ বাকি সব দিক বন্ধ। আর ওদের আনুরূপ্য মানে অভিনয়, ভণ্ডামি, নিজেকে ও অপরকে প্রতারণা; মোট কথা, যাতেই কাজ উদ্ধার হয়, তা সে যত নীচ উপায়ই হোক না কেন, তাই করতে না বাধা। তুমি যে আনুরূপ্যের কথা বলতে চাইছ, সে হচ্ছে মনকে অবস্থা হিসেবে নতুন ক'রে গড়া, কিন্তু এদের আনুরূপ্য খুবই সহজ, কেন না গড়বার কিছুই নেই, মনটাকে বাদই দিয়ে দিয়েছে। (হঠাৎ গম্ভীরভাবে) এখন যাও, আমার সময় নষ্ট হচ্ছে। এক মাস ধ'রে যা বললুম ভাবো, তারপর যদি আর কোনও প্রশ্ন থাকে জিজ্ঞাসা ক'রো।

কাঠগড়া থেকে আমি নেমে যাবার পর রায় লিখলেন, "এই সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এর বুদ্ধি বাছুরের নতুন-ওঠা শিঙের মত; সব কিছুকেই গুঁতোতে চায়, কিন্তু জোর নেই, হাড় শক্ত হয় নি।"

৩

বাস্তবিক, ভেবে দেখতে গেলে আমরা ভারতীয়েরা এক কিম্ভূতকিমাকার প্রাণীতে পরিণত হয়েছি। আমাদের কিছুটা পুরনো ধরন, কিছুটা অনুকরণ। আমরা কখনও বা জেলিমাছের মত মেরুদণ্ডহীন, নিজেকে ভেস্তে দিয়ে, গুলিয়ে দিয়ে, ঘটনার বা পরিবর্ত্তনের দৌরাত্ম্য থেকে আত্মরক্ষা করি। দেখুন এই কোটি কোটি অশিক্ষিত জনসাধারণের দিকে চেয়ে; ছাইমাখা সন্ন্যাসী দেখলেই তারা ঢিপ ক'রে গড় করে, পরমুহূর্ত্তে যায় আবগারীর দোকানে নেশার জিনিস সঞ্চয় করতে, ঝগড়া হচ্ছে দেখলে অজান্তে মালকোঁচা বাঁধে, আবার পুলিস দেখলেই ঘরে ঢুকে খিল দেয়, সারাজীবন বাড়ির লোকের সঙ্গে অতি তুচ্ছ ব্যাপারে ইতর ঝগড়া করতে করতে যেই কেউ ম'রে যায় অমনই বুক চাপড়ে গলা-ফাটা চীৎকারে পাড়ার লোককে সারারাত জাগিয়ে রাখে।

আবার কখনও বা আমরা হতে চাই স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট, ভাবতে চাই যে, আমাদের একটা ব্যক্তিত্ব আছে, যার বলে আমরা সাধারণের চেয়ে উঁচু। কিন্তু চেয়ে দেখুন আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকদের দিকে। স্বাতন্ত্র্যের নামে তারা শুধু নিজের মধ্যে নিজেকে চাবি দিয়ে রেখেছে। আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষা বুদ্ধির ভেতর-মহলে কতকগুলো গলিঘুঁজির পথ খুলে দেয়, বাইরে ভেতরের মানুষটিকে টেনে আনে না। আমাদের রাজনীতি, ব্যবসায়, বৃত্তি—প্রত্যেকটি দীক্ষা দেয় এক এক রকমের অস্ত্রসাধনায়। অপর মানুষকে হঠিয়ে হারিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার এই

সাধনা ; এই সাধনার ইংরেজী নাম struggle for existence, এর মন্ত্র হ'ল—survival of the fittest. অবাক হয়ে ভাবি, এই আদর্শই যখন মানুষ মেনে নিচ্ছে, তখন সেইটে স্পষ্ট ক'রে বলতে ভয় পাচ্ছে কেন, কেন স্কুলে কলেজে 'রেষারেষি' শিল্প-হিসাবে শেখানো হচ্ছে না (ভোটের সময় তা হ'লে কত সুবিধে হয়!), কেন নবযুগের দ্রোণাচার্য্য কুমারদের শাস্ত্রপাঠের সঙ্গে মারণ, উচাটন, প্রবঞ্চন প্রভৃতি সূক্ষ্ম মানস-অস্ত্র শিক্ষা দেবার ভার নিচ্ছেন না!

আমাদের শিক্ষিতদের ভয়, কখন তাদের মান নষ্ট হয়, কিংবা, কে তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়! কাজেই গাম্ভীর্য্যের উচ্চ চূড়ায় তারা আসীন। সেই তাদের স্বাতন্ত্র্য। আবার তাদের মধ্যে যারা 'হৃদয়' নামক বালাইটিকে বাদ দিতে শিখেছে, যারা অবলীলাক্রমে যখন তখন উচ্চ হাসে, অপরিচিত লোকের পিঠে হঠাৎ বন্ধুত্বের থাপ্পড় মারে, চক্ষুলজ্জার ধার ধারে না, মেসে হোক, ট্রেনে হোক, পরের জিনিসকে আপনার ব'লে ভেবে নিতে শেখে, জোর ক'রে নেমন্তন্ন নেয়, অনিচ্ছুক গৃহস্থের মূল্যবান সময় নষ্ট করে এবং অবশেষে তাকে একটি ইন্‌সিওরেন্সের পলিসি গছায়, তারা হ'ল আমাদের দেশের আত্মরূপ্যের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

আমাদের দেশের বেকার-সমস্যা নিয়ে যাঁরা ভাবেন, তাঁরা অনেক সময়ে সমস্যা সমাধানের কোনও উপায় না দেখতে পেয়ে অবশেষে হতভাগ্য বেকার যুবকদেরই দোষী করতে আরম্ভ করেন। তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো খুব উচ্চশিক্ষিত, বুদ্ধিমান, হৃদয়বান, কেউ কেউ হয়তো চাকুরি দেওয়ার মালিকদের চেয়েও সর্ব্বাংশে অনেক বেশি গুণশালী, কিন্তু তবু তাদের গঞ্জনা শুনতে হয়—তোমাদের adaptability নেই। যাঁরা এই উপদেশ দেন, তাঁরা অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যবান, বৃত্তিমধুচক্রের এক-একটা বড় খোপ তাঁরা অধিকার ক'রে ব'সে আছেন। এই adaptability বলতে তাঁরা কি বোঝেন, তা তাঁদের নিজেদের কাছেই স্পষ্ট নয়। কিসের সঙ্গে কি মানিয়ে নিতে হবে? হয়তো কেউ উত্তর দেবেন, কেন, ঘটনার সঙ্গে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে। কিন্তু সেই মানানোটা আসলে কি? ঠিক কি করতে হবে?

উপদেষ্টারা এর উত্তর দিতে পারবেন না, বা দিতে লজ্জাবোধ করবেন। কিন্তু তাঁদের মনের ভাবটা এই, তুমি কি করবে তার আমি কি জানি? মানুষের কর্ত্তব্য সফল হওয়া, তা সে যে উপায়েই হোক। সফল না হতে পারলেই বলব, তার আত্মরূপ্য নেই।

সাফল্যের এই যে একটি সেরা উপায় আছে, এরই নাম ছলে বলে কৌশলে। এই উপায় আত্মরূপ্য নয়, আত্মরূপ্যের ব্যঙ্গানুকৃতি। এর জন্যে কোন গুণের দরকার নেই, কোন শিক্ষার দরকার নেই, শুধু দরকার নিজেকে কমিয়ে খাটো ক'রে আনা। সত্যিকার কৃতিত্বের তোরণদ্বার দিয়ে প্রবেশ করে গুণী; কিন্তু সাফল্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ করবার

আরও অনেক ছিদ্রপথ আছে, যেমন ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডে গ্যালারির তলা দিয়েও লোক ঢোকে। সেই ছিদ্রপথে পূরো মানুষটা গলে না, যদি না কিছু মনুষ্যত্ব বার ক'রে তাকে চুপসে নেওয়া হয়। এইভাবে অনেক মানুষ, অনেক জাতি চক্ষুলজ্জা কাটিয়ে ওঠে; তাদের প্রধান গৌরব যে, তাদের আর কোথাও বাধছে না, না বিবেকে, না হৃদয়ে; তার ফলে মুখচোরাদের, দুর্বলদের ভালমানুষির সুযোগ নিয়ে ক্রমেই স্ফীত হয়ে ওঠে তাদের সাফল্য; তখন তাদের ধর্ম রাজনীতির দাসত্ব করে, তাদের বিজ্ঞান যুদ্ধের মজুরি খাটে, আর তাদের সাহিত্য অবলম্বন করে গণিকাবৃত্তি।

পৃথিবীর মানচিত্র আজ আর স্থির থাকতে চাইছে না, চলচ্চিত্র হয়ে উঠছে। সফল জাতিদের দুর্ব্বলতর ধরা প'ড়ে গিয়েছে। এমন কি সবচেয়ে সুবিধাবাদী জাতিরাও আজ টের পেয়েছে, জাতীয় চরিত্র গঠন না করলে আর টিকে থাকা যাবে না। কিন্তু প্রশ্ন এই, কোন্ আদর্শের অনুরূপ ক'রে গড়া হবে জাতীয় চরিত্র? যুদ্ধের আদর্শ, না শান্তির আদর্শ? সৃষ্টিশীল বিজ্ঞানের আদর্শ, না ধ্বংসশীল? বন্ধুত্বের আদর্শ, না জাত্যভিমানের? পরস্পরকে বঞ্চিত ও প্রবঞ্চিত ক'রে বড় হবার আদর্শ, না পরস্পরকে সাহায্য ও সেবা ক'রে সমান সুখী হবার আদর্শ?

ভারতবর্ষকে আজ এই সঙ্কল্প করতে হবে—

বিদেশীর শক্তি, রুচি, শিক্ষার কাছে আর আমরা কাদার পিণ্ডের মত হয়ে থাকব না। আমাদের জাতীয় চরিত্র আমাদের নিজেদের গঠন করতে হবে।

তাই ব'লে পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে, ঘটনার স্রোত থেকে পালিয়ে নিজের স্বাতন্ত্র্যের কারাগারে নিজেকে বন্দী ক'রে রাখব না।

ব্যক্তিগত জীবনেই হোক আর জাতীয় জীবনেই হোক, নূতনের জন্যে দোর খোলা রাখব। কিন্তু রীতিমত পরীক্ষা না ক'রে কোন নূতনকেই শুধু নতুন ব'লেই ঘরে স্থান দেব না।

বাঞ্ছিত নতুনের সঙ্গে যে আনুরূপ্য, সে শুধু পুরনো চরিত্রের ওপর জোড়াতালি দিয়ে মেরামতের কাজ নয়, সে হ'ল নতুন ব্যক্তিত্বের মধ্যে পুনর্জন্ম। অনেক দুঃখ, অনেক ত্যাগ, অনেক ভাবনা, অনেক বিরোধের মধ্যে দিয়ে সেই পুনর্জন্মে পৌঁছতে হয়; তবু আমরা আলস্য করব না, দ্বিধা করব না, দৃঢ়পদে এগিয়ে যাব আমাদের পরিণতির দিকে।

শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার

সংবাদ-সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'কড়ি ও কোমলে'র "তনু" কবিতাটির শেষ পংক্তি "ত্রয়োদশ বসন্তের একগাছি মালা"র ত্রয়োদশকে যথাক্রমে চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও সপ্তদশ করিয়া যে ভাবে যুগের সহিত তাল রাখিতে চাহিয়াছিলেন, প্রতি বর্ষের শেষে নিরুপায় আমরাও ঠিক তাহাই করিয়া চলিয়াছি। গত বৎসর পঞ্চদশী ষোড়শী হইয়াছিল, এবারে ষোড়শী 'শনিবারের চিঠি' সপ্তদশী হইল। এই ক্রমিক আঙ্কিক পরিবর্ত্তন ছাড়া প্রকৃতিগত পরিবর্ত্তনের সাধ আমাদের থাকিলেও নানা কারণে তাহা সাধ্য নয়। যুদ্ধের ওজুহাতে ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্যদের মত পরাধীনতার ওজুহাতে আমাদের সমাজে শিল্পে সাহিত্যে ও শিক্ষায় মারাত্মক গতানুগতিকতা ও নিষ্ক্রিয়তা অচল অটল আসন লইয়া আছে। মারাত্মক বলিলাম এই কারণে যে, এখন পর্যন্ত আমাদের প্রভুদের দৃষ্টান্ত ও আদর্শ মানিয়াই এই সকল ক্ষেত্রে আমাদের কারবার চলিতেছে। নিজস্ব স্বাধীন ইচ্ছার বলে আমাদের কিছু করিবার সামর্থ্য নাই। আমরা কি লিখিব, কি বলিব—কতখানি লিখিব, কতখানি বলিব, প্রভুরাই তাহা নির্ধারণ করিয়া দিতেছেন। যে দৈনিক সংবাদপত্র দেশের জনমত গঠন করে, তাহাদের পূর্বাপর ইতিহাস অনুধাবন করিয়া দেখিলেই আমাদের উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইবে। ঝড়ের মুখে কুটার মত লোভ বা ভয়ের মুখে ইহাদের ধর্ম ও জাতীয়তা মুহুর্মুহু শূন্যে বিলীন হইতেছে; যে অন্যায়-অবিচারের প্রতিরোধকল্পে ইহাদের জন্ম, শক্তিমানদের চক্রান্তে ইহারা তাহারই সমর্থক হইয়া দাঁড়াইয়া দেশের দুর্দশা-বৃদ্ধির কারণ হইতেছে। ফলে ধীরে ধীরে জাতীয় চেতনা জড়তাগ্রস্ত হইয়া আমাদের সকলকেই প্রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষে আমাদের স্বাধীনতা-অপহারী রাজশক্তিরই সহায়ক করিয়া তুলিতেছে। দেশের মসীজীবীরা জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিতেছে, তাহাতে আমাদের মূল লক্ষ্যটাই দূরে চলিয়া যাইতেছে, নানা অনাবশ্যক আনুষঙ্গিক ব্যাপার লইয়া আমরা মারামারি কাটাকাটি করিয়া কৌশলী কর্তাদের আত্মপ্রসাদের কারণ ঘটাইতেছি।

* * *

সপ্তদশ বর্ষের প্রাক্কালে এই অস্বস্তিকর চিন্তায় পীড়িত হইতেছিলাম, হঠাৎ সংবাদ পাইলাম, কর্মীর অভাবে ছাপাখানা অচল হইতে বসিয়াছে। কলিকাতার বেলেঘাটা-নারিকেলডাঙা প্রভৃতি যে অঞ্চলে আমাদের যন্ত্রচালকদের বাস, কঠিন ম্যালেরিয়া-রোগে সে অঞ্চল বিধ্বস্ত হইতেছে, বহু বাড়িতে মুখে জল দিবার উপযুক্ত কোনও সুস্থ লোক নাই। উত্তর-বিহারে কলেরা এবং সারা বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়ার নিদারুণ প্রকোপের সংবাদ আমাদের কাছে সংবাদপত্রগত তথ্য মাত্র ছিল, সহসা অনুভব হইল, তাহা ভয়াবহ সত্যের আকার লইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। রাষ্ট্রিক যে অব্যবস্থার ফলে গত বৎসরে লক্ষ লক্ষ লোক মরিয়া বাংলা দেশকে শ্মশান করিয়া গিয়াছে, এ বৎসর তাহার জের মহামারীর মধ্য দিয়া সর্বত্র প্রকাশ পাইতেছে, অনাহার ও অর্ধাহারজনিত দৈহিক দুর্বলতা

মহামারীতে পরিবর্তিত হইয়া বাঙালী জাতটাকে মুমূর্ষু ও পঙ্গু করিয়া ছাড়িতেছে। মাঠে ধান কাটিবার, নদীতে মাছ ধরিবার লোক নাই—অন্যান্য যে সকল জাতি বা সম্প্রদায় সমাজকে নানাভাবে সেবা করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিয়া থাকে, ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের সংখ্যা তো হ্রাস হইয়া আসিয়াছেই। ব্যাপকভাবে প্রতিষেধক বণ্টন করিয়া একমাত্র গবর্মেণ্টই এই ক্ষয় নিবারণ করিতে পারিতেন। তাঁহারা তাহা না করিয়া অতিরিক্ত লাভের লোভ দেখাইয়া তাহাদিগকে অন্যত্র নিয়োগ করিয়া সমাজে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা আরও কঠিন এবং অসম্ভব করিয়া তুলিতেছেন। এরূপ অবস্থার সহিত আমরা আমাদের উপকরণ ও শক্তি লইয়া যথাযথ লড়িতে পারিতেছি না বলিয়া 'শনিবারের চিঠি' প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়া গেল। সহৃদয় পাঠকেরা ক্ষমা করিবেন। পূজাবকাশের পর বিলম্বিত প্রীতিসম্ভাষণ আমাদের অক্ষমতাবশতই কটু হইবার উপক্রম হইয়াছে—আমরা করজোড়ে মার্জনা চাহিতেছি।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের পর বাংলা দেশে যে তুমুল আলোড়ন হইয়াছিল, ব্যবসা-বাণিজ্য-শিক্ষা-সংস্কৃতিতে ইংরেজের সর্বগ্রাসী প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া স্বস্থ ও স্বপ্রতিষ্ঠিত হইবার যে আগ্রহ সর্বত্র দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে স্থায়ী সুফল ফলিয়াছিল এই কারণে যে, বাংলা দেশের চিন্তাশীল স্রষ্টা সাহিত্যিক ও কবি-সমাজের চিত্তও পরাধীনতার বেদনায় গ্লানিবোধ করিয়া উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। এই নিগূঢ় ও নিবিড় বেদনাকে তাঁহারা রূপ দিয়াছিলেন তাঁহাদের কাব্যে, গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে। তখনকার কর্মীরা আশ্বস্ত ও ভরসাগ্রস্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের নিরলস কর্মের পশ্চাতে দেশের শ্রেষ্ঠ ভাব ও চিন্তার সমর্থন ছিল জানিয়া। সে যুগের ভাবুক এবং কর্মী উভয় সম্প্রদায় পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই কয়েকটা সাময়িক বিপ্লবাত্মক উচ্ছ্বাসেই বাঙালীর নবজাগরণ পর্যবসিত হয় নাই। ব্যবসায়ে-বাণিজ্যে স্থাপত্যে-শিল্পে মিলে-কলে সর্বত্রই সেই আন্দোলন একটা স্থায়ী ছাপ রাখিয়া যাইতে পারিয়াছে। শুধু সাহিত্যিকদের সমর্থন ছিল বলিয়াই সেদিনের বিপ্লব কেবলমাত্র সমতলস্পর্শীই হয় নাই, সমগ্র জাতির জীবনের গহনগভীরেও তাহা শিকড় বিস্তার করিয়াছিল।

আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর অতীত হইতে চলিয়াছে, ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ সমাগতপ্রায়। মাঝখানে বৃহত্তর পটভূমিকায় যে কয়েকটি বৃহত্তর আন্দোলন হইয়া গেল, তাহাতে বাঙালীর চিত্ত বিত্ত ও রক্তপাত পরিমাণে কিছু কম হয় নাই, বাঙালী কর্মী ও যুবকদের সর্ববিধ ত্যাগস্বীকার ও কৃচ্ছ্রসাধন সমস্ত পৃথিবীর বিস্ময়েরই উদ্রেক করিয়াছে, অথচ নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, সমগ্র বাঙালী-জাতির জীবনচেতনায় এই সকল আন্দোলন সার্থক আলোড়নের সৃষ্টি করে নাই। অনুসন্ধান করিলে ইহার একমাত্র কারণ ইহাই লক্ষিত হইবে যে, কবি সাহিত্যিক ও শিল্পী-সম্প্রদায় তাঁহাদের সৃষ্টি ও রচনায়

মাঝখানের এই ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধনাকে মহিমান্বিত করেন নাই। যে কারণেই হউক, তাঁহারা সন্দেহ করিয়াছেন, দূরে দূরে থাকিয়াছেন, পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন অথবা সহানুভূতির অভাবে ব্যঙ্গ করিয়াছেন। সত্য বটে, তাঁহাদের মন সেদিনও পর্যন্ত ১৯০৫ সালের বিপ্লব-যজ্ঞকে কেন্দ্র করিয়াই কাব্যসৃষ্টি করিয়াছে, অতীতকে বড় করিয়া দেখিয়া বর্তমানের সত্যকার মহিমাকে তাঁহারা উপেক্ষা করিয়াছেন। ইহার কারণ শুধু তাঁহাদের অতীত-প্রীতিই নয়, নূতন যজ্ঞের হোতারাও সমগ্র ভারতের পটভূমিকায় সুবৃহৎ গৌরবে তাঁহাদিগকে আত্মীয়তায় উদ্বুদ্ধ না করিয়া অনাদরে তুচ্ছ করিয়াছেন। তাই এ যুগের কবিরাও কাব্যে অসহযোগ আন্দোলনের মহিমাকীর্তন না করিয়া সেই পুরাতন বিপ্লবীদেরই বন্দনা গাহিয়াছেন—

যাহারা শোণিতসিক্ত পদচিহ্নে পথ রচি বিক্ষুব্ধ ধূলায়,
উত্তপ্ত বুকের রক্তে মৃতপ্রায় জননীর করিল তর্পণ—
মানবের মহালোভ, বাঁচিবার লোভ যারা ত্যজিল হেলায়,
নিশ্চিন্তে জীবনযাত্রা অমারাত্রি সার করি কৈল বিসর্জন;
স্বাধীনতা সঁপি দিতে বহুলক্ষ ভাষাহীন আশাহীন জনে,
ঘর ছাড়ি পথে পথে নিরাশ্বাস নিরুদ্বেগে ফিরি দীর্ঘ দিন
কলঙ্ক বরিল কেহ, কেহ মৃত্যু—মহোল্লাসে প্রেম-আলিঙ্গনে;
জীবনের সর্ব আশা স্বেচ্ছাবৃত অপঘাতে করিল বিলীন;
ক্লেদ-পঙ্ক-সমাকীর্ণ এ তিমিরে তাহারা আলোক-বার্তাবহ,
তাহারা জানিয়াছিল দিশাহীন অন্তহীন নহে পারাবার,
ওরে হতভাগ্য দেশ, তাদেরে স্মরণ করি মৃত্যুদীক্ষা লহ,
নবাগত হে পথিক, বিগত পথিকদলে কর নমস্কার!

তাদের বুদ্ধিরে ল'য়ে শুনিয়াছি পণ্ডিতেরা করে আলোচনা,
কেহ কহে মূর্খ তারা, দম্ভসার, চলেছিল ভুল পথ ধরি,
জীবনের রাজপথে চলিতে অক্ষম তারা, কৈল আনাগোনা
অলক্ষ্য অরণ্যপথে অন্ধকারে ত্রস্তপদে দিবা-বিভাবরী—
মানব-কল্যাণ লাগি গূঢ়গুহাশায়ী হয়ে অলক্ষিত লোকে
অমৃত-সন্ধানী তারা চিরমৃত্যু-আশঙ্কায় যাপিল জীবন—
মানি না তাদের কথা, আমি জানি অনির্বাণ প্রাণের আলোকে
উদ্ভাসিত ভাল যার, মৃত্যুভীত কাপুরুষ নহে সেই জন।
লক্ষ লক্ষ অক্ষমের অপমানে আপনার অপমান মানি
সুকঠোর দৃঢ় হস্তে যে খুঁজিল প্রতিদিন তার প্রতীকার—

কাপুরুষ-অপবাদ নহে তার, কভু নহে, ইহা সত্য জানি
নবাগত হে পথিক, বিগত পথিকদলে কর নমস্কার!

হয়তো করেছে ভুল, হয়তো বা অকস্মাৎ বিনা প্রয়োজনে
করেছে মৃত্যুর পূজা, সুনির্মম, চাহে নাই প্রিয়জন পানে—
জননীর আঁখিজল শুকাইল ঝরি ঝরি বিনিদ্র নয়নে,
প্রিয়ার পাণ্ডুর ওষ্ঠ আজো কাঁপে রহি রহি রূঢ় প্রত্যাখ্যানে।
সুকোমল গৃহশয্যা ডাক দিল আজো তবু রয়েছে অম্লান,
মহামৃত্যু-সাধনায় মিটিয়াছে সন্ন্যাসীর অতৃপ্ত পিয়াস,
স্তব্ধ হ'ল আঁখিতারা, যা খুঁজেছে বুঝি তার মিলেছে সন্ধান :
মহাকাল ঊর্ধ্বে থাকি নেয় বলি, তবু যেন করে উপহাস।
আমরা কাঁপিয়া উঠি অকস্মাৎ বিলম্বিত আরাম-শয্যায়,
আকাশে খসিল তারা, লাভ-ক্ষতি কে গনিবে ধূলির ধরায়?
তাদেরে দিও না গালি, হে শঙ্কিত, ঢাকিবারে আপন লজ্জায়,
মৃত্যু বরিয়াছে যারা মৃত্যুভয়ে, তাহাদেরে কর নমস্কার।

* * *

কিন্তু সমগ্র ভারতের পরাধীনতা-মুক্তির জন্ম যে মহত্তর সাধনা ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশের মাটিতেই আরব্ধ হইয়াছিল, এবং যে মুক্তির আহ্বানে হাজার হাজার বাঙালী-যুবকের চিত্ত সাড়া দিয়াছিল, তাহাকে জয়যুক্ত করিয়া বাংলা সাহিত্য আজও পর্যন্ত ধন্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই। বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার জন্ম যে সাময়িক আন্দোলন ঘটিয়াছিল তাহার ফলেই বাংলা সাহিত্য স্থায়ীভাবে পুষ্ট হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে-কবিতায় প্রবন্ধে-গল্পে-উপন্যাসে, প্রভাতকুমারের গল্পে, রজনীকান্ত সেনের গানে, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সাংবাদিকতায়, বিপিনচন্দ্র পালের বজ্রনির্ঘোষে, সখারাম গণেশ দেউস্করের দেশের কথায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বাংলার ব্রতকথায়। সেদিনের শরৎচন্দ্র-তারাশঙ্করও সেই বহ্নি-বিপ্লবের স্মরণেই 'পথের দাবী', 'ধাত্রী দেবতা' রচনা করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী রচনা 'ঘরে-বাইরে' ও 'চার-অধ্যায়'ও সেই বিপ্লবেরই ক্ষীণ স্মৃতিমাত্র। সেই বিপ্লবে যাঁহাদের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল তাঁহাদের স্মৃতি-কথাও কিছু কম চিত্তাকর্ষক হয় নাই, বৈদেশিক ভাষায় অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথের সাধনার কথা নাই বলিলাম। কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষের যে মুক্তিযজ্ঞ সারা ভারতের মাটিতেই গত দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইতেছে, যাহার পশ্চাতে আরও দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসরের গৌরবময় ইতিহাস রহিয়াছে, সেই যজ্ঞে বহু বাঙালীর যৌবন ও জীবন, দেহ ও প্রাণ আহুতি দেওয়া সত্ত্বেও বাংলার

সাহিত্যক্ষেত্রে এই মহাযজ্ঞকে কেন্দ্র করিয়া সামান্য অঙ্কুরোদগম কেন হয় নাই, তাহার জবাবদিহি কি আজ শুধু বাঙালী সাহিত্যিকেরাই করিবে?

*   *   *

কারণ যাহাই হউক, দুর্ঘটনা যাহা ঘটিবার ঘটিয়া গিয়াছে। বাঙালী সাধক ও কবিদের এই পরস্পর-অপরিচয়ের ফাটল দিয়া অবাঞ্ছিত বৈদেশিক বহু ভাববাদ বাংলা দেশে প্রবেশ করিয়া বাংলা দেশের তরুণ মনকে বিক্ষিপ্ত বিভ্রান্ত করিয়া আমাদের স্বাধীনতা-আন্দোলনকে যে পিছাইয়া দিয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। যে পথে রামমোহন, ভূদেব, রাজনারায়ণ, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ মহাভারতের মুক্তিসন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন, সেই পথেই ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইয়া আমাদের জাতীয় চেতনার পরিধি তথাকথিত উচ্চশ্রেণী হইতে নিম্নশ্রেণী এবং শিক্ষিত-সমাজ হইতে অশিক্ষিত-সমাজের মধ্যে বিস্তৃত করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহার কাজ যে নিষ্ফল ও বাতিল হইয়া গিয়াছে, এমন কথা আমাদের স্বাধীনতার শত্রুরাও বলিবেন না। তথাপি বহু ক্ষেত্রে এই কংগ্রেসকে ছোট করিবার, বর্জ্জন করিবার প্রয়াসের অন্ত দেখি না। যে ডালে মানুষ উপবেশন করিয়া থাকে, সেই ডাল কাটিবার মত বাতুলও তাহাদের মধ্যে থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদিগকে সজ্ঞানে আনিবার জন্য যে শাসন দরকার, সুস্থ মানুষেরা তাহার প্রয়োগে ইতস্তত করিলে সকলের সমূহ অমঙ্গল। সেই অমঙ্গল নিবারণের সময় আসিয়াছে। এই ব্যাপারে বাঙালী সাহিত্যিকদেরও বিপুল কর্ত্তব্য রহিয়াছে। সত্যকার কর্ম্মীদের উৎসাহিত করিবার, সুস্থ করিবার, স্বস্থ করিবার সাময়িক দায়িত্ব তো তাঁহাদের আছেই, ভবিষ্যৎ-কর্ম্মীদের জন্য সাহিত্যসৃষ্টির মারফৎ পথনির্দেশ তাঁহাদিগকেই করিতে হইবে। যে যজ্ঞ আরব্ধ হইয়াছে, এক-আধ পুরুষেই তাহা শেষ হইবার নহে, মন্ত্রবলে আমাদের কাম্য স্বাধীনতা-ফলও আমরা অকস্মাৎ হাতে পাইব না; মৃত্যুর মধ্যে, দুর্ভিক্ষের মধ্যে, অনাহারের মধ্যে, পীড়ন-অত্যাচারের মধ্যে, কারাগার-নির্বাসনের মধ্যে যুগে যুগে সংগ্রাম করিয়া স্বাধীনতা লাভের অধিকার আমাদিগকে অর্জন করিতে হইবে। কর্ম্মীরা সংহত অথবা বিক্ষিপ্তভাবে তাঁহাদের কাজ করিয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের যাত্রাপথের সঙ্গীত যে সকল শিল্পী কবি ও সাহিত্যিক রচনা করিবেন, তাঁহাদিগকেও স্ব স্ব কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে। ডাক দিয়া শ্মশান-বন্ধু সংগ্রহ করার কাজও কাজ।

—

আমাদের এই ব্যর্থতা সত্ত্বেও অনেকে দাবি করিতেছেন, বাংলা সাহিত্যে নূতনের অভ্যাগম হইয়াছে—যে নূতন পুরাতনকে নিষ্প্রভ করিতে বসিয়াছে। এই নূতন সাহিত্য নাকি বিশিষ্ট মতবাদের সাহিত্য। কিন্তু নবজন্মের বেদনা-বিক্ষোভ এই কালের মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করি নাই। নূতনের প্রকাশ আমরা যতটুকু দেখিতেছি, তাহাতে নাক-মুখ-চোখ-কানের কোনও বালাই নাই—স্থূল মাংসপিণ্ডের ইঙ্গিত-বিক্ষেপকে অক্রমের

আর্তনাদ অথবা সঙ্কমের ইয়ার্কি বলিয়াই ভ্রম হইয়াছে। এই দুইয়েরই বিরুদ্ধে আমরা নালিশ জানাইয়াছি। পাষাণ-প্রাচীরবেষ্টিত কারাগারের মধ্যে যদি সত্য সত্যই নূতনের জন্ম হইয়া থাকিত, তাহা হইলে তাহার বেদনা আমরা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতাম। যদুবংশীয় অপোগণ্ডদের বেদন-বিরহিত মুষল প্রসবে ধ্বংসই সূচিত হইয়াছিল। যদি সত্যকার কিছু সৃষ্টি আমরা প্রত্যক্ষ করিতাম, তাহা হইলে এই নূতন মতবাদকেও আমরা মাথা পাতিয়া স্বীকার করিতাম, কারণ আমরা সোভিয়েট রুশিয়ার শ্রেষ্ঠতম মনীষীর মুখ হইতেই শুনিয়াছি—"The development of art is the highest test of the vitality and significance of each movement." আধখানা চাঁদ ও সিকিখানা কাস্তে দেখিয়া বিগলিত হইবার মত আদেখলেপনা আমরা প্রকাশ করিতে পারি নাই, বঞ্চিতের লাল রবিবারকে ধনিকের লাল শনিবারেরই রকমফের বলিয়া বোধ হইয়াছে, নীপারের বাঁকে আমরা ভিন্নতর শৃঙ্খলেরই আভাস দেখিয়াছি, জবানবন্দী নূতনের জবানবন্দী নয়, নবান্নে পুরাতন অন্নই পরিবেশিত হইতেছে মাত্র।

* * *

হইবে না কেন? সত্যকার শিল্প ও সাহিত্য-সৃষ্টি এত সহজ ব্যাপার নয়, এখানে অশিক্ষিত মজুর-প্রধানদের মাতব্বরি কোন কালেই স্বীকৃত হইবে না, এ রাজ্যে অবকাশ ও প্রাচুর্যের চিরদিন প্রয়োজন থাকিবে, মজুরদের সাইরেন-শাসিত কর্মব্যস্ততা ইহার পরিপোষক নয়। ইউ. এস. এস. আর.-এর স্রষ্টা একজন বলিতেছেন—

Culture feeds on the sap of economics, and a material surplus is necessary, so that culture may grow, develop and become subtle. Our bourgeoisie laid its hand on literature, and did this very quickly at the time when it was growing rich. The proletariat will be able to prepare the formation of a new, that is, a Socialist culture and literature, not by the laboratory method on the basis of our present-day poverty, want and illiteracy, but by large social, economic and cultural means. Art needs comfort, even abundance. Furnaces have to be hotter, wheels have to move faster, looms have to turn quickly, schools have to work better.

* * *

ঈদ এবং দুর্গাপূজা উভয় বাজারেরই শিকারী একদল নব্যপন্থীর সাহিত্য-সভায় নাকি একজন সাহিত্যিক এখনও ঈশ্বর মানেন বলিয়া নস্যাৎ হইয়া গিয়াছেন। শোনা কথা। সত্য হইলে বেচারা রবীন্দ্রনাথ তো ইহাদের সমাজে অপাংক্তেয় হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের বেদ-কোরান যাঁহারা বানাইয়াছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের কথা যদিচ বলেন নাই, তবুও স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন—

If nature, love or friendship had no connection with the social spirit of an epoch, lyric poetry would long ago have ceased to exist.

যাক, ইহারা ঈশ্বর না মানিলেও যে পুরাদস্তুর মাণিকপীরের উপাসনা করিতেছেন, তাহাতেই আমরা খুশি আছি।

বর্ত্তমান সংখ্যা (আশ্বিন, ১৩৫১) 'কবিতা'য় ১৩২৫ বঙ্গাব্দের ৪ অগ্রহায়ণ তারিখে শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্ত্তীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। অমিয়-বাবু সম্ভবত তখন "টিনে" (in his teens) ছিলেন—অবশ্য আজও তিনি টিনেই আছেন! রবীন্দ্রনাথ এই অকাল-বিশ্ববখাটে বালককে তখনই লিখিয়াছিলেন—

"মনকে হৃদয়কে নিজের মধ্যে সংহরণ করে রেখো না, তাকে বিকীর্ণ করে দাও—তুমি যে আপনার ভারে আপনি পীড়িত সেই ভারটা কেটে যাক।"

আজ আমরা সকলেই জানি ভক্ত শিষ্য এই অনবধানতাপ্রদত্ত গুরু-উপদেশের চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়াছেন; মনকে হৃদয়কে নিজের মধ্যে সংহরণ করিয়া অমিয়বাবু কখনই রাখেন নাই, শুধু বিকীর্ণ কথা নয়, চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া গম্য অগম্য সকল স্থানেই ছড়াইয়া দিয়াছেন। আপনার ভারে আপনি পীড়িতও কখনও থাকেন নাই তিনি, সুকৌশলে অপরের স্কন্ধে ভার কাটাইয়া আসিয়াছেন। ইহার জন্য রবীন্দ্রনাথ শেষ দিন পর্য্যন্ত "জীতা রহো বাচ্চা" বলিয়া মনে মনে শিষ্যকে আশীর্বাদ করিয়া গিয়াছেন।

* * *

কিন্তু আমাদের আসল বক্তব্য ইহা নয়। আজ আমরা এতদিন পরে স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি (ভাগ্যে চিঠিটি প্রকাশিত হইয়াছে!) যে, অমিয়বাবু সেই শ্রেণীর হনুমান-ভক্ত যাহারা ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনে, বিশল্যকরণী চাহিলে গন্ধমাদন আনিয়া হাজির করিয়া দেন। বেচারা রবীন্দ্রনাথ মন বলিতে সাদাসিধা মনই বুঝিয়া-ছিলেন, কিন্তু অমিয়বাবু তাহার অর্থটা অবচেতন মন পর্য্যন্ত টানিয়া আনিয়া যত গোল বাধাইতেছেন। তিনি কিছুদিন হইতে যে ভাবে অবিরত তাঁহার অবচেতন মনকে সর্বত্র বিকীর্ণ করিয়া চলিয়াছেন, আমাদের তো ভয়ই হইতেছে! এই সেদিনও ১৩৫১-র 'বৈশাখী'তে তাঁহার "রাঙা আগুন" শীর্ষক অবচেতন মন আমাদের যাবতীয় বোধশক্তিকে খাক করিয়া দিয়াছে। আমাদের পাঠকদেরও নিষ্কৃতি দিব না, বুঝুন তাঁহারা—

"বাসনার ফুল জ্বলে দাউ দাউ
রক্তিম দাহে মনের স্নায়ুতে স্নায়ুতে—
সে-আগুনে সারা সূর্যের শিখা ছায়া ক'রে দেয়;
পাণ্ডুর সংসার।
এনেছ এ কী এ ভস্মের আয়ু,
ছাই করবার জ্বালা;
ও মশাল নিয়ে দূরে যাও তুমি,
মায়ীর পথিক, সন্ধ্যা রক্তপথে।
তবু শোনো, তবু শোনো,
চেয়ে দেখো ঐ পথের দুধারে শান্ত আকাশে অজস্র

রাঙা গোলাপের স্নিগ্ধ আগুন কেন্দ্রিক স্থির ;
আজো ফুটে আছে প্রথম প্রেমের ব্যথা।
পুষ্পিত ওর লাল উচ্ছ্বাসে
জানো কি তোমারি ভোরের কামনা তৃষ্ণাহরা।
আমার টেবিলে মাটির পাত্র
হাতে চিত্রিত,
সবুজ পাতার মধ্যে উঠেছে দুটো রাঙা জবা ;
তারি দিকে চোখ পড়ে।
লিখি আর নানা ভাবনায়
সুন্দর তার তীব্র শোণিমা ছড়ায় প্রান্তে প্রান্তে।
বাসনার ফুল বনে বনে দেখ ফোটে নির্দাহ,
সৌরসকালবেলার আলোক ঢেলে দেয় আজো শেষ সায়াহ্নে।"

* * * *

ব্যাপারটা আমাদের এক ডাক্তার সাহিত্যিক বন্ধুর কর্ণগোচরে আনাতে তিনি চটিয়া হারমোনিয়াম-জাতীয় কি একটা ব্যবস্থা দিলেন, আমরা তাঁহাকে বেশি ঘাঁটাইতে সাহস করিলাম না। তিনি নাকি ওই ১৩২৫এর দিকেই চক্রবর্তী মহাশয়কে ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন!

পূজা-সংখ্যা 'দীপালী'তে "মিনতি" কবিতায় কবি শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

"এই রজনীতে দেয়া আর নেয়া অবসান :
তনুতটে তনু হারাক আপন সীমানা।
ঘিরে থাক মোরে বেদনাবিধুর তব গান
তোমার আমার এক হয়ে যেতে কী মানা।"

লেনাদেনা যখন চুকিয়া গিয়াছে, তখন কাহারও মানা থাকিবার কথা নয় ; তথাপি আমরা সাক্ষী থাকিতে প্রস্তুত নই। সীমানার ব্যাপারে অনেক হাঙ্গামাতেই পড়িয়াছি কিনা!

—

স্থানাভাবে পুস্তক-পরিচয় দেওয়া সম্ভব হইল না।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শনিবারের চিঠি
১৭শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৫১

বাংলার নবযুগ ও স্বামী বিবেকানন্দ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৫

বিবেকানন্দের আরও কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিব। যদিও সকল উক্তির মূলে এক কথাই আছে, তথাপি সেই একটি কথা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য আমি আরও কয়েকটি নির্ব্বাচন করিয়া দিলাম।—

It is better not to believe than not to have felt.

* * *

Unity is the test of truth. Love is truth and hatred is false, because hatred makes for multiplicity.

* * *

Man has never lost his empire. The soul has never been bound. Believe that you are free, and you will be!

* * *

The East worships simplicity and herein lies one of the main reasons why vulgarity is impossible to any Eastern people.

* * *

As soon as you say, you are a little mortal being, you are hypnotising yourself into something vile and weak and wretched.

* * *

Religion is neither word nor doctrine. It is to be and become, not to hear and accept. It is the whole soul changed into that which it believes.

* * *

Be like an arrow that darts from the bow. Be like the hammer that falls on the anvil. The arrow does not murmur if it misses the target. The hammer does not fret if it falls in the wrong place. The sword does not lament if it breaks in the hands of the weilder. Yet there is joy in being made, used and broken; and an equal joy in being finally set aside.

"Man has never lost his empire. The soul has never been bound"—ইহাই সেই বৈদান্তিক আত্ম-তত্ত্ব; তথাপি ইহা যে কেবল তত্ত্বমাত্র নয়—জগৎ ও জীবনের সহিত অসঙ্গতা রক্ষা করিয়া, যোগাসনে বসিয়া সেই তত্ত্বকে আত্মগত করাই যে পরমপুরুষার্থ নয়, বিবেকানন্দ তাহাই প্রচার করিয়াছেন; সেই তত্ত্বের বিদ্যুৎকে ধরিয়া মনুষ্যজীবন-রূপ শক্তিযন্ত্রে তাহাকে বাঁধিয়া দিতে চাহিয়াছেন। এ

ব্যাপারে বিশ্বাস—আত্ম-বিশ্বাসই—সর্ব্বশক্তির মূল; জগৎ হইতে এ ধরনের বিশ্বাস প্রায় লোপ পাইয়াছে; অথচ এই বিশ্বাস যে কত বড় শক্তি তাহা আমাদের এযুগের কবিও একবার ভাব-দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—

মুহূর্ত্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে ভীত তুমি, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।

—'যখনি জাগিবে তুমি'—এই জাগাটাই যে সব! ইহার জন্য চাই বিশ্বাস, তাই কবিও সেই বিশ্বাসকে সকলের উপরে স্থান দিয়াছেন—

এ দৈন্য মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হ'তে বিশ্বাসের ছবি।

বিবেকানন্দ এই সত্যকেই একেবারে বাস্তব জীবনের সাধনমন্ত্ররূপে, তাঁহার নিজেরই চরিত্র ও জীবনের দ্বারা যেন প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিয়াছিলেন। নরেন্দ্রের সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের যে ভবিষ্যৎ-বাণী অতিশয় মূল্যবান বলিয়া মঃ রোলাঁ উদ্ধৃত করিয়াছেন—আমিও ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি—তাহাও এখানে স্মরণীয়,—

His strong faith in himself will be an instrument to reestablish in discouraged souls the confidence and faith they have lost.

বিবেকানন্দও ইহাকেই উদ্ধারের একমাত্র উপায় বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, religion বা ধর্ম্মসাধনা বলিতে তিনি ইহাই বুঝিতেন,—"It is the whole soul changed into what it believes"। মনুষ্য-সাধারণ একই কালে একসঙ্গে এই পথে উঠিতে পারে না—এ পর্য্যন্ত কোন লোকশিক্ষক বা জগৎ-গুরু তেমন আশা করেন নাই। কিন্তু একজন পুরুষের মধ্যেও যদি সেই সত্য দিব্যদীপ্তিমান্ হইয়া উঠে তবে আরও দশজন সেই জ্যোতির সান্নিধ্যে জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠিবে; এবং—"The history of the world is the history of a few men who had faith in themselves"। ইহাই ছিল বিবেকানন্দের ভরসা ও বিশ্বাস। যে আপনাকে এতখানি বিশ্বাস করে সে মানুষকে বিশ্বাস না করিয়া পারে না; তেমনই, এত বড় আত্মবিশ্বাসীকে দেখিয়া মানুষও আপনাকে বিশ্বাস করিতে শেখে। বিবেকানন্দের বাণীর পশ্চাতে ছিল তাঁহার সেই শক্তি-ঘন পুরুষ-সত্তা—dynamic personality; সে যেন জড়ত্বকে প্রবলভাবে আঘাত করিবার এক মূর্ত্তিমান ঘনীভূত চৈতন্য! নহিলে এ বাণীর কোন ব্যবহারিক মূল্য থাকিত না। ঠিক এই প্রসঙ্গে সাময়িক-পত্রে উদ্ধৃত, ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকারের একটি মন্তব্য চোখে পড়িল, তাহা এই,—

The emergence of spirit from the bondage of nature is the desideratum in life's movement. But this emergence is a slow process; the advent of a

great soul by its spiritual influence can hasten the emergence, but a too swift process becomes fruitful in producing confusion and chaos.

,—পড়িয়া মনে হয়, সরকার মহাশয় তত্ত্বহিসাবে যাহাকে স্বীকার করেন, তথ্য হিসাবে সে বিষয়ে তাঁহার কিছু সন্দেহ আছে। সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক, আমাদেরও হয়, তাই এত কথা লিখিতে হইতেছে। দার্শনিকের অপরোক্ষ-দর্শন নাই, তাই বিশ্বাসও নাই,—চিন্তার সূক্ষ্ম তন্তুজাল সূক্ষ্মতর করিয়া তুলিতেই তিনি নিপুণ; 'মায়া'র বিচিত্র বসনখানির মূল্য যাচাই করিয়াই তিনি কৃতার্থ বোধ করেন, তাহাকে কিনিয়া পরিবার বা টানিয়া ছিঁড়িবার—জীবন-রহস্য-সাগরে অবগাহন ও সন্তরণ-শেষে তাহার তলে পৌঁছিবার—শক্তিও তাঁহার নাই, প্রবৃত্তিও নাই। কিন্তু এইরূপ দার্শনিক চিন্তাশীলতারও প্রয়োজন আছে,—জীবনের অকূল অগাধ বারিরাশিতে ঝাঁপ দিয়া তাহারই তরঙ্গচ্ছন্দের সহিত নিজের প্রাণস্পন্দন মিলাইয়া সত্যের যে অপরোক্ষ জ্ঞান, তাহা না থাকিলেও, চিন্তার সাহায্যে তাহার যে একটা পরোক্ষ পরিচয় আমরা তাঁহার নিকটে পাইয়া থাকি—আমাদের মত মানুষের তাহাই একমাত্র সম্বল। তাই সরকার মহাশয়ের উক্তির একাংশ আমার বড় ভাল লাগিয়াছে, আমার পক্ষে উহাই যথেষ্ট; বাকিটা সত্য কি না, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে। আমার মনে হয়, সরকার মহাশয়ের ঐ আশঙ্কার মূলে কোনরূপ ভূত-দর্শন বা ঐতিহাসিক সাক্ষ্য আছে; তাহা বিবেকানন্দের সেই 'spiritual influence'-এর সত্য ফলাফল-ঘটিত কি না জানি না; আমি নিজে এতখানি ভয় পাইবার মত ভূত-দর্শন করি নাই, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার আশা আছে; আধুনিক যুগের সহিত যুক্ত করিলেও, আমি বিবেকানন্দকে আসন্ন ও অনাগত বৃহত্তর কালের মধ্যে স্থাপিত করিয়াছি।

বিবেকানন্দ 'চরিত্র'কেই মানব-ধর্ম্ম-সাধনায় সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন, 'মানুষ-গড়া'-(man-making)-ই ছিল তাঁহার একমাত্র অভিপ্রায়। এই 'মানুষে'র সবচেয়ে বড় লক্ষণ—'manliness' বা পৌরুষ। অসীম আত্ম-প্রত্যয়, অদম্য কর্ম্মশক্তি এবং তাহার সহিত 'ত্যাগ' বা পরার্থে আত্ম-বিসর্জ্জন—ইহাই বিবেকানন্দের ধর্ম্মশাস্ত্র। তত্ত্ব হিসাবে ইহা হিন্দুর চিন্তায় নূতন নয়, পুরাতনই বটে; কিন্তু সাধনমন্ত্র হিসাবে ইহা যে কত নূতন, তাহা আশা করি, এত কথার পর আর বুঝাইতে হইবে না। বিবেকানন্দ যখন বলেন—"Fight always, fight and fight on, though always in defeat—that's the ideal", তখন বুঝিতে বিলম্ব হয় না, ইহাও সেই গীতার বাণী; তথাপি ইহার ভাষা ও ভাব দুই-ই যে নূতন, তাহাতে সন্দেহ কি? গীতায় আছে ভগবানে আত্মসমর্পণ—এখানে শক্তিও আমার শক্তি, কর্ত্তৃত্বও আমার। আবার বিবেকানন্দ যখন বলেন—

Worship Death! All else is vain. That is the last lesson...Yet this is

not the coward's love of death, not the love of the weak or the suicide. It is the welcome of the strong man who has sounded everything to its depths, and *knows* there is no other alternative.

—তখনও তিনি চরম শক্তির আশ্বাসই দিতেছেন—অশক্তির নিরাশ্বাস নয়; ঐ চরম শূন্যতার মধ্যেই আত্মা যেন পূর্ণতায় টলমল করিতে থাকে! নিজের চরিত্রে ও জীবনে তিনি আত্মার এই যোদ্ধৃ-মনোভাব সর্ব্বাবস্থায় রক্ষা করিয়াছিলেন। এ মনোভাব যে মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়—বিবেকানন্দ 'চরিত্র' বলিতে যাহা বুঝিতেন, ইহা যে তাহারই লক্ষণ, তাহার প্রমাণ এক সৈনিক-কবির নিম্নোদ্ধৃত কবিতা-পংক্তিগুলিতে মিলিবে; এমন আশ্চর্য্য ভাবসাদৃশ্য আর কোথাও দেখি নাই—

> We have built a house that is not for Time's throwing,
> We have gained a peace unshaken by pain for ever.
> War knows no power. Safe shall be my going,
> Secretly armed against all death's endeavour;
> Safe though all safety's lost; safe where men fall;
> And if these poor limbs die, safest of all.

ভগিনী নিবেদিতা বিবেকানন্দের এই বীর-মনোভাব সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়া শেষে বলিয়াছেন—"Both victory and defeat would come and go. He was their witness"; আবার সেই গীতা! বিবেকানন্দের সেই উক্তিটিও এখানে স্মরণীয়—"Yet there is joy in being made, used and broken; and an equal joy in being finally set aside"; উপরি উদ্ধৃত কবিতা-পংক্তিগুলির ভাবার্থ একই।

এইজন্য বিবেকানন্দের একমাত্র সাধন ছিল, 'Individuality',—মানবাত্মার স্বাতন্ত্র্য-বোধ ও স্বশক্তির উদ্বোধন। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্য-বোধ ব্যক্তির আত্মাভিমান নয়, পূর্ব্বে সে আলোচনা করিয়াছি। এই যে আত্মোপলব্ধি বা স্বাতন্ত্র্য-মহিমার দিব্যানুভূতি —যাহাদের ইহা হইয়াছে, তাহারাই ব্যক্তিত্বের বা ব্যক্তি-স্বার্থের সংকীর্ণ গণ্ডি পার হইয়াছে। কিন্তু সেই অসীম আত্মস্ফূর্ত্তির এমনই গুণ যে, সে অবস্থায় আত্মা স্ববশেই বিশ্ব-যজ্ঞে আপনাকে আহুতি দিয়া থাকে। বিবেকানন্দ আত্মার সেই পূর্ণতাপ্রাপ্তিকেই তাহার প্রকৃত 'individuality' বা স্বরূপ-মহিমা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

তবু সেই এক প্রশ্নের উত্তর চাই—আত্মার এইরূপ জাগরণ কি সাধারণভাবে আদৌ সম্ভব? বিবেকানন্দ তাহাই বিশ্বাস করিতেন, কেন করিতেন তাহাও বলিয়াছি,—সে বিশ্বাস তাঁহার নিজের আত্ম-বিশ্বাসের বিশ্বাস, কেবল জ্ঞান-বিচারের বিশ্বাস নয়। একজন মানুষের পক্ষেও যদি তাহা সম্ভব হয়, তবে সকলের পক্ষেও অন্তত অসম্ভব নয়। পদার্থমাত্রেই যে অগ্নি বা বৈদ্যুত প্রচ্ছন্ন আছে, তাহাকে প্রকট করিবার উপায় চাই। ব্যক্তি, বা গোষ্ঠী ও জাতির মধ্যে, সেই প্রেরণা সঞ্চার করা সাধ্য ও সম্ভব, আত্মার

অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি সকলের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আছে। ব্যক্তির জীবনে বা জাতির জীবনে যাহা দৈবাৎ নৈমিত্তিকভাবে ঘটিয়া থাকে তাহাকে নিত্য করিয়া তুলিবার পন্থাও আছে—বিবেকানন্দ সেই পন্থার প্রদর্শক। ব্যক্তির পক্ষে এমন জাগরণ যে সম্ভব তাহা আমরা দেখিয়াছি; কলিকাতার রাজপথে ড্রেনের গহ্বরে নফর কুণ্ডুর সেই আত্ম-বিসর্জ্জনের ঘটনা এখনও ভুলি নাই; একজন অতি সাধারণ মানুষের মধ্যে আত্মার সেই দিব্যপ্রকাশ নিবিড় অন্ধকারকে উদ্ভাসিত করিয়া অন্ধকারে মিলাইয়া গিয়াছে! বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে, জাতিগতভাবে, তাহারই আর এক প্রকাশ আর এক রূপে দেখিলাম; সেই অতি-প্রবুদ্ধ আত্মাই ষ্টালিনগ্রাডের গগনস্পর্শী জ্যোতিঃশিখায় সারা ইউরোপ আলোকিত করিয়াছে; সেই শক্তি, সেই বীর্য্যও কম আধ্যাত্মিক নয়,—অনাত্মবাদী নাস্তিকেরা তাহার যে অর্থই করুক; সে দৃশ্য দেখিলে বিবেকানন্দও আনন্দে আত্মহারা হইতেন। অধ্যাত্মবাদী সন্ন্যাসীর এই বাণী, শুধুই জীবনের ঘটনায় নয়—সাহিত্যিক কবি-সাধকের ধ্যানেও ধরা দিয়াছে—সে প্রমাণও আছে। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ কবি চিন্তা-বিষ-জর্জ্জর ম্যাথু আর্নল্ড ইহাকেই আত্মার একমাত্র মুক্তিপন্থা বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন, তাহারই উল্লেখ করিয়া একজন মনীষী সমালোচক বলিতেছেন—

To be oneself, to possess one's own soul,—this, Arnold knew, was the necessity; if this could be achieved, belief could be achieved and an end of perturbation.

"Resolve to be thyself; and know that he
Who finds himself loses his misery."

রুশ সাহিত্যিক চেহভের এই কথাগুলিও বিবেকানন্দের সেই বাণীমন্ত্রের অনুরূপ—

I believe I see salvation in individual personalities scattered here and there all over Russia—whether they belong to the intelligentsia or to the peasants.

ইহার পরেই বলিতেছেন—

This feeling of personal freedom is the mark of the true and completed individuality. Such individuals are the pioneers of humanity, and on them the future of true civilisation does indeed depend.

এ যেন বিবেকানন্দের ভাষায় বিবেকানন্দেরই বাণী! রুশীয় মনীষী যাহাকে তথ্যরূপে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, ভারতীয় দৃষ্টিতে তাহার গভীরতর তত্ত্বও উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে; চেহভ যাহা অনুমান করিয়াছেন, বিবেকানন্দ মন্ত্রদ্রষ্টার মত তাহাকে দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন। কিন্তু ইহাতে জগতের কি উপকার হইয়াছে বা হইবে, সে প্রশ্ন এখন মুলতুবি থাকাই উচিত; বিবেকানন্দের আবির্ভাবের পর, এই পঞ্চাশ বৎসরে, জগৎময় মানুষের ব্যাধি যে আকার ধারণ করিয়াছে—যে আগুন তাহার মস্তিষ্কে জন্মলাভ করিয়াছে, এবং যাহার ফলে মনুষ্যত্বের চেতনাই একণে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে, সেই আগুন প্রশমিত হইবার পূর্ব্বে কোন সত্যই স্থিতিলাভ করিবে না; অতএব এখন সকল প্রশ্নই বৃথা।

৭

কিন্তু বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই নবযুগের সহিত বিবেকানন্দের বাণী নিঃসম্পর্কিত নয়। সে যুগের ভাবধারার যে গতি ও প্রবৃত্তির আলোচনা এ যাবৎ করিয়া আসিতেছি, তাহা বিবেকানন্দে আসিয়াই একরূপ শেষ পরিণতি লাভ করিয়াছে; তাঁহার বাণী সেই যুগকে যতই অতিক্রম করুক, ধারা সেই একই—কেবল কূল ছাপাইয়াছে মাত্র। সে যুগের সমস্যা ছিল মুখ্যত বাংলার, এবং গৌণত ভারতের; বাঙালীর প্রতিভাই সেই যুগকে সর্ব্বতোভাবে বরণ করিয়া, জীবনের একটা নূতন অর্থ—একটা নূতন পথ ও পাথেয়-সন্ধানে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। সমস্যা কি তাহা আমরা দেখিয়াছি, তাহার সমাধানে কল্পনা, মনীষা ও পাণ্ডিত্যের যে অপূর্ব্ব সমন্বয় বঙ্কিমের-প্রতিভাকে সৃষ্টি-সাফল্যে মণ্ডিত করিয়াছিল, এবং তাহাতে সেই যুগ যে তাহার সকল প্রবৃত্তি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার একটি সুসম্পূর্ণ মূর্ত্তি লইয়া বাঙালীর চিত্তে, তথা সাহিত্যে, প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। জাতি-হিসাবে বাঙালীর যে নব-জাগরণ সে যুগের সাধনার শেষ ও শ্রেষ্ঠ ফল তাহার নিদর্শন—বঙ্কিম-সাহিত্য। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তুলনা করিলেই বিবেকানন্দের সহিত সে যুগের সম্পর্ক কতটুকু ও কিরূপ তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। দুইটি বিষয়ে উভয়ের মিল খুব স্পষ্ট,—প্রথম, প্রতীচ্যের সহিত প্রাচ্য সংস্কৃতির সমন্বয় বা যোগস্থাপন; দ্বিতীয়, স্বজাতি-সমাজের চৈতন্য-সম্পাদন। প্রথমটির সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের যে প্রয়াস তাহাতে আমরা একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি—ভারতীয় জ্ঞানগরিমা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার যে গভীর শ্রদ্ধা, সেই শ্রদ্ধার মূলে ছিল—ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব; তিনি ভারতীয় সাধনার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে তাহাকে যাচাই করিয়া। এজন্য, তিনি যে নবমানব-ধর্ম্মের আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার আধ্যাত্মিকতাও বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। ইহার কারণ, তিনি পারমার্থিক অপেক্ষা ব্যবহারিক দিকটাই বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন—যুগের প্রবৃত্তি ও প্রয়োজনকে মানিয়া লইয়াছিলেন; যুগ ও জাতির সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টি ছিল বাস্তব। হাতের কাছেই যে উপাদান আছে তাহা দ্বারা প্রয়োজন-অনুযায়ী একটা কিছু গড়িয়া লইতে হইবে, কবি ও মনীষী বঙ্কিম ইহা কখনও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। অথচ বঙ্কিম যে কতবড় আদর্শবাদী ছিলেন তাহাও আমরা জানি; সেই আদর্শকেই বাস্তবের অধীন করিবার যে শক্তি, তাহাই বঙ্কিমের সৃষ্টি-শক্তি; এই সৃষ্টিশক্তি তাঁহার সর্ব্ববিধ রচনায়—কবিকর্ম্মে যেমন, জ্ঞান-গবেষণার কর্ম্মেও তেমনই—পরিস্ফুট হইয়া আছে। উপকরণ যত সামান্য হউক—আদর্শ যতই দুরধিগম্য হউক—বাস্তবে ও কল্পনায় যতই বিরোধ থাকুক, তথাপি তাহারই সাহায্যে একটা কিছু গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা তাঁহার মত আর কাহারও ছিল না। তাই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিরোধ-মীমাংসায় তিনি আশ্চর্য্য বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন; একের গৌরব-উদ্ধারেও অপরের মূল্যও স্বীকার

করিয়াছেন। এ বিষয়ে বিবেকানন্দের মনোভাব কিছু স্বতন্ত্র; তিনি য়ুরোপীয় জাতি-সকলের সাধনার বৈশিষ্ট্য ও মূল্য স্বীকার করিলেও, ভারতের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে অতিশয় সচেতন ছিলেন, এবং উভয়কে পৃথক রাখিয়াছিলেন। য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানকে তিনিও অবজ্ঞা করেন নাই এবং বঙ্কিমের মতই তাহার অনুশীলন কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—বুদ্ধিকে জাগ্রত এবং জ্ঞানকে সপ্রতিভ রাখিবার জন্ম তাহার আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু তাহাদের অন্তর্গত তত্ত্বকে ভারতীয় সাধনার অনুকূল বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি 'এভল্যুশন'-বাদ মানিতেন না—বঙ্কিম প্রায় পূরাপূরি মানিতেন। তিনি আত্ম-তত্ত্বকেই সকল তত্ত্বের উপরে স্থান দিয়াছিলেন বলিয়া, যে 'progress' বা 'প্রগতি'র সংস্কার য়ুরোপীয় চিন্তায় বদ্ধমূল, তাহাতেও তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না; একবার ভগিনী নিবেদিতার একটি অভিযোগের উত্তরে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—"That's because you cannot overcome the idea of progress, but things do not grow better. They remain as they are, and *we* grow better by the changes we make in them."—ইহা সত্যই বড় ভয়ানক কথা!

এ সম্বন্ধে আমি খাঁটি হিন্দু মনোভাবের আর একটু পরিচয় এখানে দিব—পাঠকগণ দেখিবেন, তাহা আরও ভয়ানক। মনুষ্যসমাজের উন্নতি-সাধন নয়—হিত-সাধনই হিন্দু চিন্তার অনুমোদিত। ওই উন্নতির একটা মাপকাঠি অনুসারে, জাতি বা ব্যক্তিসকলের উচ্চ-নীচ-ভেদ হিন্দুর তত্ত্ব-জ্ঞানের বিরোধী। নব-প্রকাশিত একখানি অভিনব ও উপাদেয় বাংলা পুস্তক হইতে আমি ইহার প্রমাণ দিব—প্রত্যেক সত্যপিপাসু ও আত্মজিজ্ঞাসু শিক্ষিত বাঙালীকে আমি এই পুস্তক পাঠ করিতে বলি—বর্ত্তমান যুগে এই ধরনের পুস্তক 'টনিকে'র মতই স্বাস্থ্যকর। পুস্তকখানির নাম—'তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ', গ্রন্থকারের নাম শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়। এই পুস্তকের এক স্থানে এক অঘোরী তান্ত্রিকের মুখে যে কথাগুলি বাহির হইয়াছে, আমি নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; তাহাতে স্পষ্টই দেখা যাইবে—আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐ উন্নতিবাদ ভারতীয় সাধনার একটা মূলতত্ত্বের কত বিরোধী। বলা বাহুল্য, বিবেকানন্দ এতদূর যাইতে প্রস্তুত ছিলেন না; তাহা হইলে, তিনি, কর্ম্মযোগী সন্ন্যাসীর পরিবর্ত্তে জ্ঞানমার্গী উদাসীন হইয়া শ্মশানে বা গিরিগুহায় বাস করিতেন।

> "তোদের কেবল উন্নতি আর উন্নতি; উন্নতি কি সকলের এক ভাবেই হয়? এর মধ্যে এমন অনেকেই আছে যারা এখানে কোন উন্নতি অবনতির উদ্দেশ্য নিয়ে আসে নি, কেবল কর্ম্মক্ষয় করতে এসেছে। আত্মার ক্ষুধা যার যেমন তার সেই রকম ভোগ আর কর্ম্ম এখানে চলবে ত?...লোকচক্ষে—অন্তত: তোদের মত লেখাপড়া জানা বাবুলোকদের চক্ষে, হয়ত তা খারাপ ঠেকবে, কিন্তু তাদের হিসেবে তারা ঠিক আছে।...

একটা কথা মনে রাখবি, কখনো ভুলিস নি;—কারও উন্নতি বা অধঃপতন নিয়ে বিচার করতে যাস্ নি, আর প্রচারও করিস নি কখনো,—তাতে তোর ক্ষতি হবে, নিজের কিছুই সুবিধা হবে না। এখানে যা কিছু দেখবি বা শুনবি তার থেকে একটা মনগড়া সহজ সিদ্ধান্ত করে নিয়ে কারো কাছে কিছু বলিস নি, ঠকে যাবি। যত জীব দেখছিস—যারা জীবনের ধারা পেয়ে গেছে—তাদের সকলের মধ্যেই একটা করে পৃথিবী আছে। জ্ঞানী মহৎ ব'লে তুই যাদের কর্ম্মের কতকটা দেখেছিস তাদেরও যে রকম—অজ্ঞান, হীনবুদ্ধি, মূর্খ, কুক্রিয়াসক্ত ব'লে যাদের দেখছিস, তাদেরও সেই রকম—সকলকারই একটা একটা আলাদা পথ আছে, যার মধ্যে দিয়ে সে খেলা করছে—আপনাকে প্রকাশ করছে।" (পৃঃ ২২২)

অতএব মূল তত্ত্বের দিক দিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে কোন সত্যকার রফা হইতে পারে না, ইহা বিবেকানন্দ বুঝিতেন। তথাপি য়ুরোপের বিশিষ্ট সাধনাকে শ্রদ্ধা করিতেও কোন বাধা ছিল না; প্রত্যেকের পথ পৃথক হওয়াই তো স্বাভাবিক; যাহার যে পথ সে সেই পথেই অগ্রসর হউক—শেষে সেই এক তীর্থেই পৌঁছিবে। তথাপি বিবেকানন্দের এ অভিমান ছিল যে, সে তীর্থ ভারতেই আছে, শেষে সকলকে সেখানেই পৌঁছিতে হইবে। এরূপ অভিমান বঙ্কিমেরও ছিল; কিন্তু তিনি উপস্থিত একটা রফা করিয়াছিলেন, তাহার কারণ, তিনি বিবেকানন্দের মত এত বড় অধ্যাত্মবাদী ছিলেন না,—কেবল আধ্যাত্মিক শক্তির উপরেই নির্ভর করিতে পারেন নাই ব'লয়া একটু পাটোয়ারী বুদ্ধি রাখিতে হইয়াছিল। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, হিন্দুধর্ম্মের উপরে বহুকাল ধরিয়া যে আগাছার জঙ্গল জ'ন্ময়াছে, তাহা কাটিয়া দূর করিবার একমাত্র অস্ত্র—য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান; তাহা ছাড়া, ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যে মতি-গতি হইয়াছে তাহাকেও যথাসম্ভব অনুকূল রাখাই শ্রেয়ঃ। এ বিষয়ে বিবেকানন্দের কোন দ্বিধা-সংশয় ছিল না; ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন—

To his mind Hinduism was not to remain a stationary system, but to prove herself capable of embracing and welcoming the whole modern development...Above all, she was the holder of a definite vision, the preacher of a definite mission among nations.

—অর্থাৎ, এমন কোন নূতন তত্ত্ব বা মতবাদ নাই যাহার সহিত হিন্দু-চিন্তার রফা করিতে হয়; তাহা এমনই সর্ব্বাশ্রয়ী যে, কিছুরই সহিত তাহার বিরোধ হইতে পারে না, তাহার মত করিয়া সে সকলকে হজম করিয়া লইবে; এবং তাহার যে নিজস্ব সত্য-সম্পদ—যে বিশিষ্ট ভাবদৃষ্টি আছে—তাহাই জগৎকে দান করিবে। এ বিষয়ে বিবেকানন্দের সহিত বঙ্কিমের মত-ভেদ ছিল না বটে, কিন্তু চিন্তাপদ্ধতি ও সাধন-রীতিতে বিশ্বাস-ঘটিত তারতম্য ছিল।

দ্বিতীয় বিষয়—স্বজাতির উদ্ধার-সাধন। এখানেও উভয়ের বাসনা এক হইলেও, আদর্শ এক ছিল না। এই উদ্ধার-সাধন বিবেকানন্দের নিকটে কোন পৃথক সমস্যার মত ছিল না; তাহার জন্যও তিনি সেই একমন্ত্র—আত্মার মুক্তি-মন্ত্র ছাড়া, আর কোন উপায় চিন্তা করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র স্বাজাত্য-সাধনাকেই জাতির মুক্তিলাভের অতি সহজ ও স্বাভাবিক উপায় বলিয়া—ভারতবর্ষে যাহা সম্পূর্ণ নূতন—সেই জাতীয়তা-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের আদর্শ তদপেক্ষা উন্নত ও উদারতর, তাহাতে সন্দেহ নাই, তথাপি, বিবেকানন্দের সেই আধ্যাত্মিক শক্তিসাধনা এবং এই সাধারণ মানব-ধর্ম্ম সাধনার একত্র বিচার করিয়া মঃ রোলাঁ লিখিয়াছেন—

This message of energy (বিবেকানন্দের) had a double meaning; a national and a universal. Although for the great monk of the Advaita, it was the universal meaning that predominated, it was the other that revived the sinews of India. (ইহা আমরাও জানি; অন্তত বাংলা দেশে—জাতীয়-জাগরণের এই আদি অরুণোদয়ের দেশে—বঙ্কিমচন্দ্রের বাণী বিবেকানন্দের মন্ত্রে অধিকতর শক্তি লাভ করিয়াছিল)। There was ground for fearing that its high spirituality would be twisted to the profit of a purely animal pride in race or nation, with all its stupid ferocities.

কিন্তু তার পরেই বলিতেছেন—

But how else was it possible to bring about within the disorganised Indian masses a sense of human unity, without first making them feel such unity within the bounds of their own nation?

বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক ইহাই ভাবিয়াছিলেন। তাঁহার 'বন্দেমাতরম্'-গানের উদ্দিষ্ট দেবতা যে ভারতভূমি নয়—বঙ্গভূমি; ইহাতেও তাঁহার বাস্তব-দৃষ্টি, মানব-চরিত্র ও ইতিহাস-জ্ঞানের পরিচয় রহিয়াছে! প্রেমের প্রথম উদ্দীপন, বাস্তবের ক্ষেত্রে, অতিশয় নিকট বস্তুতেই হইয়া থাকে; স্ব-সমাজ ও স্বজাতি আগে, বৃহত্তর সমাজ পরে, এ তত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্র ভালরূপই জানিতেন। বিবেকানন্দের প্রেম কত বড় ও গভীর ছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার মূলে ছিল ভারতীয় সাধনার প্রতিই ঐকান্তিক অনুরাগ, তাই ভারতীয় জনগণের শোচনীয় অধঃপতন দেখিয়া তিনি সমগ্র ভারতের কল্যাণ-সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন। অতএব এই দুই জনের ব্রত যে দুইরূপ—তাহাই সঙ্গত ও স্বাভাবিক; কারণ, একজন ছিলেন সন্ন্যাসী, আর একজন সমাজধর্ম্মী গৃহস্থ। এই দুই ধর্ম্মই সত্য—এক অপরের পরিপূরক মাত্র। এ বিষয়ে সে যুগের এক মনস্বী বাঙালী-লেখকের উক্তি বড়ই যথার্থ, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব—বিবেকানন্দের ভারতপ্রীতি ও বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ-প্রীতি এই দুই-ই যে সমান সত্য ও সমান আবশ্যক, এই উক্তি যেন তাহারই সমর্থন করিতেছে।—

"তোমার ইংরাজ বা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, undefined and indefinite units, অর্থাৎ, নির্দ্দেশশূন্য ও সংজ্ঞাবিহীন ব্যষ্টি লইয়া কখনও কোন সমষ্টির সৃষ্টি হয় না—একতা সম্ভবপর নহে।" আমাদের স্মার্ত্তগণও তাহাই বলেন। তাঁহারা বলেন যে, বঙ্গদেশ পঞ্জাবে বা মহারাষ্ট্রে পরিণত হইবে না, গৌড়-জন দ্রাবিড় হইবে না—দ্রাবিড়ের আচার পদ্ধতি গ্রহণ করিবে না। অতএব বাঙ্গালাকে, বাঙ্গালার অতীত যুগের পারম্পর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সজীব করিয়া তুলিতে হইবে; তবেই বাঙ্গালা ভারতব্যাপী হিন্দুত্বের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইবে। কাজেই বলিতে হয়, তোমার বাঙ্গালা দেশকে আগে সামলাও; পরে গোটা ভারতের ভাবনা ভাবিও। মনে নাই কি,—সন্ন্যাসীর সেই কথাটা! তিনি বলিয়াছিলেন, ভারতের ভাবনা সন্ন্যাসী ও যতি-সজ্জনে ভাবিবে; প্রদেশের ভাবনা গৃহস্থ ও সামাজিকগণেই ভাবিবেন। আমি সন্ন্যাসীর এই কথাটা বেদবাক্যের মত মান্য করি।"

এ চিন্তা এ ভাবনা এ যুগে একেবারে 'out of date' হইয়াছে—বাঙালীরও চিন্তাশক্তি আর নাই; তাহার কারণ, সত্যকার বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষাও আর নাই; নহিলে কংগ্রেসপন্থী বাঙালী ক্রমেই এত দুর্ব্বল ও মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িবে কেন?

৮

আরও কয়েকটি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত বিবেকানন্দের তুলনা করা যাইতে পারে। দুই জনেই 'পলিটিক্‌স্' বা রাষ্ট্রনীতি-চর্চ্চার বিরোধী ছিলেন, আজিকার দিনে ইহা বড়ই অদ্ভুত বলিয়া মনে হইবে। একজনের মতে উহা ধর্ম্মই নহে, আর একজন উহাকে পরধর্ম্ম বলিয়া বর্জ্জন করিতে বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির কোনরূপ মন্তব্য করা শোভা পায় না; কেবল এইমাত্র বলিতে পারি যে, প্রায় পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক কাল আমরা ক্রমে 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়' বলিয়া যাহাকে আশ্রয় করিয়াছি, তাহা যে এখনও আমাদের ধাতুগত হয় নাই, বরং তাহার ফলে আমাদের শক্তি অপেক্ষা অশক্তিই বৃদ্ধি পাইতেছে, আমরা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতেছি, তাহাতে সন্দেহ নাই। আপাত-দৃষ্টিতে আমরা যাহাকে সত্য বলিয়া বুঝি—মহাপুরুষের দিব্য-দৃষ্টিতে তাহা যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে আশঙ্কার কারণ আছে। কেবল ইহাই লক্ষণীয় যে, এ বিষয়ে এই দুই মহাপুরুষের চিন্তাধারার ঐক্য আছে। তারপর, এ যুগের যাহা প্রধান প্রবৃত্তি—যাহা এই যুগেরই নবধর্ম্ম—সেই Humanity বা মানব-পূজা বা মানবাত্মার মহত্ত্ব-বোধ এই উভয়কেই সমান অনুপ্রাণিত করিয়াছে; বঙ্কিমে যাহার প্রথম পূর্ণ ও সজ্ঞান উপলব্ধি, বিবেকানন্দে তাহা উচ্চতম অধ্যাত্মিক তত্ত্বে পরিণতি লাভ করিয়াছে। "We Indians are MAN-worshippers. Our God is man"—বিবেকানন্দের এই উক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় প্রতিধ্বনি বলিলেও হয়,—বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্র' এই 'মানব-ভগবৎ'-বাদের একটি সুনিপুণ ভাষ্য মাত্র। কেবল একটা বিষয়ে দুইয়ের দৃষ্টিতে প্রভেদ

আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনতত্ত্বে, মানুষের প্রকৃতিসুলভ যে মনুষ্যত্ব—তাহার সেই দেহ-মন-প্রাণের ধর্ম্মকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হইয়াছে, এবং সেই জন্য পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভকে সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষা বা সর্ব্ববৃত্তির অনুশীলনসাপেক্ষ করা হইয়াছে। এইরূপ দৈহিক ও মানসিক ব্যায়াম ব্যতিরেকেও, তথাকথিত জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চ্চার অভাবেও, অন্য উপায়ে মানুষের আত্মা যে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, বঙ্কিমের অনুশীলনতত্ত্ব তাহার যেন প্রতিবাদী। ইহার কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র বিবেকানন্দের মত, আত্মার স্বাতন্ত্র্য-মহিমায় (বিবেকানন্দের 'individuality') বিশ্বাস করিতেন না; ছোট-বড় সকল মানুষের মধ্যেই সেই এক শক্তি-বীজ নিহিত আছে, তাহার স্ফুরণ যে সর্ব্বাবস্থাতেই সম্ভব—সামাজিক অবস্থা বা মানসিক উৎকর্ষের উপরে তাহা নির্ভর করে না; চরিত্র-বলই যে চিত্তশুদ্ধির নিদান, এবং তাহা অশিক্ষিতের মধ্যেও সুলভ,—বঙ্কিমচন্দ্রের Doctrine of Culture তাহা গ্রাহ্য করে নাই। এজন্য তিনি একরূপ Intellectual aristocracy-র সমর্থন করিয়াছেন। বিবেকানন্দও কম aristocrat নহেন, কিন্তু তাঁহার aristocracy—আত্মার aristocracy, তাই তাহা ডেমোক্রেসিরও চূড়ান্ত।

উপরে যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র যদি সে যুগের প্রকৃত প্রতিনিধি হন, তাহা হইলে বিবেকানন্দ সেই যুগকে অতিক্রম করিয়াছেন মাত্র—তাহার সেই ধারাকে তটবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া সাগরসঙ্গমে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। বিবেকানন্দও সেই যুগেরই সন্তান, তাঁহার ধাতুপ্রকৃতিতেও সেই যুগের প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল; তাঁহার বালক-বয়সের সেই বিদ্রোহী মনোভাব সেই যুগেরই লক্ষণ। কেবল, তাঁহার ব্যক্তি-চরিত্রে যে অসাধারণ পৌরুষ সুপ্ত ছিল—শ্রীরামকৃষ্ণের যাদু-স্পর্শে তাহা এমনই স্ফুরিত হইয়াছিল যে, তিনি অনায়াসে যুগকে অতিক্রম করিয়া, বৃহত্তর দেশে ও কালে আপনাকে প্রসারিত করিতে পারিয়াছিলেন। সেকালে ইহা কাহারও পক্ষে সম্ভব হইত না—বিবেকানন্দের পক্ষেও নয়; কারণ, ইহা ঐতিহাসিক কালধর্ম্মে—বা স্বভাবের নিয়মে ঘটে নাই। তথাপি, ইহাও সত্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ উভয়েই বাঙালী—উভয়ের প্রতিভা বাঙালী-প্রতিভা; উভয়ে একই যুগের একই জল-মাটির মানুষ। শ্রীরামকৃষ্ণও সেই জল-মাটির বটে (বাঙালী না হইলে এমন সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের রস-রসিকতা সম্ভব হইত না), কিন্তু তিনি সকল যুগের। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ-চেতনা এই যুগাতীতের স্পর্শ লাভ করে নাই—বিবেকানন্দের করিয়াছিল। তাই উভয়ের মধ্যে বাঙালীর ধাতুগত সেই শাক্ত-সংস্কার জাগ্রত হওয়া সত্ত্বেও, একজনের সংস্কার খাঁটি, আর একজনের তেমন খাঁটি নয়—মিশ্র। বিবেকানন্দ বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্মকে গুণময়ী প্রকৃতির সঙ্গে—লীলায় নয়—সংগ্রামে অবতীর্ণ করিয়া, বন্ধন-ছেদনের আনন্দ আস্বাদন করিবার জন্যই বন্ধনকে স্বীকার করিয়া—আত্মার

কর্ত্তৃত্ব-শক্তির (dynamic energy) জয়ঘোষণা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, খাঁটি শাক্তের মত, প্রকৃতির উপাসনা করিয়া তাহারই পথে, পশ্বাচার হইতে দিব্যাচারে আরোহণ করাকেই সহজ ও সাধ্য মনে করিয়াছিলেন। একজনের সাধন-পীঠ—আত্মা, আর একজনের—দেহ; একজন মৃতকেও জাগাইবার জন্য ডাক দেন—"Lazarus Come forth!", আর একজন মুমূর্ষুকে বাঁচাইবার জন্য তাহার দেহে বৈদ্যকশাস্ত্র অনুসারে তাপ সঞ্চারের চেষ্টা করেন; একজনের মতে—"The soul is the cause of the body", আর একজনের মতে—The body is the cause of the manifestation of the force we call the soul"; যদিও ঐ 'soul' উভয়ের নিকটেই সমান সত্য। তথাপি উভয়েই শাক্ত; বিবেকানন্দ তাঁহার ধর্ম্মকে 'dynamic religion' বলিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্রও এই dynamism-কে তাঁহার ধর্ম্ম-সাধনের ভিত্তি করিয়াছেন; প্রভেদ এই যে, একজন প্রকৃতিপন্থী হইলেও যুক্তিবাদী, অতিশয় নিয়মতান্ত্রিক, তাই 'morality'র উপরে উঠিতে পারেন নাই; আর একজন অধ্যাত্মবাদী, তাই সর্ব্ববন্ধন-অসহিষ্ণু; তাঁহার ধর্ম্মে, আত্মা আত্মা ছাড়া আর কিছুরই বশীভূত নয়; morality প্রভৃতি 'custom' মাত্র—'character'ই সব। কিন্তু কেহই বিনাযুদ্ধে জয়লাভের কথা বলেন নাই; পথ-চলার 'আনন্দ' নয়—পথ-চলার দারুণ বাধা-বিঘ্ন, বিপদ-বিভীষিকাকে অপসারিত করিবার যে শক্তি তাহার সাধনাকেই একমাত্র সত্য-সাধনা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসগুলিতে এই তত্ত্বের রস-রূপ ট্র্যাজেডির আকারে প্রকটিত করিয়াছেন। বিবেকানন্দও 'মায়া'কে নস্যাৎ করিতে পারেন নাই, বরং সেই মোহিনী তাঁহার বাঙালী-প্রাণকে কিঞ্চিৎ অভিভূত করিয়াছিল, নতুবা, তিনি এত বড় প্রেমিক হইতে পারিতেন না। মঃ রোমাঁ রোলাঁ বিবেকানন্দের নূতনতর মায়াবাদ ব্যাখ্যা করিবার ছলে লিখিয়াছেন—

> Nothing in the world is to be denied, for, Maya, illusion, has its own reality. We are caught in the network of phenomena. Perhaps it would be a higher and a more radical wisdom to cut the net, like Buddha, by total negation, and to say: "They do not exist." But in the light of the poignant joys and tragic sorrows, without which life would be poor indeed, it is more human, more precious to say: They exist. They are a snare.

—বাঙালী কবি ও বাঙালী সন্ন্যাসী কেহই তাহাকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই; "They exist. They are a snare"—বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলিও এই আর্ত্ত-ধ্বনিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। অতএব, বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমের মধ্যে যাহা কিছু পার্থক্য

তাহা মাত্রাগত; বিবেকানন্দ বঙ্কিম-যুগের প্রবৃত্তিকে বিপরীতগামী করেন নাই, তাহার সেই ধারাকেই সহসা এক গভীরতর খাতে প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

* * *

বাংলার নবযুগ সম্পর্কে বিবেকানন্দের কথা প্রায় শেষ হইয়াছে, কেবল একটি কথা এখনও বাকি আছে। বিবেকানন্দের বাণীই যে পরবর্ত্তী মন্বন্তরের কোলাহলে ভারতের নিজস্ব সাধনাকে কিছু পরিমাণে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে, তাহার প্রমাণ এতই স্পষ্ট যে সে বিষয়ে কিছু না বলিলেও চলিত; কিন্তু এই জাতি এতই সত্য-ভীরু বা পাপ-দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, এখন সাধনার ক্ষেত্রেও গুরুশিষ্যের সম্পর্ক স্বীকার করে না। বাঙালী ডুবিয়াছে, তাই বঙ্কিমচন্দ্রও ডুবিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষ তো জাগিয়া উঠিতেছে; সেই জাগরণের অন্তত দুইটি ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের বাণী এখনও কার্য্যকরী হইয়া আছে। তথাপি বিবেকানন্দের প্রতিও সেই মনোভাবের কারণ কি? মহাত্মা গান্ধীর পতিতোদ্ধার-ব্রত ও গণ-উদ্বোধন-নীতির মূলে বিবেকানন্দের সেই বাণীই যে প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যমান তাহা অস্বীকার করিবে কে? মহাত্মা গান্ধী যে কখনও বিবেকানন্দের নাম করেন নাই এমন নহে; তথাপি একজন বিদেশীকেও দুঃখ করিয়া বলিতে হইয়াছে—

It is regrettable that the name the example and the words of Vivekananda have not been invoked, as often as I could have wished, in the innumerable writings of Gandhi and his disciples.

ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই,—বিবেকানন্দ যে বাঙালী! কংগ্রেসের সরকারী ইতিহাস হইতে বাঙালীর কীর্ত্তি মুছিয়া ফেলিবার এত আগ্রহ যাহাদের তাহারা সত্যাগ্রহী হইতে পারে, কিন্তু সত্যবাদী হয় কেমন করিয়া? আমার এই কথাগুলি অনেক বাঙালীরও ভাল লাগিবে না, তাহা জানি, কারণ, এ ধরনের কথা রাজনৈতিক-বুদ্ধিসঙ্গত নয়; সত্যকে গোপন করা, এবং মিথ্যাকে সহ্য করা—অকপট না হওয়াই রাজনৈতিক ধর্ম; এই জন্যই কি বিবেকানন্দ রাজনীতিকে বিষবৎ বর্জ্জন করিতে বলিয়াছিলেন? কারণ, ইংরেজের মত ও-পাপ হজম করিয়া চরিত্র বজায় রাখিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমি গান্ধীভক্ত ভারতীয়দের কথাই বলিতেছি, মহাত্মা গান্ধীর কথা বলিতেছি না। কথা উঠিতে পারে, ইদানীং বাংলাদেশেই বা শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে বিবেকানন্দের নাম কয় জন করিয়া থাকে? কথাটা সত্য, কিন্তু তাহার কারণ স্বতন্ত্র; বাংলার নবযুগের সেই ধারাই যে বিপর্য্যস্ত হইয়াছে—কাহার দ্বারা ও কেমন করিয়া তাহা হইয়াছে, এই আলোচনার পরিশিষ্টে তাহাই বলিব।

একদিকের কথা বলিলাম, আর একদিকে, অর্থাৎ সাধনার অপর ক্ষেত্রেও অবস্থা প্রায় একই, বরং আরও বিচিত্র—কারণ, সেখানে এই বিস্মৃতি অ-বাঙালীর নয়, বাঙালীর। বিবেকানন্দের কর্ম্ম-মন্ত্র যেমন মহাত্মা গান্ধীর মন্ত্র হইয়াছে, তেমনই, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অধ্যাত্ম-তত্ত্ব এ যুগের এক মহা শক্তিমান সাধকের সাধনার সহায় হইয়াছে,

—শ্রীঅরবিন্দ যে সেই সাধন-মন্ত্রেরই উত্তর-সাধক, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই ; তাঁহার নিজেরই রচনাবলীতে ইহার স্পষ্ট আভাস আছে। কিন্তু পরে, একটি সম্প্রদায়ের গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, সেই সাধন-ধারার পারম্পর্য্য আর স্বীকৃত হয় না, বরং ক্রমেই একটা বিরোধের ভাব প্রকট হইয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি দার্শনিকপ্রবর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকারের 'Eastern Lights' নামক উপাদেয় গ্রন্থে শ্রীঅরবিন্দ-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিস্ময় ও কৌতুক বোধ করিয়াছি। এই প্রবন্ধে তিনি অতি সুন্দর দার্শনিক ভাষায় শ্রীঅরবিন্দের নব-দর্শনের নবত্ব ও মৌলিকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে সকল তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন তাহার একটিও শ্রীরামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দের তত্ত্ব-দৃষ্টির বহির্ভূত নয়। আমি এখানে সেই তত্ত্বের দার্শনিক গহনে প্রবেশ করিব না, কেবল নমুনাস্বরূপ একটি প্রধান তত্ত্বের উল্লেখ করিব। শ্রীঅরবিন্দের নব-দর্শন সম্বন্ধীয় সেই তত্ত্বটি সরকার মহাশয় এইরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন,—"Energy and matter are the bi-polar expression of the divine Sakti" ; যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-মূর্ত্তির ভিতরে দৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাদের নিকটে এ তত্ত্ব নূতন নহে। তাহা ছাড়া, Arthur Avalon-এর সহিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়ের তন্ত্র-সম্বন্ধীয় আলোচনায় এই তত্ত্বের সন্ধান অনেকেই পাইয়া থাকিবেন। এমন কথা বলিলেও হয়তো অযথার্থ হইত না যে, শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীতে যাহা বীজ বা অঙ্কুররূপে বিদ্যমান, শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার প্রতিভাবলে তাহাকেই পূর্ণবিকশিত করিয়া, অপূর্ব্ব ভাষায় ও ভঙ্গীতে তাহাকে প্রকাশিত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে এখানে আর অধিক কিছু বলিব না, কেবল উক্ত প্রবন্ধ হইতে আরও দুই-একটি এমন উক্তি উদ্ধৃত করিব, যাহা শ্রীঅরবিন্দ অপেক্ষা শ্রীরামকৃষ্ণ অথবা বিবেকানন্দ সম্বন্ধেই অধিকতর প্রযোজ্য। যথা—

"**Shiva and Kali, Brahman and Sakti are one, and not two who are separable. Force inherent in existence may be at rest or in motion.**"

এ উক্তি যদি কোন অর্থে নূতন হয়, তবে তাহা শ্রীরামকৃষ্ণের। নিম্নোদ্ধৃত উক্তি দুইটিও বিবেকানন্দের ; প্রথমটির আলোচনা আমি ইতিপূর্ব্বে সবিস্তারে করিয়াছি—বিবেকানন্দ-প্রচারিত 'Individuality'র ব্যাখ্যায়, এবং আরও পূর্ব্বে, 'আত্মা'র স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধিকার-বোধ এবং 'ব্যক্তি'র স্বাতন্ত্র্য বা স্বাভিমানের পার্থক্য-বিচারে ; ইহা যে বিবেকানন্দেরই বাণী, তাঁহার বক্তৃতাগুলির মধ্যে তাহার অজস্র প্রমাণ মিলিবে।—

"**But the finer insight of Aurobinda has been able to distinguish will from desires, and to discern the cosmic and the transcendent movement of will from egoistic tendencies.**"

* * *

"**Aurobinda is equally alive to the play of the divine life in creatian and destruction. 'God is there not in the still small voice, but in the fire and the winds'.**"

এ তত্ত্ব ভারতবর্ষে আদৌ নূতন নহে, বিবেকানন্দের পরে আরও পুরাতন। আরও আশ্চর্য্য হইয়াছি যে, এই প্রবন্ধে, James, Bergson, Plato, Schopenhauer, বুদ্ধ, চৈতন্য, তন্ত্র, সাংখ্য, বেদান্ত—কিছুই বাদ যায় নাই, বাদ গিয়াছেন কেবল বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ!—যেন তাঁহাদের বাণীর মৌলিকতা বিচারযোগ্যই নয়। 'মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ'—কিন্তু ইহা কি সত্যই মতিভ্রম? সত্যের উপরে ব্যক্তিকে স্থান দিলে ব্যক্তিরও যেমন মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, তেমনই, যুগের স্বরূপ ও তাহার ধারাটি ধরিবার পক্ষে বড়ই বিঘ্ন ঘটে।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

আখেরী

১৩৫০ সালের চৈত্রের শেষ, ইংরিজী ১৯৪৪এর এপ্রিল। পার্কের নিঃশেষে-পাতা-ঝ'রে-যাওয়া কৃষ্ণচূড়াগাছে ফুলের কুঁড়ির স্তবকগুলো পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে, মাথার দিকে লালচে আভা গাঢ় হয়ে এসেছে; কাঠমল্লিকা ফুটেছে অজস্র, আরও অনেক ফুল ফুটেছে; বসন্ত চ'লে গিয়েছে, গরম পড়েছে, ভোরের বাতাস স্নিগ্ধ, কিন্তু তার মধ্যে আর সে দখনে হাওয়ার মিষ্টতা নাই।

ভোরবেলা। ঝাড়ু পড়ছে রাস্তায়। জল দেওয়ার শ্রমিকেরা এসে হাঁকছে। ফুটপাথে এখনও লোক শুয়ে আছে।

বাগবাজার-শ্যামবাজারের মোড়ে একটা ছোট চায়ের দোকান। পাশে একটা বিড়ির দোকান ত্রিশঙ্কুর মত অর্থাৎ কাঠের কুলুঙ্গীর উপর। বিড়িওয়ালা হুসেন, চায়ের দোকানের অমূল্য এখনও ঘুমুচ্ছে। ভোরের বাতাস এখনও ঠাণ্ডা, তাতে এখনও পেট্রোল-মোবিলের ধোঁয়া মেশে নি; বাস ছাড়তে শুরু করে নি। মিলিটারী লরী সবে চলতে আরম্ভ হয়েছে। দক্ষিণ দিক থেকে আসছে এক দল লরী; হরেক রকম মাল এবং মানুষ অর্থাৎ সেপাই বোঝাই নিয়ে চলেছে, লালচে ধুলোয় একাকার হয়ে গিয়েছে।

চায়ের দোকানটার এ পাশে একটা মিষ্টির দোকান। এ দোকানটা এর মধ্যে চালু হয়েছে। উনোনে আঁচ গনগন করছে, কড়াইয়ে ঘি তেতে উঠেছে, মোটাসোটা কারিকরটি জিলিপি ছাড়ছে, একজন একটা ছোট ঝুড়িতে বাসী—মানে, অচল বাসী কচুরি মিষ্টি গুঁড়ো ক'রে রাস্তায় ছিটিয়ে দিচ্ছে কাক-ভোজনের জন্য; ট্রামের তার থেকে রাস্তার উপর নেমে এসেছে কাকের ঝাঁক। গোটা দশেক ভিখিরীর ছেলেও তাদের সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ওদিক থেকে আসছে যুদ্ধের কারখানায় শ্রমিকবাহী লরী। তারই মধ্যে আছে খাস-অ্যামেরিকানবাহী বাস। বিশ ত্রিশ হাত লম্বা রেলের ফার্স্ট সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ির মত চেহারা, মাথায় পাঁচটা লাল আলো, পিছনে তিনটে, তার মধ্যে মাথার দুটো সর্ব্বদাই জলছে, নীচেরটা জ'লে উঠছে গাড়িটা থামলেই, আবার চললেই

নিয়ে যাচ্ছে। ওদিকের ফুটপাথে চলেছে গঙ্গাস্নানের যাত্রী। পুণ্যকামী মেয়েরা, স্বাস্থ্যকামী বাবুরা, গাজনে সন্ন্যাসব্রতধারী মেয়েপুরুষ। ধারিক ঘোষের দোকানের পাশে পঞ্চাশের কঙ্কালের দল ফেলে-দেওয়া দইয়ের খুরি, এঁটো পাতা কুড়িয়ে চাটতে বসেছে। ক'জন রুগ্ন পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে ব'সে ধুঁকছে। ঝুড়িতে বোঝাই তরকারি নিয়ে দেহাতি হাটুরেরা চলেছে বাজারে। খবরের কাগজওয়ালারা সাইকেল হাঁকিয়ে ছুটছে।

হঠাৎ যে লোকটা কাক-ভাজনের জন্ম কচুরিগুঁড়ো ছড়াচ্ছিল, সে চীৎকার ক'রে উঠল, অ্যাই! জিলিপি ভাজছিল যে সে বলে উঠল, শালা!

একটা কাককে চাপা দিয়েছে একখানা লরী। যাক, ছোঁড়া দিনটে বেঁচেছে। যে জিলিপি ছাড়ছিল সে বললে, আর থাক। ছিটুস নি আর। তারপর আবার বললে, গুপের জন্তে রেখেছিস তো? সে বেটা এখনও এল না যে?

ওই যে! ওই যে অমূল্যকে খোঁচা মারছে।

হুঁ। বন থেকে বেরুল টিয়ে লাল গামছা মাথায় দিয়ে। বেটা আনারস রাত্রে থাকে কোথা বল্ দেখি! এই! এই গুপে!

দশ বারো বছরের বাচ্চা একটা। সতেজ আগাছার মত ছেলে। কাক চাপা পড়েছে দেখে নাচতে আরম্ভ করেছে। লে—খা—খা! খাঁয়ে যা কচুরি। কা! কা! কা!

জিলিপি-ভাজিয়ে কারিকর ধমক দিলে, মারব গিয়ে থাপ্পড়। কাক মরেছে তাতে নাচন কিসের?

চায়ের দোকানের অমূল্য উঠেছে, সে বললে, দেখ না। ভারী পাজী!

গুপে হি-হি ক'রে হাসছে। হঠাৎ কি খেয়াল হ'ল গুপের, সে ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে নিলে চেপ্টে-যাওয়া কাকটাকে। এঃ হে-হে রে। নির্দ্দয়, একেবারে ছাতু ক'রে দিয়েছে। শালারা!

মাথার উপরে কাকের দল কলরব ক'রে উড়ছে। গুপের হাতে মরা কাকটাকে দেখে তারা তাকেই আক্রমণের লক্ষ্য করেছে। গুপে কিন্তু 'শালারা' ব'লে তাদের গাল দেয় নি। দিচ্ছিল লরীর ড্রাইভারকে।

কাকের আক্রমণ আরম্ভ হয়ে গেল। গুপে কাকটা ফেলে দিয়ে ছুটে পালিয়ে এল চায়ের দোকানে। দোকানে তখন চায়ের খদ্দের এসে গিয়েছে জন চারেক। দুজন হাফপ্যাণ্টের সঙ্গে কলার দেওয়া গেঞ্জি পরেছে, পায়ে কাবলী স্যাণ্ডেল, ওরা সব যুদ্ধের কারখানায় কাজ করে; একজন বাস-ড্রাইভার শিখ; একজন সাধারণ বাঙালী ভদ্রলোক।

(১০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সপ্তর্ষি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চিঠিখানা পড়তে পড়তে ইন্দুর সুন্দর মুখখানাও অজ্ঞাতসারে যেন পাষাণের মত কঠোর হয়ে উঠল। চোখের দৃষ্টি থেকে যা ক্ষরিত হতে লাগল, তা আর যাই হোক আনন্দ নয়। নিজের ব্যর্থ ব্যথিত জীবনের অনতিক্রম্য অভিশাপ বহন ক'রে সংসারের সমস্ত আনন্দ-উৎসব থেকে সে নিজেকে যথাসাধ্য দূরেই সরিয়ে রেখেছে, তার কারণ পাছে তার দুর্ভাগ্যের উত্তাপে আর কারও সৌভাগ্যের ফুল শুকিয়ে যায়, তা ঠিক নয়। নিজের আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যেই নিজেকে অবলুপ্ত ক'রে দিতে চায় সে। যে মহাকালের নিদারুণ বিধানে তার সমাজ-জীবনের আশা-আনন্দ-আকাঙ্ক্ষা একবার নয় দু-দুবার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে, সে মহাকালকে শাস্তি দেবার ক্ষমতা তার নেই। কিন্তু পরাজয়-গ্লানি-লাঞ্ছিত এই ভাগ্য নিয়ে কুণ্ঠিত দৃষ্টি তুলে সেই সমাজ-জীবনে আর সে ফিরে যেতে চায় না। যেখানে গৌরবের আসন দাবি করেছিল, সেখানে সসঙ্কোচে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না সে কিছুতেই। বড় বউদিদি কেন তাকে যেতে লিখেছেন, তিনি কি তাকে চেনেন না? তাকে এমন অপদস্থ করবার মানে কি?

হংস-শুভ্র আড়চোখে একবার কন্যার মুখের পানে চেয়ে দেখলেন। হাঁটুর আন্দোলন আরও বেড়ে গেল। কিছু বললেন না। গড়গড়ার শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ রইল না খানিকক্ষণ। ইন্দু চিঠিখানা প'ড়ে সযত্নে সেখানা খামের মধ্যে পুরে তেপায়ার ওপরে রেখে চ'লে যাচ্ছিল, এমন সময় হংস-শুভ্র কথা কইলেন।

বড়বউ নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে শশাঙ্কটাকে নানা রকম হুজুকে ক্রমাগত। এদিকে ঋণে তো জেরবার হয়ে পড়েছে শুনছি।

ঋণ শোধ হয়ে গেছে বোধ হয়। নতুন একটা মিল কিনেছেন, শুনলাম সেদিন তারাপদর কাছে।

খুব শান্ত কণ্ঠে কথাগুলি বললে ইন্দু-শুভ্রা। মিল কেনার কথা হংস-শুভ্রও শুনেছিলেন, সে সম্পর্কে তাঁর মনে একটা জ্বালাও ছিল। অতর্কিতে উত্তপ্ত কথাগুলো বেরিয়ে পড়ল মুখ থেকে।

হ্যাঁ, কিনেছে—বড়বউয়ের নামে।

ইন্দু চুপ ক'রে রইল। তারপর অতিশয় নিরীহভাবে প্রশ্ন করলে, আপনার কি কি কাপড় গুছিয়ে দেব? যাবেন তো, বড়বউদি অত ক'রে অনুরোধ করেছেন যখন?

খানিকক্ষণ গড়গড়া টেনে অগ্নিবর্ষী চক্ষুর দৃষ্টি ইন্দুর মুখের ওপর স্থাপন ক'রে বললেন, যাব কেন?

ইন্দু নতমুখে নতদৃষ্টিতে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। ইন্দুর অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে খানিকক্ষণ নির্নিমেষে চেয়ে থেকে হংস-শুভ্রের দৃষ্টির জ্বালা স্নিগ্ধতায় রূপান্তরিত হয়ে গেল—সবেদন স্নিগ্ধতায়। এই তাঁর কনিষ্ঠ সন্তান—কনিষ্ঠ এবং প্রিয়তম। এর ওপরই বিধাতার যত আক্রোশ! আই. এ. পাস ক'রে নিজে পছন্দ ক'রে বিয়ে করেছিল মহীতোষকে, ছ মাসের মধ্যে বিধবা হ'ল। বছর দুই পরে আবার বিয়ে দিলেন—বীরেনও বাঁচল না। ওর জন্যে আলাদা বাড়ি ক'রে দিয়েছেন, আলাদা সম্পত্তি ক'রে দিয়েছেন। যথেচ্ছাচার জীবন যাপন করবার কোন সুযোগের অভাব নেই। এ যুগে সবাই ভোগ-বিলাসে গা ভাসিয়ে দিয়েছে, ওই বা দেবে না কেন—তিনি নিজেও তো কম কিছু করেন নি? পর পর কয়েকটা মুখ মানস-পটে ফুটে উঠল—জোহরা, স্বর্ণ, মিস এলিসন, মিসেস ঘোষ, মোক্ষদা, আরও কয়েকটা— কেউ তো একালে আত্ম-সম্বরণ ক'রে ব'সে নেই, পারুক না পারুক দু হাতে জীবনটাকে আঁকড়ে ধরবার জন্যে ব্যগ্র বাহু বিস্তার করেছে সবাই। কুন্দর মুখখানা আবার মনে পড়ল—ইন্দুই বা কৃচ্ছ্রসাধন করবে কেন, এর মধ্যেই সব সাধ-আহ্লাদ ফুরিয়ে যাবে কেন ওর? একটা ছেলে পর্য্যন্ত হ'ল না! কলকাতায় নিজের বাড়িতে গিয়ে বেশ জমজমাট হয়ে থাকুক না, কিন্তু না, তা থাকবে না ও, থান প'রে শুধু হাতে আমার চোখের সামনে হবিষ্যি ক'রে যাবে দিনের পর দিন। মাথার সিঁদুরটা একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে মুছে ফেলেছে। বাসন্তীর নিমন্ত্রণও প্রত্যাখ্যান করবে ঠিক। হংস-শুভ্রের চোখের দৃষ্টি আবার প্রখর হয়ে উঠল।

আমি যাব কেন? আমার সঙ্গে ওদের সম্পর্ক একটা ফরম্যালা মাত্র, একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার শুধু। আমি প্রাগৈতিহাসিক। শ্বেতপাথরের আসন দিয়ে আমার যুগের সঙ্গে এ যুগের সেতু বাঁধবার চেষ্টা দুশ্চেষ্টা তোমাদের।

তবু আপনাকে যেতেই হবে শেষ পর্য্যন্ত।

তুমি যদি জোর ক'রে নিয়ে যাও, তা হ'লে যেতেই হবে।

কন্যার মুখের ওপর পূর্ণ দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে মৃদু হাসলেন হংস-শুভ্র। যে

প্যাঁচটা কষেছেন, তা থেকে মুক্তি পাওয়া ইন্দুর পক্ষেও অসম্ভব হবে ভেবে বেশ একটু পুলকিতই হলেন তিনি। ইন্দু তবু চেষ্টা করতে ছাড়লে না।

আমি ভাবছি—

তুমি কি ভাবছ, তা জানি। তুমি ভাবছ, বুড়োটা ওই হুল্লোড়ের মধ্যে গিয়ে হোঁচট খেয়ে মরুক, আমি দিব্যি এখানে নিরিবিলিতে থাকি। তোমরা সবাই স্বার্থপর।

ক্ষণকাল নীরব থেকে ইন্দু বললে, বেশ, যাব তা হ'লে।

ব'লেই চ'লে যাচ্ছিল, হংস-শুভ্র ডাকলেন।

আজ সোম আসবে একটু পরেই। মনে আছে তো?

কাকামণির ঘরটাই ঠিক করতে যাচ্ছি।

পালংশাক আনতে দেওয়া হয়েছে?

তারাপদকে স্থক্তোর সব জিনিসই আনতে দিয়েছি, কিন্তু এখনও তার পাত্তা নেই। তুমি ওকে বড্ড আশকারা দাও বাবা।

এ আলোচনা আর বেশি দূর অগ্রসর হবার সুযোগ পেল না, কারণ দ্বার-প্রান্তে ভট্টাচার্য্য মশাই দেখা দিলেন। এইবার মহাভারত-পাঠ শুরু হবে।

ইন্দু-শুভ্রা কাকামণির ঘর ঠিক করতে গেল।

খ

কাকামণির ঘর ঠিক ক'রে-ঘণ্টাখানেক পরে ইন্দু নিজের ঘরে এসে ঢুকল। তার সমস্ত মন জুড়ে কি যে একটা হচ্ছিল, যা ভাষায় প্রকাশ করা শক্ত। ঠিক রাগ নয়, ঠিক বিরক্তিও নয়, কি যেন একটা কি! মাঝে মাঝে তার এ রকম হয়। দু-দুবার বিধবা হয়েছে ব'লে যে গ্লানি হওয়া স্বাভাবিক, সে গ্লানি একা ঘরে তার হয় না, সে গ্লানি সামাজিক। দুবার বিধবা হয়ে সমাজের কাছে সে যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে, উপর্য্যুপরি দুবার ট্রেন মিস করলে আর পাঁচজনের কাছে যেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়তে হয়। মহীতোষ কিংবা বীরেনের সম্বন্ধে তার যে কিছুমাত্র মমত্ববোধ নেই—এ কথা অবশ্য ঠিক নয়, কিন্তু সে মমত্ববোধটা তার সমস্ত সত্তাকে সর্ব্বক্ষণ আচ্ছন্ন ক'রে থাকে না। দুটি যুবক তার জীবনে অতি অল্পদিনের জন্য এসেই চ'লে গেছে—এদের মধ্যে কেউ একজন বেঁচে থাকলে হয়তো তার জীবন ফলে-ফুলে সুশোভিত হয়ে উঠত, এই সব স্মৃতি-সম্ভাবনা নিয়ে সারা-জীবন হা-হুতাশ ক'রে কাটিয়ে

দেওয়ার মত নির্জ্জীব মন তার নয়। তার পরনে থান, মাথায় সিঁদুর নেই, অঙ্গ নিরাভরণ, এক বেলা হবিষ্যান্ন ভোজন ক'রে কম্বলে শুয়ে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য সে পালন করছে বটে, কিন্তু অন্তর তার নিরাসক্ত নয়, বৈরাগ্যের প্রতি তার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। রবীন্দ্র-সাহিত্যের আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছে সে, মুক্তি তার কাম্য বটে, কিন্তু 'সহস্র বন্ধন মাঝে মহানন্দময়' সে মুক্তি। কিন্তু কোথায় সে সহস্র বন্ধন, যা তাকে মহানন্দময় মুক্তির সন্ধান দেবে? স্বাভাবিক পরিবেষ্টনীর যে বন্ধন, কোন এক বিশেষ পরিবারে জন্মগ্রহণ করার জন্যে যে সব সামাজিক বন্ধনে জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ বাঁধা পড়ে, তা কি সব সময়ে আনন্দময়? তা তো নয়। বাড়ির কার সঙ্গেই বা তার মনের সুর মেলে? যাদের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, তাদের সঙ্গেই বা মিলত কি না কে জানে! মহীতোষের প্রেমে প'ড়েই তাকে বিয়ে করেছিল সে, মনে হয়েছিল যে, মনের সুর মিলেচে, কিন্তু দু দিনেই ভুল ভেঙেছিল। যে মহীতোষকে সঙ্গী ক'রে স্বপ্নে বিভোর হয়ে সে এক আদর্শলোকে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে আশা করেছিল, সেই মহীতোষ যখন বিয়ের পর খাকি হাফপ্যাণ্ট প'রে পুলিসে চাকরি নেবার জন্যে স্থানে-অস্থানে সেলাম ক'রে বেড়াতে লাগল, তখন তার স্বপ্ন-কাব্যে প্রথম ছন্দ-পতন ঘটল। পুলিসমাত্রেই যে খারাপ তা নয়, খাকি হাফপ্যাণ্ট অনেক ভদ্রলোকেও পরে, তবু যে কেন বেসুরো বাজল তা ঠিক জানা নেই তার, কিন্তু বেজেছিল। হয়তো আবার সুর জমত এসব সত্ত্বেও, হয়তো জমত না, কিন্তু মহীতোষ বাঁচল না। তারপর এল বীরেন। বীরেনকে সে আগে চিনত না। বাবা সম্বন্ধ ক'রে বিয়ে দিয়েছিলেন। সে বিয়েতে মত দিয়েছিল মাত্র। অন্য কোন কারণে নয়, বিধবা-বিবাহ সমাজে প্রচলিত হওয়া উচিত— এই সুস্থ মতবাদকে সমর্থন করবার জন্যেই মত দিয়েছিল। অপরে যা করতে ভয় পায় সে যে তা অকুতোভয়ে করতে পারে, এইটে প্রমাণ করবার জন্যেই মত দিয়েছিল। আবার বিয়ে করবার দিকে বিশেষ একটা লোলুপতা তার ছিল না। যৌন-সম্ভোগ-লালসা তার জীবনকে কোনদিনই নিয়ন্ত্রিত করে নি, অযৌন জীবন যাপন করলে যে নারী-জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবেই এই হাস্যকর উক্তিকে সে কোনদিনই যুক্তিযুক্ত মনে করে না, সে বিয়ে করেছিল বিধবা-বিবাহের প্রতি সমাজের অযৌক্তিক আচরণের প্রতিবাদস্বরূপ। বিধবা-বিবাহ সমাজে সুপ্রচলিত থাকলে হয়তো সে বিয়ে করত না।...বীরেনও বাঁচল না। দু-দুটো বন্ধন খুলে গেল। কিন্তু তাই ব'লে সে কি দাদা-বউদিদিদের সংসারে

ঢুকে সকলের অনুকম্পা-ভাজন হয়ে তাদের ছেলে-মেয়ে মানুষ ক'রে নারীজন্ম সার্থক করবে? যাদের সঙ্গে এতটুকু মতের মিল নেই, সারা-জীবন তাদের কথায় সায় দিয়ে দিয়ে গৃহলক্ষ্মী সেজে ব'সে থাকবে? পৃথিবীতে আর কাজ নেই? আর মানুষ নেই? আছে বইকি। অজস্র মানুষ আছে, সহস্র সহস্র মানুষ আছে, যাদের সে দেখে নি অথচ ভালবাসে, যাদের আদর্শকে সে শ্রদ্ধা করে, যাদের মনের সুরের সঙ্গে তার মনের সুর ঠিক ঠিক মিলে যায়, তারাই তার আত্মীয়। তাদের জন্যেই বাঁচতে হবে, তাদের জন্যেই বৈধব্যের এই ছদ্মবেশ। তাদের জন্যেই দরকার হ'লে বিলাসিনীর ভূমিকাতেও সে অবতীর্ণ হবে তার পার্কস্ট্রীটের বাড়িতে, কিন্তু এখনও তার প্রয়োজন হয় নি, প্রয়োজন হ'লে সে সব করবে, প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেবে, কিন্তু এখন নয়। এখন তাকে দমদমের বাড়িতেই থাকতে হবে কিছুকাল।

ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল সে। যে কথাটা এতক্ষণ অস্পষ্টভাবে তার মনকে আকুল ক'রে তুলছিল, সহসা সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। কথা নয়, বর্ণনা। মেদিনীপুরের একটা বর্ণনা। বর্ণনাটা তেমন কিছু নয়, কিন্তু এ বর্ণনার পেছনে যে ছবি প্রচ্ছন্ন আছে, তা ভয়ঙ্কর। সকালে যখন কাগজ পড়ছিল, সেই ছবিটা মুহূর্ত্তের জন্য ফুটে উঠেছিল তার মানস-পটে…তবু শঙ্খর ছেলের অন্নপ্রাশনে উৎসব করতে হবে, বউদিদির বাবা ঝুড়ি ঝুড়ি উপহার পাঠিয়েছেন—লজেন্‌জ, বিস্কুট, মেওয়া…হীরক জেলে—কম্‌রেড হীরক…হীরককে সে বুঝতে পারে না…নিজের দেশের চেয়ে রাশিয়া তার কাছে বড় হ'ল! বুঝতে পারে না ঠিক, কিন্তু হীরককেই সে এখনও শ্রদ্ধা করে বাড়ির মধ্যে। রজতকেও করত, কিন্তু রজত বিয়ে করেছে, আর কোন আশা নেই তার কাছে, সেতারের তারগুলো এবার ঢিলে হয়ে যাবে ক্রমশ, দীপক রাগিণী আর আলাপ করা চলবে না তাতে। নন-ভায়োলেণ্ট নন-কো-অপারেটার ছোটদার কথা মনে প'ড়েই হঠাৎ অনঙ্গকে মনে পড়ল তার। অনঙ্গের অঙ্গ নাকি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে রোজ জেলে চাবুকের চোটে… অনঙ্গ জেলের আইন মেনে চলবে না কিছুতে…এ কি ছেলেমানুষি তার, বার বার মার খাবে, তবু মানবে না! হঠাৎ মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে ব'সে পড়ল ইন্দু, সেক্রেটারিয়েট টেবিলের নীচের ড্রয়ারটা টেনে অনঙ্গের ফোটোখানা বার ক'রে নিনিমেষে চেয়ে রইল সেটার দিকে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ন, ওয়েলিংটন, শার্লমেন, তৈমুর, চেঙ্গিস, নাদির শা বেঁচে থাকবে,

ক্লাইবও থাকবে, কিন্তু অনঙ্গ থাকবে না, এই কচি কিশোর অনঙ্গ মহাকালের আবর্ত্তে কোথায় তলিয়ে যাবে, কেউ তাকে মনে রাখবে না—যাদের জন্মে সে প্রাণ দিচ্ছে, তারাও না। হঠাৎ তার চোখ দিয়ে—জল নয়—বিদ্যুৎ-বহ্নি বিচ্ছুরিত হতে লাগল যেন।

গ

বাইরের ঘরে তখনও মহাভারত-পাঠ চলছিল।

স্বর্গ থেকে পতনোন্মুখ যযাতিকে সম্বোধন ক'রে তাঁর মর্ত্ত্যবাসী দৌহিত্র অষ্টক প্রশ্ন করছিলেন, "উক্ত উভয়বিধ ভিক্ষুর মধ্যে অগ্রে কাহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে?" যযাতি উত্তর দিচ্ছিলেন, "যিনি গৃহস্থাশ্রমে বাস করিয়াও আশ্রম-বিবর্জ্জিত এবং কামাচার-পরাঙ্মুখ তিনিই অগ্রে মুক্তিলাভ করেন এবং যথার্থ জ্ঞানী হইয়া পাপাচরণ করিলেও ধারাবাহিক সুখ ভোগ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি পণ্ডশ্রম মনে করিয়া ধর্ম্মোপাসনা করে, তাহার সেই ধর্ম্মাচরণ বিফল; কেবল ক্রূরতা মাত্র…"

এমন সময় সোম-শুভ্র এসে পৌঁছলেন।

সোম-শুভ্রের বয়স ছিয়াত্তরের কাছাকাছি হ'লেও তিনি মোটেই অসমর্থ হয়ে পড়েন নি। এখনও বেশ খাড়া আছেন। মুখে প্রাজ্ঞতার ছাপ পড়েছে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে এমন একটা প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যও ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে যে, দেখলে ভয় করে না, সম্ভ্রম হয়। মাথাটি যেন বড় একটি কদমফুল, ছোট-ক'রে-ছাটা ধপধপে সাদা চুলে ভরতি। এতটুকু টাক পড়ে নি। গোঁফ-দাড়ি কামানো নিটোল মুখে কোথাও জরার চিহ্ন নেই। চোখের দৃষ্টি বেশ স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল। পরনে থান, সাদা লংক্লথের 'চায়না' কোট, পায়েও ধপধপে ক্যাম্বিসের ফিতাহীন জুতো। জুতোটির বিশেষত্ব আছে, ফরমাশ দিয়ে তৈরি করানো। সোম-শুভ্রকে দেখলেই মনে হয়, শুভ্রতার মর্য্যাদা সম্বন্ধে তিনি যেন বিশেষ রকম সচেতন। মলিনতার সামান্যতম গ্লানিও যেন তিনি নিজের ত্রিসীমানায় আসতে দেবেন না। আপাদমস্তক সব ধপধপ করছে।

ঘরে ঢুকেই সোম-শুভ্র হেঁট হয়ে দাদার পদধূলি নিলেন। ভট্টাচার্য্য মশাইকে নমস্কার করলেন।

তুমি এসে পড়লে? নটা বেজে গেল নাকি?

পকেট থেকে ঘড়ি বার ক'রে সোম-শুভ্র বললেন, নটা কুড়ি।

স্টেশনে কাউকে পাঠাতে পারি নি, নেপালী চাকরটা পালিয়েছে—

তারাপদ স্টেশনে ছিল।

ও, ছিল বুঝি! তাই বাজার থেকে ফিরতে এত দেরি তার।

সঙ্গে সঙ্গেই তারাপদ কাঁধে সোম-শুভ্রের বিছানার বাণ্ডিল ও হাতে বাজারের থলি নিয়ে ঢুকল। হংস-শুভ্রের কথার জবাবস্বরূপই বোধ হয় বললে, একা আর ক দিক সামলাই, বল। এবং প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না রেখে ভেতরের দিকে চ'লে গেল হনহন ক'রে।

তারাপদ ও হংস-শুভ্র সমবয়সী। শুধু তাই নয়, সহপাঠীও। সেকালে শিব-শুভ্রের বাড়িতে ছোটখাট একটা পাঠশালা ছিল। শিব-শুভ্রের বাড়িতে খেয়ে এবং শিব-শুভ্রের নিকট বেতন নিয়ে একজন পণ্ডিত, শুধু হংস-শুভ্র এবং সোম-শুভ্রকেই নয়, পাড়ার সব ছেলেদের বিনা বেতনে পড়াতেন। কাউকে কোন খরচ দিতে হ'ত না। সেই পাঠশালায় তারাপদ হংস-শুভ্র এবং সোম-শুভ্রের সঙ্গে কিছু দিন পড়েছিল। সদগোপের ছেলে তারাপদর পড়া অবশ্য বেশি দূর অগ্রসর হয় নি, কিন্তু এই সুবাদে সে হংস-শুভ্র ও সোম-শুভ্রকে 'তুমি' এবং পরিবারের বাকি সকলকে অসঙ্কোচে 'তুই' বলে। তখন থেকেই সে একাধারে হংস-শুভ্রের বন্ধু এবং ভৃত্য, পার্শ্বচর এবং অনুচর। হংস-শুভ্র তার সমস্ত খরচ বহন করেন, সমস্ত আবদার সহ্য করেন। তারাপদও কম সহ্য করে নি—তার স্ত্রী মোক্ষদার সঙ্গে হংস-শুভ্রের যে সম্পর্ক ঘটেছিল, তাও সে সহ্য করেছিল, কিছু বলে নি। হংস-শুভ্র অবশ্য আর একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তারাপদর বিবাহ দিয়েছিলেন এবং আজীবন তার পরিবারের যাবতীয় খরচ বহন ক'রে এসেছেন, তবুও এতটা কে সহ্য করতে পারত? হংস-শুভ্রের এই ধরনের অত্যাচার, শুধু একটা নয়, তারাপদ অনেক সহ্য করেছে। সেই ছেলেবেলাতেই যখন পাঠশালায় পড়ত, একটা সুন্দর পেন্সিল কুড়িয়ে পেয়েছিল। হংসকেই দিতে হ'ল সেটা শেষ পর্য্যন্ত। না নিয়ে কিছুতেই ছাড়লে না। তার বদলে পাঁচটা নতুন পেন্সিল কিনে দিলে অবশ্য, কিন্তু চ্যাপ্টা গোছের ওই পেন্সিলটা সে নিলে। কলকাতার বাজারে ওরকম পেন্সিল তখন পাওয়া যেত না, কোন সায়েবসুবোর পকেট থেকে প'ড়ে গিয়েছিল বোধ হয়। তারাপদ জানে, হংসের স্বভাবই ওই রকম, যখন যেটা ধরে সহজে ছাড়ে না, একেবারে চূড়ান্ত ক'রে তবে ছাড়ে। এখন ধর্ম্ম নিয়ে পড়েছে। র‍্যাংকিনের বাড়ির স্যুট ছাড়া যে এককালে আর কোন কিছু পরত না, সে এখন নামাবলী আর পাটের কাপড় প'রে ব'সে আছে।

হয়তো কোন্‌দিন কমণ্ডলু নিয়ে ছাই মেখে বলবে, চললাম সংসার ছেড়ে। কিছুই বিচিত্র নয়। তারাপদর ধারণা, ঝোঁক চেপে গেলে হংস না করতে পারে এমন জিনিস নেই।

ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে সোম-শুভ্র ভেতরে চ'লে গেলেন।

মহাভারত পাঠ-আবার শুরু হ'ল।

"রাজা যযাতির এবম্প্রকার ধর্ম্মসঙ্গীত শ্রবণ করিয়া অষ্টক জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! আপনি যুবা, মাল্যধারী, তেজস্বী এবং দর্শনীয়; কোন্ ব্যক্তি আপনাকে দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছেন? এবং আপনি কোথা হইতে—"

আগামী রবিবার দিনটা কেমন দেখুন তো, এই পাঁজি নিন।

মহাভারতের সম্ভবপর্ব্ব থেকে হঠাৎ গুপ্তপ্রেসের পঞ্জিকায় নীত হওয়াতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মানসিক অবস্থাটাও অনেকটা যযাতির মত হ'ল। তিনি একটু থতমত খেয়ে গেলেন।

আজ্ঞে, কি বলছেন?

আগামী রবিবার দিনটা শুভদিন কি না দেখুন, সেদিন অন্নপ্রাশন দেওয়া চলতে পারে কি না!

মিনিট পাঁচেক দেখে ভট্টাচার্য্য অভিমত প্রকাশ করলেন, না, অত্যন্ত অশুভ দিন আগামী রবিবার।

হংস-শুভ্রের চোখ দুটো জ্ব'লে উঠল। কিন্তু তিনি চুপ ক'রে রইলেন। ভট্টাচার্য্য আড়চোখে তাঁর দিকে একবার চেয়ে পঞ্জিকাটি সন্তর্পণে মুড়ে রেখে পুনরায় যযাতির-উপাখ্যান আরম্ভ করতে যাবেন, এমন সময় হংস-শুভ্র বললেন, আজ আর থাক।

আচ্ছা।

ভট্টাচার্য্য ধীরে ধীরে উঠে গেলেন।

অগ্নিগর্ভ পর্ব্বতের মত স্থির হয়ে ব'সে রইলেন হংস-শুভ্র।

ক্ষণকাল পরেই একটা সাদা প্লেট ফরসা তোয়ালে দিয়ে মুছতে মুছতে তারাপদ প্রবেশ করতেই তিনি বললেন, পণ্ডিত মশাই চ'লে যাচ্ছেন, ডাক তো। ভট্টাচার্য্য আবার ফিরে এলেন।

অন্নপ্রাশনের একটা ভাল দিন দেখে দিন তো পণ্ডিত মশাই।

ভট্টাচার্য্য আবার পঞ্জিকার পাতা ওলটাতে লাগলেন। তারাপদ প্লেটটা মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেল। যাবার আগে সে হংস-শুভ্রের দিকে যে দৃষ্টিটা

নিক্ষেপ ক'রে গেল, তার অর্থ—আবার কি নিয়ে মাতলে তুমি? ছেলেটার অন্নপ্রাশনে বাগড়া লাগাচ্ছ নাকি?

খানিকক্ষণ পাতা উলটে ভট্টাচার্য্য বললেন, এর পরের বৃহস্পতিটা খুব ভাল দিন।

এর পরই হংস-শুভ্র যে প্রশ্নটি করলেন, তার জন্যে ভট্টাচার্য্য প্রস্তুত ছিলেন না।

আপনি যজ্ঞ করতে পারবেন?

আজ্ঞে?

আমার নাতির ছেলের অন্নপ্রাশন-অনুষ্ঠান রীতিমত হিন্দু পদ্ধতিতে করতে চাই। তাতে যজ্ঞ হোম ঠিক বৈদিক নিয়ম অনুসারে করতে হবে। আপনি কি অধ্বর্য্যু কিংবা অন্য কোন ঋত্বিকের কাজ করতে পারবেন?

ইতিপূর্ব্বে কখনও করি নি। তবে সাধারণভাবে বৃদ্ধি-টৃদ্ধি—

না, সাধারণভাবে হবে না। শাস্ত্রীয় নিয়ম অনুসারে করতে হবে। ভট্টাচার্য্য হংস-শুভ্রকে চিনতেন। চুপ ক'রে রইলেন।

কাশীতে খবর পাঠাতে হবে দেখছি। জিনিসপত্র যা যা লাগবে, তার একটা ফর্দ্দ কোথা পাই—

আজ্ঞে, তা আমি ক'রে দিতে পারব, বই আছে আমার কাছে।

বইটা আনুন তা হ'লে।

ব'লেই তিনি উঠে অন্দরের দিকে চ'লে গেলেন।

যাচ্ছিলেন সোম-শুভ্রের কাছে। যেতে যেতে হঠাৎ ছবি-ঘরের কপাটটা তাঁর চোখে পড়ল। প্রকাণ্ড তালাটা ঝুলছে। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি খানিকক্ষণ।

তারাপদ!

তারাপদ এল।

এ ঘরটা খোল।

প্রকাণ্ড চাবির গোছাটা এনে তালাটা খুলে দিয়ে চ'লে যাচ্ছিল তারাপদ, হংস-শুভ্র বললেন, পণ্ডিত মশাই একটা ফর্দ্দ দেবেন, সেটা তুমি টুকে নাও গিয়ে।

কিসের ফর্দ্দ?

যজ্ঞের।

হংস-শুভ্র ঘরের ভেতর ঢুকে কপাটটা বন্ধ ক'রে দিলেন। বন্ধ দ্বারের দিকে চেয়ে তারাপদ সবিস্ময়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর চ'লে গেল।

ছবি-ঘরে অনেক দিন ঢোকেন নি হংস-শুভ্র। একটা ঘরকে 'ছবি-ঘর' নাম দিয়ে সেটাকে স্বতন্ত্র মর্য্যাদা দান তিনিই করেছিলেন একদিন, বহুকাল পূর্ব্বে। মৃত পূর্ব্বপুরুষ ও আত্মীয়-স্বজনদের ছবিই শুধু নয়, অতীতের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত অনেক জিনিসও উত্তর দিকের এই ঘরখানিতে সযত্নে সংগ্রহ ক'রে রেখেছিলেন তিনি। তারাপদকে বলেছিলেন, দুবেলা যেন ধূপধূনা দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয় ঘরটা। তারাপদ অক্ষরে অক্ষরে তাঁর আদেশ পালন ক'রে যাচ্ছে, তিনি নিজেই বহুদিন ঘরটাতে ঢোকেন নি। হিন্দু-দর্শনশাস্ত্রের মহাসমুদ্রে অবগাহন ক'রে তাঁর মনে কিছুকাল থেকে এই প্রতীতি জন্মেছিল যে, যারা আত্মার অমরতায় আস্থাবান, মায়া-পাশ ছিন্ন ক'রে অখণ্ড অব্যক্ত পরমব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া ছাড়া কোনও জীবের গত্যন্তর নেই ব'লে যাদের বিশ্বাস, প্রত্যেক জীবকেই জন্মজন্মান্তরের আবর্ত্তে আবর্ত্তিত হয়ে অবশেষে সেই একই মহাসত্তায় মিশতে হবে এই যারা সত্য ব'লে মনে করে, তাদের পক্ষে এই নশ্বর জীবনের দু-চারটে স্মৃতির টুকরোকে আঁকড়ে থাকার অর্থ—সেই বিরাট প্রবাহকে অস্বীকার করা, যার খরস্রোতে, তারা জানে যে, পর্ব্বত সমুদ্রে এবং সমুদ্র মরুভূমিতে রূপান্তরিত হয়। আজকের পর্ব্বতের প্রতিকৃতি নিয়ে কি হবে? ওটা তো ওর আসল রূপ নয়। নিয়ত-পরিবর্ত্তনশীল পরমাণুপুঞ্জের একটা বিশেষ মুহূর্ত্তের ছবি রেখে লাভ কি? নিত্য-চলমান বিশ্বজগতের পটভূমিকায় কল্পনানেত্রে দেখলে ওর স্বরূপ হয়তো দেখা যেতে পারে এবং তাই হয়তো সত্য দর্শন। বহুকাল তিনি ঢোকেন নি ঘরটাতে। আজ কিন্তু ওই বড় তালাটা চোখে পড়াতে তাঁর দার্শনিক মন হঠাৎ যেন ক্রীড়াপ্রবণ হয়ে উঠল। দর্শনের বিজ্ঞ অধ্যাপক অল্পবয়স্ক ছাত্রদের সঙ্গে খেলার মাঠে নেমে যেন হুড়োহুড়ি ক'রে খেলতে উৎসুক হলেন।

ঘরে ঢুকেই প্রথমে চোখে পড়ে শিব-শুভ্রের বিরাট অয়েল-পেন্টিং ছবিখানা। হঠাৎ দেখলে রামমোহন রায় ব'লে ভুল হয়। সেই চোগা চাপকান শামলা। হংস-শুভ্র পিতার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। যদিও ছবি ছবিই, তবু হংস-শুভ্রের মত দার্শনিকও মনে মনে কোন একটা

প্রত্যাদেশের প্রত্যাশায় প্রতীক্ষা ক'রে রইলেন যেন ক্ষণকাল। বাচনিক কোন প্রত্যাদেশ এল না বটে, কিন্তু অনেক দিন আগেকার একটা ছবি ফুটে উঠল মনে। তাঁর আর সোম-শুভ্রের উপনয়নের ছবি। ভট্টপল্লী থেকে গৌরীকান্ত শিরোমণি এসেছিলেন, কাশী থেকে এসেছিলেন পণ্ডিত গোপীনারায়ণ। তা ছাড়া পুরোহিত, পণ্ডিত, শাস্ত্রী আরও অনেকে ছিলেন। বৈদিক মন্ত্রের উদাত্ত ধ্বনিতে বিরাট মণ্ডপটা গমগম করছিল, এখনও তাঁর মনে আছে। বিরাট উৎসব হয়েছিল। সাত দিন সাত রকম। প্রথম দিন হিন্দু মতে—ব্রাহ্মণভোজন, যাত্রা, ভাগবত-পাঠ। দ্বিতীয় দিন মুসলমানী মতে—পোলাও-কাবাব-কোপ্তার খানা, বাইনাচ, মুশয়রা। তৃতীয় দিন সাহেবদের জন্য সাহেবী হোটেলে সাহেবী ফ্যাশানে ডিনার, ড্রিঙ্ক, ডান্স। চতুর্থ দিনে কাঙালী-ভোজন—লুচি, ভাত, ডাল, পোলাও, তরিতরকারি, মিষ্টান্ন—সব রকম, যে যত খেতে এবং নিয়ে যেতে পারে, অষ্টপ্রহরব্যাপী কীর্ত্তন হয়েছিল। পঞ্চম দিন কেবল মেয়েদের খাওয়ানো হয়েছিল, সেও ভূরি-ভোজন। পুরুষদের কোন সম্পর্কই ছিল না তার সঙ্গে। মেয়ে রাঁধুনী, মেয়ে পরিবেশনকারিণী, মেয়ে কীর্ত্তনিয়া, এমন কি মেয়ে-যাত্রা পর্য্যন্ত এসেছিল। ষষ্ঠ দিন কবির লড়াই, কবিদের সম্বর্দ্ধনা করা হয়েছিল সেদিন। সপ্তম দিন হয়েছিল পালোয়ানদের কুস্তি; ওস্তাদদের গান, আর তাঁদের প্রত্যেকের ফরমাশ অনুযায়ী খাওয়ার ব্যবস্থা। কেউ খেলেন বাদামের হালুয়া, কেউ মহিষের কাঁচা দুধ, কেউ স্বপাক আলোচাল গাওয়া-ঘি, কেউ সিদ্ধির সন্দেশ, কেউ মধু আর ফলাহার করলেন কেবল, কেউ মোটা মোটা রুটি বানিয়ে নিলেন নিজের হাতে।...হঠাৎ চাবুকটা নজরে পড়ল হংস-শুভ্রের। চামড়ার ওই হাণ্টারটা দিয়ে সিতাংশুকে খুব মেরেছিলেন তিনি একদিন অবাধ্যতার জন্য। হংস-শুভ্র ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে ছবির ভিড়ের মধ্যে সিতাংশুর ছবিখানা খুঁজতে লাগলেন। ওই যে, হাসিমুখে চেয়ে আছে। ব্যারিস্টারের গাউনে কি সুন্দর মানাত ওকে! হিমাংশু সুধাংশুর ছবিও পাশাপাশি টাঙানো রয়েছে, কিন্তু সিতাংশুর দিকেই একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন তিনি। ছেলেটা দুষ্ট ছিল ব'লেই বোধ হয় বেশি ভালবাসতেন তাকে। যা ধরত, তা করত। তাঁর মতের বিরুদ্ধেই ব্যারিস্টারি পড়েছিল, কিছুতেই আই. সি. এস. পরীক্ষাটা দিলে না। কিছুতেই সামলানো যেত না, একটা ঝড় যেন। ঝড় থেমে গেছে। হংস-শুভ্র এগিয়ে গিয়ে আর একটা অয়েল-পেন্টিংয়ের সামনে দাঁড়ালেন। দূরসম্পর্কের পিসীমা ভুবনমোহিনী

দেবী। রক্তের দিক দিয়ে সম্পর্কটা দূর বটে, কিন্তু মনের দিক দিয়ে এই ভুবনমোহিনী একদিন হংস-শুভ্রের অতি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। বহু-বিবাহের যুগে বহুপত্নীবান যে কুলীনের গলায় মালা দিয়ে ভুবনমোহিনী সীমন্তে সিঁদুর পরবার অধিকার পেয়েছিলেন, তাঁর গৃহেই সেই ন বছর বয়স থেকেই বহু সপত্নী সমভিব্যাহারে তিনি এমন নিখুঁত রকম সুন্দর অনাড়ম্বর আত্মমর্য্যাদাপূর্ণ জীবন যাপন ক'রে গেছেন যে, সে কথা ভাবলে হংস-শুভ্রের শির এখনও শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে হংস-শুভ্রের বাড়িতে আসতেন তিনি। প্রায় সমবয়সীই ছিলেন। হংস-শুভ্র অবাক হয়ে যেতেন তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর অনবদ্য রূপরাশি দেখে, প্রস্ফুটিত শতদল যেন। বেশি দিন বাঁচেন নি, ভরা-যৌবনেই মারা গেছেন। ইংরেজী-কেতায়-মানুষ হংস-শুভ্র তাঁর একগোছা চুল স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ কেটে রাখতে চেয়েছিলেন, ভুবনমোহিনী দেন নি। ভাগ্যে কিছু দিন পূর্ব্বে একটা ফোটো তুলে রেখেছিলেন, তাই এখনও তাঁর কথা মনে পড়ে মাঝে মাঝে। অনেক খরচ ক'রে সেই ফোটো থেকে এই ছবিখানা করিয়ে রেখেছেন তিনি। হংস-শুভ্র যখনই এ ছবিখানার কাছে এসেছেন মনে মনে প্রণাম করেছেন, আজও করলেন। হংস-শুভ্র এগিয়ে গেলেন। ছবির পর ছবি···কত ছবি! দামী গ্লাস-কেসে একখানা শাল রাখা ছিল, কাঞ্চনমালার শাল। সেখানার সম্মুখে দাঁড়ালেন খানিকক্ষণ। পাশেই কুন্দর গয়নার বাক্সটা রয়েছে, যাবার সময় কুন্দ গায়ের সমস্ত গহনা খুলে রেখে গিয়েছিল। তারপরই ভায়রাভাই রুদ্রবিলাস। এককালে খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল লোকটার সঙ্গে, চমৎকার শেক্‌স্‌পিয়র আবৃত্তি করত। কবে ম'রে গেছে। শেক্‌স্‌পিয়রের নামটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেকালের আরও কতকগুলো প্রিয় নাম মনে প'ড়ে গেল—মিল্টন, বেকন, লক, হিউম, অ্যাডাম স্মিথ, গিবন, রলিন্স···স্বপ্নের মত মনে হ'ল, বিস্মৃতপ্রায় স্বপ্নের মত। এদের কারও সঙ্গেই আর জীবন্ত সম্পর্ক নেই, সমস্তই স্মৃতি। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

ক্রমশ

"বনফুল"

গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টর

প্রথম অঙ্ক

ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলো : ড্রয়িং-রুম

ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ, পুলিস-সুপার, সিভিল সার্জন, হেডমাষ্টার, দাতব্য-বিভাগের কর্ত্তা প্রভৃতি

ম্যাজিস্ট্রেট। একটা দুঃসংবাদ দেবার জন্মে আজ আপনাদের এখানে ডেকেছি। শিগগিরই একজন ইন্সপেক্টর আসছে।

জজ। ইন্সপেক্টর?

দাতব্য-কর্ত্তা। ইন্সপেক্টর?

ম্যাজিস্ট্রেট। হ্যাঁ, একজন গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টর—কলকাতা থেকে, ছদ্মবেশে, সিক্রেট অর্ডার নিয়ে।

জজ। কি দুঃসংবাদ!

দাতব্য-কর্ত্তা। দুঃসংবাদ ব'লে দুঃসংবাদ। এমনিতেই আমাদের বিপদ-আপদের যেন অভাব আছে? তার ওপরে আবার—

হেডমাস্টার। তার ওপরে আবার 'সিক্রেট-অর্ডার'! কি সর্ব্বনাশ!

ম্যাজিস্ট্রেট। একটা যে কিছু বিপদ আসছে, তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। কাল সারারাত আমি ইঁদুরের স্বপ্ন দেখেছি—প্রকাণ্ড দুটো কালো ইঁদুর, আমার কাছে এসে গাঁ শুঁকে চ'লে গেল। তখনই মনে হ'ল, একটা বিপদ আসছে। আর ভোরবেলা উঠেই এই সংবাদ।...যাক, চিঠিখানা আপনাদের প'ড়ে শুনিয়ে দিই। আমার বন্ধু বীরনগরের রায় সাহেবকে তো আপনি জানেন [দাতব্য-কর্ত্তার প্রতি]। রায় সাহেব লিখছেন, 'প্রিয় রায় বাহাদুর' [চিঠিখানার বিশেষ বিশেষ অংশ পড়িতে লাগিলেন] কোথায় গেল—এই যে, "অন্যান্য সংবাদের মধ্যে একটা বিশেষ খবর এই যে, এই বিভাগ—তার মধ্যে আবার আমাদের জেলা পরিদর্শনের জন্য একজন ইন্সপেক্টর ছদ্মবেশে আসিয়া পৌছিয়াছেন; তিনি ইন্সপেক্টর বলিয়া নিজের পরিচয় দেন না, সাধারণ লোক হিসাবে চলাচল করিতেছেন। এই খবর একান্ত বিশ্বাসজনক সূত্রে প্রাপ্ত। আমি তো জানি যে, সাধারণ মানুষ-সুলভ দুর্ব্বলতা আপনার আছে, কারণ কোন বিচক্ষণ মানুষই সুযোগ আসিলে ছাড়িয়া দেয় না।" [একটু থামিয়া, কাসিয়া] এখানে তো সকলেই আমরা বন্ধু, কাজেই...[পুনরায় পড়িতে লাগিলেন] "আমি পূর্ব্বাহ্নেই

আপনাকে সাবধান করিয়া দিবার জন্ম এই পত্র লিখিতেছি যে, যে কোন মুহূর্ত্তে এই ইন্সপেক্টর আপনাদের মধ্যে গিয়া পৌছিতে পারেন, যদি তিনি ইতিমধ্যেই ছদ্মবেশে গিয়া না পৌছিয়া থাকেন। হয়তো তিনি এখনই আপনাদের মধ্যে বসবাস করিতেছেন, আপনারা জানিতেও পারিতেছেন না। গতকল্য আমি"··· যাক, এবার তাঁর পারিবারিক সংবাদ আরম্ভ হ'ল, "গতকল্য আমার ভগ্নী ও ভগ্নীপতি রতনবাবু আসিয়া পৌছিয়াছেন। রতনবাবু আরও মোটা হইয়াছেন এবং অবসর পাইলেই বসিয়া বসিয়া বাঁশী বাজান।" ইত্যাদি, ইত্যাদি। যাকগে। তা হ'লে ব্যাপার হ'ল এই—

জজ। দুঃসংবাদ সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন এমন হ'ল? নিশ্চয় কোন জরুরি কারণ আছে।

হেডমাস্টার। সত্যি রায় বাহাদুর, কেন এমন ঘটল? ইন্সপেক্টর কেন আসতে যাবে? আপনার কি মনে হয়?

ম্যাজিস্ট্রেট। [দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া] কেন আর কি? ভবিতব্য! ভবিতব্য! এতদিন অন্যান্য জেলায় গিয়েছে, এবার আমাদের পালা।

জজ। অত সহজ নয় রায় বাহাদুর। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, খুব জরুরি আর গোপনীয় কারণ আছে। ব্যাপারটা রাজনৈতিক। [নীচু স্বরে] শীঘ্রই যুদ্ধ বাধবে, তাই খবর নেবার জন্যে ইন্সপেক্টর বেরিয়েছে, কোথাও কোন বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা আছে কি না।

ম্যাজিস্ট্রেট। আপনি এমন বিচক্ষণ লোক, আর এসব কথা বলছেন! বিশ্বাস-ঘাতকতা এই দিনাজসাহী শহরে! তবু যদি বা সীমান্তের ধারে কাছে হ'ত! এক মাস হাঁটলেও সীমান্তে গিয়ে পৌছনো যায় না এমন শহর এই দিনাজসাহী।

জজ। আমার মনে হয়, আপনি ভুল করছেন। রাজধানীতে যারা থাকে, তাদের বুদ্ধিই অন্য রকম। ক্ষতির কারণ না থাকলেও মাঝে মাঝে খোঁজ-খবর নেওয়া সেই বুদ্ধির একটা লক্ষণ।

ম্যাজিস্ট্রেট। কারণ যাই হোক, আগে থেকে আপনাদের সতর্ক ক'রে দিলাম। আমার ডিপার্টমেণ্ট আমি ইতিমধ্যে গুছিয়ে নেব। আপনা-দেরও তাই করা উচিত। [দাতব্য-বিভাগের কর্ত্তার প্রতি] রসময়বাবু, ইন্সপেক্টর যে আপনার দাতব্য-হাসপাতাল দেখতে যাবেন, তাতে আর সন্দেহ নেই। রুগীগুলোকে যেন ভিখিরীর মত না দেখায়। হঠাৎ

ওদের ভিখিরী ব'লেই মনে হয়। বিছানাগুলো একটু ফিটফাট যেন থাকে।

[কর্ত]ব্য-কর্ত্তা। এ আর এমন বেশি কি! বিছানাগুলো একটু পরিষ্কার ক'রে রাখতে হবে।

[ম্য]াজিস্টেট। হ্যাঁ, বিছানাগুলো দেখলে শ্মশান থেকে কুড়িয়ে আনা ব'লে মনে হয়।

আর এক কাজ করতে হবে প্রত্যেকখানা তক্তাপোশের পাশে, প্রত্যেক রুগীর মাথার কাছে ইংরিজীতে উচ্চাঙ্গের একটা নীতিবাক্য লিখে রাখা উচিত; প্রত্যেক রুগীর পায়ের কাছে একখানা কাগজে রুগীর নাম, রোগের নাম, বয়স, কতদিন ভুগছে, সব লেখা থাকা দরকার।

সত্যি, আপনার রুগীরা এমন কড়া তামাক খায় যে, কাছে গেলেই হাঁচি পায়। আর রুগীর সংখ্যা কম হ'লেই ভাল ছিল, নতুবা ইন্সপেক্টর মনে করতে পারেন যে, স্বাস্থ্য-বিভাগ যথেষ্ট মনোযোগী নয়, কিংবা সিভিল-সার্জন কিছু জানেন না।

[কর্ত]ব্য-কর্ত্তা। চিকিৎসার বিষয়ে যদি বলেন, তবে আমি আর সিভিল-সার্জন অনেক দিন হ'ল এই সিদ্ধান্তে পৌছেছি যে, প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দেওয়াই চিকিৎসকের প্রধান কর্ত্তব্য, সেইজন্যে দামী ওষুধ আমরা ব্যবহার করি না। আমার রুগীরা গরিব লোক, যদি মরে নিতান্ত সাদাসিধেভাবে মরবে। আর যদি বেঁচেই ওঠে, তাও সাদাসিধেভাবেই উঠবে। বাঁচা মরা যেমনই হোক, সিভিল-সার্জনের পক্ষে ওদের চিকিৎসা করাই সম্ভব নয়, কারণ ডাক্তার পিলাই এক অক্ষরও বাংলা বুঝতে পারেন না।

[সি]ভিল-সার্জন। [অস্পষ্ট নাসিকা-গর্জ্জন দ্বারা আপত্তি প্রকাশ করিল।]

[ম্য]াজিস্টেট। [জজের প্রতি] মিঃ সিন্‌হা, আপনিও একটু দৃষ্টি রাখবেন আদালত-বাড়িটার দিকে। এজলাস ঘরের মধ্যেই আপনার চাপরাসীরা মুরগী পালতে শুরু করেছে। ওঃ, সেদিন দেখি, একপাল হাঁস মুরগী সে কি ডাক শুরু করেছে! উকিলবাবুদের সওয়ালের সঙ্গে হাঁসের ডাক মিলে সে কি জটিল ঐক্যতান! অবশ্য পক্ষীপালন খুব উপকারী, বিশেষ এই দুর্দিনে। কিন্তু একেবারে প্রকাশ্য আদালতে ব্যাপারটা বোধ করি বাঞ্ছনীয় নয়। আমি অনেকবার আপনাকে মনে করিয়ে দেব ভেবেছি, কিন্তু কাজের চাপে কিছুতেই মনে রাখতে পারি নি।

জজ। আজকেই আমি হুকুম দিয়ে দিচ্ছি, সব যেন আমার বাবুর্চিখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আসুন না আজ রাত্রে ডিনারে।

ম্যাজিস্ট্রেট। আরও একটা কথা। আদালত-ঘরের দেয়ালে ঘুঁটে দিয়ে দিয়ে বসন্তের রুগীর গায়ের মত হয়ে গিয়েছে। আর রাজ্যের ছেঁড়া কাঁথা শুকোতে দেখা যায়। আর সেরেস্তার আলমারির গায়ে একখানা শঙ্কর মাছের চাবুক ঝুলতে দেখেছি। এতে ক'রে প্রমাণ করে, শিকারে আপনার খুব শখ। কিন্তু কয়েক দিনের জন্যে ওটা সরিয়ে নেওয়া দরকার। তারপরে ইন্সপেক্টর চ'লে গেলে আবার ওটা স্বস্থানে রাখা যেতে পারে।

আর আপনার পেশকার। তার কথা আর কি বলব। তার গায়ে এমন বিকট গন্ধ, যেন এখনই তাড়িখানা থেকে বেরিয়ে এল। আপনাকে অনেকবার মনে করিয়ে দেব ভেবেছি, কিন্তু আমি এমনই ব্যস্ত থাকি যে, আদৌ সময় পেয়ে উঠি না। অবশ্য লোকটা যদি বলে যে, ওটাই তার স্বাভাবিক গন্ধ, তা হ'লে আপত্তি করা চলে না। কিন্তু খুব ক'ষে পেঁয়াজ-রসুন খাইয়ে ওটা চাপা দেওয়া যায় না? আচ্ছা, ডাক্তার পিলাই, আপনি একটু ওষুধ দিয়ে ওটা চেপে রাখবার ব্যবস্থা করতে পারেন না?

সিভিল-সার্জন। [নাসিকা-তর্জ্জনে কি যেন জানাইল।]

জজ। না না, ও গন্ধ দূর করবার উপায় নেই। লোকটা বলে যে, ওর নার্স শৈশবে ওকে মদের মধ্যে একবার ফেলে দিয়েছিল, সেই থেকে তাড়ির গন্ধ ওর স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে।

ম্যাজিস্ট্রেট। যাই হোক, একবার তবু মনে করিয়ে দিলাম। কিন্তু যে ভাবে আদালতে বিচার হয়, আমার বন্ধু চিঠিতে যাকে স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা বলেছেন, সে বিষয়ে আমি কিছু বলতে ইচ্ছা করি না। আর বলবার আছেই বা কি? দুর্ব্বলতা-মুক্ত মানুষ আর কোথায়? এ তো বিধাতার বিধান।

জজ। দুর্ব্বলতা কাকে বলছেন রায় বাহাদুর? সব দুর্ব্বলতা কি সমান? আমি প্রকাশ্যে ব'লে থাকি যে, আমি ঘুষ নিয়ে থাকি। কিন্তু কি? টাকাকড়ি নয়—বিলিতী কুকুরের বাচ্চা। ওকে ঘুষ বলা চলে না।

ম্যাজিস্ট্রেট। বিলিতী কুকুরের বাচ্চাই হোক আর যাই হোক, ওকে ঘুষ ছাড়া আর কি বলে?

জজ। না রায় বাহাদুর, এ কথা ঠিক হ'ল না। ধরুন, একজন যদি স্ত্রীর জন্যে পাঁচশো টাকা দামের একখানা বেনারসী শাড়ি নেয়, কিংবা—

ম্যাজিস্ট্রেট। স্বীকার করলাম, ঘুষ হিসাবে আপনি শুধু বিলিতী কুকুরের বাচ্চাই নেন, কিন্তু তাতেই বা কি? আসল কথা, আপনি ভগবানে বিশ্বাস করেন না, কোনদিন পূজা-অর্চনা করেন না। ভগবানে আমার অটল বিশ্বাস। তিন বেলা সন্ধ্যাহ্নিক না ক'রে আমি জলগ্রহণ করি নে।

জজ। দেখুন, আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ যদি তুললেন তবে স্পষ্ট বলি, আমি শাস্ত্রে বিশ্বাস করি না, এসব বিষয়ে আমি কারও সাহায্য না নিয়ে কেবল নিজের চিন্তাশক্তির সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি।

ম্যাজিস্ট্রেট। কোন কোন বিষয়ে অতি-চিন্তা চিন্তাহীনতার চেয়ে নিন্দনীয়। কিন্তু সে যাই হোক, জজের আদালতে যে ইন্সপেক্টর যাবেন, তা মনে হয় না—ও জায়গা একেবারে বিধাতার খাস জমিদারির অধীন। এ বিষয়ে আপনার সৌভাগ্য ঈর্ষ্যার যোগ্য।

কিন্তু হেডমাস্টার মশায়, আপনি সাবধান হবেন—বিশেষ ক'রে আপনার শিক্ষকদের সম্বন্ধে। অবশ্য তাঁরা সবাই শিক্ষিত লোক। ইস্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাপে ধাপে আরোহণ ক'রে জ্ঞানের চিলেকোঠায় গিয়ে ওঁরা পৌঁছেছেন, কিন্তু ওঁদের অনেকের বড় বিচিত্র রকমের অভ্যাস আছে, বোধ করি, জ্ঞানের থেকে সেসব অবিভাজ্য। যেমন ধরুন না কেন, সেই যে মোটা চেহারার ভদ্রলোকটি, নামটা কিছুতেই মনে থাকে না, চেয়ারে গিয়ে বসলেই এমন বিকট মুখভঙ্গী করে [মুখভঙ্গী করিয়া দেখাইলেন] আর ক্রমাগত দাড়িতে হাত বুলোতে থাকে; যতক্ষণ সে ছেলেদের প্রতি মুখভঙ্গী করে কিছু আসে যায় না, হয়তো অধ্যাপনার ওটা একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ, আমার পক্ষে নিশ্চিত ক'রে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু মনে করুন তো, ওই রকমটি যদি কোন দর্শকের প্রতি করে, তবে কি বিপদ ঘটবে! ইন্সপেক্টর ভাবতে পারেন, ওতে তাঁকে ব্যঙ্গ করা হ'ল। তখন ওই ঘটনা কত দূর গড়াবে বলুন তো?

হেডমাস্টার। আমি কি করব বলুন? আমি বারংবার তাঁকে সাবধান ক'রে দিয়েছি। সেদিন মহামান্যা লাটপত্নী ইস্কুল পরিদর্শনে এসেছিলেন। আর কি বলব! এমন মুখভঙ্গী ক'রে উঠলেন, না না, তেমনটি আপনি কখনও দেখেন নি। অবশ্য তাঁর উদ্দেশ্য খুব সাধু। কিন্তু এজন্য এডিকং-এর কাছে আমাকে কথা শুনতে হ'ল।

ম্যাজিস্ট্রেট। আর আপনার ইতিহাসের শিক্ষকের বিষয়ে একটা কথা বলতে

চাই। লোকটি খুব পণ্ডিত সন্দেহ নেই, কিন্তু ক্লাসে এমন অত্যুৎসাহে বক্তৃতা করেন যে, প্রায় আত্মবিস্মৃত অবস্থা। একবার তাঁর বক্তৃতা শুনেছিলাম। যতক্ষণ অ্যাসিরিয়ান আর ব্যাবিলোনিয়ানদের বিষয়ে বলছিলেন আত্মসম্বিৎ একেবারে হারান নি, কিন্তু যখন আলেক্‌সাণ্ডার দি গ্রেটে এসে পৌছলেন, অবস্থা চরমে গিয়ে পৌছল। মনে হ'ল, ঘরে যেন আগুন লেগেছে, সত্যি তাই মনে হ'ল। হঠাৎ চেয়ার থেকে লাফিয়ে নেমে প'ড়ে মেঝের ওপরে দড়াম ক'রে একখানা চেয়ার ফেললেন। আলেক্‌সাণ্ডার দি গ্রেট অবশ্য মস্ত বীর ছিলেন, কিন্তু সেজন্য চেয়ার ভাঙা কেন? ওগুলো যে গভর্মেণ্টের সম্পত্তি।

হেডমাস্টার। ঠিক বলেছেন, লোকটা অল্পেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। আমি অনেক বার তাঁকে সাবধান ক'রে দিয়েছি। কিন্তু তিনি কি বলেন জানেন, 'আপনি যাই বলুন, জ্ঞানবিস্তারের জন্য আমি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত।'

ম্যাজিস্ট্রেট। বিধাতার কি লীলা! বুদ্ধিমান লোকেরা হয় মাতাল, নয় এমন বিচিত্র মুখভঙ্গী করে যে, ভয় পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিতে হয়।

হেডমাস্টার। কি আর বলব! আমার শত্রুও যেন শিক্ষাবিভাগে কাজ করতে না আসে। এখানে সকলকেই ভয় ক'রে চলতে হয়; কে যে কর্ত্তা নয় তা বুঝতে পারি না, প্রত্যেকেই এসে দুটো উপদেশ দিয়ে যায়; প্রত্যেকেই প্রমাণ করতে বসে যে, আমাদের চেয়ে বুদ্ধিমান; যত দেউলে ব্যবসায়ী, পশারহীন উকিল, আকাট বৈজ্ঞানিক, বড় সাহেবের জামাইয়ের জামাই—আমাদের কর্ত্তা। আর বেতনের কথা সে আর কি বলব! নিজের স্ত্রীর কাছে উল্লেখ করতেও লজ্জা বোধ হয়।

ম্যাজিস্ট্রেট। কিছুতেই কিছু যায় আসে না, কিন্তু বেশটা যে ছদ্ম, বুঝতে পারবার আগেই ব'লে উঠবে—এই যে সোনার চাঁদেরা, তোমরা সব এখানে! দেখলাম তোমাদের সব কীর্ত্তি। জজ কে? জগদ্ধাত্রী সিংহ? গ্রেপ্তার। দাতব্য-বিভাগের কর্ত্তা কে? রসময় কটক? গ্রেপ্তার। এ যে অসহ্য অবস্থা!

(পোষ্টমাষ্টারের প্রবেশ)

পোস্টমাস্টার। কি ব্যাপার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব? ইন্সপেক্টর আবার কে আসছে?

ম্যাজিস্ট্রেট। কেন, আপনি কি শোনেন নি কিছু ?

পোস্টমাস্টার। আমি বলরামবাবুর কাছে এইমাত্র শুনলাম। তিনি ডাকঘরে গিয়েছিলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট। আপনার কি মনে হয় ? কেন ইন্সপেক্টর আসছে ?

পোস্টমাস্টার। কেন আবার ? শীঘ্রই যুদ্ধ বাধবে।

জজ। দেখুন। আমিও ঠিক এই কথাই বলেছিলাম।

ম্যাজিস্ট্রেট। আপনারা কিছুই বুঝতে পারেন নি।··তারপরে নিরাপদবাবু, পোস্ট-অফিসের সব খবর ভাল তো ? ইন্সপেক্টর ডাকঘর পরিদর্শন করতে নিশ্চয় একবার যাবেন।

পোস্টমাস্টার। আমি সর্ব্বদা ঘর সামলিয়ে চলি। আপনার খবর সব মঙ্গল তো ?

ম্যাজিস্ট্রেট। আমি ? আমি ভয় পাব কেন ? কেবল একটু, মানে ব্যবসায়ীরা আর শহরের লোক আমাকে জ্বালাতন ক'রে মারলে। আমি নাকি তাদের সর্ব্বনাশ করছি ! হ্যাঁ, কখনও যে অল্পস্বল্প না নিয়ে থাকি এমন নয়, কিন্তু ভগবান জানেন, তার উদ্দেশ্য সাধু। দেখুন মুস্তফী মশায় [পোস্ট-মাস্টারকে একান্তে লইয়া গিয়া নীচু স্বরে] এক কাজ করতে পারেন না, তাতে আমাদের সকলেরই উপকার হবে, এই, মানে—কিনা ডাকঘরে যত চিঠি আসে আর যায়, সবগুলো খুলে একবার দেখতে পারেন না ? আমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকে কি না ? না থাকে তো কোন বালাই নেই, আবার বন্ধ ক'রে দিলেই চলবে। না হয় খোলাই থাকবে। নিশ্চয় কোন অভিযোগ যাচ্ছে, নইলে ইন্সপেক্টর আসতে যাবে কেন ?

পোস্টমাস্টার। এসব বুদ্ধি আর আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে না। রোজ ভোরবেলা উঠে ওই তো আমার প্রথম কাজ। চা খেতে খেতে হাঁক দিই—শশী পিওন, আমায় খবরের কাগজ। শশী এক তাড়া খামের চিঠি এনে দেয়। বলব কি মশায়, এক-একখানা চিঠি এমন সুন্দর ! যেমন বর্ণনা, তেমনই ভাষা, আর শিক্ষণীয় বিষয়ও তেমনই থাকে। কোথায় লাগে আপনাদের আনন্দবাজার, যুগান্তর !

ম্যাজিস্ট্রেট। আচ্ছা, তার মধ্যে কি কলকাতা থেকে ইন্সপেক্টর আসবার কথা দেখেন নি ?

পোস্টমাস্টার। কই, না।···কিন্তু যাই বলেন, এক-একখানা চিঠি এমন

আবেগের সঙ্গে লিখিত। দুঃখ হয় যে, এমন সব চিঠি আপনারা পড়তে পান না। একজন কর্নেল তার এক বন্ধুকে লিখছে—'প্রিয় বন্ধু, আমরা এখন নন্দনকাননে বাস করছি; চারদিকে অগণিত তরুণী; নিশান উড়ছে, ব্যাণ্ড বাজছে, পানাহারের অপরিমিত আয়োজন।' আমি রেখে দিয়েছি—দেখবেন নাকি? সে কি জ্বালাময়ী ভাষা!

ম্যাজিস্ট্রেট। আর এক সময়ে হবে, এখন ভাল লাগছে না। নিরাপদবাবু, যদি কখনও আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আপনার হাতে এসে পড়ে, আপনি রেখে দেবেন।

পোস্টমাস্টার। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

জজ। ডাকবাবু, এই রকম করতে করতে একদিন আপনি বিপদে প'ড়ে যাবেন।

পোস্টমাস্টার। আমি পড়ব বিপদে!

ম্যাজিস্ট্রেট। কখ্খনও নয়। চিঠিগুলোর তো আর প্রকাশ্য ব্যবহার হচ্ছে না; গোপনীয় বস্তু গোপনেই রাখছেন। এতে আবার বিপদ কি?

জজ। কখন্ কোন্ বিপদ ঘটে, তার নিশ্চয় কি? সে যাক্‌গে, রায় বাহাদুর, আপনাকে আমি একটা বিলিতী কুকুরের বাচ্চা উপহার দেবার জন্যে এনেছিলাম। কোতনগরের দুই জমিদারে মামলা বেধে উঠেছে। দুই শরিকের কাছ থেকেই বিলিতী কুকুরের বাচ্চা উপহার নিচ্ছি, তারই একটা—

ম্যাজিস্ট্রেট। প'ড়ে মরুক আপনার বিলিতী কুকুরের বাচ্চা। আমি কিছুতেই সেই ছদ্মবেশী ইন্সপেক্টরের কথা ভুলতে পারছি না। প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হচ্ছে, কখন্ বা দরজা খুলে যাবে—আর এসে ঢুকবেন সেই—

(দরজা খুলিয়া গেল আর ঘনরামবাবু ও বলরামবাবু ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রবেশ করিল)

বলরামবাবু। অদ্ভুত সংবাদ!

ঘনরামবাবু। আশ্চর্য্য ঘটনা!

সকলে। ব্যাপার কি? ব্যাপার কি?

ঘনরামবাবু। অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার! আমরা কানাইবাবুর হোটেলে গিয়েছিলাম—

বলরামবাবু। [বাধা দিয়া] ঘনরামবাবু আর আমি হোটেলে গিয়েছিলাম—

ঘনরামবাবু। [বাধা দিয়া] আমাকে বলতে দাও বলরামবাবু। আমি বলব।

বলরামবাবু। না না, আমাকে বলতে দাও, আমাকে বলতে দাও। তুমি ভাষা খুঁজে পাবে না।

ঘনরামবাবু। তুমি বলতে গিয়ে সব মাটি ক'রে ফেলবে। এমন ঘটনা সব তোমার দোষে মাটি হয়ে গেল দেখছি।

বলরামবাবু। দেখ না, আমি কেমন ক'রে বর্ণনা করি। তুমি কেবল একটু চুপ কর তো। আহা, বাধা দিও না আমাকে। আপনারা দয়া ক'রে ঘনরামবাবুকে থামতে বলুন তো।

ম্যাজিস্ট্রেট। যে হয় আপনারা একজন বলুন। বসুন তো, এই নিন চেয়ার। আমাদের নাভিশ্বাস আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

(ঘনরাম ও বলরাম বসিল ; সকলে তাহাদের ঘিরিয়া বসিল)

সকলে। এইবার বলুন, ব্যাপার কি ?

বলরামবাবু। আমি একেবারে গোড়া থেকে শুরু করব। আপনাদের এখান থেকে বেরিয়ে—আপনারা তখন তো চিঠি প'ড়ে কাঁপতে শুরু ক'রে দিয়েছেন—আমি ছুটে চললাম। আমার সব মনে আছে—আমাকে বাধা দিয়ো না ঘনরাম। আমি প্রথমে গেলাম কমলবাবুর বাড়িতে, সেখানে তাঁকে না পেয়ে গেলাম রোহিণীবাবুর বাড়িতে, তাঁকেও পেলাম না। তখন আপনার কাছে গেলাম পোস্টমাস্টারবাবু, গিয়ে আপনাকে খবরটা দিয়ে যেমনই বেরিয়েছি, অমনই দেখা হ'ল ঘনরামের সঙ্গে—

ঘনরাম। [বাধা দিয়া] ঠিক কুন্দনলালের পানের দোকানের সমানে—

বলরাম। [তাহাকে থামাইয়া দিয়া] কুন্দনলালের পানের দোকানের সামনে। আমি তাকে দেখেই বললাম, ঘনরাম, রায় বাহাদুর যে গোপন খবর পেয়েছেন, তা শুনেছ কি ? আপনার বাড়ির চাকর ফণিবাবুর বাড়িতে যেন কি কাজে যাচ্ছিল, তার কাছে ঘনরাম সে খবর শুনতে পেয়েছে—

ঘনরাম। [বাধা দিয়া] ফণিবাবুর বাড়ি যাচ্ছিল তালমিছরি আনতে।

বলরাম। [তাহাকে বাধা দিয়া] তালমিছরি আনতেই বটে। তখন আমরা দুজনে পরেশবাবুর বাড়ির দিকে চললাম।…ঘনরাম, এ রকম

ক'রে বাধা দিলে—আপনারা দয়া ক'রে ওকে একটু থামান না।··· এ তোমার ভারি অন্যায়। পরেশবাবুর বাড়ির দিকে চলেছি, এমন সময়ে ঘনরাম বললে—চল না হে, একবার কানাইবাবুর হোটেলে যাওয়া যাক। সকাল থেকে কিছু খাই নি। ভোরবেলা দেখলাম কানাইবাবু পাঁঠার মাংস কিনে নিয়ে গেলেন। খান দুই ক'রে চপ হ'লে মন্দ কি? আমি বললাম—চল না, মন্দ কি! যেমনই আমরা হোটেলে ঢুকেছি, অমনই দেখলাম একজন যুবক—

ঘনরাম। [বাধা দিয়া] সুপুরুষ, কিন্তু গায়ে ধুতি-পাঞ্জাবি, কোট-প্যাণ্টলুন নয়।

বলরাম। সুপুরুষ, সুদর্শন যুবক গায়ে ধুতি-পাঞ্জাবি, ঘরের মধ্যে এই ভাবে হাঁটছেন। [দেখাইল] মুখে সে কি বুদ্ধির ছাপ! হাবভাব চেহারায় মনে হয়, যেন গভর্মেণ্টের অদৃশ্য ছাপ-মোহর মারা। আর মাথাটা দেখলেই মনে হয়, বুদ্ধিতে ঠাসা। দেখেই আমার কেমন যেন সন্দেহ হ'ল। তখুনি বুঝতে পারলাম লোকটি যে-সে নয়। ঘনরামকে বললাম—ব্যাপারখানা কিছু বুঝতে পারছ? ঘনরাম আগেই সন্দেহ করেছিল। সে কানাইবাবুকে জিজ্ঞেস করলে—লোকটি কে হে? কানাইবাবুর আবার মাস খানেক হ'ল একটি ছেলে হয়েছে। বেশ ছেলেটি। দেখেই বুঝলাম, ছেলেটা বাপের ব্যবসা রেখে চলতে পারবে। ঘনরাম জিজ্ঞেস করলে—লোকটা কে হে? কানাইবাবু বললে—ওই লোকটা?—আচ্ছা, ঘনরাম, এ রকম ক'রে বাধা দিলে···আপনারা ওকে একটু থামতে বলুন না।···তুমি নিজেও বলতে পারবে না, আমাকেও বলতে দেবে না। পারবে না কেন? ফোকলা দাঁতের গর্ত্ত দিয়ে বাতাস বেরিয়ে যায়, বলবে কি ক'রে? কানাইবাবু বললে—ভদ্রলোক একজন অফিসার, কলকাতা থেকে আসছেন, নাম মিঃ আনন্দমোহন রায়, যাচ্ছেন শিলিগুড়ি। লোকটির আচারব্যবহার অদ্ভুত। আজ প্রায় পনরো দিন ধ'রে এখানে আছেন; এক পয়সাও এ পর্য্যন্ত দেন নি, সবই ধারে চালাচ্ছেন। এই না শুনেই আমার মাথায় এক বুদ্ধি এল, আমি বললাম—বটে!

ঘনরাম। না, বলরাম, আমি বলেছিলাম—বটে!

বলরাম। হ্যাঁ, তুমি প্রথম বলেছিলে, তারপরে আমি বলেছিলাম। তখন আমরা দুজনে মিলে ব'লে উঠলাম—বটে! লোকটা যদি শিলিগুড়িই

যাবে, তবে এখানে থাকবার কারণ কি? এই লোকটাই তবে নিশ্চয় সেই অফিসার।

ম্যাজিস্ট্রেট। কে? কোন্ অফিসার?

বলরাম। যে অফিসারের আসবার সংবাদ আপনারা পেয়েছেন, সেই গভর্মেন্ট-ইন্সপেক্টর।

ম্যাজিস্ট্রেট। সর্ব্বনাশ! কি বলছেন আপনারা? এ কথনই হতে পারে না।

ঘনরাম। নিশ্চয়ই এ সেই গভর্মেন্ট-ইন্সপেক্টর। লোকটা টাকাও দেয় না, আবার হোটেল ছেড়ে চ'লেও যায় না! আর তার যাবার কথা শিলিগুড়ি! এ যদি গভর্মেন্ট-ইন্সপেক্টর না হয় তো কি বলেছি!

বলরাম। এ নিশ্চয় সেই লোক! সব দিকে তার দৃষ্টি। ঘনরাম আর আমি চপ খাচ্ছিলাম, আর লোকটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখছিল। যেন চোখ দিয়ে চপ দুখানা সে কেড়ে নেবে। তার চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার মাথা ঘুরে উঠল।

ম্যাজিস্ট্রেট। ভগবান, রক্ষা কর। কত নম্বর ঘরে আছে?

ঘনরাম। পাঁচ নম্বর ঘর; ঠিক সিঁড়ির নীচেই।

বলরাম। এক বছর আগে দুজন অফিসার যে ঘরটায় ঘুষোঘুষি করেছিল, ঠিক সেই ঘরটাতে।

ম্যাজিস্ট্রেট। কতদিন ধ'রে আছে?

ঘনরাম? পনরো দিনের ওপর।

ম্যাজিস্ট্রেট। পনরো দিনের ওপরে? ভগবান, রক্ষা কর। এই পনরো দিনের মধ্যেই যে কসাই-বুড়ীকে বেত মারা হয়েছে; কয়েদীদের রেশন দেওয়া হয় নি। রাস্তাঘাটে একদিনও ঝাড়ু পড়ে নি। আবর্জ্জনা! দুর্গন্ধ! হায় হায়, সব গেল। [মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল]

দাতব্য-কর্ত্তা। রায় বাহাদুর, এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? চলুন, আমরা সবাই মিলে কানাইবাবুর হোটেলে যাই।

জজ। না না, আগে ব্যবসায়ীদের পাঠিয়ে দেওয়া যাক। আগে যাওয়া কিছু নয়, কারণ শাস্ত্রেই আছে—'ন গণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ সিদ্ধে কার্য্যে সমম্ ফলম্।'

ম্যাজিস্ট্রেট। আমাকে কর্ত্তব্য স্থির করতে দিন। এর আগেও আমার এ

রকম বিপদ এসেছে, আবার তা কেটেও গিয়েছে। এবারেও দয়াময় অন্যান্য বারের মত বিপদুদ্ধার ক'রে দেবেন। [বলরামকে] বলরাম-বাবু, লোকটি তো যুবক ?

বলরাম। যুবক বইকি ! খুব বেশি হয় তো তেইশ-চব্বিশ।

ম্যাজিস্ট্রেট। মন্দর ভাল। অল্প বয়সের ছোকরাকে খুশি করা সহজ। বুড়ো শয়তানের মনে যে কি আছে, তা ভগবানও বুঝতে হার মানেন। আপনারা সব যান, নিজের নিজের আফিসগুলো গুছিয়ে নিন গিয়ে। আমি ছোট রায় সাহেবের সঙ্গে [বলরামকে লক্ষ্য করিয়া] শহরটা ঘুরে দেখে আসি, সব ঠিক আছে কি না। চন্দন সিং !

চন্দন সিং। হুজুর !

ম্যাজিস্ট্রেট। পুলিস সাহেবকে আমার সেলাম দাও। না না, তোমাকে দরকার আছে। তুমি কাউকে বল, পুলিস সাহেবকে যেন এখনই একবার আসতে বলে। আর তুমি এখনই আমার সঙ্গে এস।

চন্দন সিংএর দ্রুত প্রস্থান

দাতব্য-কর্ত্তা। জজ সাহেব, চলুন, শিগগির যাওয়া যাক। না জানি কি বিপদ ঘটবে !

জজ। আপনার আবার বিপদ কি ? রুগীগুলোর বিছানাপত্তর একটু ফিটফাট ক'রে রাখবেন, তা হ'লেই চলবে।

দাতব্য-কর্ত্তা। বিছানাপত্তর ! কি যে বলছেন ! সমস্ত বাড়িটায় এমন দুর্গন্ধ যে, নাকে কাপড় না দিয়ে ঢোকা যায় না।

জজ। আমি দিব্যি নিশ্চিন্ত আছি। আজ পনরো বছর এখানে জজিয়তি করছি, এই পনরো বছরে সেরেস্তা এমনই দুরস্ত ক'রে রেখে দিয়েছি—

দাতব্য-কর্ত্তা। যদি কোন নথি দেখতে চায় ?

জজ। দেখতে চাইলেই হ'ল ! খুঁজেই পাবে না। আরও পনরো বছর লাগবে নথি খুঁজে বের করতে। তা স্বয়ং বেদব্যাসের অসাধ্য।

(জজ, দাতব্য-কর্ত্তা, হেডমাষ্টার, পোষ্টমাষ্টারের প্রস্থান ; চন্দন সিংএর প্রবেশ)

ম্যাজিস্ট্রেট। আমার গাড়ি তৈরি ?

চন্দন সিং। হাঁ হুজুর।

ম্যাজিস্ট্রেট। আচ্ছা, চল ; না, দাঁড়াও। আর সকলে কোথায় ? পুরন্দর সিং ? পুরন্দর সিংকে আনতে ব'লে দিলাম।

চন্দন সিং। পুরন্দর সিং পুলিস-ফাঁড়িতে। কিন্তু হুজুর, তাকে দিয়ে কাজ হবে না

ম্যাজিস্ট্রেট। কেন?

চন্দন সিং। হুজুর, সে দারু পিয়ে বেহুঁশ হয়ে প'ড়ে আছে। দু বালতি জল তার মাথায় ঢালা হয়েছে, তবু হুঁশ হয় নি।

ম্যাজিস্ট্রেট। সর্ব্বনাশ! ভগবান, রক্ষা কর। তুমি শিগগির ফাঁড়িতে যাও। না না, আগে ঘরের মধ্যে থেকে আমার নতুন টুপিটা নিয়ে এস। বলরামবাবু, চলুন, যাওয়া যাক।

ঘনরাম। চলুন, আমিও যাচ্ছি, রায় বাহাদুর।

ম্যাজিস্ট্রেট। না না, এত লোক গেলে সবাই সন্দেহ করবে, আর গাড়িতেও জায়গা নেই।

ঘনরাম। কিছু ভাববেন না, জায়গা এক রকম ক'রে হয়ে যাবে। না হয় গাড়ির পেছন পেছন ছুটে যাব। মোট কথা, ওখানে কি রকম কি হয় দেখতেই হবে।

ম্যাজিস্ট্রেট। [চন্দন সিংকে] শিগগির যাও। পাহারাওয়ালারা কোথায়? পাহারাওয়ালারা প্রত্যেকে একখানা ক'রে রাস্তা নিয়ে ঝাঁটাগুলো সব সাফ ক'রে ফেলুক, মানে ঝাঁটা নিয়ে, পথগুলো সব সাফ করতে শুরু ক'রে ফেলুক। বিশেষ ক'রে কানাইবাবুর হোটেলের দিকটা। আর চন্দন সিং, দেখ, তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি। আমার চোখ সব দিকে আছে। যা রয় সয়, তাই নিও। তুমি জমাদার, কিন্তু ঘুষ নেবার বেলায় যেন দারোগা। অতটা ভাল নয়। শিগগির যাও।

(পুলিস সাহেবের প্রবেশ)

ম্যাজিস্ট্রেট। এই যে পুলিস সাহেব, অন্তর্দ্ধান করেছিলেন কোথায়? এদিকে যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

পুলিস সুপার। কি ব্যাপার সাব্?

ম্যাজিস্ট্রেট। কলকাতা থেকে সেই অফিসার এসে পৌঁছেছেন। এদিকের কি ব্যবস্থা করেছেন?

পুলিস সুপার। আপনার হুকুমমাফিক পঞ্চুলাল পাহারাওয়ালাদের নিয়ে পথ ঝাড়ু দিতে গিয়েছে।

ম্যাজিস্ট্রেট। ডুলবাজ খাঁ কোথায়?

পুলিস সুপার। সে গিয়েছে আগুন নেবাবার বালতিগুলো নিয়ে।

ম্যাজিস্ট্রেট। আর পুরন্দর সিং মদ খেয়ে প'ড়ে আছে?

পুলিস সুপার। হ্যাঁ সার্।

ম্যাজিস্ট্রেট। কেন এমন হয়?

পুলিস সুপার। ভগবান জানেন। নতুন পাড়ায় দাঙ্গার খবর পেয়ে তাকে পাঠাই, যখন তাকে ফিরিয়ে আনা হ'ল, একদম বেহুঁশ।

ম্যাজিস্ট্রেট। এক কাজ করুন। পঞ্চুলাল খুব লম্বা-চওড়া আছে, ওকে একটা নতুন পোশাক পরিয়ে চৌমাথার ওপরে দাঁড় করিয়ে দিন। চমৎকার দেখাবে। হ্যাঁ, দেখুন, বাজারের মধ্যেকার ওই পুরনো পাঁচিলটা ভেঙে ফেলে ওখানে গোটা কয়েক ঝাঁটা-বাধা বাঁশ খাড়া ক'রে দিন, মনে হবে, যেন নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে। চারদিকে যত ভাঙাচোরা দেখা যাবে, শহরের অথরিটিদের তত বেশি অ্যাকটিভ মনে হবে। বুঝলেন? কিন্তু সর্ব্বনাশ, ওই পাঁচিলটা ভাঙলেই যে এদিক থেকে আবার আবর্জ্জনার গাদা দেখা যাবে! ও গাদা সরানো তো একদিনের কর্ম্ম নয়। সত্যি, শহরটাতে কি দুর্গন্ধ! আর লোকেরই বা কি অভ্যাস! শহরের মধ্যে কোথাও একটুখানি 'পার্ক' করা হয়েছে কি সবাই সেখানে আবর্জ্জনা ফেলতে আরম্ভ করে। একটা মূর্ত্তি স্থাপন করা হয়েছে কি দেখতে দেখতে তার গলা অবধি আবর্জ্জনায় ডুবে যায়। আমরা সকলে আস্ত থাকতে এত আবর্জ্জনাই বা পায় কোথায়?

আর দেখুন, অফিসার যদি কোন পুলিসকে জিজ্ঞেস করে, সে খুশি কি না? অমনই যেন বলে, খুব খুশি হুজুর। কেউ যদি সত্যিই খুশি না থাকে, তবে পরে তাকে খুশি ক'রে দেব।

(টুপি ভাবিয়া টুপির বাক্সটি তুলিয়া লইল)

এখন ভগবানের ইচ্ছেয় সব ভালয় ভালয় চুকে গেলে হয়। দোহাই মা কালী, জোড়া পাঁঠা দেব। তারপরে বেটা দোকানদারদের কাছ থেকে দশ জোড়া পাঁঠার দাম আদায় ক'রে নেব। একবার অফিসার চ'লে যাক, তারপর দেখা যাবে। চলুন বলরামবাবু।

(টুপির বদলে টুপির বাক্সটি মাথায় পরিবার চেষ্টা)

পুলিস সুপার। ওটা টুপির বাক্স, টুপি নয়।

ম্যাজিস্ট্রেট। [বাক্স ফেলিয়া দিয়া] টুপি নয় তো নয়, গোল্লায় যাক।

দেখুন, অফিসার যদি জিজ্ঞাসা করেন, নতুন হাসপাতাল কেন গড়া হয় নি, পাঁচ বছর আগে টাকা দেওয়া হয়েছে, বলবেন যে, গড়া হয়েছিল, হঠাৎ আগুন লেগে পুড়ে গিয়েছে। আমি সেই রকম রিপোর্ট পাঠিয়েছি। কেউ যেন ব'লে না ফেলে যে, বাড়িটা তৈরিই হয় নি। হ্যাঁ, আর দেখুন, ঢুলবাজ থাঁকে বলবেন [ঘুষি দেখাইয়া] ওটা যেন বেশি না চালায়। যত লোক ফাঁড়ি থেকে বেরোয়, সকলের মুখে কালশিরে। অফিসারের চোখে না পড়লে অবশ্য কোন ক্ষতি নেই। চলুন ঘনরামবাবু। [ফিরিয়া আসিয়া] আর দেখুন, কন্‌স্টেব্‌লরা যেন পোশাক প'রে তবে বেরোয়। কারও খালি পা, কারও পায়ে পট্টি নেই! ভগবান, কি যে তোমার মনে আছে, কে জানে!

সকলের প্রস্থান

(ম্যাজিস্ট্রেট-পত্নী বনমালার প্রবেশ, সঙ্গে তাহার কন্যা কমলা)

বনমালা। কোথায় গেল সব? মাগো, আর তো পারি নে। কেউ নেই এখানে! [কমলার প্রতি] তোমার জন্যেই এই বিপদ হ'ল। যত বলি তাড়াতাড়ি এস, ওরা সব গেল। না, 'মা, ব্রোচটা লাগিয়ে নিই, মুখে একটুখানি পাউডার—'! নাও, এখন সব গেল।

কমলা। আমার কোন দোষ নেই মা। দিদির জন্যেই তো দেরি হ'ল।

বনমালা। একবার দেখব সেই মা-মরা ডাইনি ছুঁড়ীকে। পাউডার, স্নো, পমেটম। যেন তার বর এসেছে। ওই তো দাঁড়কাকের মত চেহারা। [জানালায় উঁকি দিয়া] ওগো, শুনছ? কোথায় চললে তুমি? এসেছে নাকি? গভর্মেন্ট-ইন্সপেক্টর? গোঁফ আছে তো? কত বড় গোঁফ?

ম্যাজিস্ট্রেটের স্বর। শিগগিরই ফিরে আসছি। তোমরা থাক।

বনমালা। শিগগির ফিরে আসছি ব'লে আমাকে ভোলানো চলবে না। বলা নেই, কওয়া নেই, অমনই চলল! গোঁফ আছে কি না ব'লে গেলেও তো হ'ত! এসব তোমার দোষ। মা, এক মিনিট সবুর কর পিনটা গুঁজে নিই!

কমলা। আমি বলতে যাব কেন? দিদি তো বললে।

(রমলার প্রবেশ)

রমলা। এসেছে নাকি?

বনমালা। হ্যাঁ, তোমার বর এসেছে। হয়েছে তোমার পিন-গোঁজা আর

স্নো-মাখা? পোস্টমাস্টারকে দেখলেই তোমার সাজ করবার কথা মনে পড়ে যায়! তোমাকে দেখলে যে সে মুখ ভেঙচায় তা কি চোখে পড়ে! তবু হ'ত যদি কমলা।—আর ওদিকে উনি হটহট ক'রে চলে গেলেন! গোঁফ আছে কি না ব'লে গেলেও কতকটা হ'ত।

কমলা। দু-এক ঘণ্টার মধ্যেই সব জানতে পারা যাবে মা।

বনমালা। চমৎকার! কি বুদ্ধি! দু-এক ঘণ্টা! তবু ভাল যে, বল নি দু-এক মাসের মধ্যে। [জানালায় উঁকি মারিয়া] ঝিটা গেল কোথায়? ওই যে! ও মিছরি, মিছরি, শহরে কেউ এসেছে খবর পেয়েছিস? পাস নি? তা জানবি কি ক'রে? কেবল ছোঁড়াগুলোর পেছনে পেছনে ঘোরা,:কাজের কথা জানবার কি আর সময় আছে? যা না, ওদের পেছনে পেছনে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ছুটে যা। সব জেনে আসতে হবে কিন্তু। দরজার ফাঁক দিয়ে সব শুনবি। কি রকম দেখতে? চোখের রং কটা, না কালো? আর সবচেয়ে লক্ষ্য করিস, গোঁফ আছে কি না। ছোট ছোট, দৌড়ে যা, লক্ষ্মী!

(চীৎকার করিতে লাগিল)*

ক্রমশ

প্র. না. বি.

বলিদান

আমি যেন ভাই হই শেষ-বলিদান,
আমারই রক্তে ব্যথিতা ধরার হউক মুক্তিস্নান।
শৃঙ্খল-বাঁধা পীড়িত মানুষ ক্ষমাহীন দিনে রাতে,
নিরুপায় যারা জাগে ভাই যত অপমান নিয়ে মাথে,
দুঃখ-রাতের বর্ষা-ধারায় যার আঁখিজল মেশে,
আমি নেব ভাই হেসে,
তাহাদের যত চিন্তার বোঝা আমার স্কন্ধে তুলি
সকল দুঃখ, সকল যাতনা ভুলি ;—
আমার আত্মদান,
পীড়িত ব্যথিত মানবাত্মার ক্ষোভের করুক ত্রাণ।

---

* বিখ্যাত রুশ-লেখক Gogol-এর উক্ত নামধেয় নাটকের অনুবাদ।

জেনেছি, জেনেছি, মৃত্যুরে ভয় নাই—
মৃত্যু-তিমিরে জীবনের আলো লুকায়ে রয়েছে ভাই।
তাই তো দিনের শেষে,
অরুণ তপন ডোবে আঁধারের দেশে,
সঞ্চয় করে বিত্ত সেথায় সুদীর্ঘ শর্বরী,
শেষে নবরূপ ধরি—
সোনার কিরণে পূর্ব গগন প্রভাতে দেয় সে ভরি।
একটি জীবন-সমাধি রচিয়া জানি,
বাঁচায়ে রাখিব নানা জীবনের বহু পরাণের বাণী ;—
দুর্য্যোগ যদি ঘিরে ধরে কভু, তুমি থেকো ভাই ধীর,
আমি আছি, দিব বাড়ায়ে আমার অখ্যাতনামা শির।
যদি কেহ মোর তরে
প্রথম প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়া ধরে,
যদি কেউ ভাই মালা গেঁথে রাখে আমার মিলন-আশে,
ভুল ক'রে কেউ যদি মোরে ভালবাসে ;
আমার মরণে নয়ন তাহার যদি ভ'রে ওঠে জলে ;
হৃদয়ের বনতলে,
পাতায় পাতায় বিচ্ছেদ-গান মর্মরি যায় চ'লে ;—
—সে কালো-আঁখিরে ব'লো ভাই শুধু ব'লো,
এ বিদায়ে শুধু আরো মহীয়ান মিলন-সূচনা হ'ল।
সেথায় বাতাস আরো মন্থর শস্যের সৌরভে,
প্রাণ-জয়-গৌরবে,
সেখানে আমি তো একটি হৃদয়ে নই,
শত-হৃদয়ের ছায়ায় ছায়ায় আমি বহু হয়ে রই।
আজি বসন্ত রাত্রে প্রিয়ার চুম্বন যদি বৃথা,
অন্তরে জ্বলে ব্যর্থ-প্রেমের চিতা,—
যদি কাঁদে শুকতারা,
আমার সহসা-বিদায়ে তাহার নামে অশ্রুর ধারা,—
ব'ল তারে ভাই, আমি হই নাই মিছে,
অজানা-দেশের পাখীর কণ্ঠ মোর গানে মুখরিছে ;
রুদ্ধ জীবন-স্রোতের আমি যে খুলে দিয়ে যাই বাঁধ,
আগত-প্রাতের ভৈরবী গাই—আমি রাত-জাগা চাঁদ।

শ্রীঅতীন্দ্র মজুমদার

হিন্দী সাহিত্য

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁরা একটু সন্ধান রাখেন, তাঁরা এ কথা স্বীকার করবেন যে, বর্ত্তমান যুগে হিন্দী ভাষা ও সাহিত্য একমাত্র বাংলা ছাড়া অন্যান্য প্রদেশের ভাষা ও সাহিত্য অপেক্ষা অধিক উন্নত ও প্রগতিশীল। বাংলা-সাহিত্যকে এইজন্যে শ্রেষ্ঠতর আসন দিলাম যে, আমার মতে, এ পর্য্যন্ত হিন্দী-সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মত সাহিত্য-মহারথী অবতীর্ণ হন নি। কিন্তু তাই ব'লে ভবিষ্যতে যে অবতীর্ণ হতে পারেন না, তা বলা যায় না, কারণ সমগ্র ভারতব্যাপী বিশাল ক্ষেত্রে যে কোনদিন তা সম্ভবপর হতে পারে।

হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ ও বিস্তার এত দ্রুত ও এমন আকস্মিক যে, তার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে আধুনিকতম যুগ পর্য্যন্ত এর আলোচনা করা সম্ভব হবে না এবং তা বলাও আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি কেবল হিন্দী সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলব।

হিন্দী সাহিত্যের বর্ত্তমান যুগ আরম্ভ হয়েছে ১৮৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। এই সময় থেকেই গদ্যযুগ আরম্ভ হয়, তাহার আগে পদ্য-রচনারই যুগ ছিল। যদিও রাজা লক্ষ্মণ সিংহের সময় থেকেই হিন্দী গদ্যের ভবিষ্যৎ রূপরেখার একটি আভাস পাওয়া যায়, তবুও ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রকেই বর্ত্তমান গদ্যযুগের প্রবর্ত্তক ব'লে ধরতে হবে। কারণ তাঁর পূর্ব্বে ব্রজভাষার কবিতার যুগই চ'লে আসছিল। ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র এক দিকে যেমন গদ্যের ভাষাকে মার্জ্জিত করতে থাকেন, অপর দিকে তেমনই হিন্দী সাহিত্যকে নতুন পথও দেখিয়ে দেন। তাঁর এই ভাষা-সংস্কারের প্রভাবে হিন্দী সাহিত্যে এক নূতন ধারা প্রবাহিত হয়। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কাশী থেকে জগন্নাথ-পুরীর পথে বাংলা দেশে উপস্থিত হন, সেই সময় বাংলা ভাষায় সামাজিক, ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটক-উপন্যাসাদি দেখে হিন্দী সাহিত্যে তার অভাব অনুভব করেন। এর তিন বছর পরেই তিনি বিদ্যাসুন্দর নাটকের অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই অনুবাদে তিনি হিন্দী ভাষার একটি সুন্দর ও নূতন রূপের আভাস দেন। এই বছরেই তিনি কবিবচনসুধা ও চন্দ্রিকা নামে দুখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং সেই সূত্রে একদল নূতন কবি ও লেখক সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। হিন্দী গদ্যসাহিত্যের এই আরম্ভকালে সেই সময় যে কজন অল্প-সংখ্যক সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়, তাঁরা সকলেই সজীব ও মৌলিক ভাবাপন্ন। হরিশ্চন্দ্রের জীবনকালেই লেখক ও কবিদের একটি প্রবল দল গঠিত হয়ে ওঠে, এবং তাঁরা সকলে মিলে হিন্দী সাহিত্যের এই নতুন অভিযানে যাত্রা করেন।

এর পরই আধুনিক পদ্ধতিতে নাটক-উপন্যাসাদি রচনা আরম্ভ হয়। স্বয়ং ভারতেন্দু কতকগুলি নাটক-নাটিকা রচনা করেন ও লালা শ্রীনিবাস দাস পরীক্ষাগুরু নামক উপন্যাস রচনা করেন। তারপর, বঙ্গবিজেতা, দুর্গেশনন্দিনী, রাজসিংহ, ইন্দিরা প্রভৃতি উপন্যাস হিন্দীতে অনুবাদ হয়ে প্রকাশিত হয়।

এই রকমে ভারতেন্দুর সময় থেকেই হিন্দীর সাহিত্য-নির্ম্মাণকার্য্য চলতে থাকে, কিন্তু তখন প্রচার ও প্রসারে অনেক বাধা ছিল ব'লে তার স্রোত তেমন দ্রুত গতি লাভ করতে পারে নি। আদালতে তখন হিন্দীর কোন স্থান ছিল না এবং সাধারণ কাজেও লোকে হিন্দী লিখতে লজ্জাবোধ করত। ইংরেজী-শিক্ষিত সমাজ নিজের মাতৃভাষার প্রতি তাচ্ছিল্যভাব দেখাতেন এবং যাঁরা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির চেষ্টা করতেন, তাঁদের উপহাস করতেন। তখন বিদ্যালয়ে হিন্দীর নামগন্ধ মাত্রও ছিল না; এমন কি পাঠশালাকে মদরসা বলা হ'ত। কাজেই তখন হিন্দী ভাষা ও সাহিত্য খুব বেশি প্রসার-লাভ করে নি।

এই সমস্ত বাধা-বিঘ্নকে তুচ্ছ ক'রে, হিন্দী সাহিত্যের উন্নতি-সাধনের উদ্দেশ্যে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কাশী নাগরী প্রচারিণী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভা প্রাচীন অজ্ঞাত কবিদের লেখা সংগ্রহ ক'রে, তাঁদের জীবনী সংগ্রহ ক'রে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। হিন্দী-শব্দসাগর নামক সুবৃহৎ অভিধান প্রকাশ করেন। এইরূপ নানা উপায়ে এই সভা হিন্দী ভাষার সেবা ক'রে হিন্দী সাহিত্যকে লোকচক্ষে প্রতিষ্ঠিত করেন।

এর পরে হিন্দী সাহিত্যের উত্থানের দ্বিতীয় পর্য্যায় আরম্ভ হয় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। বাংলার 'প্রবাসী' পত্রিকা তখন এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়। ওই সময় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রেরণায় ইণ্ডিয়ান প্রেসের সত্ত্বাধিকারী চিন্তামণি ঘোষ আচার্য্য পণ্ডিত মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয়ের সম্পাদনায় সরস্বতী নামক হিন্দী মাসিক-পত্রিকা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। এই বাঙালী-পরিচালিত ইণ্ডিয়ান প্রেসের নিকট হিন্দী সাহিত্য চিরকাল ঋণী থাকবে।

এই সময় হিন্দী ব্যাকরণের ব্যতিক্রম ও ভাষার অস্থিরতা নিয়ে অনেক বাদপ্রতিবাদ চলতে থাকে এবং পণ্ডিত মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদীই তার নিষ্পত্তি ক'রে দেন। দ্বিবেদীজী সুরেশচন্দ্র সমাজপতির ন্যায় নানা বইয়ের সমালোচনা ক'রে নানা দোষত্রুটি দেখান। এই সময় থেকেই হিন্দীতে উচ্চ সাহিত্যের সৃষ্টি হতে থাকে। তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্য থেকে পুরাণকথা, কাব্য, সিদ্ধান্ত, নীতি, শিক্ষা বিষয়ক নানা গ্রন্থের সুন্দর ও সহজ রূপান্তর হিন্দীতে করেন। বর্ত্তমান হিন্দী গদ্য-নির্ম্মাণ-কার্য্যে তাঁর চমৎকার হাত ছিল এবং আজও তার প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। এক কথায়, তিনি হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের জন্য এমন কাজ নেই যা করেন নি।

তারপর অনুবাদ-যুগ আরম্ভ হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রায় সমস্ত নাটক, রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলী' 'চোখের বালি', মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' প্রভৃতি বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ নাটক কাব্য উপন্যাস হিন্দীতে অনুবাদিত হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশী বিদেশী নানা ভাষা থেকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হিন্দীতে রূপান্তরিত হতে থাকে। এই রকমে হিন্দী সাহিত্য উন্নতি লাভ করে।

১৯২০--২১ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দী সাহিত্যের অতি-আধুনিক যুগ আরম্ভ হয়। কথাসাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রেমচাঁদের উদয় হয়। তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে লোকচরিত্র, গ্রাম্যচিত্র, সমাজচিত্র এমন ভাবে ফুটে ওঠে যে, পাঠকের মন সহসা জেগে উঠল আর সর্ব্বত্র তাঁর খ্যাতি বিস্তার লাভ করল। এক কথায়, বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র ও প্রভাতকুমারের যে স্থান, তাই তিনি লাভ করলেন। দুঃখের বিষয়, তিনি তাঁর শেষ দান 'গোদান' উপন্যাস পাঠককে উপহার দিয়ে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু হিন্দী সাহিত্যে তিনি অমর হয়ে থাকবেন।

হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের অবস্থা এখন খুবই আশাপ্রদ ও প্রগতিশীল। চারদিক থেকে উৎসাহ দানেরও কোন ত্রুটি নেই। হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন প্রতি বৎসর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থনির্মাণের জন্য বারো শো টাকার মঙ্গলাপ্রসাদ-পুরস্কার দিয়ে আসছেন। ওরছার মহারাজা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের জন্য দু হাজার টাকার পুরস্কার দিচ্ছেন। মহিলা লেখিকাদের জন্য পাঁচ শো টাকার সেকসেরিয়া-পুরস্কারও দেওয়া হচ্ছে। এ রকম পুরস্কারের সংখ্যা প্রতি বৎসরই বাড়ছে। ফলে, প্রতি বৎসর বহু বিষয়ে উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য গ'ড়ে উঠছে। সুতরাং, হিন্দী সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা যেমন আশাপ্রদ ও প্রগতিশীল, ভবিষ্যৎও তেমনই উজ্জ্বল।

সর্ব্বশেষে, যে কথাটি বলার লোভ আমি সামলাতে পারছি না তা এই যে, বাংলা সাহিত্যে বাইরের মধ্যে কেবল বিদেশী সাহিত্যেরই প্রভাব পড়েছে, কিন্তু হিন্দী সাহিত্যে বিদেশী ছাড়াও, বাংলা, গুজরাতী, উর্দ্দু, মারাঠী, তেলেগু প্রভৃতি ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষার সাহিত্য থেকে আবশ্যক ও সারযুক্ত কিছু-না-কিছু নিয়ে আপনাকে স্বাস্থ্যবান ও বলবান ক'রে নিতে সমর্থ হয়েছে। বাংলা সাহিত্য যেন ভাদ্র মাসের ভরা গাঙ, হিমালয় থেকে নেমে সমান বেগে গভীর হয়ে চলেছে, আর, হিন্দী সাহিত্য যেন বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারাকে আপনার দিকে টেনে এনে নিজেকে সমুদ্র করবার স্বপ্ন দেখছে।

শ্রীধন্যকুমার জৈন

মৃত্যু

হে অব্যক্ত, ব্যক্তে তুমি ধরিতে চাহিছ অবিরাম,
চলে ধরাধরি খেলা, মৃত্যু মাত্র তার পরিণাম।

আগেরী

(১২ পৃষ্ঠার পর)

অমূল্য বললে, খবরদার! মরা কাক ছুঁয়ে এলি, কিছু নাড়বি না তুই। বেরো বলছি, বেরো।

ওপারের ময়রার দোকানের কারিকর বললে, জাত গেল তোর। গঙ্গাচান ক'রে আয় গিয়ে।

ভদ্রলোক খদ্দেরটি হেসে বললে, কলে হাত ধুয়ে ফেল্ ভাল ক'রে।

দোকানের সামনেই জলের কল, গুপে সেইখানে কলের হাতলটা টিপে ধ'রে চান করতে ব'সে গেল। স্নান ক'রে ভিজে গায়ে ভিজে কাপড়েই এসে অমূল্যকে বললে, লে। হ'ল তো ইবার?

অমূল্য বললে, এই এই! কাপড় নিংড়ে ফেল্। এই এই!

গুপের সেদিকে গ্রাহ্য নাই, সে বললে, দে, দোকানীদের চা দিয়ে আসি। দেরি হয়ে যেছে।

ভদ্রলোকটি বললে, মুছে ফেল্ রে গা-হাত, অসুখ করবে।

উঁহু! ব'লেই সে অমূল্যকে ধমক দিয়ে বললে, দে না দোকানীদের চা।

অমূল্য একখানা ট্রের উপর চারটে কাপে চা ঢালছিল, দুধ চিনি মিশিয়ে দেবার জন্ত চামচে দিয়ে নেড়ে, ট্রেটা হাতে দিয়ে বললে, তুমি মর বাঁচ তাতে কিছু যায় আসে না, দোকানে যে কাদা হয়ে গেল কাপড়ের জলে।

মুছে দিব। গুপে চায়ের ট্রে হাতে চ'লে গেল ময়রার দোকানে।

ওই ব'য়ে দেওয়ার জন্ত সে দোকানীর কাছে কাক-ভোজনের অচল বাসী খাবারের একটা ভাগ পায়। চায়ের ট্রেটা নামিয়ে দিয়ে গুপে বললে, দাও।

হুঁ, দেব! বেটা শয়তান কোথাকার, নিজে তো ঘিয়ের খাবার খাস না, কাকে দিবি তাই বল্? নইলে দেব না।

সি একজনা আছে—দিব একজনাকে।

কাকে?

দিব। সি একজনা বটে।

অমূল্য হাঁকলে, কাজলামি করিস নি ওখানে। খদ্দের আসছে। গুপে!

বাসী খাবারের ঠোঙা হাতে ক'রে গুপে এক ছুটে এসে দোকানে ঢুকল, এক কোণে রেখে দিলে ঠোঙাটা।

অমূল্য সেই ভদ্রলোকটিকে বলছিল, উ মরবে! আজ্ঞে না। কিছু হবে নি ওর। গেল সালের ঝড়ে ওর মা মরেছে দেওয়াল চাপা। দুর্ভিক্ষে বাপ মরেছে। নিজে—

বাধা দিয়ে ভদ্রলোক বললে, মা বাপ নাই ওর?

উত্তর দিলে গুপে, ভদ্রলোকের পাশের লোকটির সামনে চায়ের কাপ কেকের ডিশ নামিয়ে দিয়ে বার দু-তিন ক্ষিপ্রভাবে ঘাড় নেড়ে দিলে।

কোথায় বাড়ি তোর ?

উচ্ছিষ্ট কাপ-ডিশগুলো গুছিয়ে তুলছিল গুপে, বললে, হুই, সেই মেদিনীপুর জিলা। সেই বহুলিয়া গাঁ আছে।

বহুলিয়া ?

হুঁ। দেবপাল পোষ্টাপিস বটে।

হুঁ। ঝড়ে তোর মা মারা গেছে ?

কাপ-ডিশগুলো নিয়ে ততক্ষণে গুপে জলের ড্রামের নীচে রেখে কল খুলে ধুতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। হাতের কাপের বিরাম দেয় না। কাজ করে আর কথা বলে। এবার কিন্তু তার কাজ বন্ধ হয়ে গেল। সবিস্ময়ে সে ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

কি বলছেন ?

বললে অমূল্য, ঝড়ে তোদের ঘর উড়ে—

উঁহু। ঝড় লয়, হাওয়াতে বটে।

হো-হো ক'রে হেসে উঠল খদ্দেরের দল। গুপে সবিস্ময়ে শুধু একবার তাকিয়ে দেখলে, বুঝবার চেষ্টা করলে, হাসির কারণটা কোথায়। তারপর কাপ-ডিশের গোছা নিয়ে এসে নামিয়ে দিলে অমূল্যর টেবিলের উপর। বললে, হাসিস না ফ্যাকফ্যাক ক'রে। কাজ কর্। ব'লেই সে ন্যাতা নিয়ে ভিজে মেঝেটা মুছে ফেলে, হাত ধুয়ে ফেলে, বইতে আরম্ভ করলে চা-ভর্ত্তি কাপগুলো, যেগুলো ইতিমধ্যে অমূল্য তৈরি ক'রে ফেলেছিল।

ভদ্রলোকটির বোধ হয় কৌতূহল হয়েছিল, এবং ভদ্রলোক হয় বেকার, নয় পয়সা আছে, সে আবার টেনে নিলে নতুন এক কাপ চা। খপ ক'রে গুপের হাতখানা ধ'রে বললে, হাওয়াতে তোদের ঘর উড়ে গেল, তোর মা চাপা পড়ল, তুই বাঁচলি কি ক'রে ?

অত্যন্ত সহজভাবে গুপে বললে, কেনে, হাওয়াতে চালটো উড়ে গেল, উঠানে একটো গাছ ছিল, সিটাতে ঠেকা খাঁয়ে পড়ল মাটিতে, আমি ছুটে গিয়ে ঢুকলম সিটার ভিতরে, আমার পাছু পাছু বাবা এল, মা আসবার মুখে ঘরের ভাল ভেঙে পড়ল।

হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে সে এঁটো কাপ গুছতে আরম্ভ করলে। অমূল্য বললে, জল আন্। গুপে!

গুপে ছুটল বালতি নিয়ে। কলের নীচে বালতি পেতে কল টিপে ধ'রে তাকিয়ে দেখছিল সামনের পানের দোকানের আয়নাটার দিকে। হাসছিল আপনার মনে। মধ্যে মধ্যে খালি হাতখানা বুলোচ্ছিল আপনার মুখে কতকগুলা বসন্তের ক্ষতচিহ্নের উপর।

জলের বালতিটা নামিয়ে নিয়েই সে আবার এসে দাঁড়াল আয়নার সামনে। পকেট থেকে একটা ভাঙা চিরুনি বার ক'রে অত্যন্ত দ্রুত টেরি কেটে নিলে।

অমূল্য হাঁকছে ভিতর থেকে, গুপে! এই গুপে!

হুঁ, যাচ্ছি।

গেলি কোথায়?

যাচ্ছি।

তোমার পেটে লাথি মারব আমি। দত্তশীলের দোকানে চা দিতে হবে না?

গুপে ছুটে আসতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ল ফুটপাথের উপর, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই উঠে গিয়ে দাঁড়াল অমূল্যর কাছে।

দত্তশীলের দোকান কয়েকখানা দোকানের পরেই। গুপে বেরুচ্ছিল সেখান থেকে। সেই ভদ্রলোক তাকে বললে, দাঁড়া।

উঁহু, কাজ আছে। অমূল্য শালা বকবে।

তোর বাবা দুর্ভিক্ষে ম'রে গেছে?

উঁহু। আকালে মরেছে বাবা। চাল ছিল নি, কিছুই খেতে ছিল নি। যা পেত বাবা আমাকে খাওয়াত, নিজে খেত নি। তাথেই ম'রে গেল।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে গেল। একটু অবিশ্বাসও হ'ল। ছেলেটা কথাগুলো বলছে যেন উপকথা বলছে; "আমার কথাটি ফুরুলো নটে গাছটি মুড়লো।"

গুপেই বললে, একদিন রাখালকাকার বাড়ি গিয়েছিলম খাবার তরে। অ্যানেকক্ষণ পরে খেতে দিলে। ফিরে এসে দেখলম, বাবা ম'রে প'ড়ে আছে। রা কাড়ে না, কাঠের পারা শক্ত হয়ে গিয়েছে।

তারপর?

তারপরে? তারপরে চ'লে এলম কলকাতাকে।

কার সঙ্গে এলি?

কত লোক এল। তাদের সঙ্গে এলম। আঠারো কোশ হাঁটলম। পা দুটো এই ফুলে গেল। জর হ'ল, গুটি বেরুলো। সেই একটো গাঁয়ে প'ড়ে থাকলম। তারপর আবার হাঁটলম। শেষে রেলগাড়িতে চড়লম। চ'লে এলম কলকাতা।

ছুটে চ'লে যাচ্ছিল গুপে। ভদ্রলোক ডাকলে, শোন্, শোন্। এই নে দু আনা পয়সা নে।

গুপীনাথ মহা খুশি। পয়সা ট্যাঁকে গুঁজতে গুঁজতে বললে, কি বলছেন বলেন?

কে আছে দেশে তোর?

একটু ভেবে গুপে বললে, ভাঙা ঘরটো আছে, দুটো গাছ আছে উঠানে, তিন বিঘা জমি আছে।

আপনার লোক কে আছে?

সি রাখালকাকা আছে। তা সি কাকা বটে, আপনার লোক নয়।

গুপে! গুপে! ওরে শূয়ার! সয়তান কোথাকার! গুপে কিন্তু চঞ্চল হ'ল না, হেসে বললে, অমূল্যা হাঁকাডছে, আমি যাই।

ভদ্রলোকটি চেয়ে দেখলে, অমূল্য দোকান থেকে বেরিয়ে এসে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁকছে। গুপী যেতেই সে তার মাথায় বসিয়ে দিলে একটা চাঁটি। গুপে চীৎকার ক'রে উঠল, মারিস না, হাতের কাপ-ডিশ প'ড়ে যাবে, ভেঙে যাবে।

চায়ের দোকান সরগরম হয়ে উঠেছে গল্প-গুজবে—খবরের কাগজ, যুদ্ধ, ইংল্যাণ্ড, অ্যামেরিকা, রাশিয়া, জার্মানি, জাপান, মহাত্মা গান্ধী, স্বাধীনতা, হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লীগ, বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলী, দুর্ভিক্ষ মড়ক।

গুপে কাজ ক'রে যায়। কাজ করার ক্ষমতা ওর অদ্ভুত। যে কাজগুলো বাকি পড়েছিল, সেগুলো ক্ষিপ্র হাতে নিপুণতার সঙ্গে অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে সেরে ফেললে। ওদিকে মড়ক থেকে বোমা এসেছে আসরে। একজন উত্তেজিত হয়ে বললে, এর চেয়ে বোমায় মৃত্যু ভাল। একবারে একমুহূর্তে মরে মানুষ।

গুপী এগিয়ে এসে লম্বা টেবিলের ধারে দাঁড়ায়, ঘাড় নাড়ে, না—না—না।

সকলে অবাক হয়ে যায়। ছোঁড়াটা বলে কি? গুপে বলে, আমি দেখেছি আজ্ঞা। উ রে বাবা রে!

দেখেছিস?

গুপীর চোখ বড় হয়ে উঠে, সে আকাশের দিকে চায়, বলে, সেই দিনে, খিদিরপুরে, দুই জাহাজ-ঘাটায়, উঃ বাবা রে! ছেত্তরে গেল মানুষগুলান, এমন কুটিকুটি ক'রে মাছ কুটে না মানুষ। কি আওয়াজ! উ রে বাবা রে! আগুন, ধুঁয়া, বাবা রে!

তুই ছিলি সেখানে?

হাঁ, দেশ থেকে এসে হোথা গিয়েছলম। কাজ করতম। বারো আনা পেতম দিন। বাবা রে! মড়ার গাদি লেগে গেল! নরিতে ক'রে নিয়ে গেল। বাবা রে পালিয়ে এলম। ছুটু ছুটু দুই সাদা ঝকঝকে, পাখীর মতন ঝাঁক বেঁধে এল, বাবা রে!

লোকে অবাক হয়ে যায়। অমূল্য বলে, তুই মরলি না কেন?

গুপী হাসতে আরম্ভ করে। বলে, ভেঁপু বাজতেই আমি পালায়েছিলম। খালের ভিতরে লুকালম, হেঁই গুটিসুটি মেরে চুপ ক'রে পড়েছিলম। তারপরে, আমি যেন হেথা আর উই—উইখানে পড়ল বোমা। বাস্, দাঁতি লেগে গেল আমার। তা বাদে উঠলম যখন, তখন এই মড়া ওই মড়া—হাত পা, কুটিকুটি, রক্ত, আগুন, ধুঁয়া।

সমস্ত ঘরখানা স্তব্ধ হয়ে যায়। গুপী বলে, চৌপর দিন আমি কেঁদেছিলম, খেতে লেরেছিলম তিন দিন, ঘুমুতে নারতম। গুপী এর পর উদাস হয়ে যায়। চুপ ক'রে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে।

জলদি এক কাপ চা। ঘরে ঢুকল একজন শিখ বাস-কণ্ডাক্টার।

চমক ভাঙল অমূল্যর। সে উনান থেকে তুলে নিলে গরম জলের কেৎলি। শিখটি ব'লে উঠল, আরে গোপীয়া! তুম হিঁয়া আ গেয়া?

গুপী তার মুখের দিকে চেয়ে হাসলে, বললে, পাঁইজী! রাম-রাম রাম-রাম পাঁইজী! হিঁয়া কাম করতা হামি আজকাল।

বাসমে আওর কাম করবি না? শিখ বলল।

অমূল্য অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, বাসেও কাজ করেছিস নাকি?

গোপী হাসে। তাড়াতাড়ি সম্ভ্রম ক'রে চায়ের কাপ নিয়ে শিখের সামনে নামিয়ে দিয়ে অমূল্যকে বলে, হাঁ। শ্যামবাজার, কালিঘাট, মৌলালী, গোলতালাও, এসপ্ল্যানেড, আলিপুর, খিদিরপুর—তিন নম্বর—তিন নম্বর।

ভাগলি কেঁও রে তু? অ্যাঁ?

জ্বর হ'ল যি! তুমরা যি বললে, হাসপাতালে যা! পথের ধারে আমি শুয়েছিলম, আমাকে নিয়ে গেল লরিতে তুলে, কাঙালীদের হাসপাতালে।

কাঙালীদের হাসপাতালে! ডেষ্টিচুটদের মেডিকেল রিলিফ সেণ্টারে!

গুপী কথার সবটা বুঝতে পারে না। নিজের কথাই সে বুঝিয়ে বলে, যে পুলিসে লরিতে ক'রে ধ'রে নিয়ে যেছে। সেই কাঙালীদের হাসপাতালে! সেই সেথাকে।

হুঁ, হুঁ। তাতেও মর নাই তুমি? কথাটা শুনে সকলে মুচকে হাসে।

গুপী গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে বলে, না। চার দিন বাদে সেথা থেকে পালায়ে এলম। সনঝের সময়ে, চুপিচুপি। হঠাৎ সে থেমে যায়। কাজে মনোযোগী হয়ে উঠে।

শিখটি উঠে যাবার সময় গুপীকে ডেকে একটা আনি দিয়ে যায়। শিখের বদান্যতার ছোঁয়াচে আর দুজনে দেয় দুটো ডবল পয়সা। একজনে দিলে একটা সিকি।

দুপুরবেলা। চৈত্রের সূর্য্য প্রখর হয়ে উঠেছে। রাস্তার পিচ নরম হয়েছে, ভারী মোটরের চাকার টায়ারের দাগ বসছে। মধ্যে মধ্যে দমকা গরম হাওয়ায় কালো ধুলো উড়ছে। তার উপর ক্রুড অয়েলের ধোঁয়ায় দুপুরের রোদ কালচে হয়ে যাচ্ছে। পথ জনবিরল। বড় রাস্তায় বাস ট্রাম একটু দেরিতে দেরিতে চলছে। শুধু মিলিটারি লরির বিরাম নাই।

চায়ের দোকানের সামনে বিড়িওয়ালা পরম কৌতুকে হাসছে। মিষ্টির দোকানের কারিকর খুব বাহবা দিচ্ছে। কয়েকটা ভিখারী ছেলে ব্যগ্র কৌতূহলে অবাক হয়ে চেয়ে

দেখছে। অমূল্য এবং গুপীতে যুদ্ধ বেধেছে। অমূল্যর দাবি, গুপী যা বকশিশ পেয়েছে তার ভাগ নেবে। গুপী দেবে না। এ ঝগড়ার সূত্র অনেক দিন থেকেই হয়ে আসছে। কিন্তু এতদিন গুপীর পাওনা লোভনীয় হয়ে উঠে নাই। চার পয়সা, দু-আনা বড় জোর দশটা পয়সার বেশি সে পেত না। আজ কিন্তু তার পাওনা আট আনা ছাড়িয়ে গিয়েছে। অমূল্য বলে, দোকানে আমরা দুজনেই কাজ করি। যা বকশিশ হবে, তার ভাগ দিতে হবে। দোকানে কাজ করিস ব'লেই দিয়েছে। দোকানের খদ্দেরে দিয়েছে।

গুপী কিন্তু দেবে না। সে বলে, তু যি পনের টাকা মাইনা পাস, আমি যি মোটে পাঁচটি টাকা পাছি। তুর মাইনার ভাগ আমাকে দে। তবে দিব। দোকানের খদ্দেরে তুকে দিলে না কেনে? আমাকে দিলে কেনে?

কথা-কাটাকাটি থেকে মারামারি। গুপী বেরিয়ে পালিয়ে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু অমূল্য দরজা আগলে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে উনানে বাতাস দেওয়া পাখাখানা। গুপী ধরেছে উনান-খোঁচানো লোহার শিকটা। কিন্তু অসুবিধে হয়েছে, শিকটাও ছোট, তার হাতখানাও ছোট।

লম্বা হাতে অপেক্ষাকৃত লম্বা পাখার ডাঁটটা দিয়ে অমূল্য পটাপট মার চালাচ্ছে। গুপী সরছে, কখনও গুঁড়ি হচ্ছে। কখনও চেষ্টা করছে শিকটা দিয়ে অমূল্যর হাতে আঘাত করতে। যুদ্ধ চলছে নিঃশব্দে।

ওপারের মিষ্টির দোকানের কারিকর মহা উৎসাহে বাহবা দিচ্ছে। তার ভুঁড়িটা নাচছে। বহুৎ আচ্ছা, কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ ভাই!

অমূল্য এগিয়ে এসে পড়েছে। এইবার ধরবে। আর উপায় নাই। কারিকর হেঁকে উঠল, ধর্ বেটাকে, ধর্। হি-হি-হি-হি!

গুপে কিন্তু অদ্ভুত। ধাঁ ক'রে সে ব'সে প'ড়ে ঢুকে গেল মালিকের বসবার চেয়ারটার তলায়। মাথাটা আটকাল কাঠের বসবার জায়গায়, চারিপাশে চারটে পায়া তার চারিদিকে রক্ষাবেষ্টনী হয়ে গেল। অমূল্যর আঘাতগুলো কাঠের পায়ায় ব্যাহত হয়ে যেতে লাগল। গুপী হি-হি ক'রে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ারের মাথা দিয়ে গুঁতো দিতে দিতে এগুতে আরম্ভ করলে।

রাস্তায় হাসির হল্লা উঠে গেল—কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ রে ভাই!

গুপী ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এল অমূল্যকে। না পিছিয়ে অমূল্যর উপায় ছিল না। সংকীর্ণ ঘর, তারই মধ্যে আবার লম্বা বেঞ্চ এবং চেয়ারে ঘরখানাকে সংকীর্ণতর ক'রে তুলেছে। আশেপাশে সরবার জো নাই।

ফুটপাথে এসেই চেয়ার মাথায় দিয়েই ছুটল গুপী; কিছুদূর গিয়ে ব'সে পড়ল। চেয়ারের তলা থেকে বেরিয়েই বললে, নিয়ে যা তোর চেয়ার। সে ছুটে গিয়ে দাঁড়াল

মিষ্টির দোকানের ধারে। দোকানের উনানে দেবার জন্তে কয়েকখানা ইট থাকে, তাই একটা তুলে নিয়ে বললে, আয় ইবার। আয়।

সে একবার কোমরে হাত দিয়ে দেখে নিলে গামছায় বাঁধা বাসী কচুরি-মিষ্টির গুঁড়োগুলো ঠিক বাঁধা আছে কি না, তারপর বড় রাস্তাটার এপাশ ওপাশ চকিতে দেখে নিয়ে রাস্তা পার হয়ে ছুটল। ব'লে গেল, করব নি আর কাজ। আর আসব নি আমি।

* * *

রাত্রি দশটা।

চায়ের দোকান বন্ধ হয়েছে। মিষ্টির দোকান বন্ধ হচ্ছে। বিড়িওয়ালার কাঠের কুলঙ্গি তালা বন্ধ। অমূল্য আর বিড়িওয়ালা চলেছে সিগারেট টানতে টানতে। গঙ্গামুখে চ'লে গেছে যে রাস্তাটা সেই রাস্তায় চলেছিল তারা। সমস্ত দিনের পর তারা চলেছে বিকৃত আনন্দের সন্ধানে। ব্ল্যাক আউটের পথ অন্ধকার।

অমূল্য হঠাৎ বললে, এই! দাঁড়া!

কি?

গুপে। ওই দেখ্। অন্ধকারের মধ্যে কালো শিলুয়েট ছবির মত ছোট একটা ছেলে কলের মুখ থেকে একটা কলসীতে জল ভ'রে নিচ্ছে। রাত্রি দশটায় জল আসে কলে। বিড়িওয়ালাও চিনলে, হ্যাঁ, গোপীই বটে।

চল্, দেখি ও কোথা যায়।

রাস্তা পার হয়ে একটা খোলা জায়গা। কর্পোরেশনের জিনিসপত্র থাকে। এখন স্লিটট্রেঞ্চ আর পাকা খিলেন শেল্টারে ভর্ত্তি। গোপী চলেছে।

এই গুপে! চমকে উঠল গোপী। কে? অমূল্য?

বিড়িওয়ালা বললে, কি করছিস ইখানে?

অমূল্য বললে, এইবার কি হয়?

গোপী বললে, দাঁড়া, দাঁড়া। অমূল্য ভাই, দাঁড়া। সে ঢুকে গেল একটা খিলেন করা শেল্টারের মধ্যে। পিছন পিছন ঢুকল অমূল্য আর বিড়িওয়ালা। ছোট একটা কেরোসিনের ডিবে জ্বলছে। স্বল্প আলোর মধ্যে তারা দেখলে, গোপী কলসী থেকে জল নিয়ে কাকে দিচ্ছে, কিছু করছে। তারা এগিয়ে গেল।

বিড়িওয়ালা থমকে দাঁড়িয়ে গেল, পিছনে হাত দিয়ে অমূল্যর অগ্রগতি রোধ করলে। অবাক হয়ে গেল তারা। আশ্চর্য্য সুন্দর সতরো-আঠারো বছরের একটি মেয়ে! পরনের কাপড় রক্তাক্ত, কোলের কাছে রক্তমাখা একটি সদ্যজাত শিশু। মেয়েটি নিস্তেজ হয়ে প'ড়ে আছে। গোপী তার মুখে জল দিচ্ছে।

গোপী বললে, অমূল্য, কি করব?

ও কে?

উ বুবি বটে। খোকা হইছে বুবির। কি করব ?

বুবি? বুবি কে?

হুঁ। বুবি, বুবি বটে উ।

কে রে তোর ?

কে আবার হবে! আমি সেই কাঙালীদের হাসপাতালে ছিলম, সেথা ছিল বুবি। কালা বটে, শুনতে পায় না, কথা বলতে লারে। উয়াকে লিয়ে হাসপাতালের নোকে যা তা বুলত। উ কাঁদথ। তাথেই উয়াকে লিয়ে সাঁঝবেলাতে পালায়ে এলম। এই-ঠেনে উকে নিয়ে থাকি।

ওরা দুজনে পরস্পরের মুখের দিকে চায় বিচিত্র দৃষ্টিতে।

গোপী ব'লে যায়, বুবি বড় ভাল রে, ভারী ভাল। ভারী মায়া লাগে। তাথেই তুকে পয়সার ভাগ দিই না। উর লেগেই আনি আমি কচুরি মিষ্টি কেক। বুঝলি? বুবিকে লিয়ে খোকাকে লিয়ে ঘরকে যাব। ঘর করব। তিন বিঘা জমি আছে। চাষ করব। বড় হব। বিয়া করব। সে থামলে। তারপর প্রশ্ন করলে, আমি এখুন কি করব অমূল্যা ?

হঠাৎ ওর দৃষ্টি পড়ল ওদের দুজনের মুখের উপর। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে সে চট ক'রে চ'লে গেল শেল্টারের মধ্যে। অমূল্য বিড়িওয়ালা দুজনে এবার ফিসফিস ক'রে কথা বলে। হঠাৎ চমকে উঠে গোপীর রূঢ় কণ্ঠস্বরে।

খুন ক'রে ফেলাব।

চকিত হয়ে দুজনে চেয়ে দেখে, দৃঢ় দৃপ্ত ভঙ্গীতে গোপী দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে একটা লম্বা শক্ত লাঠি। গোপী বললে, লাঠির মাথায় খোঁচা লাগানো আছে, বিঁধে ফেলাব যদি এগুবি তো, হাঁ।

অন্ধকারের মধ্যে ভয়াল মনে হচ্ছে গোপীকে। ওরা দুজনে কয়েক পা পিছু হ'টে এল।

গোপী হেসে বললে, তুদের মত অনেক দেখলম আমি। পালা। পালা।

বিড়িওয়ালা অমূল্যকে বললে, আয়। কাল দেখব। আজ সব নোংরা হয়ে আছে। আয়।

* * *

পরের দিন সন্ধ্যের পর নয়, দুপুরবেলাতেই অমূল্য এল। সে আর দেরি সইতে পারলে না। কোমরে একটা ছুরি নিয়ে এসেছে সে। কিন্তু শেল্টার শূন্য। কেউ নেই। গুপে তার বুবিকে নিয়ে খোকাকে নিয়ে অন্যত্র চ'লে গেছে।

অমূল্য কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপরই তার মনে পড়ল, আজ সংক্রান্তি, কাল নতুন খাতা। মালিককে হিসেব-নিকেশ বুঝিয়ে দিতে হবে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদ-সাহিত্য

সাহিত্যিকদের কর্তব্য সম্বন্ধে খুব গভীরভাবে চিন্তা করিতেছিলাম। লোটাস-ইটার্স অথবা মিউজিক-মেকার্স বলিয়া নিজেদের স্বতন্ত্র করিয়া পরিত্রাণ পাইবার উপায় অন্তত বর্তমান যুগে আর নাই। দেহতত্ত্ব কিংবা ভাটিয়ালি গান লিখিয়া জনসাধারণের মন ভুলাইবার শক্তি আমরা হারাইয়াছি, মহুয়া-মলুয়ার প্রেমের কাহিনীতেও আর সাধারণ মানুষের তৃপ্তি নাই। মুটে-মজুর-কামার-ছুতারের কবি বলিয়া নিজেদের উচ্চকণ্ঠে জাহির করিয়া তবে আসর জমাইতে হইতেছে, শ্রেণীসংগ্রামের ঠেলায় পড়িয়া কবি-গাল্লিকেরা গলদ্ঘর্ম হইতেছেন, কলের বাঁশি শ্যামের পুরাতন আড়-বাঁশিটিকে ভাঙিয়া টুকরা টুকরা করিয়া আমাদের মনের সুখ হরণ করিয়াছে। মোটের উপর, আমরা মহা মুশকিলেই পড়িয়াছি। সাহিত্য ও সাহিত্যিকের ইতিহাস পূর্বাপর অনুধাবন করিয়া দেখিতেছি, প্রত্যেক কবির জীবনেই এই চিরদুঃস্থ মানুষের কল্যাণ করিবার, তাহাদের সুখদুঃখের কথা লিখিবার, নিদ্রিতকে জাগাইবার, পরাধীনকে শৃঙ্খলমুক্ত করিবার সদিচ্ছা একবার না একবার জাগিয়া থাকে; তারপর, হয় তাঁহারা কর্মী বনিয়া কর্মের সাগরে গা ভাসাইয়া কাব্যের নিশ্চিন্ত তটভূমির আশ্রয় ছাড়িয়া যান, নয় পুনরায় মনকে কাব্যের আফিমে বুঁদ করিয়া দিয়া স্বপ্নের ঘোরে পদ্মের পাপড়ি চিবাইতে থাকেন। মহাকালের দরবারে শেষ পর্যন্ত কিন্তু তাঁহারাই টিঁকিয়া যান। যাঁহারা সময়ের বা কালের মহিমা স্মরণ করিয়া সেই খণ্ডকালকেই জয়যুক্ত করিবার চেষ্টা করেন, বৃহত্তর কালের ঢেউ আসিয়া তাঁহাদের চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দেয়, খণ্ডকালের মত তাঁহাদের সাময়িক হৃদয়-বেদনাও হারাইয়া যায়! কাল এবং কালাতীতের দ্বন্দ্বের এই ট্র্যাজেডি সাহিত্যিকদের জীবনেই ঘটিয়া থাকে। শিল্পীমনের ঐকান্তিক নির্লিপ্ততা ও নির্মমতা যাঁহাদিগকে ক্ষুদ্রকালে সমসাময়িকদের নিন্দা-প্রশংসার ঊর্ধ্বে লইয়া যাইতে পারে তাঁহারা ভাগ্যবান, তাঁহারা বিরাট, কিন্তু যাঁহারা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং দুর্ভাগ্য তাঁহাদিগকে বারংবার কাল এবং কালাতীতের মধ্যে দোল খাইতে খাইতে হয়রান হইয়া যাইতে হয় এবং অধিকাংশই হারিয়া বিলুপ্ত হইয়া যান। রবীন্দ্রনাথের মত বৃহত্তমের মনেও যখন সংশয় জাগিয়া থাকে, তাঁহাকে বলিতে হয়—

> বুঝিব কি, কেন এসেছিনু ভবে,
> কেন জ্বলিলাম প্রাণে?
> কেন নিয়ে এলে তব মায়ারথে
> তোমার বিজন নূতন এ পথে,
> কেন রাখিলে না সবার জগতে
> জনতার মাঝখানে?

বলিতে হয়—

> এবার ফিরাও মোরে, ল'য়ে যাও সংসারের তীরে
> হে কল্পনে, রঙ্গময়ি! দুলায়ো না সমীরে সমীরে
> তরঙ্গে তরঙ্গে আর! ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়!

তখন অন্যে পরে কা কথা! কিন্তু তাঁহার জীবনে ইহা ক্ষণিক সংশয় মাত্র। তিনি শেষ পর্যন্ত—

> কে আছে কোথায়, কে আসে কে যায়,
> নিমেষে প্রকাশে, নিমেষে মিলায়,
> বালুকার 'পরে কালের বেলায়
> ছায়া আলোকের খেলা।
> জগতের যত রাজা মহারাজ
> কাল ছিল যারা কোথা তারা আজ,
> সকালে ফুটিছে সুখদুখলাজ,
> টুটিছে সন্ধ্যাবেলা।
>
> শুধু তার মাঝে ধ্বনিতেছে সুর
> বিপুল বৃহৎ গভীর মধুর,
> চিরদিন তাহে আছে ভরপুর,
> মগন গগনতল।
> যে জন শুনেছে সে অনাদিধ্বনি
> ভাসায়ে দিয়েছে হৃদয়তরণী,
> জানে না আপনা জানে না ধরণী
> সংসারকোলাহল।

—সেই অনাদিধ্বনির অনুসরণে সংসার-কোলাহলের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন বলিয়া কালকেও অতিক্রম করেন—যদিও বর্তমানকালের শ্রেণী ও সমাজ সচেতন সমালোচক তাহা স্বীকার করেন না, অতীতের অন্ধকার গর্ভেই তাঁহাকে জোর করিয়া কবর দিয়া বর্তমান কালকে কালাতীতের উপরে জয়যুক্ত করেন। কিন্তু সকলেই রবীন্দ্রনাথ নন। সমসাময়িককালের ঢক্কানিনাদে বিভ্রান্ত সাহিত্যিকের সংখ্যাই বেশি। তাঁহারা কি করিবেন? তাঁহাদের কর্তব্য কি?

• • •

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্টারি সংস্কারের স্বপক্ষে ম্যাঞ্চেষ্টারের পিটারলু ফিল্ডস-এ যে সভা হয়, অশ্বারোহী সৈন্যদলের আক্রমণে তাহা ভাঙিয়া দেওয়া হয়। এই সংঘর্ষে ছয়জনের মৃত্যু ঘটে, বহু আহত হয়। ইংলণ্ডের কবি শেলী তখন ইটালী-প্রবাসে ছিলেন। সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছিলে মিসেস শেলীর ভাষায়, "it roused in him, violent emotions of indignation and compassion." বহু যদি দৃঢ়চিত্ত হয় এবং তাহাদের চিত্ত যদি এক সুরে বাঁধা হয়, তাহা হইলে তাহারা প্রভুত শক্তিশালী অস্ত্রকে বশে আনিতে পারে, পরবর্তী কয়েকদিনের ঘটনায় এই মহাসত্য অন্তরে অনুভব করিয়া কবি তাঁহার লাঞ্ছিত দেশবাসীকে প্রতিরোধ বা সত্যাগ্রহ শিখাইতে মনস্থ করেন। সাময়িক উত্তেজনা-প্রসূত এই অনুভূতির ফলে কবির "দি মাস্ক অব অ্যানার্কি" নামক চিরন্তন কবিতাটি জন্মলাভ করে। শেলী এই কবিতায় যে পদ্ধতির কথা বলেন, তাহা আসলে অহিংস অসহযোগ। কবিতাটি এই—

Stand ye calm and resolute,
Like a forest, close and mute,
With folded arms and looks that are
Weapons of unvanquished war....

And if then the tyrants dare,
Let them ride among you there,
Slash and stab, and maim and hew—
What they like, that let them do.

With folded arms and steady eyes,
And little fear, and less surprise,
Look upon them as they slay
Till their rage has passed away,

Then they will return with shame
To the place from which they came
And the blood thus shed will speak
In hot blushes on their cheek....

And that slaughter to the Nation
Shall steam up like inspiration,
Eloquent, oracular,
A volcano heard afar.

Rise like Lions after slumber
In unvanquishable number—
Shake your chains to earth like dew
Which in sleep had fallen on you—
Ye are many—they are few.

তোমরা দাঁড়াও শান্ত ও দৃঢ় মনে
অরণ্যসম নিবিড়, বাক্যহীন,
বুকে বাঁধি বাহু, স্থির দিঠি আঁখিকোণে—
অজেয় জনের অস্ত্র যা চিরদিন।

অত্যাচারীরা পারে যদি, তারা পরে
তোমাদের মাঝে ছুটাইয়া দেয় ঘোড়া,
অসি-কষাঘাতে হত বা পঙ্গু করে—
যা খুশি ওদের, যা পারে করুক ওরা।

বদ্ধ বাহুতে, অপলক দুটি চোখে
থাকিবে না ভয়, জাগিবে না বিস্ময়,
দেখ—যারা রয় নরহত্যার ঝোঁকে,
যাবৎ তাদের ক্রোধ না শান্ত হয়।

লজ্জা মানিয়া সেথা ওরা ফিরে যাবে
যেথা হতে হেথা এসেছিল এককালে,
আজিকার এই নিঠুর রক্তস্রাবে
লজ্জার আভা ফুটিবে ওদের গালে।

জেনো নিশ্চয় এই হত্যার ফলে
এ মহাজাতির হবে নবজাগরণ,
মুখর হইবে মূকেরাই দলে দলে
অগ্নিগিরির শোনা যাবে গরজন

ঘুম ভেঙে জেগে ওঠ সিংহের মত
কাতারে কাতারে জেগে ওঠ শত শত—
ঘুমের মাঝারে শিকলের ঝন্‌ঝনা
বেড়িয়াছে দেহ, যেন শিশিরের কণা
ঝেড়ে ফেলে দাও, ধর মুক্তির ব্রত;
তোমরা যে বহু—ওরা শুধু কয়জনা।

ক্ষুদ্রকে দেখিয়া কবি তাঁহার মানসলোকে যে বৃহৎকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, ঠিক শতবর্ষ পরে আমাদের কালে সেই বৃহতের মহনীয় রূপ আমরা আমাদেরই এই দেশে চক্ষুগোচর করিলাম; কিন্তু আমাদের লেখনীতে তেমন কাব্য জাগিল কই? নিশ্চিত মৃত্যুর মাঝে নিরস্ত্র মানুষের নিঃশঙ্ক ও নির্ভীক অভিযান, আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে অবারিতবক্ষ মানুষের জয়যাত্রার বিপুল মহিমা আমাদের রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করিল না বলিয়াই কি আমরা সকলেই বিমুখ হইলাম? এই দুর্যোগের দিনে ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে তেত্রিশকোটি

মানুষকে শঙ্কাহীন করিবার জন্য ক্ষীণপ্রাণ খর্বকায় একটি মানুষের কণ্ঠে যে মাভৈঃ বাণী উচ্চারিত হইল, সমসাময়িক কবির কাব্যে তাহা চিরন্তন মহিমা লাভ করিল কই? দীর্ঘ শতাব্দীপাদ ধরিয়া সমস্ত ভারতবর্ষের বুকে অহিংস অসহযোগের যে শান্ত-ভীষণ মধুর-ভয়াল প্রকাশ আমরা দেখিলাম, আমাদের শিল্পস্রষ্টা ও কবিরা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দেশবাসীর কাছে তাহার কোনও উল্লেখযোগ্য পরিচয় রাখিয়া গেলেন কি?

* * *

রাম নামধেয় ব্যক্তিটি বাস্তবজগতে কখনও বর্তমান ছিলেন কি না, অথবা থাকিলেও তাঁহার যথার্থ জীবন-ইতিহাস কি ছিল আজ আমাদের তাহা জানিবার আবশ্যক নাই, কবি বাল্মীকি যে রামকে ভাবীকালের দরবারে উপহার দিয়া গিয়াছেন তিনিই সমস্ত ভারতবর্ষের কাছে আজ চিত্ত ও নয়নাভিরাম হইয়া আছেন। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হয়তো আসলে একটা পারিবারিক দাঙ্গা মাত্র ছিল, কিন্তু মহাভারতের কবি সমগ্র ভারতের পটভূমিকায় এই যুদ্ধকে স্থাপন করিয়া এই উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের ধর্মকর্মের আশা-আকাঙ্ক্ষার নীতি-আদর্শের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, সারা পৃথিবীতে তাহা আজিও বিস্ময়ের সৃষ্টি করিতেছে। অর্থাৎ সমসাময়িক ঘটনা বা জীবনকে কেন্দ্র করিয়া কবিরা চিরন্তন কাব্যের সৃষ্টি করিতে পারেন, যদি তাঁহাদের মনের তন্ত্রীতে আঘাত লাগে, যদি তাঁহাদের শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়, যদি তাঁহাদের শিল্পকর্মের সঙ্গে ধর্মবুদ্ধি সংযুক্ত হয়। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষ বৎসর হইতে আজ পর্যন্ত আমাদের আশেপাশে এবং আমাদের জীবনে মহাকাব্যের বিষয়ের অপ্রতুলতা ঘটে নাই, কিন্তু আমাদের কবিপ্রাণ নানা পীড়নে, আঘাতে এবং ভাববিপর্যয়ে মুহ্যমান ছিল বলিয়া আমরা প্রত্যক্ষ বর্তমানকে অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ করিয়া তুলিতে পারিলাম না। বীর এবং কবির, রাম এবং বাল্মীকির যথাযথ সংযোগ ঘটিল না।

* * *

কবি গোটে তাঁহার *Faust* কাব্যে আদর্শ মানব বা Ideal Man হিসাবে ফাউস্টকে খাড়া করিয়াছেন। পার্থিব ক্ষমতা ও গৌরবের, জাগতিক সৌন্দর্য ও আনন্দোপভোগের চরম করিয়া কালের দুর্নিবার গতিমুখে ছুটিতে ছুটিতে ফাউস্টের মনে সহসা বৈরাগ্যোদয় হইল। সে অনুভব করিল, সব মিথ্যা, সব ঝুট্ হ্যায়। নিরুৎসাহ হইবার পাত্র সে নয়। শেষ পর্যন্ত বিকাররহিত আনন্দের কথা অবিরত ধ্যান করিতে করিতে একটা সন্ধান তাহার মিলিল—দৈবাদিষ্ট একটা পরিকল্পনা।

Let that high joy be mine for evermore
To shut the lordly ocean from the shore.
The watery waste to limit and to bar
And to push it back upon itself afar!
From step to step I settled how to fight it:
Such is my wish.

কারণ,

The Deed is everything, the Glory naught,

কি তাহার আয়োজন ?

Collect a crowd of men with vigour
Spur by indulgence, praise or rigour.

তাহার কাম্য কি ?

To many millions let me furnish soil
Though not secure, yet free to active toil ;…
And such a throng I fain would see,
Stand on free soil among a people free.

শতাধিক বর্ষ পরে কবি গ্যেটের মানসিক পরিকল্পনাকেই আমরা মূর্ত হইতে দেখিলাম আমাদেরই এই নির্যাতিত নিপীড়িত জাতির মধ্যে। মহিমান্বিত সাগরকে যিনি তট হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন, কর্মকেই যিনি প্রাধান্য দিলেন, যশকে নয়, জনতাকে যিনি আকৃষ্ট করিলেন এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে স্বাধীন মৃত্তিকার আশ্রয় দিবার জন্য বারংবার প্রাণ পর্যন্ত পণ করিলেন। এদেশের কবি-সাহিত্যিকেরা আদর্শের বাস্তব রূপান্তর দেখিয়াও লেখনীমুখে বৃহৎ কিছু সৃষ্টির সুযোগ গ্রহণ করিলেন না।

* * *

ভাবিতে ভাবিতে প্রায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম, হঠাৎ গোপালদার সশব্দ অভ্যাগমে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলাম। গোপালদা হাসিতে হাসিতে প্রশ্ন করিলেন, এবারকার সমস্যাটা কি ভায়া ? গোলআলুর গোলামি, না নবান্নের স্বাবা ?

গোপালদার হাসিটা সাময়িকভাবে বিশ্রী লাগিল, তবু শান্তকণ্ঠে জবাব দিলাম, বর্তমান অবস্থায় সাহিত্যিকদের কর্তব্য কি, সে কথাই ভাবছিলাম।

গোপালদা চিন্তা মাত্র না করিয়া বলিলেন, আত্মরক্ষা, যেন তেন প্রকারেণ। বিজ্ঞাপন লিখে হোক, গান লিখে হোক, সিনেমা-সংলাপ লিখে হোক, জনযুদ্ধের প্রশস্তি গেয়েই হোক বাঁচতে হবে তাদের, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। সত্য ও আদর্শ নিষ্ঠা দেখাবার সময় ঢের পাওয়া যাবে, মহাকাব্যের ক্ষণ কিছু পালিয়ে যাচ্ছে না, তার আগে মহামৃত্যুটা তো রোধ করতে হবে।

বলিলাম, সেই মহামৃত্যুর কথাই তো আমি ভাবছি। দশদিন উঞ্ছবৃত্তি ক'রে আত্মার বিনিময়ে কোনও রকমে দেহ ধারণ করলে তো সেই মহামৃত্যুকে রোধ করা যাবে না। সাহিত্যিক বাঁচবে তার সাহিত্যের মধ্যে। কোন্ আদর্শে—

গোপালদা বাধা দিয়া বলিলেন, আত্মা আদর্শ প্রভৃতি ওসব বড় বড় কথা ব'লো না ভায়া। আমাদের জন্যে ভগবান সহজ সরল পথ নির্দেশ. ক'রে দিয়েছেন। যুগধর্ম পালন কর, বাস্, সব ঠিক হয়ে যাবে।

কি আপনার ভগবানের নির্দিষ্ট সেই যুগধর্ম ?

গোপালদা হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেলেন। আসনপিঁড়ি হইয়া পূর্বেই বসিয়াছিলেন

মন মন দুলিতে লাগিলেন, তাঁহার চোখে সহসা সেই দূরপ্রসারী মোহময় দৃষ্টি ঘনীভূত হইতে লাগিল, আমিও মোহাবিষ্ট ও বিহ্বল হইয়া পড়িতে লাগিলাম। গোপালদা বলিলেন, রঘুর দশম সর্গের দ্বাবিংশ শ্লোক মনে আছে তোমার ?—

চতুর্বর্গফলং জ্ঞানং কালাবস্থাশ্চতুর্যুগা।
চতুর্বর্ণময়ো লোকস্ত্বত্তঃ সর্বংচতুর্মুখাৎ।

অর্থাৎ, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গপ্রদ জ্ঞান, সত্য-ত্রেতাদি চতুর্যুগ-পরিমিত কাল এবং ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণময় এই সকল লোক চতুর্মুখ স্বরূপ আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। যুগভেদে এই চতুর্বর্গের এক একটি বর্গ স্বয়ং ভগবান নির্দেশ ক'রে দিয়েছেন। ধর্মনিষ্ঠদের যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে, অর্থনিষ্ঠদের কাল শেষ হয়ে এল ব'লে, এখন কামনিষ্ঠরা মাথা চাড়া দিচ্ছেন। ইংলণ্ড আমেরিকা ভারতবর্ষ প্রভৃতি সকল দেশেই অর্থনিষ্ঠগণ তাই শঙ্কিত হয়ে নানা সংঘবদ্ধ এবং কৌশলময় উপায়ে বিপুল অর্থের সহায়তায় আত্মরক্ষা করবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। কামনিষ্ঠদের কাল সমাগত।

বিহ্বলভাবে বলিয়া উঠিলাম, কামনিষ্ঠ ?

হ্যাঁ, কামনিষ্ঠ, এ আমাদেরই শাস্ত্রের কথা। স্বদেশী বস্তুকেই তোমরা বিদেশের ধার করা জিনিস ভেবে আনন্দ পেতে অভ্যস্ত। সেই আনন্দই পাচ্ছ। অর্থনিষ্ঠরা চঞ্চল হ'লেও স্বভাবদোষে হাত-পা গুটিয়ে ব'সে আছে, কর্মনিষ্ঠ কামনিষ্ঠেরা কাম চালিয়ে যাচ্ছেন। কাজের লোক তাঁরা। এযুগে তাঁদের কাম জয়যুক্ত হবেই। যদি বাঁচতে চাও, সাহিত্যিক হিসেবেই হোক আর মানুষ হিসেবেই হোক, যুগধর্ম পালন কর, কামনিষ্ঠ হও।

দমিয়া গেলাম। গোপালদাকে আর ঘাঁটাইতে সাহস হইল না। তবু ছোট্ট একটি প্রশ্ন ছাড়িলাম, তা হ'লে মোক্ষ ?

গোপালদা দ্বিধাহীন তৎপরতার সহিত জবাব দিলেন, কামের রাজত্ব সমাপ্ত হ'লেই মোক্ষ তো সুনিশ্চিত। তবে মোক্ষনিষ্ঠদের দিন আসতে দেরি আছে। তৃতীয় বর্গের কথাই এখন কায়মনে চিন্তা কর ভায়া, মোক্ষ পাবেই। আজ তবে আসি।

গোপালদার চতুর্বর্গ শুনিয়া সাহিত্যিকদের কর্তব্যচিন্তা আমার মগে উঠিয়াছিল। গোপালদা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে আর বাধা দিলাম না। একটু একলা থাকার প্রয়োজন অনুভব করিলাম।

—

কবি বুদ্ধদেব বসু তাঁহার 'দময়ন্তী' কাব্যের প্রথম কবিতায় "হে কন্যা আমার" বলিয়া কন্যাকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ পর্যন্ত পড়া থাকিলেই তিনি তাহা বুঝিতে পারিবেন, তবে "বদ্বীপ" বুঝিতে কিছু ভূগোল-জ্ঞান আবশ্যক বটে। কবি বলিতেছেন—

শোন্ তোরে বলি :
যে-ত্রিবলী
তোর জন্ম-সিংহদ্বারে প্রহরীপ্রতিম
আজো তা লাবণ্যময়, করুণ, মধুর।
যে মুহূর্তে বাসনাবিহ্বল নীবি
খ'সে পড়ে, দেখা দেয় কালের প্রলয়-জলে
সর্বস্ব তিমির তলে অলজ্জ বদ্বীপ,
অমনি থমকে কাল।

কথাটা কন্যাকে বলিবার মত বটে! না থমকিয়া কালের উত্তত হইয়া উঠাই উচিত ছিল।

—

অতি-আধুনিক কবিদের যে জুয়াচুরির কথাটা আমরা বরাবরই প্রচার করিয়া আসিতেছি, দেখিতেছি তাহা একান্ত বাঙালী কবিদের নিজস্ব নয়। এই জুয়াচুরির বান পৃথিবীর সর্বত্র ডাকিতেছে। 'কবিতা'-সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুর কাব্যবুদ্ধি পরীক্ষা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত অমিতাভ সেন একবার কয়েকটি আজগুবি শব্দ ও বাক্যের সমষ্টিকে কবিতা হিসাবে তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। কবিতাগুলি পাঠে সম্পাদক মহাশয় ভাবগদ্গদ হইয়া কয়েকটিকে অচিরাৎ পত্রস্থ করিয়াছিলেন। এ সংবাদ আমাদের পাঠকেরা জানেন। অষ্ট্রেলিয়ায় সংঘটিত অনুরূপ একটি ঘটনা সংবাদপত্র হইতে নিম্নে প্রদত্ত হইল। বাংলা দেশের আধুনিক কবিকুল ইহাতে পুলকিত হইবেন।

ANGRY PENGUINS

Australians were chuckling last week over a literary hoax as fantastic as a duck-billed platypus. Editor Max Harris, of Adelaide's long-haired little review, *Angry Penguins*, had introduced the work of a new poet named Ern Malley with a 30-page rhapsody explaining, with deadly and Dadaistic earnestness, why Malley was "one of the two giants of contemporary Australian poetry."

Then Australian Army Lieut. James MacAuley (who fought in New Guinea) and Corporal Harold Stewart revealed that they were "Ern Malley." Forced to kill an afternoon's leave, they created Poet Malley by leafing through *The Oxford Dictionary of Quotations* and other inspirational works, and lifting whatever hit their fancy. Samples of Malley masterpieces :

There have been interpolations, false syndromes
Like a rivet through the hand
*Such deliberate suppressions of crisis as Footscray.**
There is a moment when the pelvis
Explodes like a grenade . . .
I have spit the infinitive,
Beyond is anything.

Hoaxers MacAuley and Stewart confessed that they culled the first three lines of *Culture as Exhibit* from a U. S. report on mosquito breeding grounds :

Swamps, marshes, barrowpits and other
Areas of stagnant water serve
As breeding grounds.

But Lieut, MacAuley and Corporal Stewart were out to kill more than an afternoon, As Ern Malley they wrote : "For some years we

have observed with distaste the gradual decay of meaning and craftsmanship in poetry. Harris and other *Angry Penguins* writers represent the Australian outcrop of a literary fashion prominent in England and America, a distinctive feature of which seemed to us to render its devotees insensible of its absurdity. . . . ."

Buzzed Surrealist Editor Harris : "If fifty million monkeys with fifty million typewriters tapped for fifty million years, one of them would produce a Shakespeare sonnet. I hope MacAuley and Stewart have not produced such a phenomenon. It is not their claims of exposure but time [that] tells the story. Time will explain that a myth is sometimes greater than its creators."—*Time*, July 17, 1944.

টীকা নিষ্প্রয়োজন।

—

সব মেয়েই যে সমান ভ্রমণ-বিশারদ প্রবোধ সান্যাল তাঁহার একটি উপন্যাসে এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন—

"মেয়েরা একাকার হ'লে সকলের দামই সমান—সকলে একই পদার্থ। ...

ওই দেখো নৃত্যশিল্পী মলিনা যেন মিশে গেছে তিনকড়ি দাসীর সঙ্গে—ওটা বস্তির মেয়ে। আর ওই যে বসে রয়েছে রূপোর ঝুমকো দুলিয়ে, ও মেয়েটি হোলো ডক্টর মিসেস বনলতা মিত্রের বোনঝি—পারুল বোস। সম্প্রতি উনি হাত বদলে বেড়াচ্ছেন। তার পাশে নূরনগরের ছোট তরফের বউ—মেয়েটি বছর দুই আগে প্রেমোন্মাদিনী হয়ে এসে জানবাজারে ফ্লাট ভাড়া নেয়। ওর বাঁদিকে—ওই যে গেলাস ধ'রে আছে—ও-মেয়েটি কে জানো? রায় বাহাদুর অঘোর চৌধুরীর নাৎনী—নতুন এসে ঢুকেছে সিনেমায়—চেয়ে দেখো, কারো সঙ্গে কারো পার্থক্য নেই—একই সাজসজ্জার পারিপাট্য, একই দেহভঙ্গিমা, একই ফ্যাসনের পুতুল,—এবং দেখতেই পাচ্ছ, ইতরভদ্রের উদ্দেশ্যটাও একই।"...

"নতুন কয়েকজন এসে আসরে বসলো, এবং এই ফাঁকে আরও জুড়ি দুই তিন স্ত্রী-পুরুষ গেলাসগুলো হাতে নিয়েই তাদের বিশ্রামকক্ষের দিকে গা ঢাকা দিল। তাদের এই পলায়নের কারণ কারো কাছে, এমন কি সুধাংশুর কাছেও অস্পষ্ট রইল না।"

ইহা কি প্রবোধবাবুর দ্বিতীয় মহাপ্রস্থানের পথের রচনা? সঙ্গে কি আত্মীয়া-বান্ধবী কেহই ছিলেন না?

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শনিবারের চিঠি
১৭শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৫১

বাংলার নবযুগ : পরিশিষ্ট—রবীন্দ্রনাথ

১

বাংলার নবযুগের যে পরিচয় দিয়াছি তাহাতে বুঝা যাইবে যে, ওই যুগ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই একরূপ সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। যাঁহারা তাহার ধারাকে এ কাল পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া আজিকার এই প্লাবনকেও সেই এক গতিবেগের পরিণাম বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের ধারণাও এক অর্থে সত্য হইতে পারে, কারণ, কালের স্রোত অবিচ্ছেদেই বহিয়া থাকে, বর্ত্তমানের সহিত অতীতের সম্পর্ক থাকেই। কিন্তু সেই সাধারণ কালধর্ম্মকে স্বীকার করিলেও, কালের এক একটা অংশ এমন বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পায় যে, স্বতন্ত্র যুগ-বিভাগও আবশ্যক হইয়া পড়ে। বাংলার আধুনিক ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দী তেমনই একটা বিশিষ্ট যুগ, সে যুগে সমাজ, ধর্ম্ম ও চরিত্রনীতির সমস্যাই এমন আকার ধারণ করিয়াছিল যে, সেই সমস্যাই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সে ছিল একটা আধ্যাত্মিক সঙ্কটের যুগ—সেই সঙ্কটে জাতির আত্মচেতনা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল—শ্রেষ্ঠ প্রতিভারও বিকাশ হইয়াছিল। অতঃপর সে সমস্যাই যেন লোপ পাইল, বাঙালীর সকল বুদ্ধি—হৃদয়বৃত্তি ও চিন্তাশক্তি একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইল; সে এক নিষ্ফল সাধনায় সিদ্ধিলাভের আশায় মাতিয়া উঠিল। সে যেন একটা আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাত;! তার পর হইতেই তাহার জীবনের মূল পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়াছে। কেন এমন হইল, এই ঘটনার মূলে কোন্ জটিলতর কারণজাল প্রচ্ছন্ন ছিল তাহার বিচার এ যুগের ঐতিহাসিক করিবেন, এখানে সে প্রয়োজন নাই। বাংলার নবযুগ বলিতে আমি কালের যে ধারাকে একটি সুস্পষ্ট গতি ও পরিণতির আকারে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি তাহার প্রধান প্রেরণা ও প্রবৃত্তি ছিল—বিধর্ম্মের সহিত স্বধর্ম্মের, মানবতার সহিত জাতীয়তার সমন্বয়-সাধন। বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে যে বিরোধ, বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম সেই বিরোধ-মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছিলেন; বিবেকানন্দও সেই বিরোধকে একটা বৃহত্তর সমস্যার অঙ্গীভূত করিয়া তাহার সমাধান-পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। বাস্তবের দুর্লঙ্ঘ্য শাসনকে স্বীকার করিয়া তাহার উপরে জয়ী হইবার যে প্রয়াস, সেই সংগ্রামকে জীবন-ধর্ম্মরূপে বরণ করাই ছিল উভয়ের আদর্শ, এজন্য চিত্তশুদ্ধি ও পৌরুষের সাধনাকেই তাঁহারা আর সকলের উপরে স্থান দিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই চেষ্টার ফল কিছু ফলিতেও আরম্ভ করিয়াছিল; কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সংক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই সব যেন ওলট-পালট হইয়া গেল, সেই সাধনা অতিশয় বিষময় হইয়া উঠিল। বঙ্কিমচন্দ্র যে জাতীয়তাধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন এবং বিবেকানন্দ

তাহাতে যে আধ্যাত্মিক শক্তি-মন্ত্র যুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার ক্ষেত্র ছিল সমাজ; বঙ্কিমচন্দ্রের 'চিত্তশুদ্ধি' এবং বিবেকানন্দের 'পৌরুষ' এই দুইয়েরই সাধনা সমাজ-জীবনে হইতে পারিবে এবং তাহাই আবশ্যক, ইহাই তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন; তাহার কারণ, উভয়েই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন যে, জাতির এই অধঃপতিত অবস্থায় প্রথমেই বাহিরের সহিত বিরোধ নয়, শক্তিলাভ করিবার পূর্ব্বেই শত্রুজয়ের অভিযান নয়,—ভিতরে আত্মস্থ হওয়া—মানুষ হওয়াই মুখ্য, আর সকলই গৌণ। দুইটি কারণে তাহা জয়়া ঘটিয়া উঠিল না, প্রথমটি—বাঙালীর জাতিগত ব্যাধি, তাহার চরিত্রের দুর্ব্বলতা; দ্বিতীয়—নবযুগের সেই বাণীমন্ত্রের বিশুদ্ধি রক্ষা, এবং সেই পথে দৃঢ়ভাবে চালিত করিবার মত শক্তিমান নায়কের অভাব।

প্রথমটির কথাই আগে বলিব। চরিত্রই মানুষের জীবনের নিয়ামক বা নিয়তি, জাতিরও তাহাই। বাঙালী জাতির চারিত্রিক দৃঢ়তা অপেক্ষা ভাবাবেগ-বিহ্বলতাই অধিক; তাহার মেরুদণ্ড বড়ই দুর্ব্বল—মস্তিষ্কের ভাবগ্রাহিতা যেমন ক্ষিপ্র, হৃদয়ও তেমনই সদ্য-স্ফীতিপ্রবণ; তাই দীর্ঘকাল একাসনে কোন মন্ত্রের সাধনা তাহার পক্ষে বড়ই দুষ্কর। যাহার চরিত্র দুর্ব্বল তাহার আত্মপ্রত্যয় দ্বিধাযুক্ত হয়, অতএব এমন জাতি অবস্থার দাস হইতে বাধ্য। এইরূপ চরিত্রের কারণে বাঙালীর ইতিহাসও বিচিত্র বটে; ধর্ম্ম ও ভাব-সাধনার ক্ষেত্রে সে অতিশয় মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে—বিশেষ করিয়া, বৈষয়িক জগতে, সে কোন বড় কীর্ত্তির অধিকারী হয় নাই; নিজ বাস-পল্লীর ক্ষুদ্র সমাজ-জীবনে কর্ম্মকে গণ্ডিবদ্ধ করিয়া, ধর্ম্মকে ব্যক্তিগত সাধনার সহায় করিয়া, এবং ভোগ-সুখকে যতদূর সম্ভব পরিমিত করিয়া, সে পারিবারিক জীবনকেই সুন্দর ও সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছে।

তথাপি গত শতাব্দীতে এই জাতিই তাহার সেই দুর্ব্বল চরিত্রে একটা প্রবল ধাক্কা পাইয়া যেন নূতন জীবনে জাগিয়া উঠিতেছিল। তাহার কারণ, তাহার সেই মেধা ও প্রতিভার বলে সে জগতের যুগান্তর-সমস্যাকে সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টিগোচর করিয়াছিল, এবং প্রাচীন ও আধুনিক ভাব-চিন্তার সংঘর্ষে আত্মরক্ষার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিল। সেই প্রথম তাহার নিজের প্রতি নিজের দৃষ্টি পড়িয়াছিল; সেই দৃষ্টির ফলে, সে আর একবার—সেই ষোড়শ শতাব্দীতে যেমন—আত্ম-সংশোধনে ও আত্মরক্ষণে যত্নবান হইয়াছিল। এবার শুধুই বর্জ্জন নয়—গ্রহণও আবশ্যক; প্রাণপণে কেবল আত্মরক্ষাই নয়—পরকেও জয় করিতে হইবে, তাই কেবল শাস্ত্রশাসন নয়—চরিত্র-গঠনই হইল মুখ্য; কারণ, পথ্যাপথ্য-বিচার নয়—সর্ব্বপথ্য হজম করিবার শক্তিই তাহাকে অর্জ্জন করিতে হইবে। এই চিন্তা, এই ভাব, এই সংকল্প যখন তাহার জীবনে একটু মূলবদ্ধ হইতেছে ঠিক সেই সময়ে বিপরীত দিক হইতে প্রবল ঝড় বহিতে শুরু করিল—ভাব-প্রবণ বাঙালী

আর স্থির থাকিতে পারিল না, সেই ঝড়ের মুখে আত্মসমর্পণ করিল। কিন্তু এই ঝড়কে বশীভূত করিবার জন্য যে বুদ্ধি ও যে শক্তির প্রয়োজন তাহা গণবুদ্ধি ও গণশক্তি—সে শিক্ষা ও সে সংস্কারই ভিন্ন, আধ্যাত্মিক বা চারিত্রিক আদর্শই তাহার পক্ষে যথেষ্ট নয়; তাই নবযুগের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার পূর্ব্বেই, সহসা সাধনার এই ক্ষেত্র-পরিবর্ত্তনে একটা আদর্শ-বিপর্য্যয় ঘটিল; বাঙালী আবার ভাসিয়া গেল; তারপর এখনও পর্য্যন্ত সে পায়ের নীচে মাটির সন্ধান পায় নাই। যে শক্তি-সাধনা সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ থাকা উচিত ছিল তাহা এইরূপ সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ও সুদুর্গম কর্ম্মমার্গে প্রবর্ত্তিত হইল; পূর্ণশক্তি লাভ করিবার পূর্ব্বেই, সেই স্বল্পসঞ্চিত শক্তির উন্মাদনায় বাঙালী যুবক, আত্মজয় নয়—আত্মনাশের আতশবাজিতে রাত্রির অন্ধকার দূর করিতে চাহিল। বাঙালীর চরিত্রগুণে বঙ্কিম-বিবেকানন্দের বাণী সংহতিসাধক না হইয়া বিস্ফোরক হইয়া উঠিল। ইহাতেই বাংলার নবযুগের অবসান হইয়াছে। বাংলার যুব-জীবনে যে আগুন জ্বলিয়াছিল তাহার কারণ, খাঁটি স্বাজাত্যচেতনার পরিবর্ত্তে, বিলাতী nationalism তাহাকে রিপুর মত গ্রাস করিয়াছিল; সমাজ-জীবনে ও ব্যক্তি-জীবনে আত্মস্থ হইবার—স্বজাতিকে চিনিবার ও তাহার সহিত সর্ব্বপ্রকার আত্মীয়তা-বন্ধন দৃঢ় করিবার পূর্ব্বেই, সে একটা সেন্টিমেণ্ট মাত্র সম্বল করিয়া পলিটিক্সের পথে দেশোদ্ধার করিতে অধীর হইয়াছিল। এই আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিয়া ক্রমে সে আদর্শভ্রষ্ট ও ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রাণশক্তি হ্রাস পাইয়াছে, এবং নৈরাশ্য এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, পরধর্ম্ম (অ-বাঙালী বা অ-ভারতীয়) আশ্রয় করিতেও তাহার বাধে না। এখন ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে নেতৃত্ব করা দূরে থাক—নিজ সমাজে নেতৃত্ব করিবার জন্য সে পরের শরণাপন্ন হয়।

অতএব, বাহিরের দিক দিয়া বাঙালীর এই দুরবস্থার কারণ যেমনই হউক, বা যতই জটিল হউক, তাহার চরিত্রই যে তাহার শত্রু, তাহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। এই চরিত্রই গত যুগের সেই নবজাগরণের ফলে নূতন ছাঁচে পুনর্গঠিত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, তাহার বিস্তারিত আলোচনা পূর্ব্বে করিয়াছি; তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, পাশ্চাত্যশিক্ষা ও যুগপ্রভাবের সহিত বাঙালীর জাতিগত সংস্কৃতি ও প্রতিভার মিলনে, জীবনের এক নূতন আদর্শ—এক অভিনব মানব-ধর্ম্ম—বাঙালীর সুপ্তিভঙ্গ করিয়াছিল, সে সাড়া তাহার আত্মায় জাগিয়াছিল, নতুবা জ্ঞানে, কর্ম্মে, কল্পনায় ও ভাবুকতায় এমন প্রতিভার বিকাশ হইত না। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, বাঙালী সেই নবযুগকে এত সহজে বরণ করিতে পারিয়াছিল তাহার কারণ, জগৎ ও জীবনের প্রতি তাহার মনোভাব ভারতীয় প্রকৃতি হইতে একটু স্বতন্ত্র, তাহার আধ্যাত্মিক সংস্কারও সন্ন্যাসের বিরোধী, —বৈষ্ণবই হউক, আর শাক্তই হউক, সে ভোগবাদী, রূপরসরসিক—তান্ত্রিক। তাই

জীবনকে আরও শক্ত করিয়া ধরিবার জন্য—পাশ্চাত্যের প্রকৃতিবাদকেও যেমন, ভারতীয় অধ্যাত্মবাদকেও তেমনই, তাহার সেই স্বভাব-ধর্ম্মের বা স্বধর্ম্মের দ্বারা শোধন করিয়া, সে এক নূতন শক্তিমন্ত্রের আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত, তাহার চরিত্রে যে বস্তুর বিশেষ অভাব—সেই পৌরুষ ও কর্ম্মবীর্য্য, ত্যাগ ও নিষ্ঠার সাধনা প্রধান পুরুষার্থ হইয়া দাঁড়াইল। ইহাই সে যুগের শেষ শিক্ষা, এই মন্ত্রে দীক্ষালাভই যে সেই যুগ-সমস্যার শেষ সমাধান তাহা আমরা দেখিয়াছি। ইহার পর যাহা ঘটিয়াছে তাহাও জানি; এই জীবনবাদ, ও শক্তিসাধনার এই আদর্শ যে অতঃপর ভাসিয়া গেল কি কারণে, তাহা বলিয়াছি। বাঙালীর দুর্ব্বল ধাতুতে ওই শক্তিমন্ত্র সহ্য হইল না। কিন্তু ইহার পর তাহার সেই প্রাক্তন সংস্কার—ব্যক্তি ও সমাজের সেই পুরাতন বন্ধনও আর টিঁকিল না। সে যে আর টিঁকিবে না—একটা ভূকম্প যে আসন্ন, সেই আশঙ্কা করিয়াই, গতযুগের শেষভাগে, জাতিহিসাবে বাঁচিবার জন্য এত চেষ্টা হইয়াছিল, সেই চেষ্টাই উপস্থিত ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, সেই ভাবধারাও রুদ্ধ হইয়াছে।

২

তথাপি ওই যুগের শেষভাগে, বিবেকানন্দের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, আর এক মহা-প্রতিভার উদয় হইয়াছিল; পরবর্ত্তীকালে এই প্রতিভা বাঙালীর ভাব-জীবনে সমধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে,—আমি বঙ্গভারতী ও ভারত-ভারতীর বরপুত্র রবীন্দ্রনাথের কথা বলিতেছি। রবীন্দ্রনাথের উদয় ও অভ্যুদয়ের কাল উনবিংশ শতাব্দীর কিয়দংশ অধিকার করিলেও, তাঁহার প্রকৃত উদয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই হইয়াছিল, এবং তাঁহার সাধনার বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব ওই শতাব্দীর বয়োবৃদ্ধির সহিত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেই সাধনাও ক্রমে যে মুখে অগ্রসর হইয়াছে তাহা এতই স্বতন্ত্র, এমন কি বিপরীত যে, তাহাকে নবযুগের সেই ধারার সহিত যুক্ত করিলে, সেই যুগ ও রবীন্দ্রনাথ, উভয়কে বুঝিবার পক্ষে বাধা হইবারই সম্ভাবনা। এজন্য, আমি যাহাকে বাংলার নবযুগের সাধনা বলিয়াছি, তাহা হইতে রবীন্দ্রনাথের সাধনাকে পৃথক রাখাই কর্ত্তব্য মনে করি। তৎসত্ত্বেও, রবীন্দ্র-প্রতিভার এইরূপ বিকাশের মূলে বাংলার উনবিংশ শতাব্দীরই একটা গভীর ও প্রচ্ছন্ন প্রেরণা সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান আছে—প্রধান ধারার বহির্ভূত হইলেও, তাহা সে যুগের সহিত একেবারে নিঃসম্পর্কিত নয়। অতএব আমার এই আলোচনার পরিশিষ্ট হিসাবে, আমি প্রথমে সেই সম্পর্কের, এবং পরে সেই প্রতিভার স্বাতন্ত্র্যের কথাই বলিব।

বাংলার নবযুগের বঙ্কিম-পূর্ব্ব ভাগের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমি সেই কালের একটি প্রবৃত্তির উল্লেখ করিয়াছি—সেই প্রবৃত্তির নাম, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যস্পৃহা। যে মানব-মহত্ত্ববোধ এই যুগের নব প্রবৃত্তির আদি লক্ষণ, এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যস্পৃহাও তাহারই অন্তর্গত। সমাজের সহিত ব্যক্তির নূতন করিয়া বোঝাপড়া, শাস্ত্রশাসনের বিরুদ্ধে

বিচার বুদ্ধির জাগরণ, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে স্বকীয় আদর্শ ও বিশ্বাসের অনুবর্ত্তিতা—এ সকলই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের লক্ষণ। রামমোহনের ব্যক্তিত্ব-চেতনা ততখানি অন্তর্মুখ ছিল না, তিনি তৎকালীন সমাজকে সহ্য না করিলেও অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই; তাঁহার সেই স্বাতন্ত্র্যবোধে এইরূপ পৌরুষেরই দৃপ্ত প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু রামমোহনের বাণী ও তাঁহার কার্য্যকলাপ তাঁহার সেই আদর্শ স্থাপনের পক্ষে কার্য্যকরী হয় নাই; তাঁহার সেই আন্দোলন কেবল এক দিকেই নবযুগের সেই প্রবৃত্তিকে পুষ্ট করিয়াছিল—সর্ব্ব বিষয়ে Reason বা বিচার-বুদ্ধির একাধিপত্য, এবং তজ্জনিত ব্যক্তিমানসের স্বাতন্ত্র্য-ঘোষণা। হৃদয়বৃত্তির উপরে বুদ্ধিবৃত্তির এই প্রাধান্যের ফলে, সমগ্রভাবে সমাজ বা জাতির কল্যাণ-কামনা মুখ্য না হইয়া ব্যক্তির স্বতন্ত্র সাধনাই শ্রেয়স্কর হইয়া উঠিতেছিল; যে তিতিক্ষা ও ধৈর্য্য, যে দূরদৃষ্টি ও প্রেম ব্যতিরেকে, এক অতি-প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী, অথচ অধুনা-মৃতবৎ অতিকায় সমাজ-দেহের উত্তোলন ও উজ্জীবন অসম্ভব, ব্যক্তির এই স্বাতন্ত্র্য-কামনা তাহার আদৌ অনুকূল নয়। এইরূপ মনোভাব সমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্ন ও মধ্য স্তরে সংক্রামিত হইবার পক্ষে একটা বড় সহায় হইয়াছিল—সেকালের ইংরেজী শিক্ষা; সেই শিক্ষার অন্তর্গত Humanity বা মনুষ্যত্বের মহিমাবোধ এবং তাহারই সমর্থনে ইতিহাস-বিজ্ঞানের সাক্ষ্য ও তৎ-প্রসূত যুক্তিবাদ, সেকালের অতি দুর্ব্বল হিন্দু-সংস্কারকে প্রবলভাবে আঘাত করিবারই কথা। রামমোহনের প্রতিভায় এই ভাব আপনা হইতেই স্ফুরিত হইয়াছিল, ইংরেজী শিক্ষার সহিত তাহার কোন যোগ ছিল না, তাই বোধ হয়, তাঁহার দৃষ্টি আরও স্বচ্ছ ছিল। কিন্তু পরে যাঁহারা রামমোহন হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দৃষ্টি ঠিক রামমোহনের অনুগামী ছিল না; তখন সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তির বিদ্রোহ আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং পাশ্চাত্য দর্শন ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মতত্ত্ব ভিতরে ভিতরে জাতীয়-চেতনার মূল ক্ষয় করিতেছিল। কিন্তু এ অবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হয় নাই, ইংরেজী শিক্ষার সারতত্ত্ব হজম হইয়া আসিলে পর, বাঙালীর মানস-দেহে সেই শিক্ষা বিষ-চিকিৎসার মতই সুফলপ্রদ হইল, তাহারই কারণে, সমাজ-চেতনারও অধিক—জাতীয় আত্ম-চেতনার সঞ্চার হইল। ইতিপূর্ব্বে তাহার মস্তিষ্কের যে নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল, এক্ষণে সেই চেতনা হৃৎপিণ্ডে পৌঁছিল, প্রাণে সাড়া জাগিল—প্রেম আসিয়া জ্ঞানের হাত ধরিল, বাঙালী নবযুগকে তাহার জীবনে বরণ করিয়া লইল। আমি ইহারই কাহিনী সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

কিন্তু রবীন্দ্র-প্রতিভার উদয় ও সেই প্রতিভার উন্মেষের সহিত এই যুগের যে সম্পর্ক তাহা ওই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-ঘটিত, অতএব, এই তত্ত্বটিকে ধরিয়া আর একটু ভিতরে যাইতে হইবে। সকল শ্রেষ্ঠ প্রতিভাই অন্তত কতক পরিমাণে দেশ-কালের নিয়ম-

বহির্ভূত—কখন্ কোথায় যে তাহার আবির্ভাব হইবে পঞ্জিকার সাহায্যে তাহা গণনা করা যায় না; তাহার উপর, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এতই স্ব-তন্ত্র যে, অনেক সময়ে মনে হয়, তাহার সহিত বর্ত্তমান যুগের, তথা বাঙালী-জীবনের কোন সাক্ষাৎ-সম্পর্ক নাই—কেবল ইহাই সত্য যে, ওই জ্যোতিষ্কের উদয় আর কোথাও না হইয়া আমাদের এই নিম্নভূমির অতি-নিকট দিগ্‌বলয়ে হইয়াছিল; তাহার কোন কারণ না থাকিলেও, বিশ্ববিধানের দুর্জ্ঞেয় নিয়মে তাহার বারণ নাই। রবীন্দ্রনাথ নামক যে প্রতিভা-সূর্য্য আপন জ্যোতির্লীলা আপনারই স্বভাবে প্রকটিত করিয়া আপনিই অস্ত গিয়াছে, তাহার আলোকে আমাদের অন্ধকার গৃহকোণ আলোকিত হইয়াছে কি না, তাহার কিরণ-প্রাচুর্য্যে আমাদের ক্ষেত্রতলের শস্যরাশি পাকিয়াছে কি না, অথবা তাহার উত্তাপে আমাদের শীত-জড়িমা ঘুচিয়াছে কি না—এমন প্রশ্ন যেন নিতান্তই অবান্তর; যদি তাহা হইয়া থাকে, ভালই; যদি না হইয়া থাকে, সে অনুযোগ করা মূঢ়তা মাত্র। কিন্তু এ কথা পরে, এখন যাহা বলিতেছিলাম। এই যে প্রতিভা, ইহা যতই স্বয়ম্পূর্ণ বা দেশকাল-নিরপেক্ষ হউক, ইহারও একটা জন্মস্থান বা উদ্ভব-ক্ষেত্র আছে—সেই ক্ষেত্রই ইহার বিকাশের পক্ষে বাধা না হইয়া বড়ই অনুকূল হইয়াছিল। এই ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চরিত্র ও সাধন-জীবনের প্রভাবে। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সেই যুগের যে সম্পর্ক—রবীন্দ্রনাথের অন্তর্জ্জীবনের সম্পর্ক গৌণভাবে তাহাই; অন্তর্জ্জীবন বলিলাম এই জন্য যে, কবিশিল্পী হিসাবে সেই যুগের সহিত তাঁহার যে সাহিত্যিক সম্পর্ক তাহা অন্যরূপ; সে সম্পর্কের কথা, এ প্রসঙ্গে যতটুকু আবশ্যক, পরে বলিব।

দেবেন্দ্রনাথ সাক্ষাৎভাবে রামমোহনের শিষ্য হইলেও তাঁহার প্রকৃতি ছিল অতিশয় বিলক্ষণ; ওই যুগের যে আধ্যাত্মিক সঙ্কটের কথা বলিয়াছি, সেই সঙ্কট দেবেন্দ্রনাথের জীবনেই সর্ব্বপ্রথম গুরুতর হইয়া উঠে। রামমোহনের নিকটে তিনি একটা মন্ত্রের নির্দ্দেশ মাত্র পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সংশয় আরও গভীর হইয়াছিল। তিনি, রামমোহনের মত, ধর্ম্মবিষয়ে কেবল জ্ঞানপন্থী ছিলেন না—ভাবপন্থীও ছিলেন, তাই বেদান্তদর্শনের অদ্বৈতকে যুক্তিসিদ্ধ ও বুদ্ধিগ্রাহ্য করিয়া, এবং সেমিটিক ঈশবাদকেই তাহার দ্বারা উন্নত ও মার্জ্জিত করিয়া, কেবল 'পৌত্তলিকতা'র উচ্ছেদসাধনেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই; তিনি ভারতীয় ব্রহ্মবাদকেই নিজের আধ্যাত্মিক পিপাসার অনুরূপ একটি ভাব-সাধনার বস্তু করিয়া লইয়াছিলেন। রামমোহন যে ধর্ম্মমতের স্থাপনা করিয়াছিলেন দেবেন্দ্রনাথ তাহাতে একটি বিশিষ্ট সাধনা যুক্ত করিয়াছিলেন; কেবল 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তম্' নয়—তিনি ব্রহ্মের রস-রূপকেও জীবনে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার সেই ধর্ম্মমন্ত্র তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত সাধনার সহিত এমনই

জড়িত ছিল, তাঁহার সেই আদর্শের মধ্যে এমন একটা বন্ধন ছিল যে, মুক্তিপিপাসু নব্য সম্প্রদায় তাহা স্বীকার করিতে পারে নাই; রামমোহনকে দেবেন্দ্রনাথ যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, পাশ্চাত্যভাবাপন্ন সংস্কারপন্থীরা সেরূপ না বুঝিয়া তাঁহার সেই যুক্তি-ধর্ম্মের শাণিত অস্ত্রখানিকেই সর্ব্ববন্ধনচ্ছেদনের উপযোগী বলিয়া সাগ্রহে বরণ করিয়াছিল।

নব্যপন্থী হইলেও দেবেন্দ্রনাথ যে বন্ধন মানিতেন, তাহা সেই প্রাচীন ভারতীয় সাধনার আধ্যাত্মিক সংস্কার; তিনি আধুনিক জীবনেই সেই সনাতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। যুগ-প্রবৃত্তির সহিত তিনি যেটুকু রফা করিতে প্রস্তুত ছিলেন তাহা প্রকৃত রফা নয়—আসলে তাহার সেই আক্রমণকে নিবারণ করিয়া, সেই বিদ্রোহকেই ভিন্ন পথে ফিরাইয়া, একটা অতীত যুগ ও অতীত সমাজের ভাবস্বপ্নময় আদর্শকে সত্য করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তিনি অতিশয় আত্মবিশ্বাসী ছিলেন—বংশগত সংস্কারেও তিনি ছিলেন পুরা অ্যারিষ্টোক্র্যাট (aristocrat)। তাহার উপর, তাঁহার চরিত্রেই এমন একটি উন্নত আদর্শনিষ্ঠা ও স্বাতন্ত্র্য-বোধ ছিল যে, তিনি সহজেই ভারতীয় সাধনার সেই অন্তর্মুখ ও আত্মতান্ত্রিক আদর্শে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এ যেন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বুদ্ধ-পূর্ব্ব যুগের এক খণ্ড সহসা উৎক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ নবযুগের সেই সমস্যাসঙ্কুল ভাববন্যার তরঙ্গাভিঘাত রোধ করিয়া, একটি সুদৃঢ় প্রাচীর-বেষ্টনীর মধ্যে স্বকল্পিত সাধনমঞ্চ রচনা করিয়াছিলেন; সেই সাধনমঞ্চ যেমন বিবিক্ত, তেমনই তাঁহারই স্বহস্তরোপিত পুষ্পপাদপে সুশোভিত ছিল। বাহিরের হিন্দুসমাজের সহিত যে ব্যবধান পূর্ব্ব হইতেই ছিল, তাহাও সম্ভবতঃ এইরূপ মনোভাবের সহায়ক হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ বর্ত্তমানের বিদ্রোহকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই—কিন্তু সমাজ-জীবনের মিথ্যা অপেক্ষা ব্যক্তি-জীবনের মিথ্যাকেই তিনি বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন, এজন্য নিজ জীবনের সত্যোপলব্ধিকে সমাজের পক্ষেও সমান উপযোগী মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে সংস্কারকের গোঁড়ামি বা প্রচারকসুলভ অন্ধতা ছিল না—তাঁহার চরিত্রগত আভিজাত্য সে বিষয়ে একটি সুন্দর সংযম রক্ষা করিয়াছিল।

এই যে চরিত্র এবং এই যে বিশিষ্ট সাধনা ইহা যে সেই যুগের ভাবধারারই একটি তরঙ্গ, তাহাতে সন্দেহ নাই—ভাবের কিরূপ ঘাত-প্রতিঘাতে ইহার উদ্ভব হইয়াছিল তাহা আমরা দেখিয়াছি। সেই আন্দোলনের গতি ও পরিণতি ওই শতাব্দীর শেষে কিরূপ হইয়াছিল সে আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন; কেবল, দেবেন্দ্রনাথের জীবনে ও সাধনায় তাহার যে রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছিল বর্ত্তমান প্রসঙ্গে তাহাই বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন আছে, কারণ, রবীন্দ্রনাথের মানস-জীবন-গঠনে তাহার প্রভাব অতি গভীর। দেবেন্দ্র-নাথের ধর্ম্মজীবনে উপনিষদের বাণী যেভাবে পুষ্পিত ও বিকশিত হইয়াছিল তেমন

আর সে যুগে কোথাও দেখা যায় না। এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথও ছিলেন একজন স্রষ্টা-কবি। তিনি তাঁহার নিজ জীবনের ভাষায় যে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন তাহার ছন্দ ও সুর রবীন্দ্রনাথের বাণী-মন্ত্রে বীজরূপে প্রবেশ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যে অর্থে স্বকীয় বা নিজস্ব, সেই অর্থে এই পৈতৃক মন্ত্র-বীজ তাঁহার নিজস্ব নয়, এমন বলা যাইতে পারে; তথাপি, ইহারই প্রভাব তাঁহার কবিমানসকে প্রথম হইতেই নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে; তাঁহার কবিপ্রতিভা ও কবিজীবন একটি বিশিষ্ট ভাব-তন্ত্রের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। কথাটা একটু বেশি সূক্ষ্ম হইয়া পড়িতেছে—বিস্তারিত ব্যাখ্যার অবকাশও নাই, তথাপি, রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতিতে যে উদার রসপিপাসা ও সর্ব্বতোমুখী কল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে এমন সন্দেহ হয় যে, সেই স্বাধীন স্বতন্ত্র ও উৎকৃষ্ট কবিপ্রতিভা যদি এত বড় একটা প্রভাব ও অন্যান্য বেষ্টনী-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিত, যদি সেই একান্ত আত্মমুখী সাধনা তাঁহার পিতার মূর্ত্তিতে শরীরী হইয়া তাঁহার মানসে দৃঢ়-মুদ্রিত না হইত, তাহা হইলে হয়তো রবীন্দ্রনাথই অতিশয় শক্তিমান তান্ত্রিক সাধকরূপে বাংলার সেই নবযুগের Renaissanceকে চরম ও পরম পূর্ণতা দান করিতে পারিতেন। এইরূপ ভাবনা যে সূক্ষ্ম-বিচার-সঙ্গত নয় তাহাও বুঝি; কারণ এরূপ মহতী প্রতিভা আপনার নিয়মেই আপনাকে বিকশিত করিয়া তোলে, বাহিরের সকল প্রভাবকে সে আত্মসাৎ করিয়া লয়, তাহাকে কেহ আত্মসাৎ করিতে পারে না। তথাপি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিগত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য কোনরূপ বাধা পাওয়া দূরে থাক, তাঁহার পিতার ওই প্রভাবে একটা বিশেষ রঙে রঞ্জিত ও দৃঢ়তর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই—তাঁহার সেই Idealism ও আত্মকেন্দ্রিক কল্পনা ওই সনাতন ভারতীয় আদর্শে আকৃষ্ট হইয়া আরও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। ব্যক্তির আত্মসাধনাই ইহাতে প্রবল; এইরূপ ভাব-সাধনার সহিত অত্যুৎকৃষ্ট কবি-কল্পনা যুক্ত হইলে যাহা হয়—রবীন্দ্রনাথের সাধনায় তাহাই হইয়াছে। এক দিকে সেই এক ভাব-মন্ত্রের বন্ধন, এবং অপর দিকে কাব্যরস-সাধনার মুক্তি, এই উভয়ের লুকাচুরি—'ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা'র সেই লীলা, শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার কবিমানসকেই সমৃদ্ধ করিয়াছে। তাহার মূলে আছে সেই খাঁটি ভারতীয় মনোভাব, তাহারই বশে রবীন্দ্রনাথ, এত কাল পরেও বাস্তবজীবনের সকল বিরূপতা ও আধুনিক যুগের বিষম কোলাহলের উপরে এক স্বাধীন আত্মার স্বকল্পিত ভাবজগৎ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সেই কবিমানস ও সেই কাব্যজগতের বিস্তারিত পরিচয় এখানে অনাবশ্যক; তাহা যে সেই যুগের ভাবধারা হইতে স্বতন্ত্র—শুধুই সে যুগ কেন, কোন যুগেরই অধীন বা অনুগামী নয়, ইহাই বর্ত্তমান প্রসঙ্গে বিশেষভাবে আলোচ্য।

রবীন্দ্রনাথের এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কি কারণে এত গভীর ও গূঢ় তাহা বলিয়াছি, সেই একই কারণে তিনি সেই যুগের প্রতিনিধি হইতে পারেন নাই। এই প্রতিভাই, বাংলার

ও ভারতের—কেবল পৌরাণিক ছাড়া, আর সকল যুগের—সকল ভাবকে আত্মসাৎ করিয়া আপনার রসকল্পনাকে পুষ্ট করিয়াছে ; অতএব, এক হিসাবে ইহা যেমন ভারতীর সংস্কৃতি-কাননের যেন একটি কবি-মধুকর,—তেমনই কোন এক বিশেষ যুগের প্রতিনিধি নহে। এই অবাধ ভাবরসরসিকতার সহিত দুর্জ্জয় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য যুক্ত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের অন্তর্জ্জীবন ও বহির্জ্জীবনের দ্বন্দ্বও অতিশয় বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। সকল আসক্তির মধ্যেই তিনি নিরাসক্ত ; জনতার শোভাযাত্রায় যোগদান করিলেও সারা পথ তিনি আত্মমনস্ক, তাঁহার জীবনে কর্ম্মানুষ্ঠানের যে ব্যাকুলতা লক্ষ্য করা যায় তাহাতেও বাস্তব প্রয়োজন অপেক্ষা আত্মগত ভাবসত্যের প্রয়োজনই অধিক। যে পথ তাঁহাকে ঘরের বাহিরে ডাকিয়া লয় তাহা আমাদের এই পথ নয় ;—তাঁহার সেই পথ ও ঘর একই, তাহার কারণ, সে পথে—যাত্রারম্ভ ও যাত্রাশেষ, এই দুইয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই—তাহাতে গন্তব্যের ভাবনা নাই, পথ চলাতেই আনন্দ, তাই পথবাসে ও গৃহবাসে প্রভেদ নাই। এইরূপ দেশকালহীন মানস-ভ্রমণ কেবল তাহার পক্ষেই সম্ভব, যে রবীন্দ্রনাথের মত একটি আত্মস্থির ভাবদৃষ্টি লাভ করিয়াছে, যে নিজেরই মধ্যে সমস্ত জগৎকে গ্রাস করিয়া তাহাকে আপন রসকল্পনার অধীন করিয়াছে—গত ও স্থিতির যুগ্ম-তালকে বিশ্বরাগিণীর সঙ্গীত-সুষমার সমীভূত করিতে পারিয়াছে। তখন কোথায় যু' কোথায় বা তাহার সমস্যা! উনবিংশ শতাব্দীতে যাহার উদয় এবং বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যকালে যাহার অস্তগমন—সেই অন্বর্থনামা কবির রবিমণ্ডলে বসিয়া প্রাচীন ঋষিবংশবন্দিত সাবিত্রী-দেবতা সেই এক সুরের উদ্বোধন করিতেছে—সেই—'তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যম্'!

অতএব, যে নূতন মানবধর্ম্ম—Humanityর যে বাস্তব আদর্শ এ যুগের অতি প্রয়োজনীয় সাধন, এই ব্যক্তি-স্বতন্ত্র ভাব-মুক্তির সাধনা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এ সাধনা অতিশয় শক্তিমান ব্যক্তিপুরুষের সাধনাই বটে ; কিন্তু সকল ভাবতান্ত্রিক আদর্শকে নিষ্ফল করিয়া মানুষের যে ইতিহাস-জাত নিয়তি আজ শত শতাব্দীর শেষে তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে তাহাকে এড়াইয়া চলিবার উপায় আর নাই; এবার ব্যক্তি-জীবনকে মানব-জীবনে লয় করিতে হইবে ; সেই মানবও ব্যক্তি-মানবের একটা ভাব-বিগ্রহ নয়, রক্তমাংসেরই এক বিরাট শরীরী বিগ্রহ। মানবাত্মার যাহা পরম পদ তাহাও আর ভাবসাধনার লভ্য নয় ; জীবনের উপলবন্ধুর পথ, দুর্গম গিরিসঙ্কট ও তপ্ত মরুসৈকত অতিবাহন করিয়া, দুর্ব্বলতম যাত্রীর হাত ধরিয়া, সেই পরম তীর্থে পৌঁছিতে হইবে। অতএব ওই ভাবমার্গের সাধনা এ যুগের পক্ষে ব্যর্থ হইবারই কথা—যদিও আর এক ক্ষেত্রে আর এক রূপে তাহা সার্থক হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনকে আশ্রয় করিয়া সেই ভাব-বীজ কালজয়ী কাব্যকুসুমে বিকশিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি—নবযুগের সমস্যা-সমাধানের সহিত সে

কীর্ত্তির সাক্ষাৎ-সম্পর্ক যে অল্প, এ কথা বিস্মৃত হইলে রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রতিই অবিচার করা হইবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনে, যুগ, জাতি ও দেশের বাস্তব আঘাত হইতেও নিষ্কৃতি পান নাই; সেই আঘাতে তাঁহার অতি তীক্ষ্ণ অনুভূতিপ্রবণ চিত্ত নানা রূপে সাড়া দিয়াছে—সেই সাড়াও তাঁহার সেই আত্ম-সচেতন মনের সহিত নিজেরই বোঝাপড়া। সাময়িক ভাবাবেগে তিনি নিজের কবিধর্ম্মকে লঙ্ঘন করিয়া বিড়ম্বনা ভোগও করিয়াছেন—রবীন্দ্র-সাহিত্যে কবির অন্তর্জ্জীবনের পাশে পাশে সেই বহির্জ্জীবনের কাহিনীও রেখাপাত করিয়াছে। সেই সকল রেখাবলী হইতে পৃথক করিয়া কবি রবীন্দ্রনাথকে বুঝিয়া লওয়া দুরূহ নয়, বরং, বাংলার নবযুগের ভাবধারার যে পরিচয় আমি দিয়াছি তাহার পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের সেই কবিমূর্ত্তিকে স্থাপন করিলে তাহা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম হইতেই সে যুগের সাহিত্যিক আদর্শকেও অস্বীকার করিয়াছিলেন; তাঁহার সেই স্বাতন্ত্র্য এমনই যে, যতদিন বাংলার ভাবচিন্তায় সে যুগের প্রভাব মন্দীভূত হয় নাই, ততদিন তাঁহাকে কেহ চিনিতেও পারে নাই; তখন তাঁহার ভাবও যেমন—ভাষা ও ছন্দও তেমনই, সম্পূর্ণ অপরিচিত বলিয়া মনে হইত; প্রায় মধ্যগগনে আরোহণ করিয়াও এই রবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্র আপনার কিরণজাল প্রকাশিত করিতে পারেন নাই! তারপর, যখন কিছুদিনের জন্য (তাঁহার কবিমানসের একটি আকস্মিক ও অভিনব বিকাশে) তিনি জাতীয়তার চারণ-কবিরূপে পথে বাহির হইলেন—এবং গানে গানে জনতার কণ্ঠ ভরিয়া দিলেন; যখন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মত, বিবেকানন্দেরই প্রায় সমধর্ম্মী, আর এক মহাপ্রাণ মহামনস্বী বীর সন্ন্যাসীর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় এক দিকে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা, এবং অপর দিকে, বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শে, তাঁহারই স্মৃতি-মণ্ডিত 'নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদকতায়, জাতির চরিত্রগঠনে ও জাতীয় আদর্শের উদ্ধারসাধনে আত্মনিয়োগ করিলেন, তখনই বাংলার নবযুগের শেষ প্রতিনিধিরূপে তিনি আপন অলোকসামান্য প্রতিভার পরিচয় দান করিলেন। তাহার পরের ইতিহাস অন্যরূপ; রবীন্দ্র-জীবনের এই অধ্যায়ই বাংলার নবযুগের শেষ অধ্যায়। ইহার পর দেশ ও জাতির ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাধনাও ভিন্নমুখী হইয়াছে, অথবা আরও নিশ্চিতরূপে আপন পথে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—এই যুগের রচনাবলীর সহিত পরবর্ত্তী রবীন্দ্র-সাহিত্যের তুলনা করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। এই পরবর্ত্তীকালের যে কবিকীর্ত্তি তাহার বিচার-বিশ্লেষণ এ আলোচনার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক, কেবল তাহাতে নবযুগের সেই সাধনার ধারা যে খণ্ডিত হইয়াছে আমি অতঃপর তাহারই কিছু পরিচয় দিব।

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

মাধুকরী

১

কল্পনা-গহনে
ভ্রমি আনমনে ;
তরুছায়ে চমকিল তোমার অঞ্চল,
ঝঙ্কারিল বুঝি তব নূপুর চঞ্চল !
বুঝি তুমি হেরিয়া আমারে
পুষ্পিত মালঞ্চ-বক্ষে গভীর আঁধারে
উৎসুক আনন্দে লুকাইলে—
সহসা অন্তরে শুধাইলে
স্ফুটমান আশার মঞ্জরী,
মন্দানিলে মোর 'পরে ঝরি
পড়িল শিশিরকণা শীর্ণধারে
বেদনায় অশ্রু সম। আমি যে তোমারে
হারাইনু বাঁধিয়াও নয়নের আলিঙ্গনে,
লভিয়াও স্পর্শ তব নূপুরনিক্কণে !
হে মানসী প্রণয়িনী প্রিয়া,
দূর হতে দর্শনের ছবিটুকু নিয়া
কাটিবে কি দীর্ঘ শুষ্ক দিন ?
হতাশার দগ্ধ বক্ষে লীন
হ'ল হায় ক্ষণিকের ক্ষীণস্রোতা আশা
বিফল হইল ভালবাসা !
না না, তুমি যাও নাই ; ঐ দূরে
বাজিল কঙ্কণ তব নব সুরে ;
সুবর্ণখচিত বস্ত্রাঞ্চল
হইল যে আবার চঞ্চল
মেঘবক্ষে ক্ষণপ্রভা সম ;
হে প্রেয়সী মম,
ঘনপত্র যূথিকার ঈষৎ আড়ালে
ঐ যে দাঁড়ালে
ছলনার হাসি হেসে,
গন্ধরাজ বিলম্বিত কেশে
ডাকিছ ইঙ্গিতে,
বিক্ষুব্ধ শোণিতস্রোত মোর ধমনীতে।

২

মুহূর্তের তরে
আমার অন্তরে
জ্ব'লে ওঠে সতেজে আবেগে
তীব্র তালে বজ্রবহ্নি সম ওঠে জেগে ;
সমুদ্র পীড়ন করে ঝড় যেন তেজে
শিরায় শিরায় যায় বেজে
শব্দহীন ঘোর কলরোল ;
দ্রুত হতে দ্রুততর মৃদঙ্গের বোল
কে যেন বাজায় বুকে অদৃশ্য আঙুলে ;
উঠে ফুলে ফুলে
শিরা-উপশিরা
চুনি পান্না মরকত হীরা
ঝ'রে পড়ে অবিরল আমার উপরে,
বিস্ফোরিত অগ্নিকণা ব'য়ে যায় অনন্ত নির্ঝরে।
বুঝি তার শেষ নাই, চিরস্থায়ী এক সে নিমেষে
বহুরূপা বিদ্যুৎ নাচিয়া যায় লক্ষবর্ণ বেশে ;
কোটি কুসুমের গন্ধ ভ'রে ওঠে প্রাণে,
শিহরিত অন্তরাত্মা অপূর্ব্ব আঘ্রাণে,
আনন্দের কারাগারে বন্দি আমি
আনন্দ-সায়রে নামি ;
স্বপ্নক্লান্ত জাগি সখী নিঝুম হরষে
তোমার পরশে।

৩

একটি রজনী সখী, তারই মাঝে
জীবনের আরম্ভ ও শেষ।
একটি রজনী বঁধু, জ্যোৎস্নামাখা
রজনীগন্ধার গন্ধে পুলকিত,
দক্ষিণ সাগরপথে সঞ্চারিত
সুস্নিগ্ধ পবনে সুশীতল।
আজিকার এ নিশীথে উঠেছে চন্দ্রমা
মেঘ ভেসে আসিয়াছে বায়ুভরে
মন্থর গতিতে ক্রমে ধীরে
চ'লে গেছে আকাশের পথে।
তোমার মানসপটে
কত চিত্র বর্ণে বর্ণে উঠেছে ফুটিয়া;
নয়ন হয়েছে সিক্ত অশ্রুজলে,
কভু দৃপ্ত হেরিয়াছি বিদ্যুৎবহ্নিতে,
হাস্যরসে কভু তরঙ্গিত;
অথবা কখন অবসাদে
নিদ্রাক্লান্ত ধূমাচ্ছন্ন দীপশিখাসম।
আমি হেরিয়াছি তব রূপ
মায়ামুগ্ধ চোখে,
চমকিয়া উঠিয়াছি অকারণে,
লভিয়াছি পরশে তোমার
শেষ রসবিন্দু জীবনের।

শ্রীমধুকরকুমার কাঞ্জিলাল

তাল এবং মিছিল

সেদিন এক বিবাহের নিমন্ত্রিত আসরে একটি ভদ্রলোক বলিতেছিলেন, তাঁহার ভয়ানক বদ অভ্যাস, উচিত কথাটি স্পষ্ট ভাষায় শুনাইয়া দেওয়া। এ বিষয়ে তিনি কাহাকেও পরোয়া করেন না, তা তিনি যত উচ্চপদস্থ লোকই হন না কেন। এই তো সেদিন কালেক্টার সাহেবকে ধরিয়াই দুই কথা আচ্ছা করিয়া শুনাইয়া দিয়া আসিলেন। বলিলাম, সাহেব, আমাদের দেশের আসল খবর তো আর কিছু রাখ না। দু দিনের জন্ম আসিয়া ফপরদালালি করিয়া চলিয়া যাও। এদিকে—

একটি দুষ্টবুদ্ধি যুবক প্রশ্ন করিয়া বসিল, ফপরদালালির ইংরেজীটা কি বলিয়াছিলেন? স্পষ্টবক্তার নিতান্ত মন্দ ভাগ্য। সভাসুদ্ধ লোক একযোগে এমন তুমুল হাস্য করিয়া উঠিল যে, স্পষ্টবক্তার সমস্ত কথা বেমালুম অস্পষ্ট হইয়া গেল।

যুবকটি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। সে সভাসুদ্ধ সমস্ত লোককে এক বিষম বিপত্তি হইতে বাঁচাইয়া দিল: বিপত্তি বইকি। যাঁহারা নিজেদের গুনপনা সম্বন্ধে বড় বেশি স্পষ্ট আলাপ করেন, তাঁহারা সভ্য-সমাজের আতঙ্ক। দেখা হইলে গা ছমছম করে। তাঁহারা যে সকল কীর্তি যত্রাযত্রে রাখিয়া যাইতেছেন, সেগুলি দৈবক্রমে অপরের অজ্ঞাত। তাই যেখানে সেখানে, সুবিধা পাইলেই, জাঁক করিয়া শুনাইতে হয়, নহিলে লোকে

জানিবে কি করিয়া? অথচ লোকে যে জানে না, তাহার কারণই হইল, কীর্তিটা একেবারে কাল্পনিক না হইলেও বলিবার মত কিছু নয়। বহ্বাস্ফোট-পরায়ণ ব্যক্তি মাত্রেরই ওই এক ধরন, যাহা করেন, তাহা একেবারে ফলাও করিয়া জাহির করা চাই, যেন এ কর্ম্মটি পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্যের অন্যতম।

জাহির করিবার ধরনটি সাধারণত দুই রকমের দেখা যায়। কেহ কেহ তিলকে তাল করিয়া জাহির করেন, আর কেহ কেহ আসল ব্যাপারটিকে না বাড়াইয়া এমন আড়ম্বর ও সমারোহ সহযোগে উহা ঘোষণা করেন যে, হঠাৎ ভ্রম হয়, সামান্য ব্যাপারটি বুঝি আসলে অসামান্য। প্রথমটি হইল অতিরঞ্জনের কৌশল। ইহার সুবিধা এই যে, বলিবার সময়ে ঢাক-ঢোল বাজাইবার দরকার হয় না। তিলটি তো প্রথমেই তালে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। এখন উহা শুধু সকলের নাকের সম্মুখে ঝুলাইয়া দিলেই হইল। সুতরাং মুখমণ্ডলে পরম ঔদাসীন্য ও নির্লিপ্ততার অভিব্যক্তি ফলাইয়া তালটিকে কেবল বর্ণনা করিয়া গেলেই কার্য্যশেষ। ভাবখানা, ইহা লইয়া আর হৈ-চৈ করিব কি? আপনাদের কাছে অবশ্য খুবই অসাধারণ কীর্ত্তি বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু আমার নিকট ইহা জলভাত। দ্বিতীয় প্রণালীটি বিবাহের মিছিলের মত। একটা রীতিমত তাণ্ডব সম্মুখে লইয়া জরিমখমল-পরিহিত নাতিসুশ্রী বালকটি দশাশ্বচালিত স্যন্দনে বিবাহ করিতে চলিয়াছে। কেবল বরটিকে হয়তো দেখিলে নাক সিঁটকাইতেন। কিন্তু সমারোহে হকচকাইয়া গিয়া উহার আসল রূপটি দৃষ্টি এড়াইয়া গেল।

আমার দুর্ভাগ্যক্রমে এই দুই জাতীয় বিপাকেই আমাকে পড়িতে হইয়াছে। অতিরঞ্জনের কৌশলী রঞ্জনবাবুর কথাই প্রথমে বলি। তিনি ঘরে ঢুকিবামাত্র ঘ্রাণেই যেন টের পাই, আলোয়ানের ভিতর একটি অতি পরিপক্ক তাল ঢাকিয়া ঢুকিয়া আনিয়াছেন। তাল সামলাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকি। প্রথমটায় এটা সেটা নানারকম ছোটখাট বিষয়ের আলোচনা চলিতে থাকে। উহা গ্রাউণ্ড প্রিপারেশন। অর্থাৎ, আলাপটা উচ্চগ্রামে না চড়াইয়া নীচু পর্দ্দায় বাঁধিয়া রাখিবার আয়োজন। ইহার সার্থকতা অনভিজ্ঞের নিকট প্রথমে ধরা পড়ে না। আমারও প্রথম প্রথম পড়ে নাই। উদ্দেশ্যটা পরে বুঝিয়াছি। আসল কথাটি পাড়িবার সময় আলাপের সুরটা যদি পূর্ব্বাপর একই রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সুরের সহিত 'তাল'এর বৈষম্যটা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে; এবং তালটা যেন হঠাৎ গাছ হইতে কাটিয়া গিয়া দুম করিয়া পিঠের উপর পড়ে। চুটকি গান গাহিতে গাহিতে সুরটিকে রাখিয়া গানটি বদলাইয়া ভগবদ্গীতার শ্লোক যোজনা করিলে যাহা হয় আর কি। আপনি মনে মনে একেবারে লাফাইয়া উঠেন। ওই মানসিক উল্লম্ফনটাই রঞ্জনবাবুর এবং তাঁহার গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য। রঞ্জনবাবুর ব্যবসা ডাক্তারি। পসারও মন্দ নয়। সেদিন নানা কথার ফা ক হঠাৎ বলিলেন, সাহেবজাতির

ইংরিজী বোঝা যায় না কেন, বলুন তো? আমি বলিলাম, কোন্ সাহেবের সঙ্গে আবা দেখা করতে গিয়েছিলেন?

না, দেখা নয়। টেলিফোনে কথা হচ্ছিল।

কার সঙ্গে?

পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে।

পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে? কেন?

রঞ্জনবাবুর সুর অতি সহজ ও স্বাভাবিক। বলিলেন, না, বিশেষ কিছু নয়। আমার বাড়ির সামনে একটা ট্র্যাফিক পুলিশের বন্দোবস্তের জন্যে। যা রুগীর ভিড় হয়।

তালটিকে আলোয়ানের বাহিরে আনিয়া ছাড়িয়া দিয়াই পর-মুহূর্ত্তে অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। ইহাই নিয়ম। ভাবখানা হইল, এমন একটা কি কথা বলিলাম, যাহার জন্য আমার কিংবা আপনার থমকাইয়া থাকিতে হইবে!

দূরের জিনিস যেমন ছোট এবং নিকটের জিনিস যেমন বড় দেখায়, ইহাদের চোখেও তেমনই অন্যের গুণগুলি ছোট লাগে এবং নিজেরগুলি বৃহৎ বলিয়া প্রতিভাত হয়। নিজের তিলটি তাল বলিয়া মনে হয়, অপরের তালটিকে তিল বলিয়া বোধ হয়। মনশ্চক্ষুর এ রোগের চিকিৎসা নাই। উহাতে চশমা পরানো চলে না। ফলে রোগ বাড়িয়াই চলে।

রঞ্জনবাবুর জুড়ি হইলেন নবনীবাবু। ইনি এম. এ., পি-এইচ. ডি. (লণ্ডন)। মস্ত পণ্ডিত। ইস্কুল হইতে ইউনিভার্সিটি পর্য্যন্ত বরাবর প্রথম হইয়া আসিয়াছেন। কৃতী অধ্যাপক, বক্তৃতায় পারদর্শী, যুক্তিতর্কে অদ্বিতীয়। যে পুস্তকগুলি লিখিয়াছেন, তাহা দেশে বিদেশে সর্ব্বত্র উচ্চপ্রশংসিত। কিন্তু হইলে কি হইবে? ওই মনশ্চক্ষুর ব্যারামে একেবারে সব মাটি! একদিন তাস খেলিতে খেলিতে বলিয়া বসিলেন, জহরলাল নেহরু নিশ্চয়ই আমার উপর রাগ করিয়াছেন। আমরা স্তম্ভিত। বলিলাম, কেন?

আমার পুস্তকের একখানি কপি তাঁহাকে উপহার দিব বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছিলাম। অথচ এ যাবৎ পাঠাইতেই পারিলাম না।—বলিয়াই নির্লিপ্তভাবে খেলায় মনোনিবেশ করিলেন।

কোন কালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সহিত ইঁহার সাক্ষাতের সুযোগ হইয়াছিল। উহাই অতিরঞ্জিত হইয়া ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে, এমন কি মান-অভিমানের সম্ভাবনায়, পরিণত হইয়াছে।

এখন মিছিলওয়ালাদের সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইঁহাদের কৌশল হইল সমারোহ। পথের ধারে বাজিকরদের খেলা নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন। সম্মুখে একটি কড়ি কিংবা কাষ্ঠপুত্তলী রাখিয়া খুব করিয়া ডুগডুগি বাজাইতে থাকে। লোকের

ভিড় জমিয়া যায়। সমারোহ দেখিয়া লোকে মনে করে, উহা সামান্ত কড়ি কিংবা পুতুল নহে, আর কিছু। হয়তো এখনই নড়িয়া উঠিবে। আমাদের মিছিলওয়ালারাও ওই বাজিকরদের স্তায় তাঁহাদের ক্ষুদ্র কীর্তিখানি সম্মুখে রাখিয়া উহাকে জাঁকাইয়া তুলিবার জন্ত খুব খানিকটা হাত-পা ছুঁড়িতে থাকেন। তাঁহারা নিজেদের কীর্তিতে নিজেরাই মুগ্ধ, তাঁহারা বিশ্বাস করেন, উহা পাঁচজনকে ডাকিয়া চীৎকার করিয়া শোনাইবার মত। বিবাহ-বাড়ির যে স্পষ্টবক্তাটির কথা বলিতেছিলাম, তিনি এই দলের। কালেক্টার সাহেবকে তিনি যাহা "শুনাইয়া" দিয়া আসিয়াছেন, তাহা নিতান্তই সাধারণ কথা। বিদেশী লোক দুই দিন থাকিয়া এ দেশের কিছুই বুঝিতে পারে না, এই মাত্র। কিন্তু একে সাহেব, তাহার উপর একটা গোটা জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তাহারও উপর এমনই এক প্রসঙ্গ যাহা চাকুরির দরবারও নয়, খেতাবের প্রার্থনাও নয়। সুতরাং এ এক মহা কীর্তি। ইহাদের বাড়াইয়া বলিবার দরকার হয় না। কোন দিন তাহা বলেনও না। সত্য সত্য যাহা ঘটিতেছে, তাহাই যে এক রাজসূয় কীর্তি।

মাত্রাজ্ঞানের ক্রটিটি লক্ষ্য করিতেছেন নিশ্চয়ই। ইহার কারণ আর কিছু নয়, কারণ হইল নিজেদের ক্ষুদ্রতা। যে প্রশ্রয় এবং বাহবা আমরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বাহাদুরি দেখিয়া দিয়া থাকি, ইহারা নিজেরাই নিজেদের বাহবা দেন। সাবাস বটে! এত বড় সাহসের কথাটা তুমি কি করিয়া সাহেবকে বলিয়া আসিলে?—স্বগতোক্তিটা যেন কানে স্পষ্ট শোনা যায়।

আপনাকে যদি ঘণ্টাখানেক কাটাইতেই হয়, তাহা হইলে আপনি ইহাদের কোন্ দলে ভিড়িবেন? আমি বিনা দ্বিধায় মিছিলওয়ালাদের দলে ভিড়িব। দুই দলই অসহ্য। কিন্তু তবু যেটুকু তারতম্য আছে, তাহা বোধ করি ইহাদেরই অনুকূলে। ইহারা মানসিকভাবে অপর পক্ষ হইতে অপেক্ষাকৃত সুস্থ এবং ভদ্র। নিজেদের তথাকথিত গৌরব লইয়া যে জগঝম্পটা বাজান, তাহা কুরুচিপূর্ণ ও মাত্রাবিরুদ্ধ হইলেও অপরের প্রতি তাহা অসম্মানজনক নহে। অনেকে ঘটা করিয়া পুত্রকন্তার জন্মোৎসব করেন। অপত্যলাভ এমন সাধারণ ব্যাপার যে ঘটা দেখিয়া অসহ্য বোধ হইতে পারে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। এ সমারোহ তাঁহাদের নিজেদের আনন্দের জন্ত। অপরের দারিদ্র্য কিংবা অপুত্রক অবস্থার প্রতি কটাক্ষ করিয়া নয়।

রঞ্জন-নবনী-সম্প্রদায় সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। অন্তের প্রতি তাঁহাদের অনতিগোপন মনোভাবটি অসম্মানজনক। তাঁহারা মনে মনে অপরের মাথার উপর সর্বক্ষণ পা তুলিয়া দিয়া বসিয়া আছেন। কৃপা করিয়া কিংবা দায়ে ঠেকিয়া আজ আপনার সহিত আড্ডা দিতেছেন বটে, কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী যদি কাল প্রসন্ন হন, তাহা হইলে তাঁহারা

পেচকপক্ষীর পাখার ভর করিয়া উন্নতির কোন্ অভ্রভেদী শিখরে তিনি উড়িয়া গিয়া বসিবেন, তাহা কি আপনি জানেন না? আগামী কল্যের এই সম্ভাবনায় তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ এত মশগুল যে, দুই দণ্ড বসিয়াই হাঁপ ধরিয়া উঠে।

সুবাস

প্রেম

তুমি নেই, তাই অন্ধকারের শূন্য ঘরের মধ্যে
একা একা প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে। ঝড় এল কালবোশেখী
ঘোলাটে মেঘের উদ্দামগতি এলোমেলো হাওয়া বইছে,
তোমার হাতের সূচীশিল্পের সবুজ পর্দ্দা উড়ছে!
তুমি নেই, তাই মন উদাসীন
স্মরণের বীণা বাজে রিম্‌ঝিম্‌
বিজন ঘরের স্তিমিত আলোয় প্রদীপের বুক পুড়ছে!

তুমি নেই, তাই প্রতীক্ষাময়ী চঞ্চল ঝ'ড়ো রাত্রে
আচমকা শুনি পায়ের শব্দ। অস্ফুট ভাষা শুনছি
বহিরাকাশের প্রান্তরে কত উদ্দাম ঘোড়া ছুটছে
মেঘলাবরণ চোখে বিদ্যুৎ হ্রেষায় বজ্র হাঁকছে!
অস্ত গিয়াছে মিলনের চাঁদ
মেঘে মেঘে তাই গভীর বিষাদ
আবছা আঁধারে হৃদয়ের দীপে শিখায়িত প্রেম কাঁপছে।

বিমলচন্দ্র ঘোষ

পলিসি

পলিসি ধরেছ ভালো গো দাদারা, পলিসি ধরেছ ভালো,
এ গাঢ় তিমিরে যত দীপ জলে, তোমরাই তাহা জ্বালো।
পরিকল্পনা তোমাদেরি জানি যেখানে যা ঘটে কাজ,
তোমাদেরি ওই কোনারক সাঁচী, তোমাদেরি ওই তাজ।
যারা করে কাম, তাহাদেরই নাম লেখা তোমাদের দলে,
যাহা করণীয় ক'রে ব'সে আছ, তাহারি নকল চলে!
পলিসি ধরেছ ভালো গো দাদারা, পলিসি ধরেছ ভালো,
উচ্চকণ্ঠে ঘোষিতে পারিলে লাল হবে ঘোর-কালো।

সপ্তর্ষি

২

সোম-শুভ্র

ক

টেবিলের ওপর সাদা একখানি চাদর পাতা। তার ওপর কয়েকটা সাদা প্লেট। এক ধারে একখানি খবরের কাগজ বিছানো। সোম-শুভ্র একটি চকচকে কাঁচি দিয়ে পালংশাক কাটছিলেন। যে পাতাটি পোকায় খেয়েছে অথবা যেখানে সামান্যতম মলিনতার সংস্রব আছে ব'লে তাঁর সন্দেহ হচ্ছে, তা তৎক্ষণাৎ কেটে বাদ দিয়ে খবরের কাগজে জমা করছেন। তিনি যা খাবেন, তা নিখুঁত রকম নির্ম্মল হওয়া চাই এবং সে বিষয়ে তাঁর মন এত বেশি রকম সজাগ যে, তিনি নিজের হাতেই সব করেন। পাশেই চাল এবং ডাল রয়েছে। ইন্দু সব বেছে দিয়েছে একবার, তবু তিনি আর একবার নিজে দেখে দেবেন। কয়েকটি আলু, আধখানা বাঁধাকপি, গোটা দুই বিলিতী বেগুন হাতে ক'রে ইন্দু ঢুকল। সোম-শুভ্র প্রসন্ন দৃষ্টি তুলে তার দিকে হাসি-মুখে চাইলেন।

গরম জলে ধুয়ে নিয়ে এলে? আচ্ছা, রাখ ওই প্লেট দুটোতে। আমার আর কিছু লাগবে না।

আপনার কুকারটা ঠিক ক'রে দিই?

সব আমি ক'রে নেব এখন, তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

ইন্দু কোন উত্তর না দিয়ে আলু কপি আর বিলিতী বেগুনগুলো প্লেটে সাজিয়ে রাখতে লাগল। সোম-শুভ্র ক্ষণকাল ইন্দুর গম্ভীর মুখের পানে চেয়ে থেকে যেন তার আবদার রক্ষা করছেন, এই ভাবে বললেন, আচ্ছা, বেশ, তুমিই কর আজ সব। কুকারের বাটিগুলো গরম জলে ধুয়ে নাও একবার তা হ'লে। আমার বেতের বাক্সটাতে জল মাপবার ছোট মগটা আছে। ঠিক এক মগ জল লাগবে ঝরঝরে ভাত হতে। ডালে এক মগের কম দিলেও চলবে, পাতলা ডাল পছন্দ নয় আমার। হাসলেন একটু। ইন্দুর মুখেও সামান্য একটু হাসির আভাস ফুটে উঠল। সে কুকারটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। সোম-শুভ্র পালংশাক কাটা শেষ ক'রে চাল বাছতে লাগলেন।

যৌবনকালে সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন ব'লেই নয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেছিলেন ব'লে বাধ্য হয়ে স্বাবলম্বী হতে হয়েছে তাঁকে। সেকালে ব্রাহ্মরা

গোঁড়া হিন্দুদের কাছে প্রায় অস্পৃশ্যই ছিলেন। পরিচয় জানতে পারলে হিন্দু রাঁধুনী পর্য্যন্ত থাকতে চাইত না। সোম-শুভ্র কখনও কারও কাছে নিজের পরিচয় গোপন করেন নি। ব্রাহ্মদের কাছে গিয়ে সহানুভূতি আকর্ষণ করতেও তাঁর আত্মসম্মানে বেধেছিল; অপরিচ্ছন্ন চাকরের হাতে খেতে তাঁর চিরকালই অপ্রবৃত্তি, সুতরাং স্বপাক আহারেই অভ্যস্ত হতে হয়েছে তাঁকে। প্রথম প্রথম কষ্ট হয়েছিল, এখন কিন্তু এমন হয়েছে যে, অপরে রেঁধে দিলে তৃপ্তিই হয় না। সুরেশ্বরদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অনেক পরে হয়েছিল; ইকমিক কুকারও অনেক পরের কথা। সে যুগে সনাতন প্রথাতেই পিতলের ঘোকনোতে ভাতে-ভাত ফুটিয়ে খেতেন তিনি। নিজে হাতে রেঁধে খেতে হ'ত ব'লে তরকারি খাওয়ার অভ্যাসটা প্রায় নেই বললেই হয়,—তরি-তরকারি যা খান, তা হয় কাঁচা, না হয় সিদ্ধ। শরীরের জন্যে আর যা দরকার, তা পূরণ করেন দুধ দিয়ে। চাষবাস নিয়েই ছিলেন, সুতরাং গরুর অভাব হয় নি কখনও। তারপর অনেকের সঙ্গেই আলাপ হয়েছে—বিহার-অঞ্চলে নিজের আস্তানাই গ'ড়ে উঠেছে একটা—বন্ধুবান্ধবেরও অভাব হয় নি পরে—সুরেশ্বরদের সঙ্গে তো ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতাই হয়েছিল—ইচ্ছে করলে অন্যভাবেও তিনি আহারের ব্যবস্থা করতে পারতেন, কিন্তু স্বপাক ত্যাগ করেন নি তিনি। যে স্বাধীন মনোভাব তাঁকে ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রহণে প্ররোচিত করেছিল, সেই স্বাধীন মনোভাব তিনি বরাবর বজায় রেখেছেন। কখনও কোনও কারণে কারও অধীনতা স্বীকার করেন নি। বাল্যকালে হংস-শুভ্রের সঙ্গে বিলাসের কোলেই লালিত-পালিত হয়েছিলেন, কিন্তু স্বেচ্ছাবৃত আদর্শের জন্য অশেষ প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়েছে তাঁকে জীবনে। সে আদর্শ স্বাধীনতারই আদর্শ। বিদেশী রাজা আমাদের দেশ দখল করেছে ব'লে প্রাণ-মনও তাদের পায়ে সঁপে দিতে হবে, এই হীন মনোবৃত্তির বিরুদ্ধেই তাঁর বিদ্রোহ। ইংরেজী শিক্ষায় প্রথম যুগের হিড়িকে সবাই যখন সাহেবদের নকল করতে ব্যস্ত, তখন তাঁর সবচেয়ে শ্রদ্ধা হয়েছিল সেই মহাপুরুষটির প্রতি, যিনি সে যুগে মিশনারিদের বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন, হিব্রু আর গ্রীক অধ্যয়ন ক'রে প্রচলিত বাইবেলের ভুল-ভ্রান্তি প্রমাণ করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন, শাস্ত্র ঘেঁটে হিন্দুধর্ম্মের কীর্ত্তিকলাপ প্রচার করেছিলেন, পৌত্তলিকতাই যে হিন্দু-ধর্ম্মের শেষ কথা নয়, তা উচ্চকণ্ঠেই ঘোষণা করবার মত শক্তি সংগ্রহ করতে

পেয়েছিলেন। রামমোহনের মনীষাই নয়, তাঁর নির্ভীকতা, তাঁর আত্মসম্মান-বোধ বেশি মুগ্ধ করেছিল সোম-শুভ্রকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও কম মুগ্ধ করেন নি। সে যুগে সকলেই যখন বিলাসের তীব্র স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, তখন ওই ধনীর দুলালের সত্য-অনুসন্ধিৎসা, বিষয়ে বীতরাগ, পাশ্চাত্য সভ্যতার জারক প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার প্রয়াস সত্যই বিস্ময়কর মনে হয়েছিল। মহর্ষি নিজেই যে স্বাধীনচিত্ত ছিলেন তা নয়, অপরের স্বাধীনতার ওপর তিনি জোর ক'রে কখনও হস্তক্ষেপ করতে চাইতেন না। তাই তাঁর প্রিয় শিষ্য কেশবচন্দ্রের সঙ্গে যখন মতবিরোধ হ'ল, তখন নিজের মতে নিজের পথেই চলতে দিলেন তিনি তাঁকে। নিজেরও আদর্শ পরিবর্ত্তন করলেন না, তাঁকেও পরিবর্ত্তন করবার জন্যে জবরদস্তি করলেন না। তাঁর সহধর্ম্মিণীকেও তিনি পৌত্তলিকতা থেকে জোর ক'রে বিরত করতে চেষ্টা করেন নি। তাঁর এই স্বাধীনতা-নিষ্ঠা যদিও সোম-শুভ্রের মনকে খুবই নাড়া দিয়েছিল, তবু তিনি আদি-ব্রাহ্ম-সমাজে ঢোকবার চেষ্টা করেন নি, তার কারণ, তাঁর মনে হয়েছিল, স্বাদেশিকতার ছদ্মবেশে সে সমাজে যে সনাতনী মনোবৃত্তি তখনও ওতপ্রোত হয়ে ছিল, তা ঠিক সংস্কারমুক্ত মনোবৃত্তি নয়। উপবীতধারী ব্যক্তি-মাত্রকেই ব্রাহ্মণত্বের মর্য্যাদা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। কেশব সেনের অতি-প্রগতিশীল আন্দোলনেও তাঁর চিত্ত উদ্বুদ্ধ হয় নি, তা যেন বড্ড বেশি পাশ্চাত্য-ঘেঁষা ছিল। যদিও তিনিও মিশনারিদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে বিজয়ী হয়েছিলেন, তাঁর 'সুলভ সমাচার' যদিও স্বদেশী ভাবই উদ্দীপ্ত করত তখন সকলকার মনে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি যেন যীশুখ্রীষ্টেরই ভক্ত হয়ে পড়লেন। যীশুখ্রীষ্টের ওপর কারও বিদ্বেষ ছিল না, কিন্তু দেশে তখন 'স্বদেশী' ভাব জেগেছে—বেদান্ত উপনিষদ ছেড়ে বাইবেলের ব্যাখ্যা শোনবার প্রবৃত্তি ক'মে আসছিল শিক্ষিত যুবকদের। দেশী কুসংস্কার এবং পাশ্চাত্য-বিহ্বলতা—এই উভয়েরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তাঁর। তাই হংস-শুভ্র যখন মেতেছিলেন সুরেন বাঁড়ুজ্যের দলে, সোম-শুভ্র তখন দীক্ষা নিচ্ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছে। শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছে দীক্ষা নিচ্ছিলেন ব'লে যে, মহর্ষির দলের ওপর বীতশ্রদ্ধ ছিলেন, তা মোটেই নয়। নবগোপাল মিত্রের এবং রাজনারায়ণ বসুর জাতীয়তাবোধ তখন কোন্ যুবকের প্রাণে সাড়া না জাগাত! নবগোপাল মিত্রের নামই ছিল 'ন্যাশনাল' মিত্তির।

তাঁর কাগজের নাম ছিল 'ন্যাশনাল পেপার'। তাঁর হিন্দুমেলায়, শঙ্কর ঘোষের লেনে তাঁর কুস্তির আখড়ায় সে যুগে কে না গেছে! সেই কুস্তির আখড়ায় সোম-শুভ্রও লাঠি-খেলা, ছোরা-খেলা, তরোয়াল-খেলা শিখেছিলেন একদিন। লর্ড লিটন আসবার পর অবশ্য থেমে গেল সেসব। কেশব সেনের বক্তৃতা শুনতেও সাগ্রহে যেতেন তিনি। যেতেন না কেবল 'পলিটিকাল' সভায়। সেকালের বক্তৃতা-মুখর পলিটিকাল আন্দোলনে তাঁর প্রাণ ঠিক সাড়া দিত না। তাঁর মনে হ'ত, সাহেবী পোশাক প'রে বিলিতী মদ খেয়ে সভায় সভায় সাম্য, স্বাধীনতা এবং ভ্রাতৃপ্রেমের লম্বা বক্তৃতা দিয়ে লাভ কি, যদি কার্য্যত আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সে সাম্য, স্বাধীনতা এবং ভ্রাতৃপ্রেমের মর্য্যাদা আমরা না দিতে পারি? আমাদের নিজেদেরই সমাজে যখন জাতিভেদের অসাম্য, স্ত্রীলোকদের পরদা সরিয়ে দেবার সাহস নেই, কুসংস্কারের পঙ্কে সমস্ত দেশ যখন পঙ্কিল, ভ্রাতৃবিরোধই যখন সমাজের প্রাত্যহিক ঘটনা, তখন সেখানে নিজেরা সেসব দূর করবার চেষ্টা না ক'রে বক্তৃতা করলেই কি দেশ উদ্ধার হয়ে যাবে? স্বায়ত্ত-শাসন তিনিও কাম্য মনে করতেন, কিন্তু তার চেয়েও তিনি বেশি কাম্য মনে করতেন স্বায়ত্ত-শাসনের যোগ্যতা অর্জ্জন করাকে। বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন তিনি, তাই এ কথাটা তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এড়ায় নি যে, জনসাধারণ কর্ত্তৃক জনসাধারণের হিতের জন্য যে শাসনবিধি আমরা চাইছি, তা কখনও স্থায়ী হবে না, জনসাধারণ যদি তার উপযুক্ত না হয়। নিজের চিত্ত স্বাধীন না হ'লে সত্যিকার স্বাধীনতা কে দিতে পারে? সমাজের পায়ে অসংখ্য কুসংস্কারের শৃঙ্খল আমরা নিজেরাই পরিয়ে রেখেছি, অথচ তার অগ্রগতির জন্যে প্রার্থনা জানাচ্ছি বিদেশী বড়লাটকে। এই হাস্যকর ব্যাপারে তাঁর মন কখনও সাড়া দেয় নি। তাই তিনি কংগ্রেস-সভায় বিদ্রোহমূলক বক্তৃতা করবার চেষ্টা না ক'রে সত্যি সত্যি বিদ্রোহ করেছিলেন সমাজের বিরুদ্ধে। প্রচলিত নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে তাঁর পৌরুষ যেন কৃতার্থ হয়েছিল। ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগের জন্যে তিনি ব্রাহ্ম হন নি, ব্রাহ্মধর্ম্ম সে যুগে বিদ্রোহের প্রতীক ছিল ব'লেই তিনি সে ধর্ম্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। আসলে তিনি বিদ্রোহী ছিলেন। কোন গণ্ডির সঙ্কীর্ণতার মধ্যে তিনি যে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন নি, তার প্রমাণ, ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যেও তিনি নিজেকে

সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দেন নি। সে সমাজেরও নানা কুসংস্কার নানা গোঁড়ামি তাঁর মনকে পীড়িত করত। শেষকালে সবচেয়ে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল অধিকাংশ ব্রাহ্মদের 'হামবড়া' ভাব। মুখে যদিও সকলে বিনয়ের অবতার ছিলেন, কিন্তু আচারে-ব্যবহারে কথায়-বার্ত্তায় তাঁরা এমন ভাব প্রকাশ করতেন অব্রাহ্ম হিন্দুদের সম্পর্কে যে, সোম-শুভ্রের লজ্জা করত। কারও সঙ্গে খাপ খায় নি ব'লেই তিনি পালিয়েছিলেন বাংলা দেশ ছেড়ে বেহারের দেহাতে, এবং সেখানেই স্কুল ক'রে হাসপাতাল ক'রে নিজের আদর্শ জীবন যাপন করবার চেষ্টা করেছিলেন এতকাল। এক সময়ে তিনি ভেবেছিলেন যে, বেহার অঞ্চলে অনেকখানি জমি কিনে নির্য্যাতিত ব্রাহ্মদের জন্যে একটা উপনিবেশ স্থাপন করবেন, অনেকেই তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করার জন্যে নির্য্যাতিত হতেন। অনেককে সাহায্য করতেন তিনি। ভেবে-চিন্তে উপনিবেশ স্থাপন করবার বাসনা ত্যাগ করেছিলেন তিনি শেষকালে। ভেবে দেখলেন, এতে লাভের চেয়ে লোকসানই বেশি হওয়া সম্ভব। বহু-সম্প্রদায়-বিভক্ত এই দেশে আর একটা সম্প্রদায় বাড়ালে বিরোধের আর একটা বীজ বপন করা হবে মাত্র। এটা তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এড়ায় নি যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই একটা প্রত্যঙ্গ—ওটাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে পৃথক করবার চেষ্টা করা অনুচিত। ওর যেটুকু ধর্ম্ম সেটুকু সনাতন হিন্দুশাস্ত্র থেকেই নেওয়া, আর ওর যেটুকু ঢং সেটুকু বিদেশী জিনিস। উপনিবেশ স্থাপন করলে অনিবার্য্যভাবে সেই ঢংটুকুকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে। নিছক ধর্ম্মচর্চ্চার জন্যে আলাদা উপনিবেশ স্থাপন করবার প্রয়োজন নেই। সমাজ-সংস্কার করতে গেলে সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবার চেষ্টা করাই ভাল, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে পর হয়ে যেতে হয়, তাতে লাভ হয় না, লোকসান হয়। তা ছাড়া আর একটা কথাও মনে হয়েছিল তাঁর। ধর্ম্মের জন্যে, আদর্শের জন্যে কষ্টস্বীকার না করলে ঠিক যেন মূল্য দেওয়া হয় না তার। সুতরাং উৎসাহী ব্রাহ্ম-হিতৈষী হিসাবে ব্রাহ্ম-সমাজে তাঁর খুব খাতির ছিল না। বন্ধু সুরেশ্বর ছাড়া আর কারও সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠও ছিলেন না তিনি। বেহারের যে অংশে তিনি জমি কিনেছিলেন, তা নেহাতই দেহাত—রেল-স্টেশন থেকে কুড়ি মাইল দূরে—মেশবার মত বাঙালীও কাছে-পিঠে ছিল না বড় একটা। বেহারী জনমজুর, বেহারী চাকর-গোমস্তা, স্কুল, হাসপাতাল আর চাষবাস নিয়েই থাকতেন তিনি। বই প'ড়ে

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় দক্ষতা লাভ করেছিলেন। বাংলা দেশের সঙ্গে যোগ ছিল বাংলা সাহিত্যের মারফত। বাংলা ভাষার প্রত্যেক লেখককে তিনি চিনতেন। সাহিত্য ছাড়া তাঁর আর একটি শখ ছিল, তা বাগানের—শুধু ফলের নয়, ফুলেরও। প্রকৃতির কোলেই কেটেছে সারাটা জীবন। তাই কোন বিষয়ের কোন গোঁড়ামিই তাঁর মনকে আবিল ক'রে তোলে নি। তিনি মনের শুভ্রতা সত্যিই বজায় রাখতে পেরেছিলেন। বিবাহ করেন নি, কোন স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আসেন নি, মিথ্যা কথা বলেন নি, হীন কাজ করেন নি কখনও কোনও রকম। তাঁর মনের আর একটা অবলম্বন ছিল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা। কলেজ-জীবনে আর্টের চেয়ে বিজ্ঞানের প্রতিই বেশি ঝোঁক ছিল তাঁর, বিশেষ ক'রে উদ্ভিদ-বিদ্যার প্রতি। উদ্ভিদ-জীবনের গহন রহস্যে নানা তত্ত্ব অনুসন্ধান ক'রে দিনের পর দিন তিনি কাটিয়েছেন। যশোলিপ্সা থাকলে তাঁর ওই সব অপূর্ব্ব, অদ্ভুত এবং অনেক সময় আজগুবি গবেষণা ছাপিয়ে তিনি নাম করতে পারতেন, কিন্তু সেসব দিকে লক্ষ্য ছিল না তাঁর। সত্যকে সন্ধান করবার যে আনন্দ, সেই আনন্দেই মশগুল থাকতেন, সেসব লিপিবদ্ধ ক'রে কাজে লাগাবার খেয়াল কখনও হয় নি। এমনও হয়েছে যে, তাঁর কল্পনা, তাঁর গবেষণা অনেক পরে অন্য বৈজ্ঞানিকের যশের কারণ হয়েছে, কিন্তু সেজন্য কখনও ক্ষুব্ধ হন নি তিনি, আনন্দিতই হয়েছেন। গাছেরও যে অনুভূতি আছে—এ কথা জগদীশচন্দ্রের বহুপূর্ব্বে তাঁর মাথায় এসেছিল। জগদীশচন্দ্র, ঠিক তাঁর সহপাঠী না হ'লেও, সমসাময়িক ছিলেন। তিনি যখন উদ্ভিদের অনুভূতি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখলেন, তখন সোম-শুভ্র নিজের কল্পনাকে একজন বৈজ্ঞানিকের গবেষণায় মূর্ত্ত দেখে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। গাছের অনুভূতিই নয়, গাছ বিষয়ে নানা উদ্ভট কল্পনা আছে তাঁর। তাঁর ধারণা, পশুপক্ষীরাই শুধু যে মানুষের অনুরাগ-বিরাগ বুঝতে পারে তা নয়, গাছেরাও পারে। গাছকে ভালবাসলে সে হৃষ্ট হয়, ঘৃণা করলে ক্লিষ্ট হয়। বায়লজিস্টরা গাছকে জীব-জগতের নিম্নতম স্তরে স্থান দিয়েছেন গাছের পূর্ণ পরিচয় এখনও ঠিকমত পান নি ব'লে। ঘোড়ার শরীরে ডিপ্‌থিরিয়া এবং টেটানাস ঢুকিয়ে যখন প্রতিষেধক অ্যান্টিটক্‌সিন তৈরি করা সম্ভব হ'ল, তখন সোম-শুভ্রের মনে হ'ল, গাছের শরীরেও যদি প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায়, তা হ'লে গাছও হয়তো প্রতিষেধক

কোনও ঔষধ প্রস্তুত করতে পারে। যে গাছ জীব-জগতের এত আহার এবং ঔষধ যোগাচ্ছে, তার পক্ষে এও অসম্ভব না হতে পারে। এই সব নিয়ে তাঁর কল্পনা-বিলাসের অন্ত নেই। এই সম্পর্কেই বিশেষ ক'রে তিনি এবার কলকাতায় এসেছেন।

হংস-শুভ্র এসে প্রবেশ করলেন। উঠে দাঁড়ালেন সোম-শুভ্র।

ব'স ব'স। একটা কথা জানতে এলাম। শঙ্খর ছেলের অন্নপ্রাশনের খবর পেয়েছ তুমি?

হ্যাঁ, দু তরফ থেকেই পেয়েছি। শঙ্খর শ্বশুরবাড়ি থেকেও নিমন্ত্রণ করেছেন আমাকে। আগামী রবিবারে তো?

রবিবারে হবে না। ছুটির দিন দেখে অন্নপ্রাশন হয় না, শুভদিন দেখে হয়। পরের সপ্তাহে বৃহস্পতিবার ভাল দিন আছে, সেই দিনই ঠিক করছি। তুমি থাকতে পারবে তো? প্রায় দিন দশেক পেছিয়ে গেল।

পারব।

তা হ'লে তো ভালই হ'ল, তোমার জন্যেই আমার ভাবনা হচ্ছিল। মৃগাঙ্ককেও চিঠি লিখে দিই তা হ'লে, তার এখন বম্বে যাওয়ার দরকার নেই। কংগ্রেসের একটা মীটিঙে ও না গেলে দেশোদ্ধার আটকে থাকবে না। সবাই দেশোদ্ধার করতেই মত্ত—নিজেকে উদ্ধার করা যে আগে দরকার, তা কেউ বুঝবে না।

হীরক এবং রজতের মুখ তাঁর মনে পড়ল। তাঁর এই পৌত্র দুটির জন্য দুশ্চিন্তার অন্ত নেই তাঁর। ভেবে ভেবে কোন কূল-কিনারা না পেয়ে আজকাল ভাবাই ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। হীরক জেলে.; রজতের পেছনে নাকি এখনও পুলিস ঘুরছে, এত খরচ করা সত্ত্বেও। রজতের সম্বন্ধে একটা যা ভরসার কথা, ছোকরা প্রেমে প'ড়ে বিয়ে করেছে। মেয়েটাও নেহাত তুচ্ছ করবার মত নয়, কালো চোখের চাউনিতে আলো আছে। কাজলের ঢলঢলে মুখখানা মনে পড়ল। মুখে যদিও কিছু বলেন নি তিনি, কিন্তু এক নজর দেখেই এই নাত-বউটিকে ভারী পছন্দ হয়েছিল তাঁর। রজত কি একে ফেলে পালাতে পারবে? কিন্তু রজত সব পারে। একটুও মুখবিকৃতি না ক'রে কুইনিন-মিক্শ্চার খেয়ে বাজি জিতেছিল একদিন ছেলেবেলায়। ট্রেন ফেল ক'রে তুমুল বৃষ্টিতে হেঁটে এসেছিল কেবল কথা রাখবার জন্যে।

সব পারে। আজকালকার এই ডাকাত ছেলেগুলোর অসাধ্য কিছু নেই। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন তিনি। হঠাৎ মনে হ'ল, এর আগে এ দেশে এ রকম ছেলে ছিল কি? ক্ষুদিরাম? কানাইলাল?—বারীনের নামটা মনে পড়তেই মনটা খিঁচড়ে গেল হঠাৎ। না—না…হঠাৎ নজরে পড়ল, সোম-শুভ্র তাঁর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন।

আশ্বস্ত হয়ে বললেন, ও, আচ্ছা, তুমি থাকছ তা হ'লে। দেখ, ভাবছি, এই বোধ হয় আমার জীবনের শেষ কাজ, একটু ভাল ক'রেই করব। কাশী থেকে ভাল পুরোহিত আনিয়ে রীতিমত যজ্ঞ ক'রে, বুঝলে—

উৎসাহভরে আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ দেখতে পেলেন, সোম-শুভ্র চাল বাছছেন—ইতিপূর্ব্বে আরও দু-একবার দেখেছেন, তবু মেজাজটা বিগড়ে গেল নতুন ক'রে। গমনোদ্যত হয়ে বললেন, আচ্ছা, বিকেলে সব কথা হবে এখন।

বিকেলে আমি কলকাতা যাব ভাবছি।

ও, আচ্ছা।

একটু দ্রুতপদেই বেরিয়ে গেলেন তিনি।

সোম-শুভ্র প্রশান্তভাবে চাল বাছতে লাগলেন। মিনিট দুই পরে একটা কাচের কুঁজো হাতে ক'রে তারাপদ প্রবেশ করলে।

এই দেখ, তোমার মনোমত হয়েছে কি না। তিন বার ধুয়েছি।

কুঁজোটা তুলে ধরলে। সোম-শুভ্র ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে দেখলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন, এখনও ময়লা ভাসছে। থাক, রেখে দাও তুমি, আমি নেব ঠিক ক'রে এখন।

কোথা ময়লা, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না বাপু!

আবার বেরিয়ে গেল তারাপদ। একটু পরেই আবার জল-ভরতি কুঁজো নিয়ে ঢুকল।

নাও, দেখ।

সোম-শুভ্র দেখে বললেন, রেখে দাও। তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন, রেখে দাও না, আমি সব ঠিক ক'রে নেব।

তা তো নেবে। কিন্তু ওদিকে বড় কর্ত্তা যদি টের পায় যে, তুমি নিজে সব ঠিক ক'রে নিচ্ছ, তা হ'লে আর আস্ত রাখবে না আমাদের কাউকে।

তোমাদের বংশে রাগটি তো কারও কম নয়, নেপালী চাকরটাকে এমন খড়ম ছুঁড়ে মারলে সেদিন যে—

তারাপদ!

হংস-শুভ্রের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

ওই শোন। এখন কলকাতা ছুটতে হবে আমাকে। অন্নপ্রাশনের তারিখ-ফারিখ সব উল্টে দিয়ে ব'সে আছে। যজ্ঞ হবে। বাণীকণ্ঠকে তার করা হয়ে গেছে।

বাণীকণ্ঠ কে?

এ বাড়ির তোমরা কেউ চেন না তাকে। ওর এক ক্লাসের ইয়ার ছিল আগ্রায়। চমৎকার সারেঙ্গ বাজায়, এই তার গুণ।

তারাপদ!

উচ্চতর গ্রামে হংস-শুভ্রের ডাক শোনা গেল আবার।

আমি যাই। ইন্দু রইল, সে সব ঠিক ক'রে দেবে।

তারাপদ!

তারাপদ চ'লে গেল। কুকারের বাটিগুলি গরম জলে সাবান দিয়ে ধুয়ে একটা ফরসা তোয়ালে দিয়ে মুছতে মুছতে ইন্দু প্রবেশ করলে একটু পরে।

চালগুলো ধুয়ে আনি?

আন, ছাড়বে না যখন।

ইন্দু নিখুঁত নিপুণতা সহকারে বাছা চালগুলি গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

সোম-শুভ্র ডালে মন দিলেন।

খ

সোম-শুভ্র কলকাতায় এলে পরমানন্দের বাসাতেই ওঠেন। শশাঙ্কের বাসায় উঠতে কেমন যেন সঙ্কোচ হয় তাঁর। বাসন্তী এ নিয়ে অনেক অনুযোগ করেছে, কিন্তু তবু তিনি ওঠেন নি। শঙ্খ রজত হীরক—এদের কাউকে তিনি চেনেন না। শশাঙ্ককে চেনেন, কিন্তু— এই 'কিন্তু'টা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারেন নি তিনি। অন্নপ্রাশনের দিনে যেতে হবেই, ভিড়ে গোলমালে কেটে যাবে কোন প্রকারে, এই ভরসা।

পরমানন্দ এবং অনামিকাকে আগে থাকতেই খবর দিয়েছিলেন। খবর না দিয়ে কোথাও যান না তিনি। পরমানন্দ এবং অনামিকা বিকেলে বেরিয়ে

পড়ে সাধারণত। কোন মহদুদ্দেশ্যে নয়, আড্ডা দিতে যায়। পরমানন্দ যায় নবকুমারের বাড়িতে, অনামিকা ইলার। পরমানন্দের চাকরি হয়েছে, নবকুমারের হয় নি। নবকুমার 'অধরা' নামক মাসিক-পত্রিকার অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক। অনামিকার বিয়ে হয়েছে, ইলার হয় নি। ইলাও বিনা বেতনে শিক্ষয়িত্রীগিরি করেন সদ্য-স্থাপিত একটি বালিকা-বিদ্যালয়ে। পরমানন্দ নবকুমার শুধু যে এক জাতের লোক তা নয়, এক ধাতেরও। দুজনেই নোট-বই মুখস্থ ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অর্জ্জন করেছে, ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণও করেছে, কিন্তু একজনও ঠিক ব্রাহ্মণ-প্রকৃতির নয়। সুলভ সংস্করণের নানা পুস্তকের দৌলতে দুজনেই—বিশেষ ক'রে নবকুমার—আধুনিক জগতের অনেক সংবাদ রাখে। ফড়ফড় ক'রে অনেক কিছু আউড়ে তাক লাগিয়ে দিতে পারে সাধারণ যে কোন লোককে। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির বুঝতে কষ্ট হয় না যে, ওরা ঠিক 'ব্রাহ্মণ' নয়, এমন কি শিক্ষিতও নয়। ওরা ভারবাহী মাত্র। ওরা নানা বই থেকে নানা সংবাদ সংগ্রহ ক'রে চতুর্দ্দিকে আস্ফালন ক'রে বেড়ায় নিজেদের জাহির করবার জন্যে এবং সেটাও নিতান্ত বস্তুতান্ত্রিক উদ্দেশ্যে। শিক্ষাটা মনে প্রবেশ করলে যে সঙ্কোচ, যে দ্বিধা, যে বিনয় আত্মপ্রচারে বাধা সৃষ্টি করে, তা এদের নেই, এবং নেই ব'লেই যেন এরা গর্ব্বিত। অনামিকা ইলারও সেই দশা। লোক-দেখানো শিক্ষা পেয়েছে, কিন্তু শিক্ষিত হয় নি। মনোজগতের নয়, বস্তুজগতের সুখ-সুবিধা আহরণের জন্যেই ছটফট ক'রে বেড়াচ্ছে সর্ব্বদা নানা ভাবে নিজেদের ঢাক পিটিয়ে।

তবু সোম-শুভ্র এদের কাছেই আলোচনা করবেন ঠিক করেছিলেন। যদিও তিনি পরমানন্দকে মানুষ করেছেন এবং নিজে পছন্দ ক'রেই অনামিকার সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছেন, তবু এদের যে তিনি ঠিক চেনেন না, তা তিনি নিজেও বুঝতেন। আজকাল কোন ছেলেকে 'মানুষ' করা মানে, তার জন্যে মাসে মাসে নিয়মিতভাবে কিছু অর্থ ব্যয় করা। সে সত্যিই মানুষ হচ্ছে কি না, তা নির্দ্ধারণ করা সত্যিই প্রায় অসম্ভব। পছন্দ ক'রে বিয়ে দেওয়াটাও অনেকটা ওই জাতীয় অসম্ভব ব্যাপার। যে মেয়েটিকে পছন্দ করা যায়, সে সত্যিই পছন্দসই কি না, তা এক নজর দেখে বা সামান্য একটু-আধটু খবর নিয়ে বোঝা শক্ত। এসব জানা সত্ত্বেও সোম-শুভ্র এদের কাছেই নিজের

বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে আলোচনা করবেন ঠিক করলেন, তার কারণ, যৌবনের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস। তিনি বিশ্বাস করতেন, অসম্ভব এবং আজগুবি কল্পনা পরিহাসের পরিবর্তে স্বপ্ন উদ্রিক্ত করতে পারে কেবল যৌবনের মনেই। যৌবনের প্রতি তাঁর এই আস্থার গভীরতা এত অধিক ছিল যে, আধুনিক ছেলে-মেয়েদের চপলতা, বিলাসপ্রবণতা, উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি বেচালকেও তিনি সহ্য করতেন। মনে করতেন, প্রাণের জীবন্ত প্রবাহ স্বাভাবিক নিয়মেই মানুষের তৈরি কৃত্রিম গণ্ডি অতিক্রম ক'রে যায় মাঝে মাঝে। চিরকালই যায়। ও নিয়ে বেশি বিচলিত হয় তারাই, যারা সত্যকে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতে পারে না। তবে এটাও ঠিক যে, তিনি বেচাল পছন্দ করতেন না, সভ্যসমাজের রীতিনীতি মেনে চলাটাই ভাল লাগত তাঁর, নিজেও মেনে চলতেন। জীবন্ত প্রাণের আবেগকে স্বীকার করতেন ব'লেই তার দুর্দ্দমনীয়তাকেও মানতেন। এই আবেগকে শুধু যে মানতেন তা নয়, এর প্রতি শ্রদ্ধা ছিল তাঁর।

জীবনের ছিয়াত্তর বছর যখন পূর্ণ হ'ল, এবং হঠাৎ যখন তাঁর পুরাতন ভৃত্য ঝকরু সন্ন্যাস-রোগে মারা গেল এক ঘণ্টার মধ্যে, তখন তাঁর মনে হ'ল, জমা-খরচ মিলিয়ে জীবনের হিসাব-নিকাশ এবার ঠিক ক'রে ফেলা উচিত। যে কোন মুহূর্ত্তে তাঁরও মৃত্যু হতে পারে। বিবাহ করেন নি, উত্তরাধিকারী কেউ নেই। দশ লক্ষ টাকার যে পৈত্রিক সম্পত্তি তিনি পেয়েছিলেন, তা থেকে কিছুই তিনি প্রায় খরচ করেন নি। হাজার দশেক টাকা খরচ ক'রে জীবনের প্রথম ভাগে তিনি সস্তায় যে দুশো বিঘে জমি কিনেছিলেন, তা থেকে শুধু তাঁর ভরণ-পোষণ নয়, অনেক উদ্বৃত্তও হয়েছে। স্কুল এবং হাসপাতাল চালাতে কিছু খরচ হয়েছে অবশ্য, বন্ধুবান্ধবরাও মাঝে মাঝে নিয়েছেন কিছু, শশাঙ্ককে কিছু দিয়েছিলেন একবার, পরমানন্দর জন্যেও কিছু গেছে, কিন্তু তবু এখনও সবসুদ্ধ ত্রিশ লক্ষ টাকা তাঁর ব্যাঙ্কে জমা আছে। এ টাকাটার একটা সুব্যবস্থা করা দরকার। এ ছাড়া তাঁর যেসব গবেষণামূলক অদ্ভুত কল্পনা আছে, সেগুলোকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মূর্ত্তি দেবার চেষ্টা করাও উচিত—সম্ভব হ'লে যন্ত্র-সহযোগে সেসবের যাথার্থ্যও প্রমাণ করতে হবে। এই সম্পর্কে তাই তিনি পরমানন্দ এবং অনামিকাকে চিঠি লিখেছিলেন যে, তারা যেন তাদের দু-একজন বৈজ্ঞানিক বন্ধুকে নিমন্ত্রণ ক'রে আনে

বুধবার সন্ধ্যায়, সেই দিন তিনি কলকাতায় পৌঁছবেন এবং তাদের সঙ্গে বিজ্ঞান বিষয়ে দু-একটা আলোচনা করবেন। পরমানন্দ অনামিকা তাই সেদিন আড্ডা দিতে না গিয়ে নবকুমার ইলাকেই নিমন্ত্রণ করেছিল নিজেদের বাড়িতে। নবকুমার কাগজের সম্পাদক, সবজান্তা, সবাইকে ডাক লাগিয়ে কথা বলে। ইলা বি. এস-সি. পড়েছিল, তারও বৈজ্ঞানিক হতে বাধা নেই।

সোম-শুভ্র ঠিক সময়ে এসে পৌঁছলেন এবং পরমানন্দ, অনামিকা, নবকুমার, ইলার সম্মুখে এমন স-সঙ্কোচে তাঁর বৈজ্ঞানিক নিবন্ধটি পাঠ করলেন যে, যেন তিনি বিশ্ববিখ্যাত কোন বিদ্বন্মণ্ডলীর সম্মুখে কতকগুলি হাস্যকর উদ্ভটতার অবতারণা ক'রে ধৃষ্টতা প্রকাশ করছেন।

ক্রমশ

"বনফুল"

গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টর

কানাইবাবুর হোটেলের ছোট একটি ঘর। ঘরের মধ্যে তক্তাপোশ, টেবিল, আলনায় কোট প্যাণ্টলুন; ট্রাঙ্ক; টেবিলের উপর চায়ের সরঞ্জাম। মুকুন্দ অর্থাৎ অনঙ্গমোহনের ভৃত্য মনিবের বিছানায় শুইয়া গড়াইতেছে আর নিজের মনে বকিতেছে

মুকুন্দ। ওরে বাবা! খিদের যে এমন তেজ তা আগে টের পাই নি, পেটের মধ্যে যেন রুশ-জার্মানের লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে।...দু মাস হ'ল কলকাতা ছেড়েছি, বাবু যাবেন বাড়ি—এতদিনে পৃথিবী ঘুরে আসা যায়! কোথায় গেল সব টাকাকড়ি, এখন এই পচা শহরে খিদের জ্বালায় ভুগে মরি। কেন বাপু, নিজের আয় বুঝে ব্যয় করলেই হয়! তা হবে না। নিজে যে মস্ত জমিদার, তা প্রমাণ করা চাই। মাইনের টাকাগুলো কলকাতাতেই শেষ। বুড়ো কর্তা টাকা পাঠালে, তবে বাবু রওনা হলেন। মাঝখানে মাথায় যে কি চাপল, নেমে পড়লেন দিনাজশাহী শহরে। উঃ-হু-হু, পেটের মধ্যে সত্যি রুশ-জার্মানের লড়াই বেধে গিয়েছে। টাকাগুলো বাবুগিরি ক'রে, জুয়ো খেলে উড়িয়ে দিয়ে এখন মুখটি চুন। কিন্তু চাল খাটো হবে না। [তাহার মনিবের বাচন-ভঙ্গীতে] মুকুন্দ,

যাও, হোটেলে গিয়ে সবচেয়ে ভাল ঘরটা রিজার্ভ কর। সবচেয়ে ভাল খানা চাই। যেন কোন নবাব-পুত্তুর আর কি! এদিকে তো কেরানী-গিরি ক'রে কলম ক্ষ'য়ে গেল। নাঃ বাপু, কলকাতার চাকরি এবার ছেড়ে দেব, এর চেয়ে পাড়াগাঁয়ে বেশ আরামে থাকা যায়। ভাবনা নেই, চিন্তা নেই; পছন্দমত একটা বিয়ে ক'রে ফেল, বউটা সব কাজ করবে, আর আরামে পায়ের ওপর পা দিয়ে—বাঃ, কি সুখের জীবন!

কিন্তু যাই বল, টাকা থাকলে কলকাতার মত আরামের জায়গা আর নেই। একখানা ফরসা ধুতি-চাদর হ'লেই সবাই 'বাবু' বলে, 'মশাই' বলে। গাড়োয়ান, রিক্‌শওয়ালা সবাই 'আসুন' বলবে। ট্রামে বড় বড় সাহেবদের সঙ্গে একসঙ্গে ব'সে চ'লে যাও। তোফা! তোফা! সাহেবী দোকানে ঢুকে পড়, কেনো, নাই কেনো, মেমসাহেবরা এসে বলবে 'সার'! নাঃ, আমাদের বাঙালী দোকানগুলো কিছু নয়।

অনেকক্ষণ পথে চ'লে কষ্ট হ'লে ট্রাম আছে, বাস আছে। না হয় ট্যাক্সি নাও। ভাড়া না থাকে তো তাতেই বা কি! এই ড্রাইভার, ঠায়রো, হামারা দোস্তকা কোঠি হ্যায়।—ব'লে এক বাড়ির সামনে নেমে পড়, আর পেছনের দরজা দিয়ে স'রে পড়। হাঃ-হাঃ, এইজন্যেই বড়লোকের বাড়ির দুটো দরজা। খাদ্যি-খানাও চমৎকার। কিন্তু টাকা ফুরিয়ে গেলেই বিপদ, এখন যেমন উপস্থিত। বুড়ো কর্ত্তা টাকা পাঠাচ্ছেনই, কিন্তু বুঝে-সুঝে খরচ করলে তো আর লোকে নবাব বলবে না! ট্যাক্সি ছাড়া বাবু চলবেন না, প্রত্যেক দিন সিনেমা দেখা চাই। তার পরদিন বলবেন, মুকুন্দ, দেখ তো কোটটা বেচে কিছু পাওয়া যায় কি না! আড়াইশো টাকার কোটে পঁচিশ টাকাও ওঠে না।...কেন বাপু, এত নবাবি না ক'রে আর দশজনের মত আপিসে গিয়ে খাটলেই হয়!...বুড়ো কর্ত্তা একবার জানতে পারলে জল-বিছুটির ব্যবস্থা করবে। কি মুশকিলেই পড়া গেছে! হোটেলওয়ালা জবাব দিয়েছে, সমস্ত দাম মিটিয়ে না দিলে আর এক পয়সার জিনিসও দেবে না। উঃ, পেটের মধ্যে কি লড়াইটাই না হচ্ছে! এক মুঠো ভাত পেলেও...ইস্, কি খিদেই না পেয়েছে! মনে হচ্ছে, এক গ্রাসে পৃথিবীটা খেয়ে ফেলতে পারি। কে? [দরজায় ধাক্কা] বাবু নিশ্চয়। [তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল]

(অনঙ্গমোহনের প্রবেশ)

অনঙ্গমোহন। এই নাও। [টুপি ও ছড়ি মুকুন্দর হাতে দিল] আবার তুমি আমার বিছানায় গড়াচ্ছিলে ?

মুকুন্দ। তোমার বিছানায় শুতে যাব কেন ?

অনঙ্গমোহন। বটে! আবার মিথ্যে কথা! বিছানা এলোমেলো হ'ল কেন ?

মুকুন্দ। বিছানায় আমার কি দরকার ? আমার পা নেই ? আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোতে পারি।

অনঙ্গমোহন। [পায়চারি করিতে করিতে] যাক, দেখ তো কৌটোয় সিগারেট আছে কি না!

মুকুন্দ। সিগারেট কোত্থেকে আসবে ? চার দিন হ'ল ফুরিয়ে গিয়েছে।

অনঙ্গমোহন। [পায়চারি করিতে করিতে গম্ভীরভাবে] দেখ মুকুন্দ।

মুকুন্দ। আজ্ঞে ?

অনঙ্গমোহন। [স্বর আগের চেয়ে কম গম্ভীর] একবার ওখানে যাও তো।

মুকুন্দ। কোথায় ?

অনঙ্গমোহন। [স্বর আর গম্ভীর নয়; যেন অনুনয়ে পূর্ণ] নীচে, রান্নাঘরে, ওদের বল, আমাকে খাবার পাঠিয়ে দিক।

মুকুন্দ। আমি তা পারব না।

অনঙ্গমোহন। পারবে না ? এত বড় আস্পর্দ্ধা!

মুকুন্দ। কিছুতেই আর কিছু হবে না। হোটেলওয়ালা বলেছে, আর তোমাকে বিনা পয়সায় কিছু দেবে না।

অনঙ্গমোহন। এতখানি তার সাহস! আর কি করবে শুনি ?

মুকুন্দ। সে বলছে, এবার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে গিয়ে নালিশ করবে। সে বলে, তোমার বাবু আজ তিন সপ্তাহের মধ্যে একটি পয়সা দেয় নি। তোমরা ঠগ। তোমার বাবু জোচ্চোর। সে বলে, এ রকম ঠগ আগেও অনেকবার দেখেছি।

অনঙ্গমোহন। আর তোমার এত আস্পর্দ্ধা, সেই সব কথা আমার কাছে বলছ!

মুকুন্দ। হোটেলওয়ালা বলে, এই রকম লোক আসতে আরম্ভ করলে দু মাসের মধ্যেই আমাকে লালবাতি জ্বালতে হবে। না, এবার আর

আমি ছাড়ছি না, আমি আজই তাকে থানায় নিয়ে যাচ্ছি, এর পরে যাতে শ্রীঘর যেতে হয় তার ব্যবস্থা করব।

অনঙ্গমোহন। থাক থাক। অনেক হয়েছে। এবার গিয়ে তাকে খানা পাঠিয়ে দিত বল।

মুকুন্দ। তার চেয়ে আমি তাকেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

অনঙ্গমোহন। তাকে দিয়ে আমার কি দরকার? আমার দরকার তার খাবারগুলো।··আচ্ছা, তাকেই ডেকে নিয়ে এস।

মুকুন্দর প্রস্থান

উঃ, কি খিদেই না পেয়েছে! একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, খিদে দমন হয় কি না! চারগুণ আর বেড়ে উঠল। নাঃ, নৈহাটিতে সাত দিন কাটিয়ে কি ভুলই না করেছি! ওখানে জুয়াড়ীদের পাল্লায় না পড়লে আজ অনেক টাকা থাকত। আর এ কি পচা শহর, বাপ্‌স্! কেউ ধারে এক পয়সার জিনিস দিতে চায় না, প্রগতি ব'লে এখানে কিছু নেই দেখছি।

('মেবার পাহাড়', 'যমুনে তুমি কি সেই যমুনে!' প্রভৃতি সুর শিস দিয়া পায়চারি করিতে লাগিল)

(মুকুন্দ ও হোটেলের একজন খানসামার প্রবেশ)

খানসামা। বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কি চাই?

অনঙ্গমোহন। আরে, তুমি যে! ভাল আছ তো?

খানসামা। হ্যাঁ, হুজুর।

[অনঙ্গ]মোহন। তোমাদের হোটেলের খবর কি? সব ঠিক চলছে?

খানসামা। হ্যাঁ, হুজুর।

অনঙ্গমোহন। লোকজন কেমন আসছে?

খানসামা। মন্দ নয়।

অনঙ্গমোহন। দেখ, ওরা এখনও আমার খাবার পাঠিয়ে দেয় নি। তুমি চটপট আমার খাবারটা পাঠিয়ে দাও তো। খেয়েই আমাকে একটা জরুরি কাজে বেরুতে হবে।

খানসামা। আমার মনিব বলেছেন, আর আপনাকে খাবার দেবেন না। আজ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তাঁর নালিশ করতে যাওয়ার কথা আছে।

অনঙ্গমোহন। এতে নালিশ করবার কি আছে? তুমিই ভেবে দেখ না, আমার কর্ত্তব্য কি? আমাকে খেতে হবে, না খেয়ে কতদিন থাকব?। তাতে যে শরীর শুকিয়ে যাবে। বিষম খিদে পেয়েছে। ভেবো না যে, আমি ঠাট্টা করছি।

খানসামা। মনিব বলেছেন, আগের সব মিটিয়ে না দেওয়া পর্য্যন্ত আর আপনাকে কিছু দেবেন না।

অনঙ্গমোহন। বেশ তো। তুমি তাকে গিয়ে একটু বুঝিয়ে বল না।

খানসামা। এর মধ্যে বুঝিয়ে বলবার আর কি আছে?

অনঙ্গমোহন। আচ্ছা, আমি শিখিয়ে দিচ্ছি। আমার এখন বিষম খিদে পেয়েছে। পেয়েছে কি না? আচ্ছা, তা হ'লে আমার খাওয়া দরকার। দরকার কি না? এই তো দিব্যি বুঝতে পেরেছ! সত্যি, তোমার কি বুদ্ধি! এইবার তোমার মনিবকে গিয়ে বুঝিয়ে বল। খিদে এক জিনিস, আর টাকা আর এক জিনিস। দুটোকে মিশিয়ে ফেলতে নিষেধ ক'রো। তাকে বল গিয়ে যে, তার মত চাষা দু-চার দিন না খেয়ে থাকতে পারে, কিন্তু আমার মত ভদ্রলোকের পক্ষে এক বেলাও অনাহারে থাকা অসম্ভব। অন্যায়। বিধাতার বিধানের বিরুদ্ধ। বুঝেছ? এইবার গিয়ে বুঝিয়ে বল দেখি।

খানসামা। আচ্ছা হুজুর। আমি বলি গিয়ে।

খানসামা ও মুকুন্দর প্রস্থান

অনঙ্গমোহন। যদি সত্যিই সে খাবার না পাঠায়, তবে তো বিপদ! এমন খিদেও জন্মে পায় নি। পদ্মার হাওয়ায় খিদের আগুন দাউদাউ ক'রে জ্ব'লে উঠল। কোট আর ট্রাউজার বাঁধা দিলে কিছু পাওয়া যায় না? না না, বরঞ্চ দু দিন না খেয়ে থাকা ভাল, তবু হার্ম্যানের বাড়ির নতুন সুট প'রে বাড়ি পৌঁছনো চাই।

...ইচ্ছে ছিল, মোটরে ক'রে কলকাতা থেকে থু শিলিগুড়ি যাব। বেটা পেট্রলওয়ালা গোল করলে। নাঃ, বাকিতে দেব না। কেন বাপু? বড়লোক কবে নগদ দাম দেয়? মোটরে ক'রে বাড়ি পৌঁছতে পারলে শহরের লোক দেখে অবাক হয়ে যেত। কে আসছে? মিঃ অনঙ্গমোহন রায়, বি. এ., অফিসার অব দি সেক্রেটারিয়েট! মুকুন্দটাকে সামনে

বসিয়ে দিতাম, চকচক করছে চাপরাস আর উর্দ্দি! ওঃ, সে কি চমৎকার হ'ত! সব মাটি ক'রে দিলে বেটা পেট্রলওয়ালা। বাকিতে দেব না! নন্সেন্স! বড়লোকে কবে আবার নগদ কারবার করে! কিন্তু, উঃ, কি খিদেই না পেয়েছে!

(মুকুন্দর প্রবেশ)

কি খাব?

মুকুন্দ। খাবার নিয়ে আসছে।

অনঙ্গমোহন। [দুই চেয়ারে ভর দিয়া বার কয়েক দুলিল]

খাবার! খাবার! খাবার!
নামটি যেন বাবার।
না পেলে প্রাণ সাবাড়!

চমৎকার! চমৎকার! তুই বলছিলি, দেবে না?

(খানসামার থালা বাটি লইয়া প্রবেশ)

খানসামা। মনিব বললেন, এর পরে আর খাবার দেবেন না।

অনঙ্গমোহন। মনিব! মনিব! তোমার মনিবের আমি ভারি ধার ধারি কিনা! কি এনেছ?

খানসামা। ভাত, ডাল আর মাছের ঝোল।

অনঙ্গমোহন। শুধু ডাল আর মাছের ঝোল?

খানসামা। শুধু এই আজ হয়েছে।

অনঙ্গমোহন। তোমার মনিবকে বল গিয়ে, ওসব ধাপ্পায় আমি ভুলব না। আর যা যা আছে, সব পাঠিয়ে দিতে বল।

খানসামা। আর কিছু হয় নি।

অনঙ্গমোহন। মাংস হয় নি?

খানসামা। না।

অনঙ্গমোহন। ফের মিথ্যে কথা! রান্নাঘরের পাশ দিয়ে ওঠবার সময়ে দেখলাম, মাংস রাঁধছে। আর দুজন লোককে মাংসের চপ খেতে দেখলাম এখুনি।

খানসামা। আছে, কিন্তু নেই।

অনঙ্গমোহন। তার মানে?

খানসামা। তার মানে ওসব ভদ্রলোকদের জন্যে।

অনঙ্গমোহন। রাস্কেল!

খানসামা। হ্যাঁ, হুজুর।

অনঙ্গমোহন। তুমি একটি আস্ত গর্দ্দভ। ওরা খাচ্ছে আর আমি পাই না কেন? আমি কি খেতে জানি না?

খানসামা। ওরা দাম দিয়ে খায়।

অনঙ্গমোহন। এসব বিষয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করা নিষ্ফল। [খাইতে খাইতে] একে মাছের ঝোল বলে নাকি? ঝাল নেই, নুন নেই, কেবল কতকগুলো জল। যাও, ভাল দেখে ঝোল পাঠিয়ে দাও।

খানসামা। মনিব বলেছেন, পছন্দ না হ'লে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে; আর কিছু সে পাবে না।

অনঙ্গমোহন। [পাছে ফিরাইয়া লইয়া যায়, সেই ভয়ে হাত দিয়া বাটি রক্ষা করিতে করিতে] তুমি রাস্কেল। তোমার মনিব ডবল রাস্কেল। আমার সঙ্গে এ রকম ব্যবহার চলবে না ব'লে দিচ্ছি। [খাইতে খাইতে] কি ঝোল! আর কি মাছ! বাপ রে, জ'মে পাথর হয়ে গিয়েছে। এ মাছ নদীর, না পাহাড়ের? নাঃ, এ মাছই নয়।

খানসামা। মাছ নয় তো কি?

অনঙ্গমোহন। তোমার মাথা। চিবোতে চিবোতে চোয়াল ব্যথা হয়ে গেল। এখন দাঁতগুলো না ভেঙে যায়! আর কিছু আছে?

খানসামা। না।

অনঙ্গমোহন। শূয়ার! গাধা! গরু! চাটনি নেই? দই? এ তো খাওয়ানো নয়, ভদ্রলোকদের পকেটমারা!

(খানসামা ও মুকুন্দ মিলিয়া থালা বাটি লইয়া টেবিল পরিষ্কার করিয়া ফেলিল; উভয়ের প্রস্থান)

নাঃ, পেট ভরল না, কেবল খিদে আরও বেড়ে গেল। পয়সা থাকলে বাজার থেকে কিছু আনিয়ে নেওয়া যেত।

(মুকুন্দর প্রবেশ)

মুকুন্দ। বাবু, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসেছেন। তোমার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন।

অনঙ্গমোহন। সর্ব্বনাশ! হোটেলওয়ালা বেটা নিশ্চয় নালিশ. করেছে। জেলে নিয়ে যাবে নাকি? সেখানে যদি ভদ্রলোকের মত ব্যবহার করে··· না না, কখনই জেলে যাওয়া হবে না। এ কদিন এখানে মস্ত অফিসার সেজে বেড়াচ্ছিলাম, আর এখন জেলে···না না, সে কিছুতেই হবে না। লোকটার আস্পর্দ্ধা দেখ না, আমাকে ভাবে কি? আমি চোর জোচ্চোর, না মুটে-মজুর। আমি বলব, আমাকে কি ভাব? এত বড় তোমার সাহস! এত—

(সহসা দরজা খুলিয়া গেল; অনঙ্গমোহন ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল। ম্যাজিষ্ট্রেট ও বলরাম প্রবেশ করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত দুইজন দুইজনের দিকে ভীতভাবে তাকাইয়া থাকিল)

ম্যাজিস্ট্রেট। [ভীত ভাব কতক পরিমাণে কাটাইয়া বিনীতভাবে] সুপ্রভাত। আশা করি, আপনার সব মঙ্গল।

অনঙ্গমোহন। সুপ্রভাত, সার্।

ম্যাজিস্ট্রেট। আমাকে মাপ করুন···

অনঙ্গমোহন। হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক হয়েছে।

ম্যাজিস্ট্রেট। এই শহরের প্রধান কর্ম্মচারীরূপে আমার কর্ত্তব্য, এই শহরের বিদেশী অতিথিদের মঙ্গলামঙ্গল দেখা।

অনঙ্গমোহন। [প্রথমে ভীতভাবে, কিন্তু শেষে ভয় কাটাইয়া উঠিয়া] কিন্তু আমি কি করব বলুন? আমার দোষ নেই, আমি সব পাওনা মিটিয়ে দিতেই যাচ্ছিলাম—আজই বাড়ি থেকে আমার টাকা আসবার কথা। [ঘনরাম দরজার ফাঁক দিয়া উঁকি মারিল] দোষ ওরই···লোকটা মাছ দেয় যেন পাথরে তৈরি, আর মাংস কেবলই হাড়। জানলা দিয়ে ফেলে দেওয়া ছাড়া মুখে দেবার উপায় নেই। চায়ে আঁশটে গন্ধ। কদিন থেকে বেটা আমায় না খাইয়ে রেখেছে। আমি কেন তাকে···কেন যে—

ম্যাজিস্ট্রেট। [ভয় পাইয়া] মাপ করুন, কিন্তু সত্যি বলছি, আমার দোষ নয়। এখানকার বাজারে চমৎকার টাটকা মাছ ওঠে। তালাইমারির জেলেরা বড় ভাল লোক, বছরে তারা দুবার বারোয়ারী পূজো করে— একবার কালীপূজো, একবার হরিপূজো। ও বেটা যে এ মাছ কোথা থেকে নিয়ে আসে, জানি না। চলুন, আপনাকে অন্য ঘরে নিয়ে যাচ্ছি।

অনঙ্গমোহন। না, আমি অন্য ঘরে যাব না। আমি বুঝতে পেরেছি, অন্য ঘর মানে কি—শ্রীঘর! আমাকে অন্য ঘরে নিয়ে যাবার আপনার কি অধিকার? আমাকে রামা-শ্যামা মনে করবেন না। আমি কলকাতার অফিসার। আমি দেখে নেব, নিশ্চয় বলছি, দেখে নেব—

ম্যাজিস্ট্রেট। [স্বগত] ভগবান, রক্ষা কর! কি দুর্দ্দান্ত লোক! সব ধ'রে ফেলেছে দেখছি, বেটা দোকানদারেরা সব ফাঁস ক'রে দিয়েছে।

অনঙ্গমোহন। [সজোরে] পল্টন নিয়ে আসলেও আমাকে নিয়ে যেতে পারবেন না। আমি এক্ষুনি মন্ত্রীদের লিখে পাঠাচ্ছি। [টেবিল চাপড়াইয়া] এখন কি করতে চান, বলুন? কি মতলব আপনার?

ম্যাজিস্ট্রেট। [কম্পিতভাবে] দয়া করুন। আমার সর্ব্বনাশ করবেন না। কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে বাস করি, আমি ছাপোষা মানুষ, এসব ক'রে আমার সর্ব্বনাশ করবেন না।

অনঙ্গমোহন। না, আমি কিছুতেই যাব না। আপনার স্ত্রীপুত্র আছে তো আমার কি? আপনার স্ত্রীপুত্রের খাতিরে কি আমাকে জেলে যেতে হবে নাকি?

(ঘনরাম দরজায় উঁকি দিয়াই ভয়ে অদৃশ্য হইল)

ধন্যবাদ। আমি অন্য ঘরে যাব না।

ম্যাজিস্ট্রেট। [কম্পমান অবস্থায়] আমার সব দোষ আমি স্বীকার করছি। কিন্তু কি করব বলুন, আমি যে মাইনে পাই, তাতে চা-জলখাবারেরও খরচ ওঠে না, তার ওপরে অনেকগুলো কাচ্চা-বাচ্চা। ওরা বুঝি লাগিয়েছে, আমি ঘুষ নিয়েছি? ওসব কথায় বিশ্বাস করবেন না। হয়তো কিছু কলা-মূলো, হয়তো এক-আধ থান কাপড়। আর কসাই-বুড়ীকে চাবুক মারার গল্প ক'রে গিয়েছে বুঝি? সব মিথ্যে কথা। আমার শত্রুদের সব কারসাজি, ওদের অসাধ্য কিছু নেই, ওরা গলায় ছুরি দিতে পারে।

অনঙ্গমোহন। আমি ওসব কথা শুনতে চাই না। কসাই-বুড়ীকে চাবুক মেরেছেন ব'লে আমাকেও যদি মারবেন ভাবেন, তবে ভুল করছেন। আমি তো বলছি, সব পাওনা মিটিয়ে দিতে রাজি আছি, কেবল এখন আমার হাতে টাকা নেই।

ম্যাজিস্ট্রেট। [স্বগত] ওঃ, শয়তান! কিছুতেই ধরা দিতে চায় না!

আমরা যেন এতই বোকা! আচ্ছা, দেখা যাক, এবারে কি হয়! [প্রকাশ্যে] আপনার যদি টাকার দরকার হয়, সেজন্যে ভাববেন না। আমি আছি। বিদেশী লোকদের সাহায্য করা আমার কর্ত্তব্যের মধ্যে।

অনঙ্গমোহন। দিন কিছু টাকা হাওলাত। দেখুন, এক্ষুনি আমি হোটেলওয়ালাকে মিটিয়ে দিচ্ছি। একশো টাকা হ'লেই চলবে, কিছু কম হ'লেও ক্ষতি নেই।

ম্যাজিস্ট্রেট। [নোট দিল] এই যে, ঠিক একশো টাকাই আছে। কষ্ট ক'রে আর গোনবার প্রয়োজন নেই। ও ঠিক আছে।

অনঙ্গমোহন। [টাকা লইয়া] বিশেষ বাধিত হলাম। বাড়ি গিয়েই আমি টাকা পাঠিয়ে দেব। অনিবার্য্য কারণে হঠাৎ টানাটানিতে প'ড়ে গিয়েছিলাম। আপনি সত্যিই ভদ্রলোক দেখছি।

ম্যাজিস্ট্রেট। [স্বগত] চার গিলেছে দেখছি, এবারে কাজ সহজ হয়ে আসবে। একশো ব'লে দুশো টাকা গছিয়ে দিয়েছি।

অনঙ্গমোহন। মুকুন্দ!

(মুকুন্দর প্রবেশ)

খানসামাকে ডাক দাও। [ম্যাজিস্ট্রেট ও বলরামের প্রতি] আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন না।

ম্যাজিস্ট্রেট। না না, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমরা ঠিক আছি:

অনঙ্গমোহন। সে কি হয়? বসুন, বসুন। এখন বুঝতে পারছি, আপনি কেমন সরল আর কর্ত্তব্যপরায়ণ। আমি তো প্রথমে ভেবেছিলাম, আপনি বুঝি · [বলরামের প্রতি] বসুন না।

(ম্যাজিস্ট্রেট ও বলরাম ব'সল। ধনরাম দরজার ফাঁক দিয়া শুনিবার চেষ্টায় নিযুক্ত)

ম্যাজিস্ট্রেট। [স্বগত] একটু সাহস সঞ্চয় করা দরকার। উনি ওঁর ছদ্মবেশ বজায় রাখতে চান। তাই হবে। আমি এমন ব্যবহার করব, যেন চিনতেই পারি নি। [প্রকাশ্যে] ইনি বলরামবাবু, ইনি এই জেলার একজন প্রসিদ্ধ জমিদার। এখন বলরামবাবু আর আমি দুজনে শহর পরিদর্শন করতে বেরিয়েছিলাম। অনেক ম্যাজিস্ট্রেট আছে, শহরের কোন খোঁজ-খবরই রাখে না। আমি সে'রকম নই। বিদেশী লোক যদি এখানে এসে বিপদে পড়ে, সে তো আমাকেই দেখতে হবে। কর্ত্তব্য

ছাড়া শাস্ত্রেও তো উপদেশ আছে, অপূজিতো অতিথির্যস্য গৃহাৎ যাতি বিনিঃশ্বসন্। ঘুরতে ঘুরতে এই হোটেলে এসে আপনার মত মহানুভব ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হ'ল।

অনঙ্গমোহন। আমিও আপনার পরিচয় পেয়ে খুশি হয়েছি। আপনি হাওলাত না দিলে আমাকে খুব কষ্টেই পড়তে হ'ত।

ম্যাজিস্ট্রেট। [স্বগত] ও কথা অন্যকে ব'লো চাঁদ। কষ্টেই পড়তে হ'ত! বটে! ওসব চাল আমার কাছে দিও না। [প্রকাশ্যে] যদি কিছু না মনে করেন তো জানতে চাই, কোথায় যাচ্ছেন?

অনঙ্গমোহন। শিলিগুড়ি যাচ্ছি। ওখানেই আমার বাড়ি আর জমিদারি।

ম্যাজিস্ট্রেট। [স্বগত] বটে! শিলিগুড়ি! সোনার চাঁদ এত বড় মিথ্যেটা বলতে মুখে বাধল না! এর সঙ্গে খুব সমঝে চলতে হবে। [প্রকাশ্যে] দেশভ্রমণে যদিচ অসুবিধা আছে, কিন্তু অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়। আপনি অবিশ্যি আনন্দলাভের জন্যে বেরিয়েছেন?

অনঙ্গমোহন। না, বাবা বিশেষ ক'রে অনুরোধ ক'রে পাঠিয়েছেন। আমি সার্ভিসে চটপট প্রমোশন পাচ্ছি না ব'লে তিনি আমার ওপর বিরক্ত। এই বুড়োদের ধারণা, কলকাতায় যাওয়ার পরদিনেই রায় বাহাদুর হওয়া যায়।

ম্যাজিস্ট্রেট। [স্বগত] শোন কথা একবার! কি রকম গল্প ফেঁদে বসেছেন! আবার বুড়ো বাপকেও টেনে আনছে দেখছি। [প্রকাশ্যে] কতদিন দেশে থাকবেন?

অনঙ্গমোহন। কিছুই বলতে পারি না। বুড়োর যে কাণ্ডজ্ঞান আছে, তা মনে হয় না। কলকাতা ছেড়ে আমার পক্ষে থাকা অসম্ভব। চাষাভুষোর মধ্যে জীবন কাটাবার জন্যে আমার জন্ম হয় নি। মদ ছাড়াও আমি বাঁচতে পারি, কিন্তু কাল্‌চার না হ'লে বাঁচা অসম্ভব। কাল্‌চার! কাল্‌চার! [কাল্‌চার শব্দ এমন ভাবে উচ্চারণ করিল, যেন দুর্লভ শ্যাম্পেন দুই ঢোক গলাধঃকরণ করিল]

ম্যাজিস্ট্রেট। [স্বগত] বুদ্ধি আছে বটে! কেমন মিথ্যের সঙ্গে মিথ্যের মালা গেঁথে চলেছে! ধরা-ছোঁয়ার উপায় নেই। আচ্ছা, দাঁড়াও, এখনই সব ফাঁস ক'রে দিচ্ছি। [প্রকাশ্যে] যা বলেছেন, এসব জায়গায় কি মানুষ থাকে! অবশ্য কর্তব্যের খাতিরে, দেশের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে

থাকতে হয়। দিনে রাত্রে দেশের চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তা নেই। কিন্তু গভর্মেণ্ট কি এসব স্বার্থত্যাগের খোঁজ-খবর রাখে? [ঘরের দিকে তাকাইয়া] ঘরটা স্যাঁতসেঁতে ব'লে মনে হচ্ছে।

অনঙ্গমোহন। যাচ্ছেতাই ঘর। আর ছারপোকা কি? এক-একটা যেন আস্ত ইঁদুর।

ম্যাজিস্ট্রেট। কি অন্যায়! এমন কাল্‌চার্ড অতিথিকে কতকগুলো নরাধম ছারপোকা কামড়ায়! এই সব হতভাগার জন্মাবার কি প্রয়োজন ছিল? ঘরটা অন্ধকার মনে হচ্ছে।

অনঙ্গমোহন। ঘোর অন্ধকার। হোটেলওয়ালা আমার ঘরে আলো দেওয়া বন্ধ করেছে। কখনও কখনও পড়তে ইচ্ছে করে, আবার একটু-আধটু লেখবার অভ্যাসও আছে। নাঃ, ঘরটা একদম অন্ধকার।

ম্যাজিস্ট্রেট। আপনাকে একটা কথা বলতে ইচ্ছা করি···কিন্তু—না, সে সাহসও নেই, সে যোগ্যতাও নেই।

অনঙ্গমোহন। ব্যাপার কি? বলুন না।

ম্যাজিস্ট্রেট। না না, আমি তার যোগ্য নই।

অনঙ্গমোহন। কোন ভয় নেই, খুলে ব'লে ফেলুন।

ম্যাজিস্ট্রেট। আমার বাড়ির দোতালায় চমৎকার একটি ঘর আছে। আলো বাতাস, চারদিক খোলামেলা, চমৎকার। ঠিক আপনার যেমনটি দরকার, সেই রকম। কিন্তু না না, আপনাকে যেতে বলবার যোগ্যতা আমার নেই। বেয়াদপি মাপ করবেন। সরলপ্রকৃতির লোক ব'লেই যা মনে এল ব'লে ফেললাম। কিছু মনে করবেন না।

অনঙ্গমোহন। এতে বেয়াদপি কিসের! ওই রকম একটি ঘর পেলে তো আমি বেঁচে যাই। এই নোংরা হোটেলের চেয়ে অনেক ভাল।

ম্যাজিস্ট্রেট। আমি কৃতার্থ হব, আমার স্ত্রী কৃতার্থ হবে, আমার মেয়েরা কৃতার্থতম হবে। ছেলেবেলা থেকে আতিথেয়তাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ব'লে মনে করতে শিক্ষা পেয়েছি। এ খোশামুদি মনে করবেন না। আমার যদি কোন দোষ না থাকে, তবে সে ওই দোষটি।

অনঙ্গমোহন। আমারও ঠিক ওই কথা। আমি নিজেও যেমন সরলপ্রকৃতি, তেমনই সরলপ্রকৃতির লোক ভালবাসি। আমি শ্রদ্ধা ও সম্মান ছাড়া আপনার কাছে আর কিছু চাই না।

(খানসামা ও মুকুন্দের প্রবেশ। ঘনরাম উঁকি মারিল)

খানসামা। হুজুর, ডেকে পাঠিয়েছিলেন?

অনঙ্গমোহন। বিল লে আও।

খানসামা। আজ সকালে দিয়ে গিয়েছিলাম। এই নিয়ে দুবার দেওয়া হ'ল।

অনঙ্গমোহন। তোমার বিলের কথা মনে রাখবার আমার সময় নেই। বল, কত হয়েছে?

খানসামা। প্রথম দিন দুবেলা। তার পরদিন একবেলা, তার পর থেকে সব বাকিতে চলছে।

অনঙ্গমোহন। স্টুপিড! দফাওয়ারি বলবার দরকার নেই। মোটের ওপর কত হয়েছে বল না!

ম্যাজিস্ট্রেট। আপনি ব্যস্ত হবেন না। পরে হবে এখন। [খানসামাকে] যাও এখন, ভাগো। বিলের ব্যবস্থা করা যাবে।

অনঙ্গমোহন। ঠিক বলেছেন। [টাকা পকেটে রাখিয়া দিল]

(খানসামার প্রস্থান। ঘনরাম দরজায় উঁকি মারিল)

ম্যাজিস্ট্রেট। শহরের প্রতিষ্ঠানগুলো একবার দেখবেন না?

অনঙ্গমোহন। দেখবার মত এমন কি আছে?

ম্যাজিস্ট্রেট। দাতব্য-বিভাগের বিলি-ব্যবস্থা কি রকম, দেখা তো দরকার।

অনঙ্গমোহন। বেশ তো, চলুন না।

(ঘনরাম দরজার ফাঁক দিয়া মাথা বাহির করিল)

ম্যাজিস্ট্রেট। তারপরে জেলা-স্কুল পরিদর্শনে যেতে পারেন। সেখানকার শিক্ষা-ব্যবস্থা কেমন দেখা দরকার।

অনঙ্গমোহন। দরকার বইকি।

ম্যাজিস্ট্রেট। তারপরে থানা এবং জেলখানায় যাওয়া আবশ্যক। আমরা কয়েদীদের কি রকম রাখি, তা জানা প্রয়োজন।

অনঙ্গমোহন। আবার থানা-জেলখানা কেন? তার চেয়ে দাতব্য-প্রতিষ্ঠান-গুলোই দেখব।

ম্যাজিস্ট্রেট। আপনার যেমন অভিরুচি। আপনি নিজের গাড়িতে যাবেন, না আমার গাড়ি আনব?

অনঙ্গমোহন। আপনার সঙ্গেই যাব, গল্পগুজব করতে করতে যাওয়া যাবে।

ম্যাজিস্ট্রেট। [বলরামকে] বলরামবাবু, আমার গাড়িতে আপনার জায়গা হওয়া তো মুশকিল।

বলরাম। কিছু ভাববেন না, আমি ব্যবস্থা ক'রে নেব।

ম্যাজিস্ট্রেট। [বলরামকে] দুখানা চিঠি নিয়ে এখনই ছুটে যান। একখানা দেবেন আমার স্ত্রীকে। আর একখানা দাতব্য-প্রতিষ্ঠানের রসময়বাবুকে। [অনঙ্গমোহনের প্রতি] আপনি যদি অনুমতি করেন তো এখানে ব'সে আমার স্ত্রীকে দু ছত্র লিখে পাঠাই যে, আপনি অনুগ্রহ ক'রে আমার কুটীরে পদধূলি দিতে সম্মত হয়েছেন।

অনঙ্গমোহন। লিখুন না। এই যে দোয়াত। কাগজ! কাগজ কই? যাকগে, এই বিলখানার অপর পিঠে লিখতে পারেন।

ম্যাজিস্ট্রেট। বেশ তো, চমৎকার হবে। [নিজের মনে লিখিতে ও বলিতে লাগিল] খাওয়ার পরে দেখা যাবে এখন। এক বোতল হুইস্কি আছে। কয়েক পেগ পেটে গেলে দেখা যাবে, বাছাধনের পেটে কি আছে!

(চিঠি বলরামের হাতে দিল। সে দরজা খুলিয়া বাহিরে গেল। হঠাৎ দরজা খুলিতেই ঘনরাম ঘরের মধ্যে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল। সে এতক্ষণ দরজায় ঠেস দিয়া সব শুনিতেছিল)

অনঙ্গমোহন। আশা করি, আপনার লাগে নি।

ঘনরাম। না না, এমন কিছু নয়। শুধু নাকটা একটু থেঁতলে গিয়েছে। সিভিল-সার্জনের কাছে গেলে এখুনি সেরে যাবে।

ম্যাজিস্ট্রেট। [ঘনরামের দিকে রুষ্টভাবে তাকাইয়া অনঙ্গমোহনকে বলিল] না না, এমন কিছু নয়। চলুন, রওনা হওয়া যাক। আপনার চাকর জিনিসপত্তর নিয়ে যাবে। [মুকুন্দকে] ওহে বাপু, আমার বাড়িতে, তার মানে, ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোয় জিনিসপত্তরগুলো নিয়ে এস। [অনঙ্গমোহনকে] না না, সে কি হয়! আপনি আগে চলুন। [অনঙ্গমোহনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া বাহির হইবার সময়ে ঘনরামের দিকে রুষ্টভাবে তাকাইয়া] ঠিক আপনার মতই কাজ হয়েছে। আর কোথাও কি পড়বার জায়গা পেলেন না!

(সকলের প্রস্থান। নাক ধরিয়া ঘনরামের অনুসরণ)

ক্রমশ—প্র. না. বি

ডিমের সেন্সাস

(ডিমের ন্যায় ছন্দও এক রকম নয়)

ব্রহ্মাণ্ডই অণ্ড যখন—অখণ্ড এই বিশ্ব—
ডিম্ব এবং বিম্ব নিয়েই এই চরাচর দৃশ্য,
বসল সভা রাক্ষুসে এক, ছায়ার তলে নিম্বের,
অতি ত্বরিৎ করতে হবে সেন্সাস সব ডিম্বের।
ক্রমে ক্রমে উঠছে বেড়ে সকল ডিমের মূল্য,
মহার্ঘ কি হবে শেষে সেও সোনার তুল্য ?
পাড়ছে নাকো ডিম কি দেশের মুরগী এবং হংস ?
কিংবা তাহা লুকিয়ে রাখে, কিংবা করে ধ্বংস ?
সত্য ব্যাপার বুঝতে হবে, করতে হবে, হোক গো-
বিশ্বজিতের প্রায়ই সমান ডিম্বজিৎ এক যজ্ঞ।

২

যত নিখিল-বঙ্গীয় সব মুরগী এবং হংস,
সকল রকম খেচর ভূচর জলচরের বংশ—
মশা, মাছি, সর্প হতে টিকটিকি আর কুম্ভীর,
বাদ যাবে না সরীসৃপও, ব্যাপারটা খুব গম্ভীর।
খুঁজতে হবে পগার পাহাড়, বন-বাদাড়ের গর্ত্ত
বালুর চর ও ঘুঘুর বাসা, এইটে হবে শর্ত্ত।
তক্তাপোশের তলার বিবর, ছাদের ফাটাল, ভিত্তি
দলে দলে নিপুণভাবে খুঁজতে হবে নিত্যি।
অণুর মত ডিম্ব আছে ঝোপের মাঝে উচ্ছ—
মাইক্রস্‌কোপ শক্তিশালী সঙ্গে নেবে বুঝছ।

৩

বোজাবে না গর্ত্ত কেহ, কাটবে না কেউ কাঠ,
দেবে নাকো রৌদ্রে চাটাই মাদুর কিংবা খাট,
সর্প যদি ডিম্ব লুকায় আনবে ডেকে মাল,
বাস্তু-সাপে বা'হর ক'রে করবে নাজেহাল,
অণ্ডজেরা বিষম বেকুব বুঝিয়ে দেবে বেশ,
হচ্ছে আদমসুমারি, আর থাকবে নাকো ক্লেশ।

শর কাশ ও বেনার বনে থাকবে যে যথায়
পড়বে সবাই স্মরণীয় আইনের আওতায়।

৪

ধরলে পরে ডিম্ব-সহ কই কি ইলিশ মাছই,
ট্যাংরা, কই, বা মৌরলাদি নেইকো বাছাবাছি,
অবিলম্বে করবে হাজির হোক না যত সের
সম্মুখেতে মাননীয় স্কোয়াড-মাষ্টারের।
তৎপরতার নাইক সীমা চৌদিকে আশ্বাস
সুলভ হবে ডিম্ব, চলে ডিম্বেরি সেল্পাস।
অঙ্কেতে আর কুলায় নাকো দীর্ঘ দু মাস পর
সাঙ্গ হ'ল ঠুকঠুকানি গণকদের সফর।
সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশ ক'রে—বিবৃতি এইটাই,
ডিম্ব তেমন সুখাদ্য নয়, ডিম্ব বেশি নাই।
ডিম না পেলে তার বদলে সবাই খাবে ফ্যান,
খোলা না হোক কাটা হ'ল গ্রন্থি গর্ডিয়্যান।
আঙুর-ক্ষেতে হাসল শৃগাল, বার হ'ল গর্দ্দভ,
ডাকল ভেবে কোথায় তাহার আত্মীয়েরা সব।
বংশীতে হায় তবু যে চিড়—পায় না তরী কূল
বাহির হ'ল তালিকাটায় একটা বেজায় ভুল।
ঘোড়ার ডিমের সংখ্যা ল'য়ে বাধল বিসম্বাদ
গণনাটাই বাতিল—বাতিল বেবাক সে তায়দাদ।
ডিম্ব থেকে ছুটল ঘোড়া উষ্ট্রপাখীবৎ—
নেংটি ইঁদুর করলে প্রসব প্রকাণ্ড পর্ব্বত।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

জীবন

অব্যক্তও ধরা দেয় দুটি ক্ষীণ বাহু বিস্তারিয়া,
তাহারে ধরার নামে মোরা উঠি উৎসবে মাতিয়া—
নবশিশু জন্ম নেয়, মোরা খুঁজে মরি তার নাম,
জীবন কিছুই নয়—অব্যক্তের ক্ষণিক বিশ্রাম।

মঞ্জরী রায়

নীলকণ্ঠ কেবিন।

নামকরণটি ঠিকই হইয়াছিল। স্বয়ং নীলকণ্ঠ ছাড়া অন্য কাহারও পক্ষে কেবিনটি নিরাপদ নহে, এবং এ কেবিনে কয়েকদিন আসিয়া যে টিকিয়া থাকিতে পারিবে, সে প্রায় নীলকণ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইবে, ভবিষ্যতে অন্য কোথাও সে সহজে ঘায়েল হইবে না।

তবু সিনেমায় বাংলা ছবি দেখিবার যেমন লোকের অভাব হয় না, তেমনই নীলকণ্ঠ কেবিনেও খরিদ্দারের অভাব হয় না। যাঁহারা ফিরিবার সময় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া যান, মনে মনে (কখনও বা প্রকাশ্যেই) প্রতিজ্ঞা করেন, আর কখনও এদিককার ছায়াও মাড়াইবেন না, তাঁহারাই পরদিন যথাসময়ে আসিয়া হাজির হন। ইহাদের মধ্যে আমি অন্যতম।

ইহার কারণ আছে। নীলকণ্ঠ কেবিনটি এ পাড়ার বনিয়াদী রেস্তরাঁ এবং দীপালী সিনেমার প্রায় মুখোমুখি। ইহার ভয়েই বোধ হয় কাছাকাছি অন্য কেহ রেস্তরাঁ খুলিতে ভরসা পায় নাই। পাড়ার লোক পাড়া ছাড়িয়া অন্য পাড়ার রেস্তরাঁয় গিয়া চা খাইয়া আসিবে, বাঙালী আজিও এতটা 'অ্যাড্‌ভেঞ্চারাস' হইতে পারে নাই। সুতরাং পাড়ার সবেধন নীলমণি নীলকণ্ঠ কেবিন বেশ দাপটের সহিতই টিকিয়া আছে।

রোজই বিরক্ত হইয়া ভাবিতে ভাবিতে ফিরি যে, কাল আর আসিব না। কিন্তু পরদিন সে কথা নীলকণ্ঠ কেবিনে ঢুকিবার আগে পর্য্যন্ত আর মনে থাকে না। ঢুকিয়াই বলি, ওরে ছোকরা, চা আন্ দেখি। পেয়ালাটা বেশ ক'রে গরম জল দিয়ে ধুয়ে নিস বাপু। ঐ বলা পর্য্যন্তই। পেয়ালাটা বাস্তবিক গরম জল দিয়া ধোয়া হইল কি না সেটা দেখার আর প্রয়োজন মনে করি না। আমার বিবেকের কাছে আমি তো পরিষ্কার রহিলাম, এখন ছোকরা যদি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া অধৌত পেয়ালাতেই আমাকে চা দেয় তো পরলোকে ইহার জন্য ও-ই জবাবদিহি করিবে। আমার কি তাহাতে?

শুনিতে পাওয়া যায়, অনেক বছর আগে নাকি এই কেবিনের পানীয় এবং ভোজ্য ভালই ছিল, কিন্তু পসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী ব্যবসায়ীরা সাধারণত যাহা করিয়া থাকে, নীলকণ্ঠ কেবিনও ঠিক তাহাই করিয়াছে।

আমি যে রোজ নীলকণ্ঠ কেবিনে আসি তাহার ব্যক্তিগত কারণও আছে। গল্প লেখা আমার পেশা—শুধু পেশা নয়, নেশাও বটে। কিন্তু নিছক কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া লেখার পক্ষপাতী আমি নই। এই কেবিনে আমার গল্প লেখার বাস্তব খোরাক প্রচুর মেলে। আমি কিছু বলি না, শুধু এক পাশে চুপচাপ বসিয়া চায়ের কাপে চুমুক দিবার ভান করি এবং মাঝে মাঝে খুব ধীরে ধীরে চুমুক দিই। সঙ্গে সঙ্গে কান দুইটি খাড়া রাখি এবং চোখ দুইটিও সর্ব্বদা সজাগ থাকে।

আমার একটি দিনের অভিজ্ঞতা মাত্র নমুনাস্বরূপ বলিতেছি। চায়ের কাপে খুব ধীরে ধীরে চুমুক দিতেছি, এমন সময় রুক্ষচুল স্থূলদেহ এক ভদ্রলোক ধাঁ করিয়া ঢুকিয়াই আমার পাশের চেয়ারে বসিয়া হাঁফাইতে লাগিলেন। তাঁহার পরনে লংক্লথের পায়জামা, গেঞ্জি-পরা গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি, পায়ে চটি এবং মাথায় মাড়োয়ারী টুপি। আমি তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করিতেই তিনি আমাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, বলছি বলছি মশাই, সব বলছি। আগে একটু জিরিয়ে নিতে দিন। কি রকম হাঁফাচ্ছি, দেখছেন না?

আমি কহিলাম, কই, কিছু তো আমি জানতে চাই নি আপনার কাছে।

হাত ঘুরাইয়া ভদ্রলোক কহিলেন, জানতে না চাইলেও চাওয়া আপনার উচিত ছিল। দুনিয়ায় জ্ঞানযোগটাই হচ্ছে সেরা যোগ। আর এ ব্যাপারে ভেদাভেদ রাখতে নেই, সে হচ্ছে মূঢ়তা। যার কাছ থেকে যতটুকু পারেন ততটুকুই জেনে নেবেন। এইজন্যেই তো শাস্ত্রে বলেছে, স্ত্রী-রত্নং দুষ্কুলাদপি। বলিলাম, তা হয়তো বলেছে। কিন্তু তার সঙ্গে আপনার কথার কোনও যোগাযোগ নেই। তিনি বলিলেন, দেখুন, দুনিয়ায় কিসের সঙ্গে যে কিসের যোগ, সেটাও বুঝতে পারা সহজ নয়। এই বোয়, দো কাপ চা, দোঠো ডবল মামলেট। না না, আপনাকেও খেতে হবে। কোনও আবদার শুনছি না। চা ও অমলেট খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে ভদ্রলোকের কাহিনী শুনিতে লাগিলাম।

বন্ধুর মত পরামর্শ দিচ্ছি মশাই, কখখনও কিন্তু প্রেমে-ট্রেমে পড়বেন না। পড়লেই স্রেফ মারা পড়বেন। উঃ, এসব কি আর ভদ্রলোক সইতে পারে? রীতিমত নুইসেন্স। আমার ব্যাপারটাই সংক্ষেপে শুনুন।

মঞ্জরী রায়ের প্রেমে পড়লুম। তাকে না পেলে আমার কত রকমের সর্ব্বনাশ হবে, তার একটা লম্বা ফর্দ্দ তাকে দিলুম। মঞ্জরী হেসে বললে, বেশ তো। আমি ধনী বাপের একমাত্র ছেলে, টাকা আমার কাছে খোলামকুচি। মঞ্জরী আমার টাকায় খুশিমত থিয়েটার বায়স্কোপ দেখতে লাগল, যখন তখন ফারপো, গ্রেট ইষ্টার্ন, চাংওয়া, গ্র্যাণ্ড হোটেল ক'রে বেড়াতে লাগল। মঞ্জরীর বাপেরও পয়সা কম ছিল না, কিন্তু মঞ্জরী বাপের টাকায় হাত দিতে অপমান বোধ করত। বলত, তোমার টাকা থাকতে আমায় পরের কাছে হাত পাততে হবে কেন? কত বড় সম্মানটা মঞ্জরী আমাকে দিলে, ভেবে দেখুন একবার।—বলিয়া আমাকে ভাবিতে সময় দিবার জন্যই বোধ হয় তিনি পকেট হইতে মনিব্যাগটি বাহির করিয়া ভিতরকার নয় টাকা চৌদ্দ আনা বাহির করিয়া গুনিয়া আবার রাখিয়া দিলেন এবং আবার শুরু করিলেন, কিন্তু বিয়ের কথা তুললেই মঞ্জরী নানা বাজে ওজুহাতে সে কথা এড়িয়ে যেত। জেরা করতে গেলেই তার চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠত, কিন্তু কিছু বলত না সে। বোয়, খুব ভাল পুডিং দেখি দুখানা।

চার আনা ক'রে? আরে বাপু, দাম জানতে চাইছে কে? সাধে কি আর শাস্ত্রে লিখেছে, 'যদা যদাহি ধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্'?

দুইজনের প্লেটে দুইখানা পুডিং আসিল ও উড়িয়া গেল। আরও দুইখানা এবং আরও দুইখানা। নীলকণ্ঠ-মার্কা হইলেও পুডিংটাই ওই কেবিনের সেরা জিনিস; তাহা ছাড়া পরস্মৈপদী বলিয়া ভোজনে পরমানন্দ লাভ করিলাম। ভদ্রলোক একটি পাঁচ টাকার নোট মনিব্যাগের মধ্য হইতে বাহির করিয়া ধাঁ করিয়া আমার কোটের পকেটে গুঁজিয়া দিয়া কহিলেন, এই পাঁচটি টাকা এ কেবিনে আজকে খরচা ক'রে যাবই, যেমন ক'রে হোক। ততক্ষণ থাক ও ব্যাটা আপনার পকেটে। গল্প শুনুন। ওরে ছোকরা, দে দেখি তোদের কি কি ভাল জিনিস আছে। ঠিক হিসেব ক'রে পাঁচ টাকা পুরিয়ে দিবি। এক পয়সা কম-বেশি হ'লে গাঁট্টা মেরে মাথা ফাটিয়ে দোব।...তারপর শুনুন মশায়। মঞ্জরীকে একদিন জোর ক'রে চেপে ধরলুম—মানে, চেপে ধরা ঠিক নয়, প্রশ্নের বাণে জর্জ্জর করলুম আর কি—বিয়ের কথাটাকে সে শুধু ধামাচাপা দিয়েই রাখতে চায় কেন? মঞ্জরী বললে, এবারকার বি এ. পরীক্ষার ফল বেরলেই জানতে পারবে। জানতে পারলুম, দু বার ফেল-করা পালোয়ান বন্ধু তৃতীয় বারে পাস ক'রে এসে আমাকে ঘুষি দেখিয়ে জানিয়ে গেল, মঞ্জরীর আশা যেন আমি ত্যাগ করি, কেন না সে তিন বারের মধ্যে বি.এ. পাস করতে পারলেই মঞ্জরী তাকে বিয়ে করবে ব'লে কথা দিয়েছিল। মঞ্জরী ছলছল চোখে জানালে, আমি জানতুম, টুল-বেঞ্চিরা যতদিন বি.এ. পাস না করছে, ততদিন বন্ধু কিছুতেই পাস করতে পারবে না। তাই তো ও রকম বলেছিলুম। এখন কি করি বল তো? তুমি তো বুঝতে পার, মনে মনে তোমাকেই আমি...। ভাবলুম, সত্যিই তাই, কেন না বন্ধু ছোঁড়ার চেহারা আমার চাইতে ভাল হ'লেও আমার ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্টের চেহারার কাছে একেবারে নট কিসস্যু। কিন্তু বন্ধু যেমন ষণ্ডা, তেমনই বেপরোয়া, কাউকে কেয়ার করে না। ওকে ডোণ্ট কেয়ার করার মত সাহস আমার ছিল না। বি.এ. পাস না করা পর্য্যন্ত নিজের প্রতিজ্ঞামত চুপ ক'রে ছিল, এইবার সে জোর ক'রে নিজের দাবি জানাতে লাগল। কালীঘাটে গিয়ে বললুম, মঞ্জরীকে বুঝি হারালুম। মা কালী, একটা বিহিত কর মা। মা কালী বিহিত করলেন। হঠাৎ একদিন শেষরাত্রে বন্ধুর বাড়ি সার্চ হয়ে গেল। কাগজপত্র তার স্যুটকেসে যা পাওয়া গেল, তার ফলে সরকারী অতিথিশালার দুয়ার তার জন্যে খুলে গেল, আর সে ঢুকতেই ঝপাং ক'রে বন্ধ হয়ে গেল। কত তদ্বির, কত দরখাস্ত, কিছুতেই কিছু হ'ল না। আমার কিন্তু মশাই সত্যি এতে কোনও হাত ছিল না—আমি শুধু মা কালীকে একটু বিহিত করতে বলেছিলুম মাত্র, বন্ধুর এ রকম অহিত করতে আমি বলি নি। অথচ অনেকের সন্দেহ হয়ে গেল, আমিই এ ব্যাপারের জন্যে পুরোপুরি দায়ী, বন্ধুর কাগজপত্রের গোপন খবর

যথাস্থানে আমিই দিয়েছিলুম। বন্ধুর ডজন খানেক পালোয়ান বন্ধু আমায় শাসিয়ে গেল, আমায় টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে গঙ্গার জলে না ভাসিয়ে দেওয়া পর্য্যন্ত ওরা টেরি কাটবে না। দেখুন, প্রেম করতে গিয়ে কি ফ্যাসাদ! অজয় ভটাচায্যি সাধে কি আর লিখে গেছে—'প্রেমের পূজায় এই তো লভিলি ফল'! আমি তো ভয়ে আর বেরোতে পারি না বাড়ি থেকে। বললুম, এ কি করলে মা কালী? মা কালী আর একবার বিহিত করলেন। যণ্ডারা সবাই বন্দী হ'ল। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি থেকে বেরলুম। কিন্তু আর এক চিন্তায় প'ড়ে গেলুম। মঞ্জরীর বাড়ি গিয়ে দেখি, সামনে টু-লেট ঝুলছে। পাড়ার কেউ বলতে পারলে না, কোথায় তারা গেছে। তারপর পুরো আটটি বছর চ'লে গেছে, আজও মঞ্জরী রায়ের দেখা পাই নি। খোঁজ করেছি অনেক, তবু খোঁজ পাই নি। আপনি সিগ্রেট খান তো? খান না? বেশ করেন। ফর নাথিং বাজে খরচা। দাঁড়ান সিগ্রেট ধরিয়ে নিই একটা।—বলিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে তিনি বলিতে লাগিলেন, আপনি বিশ্বাস করুন, মঞ্জরীকে আমার মনপ্রাণ পুরোপুরি দিয়ে ফেলেছিলুম। আর ফিরিয়ে নেবার উপায় ছিল না। তাই ও ব্যাপারের পর মন একেবারে ঝরঝরে হয়ে গেল। বাবাও আবার সময় বুঝে পটল তুললেন। সব সম্পত্তি এল আমার হাতের মুঠোয়। দু হাতে টাকা উড়িয়ে দিতে লাগলুম। মঞ্জরী নেই, কার জন্তে আর টাকার মায়া করব? শেষকালে সব ফুঁকে দিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালুম। ও কি?

ভদ্রলোক অকস্মাৎ যেন ইলেক্‌ট্রিক শক পাইয়া চমকাইয়া উঠিয়া ওধারের ফুটপাথে তাকাইয়া রহিলেন। দেখিলাম, একজন বেঁটে ভদ্রলোকের সঙ্গে একজন লম্বা ভদ্রমহিলা ফুটপাথ ধরিয়া চলিয়াছেন। প্রশ্ন করিলাম, কি হ'ল?

ভদ্রলোক কহিলেন, ওই দেখছেন, ভ্যানিটি-ব্যাগ হাতে ভদ্রমহিলা হাই-হীল জুতো প'রে খটখটিয়ে যাচ্ছেন, উনিই মঞ্জরী রায়।

বলেন কি?

কি আর বলব? এইজন্তেই কবি টেনিসন বলেছেন, 'Men may come and men may go, But I go on for ever,' আপনি একটু বসুন। ওই মঞ্জরী রায়কে যদি আজ এই রেস্তরাঁয় আনতে না পারি তো আমার নাম—।

বলিয়া তিনি মঞ্জরী রায়কে পাকড়াও করিবার জন্ত চট করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। সন্ধ্যা ঘনাইয়া রাত্রি হইয়া গেল, কিন্তু ভদ্রলোক তখনও ফিরিলেন না। বয় আসিয়া বিল দিল, দেখিলাম পুরাপুরি পাঁচ টাকা হইয়াছে। ভদ্রলোকের প্রত্যাবর্ত্তনের জন্ত আর অপেক্ষা না করাই ভাল। তিনি যে পাঁচ টাকার নোটটি আমার পকেটে জোর করিয়াই গুঁজিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা এইবার বাহির করিয়া দেখিলাম, একটি

পুরাতন সিনেমার টিকেট। প্রথমটা বড় দমিয়া গেলাম। পরক্ষণে নিজের মনিব্যাগ খুলিয়াই পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া দিলাম। ভাবিয়া দেখিলাম, লোকসান কিছুই হয় নাই। ভদ্রলোক ধাপ্পা দিয়া গেলেন বটে, কিন্তু গল্পের যে খোরাক দিয়া গেলেন, তাহার দাম অন্তত পাঁচটি টাকা হইবেই।

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা ও নূতন পরিকল্পনা

গত মহাযুদ্ধের পর প্রগতিশীল সকল রাষ্ট্রই নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করেছিলেন। শিক্ষা যে একটা সমগ্র জাতিকে কতখানি প্রভাবিত করতে পারে, তা অনেক দেশেই মনীষী এবং সংগঠকরা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই মোটামুটিভাবে গত মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী কালকে আমরা নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনার ও প্রবর্ত্তনের একটা যুগ-সন্ধিক্ষণ ব'লে মনে করতে পারি।

আমাদের দেশে শিক্ষার অভাব ও শিক্ষা-ব্যবস্থার গলদ আমাদের দেশের নানা শ্রেণীর লোকের মনেও একটা অস্বস্তির সৃষ্টি করেছিল। আমরাও অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে লেখাপড়া-জানা লোকের সংখ্যার স্বল্পতা দেখে উদ্বিগ্ন বোধ করছিলাম। তা ছাড়া স্কুল-কলেজের পাস-করা ছেলেমেয়েরা জীবনে স্বপ্রতিষ্ঠ হতে পারছে না, বেকার-সমস্যা ক্রমাগতই বেড়ে যাচ্ছে, এসব লক্ষ্য ক'রেও আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার কোথাও গলদ আছে—এই সন্দেহটাই মনে জাগছিল। কিন্তু অন্যান্য দেশ যেমন তাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আগাগোড়া বিশ্লেষণ ক'রে নূতন ছাঁচে গ'ড়ে তুলছিল, তেমন ভাবে আমাদের ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করবার বা সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নূতন ক'রে গ'ড়ে তোলার আয়োজন আমরা করি নি। আমাদের দেশটা গরিবের, ছেঁড়া কাপড় আমরা জোড়াতালি দিয়ে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত। ছেঁড়া-খোঁড়া শিক্ষা-ব্যবস্থাটাকেও আমরা জোড়াতালি দিয়েই ব্যবহারের উপযোগী ক'রে তোলার চেষ্টা করেছিলাম। আমাদের মুখুজ্জে মশাই তাঁর বিরাট শক্তিকে নিয়োজিত করেছিলেন স্কুল-কলেজের সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়ে তুলতে, পাশ্চাত্যের অনুকরণে বিশ্ববিদ্যালয়ের পর বিশ্ববিদ্যালয় খাড়া ক'রে তুলতে। তাঁর এই প্রচেষ্টাকে অনুসরণ ক'রেই আমরা এতদিন পর্য্যন্ত প্রধানত আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কারের চেষ্টা করেছি। আমরা কখনও সন্দেহ করি নি যে, গলদটা আমাদের ব্যবস্থার মধ্যেই রয়েছে। বিষের গাছকে যত্ন ক'রে বাড়ালেই তাতে

অমৃতের ফল ধরে না, বিষ-ছড়ানোর ব্যবস্থাটাই পাকাপোক্ত হয়। বছরের পর বছর ধ'রে আমরা যে শক্তি দিয়ে স্কুল-কলেজের সংখ্যা বাড়িয়ে তোলায় প্রাণপণ চেষ্টা করেছি, তাতে সমগ্র জাতির মঙ্গল যতটুকু হয়েছে তার চাইতে অমঙ্গলই হয়েছে বেশি, শিক্ষিতদের মধ্যে হিংস্র পশুর মত স্বার্থের কাড়াকাড়ির নিত্যনৈমিত্তিক অভিযান দেখে এ বিষয়ে কারও সন্দেহ থাকার কথা নয়। তবু আমরা বিরাট ব্যয়ে নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় খুলছি, ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়িয়েছে অন্দরের থালা-ঘটি-বাটি বন্ধক দিয়ে বৈঠকখানা সাজাবার মত।

আমরা যে শুধু অস্বস্তিই বোধ করেছি, গলদটা ঠিক কোথায় তা নির্দ্দেশ ক'রতে পারি নি, তার কারণ প্রধানত দুইটি। প্রথমত পর্য্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ শক্তিকে নষ্ট ক'রে দেবার আয়োজন আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাটার মধ্যেই রয়েছে;—নইলে অন্ধভাবে বিদেশী-ভাষার বিরাট ভূতকে শিশুর ওপর চাপিয়ে দিয়ে আমরা ইংরেজীনবিস হচ্ছি ব'লে গর্ব্ব অনুভব করতাম না বা একটা বিদেশী ভাষা শেখার প্রাণপণ চেষ্টায় জীবনের এতখানি মূল্যবান সময় নষ্ট করতাম না।

প্রত্যেক শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যেই, সে যে রকমই হোক না কেন, একটা আদর্শ থাকে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যে, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে, এই আদর্শের প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে। এর প্রভাব এত বড় যে, সমগ্র জাতির ভাগ্য এরই দ্বারা পরিচালিত হয়, যতক্ষণ না পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর চাপে এর ঘোর কেটে যায়। শিক্ষার এই বিরাট প্রভাব সম্বন্ধে সচেতনতাই বিগত মহাযুদ্ধের পর বিভিন্ন জাতির নূতন ক'রে শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনা গ'ড়ে তোলার মূলে রয়েছে। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাব যে, শিক্ষার্থীকে সর্ব্বতোভাবে নির্ভরশীল ক'রে তোলাই এই ব্যবস্থার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। হাতে-খড়ির পর শিশু যেদিন থেকে বিদ্যালয়ের শীর্ণ পরিসরের মধ্যে প্রবেশ-লাভ করে, সেদিন থেকে তার স্বাধীন ইচ্ছা ও চিন্তাকে বলিদান করাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে আদর্শ ব'লে ধরা হয়। যার কোন স্বাধীনতার বালাই নেই, সজীব ইচ্ছাশক্তি যার মধ্যে নিষ্ক্রিয়, সেই আমাদের দেশে ভাল ছেলে! বিদ্যালয়ে যে ছেলেটি বিনা প্রশ্নে, নির্ব্বিরোধে বইয়ের ছাপার অক্ষরের মন্ত্রগুলি হজম করে, নিজে পরখ না ক'রে বিনা অনুসন্ধানে যে পরের ভাষায় নিজের ঘরের কথা অনর্গল ব'লে যেতে পারে, তাকেই আমরা পুরস্কার লাভের উপযুক্ত ব'লে বিবেচনা করি; বিদ্যালয়কে বিন্দুমাত্র আকর্ষণীয় না ক'রে তুললেও, যারা কেবল আদেশ ও উপদেশ পালন করার জন্ম নিত্য বিদ্যালয়ে আসে, তাদেরই দিকে আমরা সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি। এই একান্ত মন্থণ বাধ্যতা ও প্রশ্নহীন নির্ভরতা আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থারই জারজ সন্তান। আবাল্যের এই অভ্যাসই আমাদের দাসত্ব ও পরমুখাপেক্ষিতার মনোভাবকে দৃঢ়তর করেছে।

আমাদের দ্বিতীয় অক্ষমতার কারণ, পাশ্চাত্য সভ্যতার বিদ্যুৎস্ফুরণের প্রতি অন্ধ শ্রদ্ধা। একে আমরা যাচাই ক'রে গ্রহণ করি নি, ওটা আমাদের ওপর চেপে বসেছে চাষীর কাদা-মাখা গায়ে ফরসা কোটের মত। পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলে যে শক্তি, তা হচ্ছে অন্যের শক্তিকে নিষ্পেষিত ক'রে নিজের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করার শক্তি। এটা ব্যায়াম ক'রে শক্তি বাড়ানো নয়, নিজকে উন্নত করা নয়, ওটা অন্যের রক্তে নিজের জোর বাড়ানো। এ সভ্যতাটা তাই যখন পরের দিকে তাকায়, তখন অন্যকে নিষ্পেষিত ক'রে নিজেকে কি ক'রে আরও মহিমান্বিত ক'রে তুলবে এই কথাটাই ভাবে। বাইরের লোকের চোখে এই মহিমাটাই পড়ে, বিরাট প্রাসাদ বিরাট যন্ত্র দেখেই আমরা ভুলি, পর পর দুইটা মহাযুদ্ধের অবতারণা দেখেও আমরা এর গোড়ার দুর্ব্বলতাটুকু ভাল ক'রে দেখতে পাই নি। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাটা এই সভ্যতারই সৃষ্টি, তাই প্রতিযোগিতাকেই এই শিক্ষা পুষ্ট ক'রে তোলে, সহযোগিতাকে নয়।

আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার এই দুইটি গলদই আমাদের দেশের কোন কোন মনীষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন ধ'রে কোন কথাই এত বার বার বলেন নি, যতটা বলেছেন আমাদের জাতীয় জীবনের এই দুষ্ট ব্রণটির কথা। বিদ্যালয়ের পলাতক ছেলেকে যেদিন বিশ্ববিদ্যালয় তার গণ্ডির মধ্যে সসম্মানে আমন্ত্রণ করেছিল, সেদিন তিনি সেখানে প্রবেশ করেছিলেন আনন্দে বিগলিত হয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসা করতে নয়, দুঃখের কথা জানাতে। হয়তো তাঁর ভরসা ছিল যে, অপাঠ্য পুঁথিতে লেখা তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিবাগীশরা উপেক্ষা ক'রেও থাকেন, তবু হয়তো তাঁদের সর্ব্ববিশ্বাসের কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদী থেকে উচ্চারিত কথাগুলি একটু আলোড়নের সৃষ্টি করবে। তাঁর সে বিশ্বাস তাঁর অনেক স্বপ্নেরই মত কার্য্যকরী হয় নি।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার মূল ব্যাধিটাকে সনাক্ত করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, বিদ্যালয়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি থেকে শিক্ষাকে জীবনের সুদূরপ্রসারী ক্ষেত্রে নিয়ে যেতে, পাশ্চাত্য সভ্যতার আত্মঘাতী আদর্শ থেকে শিক্ষাকে রক্ষা করতে। কিন্তু বস্তুতান্ত্রিক জগতের বিশ্লেষণের চাঁচা-ছোলা যন্ত্রপাতি নিয়ে কোমর বেঁধে তিনি কাজেতে নামতে পারেন নি, নানা কারণে কবির কল্পদৃষ্টির মধ্য দিয়েই তিনি আমাদের দুরদৃষ্টের কুয়াশা-ঢাকা সত্যের স্বরূপ দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি নির্দ্দেশ দিয়ে গেছেন, কিন্তু সুনির্দ্দিষ্ট পথ দেখিয়ে যেতে পারেন নি। পরীক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতিকে তিনি একেবারে উপেক্ষা করতে পারেন নি, যদিচ তিনি বিশ্ববিদ্যালয় বলতে এখনকার যান্ত্রিক সিঁড়িহীন, অপাংক্তেয় কাঠামোটাকে বুঝতেন না, কল্পনা করতেন বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সজীব সমগ্র শিশু-মূর্ত্তিটিকে। কিন্তু ওই ছিদ্রপথেই শনি তার প্রবেশের পথ ক'রে নিয়েছে,

তাঁর গড়া বিশ্বভারতী মামুলী শিক্ষালয়ের উঁচু-নীচু পরীক্ষার ছাঁচে ঢালা একটু স্বতন্ত্র আর একটি বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে, সমগ্র জাতির মধ্যে নূতন একটা প্লাবন আনতে পারে নি, নূতন একটি পথ ও পরীক্ষার নির্দ্দেশের মত এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে।

দগদগে ঘা-টার ওপর নির্ম্মমভাবে ছুরি চালাবার জন্য গান্ধীজীর মত একজন ডাক্তারের প্রয়োজন ছিল। নিরাসক্ত ডাক্তারের মতই রুচিকে উপেক্ষা ক'রে তিনি প্রাণ-রক্ষার দিকে সমগ্র মনোযোগ দিতে পেরেছেন। আমাদের আসল রোগটা হচ্ছে যে, আমরা কিছু বুঝতে বা করতে পারছি না, কিন্তু আমরা সে সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা না করে বিদ্যালয়ের ঘরগুলিকে চুণকাম করতে লেগে গিয়েছি। এই বিদ্যালয়গুলি চাষাকে চাষের কাজ শেখায় নি, তাঁতীকে তাঁত বুনতে শেখায় নি, যার যা করার ক্ষমতা আছে তাকে তা করার সুযোগ এবং শিক্ষা দেয় নি, দেশবাসীকে দেশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় নি, অথচ চাষীর ছেলেকে বাবু বানিয়ে, তাঁতীকে কেরানী গ'ড়ে দেশের মধ্যে একটা অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি করেছে। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা ঐতিহাসিকভাবে পরিকল্পিত হয়েছিল কোম্পানির কাজের জন্য উপযুক্ত কেরানী গড়তে। সে পরিকল্পনা আজ পরিবর্ত্তিত হয় নি, সুতরাং কেরাণী গড়ার যন্ত্র কেরানীই গড়ুক, ওটাকে মানুষ গড়ার কাজে লাগানোর চেষ্টা করা বৃথা। সমগ্র জাতিকে কেরাণীতে পরিণত করা যায় না জেনেও যে আমরা এই শিক্ষা-ব্যবস্থাকেই ব্যাপকতর করবার চেষ্টা করেছি সেটা আমাদেরই অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পাশ্চাত্যের যে আদর্শের অনুকরণে পরিকল্পিত হয়েছিল, সে ব্যবস্থাকে পাশ্চাত্য শতভাবে পরিবর্ত্তিত করেছে। শিক্ষাকে নিয়ে কতভাবে পরীক্ষা যে ওরা করেছে তার ইয়ত্তা নেই। মরা নদীর মত আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা স্থির, স্থান-কাল-পাত্রভেদে এর কোন পরিবর্ত্তন হয় না, বাস্তবের সঙ্গে একে মানিয়ে নেবার কোন ব্যবস্থা নেই; তাই অব্যবস্থাকে কেন্দ্র ক'রে এত বীভৎসতা জন্ম নিয়েছে।

আমাদের শিশুদের ভার যাঁদের হাতে, তাঁদের কোন শিক্ষা, কোন উপযোগিতাই নেই, এঁরাই জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে শিশুর জীবনের শিক্ষার প্রতি প্রথম আগ্রহকে বিভীষিকায় পরিণত করেন; প্রথম থেকেই আমাদের বিদ্যালয়গুলির কাজ হচ্ছে শিশুকে এইটুকু ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া যে, বিদ্যালয়টা জীবনের অন্য সব কিছু থেকে আলাদা, এই সময়টা হাসতে মানা, পৃথিবীর দিকে চাইতে মানা, সহজ হতে মানা। বইয়ের পৃথিবীর ভেতর দিয়ে চলতে হ'লে রামগরুড়ের ছানা হয়ে থাকতে হবে। শিক্ষাকে এমন ক'রে স্বাভাবিক জগৎ থেকে আলাদা ক'রেই আমরা শিশুর বিতৃষ্ণাকে জাগ্রত করি। যার পক্ষে ছুরি থেকে কাঁচিকে আলাদা করা কঠিন নয়, বিড়াল থেকে কুকুরকে আলাদা করা কঠিন নয়, তার পক্ষে ক থেকে খ-কে আলাদা করা একটা প্রকাণ্ড সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় এইজন্য

যে, আমরা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পথটাকে একেবারে উল্টে ধরি, তথ্য দেবার আগেই তত্ত্ব কপচাতে শুরু করি। হাত-পা মুড়ে এক জায়গায় ব'সে থাকা শিশুদের পক্ষে অসহ্য—ওটা তার সজীবতারই লক্ষণ, তাই তারা প্রাণের প্রাবল্যে ছটফট ক'রে একটা কিছু গড়তে বা ভাঙতে চায়। যদি তাদের কিছু শেখাতে হয়, তবে ওই ভাঙা-গড়ার খেলার মধ্য দিয়েই শেখাতে হবে, শিক্ষকের কাজ সেই খেলাকে সুপরিচালিত ক'রে অর্থময় কাজে পরিণত করা। আমাদের তাই প্রথম সমস্যা, কি ক'রে কাজকে শিক্ষার বাহন ক'রে তোলা যায়।

দ্বিতীয়ত, আমাদের সমাজের সঙ্গে শিক্ষার কোন যোগ নেই। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাটা ভিক্ষুক তৈরি করার যন্ত্রস্বরূপ—তাই আমরা এত অবজ্ঞার সঙ্গে বিদ্যালয়গুলির দিকে তাকিয়ে থাকি। শিক্ষা আমাদের জীবনের জন্য প্রস্তুত করে না, তাই জীবনের সব চাইতে সুন্দর, সজীব, কর্মক্ষম সময়টুকু বিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটিয়েও আমাদের ওর বাইরে এসে কি করব এই ভাবনা নূতন ক'রে ভাবতে বসতে হয়। জগতের চলমান স্রোতের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ঘটাবার এবং সমস্যার সমাধান করবার মত শক্তি অর্জন করার কোন ব্যবস্থাই বিদ্যালয়ের মধ্যে নেই ব'লেই এই অবস্থা ঘ'টে থাকে। সুতরাং শিক্ষাকে নূতন ক'রে গড়তে হ'লে সমাজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রাচীরটা কি ক'রে ভেঙে ফেলা যায়, সে কথা আমাদের ভাবতে হবে। বিদ্যালয়গুলি যে সমাজের বোঝা নয়, সমাজের ঐশ্বর্য্য বাড়াবার কেন্দ্র, সেটা প্রমাণিত করতে হবে।

বইয়ের কতগুলি কথা মুখস্থ করাই আমাদের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত; ছাত্র-ছাত্রী জীবনে সেগুলি প্রয়োগ করে কি না, তা দেখার কোন দায়িত্ব বিদ্যালয়ের নেই। যে কোন রকমে পরীক্ষা-পাসের ছাপটা জুটলেই সবাই খুশি। এই ব্যবস্থাই আমাদের বিদ্যালয়ে ভাল ভাল বুলি মুখস্থ করতে এবং জীবনে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিতে শিখিয়েছে। আমরা 'সত্য কথা বলিবে' 'অন্যের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে' ইত্যাদি মুখস্থ করি, কিন্তু সত্য কথা বলি না বা কারও সঙ্গেই সদ্ব্যবহার করি না। জীবনের মধ্যে খানিকটা পুঁথিগত জ্ঞান আত্মসাৎ করাই আমাদের মতে শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত, তা ছাড়া জীবনের সমগ্র ব্যাপক অংশটিকেই আমরা অবজ্ঞার সঙ্গে হরিজনের দলে ফেলে রাখি। সুতরাং কি ক'রে শিক্ষাকে জীবনে প্রয়োগ করার কাজে লাগানো যায়, এই আমাদের আর একটি সমস্যা। এত এত শিক্ষা কি ক'রে আমাদের সমাজের অর্থনৈতিক এবং নৈতিক সংস্কারে সহায়ক হবে, সে কথা আমাদের ভাবা প্রয়োজন।

শিক্ষাকে একটা নূতন রূপ দেবার আশু প্রয়োজন দেশের অনেকেই অনুভব করছেন। ওয়ার্ধায় হিন্দুস্থানী তালিমি সঙ্ঘের উদ্যোগে গান্ধীজীর অনুপ্রেরণায় একটি শিক্ষা-ব্যবস্থার খসড়া তৈরি করা হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রদেশে একে ব্যাপকভাবে রূপ দেবার চেষ্টাও চলছে। কিন্তু বাংলা দেশে এখনও পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনাই

হয় নি। এই ব্যবস্থার ভিত্তি মোটামুটি চারটি প্রস্তাবের ওপর :—(১) সাত বছরের প্রাথমিক, সার্ব্বজনীন, অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, (২) শিক্ষার বাহন হবে কাজ, এবং সমাজ ও আবেষ্টনীর সঙ্গে শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করতে হবে, (৩) শিক্ষাকে আর্থিকভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠ করতে হবে, (৪) সত্য ও অহিংসার ওপর শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করতে হবে।

আমরা শান্তি, পবিত্রতা, সহযোগিতা, ন্যায়নিষ্ঠতা প্রভৃতি অনেক কিছু ভাল ভাল জিনিসের জন্ত চীৎকার করছি, কিন্তু ভবিষ্যতে যারা ভারতের নাগরিক হবে, তাদের তেমন ভাবে গ'ড়ে তুলছি কি? শূন্ত ভাণ্ডারের শিখণ্ডীকে সামনে দাঁড় করিয়ে আমাদের শাসকরা বহুদিন আমাদের শিক্ষা-সম্প্রসারণকে অচল ক'রে রেখেছেন। ওয়ার্দ্ধা-ব্যবস্থা দাবি করছে, শিক্ষার এসব প্রাথমিক সমস্যা জয় করা যায়। তবু যে কেন আমরা দীর্ঘ সাত বৎসরের মধ্যে এটাকে পরীক্ষা ক'রে দেখারও সময় পাই নি, সেটাই আশ্চর্য্য। বারান্তরে শিক্ষা-ব্যবস্থার এই নূতন আদর্শটি সম্বন্ধে আলোচনা করার বাসনা রইল।

শ্রীঅনিলমোহন গুপ্ত

সংবাদ-সাহিত্য

এশিয়ার পূর্ব প্রত্যন্তের তিনটি মহাদেশ—ভারতবর্ষ, চীন এবং জাপান—তিন মহাদেশেই প্রাচ্য মানুষের বাস, অথচ কত বিভেদ! ভারতবর্ষ পরাধীন, চীন স্বাধীনতা এবং পরাধীনতার মাঝখানে দোল খাইতেছে, জাপান স্বাধীন। আধ্যাত্মিকতা লইয়া উল্লাস অথবা বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতাকে নারকীয় বা পৈশাচিক আখ্যা দিয়া নিন্দা করা সহজ। সেদিক দিয়া বিচার করিব না। ভোগবাদ নয়, জীবনবাদের সহজ বিচারে আমরা মৃত অথবা মুমূর্ষু, চীন অর্ধসচেতন, জাপান সম্পূর্ণ জীবন্ত। আমাদিগকে মারিয়া ফেলা হয়, চীন মরেও মারেও, জাপান স্বেচ্ছায় মরে অথবা বাঁচে। আয়োজন উপকরণ সবই প্রায় এক, শুধু স্বাধীনতার ইতরবিশেষে একে আরে আসমান-জমিন ফারাক্ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। দেড় শত পৌনে দুই শত বৎসর পূর্বে আমরা ঠিক কি ছিলাম ব'লতে পারিব না; কিন্তু ওই পরিমাণ কাল ইংরেজের সুশাসনে এবং স্নেহচ্ছায়ায় নজরবন্দী থাকিয়া আমরা কি হইয়াছি, ডাইনে বাঁয়ে সামান্ত একটু চোখ চাহিয়াই তাহা অনুভব করিতে পারি। সুখের বিষয়, মর্মান্তিকভাবে লজ্জিত হইবার মত চেতনা আমাদের অবশিষ্ট নাই।

নাই বলিলে ভুল হইবে, এই চেতনা আমাদের ছিল না। যতদিন ছিল না, ততদিন ইংরেজ আমাদের কি ভালটাই না বাসিত! আমাদিগকে পুতুপুতু করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া শোয়াইয়া খাওয়াইয়া কোমরে ঘুন্‌সি বাঁধিয়া হাতে চুষিকাঠি দিয়া আদর-আপ্যায়নের অবধি ছিল না, উপরি-চাকুরির চরম করিয়া মৃত ও মুমূর্ষুর মধ্যেও তাহারা রেষারেষি-ঈর্ষার বান ডাকাইয়া ছাড়িয়াছিল। আমরা বিগলিত হইয়াই ছিলাম; মাঝে মাঝে রোগীসুলভ আবদার-বায়না করিতাম—কখনও চোখরাঙানি, কখনও আদর, তাহাতেই আমাদের ক্ষীণ প্রাণবিন্দু টলমল করিয়া উঠিত। সহস্র বৎসরের রোগশয্যায় আমরা কৃতার্থ হইয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া নিশ্চন্ত আরামে ঘুমাইয়া পড়িতাম। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি সামান্য রুজির লোভে আমাদিগকে ওই শিক্ষাই দিয়া আসিয়াছিল।

কবে ঘুম ভাঙিল, কবে চেতনার সঙ্গে সঙ্গে বেদনা বোধ হইল, সেই ইতিহাস ক্রমশ-প্রকাশ্য। তাহারই উপকরণ সংগ্রহের কাজে আমরা লাগিয়াছি। বিস্ময়ের সঙ্গে বহু বিচিত্র ব্যাপার আমাদের নজরে পড়িতেছে। সব গুছাইয়া এই ইতিহাস যিনি রচনা করিতে পারিবেন, তিনি দ্বিতীয় বেদব্যাসের সম্মান পাইবেন। নব মহাভারত সৃষ্টি হইবার অপেক্ষায় রহিয়াছে। শতধাবিদীর্ণ বেদনার কাহিনীতে ভারতবর্ষের আকাশ-বাতাস ইতিমধ্যেই করুণ ও ভারী হইয়া উঠিয়াছে; বহুকে, বিচ্ছিন্নকে এক করিয়া যে মহাকবি মহাকাব্য রচনা করিবেন; আমরা তাঁহারই প্রতীক্ষায় আছি, খণ্ড-খণ্ডভাবে আমরা প্রত্যেকে তাঁহারই কাজ আগাইয়া রাখিতেছি। কবে সর্পযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবে, কবে আসিবেন ঋষি বৈশম্পায়ন, নৈমিষারণ্যের যুগান্তরের জড়তা ভাঙিয়া কবে আবার নরোত্তম নারায়ণের বন্দনাগান ধ্বনিত হইয়া উঠিবে, প্রাচীন অখণ্ড ভারতবর্ষ তাহারই দিন গণিতেছে। সেই শুভদিন কি আমাদের আয়ুর আয়ত্তে আছে? কে জানে!

• • •

১৯২০-২১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ কবি এবং সাহিত্যিক ই. ভি. লুকাস ভারতবর্ষে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন মাত্র কয়দিনের জন্য। অসহযোগ-আন্দোলন তখনও আরম্ভ হয় নাই, তাহার প্রস্তাবমাত্র অর্ধজাগ্রতদের মধ্যে কৌতুক-কৌতূহলের সৃষ্টি করিয়াছে। ই. ভি. লুকাস দেশে ফিরিয়া 'রোভিং ইষ্ট অ্যাণ্ড রোভিং ওয়েষ্ট' নামক বই লিখিলেন। ভারতবর্ষ-অংশের প্রথম অধ্যায়ের তিনি নাম দিলেন "নয়েজলেস ফীট"—নিঃশব্দ পদচারণ। তিনি লিখিলেন—

"ভারতবর্ষ যদিও পথচারীর দেশ, এখানে কিন্তু পায়ের শব্দ শোনা যায় না। অধিকাংশ পা-ই নিরাবরণ এবং সবই প্রায় নীরব। পথ চলিতে গেলেই কালো কালো ছায়ামূর্তিগুলিকে প্রেতের মত বোধ হয়। শহরে গ্রামে যেখানেই যাও, এই পথচারীরা পথ চলিতেছে। গরুর গাড়িও আছে, মোটর-গাড়িও আছে, অন্যান্য বিচিত্র যানবাহনেরও

অভাব নাই, কিন্তু বেশির ভাগ লোকই পায়ে হাঁটিয়া পথ চলিতেছে, পথচলার বিরাম নাই। বাজারে যাও—হাজারে হাজারে তাহাদের দেখিতে পাইবে, সুদূরপ্রসারী ধূলিধূসর পথে মাইলের পর মাইল চলিয়া যাও—দেখিতে পাইবে এক বা একাধিক ক্লান্ত পথিক হয় আসিতেছে, নয় যাইতেছে।

এই ক্লান্ত একঘেয়ে পায়েচলা মাত্র একবার দ্রুত ও চঞ্চল হইতে দেখা যায়, যখন ইহারা স্কন্ধে মৃতদেহ বহন করে।...

হাত? ভারতবাসীদের সম্বন্ধে গোড়ার আর একটি অনুভূতি হইতেছে এই যে, উহাদের হাত অক্ষম। তাহাতে শক্তির কোন প্রকাশ নাই।

হাঁ, এই জাতি শুধু যে অবিরাম পায়ে হাঁটিতেছে তাহাই নয়, অবিরাম আরামও করিতেছে। ঘুম পাইলেই যেখানে খুশি ইহারা লম্বা হইয়া শুইয়া পড়ে অথবা দুই হাঁটু জড়ো করিয়া বসে। ইংলণ্ড হইতে প্রথম আসিয়া সারা দেশজোড়া এই জড়তা দেখিয়া বিস্ময় বোধ হয়।...এই বিস্ময় আরও বাড়িয়া যায় যখন এই পূর্ণশায়িত দার্শনিকের দেশ, সহজেই-ঘুমে-পটুর দেশ ভারতবর্ষ ছাড়িয়া জাপানে প্রবেশ করা যায়। সেখানে অলসদের ঠাঁইও নাই, কালও নাই। ভারতবর্ষের পথে পথিককে সর্বদা সতর্ক হইয়া চলিতে হয়, ঘুমন্ত কোনও মানুষকে বুঝি বা মাড়াইয়া দিলাম—পথই সেখানে প্রকৃষ্ট বিশ্রাম-স্থল—জাপানে সম্পূর্ণ বিপরীত—সেখানে কেহ কখনও চুপ করিয়া বসিয়া নাই, কাহাকেও অবসন্ন অথবা গরিব বলিয়া বোধ হয় না।

India, save for a few native politicians and agitators strikes one as a land destitute of ambition. In the cities there are infrequent signs of progress; in the country none. The peasants support life on as little as they can, they rest as much as possible and their carts and implements are prehistoric. They may believe in their gods, but fatalism is their true religion.

—কয়েকজন কালা পলিটিশিয়ান ও হুজুগে লোক ছাড়া ভারতবর্ষকে আশাহীনের দেশ বলিয়া বোধ হয়। শহরে প্রগতির ছিটেফোঁটা দেখা গেলেও গ্রামে তাহার লেশমাত্র নাই। চাষারা সামান্যতম আহার্যে জীবন-ধারণ করে, প্রভূততম বিশ্রাম গ্রহণ করে এবং তাহাদের যানবাহন হাতিয়ার প্রাগৈতিহাসিক। দেবতাতে তাহাদের বিশ্বাস থাকিতে পারে, কিন্তু আসলে তাহারা অদৃষ্টবাদী।"

* * *

লুকাস সাহেব কবি, মনের আবেগে এই পর্যন্ত লিখিয়াই তাঁহার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিয়াছে। তিনি হঠাৎ অনুভব করিয়াছেন, দেড় শত বৎসর ইংরেজ-শাসনে থাকার পর ভারতবর্ষের এই অবস্থা সমীচীন নয়। ইহাতে স্বজাতির নিন্দা রটিতে পারে, সুতরাং তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া রচনায় একটু প্রাচ্য পাক (twist) দিয়া এই বলিয়া

কৈবল্যমার্গের জয়গান করিতে করিতে শেষ করিয়াছেন—"It is true philosophy to be prepared to live in such a state of simplicity. Most of the problems of life would dissolve and vanish if one could reduce one's needs to the frugality of a fakir.—এই প্রকার অনাড়ম্বর জীবনযাপন করিতে প্রস্তুত হওয়াটা খাটি দার্শনিকতা। মানুষ নিজের প্রয়োজন সমূহকে কমাইয়া যদি ফকিরের সংযম অভ্যাস করিতে পারে, তাহা হইলে তো জীবনের সকল সমস্যাই গলিয়া উবিয়া যায়।"

ঠিক। এই মোহগ্রস্ত অবস্থাতেই আমারা 'ইংলণ্ডস ওয়ার্ক ইন ইণ্ডিয়া' লিখিতে পারিয়াছিলাম, পোষ্টঅফিস টেলিগ্রাফ রেলওয়ে ইলেকট্রিসিটির সমস্ত গৌরব ইংরেজের স্কন্ধে চাপাইয়া বহু কৃতজ্ঞতা বোধ ও প্রকাশ করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম। আজ সামান্য চৈতন্যসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারিতেছি, নাকের বদলে নরুনের মত উক্ত জাতীয় যাবতীয় সুবিধা আমরা অর্জন করিয়াছি, ইংরেজ আমাদিগকে দেয় নাই। আমাদের অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য পূরাদস্তুর শিক্ষা (পাশ্চাত্য মতে) দিতে পারিত, তাহারা তাহা দেয় নাই। আজ আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, ইংরেজের তাঁবে না আসিয়াও জাপান পাশ্চাত্য সভ্যতার সেই সকল সুবিধাই প্রভূতভাবে ভোগ করিতেছে, যাহা লইয়া ভারতবর্ষে ইংরেজ এবং ইংরেজভক্তরা আজিও বড়াই করিয়া থাকেন। আমরা কিছুই পাই নাই, অথচ আমাদের সর্বস্ব গিয়াছে, এই রূঢ় সত্যটি বুঝিবার মত শিক্ষা দেশের মুষ্টিমেয় লোককে দিয়াই প্রভুদের চৈতন্য হইয়াছে, তাই আজ সর্বসাধারণের শিক্ষার পথে সহস্র বাধার উদ্ভব হইতেছে, কম্যুনাল এডুকেশন, সেকেণ্ডারি এডুকেশন, টেক্সট-বুক কমিটি প্রভৃতি ভাঁওতায় আসল শিক্ষা সুদূরপরাহত হইয়াছে—শিক্ষক-সম্প্রদায়, দেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সম্প্রদায় আজ অসহায় বিপন্ন ও নিরন্ন। গত ১৬ ডিসেম্বর দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে সার্ মরিস গয়ার মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, সারা ভারতবর্ষে শিক্ষকদিগকে যে হীনতার মধ্যে চাকুরি লইতে বাধ্য করা হয়, যে কোনও গবর্মেণ্টের পক্ষে তাহা অতিশয় নিন্দনীয় ও কলঙ্কজনক। তিনি বলিয়াছেন, শিক্ষকেরা নিশ্চিত বিলুপ্তির পথে যাইতেছে জানিয়াও গবর্মেণ্ট নিশ্চেষ্ট আছেন, তাঁহাদের ব্যবহারে একান্ত হৃদয়হীনতাই প্রকাশ পাইতেছে। সার্ মরিস গয়ার যাহাই বলুন, ভারতবর্ষে শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতিবিধান মানেই ইংরেজ-শাসনের অপমৃত্যু। বাতুল ছাড়া নিজের হাতে কেহ নিজের মৃত্যু ঘটাইতে পারে না। ইংরেজ-সরকার বুদ্ধিমানের মতই কাজ করিতেছেন।

এই কাজ আমাদের নিজেদের করণীয়, গবর্মেণ্টের সহায়তা ব্যতিরেকেও জাতির শিক্ষা-ব্যবস্থা দৃঢ়তর ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে হইবে। লর্ড ওয়াভেল—ভারতবর্ষের

একচ্ছত্র বড়লাট বাহাদুর গত শনিবার (১৬ ডিসেম্বর) কানপুরে সেবাসেবিকাদের অভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন, হয়তো এই ক্রন্দনেরই ফলে দেশী-বিদেশী স্বেচ্ছাসেবিকারা হাজারে হাজারে দয়াধর্মপ্রকাশে অগ্রসর হইবেন, সরকারী ভাণ্ডার অবারিত হইবে, কিন্তু ভারতবর্ষের সার্বজনীন শিক্ষার বারংবার চিন্তিত পরিকল্পনা পরিকল্পনাই থাকিয়া যাইবে, কোনও দিনই অন্ধের চক্ষু ফুটিবে না। আঘাতে আঘাতে যেটুকু চৈতন্যোদয় আমাদের হইয়াছে, তাহার ফলে দেশের শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায় যদি নিরক্ষর অজ্ঞ দেশবাসীর শিক্ষার কাজে অগ্রসর হন, তাহা হইলে অজগরের নাগপাশ খুলিতে বিলম্ব হইবে না।

* * *

সকল বাধা সত্ত্বেও আমাদের জাতীয় চেতনা, আমাদের নিঃস্বতার পরিমাণবোধ যে জাগ্রত হইতেছে, তাহার আভাস আজ ভারতবর্ষের সর্বত্র দেখিতে পাইতেছি। এইটুকু চাঞ্চল্যই নিরন্ধ্র অন্ধকারে আমাদের আশা। এই চাঞ্চল্যের ঢেউ শুধু ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ নয়, ভারতের বাহিরেও সত্যকার মানুষ যাঁহারা—যাঁহারা লোভী নন, সাম্রাজ্যবাদী নন, তাঁহারা প্রত্যেকেই সমবেতকণ্ঠে নিপীড়িত পরাধীন জাতিসমূহের কল্যাণ কামনা করিতেছেন। জর্জ বার্নার্ড শ, বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রভৃতি মহারথীদের কথা বাদই দিলাম—ইঁহারা বিশ্বপ্রাণ ব্যক্তি—ফেনার ব্রকওয়ে, এডওয়ার্ড টমসন প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ইংরেজরাও সম্প্রতি ভারতীয় সমস্যার সমাধান-চেষ্টায় কর্তৃপক্ষকে তৎপর হইতে বলিতেছেন। টমসন সাহেব স্বীকারই করিয়াছেন, যে ভারতবর্ষের অন্নে ইংলণ্ড পরিপুষ্ট সেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরেজ সামান্য খবরই রাখিয়া থাকে, তাহাদের অজ্ঞতা লজ্জাকর। আমরা এখানে আর একজন ইংরেজের কথা উদ্ধৃত করিতেছি, যিনি স্বচক্ষে দীর্ঘকাল ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষের অবস্থা দেখিয়া গিয়াছেন এবং ভারত-সমস্যার সত্বর সমাধান চাহেন। ইঁহার নাম লায়োনেল ফীল্ডেন। ইঁহার *Beggar My Neighbour* বইখানির ভারতীয় সংস্করণ মাত্র কয়েক মাস পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি বলিতেছেন :

No solution of the Indian problem will ever be found until and unless we on our part, and Indians no less on theirs, are willing to recognize these "blind spots" : no solution, that is, which would absolve Britain from tyranny, and make India her friend. A solution of one kind or another is of course coming : it is daily taking shape, but the shape which it is taking is an evil one for Britain, and very possibly for India too. The profound social and economic changes deriving from—and also causing—the disruptive effects of war are not, and will not be, arrested by a political deadlock, though the deadlock may dangerously

obscure their advance. However engagingly His Majesty's Complacent Ministers may tell us that this fog of obscurity is the "restoration of law and order" or "the only thing we could do," it is a fog in which the last remnants of British-Indian collaboration may be irretrievably lost. And for my part I believe that it is important for Britain, for India, and for the world, that that collaboration should continue, India, spurred and awakened by this war, as well as by her own growing nationalism, can hardly fail to become, in another few decades at most, a mighty power. An India permanently alienated from Britain, and falling willy-nilly into an Asian powergroup in a race for material gain, will be a threat not only to Britain herself and to the British Empire, but a threat also to world peace. An India friendly and grateful to a generous Britain could provide, as perhaps no other country, a much-needed link between East and West, and a tempering perhaps, of the Western Creed of Grab. But if, on either side, faces are to be obstinately saved and prejudices mulishly followed, we may await agreement till Kingdom Come. Some prejudices are breaking down : few people, for instance, can now seriously credit the dear old story that England conquered India in a sort of bumbling absent-minded fit, and just had to stay to keep order. Few can deny that England has exploited India. Few can avoid the conclusion—and I think every decent Englishman hates it—that India is a subjected and occupied country: a country in which, between August 1942 and January 1943, the police and troops opened fire on unarmed crowds no less than 538 times. But the prejudices which remain, on the British side, are still serious enough. The first is that Indians are silly, feckless and corrupt, and therefore cannot govern themselves. The second is that British democratic institutions are suitable to India. The third is that Indian "divisions" make it impossible for the British to relinquish power. The fourth is that India should obediently, at the bidding of Britain, commit herself to a war which was none of her making and from which, like Egypt or Turkey, she might herself choose to hold aloof if she were free.

These prejudices, running like an undercurrent through British politics and British publicity, must poison the atmosphere of all negotiations. They are the expression of domination and aggression : the denial of freedom and free choice. Their adoption, subconscious adoption if you like, by British negotiators must arouse in Indians a natural desire to hurl any offer into the dustbin.

(স্থানাভাবে অনুবাদ দেওয়া সম্ভব হইল না।)

• • •

কিন্তু কোনও এক বা একাধিক দেশের মুখ চাহিয়া থাকিলে আমাদের চলিবে না। নিজেদের স্বাধীনতার পথ আমাদের নিজেদেরই প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। আমাদের মুক্তির উপায় দেশের মাটি হইতেই বাহির হইবে, কোনও সক্ষম ও সফল দেশের স্থানীয় প্রয়োজনে গড়িয়া উঠা মত ও পথ হুবহু অনুসরণ বা অনুকরণ করিলে আমরা ভুল করিব। এ বিষয়ে চীনের সুবিখ্যাত কম্যুনিষ্ট-নেতা মাওৎ-জী-দাং-(Mao Tse-tung)-এর স্পষ্ট নির্দেশ আমাদের দেশের অনেক বিভ্রান্তকে পথ দেখাইবে। তিনি তাঁহার স্বদেশ চীন সম্বন্ধেই বলিতেছেন—

China should absorb on a great scale the progressive culture of foreign countries. This refers not only to the proletarian and progressive democratic culture, but also the classical culture of foreign countries, that is useful to us; for instance, the cultural heritage of the capitalist countries in their earlier period of growth. However, we should in no way *blindy* accept everything foreign without criticism, but should deal with it just as in metabolism; we first chew our food, then finally our system separates it into two portions, the one that is to be absorbed to nourish us and the other which is to be thrown out.

The thesis of "wholesome Westernization" is a *mistaken* viewpoint. *To import things foreign has done China much harm*. The same attitude is necessary for the Chinese Communists in the application of Marxism to China. Marxism should not be applied subjectively and dogmatically. *Such Marxism is useless.* The point is to grasp the general truths of Marxism and apply them to the concrete practice of the Chinese revolution, i.e., to first achieve the Sinonisation of Marxism; subjective and dogmatic Marxism is *to caricature* Marxism and the Chinese Revolution. For Marxists of this type there is no place in the revolutionary camp. Chinese culture must have its own form, that is, a national form. A national form and a new democratic content—this is our new culture of today.

এই কথা ভারতবর্ষ সম্পর্কে আরও কঠিনভাবে প্রযোজ্য। চীন নানাভাবে লাঞ্ছিত ও বিপর্যস্ত হইলেও আমাদের মত পরপদানত নিশ্চেষ্ট ও হীনবীর্য নয়। আমরা শক্তিহীন বলিয়াই গতানুগতিক উদ্যমের অভাবে খোসা-আঁটি বাদ দিয়া কিছু খাইতে অভ্যস্ত নই। ভারতবর্ষের নিজস্ব সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করিয়া তাহার রাষ্ট্র ও সামাজিক চিন্তার যে পরিবর্তনই আসুক, তাহাতে অকল্যাণের সম্ভাবনা নাই। বাহির হইতে সম্পর্কহীনভাবে আরোপিত ভাবধারা সমস্ত জাতিকে স্পর্শ করিতে না পারিলেও অনেক চিন্তালেশহীন যুবককে সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত করিয়া মূল লক্ষ্য হইতে আমাদিগকে

বিচ্যুত করিতে পারে। আমাদের অনেক থাকিলে এই ক্ষতির জন্ত উদ্বিগ্ন হইতাম না। আমাদের পুঁজি কম বলিয়াই অধিক সাবধান ও সতর্ক হইতে হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও পরীক্ষক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিং-গবেষণা করিয়া বিরাট দুই খণ্ডে যে 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' লিখিয়াছেন, স্বীকার করিতে লজ্জা নাই, তাহা সমুদয় আয়ত্তে আনিতে পারি নাই। রক্তমাংস-চামড়া ইত্যাদি থাকিলে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে নানাবিধ মজা লাগে, কিন্তু শুধু পাঁজরার হাড় কাঁহাতক গণনা করা যায়, নিউটেষ্টামেণ্টের বিভিন্ন গ্রন্থেই তো তাহার চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, আমাদের উদ্যম ও অবসর না থাকিলেও "বাধ্যতামূলক"ভাবেও সুকলেবরা বইখানি পড়িবার লোকের অভাব নাই। তাঁহাদেরই একজন, সম্ভবত সেন মহাশয়ের ছাত্রী কেহ, যে ক্লেশ স্বীকার করিয়া উক্ত নামবীজমালা সম্পূর্ণই জপ করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ পাইয়া পুলকিত হইয়াছি। পাঠকেরাও হইবেন। বিশেষ ধরনের লরির মত বিশেষ ধরনের ভয়ে লেখিকা নাম প্রকাশে অপারগ হইয়াছেন, আমরা বেনামেই তাঁহাকে তাঁহার পাঠনিষ্ঠার জন্ত প্রশংসা করিতেছি। তাঁহার পত্রটি মায়-শিরোনামা উদ্ধৃত করিলাম।—

সু-কুমার গবেষণা

মান্তবর 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন,

গত শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যায় আপনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ২য় ভাগের যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা আমি বিশেষ যত্নসহকারে পাঠ করিয়াছি। আপনারা পুস্তকে তথ্যগত যে-সকল ভুলের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অপেক্ষাও গুরুতর কতকগুলি ভুল আমার নজরে পড়িয়াছে। কাগজের এই দুষ্প্রাপ্যতার দিনে আমি এখানে মাত্র দুইটি দৃষ্টান্ত দিয়াই ক্ষান্ত হইব।

(১) অধ্যাপক সেনের পুস্তকের ১১৫ পৃষ্ঠায় আছে, "নবীনচন্দ্র সেন 'আমার জীবন'-এ লিখিয়াছেন যে মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'বুঝলে কি না'-র রচয়িতা।" অধ্যাপক মহাশয় 'আমার জীবন' ভাল করিয়া পড়িলে দেখিতে পাইতেন তাহাতে আছে—"একদিন মতি তায়ার সঙ্গে মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। কলেজে থাকিতে এক সন্ধ্যায় বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্ মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁহার বাড়িতে তাঁহার রচিত 'বুঝলে কি না' প্রহসনের অভিনয় দেখিতে যাই।"

এখানে নবীনচন্দ্র তাঁহার সুপরিচিত প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিদ্ মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কথাই লিখিয়াছেন, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম করেন নাই। এবং তিনি বলিয়াছেন,

"তাঁহার বাড়িতে তাঁহার রচিত 'বুঝলে কি না' প্রহসন দেখিতে যাই"; ইহার অর্থ মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন রচিত প্রহসন ; ইহার অন্য অর্থ নাই।

(২) ডক্টর সেন তাঁহার পুস্তকের ৪৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, রাজকৃষ্ণ রায় "কতিপয় পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে 'রসায়ন-শিক্ষা'ও আছে।" কোন কোন গ্রন্থাগারের পুস্তক-তালিকায় রসায়ন-শিক্ষা পুস্তকের লেখক হিসাবে রাজকৃষ্ণ রায়ের নাম আছে বটে, কিন্তু শুধু গ্রন্থতালিকা না দেখিয়া 'সচিত্র রসায়ন শিক্ষা' (ইং ১৮৭৭) বইখানি দেখিলে দেখিতে পাইতেন যে, ইহার গ্রন্থকার রাজকৃষ্ণ রায় নহে, রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরী। ইনি শিক্ষা-বিভাগের একজন কর্মচারী ছিলেন ; বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রথমাবস্থায় তিনি যে উহার একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন, নবীনচন্দ্র 'আমার জীবনে' তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

নিবেদিকা

(বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈকা ছাত্রী)

কু মার আগেই খাইয়াছেন, এত দিনে সু মার খাইয়া সেন মহাশয়ের পৈতৃক নামটি সার্থক হইল।

—

বাংলা দেশের কয়েকজন সাহিত্যিককে কংগ্রেসের প্রতি প্রকাশ্য অনুরাগ প্রকাশ করিতে দেখিয়া 'পরিচয়'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার হঠাৎ ক্ষেপিয়া গিয়া "ওয়ান্স আপন এ টাইম" বলিয়া মাতৃসুলভ মনোবৃত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। কার্তিকের 'পরিচয়ে' প্রথম প্রবন্ধ "আমাদের সাহিত্য ও স্বাধীনতা আন্দোলন" দ্রষ্টব্য। মাকে মামার বাড়ি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করিবার দুষ্প্রবৃত্তি আমাদের নাই। গোপালবাবুর প্রভুপাদ পি. সি. জোশী মহাশয় যখন কংগ্রেস ও মহাত্মা গান্ধীর সকল মৌলিক কেরামতি তাঁহার সদ্য-প্রকাশিত 'কংগ্রেস অ্যাণ্ড কম্যুনিষ্টস' পুস্তিকায় ফাঁস করিয়া একরূপ প্রমাণই করিয়া ফেলিয়াছেন যে, বর্তমান কংগ্রেসী ভাবগঙ্গার তিনি এবং তাঁহার জনেরাই (Saint John!) ভগীরথ, তখন গোপালবাবুই বা অনুরূপ কিছু না করিবেন কেন? কোলে ঝোল টানিবার ব্যাপক পলিসিই তো আজ সর্বত্র জয়যুক্ত হইতেছে! তবে গোপালবাবু এখনও বাস্থু অর্থাৎ দু-কানকাটা হইয়া উঠিতে পারেন নাই, তিনি মনগড়া হউক, যাহাই হউক, একটা ইতিহাসের নজির টানিয়াছেন, একেবারে বেপরোয়া অহং চালান নাই। এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ। বোম্বাই অঞ্চলে হিষ্টরিকাল ডায়ালেকটিক্স ফাঁসিয়া গেলেও কলিকাতায় ভাঙনের ঢেউ আসিয়া লাগিতে বিলম্ব আছে। ইতিমধ্যে হালদার মহাশয়

ইতিহাস কপচাইয়া ভালই করিয়াছেন। তবে তাঁহার ইতিহাসে কিছু ভুল আছে, অনেকটা শরৎচন্দ্র-বর্ণিত বৃদ্ধা তপস্বিনীর সকড়ি বাঁচাইয়া পা ফেলা গোছের হইয়াছে। বিশদ আলোচনার অবকাশ নাই। এই প্রবন্ধটিকে 'বাজে লেখা'র স্থানান্তরিত করিবার পূর্বে তিনি যেন জোনস্ কোলব্রুক কেরী মার্শম্যানের সম্বন্ধে তাঁহার বিদ্যাটা একবার ঝালাইয়া লন, ইঁহাদের কেহ কেহ রামমোহনের জন্মের পূর্বেই প্রাচ্যদেশীয় জ্ঞানভাণ্ডার আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং কলিকাতার রঙ্গমঞ্চেও রামমোহনের আবির্ভাবের পূর্বেই প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। রামকমল সেন মোটেই ওরিয়েণ্টালিষ্ট ছিলেন না এবং কেশব সেনের জন্মের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক সরাসরি নয়, মাঝখানে প্যারীমোহন নামধেয় তাঁহার একজন পুত্র ছিলেন, তিনিই কেশবচন্দ্রের জন্মদাতা হিসাবে সে যুগে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধীরে ধীরে একটি সচ্চিদানন্দ আশ্রম হইয়া উঠিতেছে। সৎ-অংশের বিবরণীতে জানা যায় কোনও বিষয়ের প্রধান পরীক্ষকের পুত্র সেই বিষয়ে পরীক্ষার্থী হইলে তাঁহাকে সেই বৎসর উক্ত পরীক্ষক-পদচ্যুত করা হয়। চিৎ-অংশে দেখিতেছি, সিণ্ডিকেটের সদস্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক এবং কোনও কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ হইলেও তাঁহার মেড ইজি পুস্তক রচনা ও বিক্রয় করিতে বাধা নাই, দৃষ্টান্ত শ্রীযুক্ত জে. কে চৌধুরী প্রণীত 'সহজ শিক্ষা ভারত ইতিহাস' প্রভৃতি। এইরূপ চিৎ হইবার অবশ্য নানা সঙ্গত কারণ আছে। আনন্দাংশের বিবৃতি বারান্তরে দিব।

—

অগ্রহায়ণের 'পরিচয়ে' "পত্রিকা-প্রসঙ্গে" একজন প্রধান-সাহিত্যিক লিখিয়াছেন, "কিন্তু বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের "নিরুদ্দেশ" আমি পড়তে এত ধৈর্য্য হারিয়েছি যে, আমি অবাক হই। বিভূতিবাবুর লেখায় সাধারণত একটি মিষ্টি কৌতুক রস থাকে, তাতে পাঠকের আকর্ষণ বাড়বারই কথা। আমি এতগুলি লেখা পড়তে পেরেছি কিন্তু এবার ওঠালেন।"

ভদ্রলোক (রাণুর) প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ তৃতীয় ভাগ ও কথামালা শেষ না করিয়াই "নিরুদ্দেশ" অবধি ধাওয়া করিতে গিয়া বিপদে পড়িয়াছেন। ভাষা দেখিয়াই তাহা মালুম হইতেছে। তাঁহাকে ভাল করিয়া ভিত পত্তনের অনুরোধ জানাইতেছি।

—

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শনিবারের চিঠি
১৭শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩৫১

বাংলার নবযুগ ঃ পরিশিষ্ট—রবীন্দ্রনাথ

৩

নবযুগের প্রেরণায় মানবধর্ম্মের যে নব-আদর্শ-স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছিল তাহা মূলে যেমন সর্ব্বমানবীয়, তেমনই সেই এক আদর্শই বাস্তবের দিক দিয়া কেন যে জাতীয়তা-বিরোধী নয়, তাহা আমরা দেখিয়াছি। এই জাতীয়তাধর্ম্ম আমাদের দেশে সম্পূর্ণ নূতন, ইহার নীতি প্রাচীন ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি হইতে স্বতন্ত্র; তাহাতে, স্ব-পর-কল্যাণ সাধনের যে মর্ম্ম আমাদের সংস্কারগত হইয়াছিল তাহাও ভিন্নরূপ ধারণ করিল—কোন আকারেই ব্যক্তির আত্মচিন্তা বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্থান তাহাতে রহিল না। ইহাতেও অন্তর ও বাহিরের সকল বাধাকে জয় করিবার জন্ত যে সংগ্রাম অনিবার্য্য—সেই সংগ্রাম বা সাধনাই বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলন', এবং বিবেকানন্দের 'dynamic religion'। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অত্যুচ্চ ভাব-সাধনার ক্ষেত্রে মানবতার যে আদর্শ স্থাপন করিলেন তাহা বিশ্বজনীন—জাতি-বর্ণ-হীন; তাহাতে মানবসাধারণের পরিবর্ত্তে এক মহামানব বা বিশ্ব-মানব অকূল অচিহ্নিত ভাবসাগরে লীন হইয়া আছে; শেলীর সেই আদর্শের মত, 'pinnacled dim in the intense inane' না হইলেও, তাহা অনেক পরিমাণে পৃথিবীর ধূলামাটির অতীত, সেই আদর্শধর্ম্মী জীবনে বাস্তবের সহিত প্রকৃত বোঝাপড়া নাই, ক্রূর-কঠিন-কুৎসিতের সহিত সংগ্রাম নাই—সে সকলকে একরকম অস্বীকার করিয়া, সকল অসম্পূর্ণতা সেই ভাব-কল্পনার দ্বারা পূর্ণ করিয়া, আত্মার মহিমা উপলব্ধি করিতে হয়। অতএব এইরূপ আদর্শ সেই 'dynamic religion'-এর আদর্শ নয়—ইহা জীবনে শক্তি সঞ্চার করিতে পারে না। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই আদর্শই রবীন্দ্রনাথের অমৃতগন্ধী লিরিকের প্রাণস্বরূপ, ইহাই তাঁহার অতুলনীয় কাব্য-সাধনায় শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কল্পনা শুধু লিরিকধর্ম্মী নয়, তাঁহার সেই রসদৃষ্টি আরও গভীর অধ্যাত্মদৃষ্টির ফল; সে দৃষ্টিতে, জীবনের নিয়তি-কঠিন নাটকীয় শক্তিরূপের পরিবর্ত্তে, নিয়তি-নিয়মহীন আত্মস্ফূর্ত্তির লিরিক-রূপ প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে।* এই জন্ত, রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতা মানুষের বাস্তব-নিয়তি বা প্রবৃত্তি-বিরোধকে সেই আদর্শ-জীবনের বাধা বলিয়া স্বীকার করে নাই; এই জন্তই তাঁহার বাণী শেষ পর্য্যন্ত এমন একটি মন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, যাহাতে সর্ব্বপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধন, আত্মশাসনমূলক discipline বা বিধিবদ্ধ আনুষ্ঠানিক অভ্যাস মিথ্যা হইয়া গিয়াছে। তিনি আনন্দকেই শক্তি-সাধনার উপরে স্থান দিয়াছেন; তাঁহার বিশ্বাস—প্রাণমনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিকাশই মানুষের পক্ষে স্বাস্থ্যকর; ফুল যেমন আপন অন্তরের রস-প্রেরণায় বর্ণে-গন্ধে দল বিস্তার করে, মানুষও তেমনই স্বচ্ছন্দে আপনাকে বিকশিত করিয়া তুলিবে। এরূপ সাধনায়

চরিত্র-শক্তির যেমন পৃথক মূল্য নাই, তেমনই পৌরুষের অর্থও সেইরূপ ভাব-জীবনের আদর্শ-নিষ্ঠা। এইরূপ স্বাতন্ত্র্য-সাধনা যে কেবল রবীন্দ্রনাথের মত মহাশক্তিমান্ ও স্বতন্ত্র পুরুষের পক্ষেই সত্য ও সম্ভব তাহা আমরাও বুঝি; কিন্তু ঐ মন্ত্র যে অপূর্ব্ব বাণী-রূপ ধারণ করিয়াছে তাহাতেই উহা সাধারণের চিত্তও অধিকার করে; কিন্তু শেষে তাহাতেই আধ্যাত্মিক অভিমান জন্মে—কবির সেই আধ্যাত্মিকতা আমরাও দাবি করিয়া থাকি। কিন্তু ইহা যে মোহ মাত্র, বর্ত্তমান সমাজে তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যাইবে। জীবনের ক্ষেত্রে সে আদর্শ অচল বলিয়াই তাহা ক্রমেই জীবন হইতে সরিয়া গিয়াছে, শেষে সাহিত্যের ক্ষেত্র হইতেও নির্ব্বাসিত হইয়াছে—বাংলা সাহিত্যের বর্ত্তমান অরাজক অবস্থা ও চরম স্বৈরাচারনিবারণে তাহা শোচনীয়রূপে ব্যর্থ হইয়াছে। শেষ বয়সে জরাগ্রস্ত কবি, কবিধর্ম্মবশে, যৌবনের জয়গান করিতে গিয়া—তাঁহারই সেই জীবনবাদকে সুদৃঢ় করিতে গিয়া, নিজেও বিপন্ন হইয়াছিলেন, এই উচ্ছৃঙ্খলতার সহিত একরূপ সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; তাহার ফলে, তিনি যে তাঁহার সাহিত্যিক আদর্শ হইতেও কতখানি ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার প্রায় শেষ রচনা—'ল্যাবরেটরি' নামক গল্পটি তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। ইহাতেই প্রমাণ হয়, জীবনের আর্ট ও আর্টের জীবন এক নয়। বিশুদ্ধ রসসাধনা সর্ব্ববন্ধন অগ্রাহ্য করিতে পারে, কিন্তু জীবন্-সাধনায় ঐ বন্ধনের প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে—সমুদ্রের তরঙ্গলীলা ও তটিনীর জলোচ্ছ্বাস এক দৃশ্য নয়। কবির কাব্যপ্রেরণারূপে—বিশুদ্ধ আর্টের পুষ্পপরাগরূপে—'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' যে কত মূল্যবান, রবীন্দ্রকাব্যের মর্ম্মরস তাহা চিরদিন প্রমাণ করিবে; কিন্তু জীবনকে জয় করিতে হইলে, অশান্ত ও অশিবের দ্বৈতকে স্বীকার করিয়া, পরে সেই অদ্বৈতে উঠিতে হয়; এই উঠিবার তত্ত্বই dynamism বা জীবনের শক্তিবাদ; আনন্দবাদে সকলই 'হইয়া আছে'—কিছুই 'হইতে' হয় না, তাই শক্তিসাধনার প্রয়োজন নাই।

আমি ইতিপূর্ব্বে 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য' কথাটি বহুবার একাধিক অর্থে ব্যবহার করিয়াছি, এক্ষণে রবীন্দ্রনাথের সাধনা সম্পর্কে তাহার বিশেষ অর্থ না করিয়া, তাঁহার রচনা হইতেই কিঞ্চিৎ নমুনা দিব। রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতিতে ইহার বিকাশ যে প্রথম হইতেই হইয়াছে—'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র একটি কবিতায় তাহার স্পষ্ট নিদর্শন আছে।—

বুঝি গো সন্ধ্যার কাছে শিখেছে সন্ধ্যার মায়া
ওই আঁখি দুটি,
চাহিলে হৃদয় পানে মরমেতে পড়ে ছায়া
তারা উঠে ফুটি'।
আগে কে জানিত বলো কত কি লুকানো ছিলো
হৃদয়-নিভৃতে,

তোমার নয়ন দিয়া আমার নিজের হিয়া
পাইনু দেখিতে।

এখানে কবি যাহাকে সম্বোধন করিতেছেন, তাহার রূপ—তাহার 'আঁখি দুটি'ই—তাঁহাকে মুগ্ধ করিতেছে না, সেই চোখের দৃষ্টি তাঁহার হৃদয়ে যে আলোকপাত করিতেছে, তাহাতে তিনি আপনাকে আপনি দেখিতে পাইয়া মুগ্ধ হইতেছেন; তাঁহার নিজেরই হৃদয়-রহস্য তাঁহার নিকটে পরম বিস্ময়ের বস্তু। এই দৃষ্টি শুধুই subjective বা আত্মভাব-রঞ্জিত নয়, ইহা বিশেষভাবে আত্মমুগ্ধ বা egoistic; ইহা এতই স্ব-তন্ত্র ও আত্ম-সচেতন যে, সর্ব্ববিষয়ে আত্মানুভূতি ভিন্ন আর কোন অনুভূতিই যেন নাই। এই ভাব রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনায়, তথা মানস-জীবনে, চির'দন আধিপত্য করিয়াছে; বাল্যের ওই কবিতাটির পর তাঁহার শেষ জীবনের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিলেই আমার বক্তব্য আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।—

> "চিরন্তন বিরাট মানবকে আমি ধ্যানের দ্বারা আমার মধ্যে গ্রহণ করবার চেষ্টা করি।...তার মধ্যে অনুভব করতে চাই আমার মধ্যে সত্য যা-কিছু জ্ঞানে, প্রেমে, কর্ম্মে, তার উৎস তিনি। সেই জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে আমি আমার ছোট-আমিকে ছাড়িয়ে যাই, সেই যিনি বড়-আমি, মহান্ আত্মা, তাঁর স্পর্শ পেয়ে ধন্য হই, অমৃতকে উপলব্ধি করি।" [রবীন্দ্রনাথের "পত্রধারা", 'প্রবাসী', ১৩৩৮]

—বলা বাহুল্য, ইহাও নিজের মধ্যে, অর্থাৎ ব্যক্তির মারফতে, বিরাটের উপলব্ধি—বহির্জগতের, বা বহুমানবের মধ্য দিয়া নয়। উপরের পংক্তিগুলিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যসাধনায় রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধিলাভের পরিচয় আছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যমন্ত্র ও তাঁহার আধ্যাত্মিক সাধন-মন্ত্র একই হইবার কথা, বরং কাব্যের সেই সৌন্দর্য্য-সাধনাতেই তাঁহার অন্তর-পুরুষের আসল পরিচয় আছে। আমি এখানে কবির সেই কবি-স্বপ্নেরও কিছু পরিচয় দিব। প্রথমে এমন একটি কবিতা উদ্ধৃত করিব যাহাতে কবির সেই প্রাণের সুর যেমন গভীর, তেমনই অনির্ব্বচনীয় হইয়া

অন্তরমাঝে তুমি শুধু একা একাকী—
তুমি অন্তরব্যাপিনী।
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়বৃন্ত-শয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্ত-গগনে,
চারিদিকে চির-যামিনী।

অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি,
একটি ভক্ত করিছে নিত্য আরতি,
নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেষ মূরতি,
তুমি অচপল দামিনী।

ঐ 'অকূল শান্তি ও বিপুল বিরতি', ঐ 'অচপল দামিনী' এবং 'চারিদিকে চির-যামিনী'র যে ভাব-সিদ্ধি, তাহা সাধক-ব্যক্তির সকল সাধনা হইলেও, কবির পক্ষে উহা ধ্যানগম্য, এবং মানুষের পক্ষে একরূপ ক্ষণিক চিত্ত-বিলাস মাত্র; কারণ, 'বিপুল বিরতি' বা 'অকূল শান্তি' জীবনের সত্য নয়; 'চারিদিকে চির-যামিনী'র মধ্যে, 'অসীম চিত্ত-গগনে একটি চন্দ্রে'র ঐ যে ধ্যান, উহাতে যে অদ্বৈত-সাধনার ইঙ্গিত আছে, তাহাতেও সকল দ্বৈতকে জয় করিবার প্রয়োজন হয় না—অন্ধকার হইতে চক্ষুকে ফিরাইয়া আলোকের দিকে নিবদ্ধ করিবার উপায় করিতে পারিলেই হয়; এইরূপ "intellectual attitude in all its naive simplicity" কবির পক্ষে যেমন স্বাভাবিক, তেমনই গৌরবজনকও বটে; কিন্তু জীবনপথযাত্রী মানুষের পক্ষে ইহার মত ভ্রান্তি আর নাই। জীবনের দামিনী অচপল নয়—অতিশয় চপল, এবং তাহার পক্ষে, good ও evil—শিব ও অশিব, দুই-ই সমান সত্য। ইহারই প্রসঙ্গে, মঃ রোলাঁ তাঁহার বিবেকানন্দ-চরিতে, বিবেকানন্দের এই উক্তিটি বিশেষ করিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমিও তাহা উদ্ধৃত করিতেছি এইজন্য যে, তাহা দ্বারা, বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রযুগ যে ভাবান্তর আনিয়াছে, তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।—"Learn to recognise the mother in Evil, Terror, Sorrow, Denial, as well as in sweetness and joy"। এই কথাই আর একটু বিস্তারিত করিয়া, মঃ রোলাঁ লিখিয়াছেন—

> Similarly the smiling Ramkrishna from the depths of his dream of love and bliss could see and remind the complaisant preachers of a "good God", that Goodness was not enough to define the force which daily sacrificed thousands of innocents.

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মের মূলমন্ত্র ঐরূপ। তাঁহার শিল্পী-মন বহু-বিচিত্রের পিপাসায় কত ভাবকেই-না রূপ দিয়াছে—কত চিন্তাকে, কত তত্ত্বকে, কত অনুভূতিকে, কত অপরূপকে বাংলা ভাষার বীণা-ধ্বনিতে বাঁধিয়া দিয়াছে! আমি এখানে তাঁহার সেই কবিকীর্তি বা কবিপ্রতিভার আলোচনা করিতেছি না—বাংলার নবযুগের সেই ধারাটির সঙ্গে তাঁহার বাণী, তথা ব্যক্তি-ধর্মের সম্বন্ধ বিচার করিতেছি। তাহাতে দেখা যাইবে, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ সেই যুগকে যেরূপে বরণ করিয়া তাহার যে গতি নির্দেশ করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেই যুগের সেই ধারাকে ধরিতে চাহিলেও তাঁহার ব্যক্তিধর্ম অতিশয় স্বতন্ত্র বলিয়া তিনি শেষে সেই ধারাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন,

অথচ কোন নূতন ধারার প্রবর্ত্তন বা নায়কত্ব করিতে পারেন নাই। তাঁহার মত, রস-শিল্পী কবির পক্ষে কোন একটি বিশেষ জীবন-বাদকে একান্তভাবে গ্রহণ করিয়া—তাহারই ভেরী বাজাইয়া জনারণ্যের পথপ্রদর্শক হওয়া যে কতখানি স্বভাব-বিরুদ্ধ, তাহা তিনিও বুঝিয়াছিলেন, তাই তিনি শেষে আপন ব্যক্তি-সাধনার সেই মন্ত্রটিকেই দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়া, ভাবমার্গে বিশ্বাত্মার সহিত ব্যক্তি-আত্মার যোগস্থাপন এবং তাহারই ফলে একটা মহামানবীয় কালচারের প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই তাঁহার অপূর্ব্ব কাব্যকলা ও তন্নিহিত মানস-মুক্তির রস-পিপাসা প্রায় দুই পুরুষ ধরিয়া শিক্ষিত বাঙালী-মনকে যে ভাবে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করিয়াছিল, তাহাতে বাংলার নবযুগের সেই আদর্শ অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়াছে—ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সেই জয়গান বিংশ শতাব্দীর ভগ্ন-জীর্ণ বাঙালী-প্রাণকে উদ্বুদ্ধ না করিয়া, তাহার আত্মসুখপরায়ণতাকেই একটি উদার ভাবসাধনার মহত্ত্ববোধে আশ্বস্ত ও চরিতার্থ করিয়াছে। ইহার জন্য কবি রবীন্দ্রনাথ দায়ী নহেন, দায়ী আমাদের চরিত্র ও আমাদের ভাগ্য—অবস্থাবশে অমৃতও এ জাতির পক্ষে বিষ হইয়া উঠিয়াছে। মঃ রোলাঁ বিবেকানন্দের ধর্ম্মমন্ত্র সম্বন্ধে এক স্থানে যাহা বলিয়াছেন তাহা পড়িলেই বুঝিতে পারা যাইবে, বাংলার নবযুগের সেই জীবনাদর্শ কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—

Those who have followed me up to this point, know enough of Vivekananda's nature, with its tragic compassion binding him to all the suffering of the universe, and the fury of action wherewith he flung himself to the rescue, to be certain that he would never permit or tolerate in others any assumption of the right to lose themselves in an ecstasy of art or contemplation.

—এই "ecstasy of art or contemplation"—"রস-সাধনা বা ধ্যান-কল্পনার আত্যন্তিক সুখ-সম্ভোগ"—যে-জীবনের আদর্শ, তাহা 'tragic compassion' বা 'fury of action'-এর জীবন নয়; রবীন্দ্রনাথ নিজেই যেন নিজের নিকটে তাহা বার বার স্বীকার করিয়াছেন; এইরূপ স্বীকারোক্তি তাঁহার একটি কবিতায় বড় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; 'এবার ফিরাও মোরে' নামক সেই কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের কবি ও ব্যক্তি-স্বভাবের সুগভীর আত্ম-পরিচয় আছে। মানুষের বাস্তব-জীবনের দুঃখ-দুর্দ্দশায় বিচলিত হইলেও তিনি সেই দুঃখের জগতে বেশিক্ষণ তিষ্ঠিতে পারেন না; যেখানে—

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু।

—সেখানেও তিনি সেই বাস্তব দুঃখকে একরূপ অস্বীকার করিয়া, এই দুর্গত মনুষ্যসমাজের আর্ত্তিনাশনের জন্য অতি উচ্চ ভাবসাধনার পন্থাই নির্দ্দেশ করিলেন; ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তির

জন্ত যে অন্নজল তাহার পরিবর্ত্তে পরম সত্যের অমৃত-পায়স, মনুষ্যজীবনের পরিবর্ত্তে বিশ্বজীবন, এবং নিষ্ঠুর নিয়তি-রূপিনীর পরিবর্ত্তে নিরুপমা সৌন্দর্য্য-প্রতিমার আধ্যাত্মিক আরাধনাকেই বাঁচিবার একমাত্র উপায় বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

…ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে, ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী ; স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি' চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার,
তার পর সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি,
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি',
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া।

—এমন যে দুর্গত সমাজ, যাহারা "শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ রেখে দেয় বাঁচাইয়া"—তাহাদিগের সেই সাক্ষাৎ দুঃখের প্রতিকার-চিন্তা না করিয়া, কবি উপদেশ দিলেন—

মহা বিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা—

এবং মুহূর্ত্তে ভাবাবিষ্ট হইয়া, তাহাদের কথা বিস্মৃত হইয়া, নিজেরই জবানিতে—উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গাহিয়া উঠিলেন—

দুর্দ্দিনের অশ্রু-জলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি, তা'রি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে, জীবনসর্ব্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি'।—কে সে? জানি না কে, চিনি নাই তারে…

তারপর কবি পৃথিবীর এই কঙ্করকণ্টকময় পথ কোনরূপে অতিক্রম করিয়া সেই বিশ্বপ্রিয়ার—সেই নিরুপমা সৌন্দর্য্য-প্রতিমার—চরণতলে উত্তীর্ণ হইয়াছেন ; এই দুঃখের জগতে দুঃখীদের সঙ্গে বাস করিয়া বলিতে পারেন নাই—

নত্বহং কাময়ে স্বর্গং নচরাজ্যং পুনর্ভবম্।
কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্ত্তিনাশনম্।

রবীন্দ্রনাথের দোষ নাই ; রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতা মনুষ্য-সাধারণের জীবন-দেবতা নয়। তিনি যে জীবনের আরাধনা করিয়াছেন, তাহার অধিষ্ঠান-ভূমি বাহিরে নয়—ভিতরে ; তাহার যত কিছু অভাব-অভিযোগ, যত কিছু দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম অতি কঠিন

স্বাতন্ত্র্যনিষ্ঠার দ্বারা অন্তরেই প্রশমিত ও দমিত হইয়া যায়। বিশ্ব-প্রিয়ার প্রেমমূর্ত্তিখানিই কবির সেই স্বাতন্ত্র্যনিষ্ঠার শক্তি-উৎস; জীবনের সকল উদ্বেগ ও জ্বর-জ্বালা তাহারই করপল্লবপরশনে জুড়াইয়া যায়—সেই সৌন্দর্য্যকে অন্তরগোচর করিলে জীবনের কোন দৌরাত্ম্যই আর থাকে না; তখনই—"অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি"। অন্যত্র, রবীন্দ্রনাথ—জীবনকে জয় করিবার নয়—বিস্মৃত হইবার এই মন্ত্র আরও উৎকৃষ্ট কবি-ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন,—চিত্রাঙ্গদার স্বর্গীয় রূপলাবণ্যদর্শনে মহাভারতের সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবীর অর্জ্জুনও গভীর ভাবাবেশে কবির ন্যায় গাহিয়া উঠে—

কেন জানি অকস্মাৎ
তোমারে হেরিয়া বুঝিতে পেরেছি আমি,
কি আনন্দ কিরণেতে প্রথম প্রত্যূষে
অন্ধকার মহার্ণবে সৃষ্টি-শতদল
দিগ্বিদিকে উঠেছিল উন্মেষিত হ'য়ে
এক মুহূর্ত্তের মাঝে।...
চারিদিক হ'তে
দেবের অঙ্গুলি যেন দেখায়ে দিতেছে
মোরে, ওই তব অলোক আলোক মাঝে
কীর্ত্তিক্লিষ্ট জীবনের পূর্ণ নির্ব্বাপণ।
...ভাবিলাম
কত যুদ্ধ কত হিংসা কত আড়ম্বর
পুরুষের পৌরুষ গৌরব, বীরত্বের
নিত্য কীর্ত্তিতৃষা, শান্ত হয়ে লুটাইয়া
পড়ে ভূমে ওই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের কাছে।

জীবন বলিতে যে প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব—বাধাবিঘ্ন জয়ের যে সংগ্রামশীলতা বুঝায়—এই সৌন্দর্য্য-ধ্যান তাহার প্রতিষেধক—তাহারই নাম 'জীবনের পূর্ণ নির্ব্বাপণ'। যে কাম সকল প্রবৃত্তির মূলে তাহাও এই বিশ্ববিজয়িনী সৌন্দর্য্য-প্রতিমার কটাক্ষমাত্রে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে—রবীন্দ্রনাথের আর একটি কবিতায় সেই তত্ত্ব রূপকচ্ছলে অতি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেখানেও কবি, রঙ রূপ ও রেখাকে ভাষার অধীন করিয়া, নারী-রূপের যে অনবদ্য সৌন্দর্য্য-প্রতিমা গড়িয়াছেন মদন তাহার দ্বারা পরাস্ত হইল—

ত্যজিয়া বকুলমূল মৃদুমন্দ হাসি'
। অনঙ্গ দেব। সম্মুখেতে আসি'

থমকিয়া দাঁড়াল সহসা। মুখপানে
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকাল তরে। পরক্ষণে ভূমি 'পরে
জানু পাতি' বসি' নির্ব্বাক বিস্ময়ভরে
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি'। নিরস্ত্র মদন পানে
চাহিল সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে। (চিত্রা—বিজয়িনী)

এইরূপ সৌন্দর্য্য-সাধনার সাধারণ নাম—Aestheticism; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই সাধনা অতিসূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ানুভূতির মানস-বিলাস মাত্র নয়; ইহার মূলে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের প্রেরণা রহিয়াছে; ইহা আত্মারই লীলারস-সম্ভোগ, এই সৌন্দর্য্য-চেতনার মধ্যে গভীরতর আত্মচেতনার আনন্দ রহিয়াছে। যাঁহারা রবীন্দ্র-কাব্যের সেই মর্ম্ম ভাল করিয়া উপলব্ধি করিবেন, তাঁহারা সেই সনাতন রস-তত্ত্বকেই এক অপূর্ব্ব কাব্যকলায় পুনরুজ্জীবিত হইতে দেখিয়া যেমন বিস্মিত ও চমৎকৃত হইবেন, তেমনই তাহার অন্তর্গত আদর্শের সহিত নবযুগের জীবন-সাধনার সম্বন্ধ কিরূপ, তাহাও সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এজন্য তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের বাণী বা ভাবদৃষ্টিকে বাস্তব জীবন-সমস্যার সহিত যুক্ত করিয়া তাহার মূল্য বিচার করিবেন না, কবি রবীন্দ্রনাথ, তথা ভাবুক ও মনীষী রবীন্দ্রনাথের যত কিছু উক্তিকে স্বতন্ত্র মর্য্যাদা দান করিবেন। বাঙালীর ভাব-জীবনকে রবীন্দ্রনাথ যতখানি সমৃদ্ধ করিয়াছেন তেমন আর কেহ করে নাই, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে তিনি যে শ্রী ও সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়াছেন এমন বোধ হয় আর কোন সাহিত্যকে কোন একজন কবি করেন নাই। বাঙালী যদি জীবনের অতি দুর্গম দীর্ঘ পথে তীর্থপর্য্যটনের শক্তি লাভ করে, যদি সেই পথের পাথেয় সে কখনও সঞ্চয় করিতে পারে, তবেই হিমালয়ের পারে কবিকল্পিত সেই মানস-সরোবরের স্বর্ণকমল-শোভা নিরীক্ষণ করিয়া সে তাহার সেই পৌরুষ ও প্রাণশক্তির পুরস্কার লাভ করিবে। তৎপূর্ব্বে সেই ফুলকে অলস সুখ-স্বপ্নের লীলা-কমল করিয়া তুলিলে, শুধুই জীবনের প্রতি মিথ্যাচার নয়—রবীন্দ্রনাথেরও অসম্মান, এমন কি তাঁহাকে উপহাসাস্পদ করা হইবে। প্রসঙ্গক্রমে একটি ঘটনা মনে পড়িল। খাঁটি পাশ্চাত্যসংস্কারবতী ও আধুনিক বিজ্ঞান-বুদ্ধিশালিনী এক ইংরেজ বিদুষী, একদা তাঁহার আদর্শ-মানব ঋষি রাসেলের (Bertrand Russel) গৃহে ভক্তদল-সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দর্শনদান উপলক্ষ্যে দুই মনীষীর দুই মূর্ত্তির তুলনা করিয়া, এবং ভক্তদলের রবীন্দ্র-পূজা ও সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব অনুমান করিয়া, যে সকৌতুক কটাক্ষ করিয়াছেন তাহা যেমন অজ্ঞতামূলক, তেমনই

স্বাভাবিক। আমাদের দেশের ধাতুগত যে mysticism—যে mysticism-এর অপচারকে রামমোহন হইতে বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত সকলেই এ যুগের সাধনা হইতে বহিষ্কার করিতে চাহিয়াছিলেন—তাহা পাশ্চাত্য প্রকৃতির পক্ষে এতই বিজাতীয় যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সেই ভারতীয় ভাবের গন্ধমাত্র সহ্য করিতে না পারিয়া, এই পাশ্চাত্য বিদুষী যখন মন্তব্য করেন—

I like the picture of Tagore with his flowing beard and his oriental mysticism, his exotic pseudo-philosophic poems, with his pomegranate and lotus-bud imagery...his flowing robes, his reverent disciples, his crescent moon idealism....It is an amusing picture.

—তখন এইরূপ উক্তিকে বিদ্বেষ-বিজৃম্ভিত বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই, ইহার মূলে যে অজ্ঞতা আছে তাহাও যেমন বুঝি, তেমনই, ইহা হইতে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও জীবন এই দুয়েরই আদর্শ একটা বিপরীত সংস্কারে কিরূপ আঘাত করে, এবং কেন করে, তাহা বুঝিবার পক্ষে আমাদের সুবিধা হয়। কিন্তু আমার মনে লাগিয়াছে ঐ ভক্তগণের কথা। রবীন্দ্রনাথকে বুঝিবার—তাঁহাকে যথার্থভাবে ভক্তি করিবার মত শিক্ষা বা সংস্কৃতি ঐ বিদেশিনীর অবশ্য নাই, কিন্তু আমাদের জীবনেও কি রবীন্দ্রনাথের আসন প্রস্তুত হইয়াছে? রবীন্দ্রভক্তির যে আতিশয্য আমাদের মধ্যে প্রায় একটা ফ্যাশন হইয়া উঠিয়াছে-তাহার মূলে কি কোন জ্ঞান-বিচার আছে? গড্ডালিকাবৃত্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও, ইহা কি স ত্য নয় যে, বর্ত্তমান কালে রবীন্দ্রনাথকে লইয়া যাহারা একটা Cult বা ভক্তি-শাস্ত্র গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই অতিশয় কৃত্রিম জীবন যাপন করে—দেশ, জাতি বা সমাজের সহিত তাহাদের যেমন নাড়ীর যোগ নাই, তেমনই তাহারা অতিশয় সুখী ও শৌখিন সমাজে বাস করিতে পারিলেই জীবন ধন্য মনে করে। আমি এখানে, প্রসঙ্গক্রমেই, অতিশয় দুঃখের সহিত ইহার উল্লেখ করিলাম, রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম ও তাহার সাধনা এযুগে এ জাতির পক্ষে যে কিরূপ নিষ্ফল হইয়াছে ইহাও তাহারই একটা প্রমাণ।

কিন্তু ইহার জন্য রবীন্দ্রনাথকে দায়ী করা যায় না, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তিনি যদি তাঁহার স্বকীয় সাধনায় ও লোকোত্তর প্রতিভাবলে এমন এক স্থানে পৌঁছিয়া থাকেন যেখানে সৃষ্টির সকল পদার্থই জ্যোতির্ম্ময়, অথবা অন্ধকার যেখানে প্রবেশ করিতে পারে না, যেখানে ধ্বনিমাত্রেই সুরময়, অগ্নিরও আলো আছে—তাপ নাই; যেখানে সকল অন্যায় ও অসত্যকে কেবল অস্বীকারের দ্বারা নিরস্ত করা যায়; তবে তাঁহার মত পুরুষের সেই প্রাচীন ঋষি-মন্ত্র উচ্চারণ করিবার অধিকার আছে, এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাধনার দ্বারা সে অধিকার সাব্যস্ত করিয়াছেন। বাংলা দেশে ঠিক ঐ কালে বাঙালীর

বংশে এমন এক প্রতিভার উদয় যে কি করিয়া সম্ভব হইয়াছিল তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস পূর্ব্বেই দিয়াছি। ইহাও সত্য যে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা খাঁটি ভারতীয় সংস্কৃতির একটি নব-পুষ্পিত রূপ, 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ', 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে', 'নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্'—এই যে বাণী, রবীন্দ্র-প্রতিভার মূল ইহাতেই নিহিত আছে। অতএব বাংলার নবযুগ যে পথে যুগ-সমস্যা, তথা জগদ্ব্যাপী আসন্ন মন্বন্তর-সঙ্কটকে বরণ করিয়া তাহার সমাধানে প্রবৃদ্ধ হইয়াছিল, এই খাঁটি সনাতনী সাধনা জীবনের রূপ-রসকে আশ্রয় করিয়াও, সেই পথে প্রবৃত্ত হয় নাই, এবং তাহার অন্তরায় হইয়াছে। তাহার কারণ, এই সাধনা আদৌ ব্যক্তিমুখী—সমাজমুখী নয়; বিশ্বকে বিরাটকে নিজ-আত্মায় সংহরণ করিয়া সেই মুকুরবিম্বিত আত্মস্বরূপ ছায়ার রূপ-রস-প্রীতিই ইহার সাধন-বস্তু; এই প্রীতিও একরূপ বিশ্বপ্রীতিই বটে, কিন্তু ইহা সেই প্রেম নয়, যে প্রেম আপন আত্মাকে—নিজের ব্যক্তি-সত্তাকে—বিশ্বে বিলাইয়া দিয়া, সেই বিশ্বের ছায়া নয়—কায়াকে আলিঙ্গন করিয়া; "with its tragic compassion binds him to all the sufferings of the universe", এবং 'ecstasy of art or contemplation'এর পরিবর্ত্তে 'fury of action'কেই বরণ করিয়া লয়।

৪

রবীন্দ্রনাথের সাধনা সেই প্রাচীন ভারতীয় সাধনাই বটে, তাহাতে সেই ব্যক্তিস্বতন্ত্র ভাবদৃষ্টিই আধিপত্য করিয়াছে; তথাপি যুগধর্ম্ম এমনই যে, সেই প্রাচীন, আপন ধর্ম্ম সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়াই, আধুনিক বেশ ধারণ করিয়াছে; সেই ভাবদৃষ্টিতেই একটি নূতন রঙ লাগিয়াছে—মন্ত্র সেই একই বটে, কিন্তু তাহাতেই একটি নূতন পিপাসা যুক্ত হইয়াছে—জীবনে যাহা সম্ভব নয়, কাব্যে তাহা হইয়াছে। যে ভূমানন্দের অনুভূতি এককালে ঋষিকেই কবি করিলেও, জগৎ ও জীবনের অসীম বৈচিত্র্যকে চক্ষু মেলিয়া দেখিবার অবকাশ দেয় নাই, সেই রসই একালের কবিকে ঋষি করিয়া তুলিয়াছে, সেই বৈচিত্র্যকে চক্ষু মেলিয়া দেখিবার—অসীমকে সীমার মধ্যে উপলব্ধি করিবার—বিপুল উৎকণ্ঠা জাগাইয়াছে; যেন সেই রসকে জীবনের পাত্রেই আস্বাদন করিতে হইবে; শুধুই মর্ম্মকোষের মধু নয়—সৃষ্টি-শতদলের প্রত্যেকটির বর্ণ, গন্ধ ও রূপরস পঞ্চেন্দ্রিয়-মুখে পান করিতে হইবে। এই যে অরূপের রূপ-পিপাসা, ইহাতে জীবনের যেটুকু আরাধনা আছে, তাহাকেই কালের প্রভাব বলা যাইতে পারে। এবার সেই অমৃতপিপাসু আত্মা দেহেরই দুয়ারে দুয়ারে মাধুকরী করিয়াছে—

> বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলেম খেলে,
> অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে;
> পরশ যাঁরে যায় না করা সকল দেহে দিলেন ধরা—

—এমন কথা বাঙালী কবির মুখে আদৌ অসম্ভব নয়—শাক্ত ও বৈষ্ণবের বংশগত ভাবধারার সেই প্রভাব ব্যর্থ হইবার নহে। তথাপি জীবনের এমন আরতি—মর্ত্যের ধূলামাটিকেও এমন ভাবের ভরে আলিঙ্গন—পূর্ব্বে আর কেহ করে নাই। যুগের সহিত রবীন্দ্র-প্রতিভার যদি কোন গূঢ়তর যোগ থাকে, তবে তাহা ইহাতেই আছে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক আদর্শে যুগপ্রবৃত্তির এই যে নূতনতর প্রেরণা রহিয়াছে, ইহাতেই অতঃপর বাংলা সাহিত্যের আদর্শ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মনুষ্যজীবনকেও রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টিতে অন্তবিধ গৌরব দান করিয়াছেন। তিনি মানুষের শক্তির শ্রেষ্ঠতাকে, তাহার কীর্ত্তি বা প্রতিভার উচ্চতম শিখরকে, মহিমান্বিত করেন নাই; যে-মনুষ্যত্ব জীবনের সমতলভূমিতে, সাধারণ জীবনযাত্রায়, তাহার মর্ম্মের মাধুরী বিকাশ করিয়া, লোকচক্ষুর অন্তরালে, শত শত পুষ্পবৃন্তে ঝরিয়া যায়, তিনি সেই মনুষ্যত্বের পূজা করিয়াছেন। যদিও কাব্যমন্ত্ররূপে ইহার বীজ আরও পূর্ব্বে বিহারীলালের কবিতায় অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তথাপি রবীন্দ্রনাথই যেমন ইহাকে সাহিত্যসৃষ্টিতে সার্থক করিয়াছেন, তেমনই সজ্ঞানে এই মন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন।—

> আমার মনে হয়, যাহাদের মহিমা নাই, যাহারা একটা অস্বচ্ছ আবরণের মধ্যে বদ্ধ হইয়া আপনাকে ভালরূপ ব্যক্ত করিতে পারে না, এমন কি, নিজকেও ভালরূপ চেনে না, মূকমুগ্ধভাবে সুখদুঃখ বেদনা সহ্য করে, তাহাদিগকে মানবরূপে প্রকাশ করা, তাহাদিগকে আমাদের আত্মীয়রূপে পরিচিত করাইয়া দেওয়া, তাহাদের উপরে কাব্যের আলোক নিক্ষেপ করা আমাদের এখনকার কবিদের কর্ত্তব্য। (পঞ্চভূত : 'মনুষ্য')

অন্যত্র—

> জগতের শত শত অসমাপ্ত কথা যত
> অকালের বিচ্ছিন্ন মুকুল,
> অজ্ঞাত জীবনগুলা অখ্যাত কীর্ত্তির ধূলা
> কত ভাব, কত ভয় ভুল,
> সংসারের দশদিশি ঝরিতেছে অহর্নিশি
> ঝর ঝর বরষার মত,
> ক্ষণ-অশ্রু ক্ষণ-হাসি পড়িতেছে রাশি রাশি—
> শব্দ তার শুনি অবিরত। (সোনার তরী : 'বর্ষাযাপন')

এই যে মানুষ-পূজা, ইহা লোকোত্তর-চরিত্রের বা বীর মানুষের পূজা নয়—মানুষমাত্রেরই মধ্যে যে মনুষ্যহৃদয় বা মনুষ্যসুলভ সুখদুঃখ-চেতনা সর্ব্বত্র তরঙ্গিত হইতেছে—ইহা তাহারই পূজা। এই মনুষ্যত্বও 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মে'র মত, ইহার জন্যও ঋষির সেই

দিব্যদৃষ্টির প্রয়োজন; ঐ সাধারণ মানুষের উপরে সেই 'কাব্যের আলোকনিক্ষেপ' করিতে হইবে, যাহাকে ইংরেজ কবি আরও স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন—'the light that never was on sea or land, the Consecration and the Poet's dream"; অর্থাৎ, এখানেও রবীন্দ্রনাথের সেই Idealism—ভাবের আলোকে বস্তুসকলকে মণ্ডিত করিয়া দেখিবার সেই দৃষ্টি—ভঙ্গী হইয়াছে; এবং ইহারই ফলে, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে কবিকল্পনার মহোৎসব পড়িয়া গিয়াছে। সে কল্পনা, প্রকৃতির মধ্যেও যেমন, মানুষের জীবনেও তেমনই, একটি শান্ত-স্থির সৌন্দর্য্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া, উভয়কে একটি আধ্যাত্মিক ঐক্যসূত্রে বাঁধিয়াছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-মন্ত্র ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিদৃষ্টির সম্পূর্ণ অনুরূপ। সাহিত্যিক ভাষায় এই আদর্শকে লিরিক আদর্শ বলা যাইতে পারে; মানবপূজা হিসাবে সেই যুগের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিলেও, এই লিরিক আদর্শ পূর্ব্ববর্ত্তী এপিক বা নাটকীয় আদর্শকে স্থানচ্যুত করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র বা বিবেকানন্দের আদর্শ ও এই আদর্শ এক নয়, বরং বিপরীত; পূর্ব্ববর্ত্তী আদর্শে মানুষ একটা বিরাট শক্তির আধার—কেবল সুখদুঃখ-চেতনার আধার নয়; জীবন একটা নিস্তরঙ্গ সরোবর নয়, ভাবস্থির রস-সাগরও নয়; মানুষের দেহদশাধীন আত্মা বিকাশের অপেক্ষা রাখে—জীবনের গণ্ডি যত বৃহৎ হইবে, কার্য্যের ক্ষেত্র যত প্রশস্ত হইবে, মানুষের চেতনাও তত উদ্‌বুদ্ধ হইবে, জীবন ততই সমৃদ্ধি লাভ করিবে। অতএব মানুষের মধ্যে ক্ষুদ্র ও মহতের প্রভেদ, অথবা, মহত্ত্বের মাত্রাভেদ না মানিলে, সৃষ্টিগত জীবন-ধারাকে অস্বীকার করিতে হয়, বস্তুকে বাদ দিয়া ভাবের সাধনা করিতে হয়। তাহাতে মানুষের সমাজে মিথ্যাচারই বাড়িয়া উঠে। বস্তু ও আদর্শের মধ্যে যে ব্যবধান তাহা দূর করিবার জন্য ভাব-সাধনাই যদি যথেষ্ট হয়, বস্তুর অসম্পূর্ণতা যদি ভাবের দ্বারাই পূরণ করিয়া লওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে কোন দুঃখ, কোন অভাবই আর থাকে না, জীবনের সহিত যুঝিবার প্রয়োজন হয় না। এই অর্থে রবীন্দ্রনাথ খাঁটি Idealist; বঙ্কিমচ[illegible] [illegible]বেকানন্দও Idealist বটেন, কিন্তু তাঁহাদের সেই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিতে হয় জীবনের বাস্তব-সাধনা দ্বারা; এজন্য সে ক্ষেত্রে, ভাব-সাধনা নয়—শক্তি-সাধনাই প্রকৃত সাধনা। তথাপি তত্ত্বের দিক দিয়া এই দুই সাধনাই সত্য; একটি সমাজ-জীবনের সাধনা, অপরটি ব্যক্তি-জীবনের—একটি স্রোতে ঝাঁপ দিয়া, অপরটি কূলে বসিয়া; একটি শাক্ত সাধনা, অপরটি বৈষ্ণব। রবীন্দ্রনাথ যে খাঁটি বৈষ্ণব তাহাতে সন্দেহ নাই; তিনি বিরাট-বিপুলকে ক্ষুদ্রের মধ্যেই প্রতিবিম্বিত দেখিয়া চরিতার্থ হন, তাঁহার ভগবান তুচ্ছতম জীবকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিবার জন্য ব্যাকুল—

"আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,
তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি, বাসিতে পারি যে ভালো।"

শিশিরের বুকে আসিয়া কহিল তপন হাসিয়া
"ছোট হ'য়ে আমি তোমারে রহিব ভরি'
তোমার ক্ষুদ্র জীবন গড়িব হাসির মতন করি'।"

"অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বম্" বলিয়া রবীন্দ্রনাথ সেই বিরাটের শক্তির দিকটিকে বড় করিয়া দেখেন নাই। জীবনের যে রূপ তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে, তাঁহার কাব্যে তিনি যে নর-নারীচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে এই উক্তি বড় যথার্থ বলিয়া মনে হয়। অপর এক সাহিত্যিক-প্রতিভার পরিচয়প্রসঙ্গে একজন ইংরেজ সমালোচক বলিতেছেন—

In many ways he was a tremendously intelligent child who, playing on the sea-shore, did not concern himself with the sweep of the great tides, but splashed ecstatically in the less menacing ripples, with the keenest eyes for the adorable jetsam they flung up. He was not at ease, nor at his best in the presence of high tensions, they made him feel uncomfortable, as if a thunderstorm was brewing.

এই যে "keenest eyes for the adorable jetsam"—ইহা রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টির সম্বন্ধে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু এইরূপ জীবন-দর্শন কাব্যের পক্ষে যতই সত্য ও সঙ্গত হউক,—'Criticism of life', বা বাস্তব ও আদর্শের সমন্বয়-মূলক জীবন-সত্যের দিক দিয়া, সম্যক-দর্শন নহে। বাংলার নবযুগের সাধনায় মানুষের যে পৌরুষ-ধর্ম্মের উৎকর্ষই ছিল একমাত্র লক্ষ্য, এখানে তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছে; এখানে জীবন মানুষের অধীন নয়, মানুষই জীবনের অধীন, এবং সে জীবনে কর্ম্মের উপরে ধ্যান, বস্তুর উপরে ভাবই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই ভাবধারা সম্পূর্ণ নূতন—ইহার অন্তর্নিহিত যে তত্ত্ব, তাহাই রূপান্তরিত হইয়া—বাস্তব ও আদর্শের ভেদ ঘুচাইয়া দিয়া—জগৎব্যাপী মহা-বিপ্লবের মন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এক দিকে সর্ব্বমানব-দেববাদ ও অপর দিকে সর্ব্বমানব-পশুবাদের সাম্য-ঘোষণা হইতেছে। বাংলার নবযুগের সাধনা ও তাহার আদর্শ যে ইহা হইতে কত স্বতন্ত্র, তাহার সেই মানব-বাদ বা মানব-ধর্ম্ম যে এইরূপ বিশ্বমানব-বাদকে—এই universalismকে—স্বীকার করে নাই, বরং জাতিগত বৈশিষ্ট্যের উপরেই সর্ব্বজাতীয়তার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, এবং জাতির বিশিষ্ট সংস্কৃতি ও জাতিধর্ম্মকেই—তাহার সেই স্বধর্ম্মকেই, সেই এক আদর্শে আরোহণ করিবার সোপান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। এক কালে রবীন্দ্রনাথও জাতীয়তা বা জাতিধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করা প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। যথা—

গোলাপফুল ত বিশ্বেরই ধন, তাহার সুগন্ধ তাহার সৌন্দর্য্য ত সমস্ত বিশ্বের আনন্দেরই অঙ্গ, কিন্তু তবু গোলাপফুল ত বিশেষ ভাবে গোলাপ গাছেরই সামগ্রী,

তাহা ত অশ্বত্থগাছের নহে। পৃথিবীতে সকল জাতিরই ইতিহাস আপনার বিশেষত্বের ভিতর দিয়া বিশ্বের ইতিহাসকে প্রকাশ করিতেছে। (আত্মপরিচয়)

* * *

এই বিশ্বধর্ম্মকে আমরা হিন্দুর চিত্ত দিয়াই চিন্তা করিয়াছি, হিন্দুর চিত্ত দিয়াই গ্রহণ করিয়াছি। শুধু ব্রহ্মের নামের মধ্যে নহে, ব্রহ্মের ধারণার মধ্যে নহে, আমাদের ব্রহ্মের উপাসনার মধ্যেও একটি গভীর বিশেষত্ব আছেই—এই বিশেষত্বের মধ্যে বহুশত বৎসরের হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর ভক্তিতত্ত্ব, হিন্দুর যোগসাধনা, হিন্দুর অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, হিন্দুর ধ্যানদৃষ্টির বিশেষত্ব ওতপ্রোত ভাবে মিলিত হইয়া আছে। আছে বলিয়াই তাহা বিশেষ ভাবে উপাদেয়; আছে বলিয়াই পৃথিবীতে তাহার বিশেষ মূল্য আছে। আছে বলিয়া সত্যের এই রূপটিকে—এই রসটিকে মানুষ কেবল এখান হইতে পাইতে পারে। (আত্মপরিচয়)

এখন জগৎ জুড়িয়া সমস্যা এ নহে যে, কী করিয়া ভেদ ঘুচাইয়া এক হইব—কিন্তু কী করিয়া ভেদ রক্ষা করিয়া মিলন হইবে। সে কাজটা কঠিন—কারণ, সেখানে কোন ফাঁকি চলে না, সেখানে পরস্পরকে পরস্পরের জায়গা ছাড়িয়া দিতে হয়।

(হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়)

—ইহা জাতীয়তা-ধর্ম্মেরই কথা, ইহাই বঙ্কিম-বিবেকানন্দের কথা; রবীন্দ্রনাথ তখন বাংলার নবযুগের সেই সাধনাকেই সমর্থন করিয়াছিলেন। পরে তিনি এই আদর্শ একেবারে ত্যাগ করিয়া বিশ্বমানববাদ প্রচার করিলেন, একেবারে বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইলেন। তখন মানুষের জাতিভেদ, স্বধর্ম্ম ও সংস্কৃতিভেদ আর নাই—মানুষের নাম হইল 'বিশ্বমানব', তাহার দেশ হইল—'সর্ব্বমানবলোক'। সেই মানুষের প্রকাশ যেখানে তাহাই স্বদেশ।—

সত্য কথা বলি, বিদেশেই তাদের বেশি দেখলুম, কিন্তু তারা যে দেশে থাকে সে দেশ বিদেশ নয়, সে যে সর্ব্বমানবলোক। সেই দেশেরই দেশাত্মবোধ আমার হোক, এই আমার কামনা।

*

বহুকাল আগে 'কড়ি ও কোমলে'র যে একটি কবিতায় লিখেছিলুম—

"মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই"

তার মানে হচ্ছে, এই মানুষ যেখানে অমর সেইখানেই বাঁচতে চাই। সেই জন্যই মোটা মোটা নামওয়ালা ছোট ছোট গণ্ডিগুলোর মধ্যে আমি মানুষের সাধনা করতে পারিনে। স্বাজাত্যের খুঁটিগাড়ি ক'রে নিখিল মানবকে ঠেকিয়ে রাখা আমার দ্বারা হয়ে উঠল না, কেন না, অমরতা তাঁরই মধ্যে যে-মানব সর্ব্বলোকে।
("পত্রধারা", 'প্রবাসী', ১৩৩৮)

'নিখিল মানবকে ঠেকিয়ে রাখা আমার দ্বারা হয়ে উঠল না'—রবীন্দ্রনাথের এই স্বীকারোক্তি বড় সত্য ও মূল্যবান। 'স্বাজাত্যের খুঁটিগাড়ি' একদিন তিনিও করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু সেটা তাঁহার পক্ষে পরধর্ম, শেষে স্বধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি সুস্থ বোধ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'সনাতন'-পন্থী, ভারতের সেই ভূমাবাদে দেশ কাল বা জাতি, কোনটারই স্থান নাই, তাই বাংলার নবযুগের সাধনা রবীন্দ্রনাথকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই; শেষজীবনে রবীন্দ্রনাথ সেই সাধনমন্ত্রকে সর্ব্বতোভাবে অস্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহার অসংখ্য রচনা ও অসংখ্য উক্তি তাহার সাক্ষ্য দিবে।

বাংলার নবযুগ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কথা এই পর্য্যন্ত। রবীন্দ্রনাথ উনবিংশ শতাব্দীর মানুষ হইলেও তাঁহার স্থান বিংশ শতাব্দীতেই, তাহার কারণ, তাঁহার প্রতিভা ও মনীষার যে দৃঢ়তর অভিব্যক্তি, এবং কাব্যসাধনার বাহিরেও নব নব ভাব-চিন্তার নায়করূপে তাঁহার যে আত্মপ্রকাশ, তাহা এই বিংশ শতাব্দীতেও ঘটিয়াছে; এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বের যাহা কিছু প্রভাব তাহাও এই কালের শিক্ষিত-সমাজের উপর পড়িয়াছে। তাঁহার সেই কবিজীবনের পরবর্ত্তী ইতিহাস এবং সেই প্রভাবের ফলাফল বর্ত্তমান আলোচনার বিষয়ীভূত নয়, এজন্য বাংলার নবযুগের পরিশিষ্ট হিসাবেই, সেই যুগকে অনুসরণ করিয়া, আমি তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা যে তাঁহার প্রতিভার সম্যক পরিচয় নয়, ইহা বলাই বাহুল্য।

৫

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর সেই নব-জাগরণের কাহিনী শেষ করিবার পূর্ব্বে সমগ্রভাবে দুই-চারিটি কথা বলিব। এই কাহিনীতে আমি বাঙালী-জাতির প্রতিভা ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, এবং বিশেষ করিয়া, একটা যুগের যুগ-সমস্যার পরিচয় দিয়াছি। আজ এই জাতি প্রায় মরণোন্মুখ বলিলেও হয়; জীবনের সকল ক্ষেত্রে সে আজ আত্মচৈতন্যহীন ও হতোদ্যম হইয়া পড়িয়াছে, এমন অবস্থা তাহার কখনও হয় নাই। বহু পূর্ব্বকালের না হইলেও, দীর্ঘ পাঁচ শত বৎসরের যে অসন্দিগ্ধ ইতিহাস আজও স্মরণাতীত হয় নাই, তাহাতে এই জাতির মনীষা ও প্রাণশক্তির, এবং জাতি হিসাবে একটি অতিশয় বিলক্ষণ সংস্কৃতির পরিচয় স্পষ্ট হইয়া আছে। উনবিংশ শতাব্দীতে তাহার যে অসাধারণ উদ্দীপ্তি ঘটিয়াছিল, তাহারই আলোকে তাহার সেই অতীতকে যেমন, তেমনই তাহার ভবিষ্যৎকেও ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া যায়। আজিকার এই মহা দুর্দ্দিনে—এই মোহ ও মস্তিষ্কবিকার এবং পরধর্ম্মপিপাসার প্রবল উপসর্গ-পীড়ার মধ্যে, প্রকৃতিস্থ হওয়ার জন্য অতিশয় ধীরভাবে আত্মসাক্ষাৎকারের প্রয়োজন আছে। সেই আত্ম-পরিচয় লাভ করিবার জন্য বেশি দূরে দৃষ্টি করিতে হইবে না, মাত্র দুই তিন পুরুষ পূর্ব্বে বাঙালী কি ছিল তাহা জানিলেই যথেষ্ট হইবে। এই উদ্দেশে, আমি আমার অভ্যস্ত

সাহিত্য-চিন্তা ত্যাগ করিয়া, অতিশয় স্বাস্থ্যভঙ্গ অবস্থায়, এই দুরূহ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমি জানি, আমার এই আলোচনায় বহু ভ্রম-প্রমাদ আছে, বিশেষত ঐতিহাসিক তথ্যবিচারে অনেক ত্রুটি ঘটিয়াছে। কিন্তু আমি ইতিহাস লিখি নাই; সে যুগের মানসিক ও আধ্যাত্মিক জাগৃতির লক্ষণগুলিকে অবলম্বন করিয়া, কেবল সাহিত্যিক ভাব-চিন্তার সাহায্যে, জাতির গূঢ়তর প্রবৃত্তি ও প্রেরণা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি; তাহাতেই তাহার যে প্রতিভা ও প্রাণশক্তির পরিচয় পাইয়াছি, সে পরিচয় মিথ্যা নহে। ইহাও সত্য যে, আমি সেই নব-জাগরণের একটা দিক ধরিয়াই আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু আর একটা দিকও আছে, এইবার সেই দিকটির বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিব। এই নব-জাগরণ সম্ভব হইয়াছিল একটি মাত্র কারণে—জাতির দেহও যেমন সুস্থ ছিল, তেমনই তাহার প্রাণশক্তিও ছিল অটুট; যেন বহুকালসঞ্চিত শারীরিক শক্তি ও হৃদয়বল একটা অভাবনীয় সুযোগে শত ধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল—শুধুই মনের নয়, প্রাণের প্রাবল্যও ধরিয়া রাখা যাইতেছিল না। সে কি উল্লাস! কি উৎসাহ! অতি দরিদ্র নিঃসহায় পল্লীবালকও কেবল দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধনশক্তি ও প্রাণের অদম্য পিপাসায় শহরের বিদ্বৎসমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিতেছে। ধনীর সন্তান নিশ্চিন্ত ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া, নূতনতর জীবনযাপনের জন্য দারিদ্র্য বরণ করিতেছে। কোথাও বা নবশিক্ষার সেই আলোক প্রাণের আতশ কাচে পড়িয়া অগ্নিশিখার মত জ্বলিয়া উঠিতেছে; গোঁড়া হিন্দুর সন্তান দারুণ ম্লেচ্ছাচারে মাতিয়া উঠিতেছে। আজন্ম সংস্কারে আচারে অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ থাকিয়াও, শাস্ত্রজ্ঞ মহাপণ্ডিতও গুরুতর সমাজসংস্কারে সর্ব্বস্বপণ করিতেছে—জীবনের আদর্শ পরিবর্ত্তন করিবার জন্য উচ্চশিক্ষা হইতেও ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনকে বহিষ্কার করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছে! যে নিজে জাগিয়াছে সে অপরকে জাগাইবার জন্য অধীর হইয়াছে। যে নিজে খ্রীষ্টান হইয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজক হইয়াছে, মাতৃভাষার উন্নতি ও স্বজাতির জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য তাহারও কি উৎসাহ! অসাধারণ মেধাশক্তির বলে দেশী ও বিদেশী বিদ্যা আত্মসাৎ করিয়া যাহার প্রত্যয় হইল যে জীবনের বাহিরে আর কিছু নাই, সে সারাজীবন নাস্তিক হইয়া কাটাইয়া দিল, কোন মোহ মানিল না, নিজের অমূল্য প্রতিভার কোন মূল্য চাহিল না! আর একজন আরও বলিষ্ঠ, আরও প্রতিভাশালী—জীবনের সমস্যাকে এমনই দুর্ব্বোধ্য ও মূল্যহীন মনে করিল যে, পূর্ণযৌবনে, সম্পূর্ণ সুস্থদেহে আত্মহত্যা করিল; সে আত্মহত্যা দুর্ব্বলের আত্মহত্যা নয়। এমন দৃষ্টান্ত আরও আছে। সাহিত্যসেবার পূর্ণ উৎসাহ এবং নিশ্চিত কবিখ্যাতি সত্ত্বেও একজন সুস্থ ও হৃদয়বান ব্যক্তি কেন যে আত্মহত্যা করিল, তাহার কারণ কেহ

(ইহার শেষ অংশ ২৩৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সপ্তর্ষি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পরমানন্দ অনামিকা সোম-শুভ্রের কাছে নানা ভাবে উপকৃত। এমন কি তাদের আশাও আছে যে, হয়তো সোম-শুভ্র তাদেরই তাঁর বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ক'রে যাবেন। সুতরাং সোম-শুভ্রের যে কোন প্রকার অদ্ভুত আচরণই তারা সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু তারাও অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল (নবকুমার ইলার কাছে) যখন তিনি অবিচলিত গাম্ভীর্য্য সহকারে ব্যক্ত করলেন যে, গাছেরাও মানুষের মতই কথা কয় এবং পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময় করে। তাঁর মতে আমরা যাকে 'মর্ম্মর' বলি, তা ঠিক একই ধরনের ধ্বনি নয়। বিভিন্ন গাছেরই মর্ম্মর যে বিভিন্ন তাই শুধু নয়, একই গাছের বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন ঋতুতে মর্ম্মরধ্বনি বিভিন্ন—এ তিনি লক্ষ্য করেছেন। বাতাসের গতি-বেগ এবং পত্রের আকৃতির ওপরই মর্ম্মরধ্বনি প্রধানত নির্ভর করে তা তিনি জানেন, কিন্তু এ-ও তিনি অনুভব করেছেন এবং তার কতকটা প্রমাণও পেয়েছেন যে, কেবল বাতাসের গতি-বেগ ও পত্রের আকৃতি দিয়েই সর্ব্বপ্রকার মর্ম্মরধ্বনির ব্যাখ্যা করা যায় না। এ বিষয়ে গাছেদের নিজেদেরও যেন সজ্ঞান কিছু প্রচেষ্টা আছে ব'লে মনে হয় তাঁর। যন্ত্র দিয়ে তিনি মেপে দেখেছেন যে, একই উত্তাপে ও বায়ুমণ্ডলের চাপে একই বাতাসের গতি-বেগে একই গাছ বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন রকম মর্ম্মরধ্বনি শোনায়। ফোনোগ্রাফ-যন্ত্র থাকলে তিনি প্রমাণ রাখতে পারতেন। তা ছাড়া তাঁর মতে গাছের ভাষা শুধু শ্রাব্য নয়, দর্শনীয়ও। চক্ষু এবং কর্ণ উভয় ইন্দ্রিয়ের সহযোগে সে ভাষার মর্ম্ম গ্রহণ করতে হয়। গাছের সব পাতা একসঙ্গে কাঁপে না, সব পাতার ওপর সূর্য্যালোক সমভাবে প্রতিফলিত হয় না। শুধু ফোনোগ্রাফ নয়, সিনেমাটোগ্রাফও দরকার, যদি কেউ বৈজ্ঞানিক উপায়ে গাছের ভাষাতত্ত্ববিষয়ক গবেষণা করতে চান। গাছের ভাষা শ্রাব্য এবং দৃশ্য তো বটেই, তা ছাড়া আর একটা জিনিস আছে ব'লেও তাঁর মনে হয়। সিম্বায়োসিস ব'লে যেমন এক ধরনের জীবনযাত্রাপ্রণালী উদ্ভিদ ও পশু জগতে বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করেছেন—যাতে দুটি বিভিন্ন প্রাণী অথবা উদ্ভিদ যৌথভাবে পরস্পরের সাহায্য নিয়ে প্রাণ ধারণ করে—তেমনই, সোম-শুভ্রের ধারণা, গাছের ভাষা ও পাখীর গান, গাছের ভাষা ও পতঙ্গের গুঞ্জন, পরস্পর-পরিপূরক। একের সাহায্য ব্যতিরেকে অপরে ঠিক যেন মূর্ত্ত হতে পারে না।

তাই বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকে গাছের ভাষার রূপও বিভিন্ন। সোম-শুভ্রের দৃঢ় বিশ্বাস, তারা তাদের এই বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ভাব-বিনিময়ও করে। তিনি লক্ষ্য করেছেন, কলকে ফুলের গাছের পাতায় পাতায় হঠাৎ একটা শিহরণ জাগল, একটা কোকিল ডেকে উঠল তার ডালে। ঠিক পাশেই একটা আতা গাছ, একই রকম হাওয়া বইছে, কিন্তু তাতে শিহরণও নেই, কোকিলও নেই। কিন্তু আর একটু দূরে আর একটা কলকে ফুলের গাছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জাগল অনুরূপ শিহরণ, তার ডালেও ডেকে উঠল কোকিল। মনে হ'ল, দুটো গাছ যেন কথা ক'য়ে উঠল একই ভাষায়। এসব ঘটনা এত বার তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, এদের তিনি কাকতালীয়বৎ ব'লে উড়িয়ে দিতে চান না। তবে তাঁর এই মতবাদকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দাঁড় করাবার জন্য যে সব প্রমাণ প্রয়োগ করা প্রয়োজন, তা ঠিক ক'রে উঠতে পারেন নি তিনি। তবু তিনি এগুলো ছাপার অক্ষরে লিপিবদ্ধ ক'রে রাখতে চান এই উদ্দেশ্যে যে, ভবিষ্যৎ যুগের কোন বৈজ্ঞানিক হয়তো এ নিয়ে কাজ করতে পারবেন, তাঁর এ কল্পনাও হয়তো সত্যরূপে মূর্ত্ত হবে কোনদিন ভবিষ্যৎ কোন জগদীশচন্দ্রের প্রতিভাবলে।

সম্পাদক নবকুমারের মনে হ'ল, সোম-শুভ্র বোধ হয় এই সব প্রলাপ তার 'অধরা' পত্রিকায় ছাপাতে চান এবং সেই উদ্দেশ্যেই তাকে বোধ হয় নিমন্ত্রণ করিয়েছেন আজ। এই হাস্যকর ব্যাপার বেশি দূর অগ্রসর হওয়ার পূর্ব্বেই নিবৃত্ত করা উচিত, নবকুমারের মনে হ'ল। কর্ত্তব্য-প্রণোদিত অপ্রিয় কার্য্যটাকে কৌশলে মোলায়েম করবার উদ্দেশ্যে তাই সে বললে, আপনার প্রবন্ধটা আমার কাগজে নিতে পারতাম; কিন্তু তাতে এত গম্ভীর প্রবন্ধ ঠিক চলবে কি না, বুঝতে পারছি না। আমার কাগজ ঠিক বৈজ্ঞানিক পত্রিকা তো নয়। তবে—

সোম-শুভ্রকে সবিস্ময়ে চেয়ে থাকতে দেখে নবকুমার থেমে গেল।

তোমার কাগজ আছে নাকি?

আমার ঠিক নয়। প্রোপ্রাইয়েটর হচ্ছেন রামদাস মল্লিক। আমি সহকারী সম্পাদক।

প্রোপাইটার না ব'লে প্রোপাইয়েটর বললে, কারণ তার গর্ব্ব, ইংরেজী কথা যখন বলে, তখন অভিধান-সম্মত শুদ্ধ উচ্চারণই ক'রে থাকে সে।

সব সময় সফল হয় না যদিও, কারণ সে ইংরেজ নয়, তবু চেষ্টা করে। বেণীমাধবের অভিধান উলটে পালটে আজই সকালে 'প্রোপাইয়েটর' তার চোখে পড়েছিল। তাক মাফিক লাগিয়ে দিলে।

সোম-শুভ্র প্রশ্ন করলেন, রুবি মিলের রামদাস মল্লিক নাকি?

হ্যাঁ।

কাগজের নাম কি?

অধরা।

রামদাস মল্লিক সোম শুভ্রের অপরিচিত নন। তিনিও ব্রাহ্ম। এই ওজুহাতে এবং অবলা বিধবাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করবেন এই কারণ দেখিয়ে বহুকাল পূর্ব্বে তিনি সোম-শুভ্রের কাছ থেকে হাজার খানেক টাকা চাঁদা নিয়েছিলেন। অনেকের কাছ থেকেই নিয়েছিলেন,—হাজার টাকা অবশ্য আর কেউ দেন নি, কিন্তু দশ, বিশ; পঁচিশ, পঞ্চাশ, একশো—যার কাছে যতটুকু নেওয়া যায় তিনি নিয়েছিলেন। অবলা বিধবাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা অবশ্য হয় নি, কিছুকাল পরে একটি তেলের কল স্থাপিত হয়েছিল। বিধবার সঙ্গে এই তেলের কলটির কিছু সম্পর্ক যে ছিল না, তা নয়। রুবি-নাম্নী যে বিধবা মেয়েটির প্রেমে প'ড়ে রামদাস মল্লিক দ্বিতীয় পক্ষে তাকে বিয়ে করেছিলেন, তার নামের সঙ্গে মিলটির নাম যুক্ত ক'রে বিধবা-প্রীতির কিছু পরিচয় মল্লিক মশায় দিয়েছিলেন। কিছুতেই ধরা-ছোঁয়া যায় না যে মল্লিককে, তিনি আজকাল 'অধরা' নামক এক পত্রিকারও স্বত্বাধিকারী হয়েছেন—এই বার্ত্তা শুনে সোম-শুভ্রের মনের নেপথ্যে যে রসিকতা উদ্বেলিত হয়ে উঠল, তার আভাস মুখে অবশ্য ফুটল না কিছু। ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে তিনি বললেন, ও। তোমাদের কাগজে চলে না বুঝি এ ধরনের লেখা?

আজ্ঞে না। আমরা পোস্ট জর্জিয়ান লিটারারি 'মুউভ্‌মেণ্ট' নিয়েই আছি। তারই রূপটা বাংলা ভাষায় ফোটাতে চেষ্টা করছি।

হচ্ছে না কিন্তু কিছুই।—কথাটা অপ্রত্যাশিতভাবে ব'লেই সোম-শুভ্রের মুখের দিকে চেয়ে ইলা বুঝলে যে, কথাটা এখন এ ভাবে বলাটা অশোভন হয়েছে। ইলার অপ্রতিভ ভাবটা দেখে অনামিকাকে ঘাড় ফিরিয়ে হাস্য গোপন করতে হ'ল। পরমানন্দ দৃষ্টির ইঙ্গিতে নবকুমারকে অনুরোধ করতে লাগল, যেন সোম-শুভ্রকে খুব বেশি নিরুৎসাহিত না করা হয়। সোম-শুভ্র প্রবন্ধের পাতাতেই

নিবদ্ধদৃষ্টি ছিলেন। এসব তিনি দেখতে পেলেন না। বলা বাহুল্য, 'অধরা' পত্রিকায় প্রবন্ধ ছাপাবার কোন আগ্রহ তাঁর জাগল না। জাগলেও তার জন্যে নবকুমারের অনুগ্রহপ্রার্থী হবার দরকার হ'ত না তাঁর, রামদাস মল্লিক যখন সে পত্রিকার স্বত্বাধিকারী। কিন্তু এত কথা তিনি নবকুমারকে বললেন না। ক্ষণকাল নীরব থেকে একটু সসঙ্কোচেই তিনি বললেন, আমি যা লিখেছি তা বিশেষ কিছু নয় হয়তো, কিন্তু তবু এটা ছাপাব ঠিক ক'রে ফেলেছি। ছাপালে পঞ্চাশ ষাট পাতার একখানা চটি-বই হবে। এক হাজার কপি ছাপাতে কত খরচ পড়তে পারে?

নবকুমারই উত্তর দিলে, দেড়শো টাকার মধ্যেই হবে।

দেড় হাজার টাকায় তা হ'লে দশ হাজার কপি হবে।

একেবারে দশ হাজার কপি ছাপাবেন? অত কি বিক্রি হবে?

বিক্রি করব না, বিতরণ করব।

এর জন্যে কেউ প্রস্তুত ছিল না। চতুর্দ্দিকে সকলের যখন এত অভাব, তখন শুধু শুধু দেড় হাজার টাকার এই অপব্যয়! পরমানন্দকে মানুষ করেছিলেন ব'লেই বোধ হয় তার ধারণা ছিল যে, সোম-শুভ্রের টাকাকড়ির ওপর তার একটা ন্যায্য দাবি আছে। তাই সে সবিস্ময়ে ব'লে উঠল, তার মানে?

মনে করেছি, লাখ খানেক টাকা কোনও ভাল ব্যাঙ্কে জমা ক'রে যাব। তারই সুদ থেকে প্রতি বছর এই বই ছাপা হয়ে বিতরিত হবে। হাজার দুই-তিন সুদ হবে বোধ হয়। দেড় হাজার যদি বই ছাপানোর খরচ হয়, বাকিটা হবে বিতরণের খরচ। যিনি বিতরণ করবেন, তাঁকে কিছু পারিশ্রমিক দিতে হবে, টিকিট প্রভৃতিও লাগবে কিছু—

ইলা আবার কথা ক'য়ে উঠল অপ্রত্যাশিতভাবে, আপনার টাকা অবশ্য আপনি যেমন ভাবে খুশি খরচ করতে পারেন—

তারপর একটু হেসে বললে, এদেশে এখনও সে স্বাধীনতা আছে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, এতগুলো টাকা আরও ঢের ভালভাবে 'ইউটিলাইজ' করা যেত।

সোম-শুভ্র কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন এবং চুপ ক'রেই হয়তো থাকতেন, যদি না তাঁর মনে হ'ত যে, তাঁর নীরবতাকে হয়তো উপেক্ষা ব'লে মনে করবে মেয়েটি। মৃদু হেসে তাই উত্তর দিলেন, সেটা নির্ভর করে ইউটিলিটি কাকে বল

তুমি, তার ওপর। তোমার শাড়ি দেখে আমার কিন্তু ভরসা হচ্ছে যে, আমাদের দুজনের আদর্শে খুব বেশি তফাত নেই।

ইলার দামী রেশমের শাড়িটার দিকে সস্নেহে চাইলেন তিনি।

ইলা লজ্জিত মুখে বললে, এর দামই বা কত? আর এ কটা টাকা দিয়ে কটা লোকেরই বা উপকার হবে? কিন্তু আপনার ওই এক লাখ টাকা দিয়ে—

তেত্রিশ কোটি লোকের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা ভাবলে এক লাখ টাকাও কিছু নয়। আর একটা স্কুল তৈরি ক'রে আরও গোটাকতক লোককে কেরানী হবার সুযোগ দিতে চাও? না, আর কোন হিতকর অনুষ্ঠানের আয়োজন ক'রে কতকগুলো চোরকে প্রশ্রয় দিতে চাও? তোমার মতে কি হ'লে ভাল হয়, শুনি?

আপনার ওই বই ছাপিয়েই বা কি হবে?

হয়তো কিছুই হবে না। আবার এমনও হতে পারে যে, আজ যা আজগুবি ব'লে মনে হচ্ছে, ভবিষ্যতে তাই হয়তো কোন বৈজ্ঞানিকের প্রতিভায় প্রদীপ্ত হয়ে মানব-সভ্যতার রূপই বদলে দেবে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে—

কথাটা বলতে গিয়ে একটু ইতস্তত ক'রে থেমে গেলেন তিনি। ঘড়িতে আটটা বাজল। অনামিকাকে উঠে পড়তে হ'ল। সোম-শুভ্রের আহারের ব্যবস্থা করতে হবে। রাত্রে অবশ্য দুধ ছাড়া তিনি খাবেন না কিছু এবং সে দুধটুকুও নিজের প্যানে নিজের স্টোভে গরম ক'রে নেবেন, কিন্তু তারও ব্যবস্থা করতে হবে অনামিকাকেই। অনামিকা এতক্ষণ একটি কথাও বলে নি, সোম-শুভ্রের কথাবার্ত্তা শুনে কিছু বলবার আর প্রবৃত্তিও ছিল না তার। আলেয়াকে নির্ভরযোগ্য আলো মনে ক'রে বিভ্রান্ত পথিক অবশেষে যেমন বিক্ষুব্ধ হয়, সোম-শুভ্রের আলোচনা শুনে অনামিকার মনের অবস্থাও অনেকটা তেমনই হয়েছিল। নিরীহ নির্দ্দোষ পরমানন্দের ওপর ভয়ানক রাগ হচ্ছিল তার। একেই বলে কালনেমির লঙ্কা ভাগ। সোম-শুভ্রের টাকার ওপর নির্ভর ক'রে বালীগঞ্জের চৌমাথার ওপর জমির দর করা হচ্ছিল। দেড়শো টাকা মাইনের কেরানীর আশাও কম নয়! বামন হয়ে চাঁদে হাত! মনের মধ্যে তুষানল জ্বলছিল অনামিকার। সে আর ব'সে থাকতে পারলে না, উঠে গেল। পত্নীর মনের অবস্থা পরমানন্দেরও অজ্ঞাত রইল না। হঠাৎ বেফাঁস কিছু ব'লে না বসে! অনামিকার পিছু পিছু সেও উঠে গেল।

নবকুমার বললে, আপনার সবচেয়ে বড় কথাটা কি, তা তো বললেন না?

আমার নিজের তৃপ্তি।

একটু চুপ ক'রে থেকে সোম-শুভ্র আবার বললেন, লম্বা লম্বা বক্তৃতার' আড়ালে এই সত্য কথাটা ঢাকা প'ড়ে যায় অনেক সময়। বুদ্ধ, চৈতন্য, রামমোহন, বিবেকানন্দ, পৃথিবীর বড় বড় বৈজ্ঞানিক, কবি দার্শনিক, দেশনেতা সকলেই যা সন্ধান করেছেন, তার নাম আত্ম-তৃপ্তি। দৈবক্রমে তাতে আর পাঁচজনের উপকার হয়ে গেছে। না-ও যদি হ'ত, তা হ'লেও তাঁরা স্বধর্মচ্যুত হতেন না।

এতটা ব'লে সহসা তাঁর মনে হ'ল, আত্ম-প্রশংসা করা হচ্ছে। সসঙ্কোচে চুপ ক'রে গেলেন।

ইলা মুখরা মেয়ে। ব'লে উঠল, দশজনের উপকার ক'রে যাঁরা তৃপ্তিলাভ করেন, তাঁরাই পৃথিবীতে পূজনীয় কিন্তু।

ঈষৎ হেসে সোম-শুভ্র বললেন, পৃথিবীতে এ রকম লোক থাকাও অসম্ভব নয়, যাঁরা দশের পূজা এড়াতে চান। মানুষ অনেক সময় ভ্রান্ত ধারণাকেই পূজো করে কিনা। গ্যালিলিও যদি লোকের পূজা চাইতেন—

এখন কিন্তু তিনি বৈজ্ঞানিক মাত্রেরই পূজনীয় নন কি?

এখন। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর মতকে সমসাময়িক বিজ্ঞেরা শুধু আজগুবি ব'লেই মনে করে নি, তাঁকে লাঞ্ছিতও করেছিল সেজন্যে।

তারপর একটু হেসে বললেন, তা ব'লে আমি এ কথা বলতে চাইছি না যে, আমি গ্যালিলিওর সমকক্ষ। এটা হয়তো আমার বাজে খেয়াল মাত্র। তর্কের খাতিরেই তর্ক করছিলাম শুধু।

এই পর্য্যন্ত ব'লে স্মিতমুখে চুপ ক'রে রইলেন তিনি।

একটু পরে নবকুমার কথা কইলে, ইলা দেবী কম্যুনিস্ট, তাই আপনার খেয়াল বোধ হয় ভাল লাগছে না ওঁর।

সোম-শুভ্র সস্নেহে ইলার দিকে চাইলেন।

ইলা ব'লে উঠল, যে কোন সুস্থ-মস্তিষ্ক লোক কম্যুনিস্ট না হয়ে পারে না। বর্ত্তমান যুগে কম্যুনিজ্‌মই মুক্তি। আপনার মনে হয় না তা?

সোম-শুভ্র বললেন, হ্যাঁ, যাদের খেটে খেতে হবে, তাদের পক্ষে মুক্তি বইকি।

সকলেরই খেটে খাওয়া উচিত এবং প্রত্যেক সভ্যসমাজের উচিত—প্রত্যেক কর্ম্মীকে কাজ করবার সুযোগ দেওয়া।

সব মানুষের পক্ষে কি এক নিয়ম খাটে? তুঁতগাছ গুটিপোকার পক্ষে হিতকর স্বীকার করি, কিন্তু সব পোকার পক্ষে নয়। এমন কি সেই গুটি-পোকাই যখন প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হয়, তার পক্ষেও নয়। সেও তখন তুঁতপাতায় আবদ্ধ থাকে না, ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায়। গুটিপোকার চক্ষে যেটা নিরর্থক বিলাস, প্রজাপতির পক্ষে সেইটেই সার্থক কর্ম্ম। এক নিয়ম কি খাটে সকলের বেলায়? বিশেষত মানুষের বেলায়?

উপমা দিয়ে কথা কইলে পারব না। নবকুমারবাবুর মত সাহিত্যিক তো আমি নই, লেখাপড়া শিখে বেকার ব'সে আছি। কারও গলগ্রহ হয়ে থাকবার ইচ্ছে নেই। তাই মনে হয়, সোভিয়েটের দেশে থাকলে হয়তো সসম্মানে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারতাম।

সোম-শুভ্র চুপ ক'রে রইলেন। নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হতে লাগল তাঁর। তাঁর বিশ্বাস যে, প্রকৃতির বিচিত্র নিয়ম-অনুসারে বিভিন্ন জীব বিভিন্ন প্রকার সুখ-দুঃখ ভোগ করতে বাধ্য। মানুষের তৈরি সাম্যবাদের ছদ্মবেশ এত বার ধরা পড়েছে যে, বৈজ্ঞানিক মাত্রেই শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছেন, জীবনটা সত্যিই যদি একটা যুদ্ধ হয় এবং তার প্রধান অস্ত্র যে শক্তি, তা প্রকৃতিই সকলকে যদি সমানভাবে না দিয়ে থাকেন, তা হ'লে নিখুঁত সাম্যের আশা দুরাশা মাত্র, আদর্শবাদীর স্বপ্ন শুধু। বাস্তব-জগতে সেটাকে মুখোশরূপে ব্যবহার ক'রে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা মাঝে মাঝে নিজেদের কাজ হাঁসিল ক'রে নেবেন হয়তো, কিন্তু খ্রীষ্টের স্বর্গরাজ্য অথবা খ্রীষ্ট-বিরোধী লেনিনের সাম্যরাজ্য দুর্ব্বলের কল্পলোকে অথবা আদর্শবাদীর স্বপ্নলোকেই থেকে যাবে। জীবলোকে তা কোন দিনই মূর্ত্ত হবে না, হবার উপক্রম করবে, কিন্তু হবে না। এ সবই জানেন তিনি। তবু রঙিন-শাড়ি-পরা ছিমছাম এই মেয়েটির—বাইরে থেকে দেখলে মনে হয়, যার কোন দুঃখই নেই, অথচ অন্তরে যার এত গ্লানি—এর স্বরূপ জানতে পেরে এবং নিজের সচ্ছলতার সঙ্গে তার তুলনা ক'রে তাঁর ভদ্র-অন্তঃকরণ একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল।

নবকুমার একটু অধীর হয়ে উঠেছিল। সোম-শুভ্র অথবা ইলা কাউকেই

তাক লাগাতে না পেরে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিল। অবশেষে সে উঠে পড়ল।

কিছু যদি মনে না করেন, আমি উঠি এখন।

খাবে না এখানে?

পরমানন্দ খেতে বলেছিল, কিন্তু হঠাৎ এখন মনে পড়ল, সার্ নীলরতনের সঙ্গে একটা এন্‌গেজ্‌মেণ্ট আছে আমার—থাকতে পারব না।

আচ্ছা।

নবকুমার রাস্তায় বেরিয়ে মোড়ের পানের দোকানে একটা পাসিং-শো সিগারেট কিনে দেশলাইয়ের ওপর সেটা লঘুভাবে ঠুকতে ঠুকতে আগের মতই অস্বস্তি ভোগ করতে লাগল। ওখান থেকে উঠে এসে বা মিছে ক'রে সার্ নীলরতনের নাম ক'রে অস্বস্তির কিছুই উপশম হ'ল না। নবকুমার চ'লে যাবার পর ইলা সোম-শুভ্রের দিকে চেয়ে ঈষৎ হেসে বললে, আমি কিন্তু অত সহজে নিস্তার দিচ্ছি না আপনাকে। আমি আপনার সঙ্গে ঝগড়া করব।

আমি বুড়ো মানুষ, তোমার সঙ্গে পারব কি?

দ্বারপ্রান্তে অনামিকাকে দেখা গেল। সমস্ত মুখ থমথম করছে তার।

স্টোভ জেলেছি, আসুন। ইলা তুমিও এস, খাবার দেওয়া হচ্ছে। নবকুমারবাবু কোথা গেলেন?

তাঁর একটা এন্‌গেজ্‌মেণ্ট ছিল, চ'লে গেছেন তিনি।

সকলে উঠে ভেতরের ঘরে গেলেন।

গ

সোম-শুভ্র নিবিষ্ট চিত্তে ব'সে হিসেব লিখছিলেন। প্রত্যহ নিখুঁতভাবে পাই-পয়সার হিসেব মিলিয়ে তবে তিনি শুতে যান। বহুকাল থেকে এ কাজ ক'রে আসছেন। আধ পয়সার হিসেব গোলমাল হয়ে গেলে রাত্রে ঘুম হয় না—আধ পয়সার জন্যে নয়, হিসেব গোলমালের জন্যে। কোন হিসেবের একচুল গোলমাল অসহ্য তাঁর পক্ষে। সারাজীবন তিনি এমন নিখুঁতভাবে হিসেব রেখেছেন যে, যে কোন মুহূর্ত্তে ব'লে দিতে পারেন জীবনে কত কুলি-ভাড়া দিয়েছেন, কত কাপড় কিনেছেন, কত চাল-ডাল কিনেছেন। সমস্ত প্রকার খরচের নির্ভুল হিসেব আছে তাঁর কাছে। শুধু টাকাকড়ির ব্যাপারেই নয়,

সব ব্যাপারেই তিনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নিয়ম-নিবদ্ধ। কোন প্রকার অনিয়ম তাঁর সহ্য হয় না। এমন কি বিছানার চাদর কোথাও যদি সামান্য কুঁচকে থাকে, তা হ'লেও তাঁর অস্বস্তি বোধ হয়। ঘুম আসতে চায় না, সেটা ঠিক ক'রে না নেওয়া পর্য্যন্ত মনের ভেতর খচখচ করতে থাকে। এ রকম লোকের জীবন অশান্তিপূর্ণ হওয়ার কথা। কিন্তু সোম-শুভ্রের জীবন আশ্চর্য্য রকম শান্তিপূর্ণ, কারণ তিনি স্বাবলম্বী, কারও কাছে—এমন কি নিজের চাকরদের কাছেও—জোর গলায় কিছু দাবি করবার আত্মম্ভরিতা তাঁর নেই। বরং তাঁর ভাবভঙ্গী দেখলে মনে হয়, তিনি সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত, যেন নিজের অস্তিত্ব দ্বারাই তিনি অপরের জীবনযাত্রায় বাধা-সৃষ্টি করছেন এবং সকলে তা সহ্য করছে ব'লে সকলের কাছেই তিনি কৃতজ্ঞ।

ইলা এসে প্রবেশ করলে।

আমি আপনার বিছানাটা ঠিক ক'রে দিয়ে যাই।

না না, কিছু দরকার নেই, তুমি বাড়ি যাও। আমি নিজেই ক'রে নিতে পারব। অনু কেমন আছে?

ভাল আছে। সে-ই আসছিল, আমিই মানা করলাম তাকে। একটু চুপ ক'রে শুয়ে থাকুক।

এর আগে কি ওর ফিট হয়েছিল কখনও?

কই, শুনি নি তো।

ইলা সোম-শুভ্রের বিছানা খুলে পাড়তে লাগল। সোম-শুভ্র বাধা দিতে পারলেন না, কোন ব্যাপার নিয়ে বেশি বাদ-প্রতিবাদ করাটাও তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। তিনি হাসি-মুখে হিসেব লিখতে লাগলেন।

মশারির দড়ি নেই বুঝি? নিয়ে আসি।

সব আছে; দাঁড়াও, দিচ্ছি।

সোম-শুভ্র উঠে তোরঙ্গ খুলে (সুটকেস পছন্দ করেন না তিনি) এক গুলি টোয়াইনের শক্ত সুতো, চারটি ছোট পেরেক এবং একটি ছোট হাতুড়ি বার ক'রে ইলাকে দিলেন।

এসব আপনি সঙ্গে রাখেন বুঝি?

সোম-শুভ্র একটু হাসলেন শুধু। ওই তোরঙ্গের মধ্যে কত রকম জিনিস যে তাঁর সংগ্রহ করা আছে, তা দেখলে ইলা অবাক হয়ে যেত। থাম,

পোস্টকার্ড, টিকিট, মনিঅর্ডার ফর্ম, চিঠি লেখার কাগজ, কলম, নিব, আলপিন, কাউণ্টেন পেন, ব্লটিং, সাধারণ পেন্সিল, লাল-নীল পেন্সিল, ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর, দেশলাই, গালা, শিলমোহর, হরিতকী, মাজন—এসব তো আছেই, অনেকেরই থাকে ; কিন্তু এসব ছাড়াও এমন অনেক জিনিস আছে, যা অনেকের থাকে না। কয়েকটা ছোট ছোট কৌটোতে আধলা, পয়সা, আনি, দুআনি, সিকি, আধুলি, টাকা, এমন কি কয়েকটা গিনিও আলাদা আলাদা করা আছে। কয়েকটা শক্ত খামে আছে নানা মূল্যের নোট। এসব ছাড়া ছোট একটা পুঁটুলিতে নানা রকমের কাপড়ের টুকরো, নানা রঙের সুতোর গুলি, সরু মোটা, ছুঁচ, নানা ধরনের ছোট বড় বোতাম সংগ্রহ করা আছে। যখনই যে কাপড়ের জামা অথবা মশারি করান, তখনই তার খানিকটা ছাঁট সংগ্রহ ক'রে রেখে দেন, ভবিষ্যতে যদি তালি দিতে হয়—এই ভেবে। পড়বার সময় চশমা লাগে, দু জোড়া করিয়ে রেখে দিয়েছেন—এক জোড়া হঠাৎ হাত থেকে প'ড়ে ভেঙে গেলে অসুবিধেয় যেন পড়তে না হয় অথবা অপরকে যেন অসুবিধেয় ফেলতে না হয়। অভিজ্ঞতা থেকে সোম-শুভ্র এটা বুঝেছেন যে, অ-গোছালো হ'লে, নিজের তো অসুবিধে হয়ই, আশপাশে যারা থাকে তারাও অস্বস্তি ভোগ করে। ঠিক সময়ে ঠিক জিনিসটি না পেলে জীবনযাত্রার ছন্দে তাল কেটে গিয়ে সব গোলমাল হয়ে যায় যেন।

না না, ও ঠিক হচ্ছে না, ঠিক সমান ক'রে মেপে নাও, যেখানে সেখানে পেরেক ঠুকলে ঠিক হবে না। মশারির চারটি খুঁট ঠিক সমান হওয়া চাই তো।

আপনি কি লিখছেন লিখুন না, আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। সোম-শুভ্র আর বাধা দিলেন না, লিখতে লাগলেন, কিন্তু মনে মনে বুঝলেন, ঠিক হচ্ছে না, ও চ'লে যাবার পর ঠিক ক'রে নিলেই হবে। যথাসাধ্য ভাল ক'রেই ইলা মশারি টাঙানো বিছানা-পাতা শেষ ক'রে বললে, দেখুন।

চমৎকার হয়েছে।

যাবার আগে ইলা লীলাভরে হেসে বললে, আপনার যে এত কাজ ক'রে দিচ্ছি, আমার একটু স্বার্থ আছে।

কি ?

আমি যে স্কুলে পড়াই ; সেখানে আমাকে মাইনে দেয় না। ভবিষ্যতে

মাইনে পাব—এই আশায় ঢুকেছিলাম। স্কুলের যিনি সেক্রেটারি, তিনি এখন বলছেন, বি. টি.-পাস লোক নেওয়া হবে। আমি যদি এক বছরের মধ্যে বি. টি. পাস করতে পারি, তা হ'লে তাঁরা আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন, না পারলে অন্য লোক নেবেন। স্কুলের সেক্রেটারি অনাদি সেন আপনাকে খুব খাতির করেন, আপনি যদি একটু রেকমেণ্ড ক'রে দেন আমাকে—

কি রেকমেণ্ড করব ?

আমাকে যেন চাকরি করতে করতে বি. টি. পাসের সুযোগ দেওয়া হয়। ওঁরা ইচ্ছে করলে তিন বছর পর্য্যন্ত সময় দিতে পারেন। আমি তা হ'লে টাকা কিছু জমিয়ে নিতে পারি, বি. টি. পড়ার অনেক খরচ তো।

কত খরচ ?

তা মাসে প্রায় পঞ্চাশ টাকা। এক বছরে ছ-সাতশো টাকা লাগবে। আপনি একটা চিঠি লিখে দিলেই কিন্তু হয়ে যায়।

তাদের স্কুলের বিষয় তো আমি কিছুই জানি না। তারপর একটু হেসে বললেন, তোমার বিষয়েই বা এমন কি জানি! চিঠি দেওয়াটা কি ঠিক হবে ?

বেশ, তবে দেবেন না।

প্রণাম ক'রে বেরিয়ে গেল ইলা। সোম-শুভ্র লক্ষ্য করলেন, তার হাসি-হাসি মুখখানি কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেছে। খুব খারাপ লাগতে লাগল তাঁর। কিন্তু কি করবেন তিনি, এমন ভাবে চিঠি দেওয়াটা কি উচিত হ'ত ? উচিত-অনুচিতের দ্বন্দ্ব মেটাতেই সারাজীবনটা কেটে গেল! কি যে কর্ত্তব্য, তা ঠিক করা এত কঠিন! ইলার মুখখানা বারম্বার ভেসে বেড়াতে লাগল মনের ওপর। একখানা হাজার টাকার চেক লিখে দিলেই বোধ হয় ওর সমস্যার সমাধান হয়, কিন্তু এমনভাবে মহত্ত্ব আস্ফালন ক'রে অপরিচিত একজন মেয়েকে একটা চেক ছুঁড়ে দেওয়ার মধ্যে যে ইতরামি আছে, তার মধ্যে যেতে তাঁর প্রবৃত্তি হ'ল না। তারপর হঠাৎ আর একটা কথাও মনে হ'ল। যে শিব-শুভ্রের টাকা তিনি পেয়েছেন, তাঁর আত্মা যাতে তৃপ্ত হবে, টাকাটা কি সেই ভাবেই খরচ করা উচিত নয় ? শশাঙ্ক-শুভ্রের কথা মনে হ'ল। কে জানে, তার ব্যবসা কেমন চলছে আজকাল! বহুদিন তার কোন খবর পান নি। গায়ে প'ড়ে খবর নিতে কেমন যেন সঙ্কোচ হয়। সে-ও বোধ হয় সঙ্কোচভরেই তাঁর

আসতে পারে না। নিতান্ত প্রয়োজনবশেই সেবার আসতে হয়েছিল ব'লে মনে মনে লজ্জিত হয়ে আছে বোধ হয়। শশাঙ্কের ছেলে শঙ্খ, তারও আবার ছেলে হয়েছে! শিশু শশাঙ্ক-শুভ্রের মুখটা মনের ওপর স্পষ্ট ফুটে উঠল। চুপ ক'রে ব'সে রইলেন তিনি।

ক্রমশ

"বনফুল"

গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টর

(ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলো। বনমালা, রমলা ও কমলা প্রথম অঙ্কের মত জানালায় দণ্ডায়মান)

বনমালা। সেই থেকে আমরা জানলায় দাঁড়িয়ে আছি। নাঃ, কারও দেখা নেই। এত ভোগান্তি তোমার জন্যেই বাপু! মাগো, আমার পিনটা গুঁজে নিই; মাগো, আমার পাউডার লাগানো হয় নি! কেন যে ওসব কথা শুনতে গেলাম! পথে কি একটা জনপ্রাণীও আছে! শহরের সব লোক যেন মরেছে।

কমলা। মা ব্যস্ত হ'য়ো না। এখনই সব জানতে পারা যাবে। মিছরি অনেকক্ষণ হ'ল গিয়েছে, এখনই ফিরবে। [জানালায় উঁকি মারিয়া] মা, দেখ দেখ, কে যেন আসছে! ওই যে, পথের মোড়ে।

বনমালা। কই? সেই থেকে কেবলই আসছে আসছে বলছ! তোমার মাথা আর মুণ্ডু! হ্যাঁ, একজন লোক বটে! কে লোকটা? বেঁটে!...ভদ্র-লোকের মতই পোশাক। লোকটা কে হতে পারে? কি মুশকিল!

কমলা। আমার মনে হয় বলরামবাবু।

বনমালা। বলরামবাবু! কখনই বলরামবাবু নয়। [রুমাল নাড়িয়া] এদিকে এদিকে—তাড়াতাড়ি।

কমলা। ও বলরামবাবু ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না।

বনমালা। আবার তর্ক! আমি বলছি, কখনই বলরামবাবু নয়।

কমলা। দেখ মা, তখনই বলেছিলাম বলরামবাবু। এখন তো বুঝতে পারছ?

বনমালা। বলরামবাবুই তো বটে। তোমার বাপু মিছিমিছি তর্ক করা। আমি যেন বুঝতে পারি নি—এমনই তোমার ধারণা। [চীৎকার করিয়া] তাড়াতাড়ি আসুন। এত ধীরে হাঁটেন আপনি! ওঁরা সব কোথায়? বাড়িতে ঢোকা অবধি অপেক্ষা করবেন না। কি রকম লোক? খুব কড়া? আর ওঁর খবর কি? কি বিপদ! বাড়িতে না ঢোকা অবধি একটি কথাও বলবেন না?

(বলরামবাবুর প্রবেশ)

আচ্ছা, আপনার কি লজ্জা করছে না? এমন ক'রে একজন অবলাকে কষ্ট দিচ্ছেন? আপনার ওপরেই আমি আশা-ভরসা ক'রে ব'সে আছি। সেই যে গেলেন, আর দেখাটি নেই! সকলেই চুপচাপ! এতেও কি লজ্জা করছে না? আমি আপনার সিদু-বিশুর ধর্ম্ম-মা—আর আপনার শেষে এই ব্যবহার!

বলরামবাবু। আমার কথা বিশ্বাস করুন, আপনাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করি ব'লেই ছুটতে ছুটতে আসছি। ওঃ, ঘাম ঝরছে দেখেছেন! কমলা যে, কেমন আছ?

কমলা। আপনি ভাল বলরামবাবু?

বনমালা। ব্যাপার কি এবার খুলে বলুন।

বলরামবাবু। রায় বাহাদুর আপনাকে একখানা চিঠি পাঠিয়েছেন?

বনমালা। লোকটা কি? জেনারেল, না—

বলরামবাবু। না, ঠিক জেনারেল নয়, কিন্তু কোন জেনারেলের চেয়ে কম নয় —যেমন কালচার, তেমনই ব্যবহার!

বনমালা। তা হ'লে এঁরই বিষয়ে উনি চিঠি পেয়েছিলেন।

বলরামবাবু। সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। ঘনরামবাবু আর আমি—আমরা দু'জনেই প্রথমে তাঁকে আবিষ্কার করি।

বনমালা। ভাল ক'রে সব খুলে বলুন।

বলরামবাবু। ভগবানের কৃপায় এখন সব ভালই চলছে। প্রথমে রায় বাহাদুরকে···হ্যাঁ প্রথমে রায় বাহাদুর বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। ইন্সপেক্টর সাহেব খুব রেগে ছিলেন, তিনি বললেন যে, হোটেলের ব্যবস্থা

খারাপ, শহরের অবস্থা ততোধিক খারাপ। তিনি কিছুতেই ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোতে আসবেন না, আর তাঁর জন্যে জেলে যেতেও পারবেন না। কিন্তু যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, রায় বাহাদুরের দোষ নেই, তখন ভাল ক'রে কথাবার্ত্তা বলতে শুরু করলেন, তার পর থেকে ভালই চলছে। ওঁরা সব দাতব্য-বিভাগ পরিদর্শন করতে গিয়েছেন। রায় বাহাদুরের ধারণা হয়েছিল যে, তাঁর বিরুদ্ধে নিশ্চয় কোন রিপোর্ট গিয়েছে—আমিও যে একেবারে ভয় পাই নি, তা নয়।

বনমালা। কিন্তু আপনার ভয়টা কিসের? আপনি তো সরকারী চাকরে নন।

বলরামবাবু। সে আপনি কি ক'রে বুঝবেন? একজন বড়লোকের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে, বিশেষ যখন তিনি কথা বলতে শুরু করেন—তখন ভয় না পেয়ে উপায় নেই।

বনমালা। ওসব বাজে কথা যাক। এখন বলুন, তাঁকে দেখতে কেমন? বুড়ো, না ছোকরা?

বলরামবাবু। ছোকরা, একেবারে ছোকরা। তেইশের বেশি কিছুতেই হতে পারে না। কিন্তু কথা বলেন বুড়োর মতন। আমরা বলি—ওখানে যাবই। কিন্তু নাঃ, ও রকম ক'রে তিনি বললেন না, তিনি বললেন—হ্যাঁ, ওখানে বোধ করি যেতেই হবে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাব। দেখুন, কথার ভাঁজে ভাঁজে কি রকম বুদ্ধি আর কালচারের গন্ধ! তারপরে বললেন, আমার একটু লেখা-পড়ার বাতিক আছে, কিন্তু ঘরে হোটেল-ওয়ালা বাতি দেওয়া বন্ধ করেছে। বাতি আর বাতিক! দেখুন, কি কাল্‌চার! শুনে আমি আর রায় বাহাদুর পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি।

বনমালা। রঙ কি রকম? ফর্সা না, কালো?

বলরামবাবু। ফর্সাও নয়, কালোও নয়—বাদামী। আর চোখ দুটো যেন কাঠবিড়ালির কাছে থেকে ধার ক'রে নেওয়া, সর্ব্বদাই নড়ছে। ওঃ, সে চোখের দিকে তাকালে বুকের ভেতরে চাকরির ইতিহাসের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে!

বনমালা। গোঁফ আছে?

বলরামবাবু। বনমালা দেবী, একজন বড়লোকের, যাকে গ্রেট ম্যান বলে, তার মুখের দিকে তাকালে গোঁফের মত তুচ্ছ জিনিস চোখেই পড়ে না।

নমালা। গোঁফ হ'ল তুচ্ছ! আরও কত কি শুনতে হবে! দেখি এবার, চিঠিতে কি আছে। (পাঠ) প্রথমে আমার অবস্থা অত্যন্ত শঙ্কাজনক হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু শেষে ভগবানের কৃপায় কচুভাজা, পুঁইচচ্চড়ি আর আড়াই টাকা হিসাবে দুই বোতল বিয়ার—(থামিয়া) নাঃ, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। ভগবানের কৃপার সঙ্গে কচুভাজা পুঁই-চচ্চড়ির সম্বন্ধ কি?

বলরামবাবু। রায় বাহাদুর তাড়াতাড়িতে হোটেলের বিলের ওপরে লিখেছেন।

বনমালা। ওঃ, তাই বলুন। (পাঠ) কিন্তু আমি চিরদিন ভগবানে বিশ্বাসী, তাই সমস্তই এখন আমাদের অনুকূলে আসিয়াছে। শীঘ্র দোতলার দক্ষিণ-দুয়ারী ঘরটা পরিষ্কার করাইয়া ফেলিবে। গ্রেট ম্যান দয়া করিয়া আমাদের বাড়িতেই···পাঁউরুটি, মাখন, ডিমের মামলেট, মোট ছ আনা।

বলরাম। ওটুকু বিলের, ও কিছু নয়।

বনমালা। সে কি আর আমি বুঝতে পারি নি! (পাঠ) পদধূলি দিবেন। দুপুরবেলা আমরা দাতব্য-বিভাগে আহার করিব। কাজেই কোন বন্দোবস্ত করিতে হইবে না। কিন্তু মদের ব্যবস্থা রাখিবে। আবদুল্লার দোকানে এখনই লোক পাঠাইবে। সে যদি ভাল মাল না পাঠায়, তবে হতভাগাকে দেখিয়া লইব। ইতি তোমারই একান্ত আলুর দম এক প্লেট। আলুর দম—এ কি রকম ঠাট্টা!

বলরামবাবু। ওটা হোটেলের বিলের অংশ।

বনমালা। আপনি ভাবছেন, আমি বুঝতে পারি নি! এই যে পরেই আছে—একান্ত অনুগত স্বামী। কি সর্বনাশ! আর তো সময় নেই। এসে পড়ল ব'লে। মিছরি! মিছরি! সে ছুঁড়ীর কি আর দেখা পাওয়া যাবে – পাড়ার ছোঁড়াগুলোর পেছনে···ঝগড়ু! ঝগড়ু!

(ঝগড়ুর প্রবেশ)

এখনই আবদুল্লার দোকানে যাও, দাঁড়াও, আমি চিঠি দিচ্ছি তাই নিয়ে যেতে হবে। (টেবিলে বসিয়া লিখিতে লিখিতে বলিতে লাগিল) কোচম্যানকে বল, এই চিঠিখানা নিয়ে আবদুল্লার দোকানে যেন যায়—

আর ক বোতল মদ নিয়ে আসে। আর তুমি গিয়ে দোতলার ঘরটি পরিষ্কার ক'রে টেবিল চৌকি দিয়ে সাজিয়ে ফেলো গিয়ে—শিগগির

বলরামবাবু। আমি তা হ'লে যাই। দাতব্য-বিভাগের পরিদর্শন কি রকম হচ্ছে, দেখি গিয়ে।

বনমালা। আপনাকে আমি ধ'রে রাখতে চাই না, আপনি শিগগির যান।

বলরামের প্রস্থান

কমলা মা, এবার আমাদের কঠিন পরীক্ষা। মেয়েদের পোশাক-নির্বাচনের চেয়ে কঠিন কাজ আর কিছু আছে? এমনটি পরতে হবে, যাতে দশজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলেও সকলের আগে তোমার দিকে নজর পড়ে। বিশেষ ইনি আসছেন কলকাতা থেকে, ওঁদের রুচিই অন্য রকম। লক্ষ্য রাখতে হবে, পাড়াগেঁয়ে ব'লে নিন্দে না হয়।

কমলা। আমি বলি কি মা, তুমি সেদিনের মত কানন-শাড়িখানা পর। তোমাকে সেদিন পেছন থেকে ঠিক কানন দেবীর মত দেখাচ্ছিল।

বনমালা। আমি তো ভাবছি, বেনারসীখানা পরব।

কমলা। না মা, সত্যি বলতে কি, বেনারসীতে তোমাকে মানায় না।

বনমালা। কেন?

কমলা। আরও রঙ ফর্সা দরকার।

বনমালা। আমার রঙ ফর্সা না হ'লে এ পাড়ায় আর কার রঙ ফর্সা শুনি?

কমলা। বাড়ির বাইরে যেতে হবে না। রমলাদি তোমার চেয়ে অনেক ফর্সা।

বনমালা। বটে! বটে! সেই মা-মরা জলার পেত্নী? তবু যদি না হ'ত টব-চাপা-পড়া ঘাসের মত গায়ের রঙ। কই, সে ছুঁড়ী কই?

কমলা। রমলাদি, এদিকে এস।

(রমলার প্রবেশ)

রমলা। কেন মা?

বনমালা। (রমলার গায়ে খদ্দরের শাড়ি দেখিয়া) আবার খদ্দর পরা হয়েছে?

রমলা। কেন মা, এ তো বেশ ভাল জিনিস।

বনমালা। সেদিন পোস্ট-মাস্টার বলেছিল, খদ্দরে তোমাকে বেশ

সেই থেকে আর খদ্দর ছাড়তে চাও না। তুমি ভাবছ, ও তোমাকে বিয়ে করবে! ও যে আড়ালে তোমাকে মুখ ভেংচায়। তবু হ'ত যদি কমলা—

কমলা। কেন মা, দিদিকে খদ্দরে তো বেশ দেখায়!

মনমালা। হ্যাঁ, বেশ দেখালেই হ'ল! ওতে যে তোমার বাবার চাকরি যেতে পারে। (এমন সময়ে সিঁড়িতে পদশব্দ হইল) ওই বুঝি ওঁরা সব আসছেন। চল, সাজগোজ ক'রে নিই।

কমলা। কিন্তু মা, আর যাই কর, বেনারসীখানা প'রো না।

মনমালা। ফের তর্ক!

তিনজনের প্রস্থান

(মুকুন্দর একটি বাক্স কাঁধে লইয়া প্রবেশ। অন্য দিক দিয়া মিছরির প্রবেশ)

মুকুন্দ। কোন্ দিকে?

মিছরি। এই দিকে এস।

মুকুন্দ। একটু জিরিয়ে নিই। খালি পেটে বোঝা দ্বিগুণ ভারী মনে হয়।

মিছরি। জেনারেল সাহেব কখন আসবেন?

মুকুন্দ। কোন্ জেনারেল?

মিছরি। কেন, তোমার মনিব।

মুকুন্দ। একেবারে চার পুরুষের জেনারেল।

মিছরি। মাগো! আমরা শুধু এক পুরুষের ভেবেছিলাম।

মুকুন্দ। দেখ, আমাকে কিছু খেতে দিতে পার?

মিছরি। তোমাদের খাবার তো এখনও তৈরি হয় নি।

মুকুন্দ। না হয় তোমাদের খাবারই কিছু নিয়ে এস।

মিছরি। তবে তুমি এদিকে এস।

মুকুন্দ। চল। তোমার নামটি কি?

মিছরি। মিছরি।

মুকুন্দ। মিছরির মতই মিষ্টি।

মিছরি। হাত দিতে গেলে দেখতে পাবে, মিছরির মত ধারও আছে।

মুকুন্দ। বাঃ, বেশ বলেছ! (গুনগুন করিয়া গান)

মেরেছিস মিছরির দানা
তাই বলে কি প্রেম দেব না!

মিছরি। চল ওই ঘরে—ওঁরা সব আসছেন।

দুইজনের প্রস্থান

(একজন কন্‌স্টেব্‌ল সসম্ভ্রমে দরজা খুলিয়া ধরিল। অনঙ্গমোহনকে অনুসরণ করি ম্যাজিস্ট্রেট, দাতব্য-কর্ত্তা, হেডমাষ্টার, ঘনরাম ও বলরাম প্রবেশ করিল। ঘনরামে নাকে একটা পটি। ম্যাজিস্ট্রেট মেঝের উপরে এক টুকরা কাগজ দেখাইয়া দিতেই- কয়েকজন পুলিস দৌড়িয়া গিয়া তাহা কুড়াইয়া লইল)

অনঙ্গমোহন। চমৎকার দাতব্য-প্রতিষ্ঠান। আপনারা যে ভাবে শহরে সব প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করালেন, তা বাস্তবিক চমৎকার। অন্যান্য শহর আমাকে কেউ কিছু দেখায় নি।

ম্যাজিস্ট্রেট। সত্য কথা বলতে কি, অন্যান্য শহরের ম্যাজিস্ট্রেট ও অফিসার কেবল নিজেদের স্বার্থই চিন্তা ক'রে থাকে। কিন্তু এখানে আমরা কর্ত্তব পালন দ্বারা উচ্চতর অফিসারদের সন্তুষ্টি-বিধান ছাড়া আর কিছু কখন ভাবি না।

অনঙ্গমোহন। দাতব্য-বিভাগের আহারটিও খুব উপাদেয় হয়েছিল। উ খুব বেশি খাওয়া হয়ে গিয়েছে! আপনারা কি প্রত্যেক দিন এমন খান নাকি?

ম্যাজিস্ট্রেট। আপনার মত সম্মানিত অতিথির জন্যেই আজ বিশেষ আয়োজ হয়েছিল।

অনঙ্গমোহন। সুখাদ্য আমার অত্যন্ত প্রিয়। জীবন তো এইজন্যেই—জীব মালঞ্চ থেকে সুখের পুষ্প চয়নের জন্যেই। মাছটার কি নাম?

দাতব্য-কর্ত্তা। (ছুটিয়া আসিয়া) বাঁশপাতা মাছ, সার্।

অনঙ্গমোহন। চমৎকার! কোন্ প্রতিষ্ঠান আমরা দেখে এলাম? হাসপাতা না?

দাতব্য-কর্ত্তা। আজ্ঞে হ্যাঁ। শহরের দাতব্য-প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটা।

অনঙ্গমোহন। তাই বটে। চারদিকে বিছানা দেখলাম। সব যেন ছিল—রুগী অবশ্যই সব সেরে উঠেছে। বেশি লোক তো দেখি নি।

দাতব্য-কর্ত্তা। হ্যাঁ, জন বারো মাত্র এখন আছে। বাকি সব সেরে গিয়েছে। এর মূলে আছে আমাদের ব্যবস্থা এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠা। আ এখানে আসবার পরে থেকে এই রকমই চলছে—রুগী ভর্ত্তি হবা

বাস্‌—সেরে ওঠে। অবশ্য ওষুধের গুণ আছে—কিন্তু কর্ত্তব্যজ্ঞান ছাড়া ওষুধ কি করতে পারে?

ম্যাজিস্ট্রেট। আর সাব্‌, ম্যাজিস্ট্রেটের কর্ত্তব্যের মত এমন দায়িত্ব আর নেই। কি বলব, এত কাজ! শহরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কথাই ধরুন না কেন—অন্য লোক হ'লে পাগল হয়ে যেত, কিন্তু ভগবানের কৃপায় এখানে সব ঠিক চলছে। অন্য সবাই যখন নিজের স্বার্থ চিন্তা করছে, আমি রাত্রে বিছানাতে শুয়েও কেবলই ভাবতে থাকি—ভগবান, আমি যেন দায়িত্ব-পালন দ্বারা উচ্চতর অফিসারদের সন্তুষ্টি সাধন করতে সক্ষম হই। তাঁরা যদি পুরস্কার দেন ভাল—না দেন, তবু আমি মনে শান্তি পাব। শহরটি যদি পরিষ্কার থাকে, কয়েদীরা যদি যথানির্দ্দিষ্ট বরাদ্দমত খাদ্য পায়, শহরে যদি গণ্ডগোল না হয়—তার চেয়ে আর কি বেশি প্রার্থনা করতে পারি? আমি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি, সম্মানের প্রত্যাশী আমি নই। অবশ্য সম্মান লোভনীয়, কিন্তু কর্ত্তব্যের তুলনায় তা ধূলিমুষ্টি।

দাতব্য-কর্ত্তা। (স্বগত) ওঃ, লোকটা কি ভণ্ড! এ গুণ ভগবদ্দত্ত!

অনঙ্গমোহন। ঠিক বলেছেন। আমিও মাঝে মাঝে ওই রকম চিন্তা ক'রে থাকি। অধিকাংশ সময়েই সাদা গদ্যে—কিন্তু কখনও কখনও কবিতাও এসে যায়।

বলরাম। (ঘনরামকে) চমৎকার বলেছেন। ঘনরাম, দেখ, ওঁর কথা শুনলেই বুঝতে পারা যায়, খুব পড়াশুনো আছে।

অনঙ্গমোহন। আচ্ছা, আপনাদের এখানে কি সময় কাটাবার মত কোন আড্ডা নেই—যেমন ধরুন একটা ক্লাব, যেখানে তাস খেলা যেতে পারে?

ম্যাজিস্ট্রেট। (স্বগত) বুঝেছি চাঁদ, তুমি কি খবর জানতে চাও! (প্রকাশ্যে) সর্ব্বনাশ! ওরকম ক্লাব থাকা তো দূরের কথা, কেউ এখানে কানেও শোনে নি। জীবনে আমি কখনও তাস খেলি নি—কি ক'রে যে লোকে তাস খেলে, তা আজও জানতে পারলাম না। সত্যি কথা বলতে কি, চিড়িতনের সাহেব দেখলেই আমার মাথা ঘুরে ওঠে। একদিন ছেলেদের সঙ্গে ব'সে একটা তাসের ঘর তৈরি করেছিলাম, সেদিন সারারাত ঘুম হ'ল না—নানা রকম দুঃস্বপ্ন দেখলাম। কি ক'রে যে লোকে জীবনের অমূল্য সময় তাস খেলে কাটায়— ভগবান!

হেডমাস্টার। (স্বগত) কাল রাত্রেই আমার কাছে থেকে একশো টাকা জিতেছে। রাস্কেল!

ম্যাজিস্ট্রেট। দেশের মঙ্গলের জন্যেই আমার জীবন উৎসর্গীকৃত।

অনঙ্গমোহন। এ আপনার বাড়াবাড়ি। কি উদ্দেশ্য নিয়ে আপনি তাস খেলেন, তার ওপরেই সব নির্ভর করে। আপনারা মফস্বলের লোক জানেন না, কিন্তু আমরা কলকাতায় জানি, দেশের মঙ্গলের জন্যেও তাস খেলা যেতে পারে।—ধরুন, মনটা খারাপ আছে, কর্ত্তব্যে মন লাগছে না—একবাজি তাস খেলে নিলাম, মনটা ভাল হ'ল, কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন হ'ল—এতে কি দেশের মঙ্গল করাই হ'ল না? না না, আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না—মাঝে মাঝে এক-আধ বাজি ভালই লাগে।

(বনমালা ও কমলার প্রবেশ)

ম্যাজিস্ট্রেট। পরিচয় করিয়ে দিই—ইনি আমার স্ত্রী; আর আমার মেয়ে কমলা।

অনঙ্গমোহন। (মাথা নীচু করিয়া) আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছি।

বনমালা। আপনার মত সম্মানিত অতিথি লাভ ক'রে আমাদের আনন্দ আরও বেশি।

অনঙ্গমোহন। কি বলছেন আপনি! আমার আনন্দ আপনাদের চেয়েও বেশি।

বনমালা। সে কি ক'রে সম্ভব? অবশ্যই আপনি ভদ্রতা ক'রে এসব কথা বলছেন। দয়া ক'রে বসুন।

অনঙ্গমোহন। আপনার পাশে দাঁড়িয়ে থাকবার আনন্দই কি কম? তবে যদি ইচ্ছা করেন, বসতেও পারি। এতক্ষণে আমি সত্যিই সুখী—আপনার পাশে উপবেশন ক'রে।

বনমালা। এ কেবল আপনি ভদ্রতা ক'রেই বলছেন। কলকাতা থেকে যাত্রা ক'রে অবধি নিশ্চয় অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে।

অনঙ্গমোহন। অসুবিধা ব'লে অসুবিধা। কলকাতা ছেড়ে মফস্বলে বেরুনো যেন স্বর্গ ত্যাগ ক'রে মর্ত্ত্যে অবতরণ। নোংরা হোটেল, ছারপোকাওয়ালা

পদি, লোকের অজ্ঞতা! কিন্তু এখানে এসে সমস্ত কষ্ট ভুলে গেলাম।
(বনমা[illegible] র দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত)

বনমালা। নিশ্চয় এখানেও আপনার অনেক কষ্ট হচ্ছে।

অনঙ্গমোহন। বিশ্বাস করুন, এই মুহূর্ত্তে আমি সুখের চূড়ায় অবস্থান করছি।

বনমালা। সে কি ক'রে সম্ভব? এ সম্মান আমার আশাতীত।

অনঙ্গমোহন। আশাতীত! বলুন, যোগ্যতার চেয়ে অনেক কম।

বনমালা। আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—

অনঙ্গমোহন। কিন্তু পাড়াগাঁয়ের কি সৌন্দর্য্য নেই? পাড়াগাঁয়ের বিল খাল নদী? ধান বাঁশ বেত? অবশ্য কলকাতার সঙ্গে কোন তুলনাই চলে না। কলকাতাই তো জীবন, না জীবন-দুধের চাঁছি। বোধ করি আপনারা ভাবছেন, আমি সামান্য একজন কেরানী। ভুল করছেন। আমার আফিসের বড় সাহেব আমার পিঠ চাপড়ে বলে—চল না হে, ফিরপোতে ডিনার খেয়ে আসা যাক। আমি আফিসে কেবল দু-চার মিনিটের জন্যে একবার ঘুরে আসি—তারপরে বেচারা কেরানীর দল সারাদিন ধ'রে কলম পিষে পিষে মরে। আফিসে যখন আমি ঢুকি…তিন-চারজন জুতো-বুরুশ আমার পেছনে পেছনে ছুটতে থাকে…হুজুর বুরুশ, হুজুর বুরুশ…আমি তাদের তাড়াবার জন্যে এমনই ভাবে পা ছুঁড়ি…[পা ছুঁড়িল] ওঃ, আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন, বসুন।

ম্যাজিস্ট্রেট, দাতব্য-কর্ত্তা, হেডমাস্টার। [সমস্বরে] পদমর্য্যাদার বিচারে আমরা বসতে পারি নে, আমরা দাঁড়িয়েই থাকব। আমাদের জন্যে আপনি ভাববেন না।

অনঙ্গমোহন। পদমর্য্যাদা চুলোয় যাক। বসুন, আমি অনুরোধ করছি, বসুন। [সকলে বসিল] পদমর্য্যাদানুসারে চলাফেরা আমি পছন্দ করি নে। বরঞ্চ লোকে যাতে আমার পদমর্য্যাদা বুঝতে না পারে, তার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করি। কিন্তু বিপদ কি জানেন—কিছুতেই আমি লোকের চোখ এড়াতে পারি নে। অসম্ভব! পথে বেরুলেই লোকে বলতে আরম্ভ করে—ওই যাচ্ছে মিঃ এ. এম. রায়। মহা মুশকিল! একবার তো লোকে আমাকে স্বয়ং কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ ব'লে মনে করলে। দেখতে দেখতে পথের দুধারে সিপাহীর দল জুটে গেল। সে কি স্যালুট করবার ধুম! সিপাহী-দলের

কর্নেল—সে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আমার পিঠ চাপড়ে বললে, জান হে, তোমাকে প্রথমে সবাই আমরা কম্যাণ্ডার ব'লে মনে করেছিলাম।

বনমালা। না শুনলে এ ঘটনা কখনও বিশ্বাস করতাম না।

অনঙ্গমোহন। থিয়েটারের সুন্দরী সব অভিনেত্রীদের সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। বোধ করি আপনারা খোঁজ রাখেন যে, থিটোরের জন্যে দু-চারখানা নাটক লিখেছি। সাহিত্যিকদের সঙ্গেও আমার বন্ধুত্ব আছে—বুদ্ধদেব সজনীকান্ত তারাশঙ্কর—এরা তো আমার chums, মানে···একদিন এস্‌প্ল্যানেডের মোড়ে তারাশঙ্করের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। পিঠ চাপড়ে বললাম, কি রকম আছ হে? সে চমকে উঠে বললে—কে, অনঙ্গমোহন বটে! কথায় আজও বীরভূমী টান গেল না। অদ্ভুত লোক ওই তারাশঙ্কর!

বনমালা। তা হ'লে আপনি লিখেও থাকেন? আহা, সাহিত্যিক হওয়া, সে কি দুর্লভ সৌভাগ্য! নিশ্চয় কাগজে আপনার লেখা বের হয়।

অনঙ্গমোহন। কাগজে লেখা পাঠাই বইকি। অনেকগুলো বই লিখে ফেলেছি। কপালকুণ্ডলা, কৃষ্ণকুমারী, গীতাঞ্জলি, গৃহদাহ। সবগুলোর নাম আবার এখন মনে পড়ছে না। আমার নতুন নাটক মানময়ী গার্লস স্কুল নিশ্চয় দেখেছেন? সেখানার রচনার ইতিহাস অদ্ভুত। ক্লাবে থিয়েটারের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা। সে বললে, ভাই, চটপট কিছু লিখে দাও না—থিয়েটার তো আর চলে না। তখনই বললাম, বেশ, দাও কাগজ। কিন্তু ক্লাবে কাগজ কোথায়? শেষে মদের বিল জোড়া দিয়ে দিয়ে এক রাত্রের মধ্যে লিখে ফেললাম মানময়ী গার্লস স্কুল। শরৎ চাটুজ্জের ছদ্মনামে যত লেখা বেরিয়েছে, সব আমার।

বনমালা। আপনারই ছদ্মনাম তা হ'লে শরৎ চাটুজ্জে।

অনঙ্গমোহন। সব সাহিত্যিকের লেখা আমি সংশোধন ক'রে দিয়ে থাকি। প্র. না. বি.-র লেখা সংশোধন করবার জন্যে আমি মাসে দু হাজার ক'রে পেয়ে থাকি।

বনমালা। পথের পাঁচালী নিশ্চয় আপনার লেখা?

অনঙ্গমোহন। নিশ্চয়, নিশ্চয়। ওখানা তো দু সপ্তাহে লিখে ফেলা।

কমলা। মা, বইয়ের মলাটে তো বিভূতি বাঁড়ুজ্জের নাম—

বনমালা। কমলা, কিছুতেই তোমার তর্ক করার স্বভাব গেল না!

অনঙ্গমোহন। উনি যা বললেন, তা সত্যি। ওখানা বিভূতি বাঁড়ুজ্জের বটে। কিন্তু আরও একখানা পথের পাঁচালী আছে, সেখানা আমার লেখা।

বনমালা। [কমলার প্রতি] নাও, হ'ল তো? কর এখন তর্ক। আমি আপনার খানাই পড়েছিলাম। কি মিষ্টি ভাষা!

অনঙ্গমোহন। সাহিত্যের জন্যেই আমার জীবন উৎসর্গীকৃত। কলকাতায় আমার বাড়ি সবচেয়ে শৌখিন। সকলেই এক ডাকে চেনে। [সকলকে সম্বোধন করিয়া] আপনারা যখন কলকাতায় যাবেন, আমার বাড়িতে উঠবেন। এ আমার বিশেষ অনুরোধ রইল। আমি প্রায়ই পার্টি দিয়ে থাকি।

বনমালা। সেসব পার্টিতে যে কি রকম ধুমধাম হয়ে থাকে, তা আমি বেশ কল্পনা করতে পারছি।

অনঙ্গমোহন। সে ধুমধাম আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না। অসম্ভব। এক-একটা বোম্বাই আমের দাম অষ্টআশি টাকা। বরাবর বোম্বে থেকে এরোপ্লেনে ক'রে আমদানি করা। আর স্থপের কথা যদি বলেন। প্যারিস থেকে তৈরি করিয়ে বরাবর জাহাজে ক'রে কলকাতায় আনানো। ঢাকনা তুলতেই সে কি গন্ধ!

নিজের বাড়ি যেদিন পার্টি না থাকে, সেদিন হয় দ্বারভাঙ্গার বাড়িতে, নয় বর্দ্ধমানের বাড়িতে, নয় তো কুচবিহারের বাড়িতে। একদিনও বেকার ব'সে থাকবার উপায় নেই।

সন্ধ্যাবেলা ক্লাবে প্রায়ই তাস খেলবার ডাক পড়ে। হয়তো গিয়ে দেখব, কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ, চীফ মিনিস্টার আর আমেরিকার কন্সাল আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে রয়েছে। খেলতে খেলতে পরিশ্রান্ত হয়ে বাড়ি ফিরি—থাকি সেই পাঁচতলার ওপরে, অমনই একসঙ্গে ষোলজন খানসামা দৌড়ে আসে···কি বাজে বকছি, একতলাতেই থাকি। ওরকম সিঁড়ি আপনারা কখনও দেখেন নি—সিঁড়িটার দামই হবে······ভোরবেলা ঘুম ভাঙবার আগেই আমার ড্রয়িংরুম লোকে ভ'রে যায়···রাজা, জমিদার, বড় বড় ব্যবসায়ী···ঘরখানা মৌমাছির চাকের মত সরগরম হয়ে ওঠে··· এমন কি মাঝে মাঝে মন্ত্রীরা···

ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি ভীত বিস্ময়ে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল)

চিঠিপত্র আমার নামে ইওর এক্সেলেন্সি ব'লে আসে। একবার এক মজা হ'ল! গভর্মেন্টের এক ডিপার্টমেন্টের বড় সাহেব কোথায় উধাও হ'ল। কোথায় গেল? খোঁজ, খোঁজ। কোন পাত্তা নেই। আফিস তো চালাতে হবে। কাকে বসানো যায়? কে যোগ্য লোক? পুরনো সব আই. সি. এস., বড় বড় জেনারেল কত জনে গেল। যত শিগগির যায়, তার চেয়ে শিগগির বেরিয়ে আসে—সবাই বলে আমাদের সাধ্য নয়। আপনারা ভাবছেন, কাজ খুব সহজ, কিন্তু আপনারা গেলেও ওই কথাই বলতেন। গভর্মেন্টের নিয়ম হচ্ছে, যখন আর যোগ্য লোক খুঁজে যায় না, তখন আমার শরণাপন্ন হয়। তখনই গভর্মেন্টের চাপরাসী আসতে শুরু হ'ল। চাপরাসীর পর চাপরাসী; চাপরাসী আসবার জন্যে পথের ট্রাম, বাস, ট্র্যাফিক বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল—ক্রমে ক্রমে পঁয়ত্রিশ হাজার চাপরাসী এসে আমার বাড়িতে পৌঁছল। সকলেরই মুখে এক কথা—মিঃ রায়, আপনি ভার নিন। আমার ইচ্ছা ছিল, রিফিউজ করব। তাড়াতাড়ি ড্রেসিং গাউনে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু মনে হ'ল, গভর্নরের কানে কথাটা যেতে পারে। ভাবলাম, কাজ কি, অ্যাক্‌সেপ্ট ক'রে ফেলি। কিন্তু তখনই সাবধান ক'রে দিলাম, দেখুন, এ আর কেউ নয়—স্বয়ং অনঙ্গমোহন চম্পটি। আমার সঙ্গে চালাকি চলবে না। বললে বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু যখন আমি আফিসে গিয়ে ঢুকলাম, মনে হ'ল, ভূমিকম্প আরম্ভ হয়েছে। আফিসের চাপরাসী আরদালী থেকে আরম্ভ ক'রে বড়বাবুর দল পর্য্যন্ত সব কাঁপতে শুরু ক'রে দিলে।

(এই কথা শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি কাঁপিতে শুরু করিয়া দিল)

আমার কথা অমান্য করে এমন সাহস কার? সকলেই আমার নামে কাঁপে? স্বয়ং মন্ত্রীমণ্ডল আমাকে ভয় ক'রে চলে। তাদের আর দোষ কি? আমাকে কে না জানে? আমি তাদের বলি, দেখ, আমাকে শেখাতে এসো না। সব জায়গায় আমার যাতায়াত। গভর্নরের বাড়িতে হামেশাই আসা-যাওয়া করছি···কালই আমাকে ফিল্ড মার্শাল উপাধি দেবে···

(পা হড়কিয়া মেঝেতে পতনোন্মুখ। সকলে সসম্ভ্রমে তুলিয়া ধরিল)

ম্যাজিস্ট্রেট। [কাঁপিতে কাঁপিতে ভয়ে ভয়ে] ইওর…ইওর…ইওর…

অনঙ্গমোহন। (তাড়া দিয়া) কি হয়েছে ?

ম্যাজিস্ট্রেট। (ভীত কম্পিত) ইওর…ইওর…ইওর…

অনঙ্গমোহন। (তাড়া দিয়া) কি মাথামুণ্ডু বকছেন ?

ম্যাজিস্ট্রেট। ইওর…ইওর…সেন্সি…একটু শুলে ভাল হ'ত। পাশের ঘরেই আপনার বিশ্রাম করবার জায়গা প্রস্তুত।

অনঙ্গমোহন। মন্দ কি! শুলে মন্দ হ'ত না। আপনি আজ খুব খাইয়েছেন। আপনাদের ওপর আমি খুব খুশি হয়েছি। মাছটার কি নাম যেন ?

দাতব্য-কর্ত্তা। বাঁশপাতা।

অনঙ্গমোহন। (নাটকীয় ভঙ্গীতে) বাঁশপাতা! বাঁশপাতা! (পুনরায় পতনোন্মুখ ; সকলে তাহাকে ধরিয়া পাশের ঘরে লইয়া গেল)

বনমালার প্রস্থান

বলরাম। ঘনরাম, এতদিনে একটা মানুষ দেখলাম বটে! মানুষের মত মানুষ বটে। এতবড় লোকের সামনে জীবনে আমি পড়ি নি। উনি কি ?

ঘনরাম। আমার তো বিশ্বাস, জেনারেল হবেন।

বলরাম। কি যে বলছ ? জেনারেল ওঁকে দেখলে টুপি খুলে সেলাম করবে। শুনলে তো, মন্ত্রীরা ওঁর ভয়ে কি রকম জড়োসড়ো! চল, শিগগির গিয়ে জজ সাহেবকে সব বলা যাক।

উভয়ের প্রস্থান

দাতব্য-কর্ত্তা। (হেডমাস্টারের প্রতি) আমার বিষম ভয় করছে, কাঁপছি, কিন্তু কেন, নিশ্চয় বুঝতে পারছি না। দেখুন, আমরা আফিসের পোশাক প'রে আসি নি। উনি জেগে উঠে, তখন নেশা ছুটে যাবে, যদি কলকাতায় রিপোর্ট পাঠান, তখন কি হবে ?

হেডমাস্টার। চলুন, যাওয়া যাক।

দুইজনের প্রস্থান

রমলা। কি চমৎকার লোক!

কমলা। সত্যি, এমন লোক আমার চোখে পড়ে নি।

রমলা। কি কাল্চার! কাল্চারড মানুষ দেখলেই বুঝতে পারা যায়। আচার, ব্যবহার, পোশাক, চেহারা সবতাতেই কাল্চারের ছাপ-মারা।

এমনি ধারা অল্প বয়সের লোক আমার খুব পছন্দসই। আমার সমস্ত মন উতলা হয়ে উঠেছে। আচ্ছা, তুই লক্ষ্য করিস নি, আমার দিকে উনি ঘন ঘন তাকাচ্ছিলেন ?

কমলা। কি যে বলছ দিদি! উনি আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন।

রমলা। কি যে বলিস! কথা বলছিলেন বটে তোদের সঙ্গে, কিন্তু চোখ ছিল আমার দিকে।

কমলা। কখখনো না।

রমলা। ফের তর্ক! ওইজন্যেই তো তুমি মার কাছে বকুনি খাও। তোমার দিকে তাকাবার আছে কি শুনি ?

কমলা। যখন সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন, তখন দেখ নি—এমনই ক'রে দু-তিন বার আমার দিকে তাকালেন। (দেখাইয়া দিল) আর সেই কন্‌সালের সঙ্গে তাস খেলবার সময়ে—মনে পড়ে না ?

রমলা। আচ্ছা, না হয় তাই হ'ল। কিন্তু সে চাহনিতে কোন অর্থ ছিল না।

(ম্যাজিষ্ট্রেটের ধীরে প্রবেশ। অন্য দিক দিয়া বনমালার প্রবেশ)

ম্যাজিস্ট্রেট। চুপ চুপ।

বনমালা। কি হয়েছে ?

ম্যাজিস্ট্রেট। মদের মাত্রা কিছু বেশি হ'য়ে গিয়েছিল। যা বললেন তার যদি সিকিও সত্যি হয়! হুঁ হুঁ বাবা, পেটের কথা টেনে বের করতে মদের মত আর কিছু নেই। একবার নেশা মাথায় গিয়ে চড়লে মনের কথা উপচে মুখে চ'লে আসে···মন্ত্রীদের সঙ্গে তাস খেলে; গভর্মেণ্ট হাউসে নিত্য যাতায়াত। যতই চিন্তা করছি, ততই মাথা বেশি ক'রে ঘুরছে—মনে হচ্ছে, যেন গভীর খাদের ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছি, কিংবা ফাঁসি দেবার জন্যে আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

বনমালা। আমার তো আদৌ ভয় করে নি। আমি ওঁর পদমর্য্যাদার কেয়ার করি নে। আমি ওঁর মধ্যে কি দেখলাম জান তো—শিক্ষা এবং সংস্কৃতির প্রতিমূর্ত্তি, আদর্শ।

ম্যাজিস্ট্রেট। এই মেয়েদের নিয়ে কিছুতেই পারা গেল না। ওরা কখন যে কি ক'রে বসবে, তা জানতে পারা যায় না। ওদের আর কি ? হয়তো ক ঘা

চাবুক দিয়ে ছেড়ে দেবে, স্বামীদের সর্ব্বনাশ! তুমি এমন ভাবে ওঁর সঙ্গে কথা বলছিলে, যেন উনি ঘনরামবাবু কি বলরামবাবু।

বনমালা। আমি তুমি হ'লে কিছুমাত্র চিন্তা করতাম না। আমরাও মানুষ সম্বন্ধে কিছু কিছু জানি।

ম্যাজিস্ট্রেট। (স্বগত) মিছি মিছি ব'কে কি লাভ? কি বিপদেই পড়েছি, এখন উদ্ধার পেলে বাঁচি। (দরজা খুলিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া) ঝগড়ু, চন্দন সিং আর ভূলবাজ খাঁকে ডেকে দাও—ওরা ওখানেই আছে। (কিছুক্ষণ পরে) কালে কালে কত কি যে দেখব! হ্যাঁ, গভর্মেন্ট-ইন্সপেক্টর একটা দর্শনধারী লোক হবে—এই তো সবাই আশা করে। ইয়া গোঁফ, টলমল করছে সোনালী ইউনিফর্ম, বুক-ভরা মেডেল! এই রকম ছোকরাকে আশা করেছিল কে? ইউনিফর্ম পরলে একটা ইঁদুরকেও মানুষের মত দেখায়। হ্যাঁ, ইউনিফর্মের ওই এক মস্ত গুণ। কিন্তু লোকটার মধ্যে কি যেন আছে, বিনা ইউনিফর্মেই যা ভয় ধরিয়ে দিয়েছে! ভগবানের কৃপায় শেষ পর্য্যন্ত ফাঁদে পা দিয়েছে। অনেক গুপ্ত তথ্য ফাঁস ক'রে ফেলেছে। নেহাত ছোকরা কিনা!

(মুকুন্দর প্রবেশ। সকলে দৌড়িয়া তাহার কাছে গেল)

বনমালা। এস বাপু, এস।

ম্যাজিস্ট্রেট। উনি কি ঘুমোচ্ছেন?

মুকুন্দ। না, হাই তুলছেন আর এপাশ ওপাশ করছেন—এইমাত্র জাগলেন।

বনমালা। তোমার নামটি কি বাপু?

মুকুন্দ। মুকুন্দ, মা-ঠাকরুণ।

ম্যাজিস্ট্রেট। তোমাকে ভাল ক'রে খেতে দিয়েছে তো?

মুকুন্দ। হ্যাঁ হুজুর, খুব খাওয়া হয়েছে।

বনমালা। তোমার মনিবের সঙ্গে দেখা করতে নিশ্চয় অনেক রাজা-মহারাজ আসেন?

মুকুন্দ। ঠিক ধরেছেন মা-ঠাকরুণ। রাজার নীচের ধাপের কোন লোকের মনিবের সঙ্গে দেখা করবার হুকুম নেই।

কমলা। মুকুন্দ, তোমার মনিব বড় সুপুরুষ।

বনমালা। আচ্ছা মুকুন্দ, তোমার মনিব কিসে খুশি হন?

ম্যাজিস্ট্রেট। তোমাদের বাজে কথা রাখ। আচ্ছা বাপু, তোমার মনিব—
বনমালা। কি চাকরি করেন ?
ম্যাজিস্ট্রেট। আবার সব বাজে কথা। কাজের কথা কইতেই দেবে না। আচ্ছা বাপু, তোমার মনিব খুব কড়া? দোষ ধরতে কি ভালবাসেন ?
মুকুন্দ। কাজকর্ম ঠিকমত হ'লে তবে তিনি খুশি হন।
ম্যাজিস্ট্রেট। তোমার চেহারাটি বেশ বাপু। তোমাকে ভাল লোক ব'লেই মনে হচ্ছে। আচ্ছা, বল তো—
বনমালা। তোমার মনিব বাড়িতে কি রকম পোশাক পরেন ?
ম্যাজিস্ট্রেট। আঃ, চুপ কর না। আমার পক্ষে এ যে জীবন-মরণের সমস্যা। (মুকুন্দকে) শীতের দিনে খাওয়া-দাওয়া একটু ভাল হওয়া দরকার। এই নাও, দুটো টাকা রাখ।
মুকুন্দ। (টাকা লইয়া) ভগবান আপনার ভাল করুন হুজুর।
ম্যাজিস্ট্রেট। কিছু না, কিছু না। আচ্ছা বাপু, বল তো—
রমলা। আচ্ছা মুকুন্দ, তোমার মনিব কি রকম চোখ পছন্দ করেন ?
কমলা। মুকুন্দ, তোমার মনিবের নাকটি কি সুন্দর!
ম্যাজিস্ট্রেট। আঃ তোমরা একটু চুপ কর না। (মুকুন্দকে) আচ্ছা বাপু, দেশভ্রমণের সময় তোমার মনিব সবচেয়ে কি বেশি পছন্দ করেন ?
মুকুন্দ। সে কি সব সময়ে বলা যায় হুজুর! যখন তাঁর যে রকম মেজাজ থাকে, সেই রকম।
ম্যাজিস্ট্রেট। খুব মেজাজী লোক, নয় ?
মুকুন্দ। খু-ব, হুজুর।
ম্যাজিস্ট্রেট। সর্ব্বনাশ! তবু কি শুনি ?
মুকুন্দ। ভাল খাওয়া-দাওয়া। ভাল বাড়িতে থাকা।
ম্যাজিস্ট্রেট। কি বললে, ভাল খাওয়া-দাওয়া ?
মুকুন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর। আমি তো সামান্য চাকর মাত্র—, কিন্তু আমার খাওয়া-দাওয়ার দিকেও মনিবের খুব নজর। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করেন—মুকুন্দ, কি রকম খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে। ভাল নয়? আচ্ছা, বাড়ি পৌঁছুলে মনে করিয়ে দিও। তবে আমি ওসব কথায় বড় কান দিই নে হুজুর, আমি গরিব লোক—যা পাই তাই যথেষ্ট।

ম্যাজিস্ট্রেট। কথখনও যথেষ্ট নয়। নাও নাও, আরও কিছু নাও।, বাজার থেকে কিছু কিনে খেও। (টাকা দিল)

মুকুন্দ। হুজুরের বাড়-বাড়ন্ত হোক।

বনমালা। এস বাপু, আমার কাছে এস, আমিও কিছু দেব এখন।

কমলা। (মুকুন্দকে, নীচু স্বরে) মুকুন্দ, তোমার মনিবকে ব'লে দিও। ওর (রমলাকে দেখাইয়া) রঙ পাউডার ঘ'ষে ফর্সা করা—আসলে কালো।

(এমন সময়ে পাশের ঘর হইতে অনঙ্গমোহনের কাশির শব্দ শ্রুত হইল)

ম্যাজিস্ট্রেট। চুপ চুপ। আর যাই কর, গোলমাল ক'রো না। বরঞ্চ তোমরা এখন ভেতরে যাও, সেখানে গিয়ে যা হয় করগে।

কমলা। সেই ভাল দিদি, ভেতরে গিয়ে আমরা কথা বলিগে। এমন অনেক কথা আমার বলবার আছে, যা লোকের সামনে বলবার নয়।

রমলা। চল, তাই ভাল।

উভয়ের প্রস্থান

ম্যাজিস্ট্রেট। (বনমালাকে) তুমি যাও না।

বনমালা। কি আপদ! আচ্ছা বাপু, তুমি আমার সঙ্গে এস।

মুকুন্দকে লইয়া বনমালার প্রস্থান

ম্যাজিস্ট্রেট। ভগবান কেবল যদি মেয়েদের বোবা আর পুরুষদের কালা ক'রে দিতেন!

(চন্দন সিং ও তুলবাজ খাঁর প্রবেশ)

ম্যাজিস্ট্রেট। অত জোরে পায়ের শব্দ ক'রো না। যেন পাঁচমণি হাতুড়ি পড়ছে! কোথায় ছিলে সব এতক্ষণ?

তুলাবজ খাঁ। হুজুরের হুকুম মাফিক—

ম্যাজিস্ট্রেট। চুপ চুপ। (মুখে আঙুল দিয়া) ঢাকের আওয়াজের মত গলার স্বর! (তাহাকে অনুসরণ করিয়া) হুজুরের হুকুম মাফিক—মাথা আর মুণ্ডু! শোন, সদর-দরজায় খাড়া থাকবে—এক মিনিটের জন্যেও সরবে না। সাবধান, কাউকে ভেতরে আসতে দেবে না—বিশেষ ক'রে দোকানদারদের। কেউ যদি ভেতরে ঢুকে পড়ে, তবে···তবে···বুঝতেই পারছ—। আর দেখ, দরখাস্ত নিয়ে, এমন কি না নিয়েও, মানে চেহারা

দেখে যদি মনে হয় এর পকেটে দরখাস্ত আছে, কিংবা দরখাস্ত করবার ইচ্ছাও মনে আছে, তাকে ঘাড় ধ'রে—(লাথি দেখাইয়া) আচ্ছা ক'রে··· বুঝলে কিনা! চুপ চুপ।

পা টিপিয়া দুইজনকে অনুসরণ করিয়া প্রস্থান

ক্রমশ—প্র. না. বি.

আমাদের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা ও নূতন পরিকল্পনা

(২)

ভারতবর্ষ গ্রাম-কেন্দ্রিক, এ দেশের শতকরা নব্বুইটি লোক গ্রামেই বাস করে। আমাদের সমস্যাগুলিও তাই প্রধানত গ্রামেরই সমস্যা। এ কথাটা সহজ হ'লেও কার্য্যত আমরা এই কথাটা প্রায়ই ভুলে যাই। আমাদের শাসকেরা আমাদের দেশে যে সভ্যতার আমদানি করেছেন তা নগর-কেন্দ্রিক, ওটা সহজ স্বাভাবিক-ভাবে আমাদের দেশে গ'ড়ে ওঠে নি, ওকে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে অপরিমেয় দ্রুতগতিতে জগৎ জ্ঞানে-বিজ্ঞানে এগিয়ে গেছে, তার সঙ্গে ভারতবর্ষ তাল রেখে চলতে পারে নি। গত দুই শত বছরে জগতের জ্ঞানভাণ্ডার অভূতপূর্ব্বরূপে প্রসারিত হয়েছে—ভারত সে জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয় নি, নূতন জীবনের শক্তি তার নাড়ীতে নাড়ীতে সঞ্চারিত হয় নি, কিন্তু সেই সভ্যতার বোঝা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এইখানেই আমাদের চরম দুর্ভাগ্যের জন্ম। আমাদের কলের কাপড় যথেষ্ট গড়ার বা পরার সামর্থ্য নেই, অথচ নিজেদের তাঁতশিল্প আমরা ভুলেছি; আমাদের ট্র্যাক্টরও নেই, বৈজ্ঞানিক সারও নেই, অথচ হাল-লাঙ্গল চালানোও আমরা ভুলতে বসেছি। নূতন নূতন আধুনিক বিদ্যালয় গ্রামে গ্রামে গড়ার সামর্থ্যও আমাদের নেই, অথচ চতুষ্পাঠী, পাঠশালা, মক্তব, কথকতা, যাত্রা এগুলিকেও আমরা মেরে ফেলেছি। এই বিংশ শতাব্দীতে আমরা প্রাগ্‌ঐতিহাসিক যুগে ফিরে যেতে পারি না এ কথা যেমন সত্যি, তেমনই ব্যাঙ থেকে ফুলে ষাঁড় হয়ে যেতে পারি না সে কথাও সমভাবেই সত্যি। মুষ্টিমেয় জনকয়েক শিক্ষিত হ'লেই জাতির ক্রমবিকাশ সাধিত হয় না; তার জন্য ব্যাপক শিক্ষার প্রয়োজন আছে।

তা ছাড়া আর একটা কথা আছে। প্রথম যখন একটা সভ্যতা গ'ড়ে ওঠে, তখন তা এগিয়ে চলে ভিতরকার প্রাণশক্তির আবেগে—বিচারের স্থান তাতে থাকে

না। উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানসর্ব্বস্ব যান্ত্রিক-সভ্যতা ধূমকেতুর মত বিপুল বেগে পৃথিবীর বুকে ছুটে বেড়িয়েছে। এই বিপুল শক্তি জগৎকে মুগ্ধ ক'রে রেখেছিল। আজ যখন পৃথিবীর ক্ষতবিক্ষত বুকে এর বেগ স্তিমিত হয়ে এসেছে, যখন আমরা বিরাট বহ্নিদাহের প্রচণ্ড ঔজ্জ্বল্যের আড়ালে লুকানো বিপুল কালিমাকে দেখতে পাচ্ছি, তখন একে বিচার করার সময় এসেছে—এর সবটুকু যে গ্রহণযোগ্য নয়, সে কথাটাই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

এই দুইটি মূল উপলব্ধির ওপর ওয়ার্দ্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনার ভিত্তি। এই পরিকল্পনা আজও পরীক্ষামূলক অবস্থার মধ্যে রয়েছে, স্থান-কাল-পাত্রভেদে এর রূপায়ন ভিন্ন হবে, এ কথা পরিকল্পনাকারীরা স্বীকার করেন। বস্তুত এই স্বীকৃতিই পরিকল্পনার জীবনী-শক্তির সুস্পষ্ট লক্ষণ। কিন্তু এর মূল সূত্রগুলি সুস্পষ্ট, আমরা সেগুলি সম্পর্কেই এই প্রবন্ধে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

গ্রামগুলি আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড, এ কথা কেউ অস্বীকার করেন না; অথচ এগুলি যে আজ চরম দুর্গতির মধ্যে সম্পূর্ণ বিলুপ্তির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, সে কথাটাও উপলব্ধি করা কঠিন নয়। এ যে এর বর্ত্তমান সভ্যতাকে গ্রহণ করতে পারি নি ব'লেই ঘটেছে সে কথাও বলা কঠিন, কারণ কোনদিন এই গ্রামগুলি স্বয়ং-সম্পূর্ণ ছিল; এরা নিজেদের অভাব মোচন তো করেছেই, বরং পরের অন্নবস্ত্রের অভাবও ঘুচিয়েছে। এই বিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক সভ্যতার দিনেও যে সেই কুটির-শিল্পের প্রয়োজন আমাদের দেশে একেবারে শেষ হয়ে যায় নি, সংহত সুনিয়ন্ত্রিতভাবে চালালে আজও যে কুটির-শিল্প বেঁচে থাকতে পারে, তার প্রমাণ আজ ভারতবর্ষে একেবারে নেই এমন নয়। কিন্তু নিশ্চেষ্ট নিঃসহায়ভাবে এরা নিজেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মৃত্যুর জন্ম অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে নীরব হয়। আমরাও বাইরে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে থাকি। রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা পরম দুর্ভাগ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু মৃত্যুর হিমশীতল আলিঙ্গনের মধ্যে দাঁড়িয়ে ওই নির্ম্মম দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে ভাবা ছাড়া আর কিছু করার আছে কি না সেটাই চিন্তনীয় বিষয়। বৈজ্ঞানিক কার্য্যকারণবাদ সম্বন্ধে জ্ঞান নেই ব'লে আমরা অজ্ঞ গ্রামবাসীকে অবজ্ঞা করি, এদের কুসংস্কার, জড়তা, অদৃষ্টবাদকে ধিক্কার দিই; কিন্তু ওই কুসংস্কার ও জড়তাকে দূর করার চেষ্টা আমরা করি না। আমরা নিজেদের দিকে চেয়ে দেখি না যে, আমরা নিজেরা কতখানি জড়, মূঢ় ও অদৃষ্টবাদী ব'লে আমাদের মঙ্গলের সমাধি আমাদের চোখের সামনে রচিত হচ্ছে জেনেও এগিয়ে যেতে পারি না। বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আছে ব'লে আমরা গর্ব্ব ক'রে থাকি, অথচ এই ধ্বংসোন্মুখ গ্রামের সঙ্গেই যে আমাদের সকল সৌভাগ্যের পরিসমাপ্তি ঘটছে, তা কয়জনে বুঝি বলা কঠিন। অবশ্য বোঝা ও

করার মধ্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষা-মারফৎ আমরা যে সীমারেখা টানতে শিখেছি, তাতে বুঝেও কাজ না করা একটা কিছু আশ্চর্য্য নয়।

এ সম্পর্কে আমাদের করবার মত কাজ আছে, গ্রামগুলিকে বাঁচিয়ে তুলে আমাদের নিজেদের মৃত্যুর মুখ থেকে আজও বাঁচানো সম্ভব—এই কথাই বনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনা জোর দিয়ে বলবার চেষ্টা করেছে। 'গ্রামে ফিরে যাও, গ্রামের উন্নতি কর' এই কথাগুলো আমরা আলগাভাবে বহুদিন ধ'রে শুনে আসছি। মাঝে মাঝে হুজুগের মুখে গ্রাম-উন্নয়নের, জঙ্গল সাফ করার ধুম প'ড়ে যায়—ঝোঁক যখন কেটে যায় শহরের ছেলেরা শহরে ফিরে আসেন, স্তিমিত গ্রামগুলি আবার ঝিমিয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে দু-চার দিন আমরা নৈশবিদ্যালয় খুলে দু-চার পাতা লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করি, গ্রামের লোকের সাড়া না পেয়ে দিন কয়েক পরেই সেগুলি বন্ধ হয়ে যায়—গ্রামের লোকেরা হজম-না-করা বিদ্যাকে নিঃশেষে ভুলে নিশ্চিন্ত হয়, চণ্ডীমণ্ডপে গুরুমশাইয়ের অবিরাম বেত্রবর্ষণের মুখে অসহায় বালক-বালিকার কান্না অসহায় গ্রামের বোবাকান্নার প্রতিধ্বনি তোলে। জাতীয় জীবনের দীর্ঘকালের জড়তাকে জয় করতে হ'লে যে গোড়া থেকে শুরু করা দরকার, সে কথা ভুলে যাই ব'লেই আমাদের চেষ্টা এমনই ক'রে নিষ্ফল হয়।

আমাদের সর্ব্বপ্রকার অধঃপতনের মূলে রয়েছে আমাদের জড়তা, অথচ আমরা আমাদের স্কুল-কলেজের মধ্য দিয়ে এই জড়তাকেই আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরের মধ্যে অঙ্কুরিত করি। যদি স্বাভাবিক প্রাণশক্তির প্রভাবে এরা চঞ্চল হয়ে ওঠে, তবে শৃঙ্খলার নামে আমরা অসঙ্কোচে সেই কর্ম্ম-প্রচেষ্টাকে নষ্ট ক'রে দিই। পারস্পরিক অসহযোগিতাই আমাদের দুর্ব্বলতা, অথচ আমরা বাল্যকাল থেকে শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে প্রতি-যোগিতাকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকি। ওয়ার্দ্ধা-পরিকল্পনার লক্ষ্য—কাজের লোক গ'ড়ে তোলা এবং বাস্তব জগতে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে গেলে যে সহযোগিতার প্রয়োজন, এই সত্যটিকে আমাদের মনে এবং অভ্যাসে দৃঢ়বদ্ধ ক'রে দেওয়া। এজন্য অযোগ্য পাঠ্যপুস্তকের অযথা-ভারমুক্ত হয়ে কাজকে কেন্দ্র ক'রে এই শিক্ষা গ'ড়ে উঠবে—এই নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। এইটুকু শুনেই আমরা আঁতকে উঠি। বহুদিন ধ'রে কাজ না ক'রে কেবল কথার তোড়ে মান বাঁচিয়ে চলার যে সহজ পথটি আমরা আবিষ্কার করেছিলাম, তার গোড়াতেই আঘাত পড়তে দেখে আমাদের বিচলিত হবারই কথা। বনিয়াদী শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তি করা হয়ে থাকে যে, এই পদ্ধতি আমাদের জাতটাকে তাঁতী, ছুতোর, মিস্ত্রীতে পরিণত ক'রে ফেলবে, উচ্চতর জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্থান এতে নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই ধারণা হাস্যকর। কাজের মধ্য দিয়েই আমরা কাজ করার সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, সে সমস্যার সমাধান থেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্ম। পৃথিবীর যত বয়স বেড়েছে, আমাদের কাজ যত বহুমুখী হয়েছে, ততই আমাদের সম্মুখে নানা সমস্যা এসে দাঁড়িয়েছে, আমরাও ততই

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের সমস্যাকে দেখাবার সুযোগ পেয়েছি। জ্ঞান-বিজ্ঞান আকাশ থেকে ঝ'রে পড়ে নি, আমাদের ও পরিবেশের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলেই এদের জন্ম। বনিয়াদী শিক্ষা এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সমাধানের মধ্য দিয়েই পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা দিতে চায়, না-বোঝা না-জানা কাল্পনিক সমস্যার কাল্পনিক সমাধানকে মুখস্থ করিয়ে নয়। আমরা এ কথা বলি না যে, বনিয়াদী শিক্ষা-সমিতি আজ দেশের সামনে যে কর্ম্মসূচী দাঁড় করিয়েছেন, সেটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, ওতে আর নূতন কিছু যোগ করার নেই। বরং সমিতি বার বারই স্বীকার করেছেন যে, স্থান-কাল-পাত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কর্ম্মপন্থাকে নূতন নূতন রূপ দেবার প্রয়োজন চিরদিনই হবে। আমরা, যারা আজ দর্শন কপচাচ্ছি বা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দোহাই পাড়ছি তারা ভুলে গেছি যে, প্রাচ্যের দর্শন বা পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান কোনটাই শুধু মাত্র ভাববিলাস নয়—সুনির্দ্দিষ্ট জীবনধারা। আমাদের ব্যাধি-জর্জ্জরিত, উপবাস-ক্লিষ্ট, দুর্ভিক্ষ-মহামারী-বিধ্বস্ত গ্রামের প্রাথমিক সমস্যা বেঁচে থাকার সমস্যা—অন্নবস্ত্রের সমস্যা। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব নেই তবু আমরা রিক্ত, আমাদের মাঠে মাঠে সোনার ধান তবু আমরা অভুক্ত, যারা যোগায় সারা দেশের অন্ন তারাই অন্নহীন গৃহহীন, আমাদের সীমাহীন লোকবল তবু আমাদের পরম দুর্ভাগ্যের কথা দুজনে মিলে ভাবতে পারি না, পরম ক্লান্তিতে আমরা এমনই স্তিমিত হয়ে পড়েছি যে আমরা ব্যথায় চাৎকারটুকু পর্য্যন্ত করিতে অসমর্থ। এইটুকু শিক্ষা, পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার সামান্য একটুখানি নৈপুণ্য, সামান্য পশুর আত্মরক্ষা করার যে স্বাভাবিক প্রকৃতিদত্ত জ্ঞানটুকু সেটুকু জ্ঞান যাদের নেই তাদের কাছে অনুবীক্ষণ-দূরবীক্ষণের স্বপ্ন, ইউরোপ-আমেরিকার সভ্যতার খবর নিয়ে যাওয়া শুধু হাস্যকর নয়—ওদের প্রতি নির্লজ্জ অপমান, নিষ্ঠুর উপহাস।

কিন্তু বনিয়াদী শিক্ষা যে কেবল ওই একান্ত প্রয়োজনীয় প্রাথমিক শিক্ষার আয়োজন ক'রেই ক্ষান্ত হতে চায়, সে কথা সত্য নয়। বনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনাকারীরা বিশ্বাস করেন যে, শিক্ষাকে যদি গোড়া থেকেই সংস্কৃত করা যায়, তবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সবটুকু প্রয়োজনীয় সংবাদই গ্রামের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া সম্ভবপর। সবাইকে তাঁতী ছুতোর চাষী ক'রে গ'ড়ে তোলাই বনিয়াদী শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য নয়। শিক্ষালয় থেকে স্বাভাবিকভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে সমাজের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে, শিক্ষালয় যাতে সমাজেরই একটা অবিচ্ছিন্ন অঙ্গরূপে গ'ড়ে উঠতে পারে এবং সমাজকে সর্ব্বতোভাবে সংস্কৃত করতে পারে এইটেই এই শিক্ষা-পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য। শিশুর মধ্যে যাতে প্রথম থেকেই স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বিতার গোড়াপত্তন হয়, স্বেচ্ছাচার থেকে স্বাধীনতাকে যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা আলাদা ক'রে দেখতে শেখে, শিশুর কাজ করার সুস্থ প্রবৃত্তিকে যাতে তার মানসিক সর্ব্বপ্রকার বিকাশের কাজে লাগিয়ে দেওয়া যায়, এগুলিই এই পদ্ধতির মূল সম্পাদ্য।

বনিয়াদী শিক্ষার পরিসর সাত বৎসর। আমরা যারা ইংরেজী-শিক্ষার মানদণ্ডে সব-কিছু মাপতে অভ্যস্ত তাদের জানানো হয়েছে যে, এই সাত বছরে ইংরেজী ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের চেয়ে বেশি বই কম জ্ঞান লাভ করবে না। আমাদের বর্ত্তমান ব্যবস্থায় এই জ্ঞানটুকু আমরা প্রায় দশ বৎসরে লাভ ক'রে থাকি, তাও পরীক্ষার পরমুহূর্ত্তে মুখস্থ-করা বুলিগুলো প্রায় নিঃশেষে ভুলে যাই। দশ বছরের শিক্ষা সাত বছরে কি ক'রে দেওয়া সম্ভব এ কথা যাঁরা ভাববেন, তাঁদের স্কুল-কলেজের পাঠ্যতালিকা ও বিকৃত পরীক্ষা-ব্যবস্থার দিকে একটু তাকিয়ে দেখতে অনুরোধ করি। শিক্ষাটা যে শিশুর জন্য, তাকে আগ্রহান্বিত ও সক্রিয় ক'রে তোলার যে কোন প্রয়োজন আছে, সে কথাটা আমাদের মনেই থাকে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর বহুদিন-পরিত্যক্ত প্রথায় শিক্ষক আজও আমাদের শ্রেণীগুলিতে ব্যাক্যের স্রোত ছড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হন। বক্তৃতাগুলি করা হয় ক্লাসে যারা সব চাইতে বোকা তাদের লক্ষ্য ক'রে; যারা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান তাদের যে বিরক্তি জন্মায় বা সময়ের অপচয় হয় সেদিকে আমরা লক্ষ্য রাখি না। পড়া তাড়াতাড়ি শিখলেও এগিয়ে যাবার উপায় নেই, তাই সারা বৎসর হেলায় কাটিয়ে পরীক্ষার আগে ছাত্র-ছাত্রীরা স্বাস্থ্য নষ্ট ক'রে মুখস্থ করতে বসে। সময়ের অসদ্ব্যবহার দেখে আমাদের ক্রোধ এবং বিরক্তি মাঝে মাঝে উদ্যত হয়ে ওঠে, কিন্তু আমরা লক্ষ্য ক'রে দেখি না, পরীক্ষার জুয়াখেলার জন্য মোটামুটি পাঠ্য-বস্তুটুকুকে কোনমতে মুখস্থ করতে অধিকাংশ ছেলেমেয়েরই দু-তিন মাসের বেশি সময় লাগে না। আবার সারা বছর ফাঁকি দিয়ে যারা পরীক্ষার বেড়াগুলি টপ টপ ক'রে ডিঙিয়ে যায়, তাদের প্রতি আমাদের কোন অভিযোগ তো থাকেই না বরং আমরা অসঙ্কোচে তাদের কৃতিত্বের প্রশংসা করি। বোঝা না-বোঝায় কিছু এসে যায় না, পরীক্ষার বোঝাটা যে অনায়াসে বইতে পারে, তারই পিঠে আমরা কৃতিত্বের ছাপটা এঁটে দিই। সুতরাং শিক্ষার্থীর আকর্ষণ জ্ঞানের দিকে থাকে না, থাকে পরীক্ষার দিকে এবং এই বিকৃত আকর্ষণকে কেন্দ্র ক'রেই শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে সর্ব্বপ্রকারের বিকৃতি ও নির্লজ্জ কদর্য্যতা। আবার এই শিক্ষার ভার যাঁদের হাতে, তাঁদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষা বা শিশুর সঙ্গে কোন যোগই নেই—যোগ টাকার সঙ্গে। সেই টাকাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এত অল্প যে তাতে নামমাত্র কর্ত্তব্যটুকুও পালন করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, তবু টিক থাকতে হয়, আর কিছু করার যোগ্যতা নেই ব'লেই। এইজন্যই আমাদের শিক্ষা এগিয়ে চলে মন্দাক্রান্তা তালে, আর সে শিক্ষাটুকু আমাদের জীবনে কোন মহৎ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না—বিদ্যালয়ের গণ্ডির বাইরে পা বাড়িয়েই আমরা বিদ্যালয়ের কৃত্রিম শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যেতে পারি। শিশুর সঙ্গে নিবিড় যোগ তার পরিবেশের। প্রকৃতির এই বিরাট পুঁথিখানিতে জ্ঞানের কোন বিষয়-বস্তুরই অভাব নেই—এর

প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা পাঠ করার চেষ্টাই জ্ঞানের অনির্ব্বাণ সাধনা। একে আমরা পড়তে জানি না ব'লেই আমাদের নকল পুঁথি লিখতে বসতে হয়। শিশুর যে সব জ্ঞান দরকার তার যথেষ্ট উপকরণ তার চারপাশেই রয়েছে, শুধু শিশুর প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়কে সে বিষয়ে সজাগ করা দেওয়া দরকার। এই পরিবেশের সঙ্গে শিশুর যোগ নিবিড়, শুধু যদি একবার তার আগ্রহকে জাগ্রত ক'রে দেওয়া যায়, তবে তার শিক্ষা এগিয়ে চলে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে—এইখানেই বনিয়াদী পরিকল্পনার সময়সংক্ষেপের সঙ্কেত। স্বাস্থ্যরক্ষা শেখার জন্ত পুঁথির পর পুঁথি ঘাঁটার প্রয়োজন অল্প—চারিদিকেই ব্যাধির যে তাণ্ডবনৃত্য চলছে, তা থেকে মুক্ত থাকা ও করার চেষ্টার মধ্য দিয়েই স্বাস্থ্যরক্ষা শেখানো যায়; গ্রামখানিই শিশুর ছোট্ট পৃথিবী, এর মধ্যে ভূগোল শেখার সমস্ত প্রাথমিক উপকরণ রয়েছে, প্রকৃতি কোথাও কৃপণ নয়, সেই অজস্রতার মধ্যেই বিজ্ঞানের মণিকোঠার চাবি। এই পরিবেশের সঙ্গে নিয়ত সংযোগে যে শিক্ষা তার মধ্যে কৃত্রিমতা নেই, এটা মুখস্থ ক'রে শেখা নয়, কাজ ক'রে শেখা, এই রকম শেখার ব্যবস্থা করাই বনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য।

আমাদের আর্থিক ব্যবস্থাকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে শিক্ষাটা নিরর্থক বোঝার মত আমাদের কাছে একটা বিরক্তির বস্তুই হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভিক্ষুক তৈরি করার ভিক্ষুক-যন্ত্রটার দিকে আমরা অবজ্ঞার সঙ্গেই চেয়ে থাকি। বনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনা দাবি করে যে, শিক্ষার এই ভিক্ষাবৃত্তি নিরোধ করা দরকার এবং সম্ভবপর। শিক্ষাকে পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় ব'লেই আমাদের দেশে শিক্ষাটা পরের হুকুমমত চলে। গান্ধীজী এক জায়গায় অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছেন যে, শিক্ষাকে যদি আর্থিকভাবে স্বয়ং-সম্পূর্ণ ক'রে তোলা না যায়, তবে বুঝতে হবে, মাষ্টারগুলি বোকা, অকর্ম্মণ্য; আর শিক্ষা-ব্যবস্থাটা একটা ধাপ্পাবাজি মাত্র। প্রথমটা এই কথাগুলি প'ড়ে একটা ধাক্কা লাগে। পৃথিবীর সব দেশেই যখন শিক্ষার জন্ত টাকা ছড়ানোর অন্ত নেই, তখন এই বেসুরো কথাগুলি নিতান্তই অবাস্তব ব'লে মনে হয়। আমাদের এখনকার বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের কার্য্য-ক্ষমতাকে শুধু উপেক্ষা করি না, তার প্রকাশকে জোর ক'রে রুদ্ধ ক'রে দিই। সামাজিক ও আর্থিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রমের মধ্য দিয়ে শিক্ষা-দানের প্রথা বঙ্গদেশ গ্রহণ করেছে, সুতরাং ওয়ার্দ্ধা-পরিকল্পনার প্রস্তাবটি সম্পূর্ণ নূতন নয়। আমাদের রাজনৈতিক অবস্থাতে এই প্রস্তাবের একটা বিশেষ মূল্য আছে। অন্ত স্বাধীন দেশে শিশুকে সকল আবিলতা থেকে বাঁচিয়ে ভবিষ্যতের উপযুক্ত নাগরিকরূপে গ'ড়ে তোলার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের শাসকেরা কার্য্যত সে দায়িত্ব গ্রহণ করেন নি। সুতরাং এ যাদের জীবন-মরণের সমস্যা, তাদেরই তাদের সাধ্যানুযায়ী শিক্ষা-ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে।

কিন্তু এই রাজনৈতিক মূল্যই এই নির্দ্দেশের একমাত্র কারণ নয়। প্রত্যেকটি শিশু

যদি জাতীয় সম্পদবৃদ্ধির কাজে নিজেকে নিযুক্ত করে, তবে সাত বছরে সে তার শিক্ষার জন্ত প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জ্জন করতে সক্ষম হবে, এবং এই উপার্জ্জন-ক্ষমতাই তার উপযুক্ততার মান ব'লে বিবেচিত হবে। গত কয়েক বছরের পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, প্রথম দুই বছর শিশু যথেষ্ট উপার্জ্জন করতে না পারলেও তার পর শিশু ধীরে ধীরে তার শিক্ষাব্যয় বহন করার উপযুক্ত উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। আমরা অবশ্যই মনে করি যে, আর্থিক আত্মনির্ভরতার মানটিকে অত্যন্ত নীচু ক'রে রাখা হয়েছে। পঁচিশ টাকা মাইনেতে একজন শিক্ষকের জীবনের নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যয়টুকুও নির্ব্বাহ করা চলে না। আমাদের মনে হয়, খণ্ডভাবে শিক্ষাকে দেখার জন্তই ওয়ার্দ্ধা-প্রস্তাবে এই ত্রুটিটুকু রয়ে গেছে। শিশুর শিক্ষা যতই এগিয়ে চলে, আমরা লক্ষ্য করেছি যে, জাতীয়-সম্পদ বৃদ্ধি করার ক্ষমতাও তার ততই বেড়ে চলে। সাত বছর বনিয়াদী শিক্ষার পর বিবিধ প্রকারের বিশেষ উচ্চশিক্ষা যখন শিশু লাভ করবে, তখন তার উপার্জ্জনক্ষমতা আরও অনেক বেশি বেড়ে যাবে এবং তার ফলে শিক্ষা-ব্যবস্থার আর্থিক ভিত্তিটা আরও দৃঢ় হবে ব'লে আমাদের বিশ্বাস। উচ্চশিক্ষা আজকাল ব্যয় বাড়াতেই সাহায্য ক'রে থাকে, এই জন্ত উচ্চশিক্ষার কথাটা বোধ হয় শিক্ষার রূপান্তরে প্রথম স্থান পায় নি। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে, কর্ম্মকেন্দ্রিক বনিয়াদী শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চশিক্ষারও পূর্ণ রূপান্তর ঘটবে—তখন উচ্চশিক্ষাও যাঁরা সাধন করবেন তাঁরাই জাতীয় সম্পদ বাড়িয়ে তোলার প্রধান সহায়ক হবেন, এবং এই উচ্চশিক্ষার শ্রেণীগুলিই বিদ্যালয়ের আর্থিক বলকে দৃঢ় করবে। শিক্ষা-ব্যবস্থার রূপান্তরের এই পরিকল্পনার বিশেষ আলোচনা করার স্থান এই প্রবন্ধে নেই, আমরা অন্ত প্রবন্ধে সে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

শিক্ষাকে আর্থিকভাবে আত্মনির্ভর ক'রে তোলার প্রস্তাবকেই আমরা গান্ধী-পরিকল্পনার নূতন কথা ব'লে মনে ক'রে থাকি। বিদ্যালয়গুলি জাতীয় সম্পদবৃদ্ধির কেন্দ্র হবে—এ কথাটা অসম্ভবও নয়, নূতনও নয়, আমাদের দেশের অদ্ভুত আর্থিক ব্যবস্থার জন্তই প্রস্তাবটা এত নূতন ঠেকে। কিন্তু আপাতসহজ মনে হ'লেও শিক্ষাকে সত্য ও অহিংসার ভিত্তির ওপর গ'ড়ে তোলার প্রস্তাবই ওয়ার্দ্ধা-পরিকল্পনার মৌলিক এবং সবচেয়ে বৈপ্লবিক প্রস্তাব। শিক্ষার ক্ষেত্রে সত্য বলতে আমরা কোন মতবাদ, তত্ত্ব বা তথ্যকে বুঝি না, বুঝি একটি মনোবৃত্তিকে। অন্ধ-ভক্তি বিশ্বাস বা দ্বেষের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে যুক্তি দ্বারা যে কোন সমস্যার সমাধানের চেষ্টাই, সত্যপ্রতিযোগিতার পরিবর্ত্তে সহযোগিতাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টাই অহিংসা। সত্য ও শান্তির আদর্শকে জোর গলায় প্রচার করলেও জাতীয় ও দলগত স্বার্থকেই আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাধান্ত দিয়েছি। বিগত মহাযুদ্ধের পর শিক্ষা-ব্যবস্থাকে প্রগতিশীল জাতিরা যে রূপ দিয়েছিল, তা উগ্রজাতীয়তার পরিপোষক। এই শিক্ষা-ব্যবস্থার ফলে জাতীয়তার প্রসার হয়েছে সত্যি, কিন্তু মনুষ্যত্বের

পূর্ণবিকাশ ঘটে নি। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের অবতারণা এবং এর ভয়াবহতা এই শিক্ষা-ব্যবস্থারই পরিণাম। শিক্ষা যে মানুষের বিকাশকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে তার পরীক্ষা হয়ে গেছে—গান্ধীজীর প্রস্তাব নূতনতর এবং কঠিনতর পরীক্ষার দাবি করছে। দেশাত্মবোধ, জাতীয় শৃঙ্খলা এবং কর্ম্মনিষ্ঠা যদি শিক্ষা দ্বারা জাগ্রত করা যায়, তবে উদার মনুষ্যত্বও শিক্ষার মধ্য দিয়েই জাগ্রত করা সম্ভব, এইটেই ওয়ার্দ্ধা-পরিকল্পনার মূল প্রতিপাদ্য এবং এইটেই এই পরিকল্পনার সবচেয়ে বড় কথা। আজ যুদ্ধক্লান্ত জগৎ শান্তি চাইছে। আমরা মুখে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য চীৎকার করছি, কাজে নূতন যুদ্ধের বীজ বপন ক'রে চলেছি। ওয়ার্দ্ধা-পরিকল্পনা নূতন জাতি গড়তে চায়, নূতনতর সভ্যতার গোড়াপত্তন করতে চায়। এর সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে নানা সন্দেহ আমরা পোষণ করছি, কিন্তু এই নূতন পরীক্ষাকে কার্য্যকরী করার চেষ্টা করছি না। কাজের গোড়ায় তর্ক তুলে সময় নষ্ট করা ক্ষতিকর। এই পরীক্ষা নূতন, সুতরাং কোন নজির তোলার চেষ্টা করা বৃথা, কাজের মধ্য দিয়েই এর পরিচয় মিলবে।

বাংলা দেশ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে, মানুষের লোভে গড়া দুর্য্যোগে বিধ্বস্ত হবার মুখে। সমগ্র পল্লীসমাজের মৃত্যুর ছবি আমরা বিগত দুর্ভিক্ষের মধ্য দিয়ে লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়েছি। ওয়ার্দ্ধা-পরিকল্পনাকে এই প্রদেশে কার্য্যকরী ক'রে তোলা যায় কি না, এই প্রচেষ্টা আরম্ভ করতে যে বিপুল অর্থ ও সঙ্ঘবদ্ধতার প্রয়োজন তার আয়োজন করা সম্ভব কি না, বাংলা দেশে এই প্রচেষ্টাকে কি রূপ দেওয়া সম্ভব—এই প্রশ্নগুলি অবিলম্বে আমাদের ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

শ্রীঅনিলমোহন গুপ্ত

বাংলার নবযুগ : পরিশিষ্ট—রবীন্দ্রনাথ

(১৯৮ পৃষ্ঠার পর)

জানিল না; সেখানেও আত্যন্তিক আত্ম-চেতনা—প্রাণের গভীরতর প্রবৃত্তির সহিত সমাজ-জীবনের বিরোধই একমাত্র কারণ বলিয়া মনে হয়; প্রাণের প্রাবল্যই প্রাণধারণের বাধা হইয়া দাঁড়াইল; অর্থাৎ জীবনে সে কোন ফাঁকি সহ্য করিবে না। আর একজনের সাহিত্যিক নিষ্ঠা এতই কঠোর যে অতিশয় সারবান প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করিয়াও তাহা প্রকাশিত হইতে দিল না, জোর করিয়া মুদ্রিত করিলেও তাহার প্রচার বন্ধ করিয়া দিল; সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হইলে তাহাতে তাহার নাম যুক্ত হইতে দিবে না; ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ মৃত্যুর পরে প্রচারিত হইয়াছিল, অধিকাংশ রচনাই লুপ্ত হইয়াছে।

ইহা একরূপ আত্মহত্যা—অতি উচ্চ আদর্শের নিকটে আত্মবলি। এক দিকে এই সব আত্মবিশ্বাসী ও প্রাণবান পুরুষের কাহিনী, অপর দিকে জাতি ও সমাজের কল্যাণ-কামনায় কত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান! শিক্ষা বিস্তারের জন্য সারা দেশে সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে সে কি অসীম আগ্রহ! কত পুস্তক-প্রণয়ন—কত পত্রিকা-প্রচার! বিদ্যাচর্চ্চা ও সাহিত্য-সেবা ধনীগণেরও বিলাস-ব্যসন হইয়া উঠিয়াছে—তজ্জন্য কত সভা-স্থাপন, পরস্পরের কি প্রতিযোগিতা! উৎকৃষ্ট নাটক রচনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা, মূল মহাভারতের অনুবাদ ও বিনামূল্যে তাহা বিতরণের জন্য লক্ষ মুদ্রা ব্যয়! এইরূপ কত অবদান! ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের জন্য সেই যে প্রয়াস, তাহাতেও ত্যাগ, সাহসিকতা ও আত্মনিগ্রহের কি সংক্রামক উত্তেজনা! এ কাহিনীর শেষ নাই! শতাব্দীর প্রায় প্রথম হইতেই এই যে জাগরণ ইহা কেবল মনীষা ও প্রতিভারই জাগরণ নয়; রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিম, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ইহার মানদণ্ড মাত্র, এমন কি, ভবানীচরণ, ঈশ্বর গুপ্ত, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, প্যারীচাঁদ, কৃষ্ণমোহন, কৃষ্ণকমল, ভূদেব, রাজেন্দ্রলাল, কৃষ্ণদাস, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতির দ্বারাও এই যুগের সম্যক পরিচয় হইবে না। ভিতরে দৃষ্টি করিলে দেখা যাইবে, এ সকলের মূলে ছিল বাঙালীর অটুট স্বাস্থ্য—অতি বলিষ্ঠ দীর্ঘাকার দেহ, সুদৃঢ় মেরুদণ্ড, ও সুগভীর হৃদয়বত্তা। আজ আর তাহার কোনটাই নাই; মনে হয়, সেই জাতিই যেন লোপ পাইয়াছে। এখন আর সে কল্পনাশক্তি নাই—ভাববিলাস আছে, বিশ্বাস নাই—শৌখিন মতবাদ আছে, সাহস নাই—শঠতা আছে, প্রেম নাই—কলহ আছে, প্রতিভা নাই—অনুকরণপটুতা আছে। সব চেয়ে আশঙ্কার বিষয়, সে ক্রমে খর্ব্বাকৃতি হইয়া পড়িতেছে। কারণ, আধুনিকেরা যে নব নব মতবাদের আস্ফালন করে—ভাব-চিন্তার যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তাহাও তেমন আশঙ্কাজনক নয়, বাঙালীর পক্ষে বরং তাহাই স্বাভাবিক—বাঁধন সে অনেকবার ছিঁড়িয়াছে, আবার শক্ত করিয়া বাঁধিয়াছে; এমন মেধাবী ও ভাবপ্রবণ জাতির ধর্ম্ম-বিশ্বাস খুব দৃঢ় না হইবারই কথা; কিন্তু দেহ যদি এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে তবে সে দাঁড়াইবে কিসের উপর? উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাহার সেই স্বাস্থ্য ও প্রাণশক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল, তাই সেই প্রবল স্রোতে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াও সে সগৌরবে কূলে উঠিতে পারিয়াছিল।

এই স্বাস্থ্য ও প্রাণশক্তির সহিত জাতিগত প্রতিভার যোগ হইয়াছিল বলিয়াই সে যুগের সাধনায়, সকল তত্ত্ব ও আদর্শবাদের মধ্যেও, জীবনের বাস্তব দিকটা এত বড় স্থান অধিকার করিয়াছিল—সমস্যা এত কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল; তাই, সৃষ্টিবিধানের অলঙ্ঘ্য নিয়মকে—দেহলগ্নাধীন মানুষের স্বভাব-ধর্ম্মকে—অতিশয় দৃঢ়রূপে ধরিয়া, তাহারই অনুকূলে স্বজাতি ও সর্ব্বজাতির কল্যাণ-পন্থাকে স্থাপন করা হইয়াছিল। প্রায় শতাব্দী-ব্যাপী আক্ষেপ-বিক্ষেপের পর বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে

একটা সমন্বয়ের সন্ধান দিয়াছিলেন, এবং বিবেকানন্দ তাহার সেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপরেই জীবনের একটা মহত্তর তত্ত্বকে আধ্যাত্মিক প্রমাণে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অন্ধবিশ্বাস, মিষ্টিক ভাবসাধনা, যোগশক্তি বা মন্ত্রবলকে সহায় করিয়া জীবনকে একরূপ ফাঁকি দিবার যে পন্থা এতকাল নানা আকারে, নানা তন্ত্রে, ভারতীয় হিন্দুমনকে প্রলুব্ধ ও আশ্বস্ত করিয়াছিল—মাটির উপরে দাঁড়াইয়া জীবনের সহিত মুখামুখি না যুঝিয়া, অতি ঊর্দ্ধ শূন্যে ধ্যানমার্গে তাহাকে জয় করিবার যে অতি-মানুষী সাধনা—তাহাকেই ইঁহারা বর্জ্জন করিয়াছিলেন। বাংলার উনবিংশ শতাব্দী জীবনের যে নূতন আদর্শকে উদ্ধার ও প্রচার করিয়াছিল, তাহাই তিন হাজার বৎসর পরে ভারতে নবযুগের সূচনা করিয়াছে।

কিন্তু এই আদর্শ পরে বিচলিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের যে সাধন-মন্ত্রের কথা বলিয়াছি তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার নাই, কারণ রবীন্দ্রনাথ কবি—তাঁহার যে অধিকার আছে, তাহা আর কাহারও নাই; কবি রবীন্দ্রনাথ সজ্ঞানে জননায়ক বা লোকগুরু নহেন; যেখানে তিনি প্রচারক বা শিক্ষক সেখানে তাঁহার ব্যক্তিত্বই প্রবল—কবিত্ব নয়, একথা স্মরণ রাখিলে আমাদের বুদ্ধিভ্রংশ হইবে না। কিন্তু জীবনেরই সাধনার দুইটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে মন্ত্র আবার প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহাতে সেই অন্ধবিশ্বাস অথবা তান্ত্রিক ভাব-সাধনার পন্থাই বরণীয় হইয়াছে। বাস্তব জীবন-সংগ্রামে বাস্তব অস্ত্রের পরিবর্ত্তে, অতি-মানবীয় শক্তির উপরে আস্থা স্থাপনের জন্য জনগণকে আহ্বান করা হইতেছে; অথবা, ব্যক্তিগতভাবে আত্মানুশীলনের দ্বারা যোগশক্তির অধিকারী হইয়া, সেই শক্তির বলে জগৎ ও জীবনকে রূপান্তরিত করিবার এক নূতন উপায় ঘোষণা হইতেছে। যাহার দেহই দুর্ব্বল, উত্থানশক্তি প্রায় রহিত হইয়াছে—তাহাকেই আত্মার শক্তি প্রয়োগ করিয়া পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে সবিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই; এই দারুণ মোহ ও আত্মপ্রবঞ্চনার ফল কি হইতেছে বা হইতে পারে, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। বাংলার নবযুগের সাধন-মন্ত্র ইহার তুলনায় যে কত সত্য ছিল, তাহাই বুঝিয়া দেখিবার জন্য আমি এখানে এ বিষয়ের একটু ইঙ্গিত মাত্র করিলাম।

আমার আলোচনা এইবার শেষ হইল; তথাপি শেষ করিবার পূর্ব্বে আরও দুই-একটি কথার পুনরুল্লেখ করিব। বাঙালীর এই নব জাগরণ শুধুই বাঙালীর নয়—এক হিসাবে তাহা ভারতেরও নব-জাগরণ, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু এইরূপ জাগরণ কোন একটি জাতির বিশিষ্ট প্রকৃতি বা স্বধর্ম্মের অনুকূলেই সম্ভব—স্বাজাত্যবোধই সেই আত্ম-চেতনার সহায়। বাঙালী-জাতির জীবনে এইরূপ জাগৃতি দুই বার ঘটিয়াছে; অতি পূর্ব্বকালের ইতিহাস প্রায় অপরিজ্ঞাত, তাই দুই বারের কথাই নিশ্চয়তার সহিত বলা

যায়। বঙ্কিমচন্দ্রই বোধ হয় প্রথম সেই পূর্ব্ববারের জাগৃতির সগৌরব উল্লেখ করিয়াছিলেন। সে জাগৃতি ঘটিয়াছিল খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে; ধর্ম্মসাধনায় ও শাস্ত্রচর্চ্চায়, কাব্যে ও দর্শনে, ভাবুকতা ও মনীষায় বাঙালা-প্রতিভার সেই সর্ব্বাঙ্গীণ উদ্দীপ্তিই ভারতের আধুনিক ইতিহাসে জাতি হিসাবে বাঙালীর প্রথম আত্মপ্রকাশ। সেবারে তাহার যাহা কিছু কীর্ত্তি, তাহা নিজের সমাজে, নিজের জাতীয় জীবনে প্রায় সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর যে জাগরণ তাহা বৃহত্তর ক্ষেত্রে ঘটিয়াছিল; তাহার প্রধান কারণ, ইংরেজের এক-শাসনের ফলে সমগ্র ভারতে একটা সহানুভূতির সুযোগ। নবযুগের প্রভাব বাঙালীর জাতিগত সংস্কার ও স্বভাবের পক্ষে যেরূপ আশু ফলপ্রদ হইয়াছিল, এমন আর কোথাও হইতে পারে নাই। বাঙালীর প্রকৃতিতে, রক্ষণশীলতা ও বন্ধনবিমুখতা—পুরাতনের সেন্টিমেণ্ট ও নবতনের ভাবাকুলতা, দুইই এমন প্রবল যে, বাঙালীই সেই গুরুতর যুগসঙ্কটে—এক দিকে যেমন পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, অপর দিকে তেমনই ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ, উভয়ের সমন্বয় করিয়া—শুধু বাংলার নয়, ভারতের সংস্কৃতিকেও পুনরুদ্ধার করিয়াছিল। ভারতের ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের সন্ধানে সে যেমন ইংরেজ পণ্ডিতের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিল, তেমনই ভারতীয় সাহিত্য ও ভারতীয় সংস্কৃতিকে—ভারতীয় চিন্তার বিশিষ্ট ধারাটিকে—নিজের অসাধারণ ধীশক্তি ও রস-দৃষ্টির দ্বারা সে-ই পুনরুজ্জীবিত করিয়াছে; সে কালের নব্য বাংলা সাহিত্যে ও কাব্যেই শুধু নয়—হিন্দু শাস্ত্র ও হিন্দু দর্শনের বহুতর চর্চ্চায় ইহার প্রভূত প্রমাণ আছে। এমন কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় অন্য কোন জাতির মধ্যে নবজীবনের এমন সাড়া আর কোথাও জাগে নাই—সেই মহাদেশব্যাপী তামসিক অজ্ঞানতার মধ্যে জ্ঞানের যা-কিছু আলোক এই বাংলা দেশেই জ্বলিয়াছিল। রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত যে প্রতিভা-পরম্পরার উদয় হইয়াছিল তাহাতে মনে হয়, যেন ঐ কালে, এই দেশে, একের পর এক, দেবগণের আবির্ভাব হইতেছিল—বাঙালী জাতির এ হেন ভাগ্যোদয় ইতিপূর্ব্বে আর হয় নাই। তথাপি এ কথাও বিস্মৃত হইতে পারি না যে, বাঙালীর সেই অভ্যুদয়ে ভারতেরও গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছিল—উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস ঐ শতাব্দীর ভারতেরও ইতিহাস বটে। ইহা বাঙালীর অন্ধ স্বজাতিপ্রীতির মিথ্যা গর্ব্ব নহে, ইহাই ঐতিহাসিক সত্য। প্রাচীন হিন্দুর অবজ্ঞাত এই অনার্য্য-অধ্যুষিত দেশেই—আর্য্য-ভারতের এই প্রত্যন্ত প্রদেশেই, নানা জাতির সংমিশ্রণে এমন এক জাতির উদ্ভব হইয়াছিল; প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসের যত-কিছু ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রবিপ্লবের তরঙ্গস্রোত উত্তর-পশ্চিম হইতে এই পূর্ব্বতটে প্রহত হইয়া, এই শান্তিপ্রিয় ঘাতসহনশীল জাতির বহির্জীবন প্রায় অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, শুক্তির অভ্যন্তরে মুক্তার মত, এমন একটি বিশিষ্ট ভাব-প্রকৃতিকে পুষ্ট করিয়াছিল যে, তাহারই

কালোচিত উন্মোচনে ও প্রস্ফুটনে সারা ভারতের সুপ্তিভঙ্গ হইয়াছিল। আজিও বাংলা সাহিত্যই ভারতের জাতীয় ভাবধারার উৎসস্থল; বাংলা ভাষাই সংস্কৃতের সকল সৌন্দর্য্য আপন অঙ্গে ধারণ করিয়া ব্যাস-বাল্মীকি, কালিদাস-ভবভূতির বাগ্-বৈভবকে নবজীবন দান করিয়াছে; ভারতীয় সাধনার বহুযুগের সেই বহুমুখী ধারাকেও এতকাল পরে এক অবতারকল্প বাঙালী মহাপুরুষই সাগর-সঙ্গমে মিলাইয়া দিয়া সারা ভারতের আধ্যাত্মিক ঐক্য স্থাপন করিয়াছেন। বাঙালী মহাকবিই খাঁটি ভারতীয় ভাবকল্পনাকে আধুনিক কাব্যকলায় প্রতিফলিত করিয়া, বিশ্বসাহিত্যে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছেন। অতএব বাংলার নবযুগ শুধুই বাংলার নয়, ভারতেরও বটে।

সর্ব্বশেষে, এই আলোচনা-প্রসঙ্গে আমার কিছু কৈফিয়ৎ আছে—পাঠক-পাঠিকাগণের নিকটে তাহাই আমার বিদায়-বাণী। এই দীর্ঘ ও দুরূহ চিন্তাকার্য্যে আমার মুখ্য অভিপ্রায় ছিল—বাঙালীর আত্মপরিচয়-সাধন। সে অভিপ্রায় কতখানি সিদ্ধ হইয়াছে, জানি না; এই একাকার অন্ধকারে আমি যদি সেই চেতনা এতটুকুও উদ্রেক করিয়া থাকিতে পারি, তবে আমার এই অসাধ্য-সাধনের চেষ্টা সফল হইয়াছে মনে করিব, আমার সাহিত্যিক জীবনও ধন্য হইবে। আজিকার এই অতি-উদার কালচার-বাদ ও বিশ্বমানবীয় ভাববিলাসের দিনে, আমি আমার স্বজাতির ভাবনাই বিশেষ করিয়া ভাবিয়াছি, এবং তাহার গৌরব-প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হইয়াছি, সেজন্য আমি কিছুমাত্র লজ্জিত নই; অতিশয় বর্ত্তমানে নূতন করিয়া যে 'অখণ্ড ভারতে'র ধূয়া উঠিয়াছে, তাহার ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা যেমনই হোক, তাহা যে পারমার্থিক সত্য নয়, তাহা আমি জানি ও বিশ্বাস করি। ভারতবর্ষ য়ুরোপের মতই একটি ভূখণ্ড, তাহাতে নানা জাতির বাস, এই সকল জাতি কখনও এক জাতিতে পরিণত হয় নাই। একদা ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিগত একটা ঐক্য-বন্ধন ছিল, অপর সকল বিষয়ে একটা পার্থক্য চিরদিন আছে ও থাকিবে। 'অখণ্ড ভারত' বলিতে যে পারমার্থিক ঐক্য বুঝায়—ভারতীয় প্রকৃতির যে আধ্যাত্মিক সমভাব বুঝায়, আজিকার 'অখণ্ড ভারত' তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। যে যুগে, রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক স্বার্থরক্ষা প্রত্যেক জাতিকে অতিমাত্রায় আত্ম-সচেতন করিয়া তুলিতেছে, সেই যুগে ধর্ম্ম বা সংস্কৃতির বন্ধন কখনও দৃঢ় হইতে পারে না; স্বার্থেরই মিলন ঘটাইবার জন্য যে অখণ্ডতার দাবি করা হইতেছে, তাহাতে সেই একাত্মীয়তা সম্ভব নয় যাহাতে সর্ব্বপ্রকার পলিটিক্স্ বর্জ্জন করিতে হয়। সারা ভারতকে যদি এক দেশ ও এক জাতি বলিয়া গণ্য করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে য়ুরোপও অখণ্ড য়ুরোপ হইতে পারিত—শুধুই য়ুরোপ কেন, সারা পৃথিবীই মানব-মহাদেশে পরিণত হইত। তাহা যে কখনও হইবে, সে বিশ্বাস আমার নাই। মানুষ যুগে যুগে অতিশয় রোচক মিথ্যার স্বপ্ন দেখিয়াছে; অনেক মহাপুরুষ—কবি ও ভাবুক, ঋষি ও প্রফেট—

পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপনের আশায় বহু উপদেশ ও আশ্বাস দিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সেই সকল মহাপুরুষের আত্মাও প্রকৃতিকে জয় করিতে পারে নাই। জয় করিবার প্রয়োজনও নাই; পুরুষই উন্মাদ, প্রকৃতি অতিশয় সুগৃহিণী, তাহার গৃহস্থালীতে কোন হিসাব-ভুল নাই। স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যই সৃষ্টির নিয়ম, এবং শক্তিই বিশ্বের শাসয়িত্রী। সকল বৈষম্য ও ভেদ-প্রভেদের মধ্য দিয়াই শক্তির বিকাশ—এই বিকাশই জীবন; সৃষ্টির মূল তত্ত্ব ইহাই, তাহা সর্ব্ববিধ একাকারের বিরোধী। তাই 'সাম্য' একটা উন্মাদবিজৃম্ভিত কল্পনা মাত্র—শক্তিহীন দুর্ব্বলের মস্তিষ্ক-বিকার। আজই পৃথিবীতে এই তত্ত্বের একটা চূড়ান্ত পরীক্ষা চলিতেছে, তাহাতে মানুষের মস্তিষ্কজাত যত-কিছু লূতাতন্তু মহাকালের সম্মার্জনীমুখে নিমেষে অন্তর্হিত হইবে—সেই 'শক্তি'ই দেশ ও জাতির গণ্ডির মধ্যে আপনার লীলা আরও অপ্রতিহত করিয়া তুলিবে, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ এখনই পাওয়া যাইতেছে। অতএব জাতীয়তা বা জাতিধর্ম্মকে পরিহাস করিলে যমে ছাড়িবে না। প্রত্যেক জাতিকেই তাহার জীবনধর্ম্ম শক্তিসহকারে পালন করিতে হইবে—ইহাই সৃষ্টির নিয়ম, প্রকৃতির নিয়ম। বাঙালীকেও যদি বাঁচিতে হয় তবে তাহাকে বাঙালী হইয়াই বাঁচিতে হইবে; আপনি বাঁচিলে তবে সে পরকেও বাঁচাইতে পারিবে; নতুবা অপরের দ্বারা কবলিত হইয়া সে যে মহামুক্তি লাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 'অখণ্ড ভারত' নামে মাটির উপরে, মানচিত্রে, কোন দেশ নাই; ভারতীয় সংস্কৃতি বলিতে যাহা বুঝায় তাহাকে আত্মসাৎ করিয়া পুনঃসৃষ্টি করিবার শক্তি যে বাঙালীর আছে, তাহার প্রমাণ সে ভালরূপেই দিয়াছে; সেই অখণ্ড ভারতকে সৃষ্টি করিতে হইলে, পরানুচীকির্ষা ত্যাগ করিয়া তাহার নিজেরই অন্তরের দীপশিখাটিকে সযত্নে লালন ও বর্দ্ধন করিতে হইবে। এমন কথা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না যে, ভারতীয় সংস্কৃতিকে বাঁচাইবার—সেই অখণ্ড ভারতকে উদ্ধার করিবার প্রতিভাশক্তি বাঙালীরই আছে; বাঙালী ঘুমাইলে সেই ভারতের সকলেই ঘুমাইবে, তাই, বাঙালী সাধকের উদ্দেশে, কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়—

স্থির থাক তুমি, থাক তুমি জাগি'
প্রদীপের মত আলস তেয়াগি',
এ নিশীথ মাঝে তুমি ঘুমাইলে
ফিরিয়া যাইবে তারা।

সমাপ্ত

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

সংবাদ-সাহিত্য

মন্থনের পরিমাণভেদে একই সমুদ্র-মন্থনে অমৃত ও হলাহলের উৎপত্তি হয়। আমাদের দেশের প্রাচীন পুরাণ-কাহিনীর এই ইঙ্গিত সাহিত্য-রূপ সমুদ্রের পক্ষেও সত্য। ভারতবর্ষের বক্ষে সাহিত্য-সমুদ্র হইতে মন্থিত এই হলাহলের সিঞ্চন আমরা আমাদের জ্ঞানেই একাধিক বার দেখিলাম। দূর অতীত কালের হলওয়েল মেকলে প্রভৃতির উল্লেখ করিতেছি না। জোনস্-কোলব্রুক-উইলসন-মূয়র প্রভৃতি অমৃতসন্ধীর পূর্বে হলওয়েল আসিয়াছিলেন, মেকলে সমসাময়িক অবজ্ঞায় ইহাদিগকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর গত শতাব্দী কালের মধ্যে ম্যাক্সমূলার, মনিয়র উইলিয়ামস, ম্যাকডোনাল্ড, ওয়েবার, বুরনফ, বারনেট, হিউম, হিল, উইণ্টারনিৎস, ইয়োলি, ডেভিডস (স্বামী-স্ত্রী), কীথ, ডয়সেন, মূয়রহেড, ইয়াকোবি, ডেভিস, ওল্ডেন-বার্গ, ম্যাকক্রিণ্ডল, পারজিটার, হগ, রোয়ের, রথ, ম্যাকডোনেল, অ্যাভালন, কানিংহাম, র‍্যাপসন, স্মিথ, ডুরাণ্ট, সাণ্ডারল্যাণ্ড, আর্নল্ড, সণ্ডার্স, ফারকোহার, রসন, শ্রীমতী অ্যাডাম্‌স বেক প্রভৃতি পণ্ডিতেরা শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি এবং কেহ কেহ অবজ্ঞাভরেও ভারত-সমুদ্র হইতে অমৃত মন্থন করিয়া সমস্ত পৃথিবীতে বণ্টন করিয়াছেন। সর্বসমর্পিতা সিস্টার নিবেদিতা ও অ্যানি বেসাণ্টের কথা না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু তৎসত্ত্বেও খলেদের গরলবর্ষণ ক্ষান্ত হয় নাই। মিস মেয়োর 'মাদার ইণ্ডিয়া', 'ভল্যুম টু' ও 'স্লেভস অব দি গডস', পার্সি ডামবেলের 'লয়াল ইণ্ডিয়া', আর্থার ডানকানের 'ইণ্ডিয়া ইন ক্রাইসিস', ইলিয়ানর এফ. র‍্যাথবোনের 'চাইল্ড্ ম্যারেজ', তিন খণ্ডে প্রকাশিত আর. কুপল্যাণ্ডের 'দি কনস্টিটিউশ্যনাল প্রবলেম ইন ইণ্ডিয়া', ইলস্লি ইনগ্রামের 'ইণ্ডিভিজেল ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি পুস্তকেই এই ঘৃণিত বিষবর্ষণ শেষ হয় নাই। ভারতবর্ষকে বিষদিগ্ধ করায় যাহাদের স্বার্থ আছে, তাহারা এই ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দেও বিভারলি নিকল্‌সের মত একজন পথভ্রষ্ট সাহিত্যিককে ক্রয় করিয়া 'ভার্ডিক্ট অন ইণ্ডিয়া' প্রচার করিয়াছে। সেই কারণেই "গ্রন্থকারের ভূমিকা"য় নিকল্‌সকে বলিতে হইয়াছে—"দুই কারণে এই ভূমিকা লিখিতেছি। প্রথম, এই সত্যের উপর জোর দিবার জন্য যে 'ভার্ডিক্ট অন ইণ্ডিয়া' সম্পূর্ণই আমার কীর্তি। ইহা ব্রিটিশ প্রপাগাণ্ডা বা প্রচার নহে, অফিসিয়াল দৃষ্টিভঙ্গী যাহাই হউক, ইহা তাহা নয়, ইণ্ডিয়া অফিস কর্তৃক ইহা উদ্বুদ্ধ হয় নাই। মিঃ আমেরির সহিত আমার কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই; আমি তাঁহাকে দেখি নাই, শুনি নাই; তাঁহার সহিত পত্রালাপ পর্যন্ত করি নাই—শুধু তিনি কেন তাঁহার সহিত তিন পুরুষে বা চার পুরুষে সংশ্লিষ্ট কাহারও সহিত আমার কোনও সম্পর্ক ঘটে নাই।" দ্বিতীয় কারণ—যে সকল ভারতীয়, বিশেষ করিয়া হিন্দু, বন্ধুর নিকট তিনি দয়া ও আতিথেয়তা পাইয়াছেন

তাঁহাদের কাছে ত্রুটিস্বীকার করার প্রয়োজন তিনি অনুভব করিয়াছেন, কারণ বইটি আপাদ-মস্তক হিন্দুধর্মের ও হিন্দুজাতির কদর্য মিথ্যা-কুৎসায় ভরিয়া দিতে তিনি বাধ্য হইয়াছেন।' ভারতবর্ষে তিনি হিন্দু বলিতে কি বুঝায় বুঝিতে পারেন নাই, হিন্দুধর্মে কয়েকটি বীভৎস কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই খুঁজিয়া পান নাই। দুইটিমাত্র উল্লেখযোগ্য মানুষ দেখিয়াছেন—মহম্মদ আলি জিন্না ও ডক্টর আম্বেদকর এম. এ. (লণ্ডন)। এই পুস্তকে প্রচারিত মিথ্যা ও কটু ভাষণের যথাযথ জবাব উপরে উল্লিখিত পণ্ডিতগণের বিবিধ রচনায় ওতপ্রোত হইয়া আছে, আমাদের পক্ষে সে চেষ্টা করা অনাবশ্যক। সাহিত্যিকেরা ধর্মভ্রষ্ট হইলে কতখানি ঘৃণিত হইয়া উঠিতে পারে, তাহারই দৃষ্টান্ত দিবার জন্য এই পুস্তক ও তাহার লেখকের উল্লেখ করিলাম।

* * *

সুখের বিষয়, বিপরীত দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। যে সকল মহামনীষী হৃদয়ের উদারতা ও যথার্থ ধর্মবুদ্ধির বশে ভারতসমুদ্রের আপাত-অবাঞ্ছিত আবর্জনা সরাইয়া অমৃতের সন্ধান পাইয়াছেন এবং সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে পারিয়াছেন, হানাহানি ও হত্যা ক্লিষ্ট পৃথিবীর মুক্তি এইখানে, তাঁহাদেরই একজনের প্রতি বিভারলি নিকল্‌স তাঁহার পুস্তকের ৫৯ পৃষ্ঠায় (ভারতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৪৪) কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন :—

There are millions of amiable, loose-thinking men and women in the West who glibly accept the idea of the 'Universality of Religion', who choose to regard all religions as merely different aspects of the same Great Truth. Romain Rolland, for instance, spent the greater part of his life trying to propagate this theme. To these people, Hinduism and Christianity are merely 'rays of light that sparkle from the facets of a single diamond'; or they are 'drops from the same clear water of the Universal Ocean.' There is an almost inexhaustible stock of cheap metaphors at the disposal of the 'Universal Religionist.'

বিভারলি নিকল্‌সের পাপ-লেখনীতে মনস্বী রলাঁর প্রতি এই হীন কটাক্ষ মোটেই বেমানান হয় নাই; দুইজনেই সাহিত্যিক হইলেও সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। একজন বিকৃত-রুচি, দেহে ও মনে পীড়িত অসুস্থ—তাঁহার দেহ যেমন স্ট্রেচার-শায়িত অবস্থায় ভারতবর্ষের স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হইয়াছে, মনও তেমনই স্ট্রেচার ছাড়িয়া আয়োডিন-আয়োডোফর্মের আবহাওয়ার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই। অন্যজন সুস্থ সবল সম্পূর্ণ মানুষ, প্রবল মননশক্তিবলে সমস্ত পৃথিবীকে, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে তিনি হৃদয়ে অনুভব ও ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন, সাহিত্য ও ধর্মের মূলতত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাই তিনি এক দিকে যেমন মিলে, মিকেলেঞ্জেলো, বীঠোফেন, হ্যাণ্ডেল,

টলষ্টয় প্রভৃতি পাশ্চাত্য শিল্পী, সুরকার ও সাহিত্যিকের অন্তর্জীবনের দ্বন্দ্বের সন্ধান দিতে পারিয়াছিলেন, অন্য দিকে তেমনই রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি প্রাচ্য সাধক ও কর্মবীরের জীবনের মূল তত্ত্বটি আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহার জন্য তাঁহাকে মেয়ো-নিকল্‌সনের মত ভারতবর্ষে আসিতেও হয় নাই, ভারতবর্ষের কোনও ভাষা, এমন কি ইংরেজী ভাষাও, আয়ত্ত করিতে হয় নাই, তাঁহার আত্মিক ব্যাকুলতা ও সত্য সাহিত্যবুদ্ধিই তাঁহাকে পথ দেখাইয়াছে। গত ২রা জানুয়ারি তারিখে ভারতবর্ষের সকল সংবাদপত্রে পৃথিবীর এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও মনীষী রোমাঁ্যা রলাঁর মৃত্যু-সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের পর আর কাহারও মৃত্যুতে পৃথিবী এতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই।

* * *

রলাঁর জীবনী, সাহিত্য ও অন্যবিধ কর্মসংক্রান্ত আলোচনার স্থান ইহা নহে। সঙ্গীত হইতে সাহিত্যে তাঁহার উত্তরণ, সঙ্গীতের ইতিহাস বিষয়ে তাঁহার অধ্যাপনা এবং ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে শেষ জীবন পর্যন্ত তাঁহার সর্ববিধ সাহিত্যসাধনার ইতিহাস তাঁহার জীবনীগুলিতেই মিলিবে। তাঁহার সম্বন্ধে এক ফরাসী ভাষাতেই একুশখানি বই লিখিত হইয়াছে। জার্মান ইংরেজী প্রভৃতি অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষাতেও কম পক্ষে বারোখানি পুস্তক আছে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দেরই এই হিসাব। সুবিখ্যাত অষ্ট্রিয়ান সমালোচক ও নাট্যকার Stefan Zweigএর বইখানি ইংরেজীতে Eden and Cedar Paul কর্তৃক অনূদিত হইয়া ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ অ্যালেন অ্যাণ্ড আনউইন লিমিটেড হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। বইটির নাম 'Romain Rolland : the Man and his Work'। রলাঁর সমধর্মী এবং প্রায়-সমকক্ষ একজন সাহিত্যিকের রচনা বলিয়া বইখানিতে তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ও মর্মকথার সন্ধান পাওয়া যায়। ইহা হইতেই আমরা জানিতে পারি, তিনি ষোলখানি প্রবন্ধ ও জীবনী পুস্তক, পাঁচখানি রাজনীতি-বিষয়ক গ্রন্থ, পাঁচখানি উপন্যাস, বারোখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন এবং ছয়খানি পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়াছিলেন; ইংরেজী, জার্মান, স্প্যানিশ, ইটালীয়ান, রাশিয়ান, ডেনিশ, চেক, পোলিশ, সোয়েডিশ, ডাচ, জাপানীজ ও গ্রীক—এই বারো ভাষায় তাঁহার পুস্তকের অনুবাদ তখন পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার রচনার মধ্যে 'Jean-Christophe' (১০ খণ্ড) ও 'L'Ame Enchantee' (The life Enchanted) (৭ খণ্ড) নামক দুইখানি উপন্যাসই সমধিক প্রসিদ্ধ। 'জন ক্রিষ্টোফারে'র জন্য ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের সাহিত্যবিষয়ক নোবেল পুরস্কার তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার দুইখানি যুদ্ধবিরোধী বই গত ইউরোপীয় যুদ্ধের মধ্যে ও পরে সমস্ত ইউরোপে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। বই দুইখানির নাম 'Au-dessus de la melee'

(Above the battle ১৯১৫) ও Les precurseurs (The Forerunners ১৯১৯)। পরবর্তীকালে তাঁহার সমস্ত নিন্দা ও খ্যাতি এই বই দুইটিতে প্রচারিত মতবাদকে কেন্দ্র করিয়াই। এই মতবাদের জন্য তাঁহাকে কম নিগ্রহও ভোগ করিতে হয় নাই। বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক Charles Baudouin রলাঁর জীবনবাদ সম্বন্ধে চমৎকার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। জেনেভা হইতে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার 'Romain Rolland calomnie' পুস্তকখানিও বিশেষ প্রসিদ্ধ। গত ৪ঠা জানুয়ারি তারিখের 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকায় "The Late Romain Rolland" প্রবন্ধে সর্বপ্রথম, একটি চমকপ্রদ সংবাদ পাওয়া গেল যে, তিনি "married a Russian, the widowed Princess Kudatcheff, and in 1935 visited Moscow"; কিন্তু 'ষ্টেট্‌সম্যানে'র এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অন্যান্য ভুলের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া এ বিষয়েও সন্দেহ জাগে।

* * *

বিভারলি নিকল্‌সের মত আত্মবিস্মৃত সাহিত্যিকেরা যে হলাহল উদ্‌গার করেন, পৃথিবীর কল্যাণকামী শিবধর্মী রোমাঁ রলাঁরা সেই হলাহল পান করিয়া অমৃতের প্রাধান্য বজায় রাখেন। যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রথমোক্তদের এত ঘৃণা, এত অপযশ, সেই ভারতবর্ষেই শেষোক্তদের চরম আশা ও আশ্বাস। Charles Baudouin হেগ হইতে প্রকাশিত 'দি ওয়ার্ড' পত্রিকায় ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ও ১১ই অক্টোবর তারিখের, সংখ্যায় "রোমাঁ রলাঁ" নামক যে প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে আছে—

"আমাদের এই যুগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, যুদ্ধ সত্ত্বেও, না, যুদ্ধের জন্যই একটি বিশ্বব্যাপী সংস্কৃতির উদ্ভব হইতেছে। কিন্তু এই বিশ্বসংস্কৃতি যে ইউরোপীয় সভ্যতারই পরিণতি হইবে তাহা নহে। ইউরোপীয় সভ্যতা সম্ভবত ধ্বংসোন্মুখী। এই বিশ্বসংস্কৃতি "কালচক্রের আবর্তনে হয়তো এশিয়ার চিন্তাধারায় প্রত্যাবর্তন করিবে।" রোমাঁ রলাঁ যিনি এতদিন পর্যন্ত একজন "ভদ্র ইউরোপীয়" মাত্র ছিলেন, তাঁহার দৃষ্টিচক্রবাল প্রশস্ততর করিতেছেন। তাঁহার *Aux peuples assassines** অর্থাৎ "নিহতদের প্রতি" নিবেদনে তিনি অতি তীব্রভাবে পীড়নলুব্ধ শোণিতপিপাসু ইউরোপের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহার দৃষ্টি—পূর্ববর্তীকালের টলষ্টয়ের দৃষ্টির মতই ব্যাকুলভাবে পূর্বমুখী হইয়াছে। তিনি কান পাতিয়া মহৎ হিন্দু রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর শুনিতেছেন।"

রবীন্দ্রনাথের সেই কণ্ঠস্বর কি, *Les precurseurs* হইতে রলাঁর ভাষাতেই শোনা যাক।

---

* 'The Forerunners' পুস্তকের "To the murdered peoples" প্রবন্ধ।

"১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ জুন তারিখে টোকিওর রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুচূড়ামণি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এইভাবে বলিয়াছিলেন—'ইউরোপের মাটি হইতে যে রাষ্ট্রীয় সভ্যতা জন্মলাভ করিয়া অতিশয় বাড়বিশিষ্ট আগাছার মত সমস্ত পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিতেছে, স্বাতন্ত্র্যই তাহার ভিত্তি। অপরকে (aliens) কাবু করিয়া রাখিতে অথবা সম্পূর্ণ ধ্বংস করিতে সর্বদা ইহার সতর্ক দৃষ্টি। ইহার প্রবৃত্তি রক্তলোলুপ এবং রাক্ষসধর্মী, অপর জাতির সঞ্চয় খাইয়া ইহা বাঁচিয়া থাকে এবং তাহাদের সমুদয় ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ গ্রাস করিতেই ইহার প্রয়াস। অন্য জাতি খ্যাতি অর্জন করিলে ইহারা ভয় পায় এবং তাহাকে সঙ্কট (peril) নামে অভিহিত করিয়া নিজেদের চতুঃসীমানার বাহিরে সকল মহত্ত্বের সম্ভাবনা-মাত্রকেও ইহারা বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করে, যে সকল জাতি দুর্বল, তাহাদিগকে গায়ের জোরে চিরদুর্বল করিয়া রাখে।...এই রাষ্ট্রিক সভ্যতা বৈজ্ঞানিক হইতে পারে, কিন্তু মানবীয় নয়।...নিঃসংশয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় যে, এই অবস্থা আর চলিবে না।...'*

"এই অবস্থা আর চলিবে না"—হে ইউরোপীয়গণ শুনিতেছ? তোমরা কি শ্রবণদ্বার রুদ্ধ করিয়া আছ? অন্তরের বাণী শ্রবণ কর। নিজেরাই নিজেদের প্রশ্ন কর। প্রতিবেশীর উপর পৃথিবীর সকল পাপের বোঝা চাপাইয়া যাহারা নিজেদের নির্দোষ কল্পনা করে, আমরা যেন তাহাদের মত না হই। যে অভিশাপের দ্বারা আজ আমরা জর্জরিত, আমাদের প্রত্যেককেই তাহার দায়িত্বের ভাগ বহন করিতে হইবে।...অধিকাংশ লোকই উদাসীন, ভালমানুষেরা শঙ্কিত, নির্জীব রাজন্যবর্গ স্বার্থপরায়ণ এবং সন্দিগ্ধ, খবরের কাগজওয়ালারা হয় অজ্ঞ, নয় সংশয়বাদী, লোভী ব্যবসায়ীরা সর্বগ্রাসী, যে সকল সর্বনাশা কুসংস্কার সমূলে উৎখাত করাই চিন্তাশীলদের ধর্ম, তাহা বজায় রাখিবার জন্যই তাঁহাদের অনিচ্ছাকৃত দাসত্ব, বুদ্ধিজীবীদের হৃদয়হীন অহঙ্কার, মানুষের প্রাণ অপেক্ষা নিজেদের মতের প্রতি তাঁহাদের সমাদর এবং সেই মত প্রমাণ করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণহরণে তাঁহাদের উদ্যোগ...আমাদের মধ্যে কে নির্দোষ? ছুরিকাহত ক্ষতবিক্ষত ইউরোপের রক্ত আমরা কি কেহ হাত হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারি?...আসল সত্য এই: ইউরোপ স্বাধীন নয়। জাতিসমূহের কণ্ঠ রুদ্ধ। পৃথিবীর ইতিহাসে আমাদের এই বর্তমানকাল চরম দাসত্বের কাল বলিয়া গণ্য হইবে। ইউরোপের একার্ধ স্বাধীনতার নামে অপরার্ধের সহিত লড়িতেছে, কিন্তু জিতিবার আগ্রহে দুই অর্ধই স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়াছে। সমস্ত জাতির ইচ্ছাশক্তির কাছে নিবেদন নিষ্ফল হইতেছে, কারণ কোনও জাতিই জাতিগতভাবে বাঁচিয়া নাই। মুষ্টিমেয় পলিটিশিয়ন, কয়েকগণ্ডা সংবাদপত্রসেবী

---

* রবীন্দ্রনাথের এই বক্তৃতাকে ("Nationalism in Japan"—*Nationalism*, Macmillan, London, 1917, p. 59-60)। রলাঁ "a turning point in the history of the world" বলিয়াছেন।

এ-জাতি ও-জাতির নামে কথা কহিবার স্পর্ধা প্রকাশ করিতেছে। সে অধিকার তাহাদের নাই।...

Unhappy peoples! Is it possible to imagine a more tragical destiny than theirs? Never consulted, always immolated, thrust into war, forced into crimes which they have never wished to commit. Any chance adventurer or braggart arrogantly claims the right to cloak with the name of the people the follies of his murderous rhetoric or the sordid interests he wishes to satisfy. The masses are everlastingly duped, everlastingly martyred; they pay for others' misdeeds. Above their heads are exchanged challenges for causes of which they know nothing and for stakes which are of no interest to them. Across their backs, bleeding and bowed, takes place the struggle of ideas and of millions, while they themselves have no more share in the former than in the latter. For their part, they do not hate. They are the sacrifice. Peoples poisoned by lies, by the press, by alcohol, and by harlots."

স্বার্থপ্রণোদিত ভাঁওতায় যাঁহারা সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়া সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করেন, রুশ সম্পর্ক সত্ত্বেও রলাঁর কথাগুলি তাঁহাদের ভাল লাগিবে না। বিভারলি নিকল্‌সের মত সাহিত্যিকের কর্তব্য উঁহারাও একই ভাবে পালন করিতেছেন। রলাঁ ভিন্নধর্মী ছিলেন।

* * *

"নিহতদের প্রতি" তাঁহার শেষ কথা—

"এই যুদ্ধের গতি আজ কে রুদ্ধ করিতে পারে? বন্য জানোয়ারকে পুনর্ধৃত করিয়া কে খাঁচায় পুরিতে পারে? যাহারা ইহাকে মুক্ত করিয়াছিল তাহারাও নহে। ইহারা জানে যে অনতিবিলম্বে তাহাদেরও ভক্ষিত হইবার পালা আসিবে। পেয়ালা রক্তে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ইহার শেষ বিন্দু পর্যন্ত পান করিতে হইবে। হে সভ্যতা, আরও খানিকটা মদের নেশায় বুঁদ হইয়া থাক—যখন তোমার তৃপ্তির চরম হইবে, কোটি মৃতদেহের উপর দিয়া শান্তির প্রবাহ যখন আবার ফিরিয়া আসিবে, ঘুমের মধ্যে তোমার মাতলামি যখন কাটিয়া যাইবে, তুমি কি তখন তোমার অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে? যে মিথ্যার দ্বারা তোমার দুর্দশাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছ, তাহা সরাইয়া ফেলিয়া নিজের অবস্থার কথা কি চিন্তা করিতে পারিবে? যাহা অজেয় এবং শাশ্বত, পচা মতবাদের খুনে আলিঙ্গন হইতে তাহাকে মুক্ত করিবার সাহস তোমার কবে হইবে'? মানুষ, মিলিত হও। সকল জাতির মানুষ, কম বেশি দোষে তোমরা দুষ্ট, সকলেই তোমরা রক্তাক্ত, সকলেই যন্ত্রণা-কবলিত। দুর্ভাগ্যের মধ্যে তোমাদের ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ় হউক, পরস্পরকে ক্ষমা করিয়া নবজন্ম লাভ কর। ঈর্ষা-বিদ্বেষ ভুলিয়া যাও—এগুলির দ্বারা চরম মৃত্যুর দিকে তোমরা সকলেই নীত হইতেছ। শোকের মধ্যে তোমরা এক হও, কারণ মৃত্যুর দ্বারা যে ক্ষতি, তাহা পৃথিবীর সমগ্র মানব-সমাজের ক্ষতি। বেদনার মধ্য দিয়া, লক্ষ লক্ষ ভ্রাতৃসম মানুষের মৃত্যুর মধ্য দিয়া তোমরা তোমাদের একত্ব

নিশ্চয়ই অনুভব করিয়াছ। এই মহাযুদ্ধের পরে তোমাদের এই একতা যেন মুষ্টিমের স্বার্থসন্ধীদের সকল প্রতিবন্ধক ভাঙিয়া ফেলিতে পারে, এই নির্লজ্জের দল সে প্রতিবন্ধক পুনরায় শক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিবে।

যদি এই পথ তোমরা না গ্রহণ কর, যুদ্ধের পরিণামে সকল জাতির মধ্যে সামাজিক মিলনের নব চেতনা যদি না জাগ্রত হয়, তবে চিন্তা-সম্রাজ্ঞী, মানুষের পথপ্রদর্শিকা হে ইউরোপ, বিদায়—তুমি তোমার পথ হারাইয়াছ। তুমি মৃতের সমাধিভূমিতে দাঁড়াইয়া নিষ্ফল পদক্ষেপ করিয়া চলিয়াছ। কবরখানাই তোমার উপযুক্ত স্থান। সেখানেই শয্যা প্রস্তুত কর। পৃথিবীর পথনির্দেশ অন্যে করিবে।"

যে যুদ্ধ লইয়া মনীষী রলাঁর এই আক্ষেপ তাঁহার জীবৎকালেই একুশ বৎসর যাইতে না যাইতেই তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর যুদ্ধে ইউরোপ লিপ্ত হইয়াছে। বিভারলি নিকল্‌সনের ইউরোপীয় সভ্যতা ও ব্রিটিশ-শাসনপ্রসূত ভারতনিন্দা যতই সুরচিত হউক, সেই সভ্যতা ও শাসনের মৃত্যুঘোষণা রলাঁ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের হতাশ হইবার কারণ নাই।

* * *

রলাঁর "Ara Pacis" নামক কবিতা হইতে—

আমরা সমুখে চলি শান্তপদে, নাহিক ব্যস্ততা,
সময় মোদের বন্ধু, আমরা শিকারী নহি তার—
মোর শান্তি রচে নীড় দিয়ে সেই সময়ের লতা
আমরা সমুখে চলি, নৃত্যচ্ছন্দে চলি অনিবার!

আমি যেন ঝিঁঝিঁপোকা মাঠে তুলি একটানা তান,
ঝড় উঠে, জল পড়ে, নামে বৃষ্টি অবিশ্রান্ত ধার—
ডুবে যায় আলগুলি, সেই সাথে ডোবে মোর গান
ঝড় যেই থামে আমি তুলি পুন সুরের ঝঙ্কার!

ধূমায়িত প্রাচীমুখে, ধরা যেথা হতেছে শ্মশান,
ছুটে অশ্বারোহী চারি, শুনিতেছি তাদের হুঙ্কার—
ভেদি অশ্বক্ষুরধ্বনি তুলি শির গাহি মোর গান
যত ক্ষুদ্র হই আমি—পরাজয় করি না স্বীকার।"

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের মর্মকথা এত অল্পে শেষ হইবার নহে। কারণ, ইহারই মধ্যে সাহিত্যের মর্মকথাটিও নিহিত আছে। রবীন্দ্রনাথের বাণী, রলাঁর বাণী এখনও পৃথিবীতে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় বলিয়া শক্তিমদমত্তদের করায়ত্ত এই পৃথিবী বাসের অযোগ্য হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতবর্ষকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন।

রলাঁ। তাঁহার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-গান্ধী জীবনীর মধ্য দিয়া বর্তমান ভারতকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার কাছে আমাদের ঋণ অপরিসীম। স্থানাভাবে আমরা তাঁহার কথা আরও শুনাইতে পারিলাম না। আগামী সংখ্যায় তাঁহার *L'Humanite* বা "মনের স্বাধীনতার ঘোষণা"টি প্রকাশ করিব। ইহার মধ্যেই তাঁহার জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দর্শন নিহিত আছে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জুন তিনি স্বরচিত এই ম্যানিফেষ্টো বা ঘোষণাটি প্রকাশ করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শত শত মনীষী এই ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন। ইহাকে বেদনাহত মানবাত্মার একমাত্র বাণী বলা যাইতে পারে।

* * *

শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগের চেষ্টায় 'প্রবাসী' পত্রিকা একদিন রোমাঁ্যা রলাঁর সহিত বাঙালী পাঠকের পরিচয় সাধন করাইয়াছিল। সেই 'প্রবাসী' পত্রিকা বর্তমান মাঘ সংখ্যায় মাত্র নয় পংক্তিতে রলাঁর প্রতি তাঁহাদের কর্তব্য সমাধা করিয়াছেন, তন্মধ্যে চারিটি পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"প্রবাসীর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। নানা বিষয়ে উভয়ের মধ্যে পত্রালাপও হইত। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্পৃক্ত রচনাবলী প্রকাশের জন্য তিনি সর্বপ্রথম তাঁহাকেই প্রেরণ করেন।"

এই চারিটি পংক্তির মূঢ়তা শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ সর্বাপেক্ষা অধিক বুঝিবেন। আমরা কোনও মন্তব্য করিব না।

* * *

আমরা মনস্বী রোমাঁ্যা রলাঁর একটি বিশেষ শ্রাদ্ধবাসরের সভাপতির অভিভাষণ নিম্নে প্রকাশ করিলাম। যাঁহাদের স্মরণে মানুষ শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থাতেও চিরন্তন আশার বাণী শুনিতে পায়, রলাঁ সেই শ্রেণীর মানুষ ছিলেন। এই অভিভাষণে সেই কথাটিই ফুটিয়া উঠিয়াছে।—

"মনীষী রলাঁর দেহান্তে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের জন্য আমরা আজ সমবেত হয়েছি, সকলেরই হৃদয় আজ ভারাক্রান্ত। কেন না বিশ্বজন আজ যে উন্মত্ত সংগ্রামে পরস্পরের কণ্ঠ আঁকড়ে ধরেছে, সেই মোহের অন্ধতম মুহূর্তে যাঁরা মানুষের একত্বের কথা ভোলেন না, দেশ এবং কালের অতীত মানবজাতির সমগ্রভাব রূপ যাঁদের দৃষ্টিতে অম্লান থাকে, রলাঁ ছিলেন সেই স্বল্পতম কবিশ্রেণীর মধ্যে একজন, তাঁর বাণী আজ নীরব হ'ল, সমগ্র মানবজাতির পক্ষে এই ঘটনাকে আমরা নিদারুণ দুর্ভাগ্য ব'লে গণনা করব।

অধ্যাপক মহাশয় রলাঁর সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে আমাদের একটি সুন্দর কথা শিখিয়েছেন। রলাঁ ছিলেন ঊর্ধ্ব সূর্যলোকের অধিবাসী, যাঁরা ধরণীতে অধ্যাত্ম জগতের রসসিঞ্চন ক'রে স্বর্গের পারিজাত ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন, তাঁদেরই একজন,

বেদে এঁদের সূরি বা কবি বলা হয়েছে। মানুষের সমাজকে এঁরাই যুগে যুগে সাধনার দ্বারা নূতন রূপ দিয়ে থাকেন।

কবিবন্ধু স্বীয় অভিভাষণে আমাদের আর একটি পরম সুন্দর কথা শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন, রলাঁর প্রতিভা গগনস্পর্শী হ'লেও তিনি প্রতিভাপুষ্টির যাবতীয় উপাদান এই মাটির ধরণী থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। রলাঁ ছিলেন যেন হিমালয়ের বক্ষ-আশ্রিত দেবদারুর মত। মাথা তার ঋজুভাবে উর্ধ্বলোকে প্রসারিত, সূর্যের অবিচ্ছিন্ন আত্মীয়তার স্পর্শে তার অন্তঃশক্তি যেন প্রস্ফুরিত হয়ে উঠেছে, কিন্তু মাটির ধরণী থেকেই তার অন্তরের সকল রসভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে—রলাঁর প্রকৃতি ছিল তেমনই। এঁদের মত কবি পৃথিবীর সঙ্গে মানসস্বর্গের যোগসূত্র সংস্থাপন করেন এবং সেই সেতু অবলম্বন ক'রে যুগে যুগে মানুষ নিজের অন্তরতীর্থে পরিভ্রমণ ক'রে অমৃতের আস্বাদন লাভ করে।

আরও একটি কথা কবি আমাদের বলেছেন, সেটিও বিশেষভাবে আমাদের প্রণিধানের যোগ্য, রলাঁর লেখার মধ্যে সাম্যবাদ এবং লেনিনের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধার নিদর্শন যথেষ্ট আছে। কেউ কেউ এর থেকে অনুমান করেছেন, রলাঁ রাজনৈতিক মতবাদে সাম্যবাদী দলের সমর্থক ছিলেন। সাম্যবাদের অন্তর্নিহিত সত্যকে, অর্থাৎ যেখানে নিপীড়িতের সঙ্গে সমত্ববোধে সাম্যবাদী দুঃখনিবৃত্তির সাধনায় আত্মোৎসর্গ করেন, তার সবটুকু রলাঁ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন সত্য, কিন্তু এ কথাও ভুললে চলবে না যে, তিনিই আবার গান্ধী ও শ্রীরামকৃষ্ণকে পরিপূর্ণ মর্যাদা দিয়েছেন। এই তিনজনকে সমসূত্রে গ্রথিত করা আনুষ্ঠানিক সাম্যবাদীর পক্ষে হয়তো কঠিন। বস্তুত রলাঁর লেখা থেকে কোন বিশেষ মতবাদের পোষকতা করার চেষ্টাকে আতস-কাচের ভিতর দিয়ে সূর্যকিরণকে বিকৃত ক'রে আগুন ধরানোর সঙ্গে তুলনা করা চলে। তাতে সূর্যকিরণের সমগ্রতাকে ক্ষুণ্ণই করা হয়। রলাঁ ছিলেন দলগত গণ্ডির উর্ধ্বে, যাঁরা স্বয়ং মহৎ এবং যাঁদের সকল মোহ অপগত হয়েছে।

বস্তুত রলাঁর মহিমা-কীর্তনে আমরা স্বয়ং মহিমান্বিত হয়ে উঠি, নিজেদের ধন্য মনে করি। ইনি তেমনই একজন মানুষ ছিলেন, রামায়ণে যাঁদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, তাঁরা যেখানে যান সেই স্থানই তীর্থে পরিণত হয়।

রলাঁর একটি পরিচয় হয়তো আপনাদের মধ্যে অজ্ঞাত নয়, তিনি সঙ্গীতশাস্ত্রের একজন পারদর্শী অধ্যাপক ছিলেন। লেখক হিসাবে তাঁর যেমন খ্যাতি ছিল, সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবেও তার থেকে কম ছিল না, তিনি বীঠোফেন প্রমুখ সঙ্গীতকর্তাদের জীবনী লিখে গেছেন। বীঠোফেন ইউরোপের শ্রেষ্ঠতম সঙ্গীত-রচয়িতা হ'লেও প্রকৃতি তাঁর প্রতি নিতান্ত নিষ্করুণ ছিলেন, তাঁর শ্রবণশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পায়। সেই অবস্থায়, পাখির গান,

শিশুর হাস্য, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কর্মস্রোতের কোলাহল যখন তাঁর কাছে নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে, তখন একদিন তিনি দারুণ ঝড়ের মধ্যে বজ্রনির্ঘোষ শ্রবণ করেন। উচ্ছ্বাস-ভরে সেই দুরন্ত দুর্যোগের মুহূর্তে তিনি ব'লে উঠেন, আমি শুনেছি, শুনেছি। প্রকৃতির মহান বিপ্লবের যে বার্তা সকল অন্তরায় অতিক্রম ক'রেও তাঁর শ্রুতিগোচর হ'ল, এক অপূর্ব সঙ্গীতে তিনি তাকে রূপ দিলেন।

রলাঁ এমনই একজন লোককে স্বীয় বন্দনা জ্ঞাপন করলেন, যাঁর আত্মার দুর্জয়-শক্তির কাছে প্রকৃতির সকল বাধা-বন্ধন পরাস্ত হয়েছিল।

রলাঁ তীর্থযাত্রীর মত মানবলোকের যুগ-যুগান্তে পরিভ্রমণ করেছিলেন। যেখানেই তিনি মানুষের অন্তরে অপরাজেয় শক্তির আবির্ভাব দেখেছিলেন, সেখানেই তাকে স্বীয় কবিপ্রতিভার দ্বারা অভিনন্দনে মণ্ডিত করেছিলেন। যুগে যুগে মানুষের মধ্যে যে অক্ষয় শক্তি ঘনীভূত হয়ে উঠে, শ্রীরামকৃষ্ণ, গান্ধীজী এবং শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে সেই শক্তির বিকাশ দেখতে পেয়ে দেশ ও ভাষার সকল বাধা অতিক্রম ক'রে রলাঁ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছিলেন। রলাঁর লেখা শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবনীতে ইতিহাসের গণ্ডির অতীত ভারতীয় সাধনার যে মূর্তি আমরা চিত্রিত দেখি, তার তুলনা কদাচিৎ পাওয়া যায়। এমনই ভাবে সেখানে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু বিভূতিযুক্ত তাকে যেমন তিনি বন্দনা করেছেন, তেমনই সকল অসুন্দরকে আঘাত করতে পশ্চাৎপদ হন নি।

ফ্রান্স যখন ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধে মেতে উঠল, তখন হিংসায় উন্মত্ত সেই জনতাকে রলাঁ এই ব'লে সাবধান করেছিলেন, "ভুলো না জার্মানরাও তোমার ভাই। গেটের জার্মানি, বীঠোফেনের জার্মানিকে অবহেলায় কলুষিত ক'রো না।" এর ফলে রলাঁ স্বদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু স্বজনপ্রদত্ত এই বিরহকে তিনি রক্ততিলকের মত আপন ললাটে ধারণ করেছিলেন। বর্তমান যুদ্ধের পূর্বেও ফাসিজ্‌মের উত্থানের ঘাতপ্রাতঘাতে যখন ইউরোপের আকাশ বিদ্বেষের দাবানলে ধূমায়িত হয়ে উঠছে, তখনও তিনি মানুষের মনকে বন্ধুত্বের এবং ভ্রাতৃত্ববোধের মন্ত্রে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর চেষ্টা ক্ষণিকের জন্য হয়তো পরাস্ত হয়েছে সত্য, কিন্তু রণক্লান্ত ধরণী আবার এমনই মানুষের অমৃতবাণীর জন্য তৃষ্ণাকাতর হয়ে উঠবে, কেন না প্রেম ভিন্ন অমৃতত্বের আর কোন পথ নেই। রলাঁর শিষ্যস্থানীয় যাঁরা, তাঁদের ক্ষয় নেই। তাঁদের জীবনের ভিতর দিয়েই হয়তো তাঁর অমোঘ বাণী সফলতা লাভ করবে। এমনই একজনের কথা আপনাদের কাছে জ্ঞাপন করি। রলাঁর প্রতিভার রশ্মিতে আকৃষ্ট হয়ে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন প্রতিভাশালিনী মহিলা ছিলেন। তিনি অভিজাত সমাজে গুণপনার জন্য যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর চিত্ত চারিদিকের দুঃখদুর্দশার ভারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। রলাঁকে তিনি অনুরোধ করেন,

এমন একজন লোকের সঙ্গ আমার চাই, যাঁর সাহচর্যে আমার সমগ্র জীবন সার্থকতায় মণ্ডিত হয়ে উঠবে এবং আমি নবজীবন লাভ করব। রলাঁ গান্ধীজীর কথা বলেন এবং মহিলাটি তখন ভারততীর্থের অভিমুখে যাত্রা করেন। আপনারা অনেকে তাঁর নাম ও ইতিহাস হয়তো জানেন। তাঁর নাম ছিল মডলিন স্লেড, মীরাবেন। আজ মীরাবেন ভারতের দরিদ্রতম অধিবাসীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে নূতন জন্ম ও নূতন জীবন লাভ করেছেন। ভারততীর্থের প্রতি রলাঁর নিবেদিত নির্মাল্যের মত তিনি বিরাজ করছেন।

রলাঁ এমনই ভাবে মানুষের জাতি, দেশ এবং কালের গণ্ডি অতিক্রম ক'রে চিরদিন সুন্দরের উপাসনায় রত ছিলেন। সূর্যলোকের রশ্মি তাঁর ভিতর দিয়ে ধরার মানুষের শীর্ষে আশীর্বাদের মত অবতীর্ণ হ'ত।"

—

বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিবার এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে বাঙালী মনের অন্ধকার দূর করিবার জন্য বাংলা দেশের এই ঘোরতর দুর্দিনেও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ও প্রকাশ-কার্যালয় বিশেষ চেষ্টিত হইয়াছেন। কয়েকজন লেখক ব্যক্তিগতভাবেও এই চেষ্টায় যোগ দিয়াছেন। তাঁহাদের প্রকাশিত পুস্তকগুলির যথাযোগ্য মর্যাদা দিবার স্থান আমরা কিছুতেই সঙ্কুলান করিতে পারিতেছি না। ফলে মাসের পর মাস চলিয়া যাইতেছে, অনিচ্ছাকৃত বাজেয়াপ্তি-অপরাধের বোঝা মনের উপর ভারী হইয়া বসিতেছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, মিত্র ও ঘোষ ও মিত্রালয়, বেঙ্গল পাবলিশার্স, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড ব্রাদার্স ও সেঞ্চুরী পাবলিশার্স, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোঃ লিঃ ও ঈষ্টার্ন পাবলিশার্স সিণ্ডিকেট লিঃ, দি বুক এম্পরিয়ম লিঃ, জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স লিঃ, সিগনেট প্রেস, সুশীল গুপ্ত, ইউ. এন. ধর এণ্ড সন্স লিঃ, কমলা বুক ডিপো লিঃ—ইংরেজী বাংলা উপন্যাস প্রবন্ধ বহুবিধ উপাদেয় পুস্তক অত্যল্প কালের মধ্যে প্রকাশ করিয়া আশ্চর্য নিষ্ঠা ও তৎপরতার পরিচয় দিয়াছেন। অনেক লেখক ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাদের পুস্তক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে প্রকাশ করিয়াছেন। এগুলির মধ্যে বিশেষ আলোচনার যোগ্য বই অনেক আছে, যেমন, শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীমতী রাণী চন্দের 'জোড়াসাঁকোর ধারে' (বিশ্বভারতী), শ্রীঅরবিন্দ মন্দির দশমবর্তিকা (শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির), রামমোহন-গ্রন্থাবলী ৩য় খণ্ড সহমরণ, বাংলা পুথির বিবরণ ১ম ভাগ—চিন্তাহরণ চক্রবর্তি, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যোগেশচন্দ্র বাগল, (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ), রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা ১ম ও ২য় খণ্ড নীহাররঞ্জন রায়, 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ' নরেন্দ্রনাথ সিংহ (দি বুক এম্পরিয়ম লিঃ), ইউরোপ, ১৯৩৮ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'The National flag and other Essays—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, Off the Main Track সুরেন্দ্রনাথ সেন (মিত্র ও ঘোষ ও মিত্রালয়), History of India

নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ ও অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, Annexation of Burma অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালা কাব্য সাহিত্যের কথা কণক বন্দ্যোপাধ্যায় (এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড ব্রাদার্স), Famines in Bengal 1770-1943 কালীচরণ ঘোষ, Economic Resources of India কালীচরণ ঘোষ (ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ) Capital কার্লমার্ক্স, Fundamental Problems of Marxism প্লেখানভ, সৃষ্টি ও সভ্যতা অরুণচন্দ্র গুহ (সরস্বতী লাইব্রেরি), শ্রীঅরবিন্দ সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (রামেশ্বর অ্যাণ্ড কোং), দিগন্ত নিশিকান্ত (দি কালচার পাবলিশার্স), War and Immorality সুধীন্দ্রলাল রায় (কেতাব মহল, এলাহাবাদ)। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায়, বনফুল, মনোজ বসু, সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, গজেন মিত্র, সুমথ ঘোষ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্ন্যাল, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পশুপতি ভট্টাচার্য, গোপাল হালদার, রামপদ মুখোপাধ্যায়, সনৎ মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী মণ্ডল প্রভৃতির গল্প উপন্যাস (প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণ) এই কালে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। জানুয়ারি মাসে ডায়ারিগুলির কথা স্বতই আসিয়া পড়ে। এই বিভাগে মুখার্জির Popular Diary এবং Sarkar's Diary লোভনীয় মূর্তি লইয়া বাহির হইয়াছে। মুখার্জি, সরকার, বেঙ্গল কেমিক্যাল, বুক ইণ্ডাষ্ট্রিজ এবং ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ-এর ক্ষুদ্রকায় পকেট ডায়ারিগুলিও কম কাজের হয় নাই।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১-৪৫ সংখ্যা তিন খণ্ডে চমৎকার বোর্ড-বাঁধাই করিয়া প্রকাশ করিয়া যথার্থ সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকাগুলির খবরদারি করা অন্যথায় বড় কঠিন হইত।

'মৌচাক'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার 'জয়ন্তী-মৌচাক' (পঁচিশ বছরের) বাহির করিয়া নূতন করিয়া শিশু ও অভিভাবকদের হৃদয় জয় করিয়াছেন। উৎকৃষ্ট বাঁধাই ছাপাই ও ছবিসহ পঁচিশ বছরের মৌচাকের সব-ভালোর একটি 'মৌচাক' দীর্ঘ দিন ধরিয়া বাংলার ছেলেমেয়েদের আনন্দ দিবে। নির্বাচন চমৎকার হইয়াছে।

শ্রীসিধোস্তর ভট্টাচার্যের 'নব বাংলা ভাসা' ১ম ও দ্বিতীয় ভাগ যাহাদের চিন্তার খোরাক যোগাইবে না, তাহাদের কৌতুকের কারণ হইবে। লেখকের উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নাই।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শনিবারের চিঠি
১৭শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৫১

স্বাধীনতার ঘোষণা

মুক্তিপ্রেমীগণ, বন্ধুগণ, তোমরা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া আছ। সৈন্যদের দ্বারা, নিষেধের (censorship) দ্বারা এবং যুদ্ধরত জাতিসমূহের পরস্পর ঘৃণার দ্বারা বিগত পাঁচ বৎসর কাল তোমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া আছ। এখন বিচ্ছেদের বেড়া ভাঙিয়া পড়িতেছে, সীমান্তের বাধা অপসারিত হইতেছে। আমাদের ভ্রাতৃত্ববন্ধন পুনঃস্থাপিত করিবার ইহাই সময়। আমি তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি; এই নূতন সঙ্ঘের ভিত্তি তোমরা দৃঢ়তর করিয়া তোল, ইহার গঠন পূর্বাপেক্ষা অধিক মজবুত কর।

যুদ্ধ আমাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা আনিয়াছে। অধিকাংশ মস্তিষ্কজীবীই তাঁহাদের বিজ্ঞান, তাঁহাদের শিল্প ও তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি কোন না কোনও গবর্মেণ্টের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছে। আমরা কাহাকেও অপরাধী করিতেছি না, কাহারও বিরুদ্ধে আমাদের কটু নালিশ নাই। ব্যষ্টিমনের দুর্বলতা এবং প্রবল সমষ্টিবন্যার আদিম (elemental) শক্তির কথা আমরা অবগত আছি। অসতর্ক মুহূর্তে সমষ্টির টানে ব্যষ্টি ভাসিয়া গিয়াছে। এই বন্যাকে ঠেকাইয়া আত্মস্থ হইবার কাজে ব্যষ্টিকে সাহায্য করিবার জন্য কোনও আয়োজন করা হয় নাই। এই অভিজ্ঞতা, আর কিছুই না হউক, ভবিষ্যতের দৃষ্টান্ত হইয়া থাকুক।

আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া প্রজ্ঞার (intelligence) প্রায় সম্পূর্ণ পরাজয় (abdication) এবং বিশৃঙ্খল শক্তিসমূহের নিকট মানবীয় বুদ্ধির স্বেচ্ছাবৃত দাসত্বের ফলে যে সকল দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, সর্বপ্রথমে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। যে মহামারী ইউরোপের দেহ ও আত্মাকে নিরন্তর গ্রাস করিতেছে, চিন্তানায়ক ও শিল্পীগণ অপরিমিত হিংসাবিষপ্রয়োগে তাহার প্রকোপ বৃদ্ধি করিতেছেন। তাঁহাদের জ্ঞান, স্মৃতি ও কল্পনার আয়ুধাগারে এই হিংসার পিছনে তাঁহারা অবিরত যুক্তিও খুঁজিয়াছেন। প্রাচীন ও নূতন, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক, নৈয়ায়িক ও কাব্যিক যুক্তির অভাব তাঁহাদের হয় নাই। মানুষে মানুষে পরস্পর পরিচয় ও প্রেমকে বিনষ্ট করিবার জন্য তাঁহারা প্রাণপাত করিয়াছেন। তদ্দ্বারা, তাঁহারা যে মহৎ চিন্তার প্রতিনিধিস্বরূপ, সেই চিন্তাকেই বিকৃত, কলুষিত, বিনষ্ট ও ঘৃণ্য করিয়া তুলিয়াছেন। এই চিন্তাকে তাঁহারা তামসিক প্রবৃত্তির অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছেন এবং হয়তো নিজেদের অজ্ঞাতসারে কোনও রাজনৈতিক অথবা সামাজিক স্বার্থদুষ্ট দল, রাষ্ট্র, দেশ অথবা শ্রেণীর একান্ত স্বার্থপরায়ণতার কাছে বলিও দিয়াছেন। বর্তমানে, যখন যে ভয়াবহ সংঘর্ষের মধ্যে জাতিসমূহ নিমজ্জিত ছিল তাহা হইতে জয়ী অথবা পরাজিত উভয় দলই সমান আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় বাহির

হইতে চলিয়াছে, এবং তাহারা নিজেরা স্বীকার করুক আর নাই করুক, অন্তরের অন্তস্তলে পরস্বাপহরণ-দুষ্প্রবৃত্তির জন্য চরম লজ্জা অনুভব করিতেছে—তখন সেই চিন্তা, যাহা তাহাদের পরস্পর বিবাদের ফলে জঞ্জালে জড়াইয়া গিয়াছিল, তাহাদের মত অধঃপতিত মূর্তিতে পুনঃপ্রকাশিত হইতেছে।

উত্তিষ্ঠত! চিত্তকে এই সকল আপোস, এই সকল হীন মৈত্রীবন্ধন এবং এই সকল ছদ্মবেশী দাসত্ব হইতে মুক্ত কর। চিত্ত কাহারও দাস হইতে পারে না। আমরাই চিত্তের দাস। আমাদের আর কোনও প্রভু নাই। এই স্বাধীন চিত্তের আলো বহন করা, তাহাকে রক্ষা করা এবং পথভ্রান্ত মানুষকে ইহার আশ্রয়-ছায়ায় ডাকিয়া আনাই আমাদের কাজ। আমাদের কাজ, আমাদের কর্তব্য হইতেছে ধ্রুব কেন্দ্রে অবস্থান করিয়া নিশীথ-রজনীর প্রবৃত্তি-ঝঞ্ঝার মাঝখানে সকলকে ধ্রুবতারার সন্ধান দেওয়া। এই সকল প্রবৃত্তির মধ্যে বাছাই করিতে আমরা প্রস্তুত নই, অহঙ্কার এবং পরস্পর হিংসা সব কিছুই আমাদের বর্জনীয়। আমরা সম্মান করি শুধু সত্যকে, যে সত্য মুক্ত, সীমান্তহীন, সীমাহীন; যে সত্য জাতি ও ধর্মের কুসংস্কারকে স্বীকার করে না। নিখিল মানবের প্রতি আমাদের চিত্ত সদাজাগ্রত। মানুষের জন্যই আমাদের সাধনা, কিন্তু সে কোনও দেশের বা জাতির মানুষ নহে—সমগ্র মানব-সমাজের জন্য। আমরা কোনও জাতিকে জানি না, সেই এক এবং বিশ্বব্যাপী মহামানবজাতিকে জানি—তাহাদের বেদনা ও জীবন-সংগ্রামকে স্বীকার করি, জানি সেই দুঃখতে মানুষকে, পড়িতে পড়িতেও যাহারা আবার পায়ের উপর দাঁড়ায়, ঘর্ম এবং শোণিতে স্নাত হইয়া বন্ধুর পথে যাহাদের অনন্ত যাত্রা। এই মহাজাতি, এই নিখিল মানব—সকলেই আমরা এক ভ্রাতৃত্ববন্ধনে বদ্ধ। এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের কথা আজ আমাদের মত যাহাতে সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, আমরা আজ তাই দুস্তর মানবীয় সংগ্রাম-সমুদ্রের মাঝখানে ভেলার মত এই ঘোষণাপত্র ভাসাইলাম—চিরমুক্ত, বহুধাপ্রসারিত ও শাশ্বত মানবচিত্তের জয় হউক।

—রোমাঁ রলাঁ

আমাদের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা ও নূতন পরিকল্পনা

৩

মৃত্যুর কোন গুণ্ঠন নেই, দুর্ভিক্ষ মহামারী কোন সুসভ্য ভদ্রতার মুখোশ এঁটে বেড়ায় না, তাই তাদের নগ্ন রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি। ঘুণ-ধরা গ্রাম্য সমাজের খুঁটির ওপর আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরাট কড়ি-বরগা চাপিয়ে নূতন সভ্যতার সৌধ গড়ার চেষ্টায় মত্ত ছিলুম—আমাদের উন্মত্ত প্রচেষ্টার ফাঁকে অনাদৃত খুঁটিগুলি

ধরাশয্যা গ্রহণ করেছে। শোনা যায়, শ্মশানে বৈরাগ্য জন্মানো স্বাভাবিক; কিন্তু বাংলা দেশের শ্মশানে দাঁড়িয়েও যে আমরা আজ শেয়াল-কুকুরের মত স্বার্থ নিয়ে কাড়াকাড়ি ও ঝগড়া করছি তাতে সন্দেহ হয় যে, মনুষ্যত্বের যেটুকু অবশিষ্ট থাকলে শ্মশানে দাঁড়িয়ে বৈরাগ্যের উদয় হতে পারে, সেটুকুও হয়তো আমরা হারিয়েছি।

বাংলা দেশের গ্রামগুলি যে শ্মশানে পরিণত হয়েছে, দুর্ভাগ্য-দুর্বিপাকের নির্মম আঘাতে আমাদের মনুষ্যত্ব যে আজ ভূলুণ্ঠিত, এ সত্যে সন্দেহ করার মত আবরণটুকুও আজ আর কোথাও নেই। দুর্ভিক্ষের লেলিহান জিহ্বার যে ক্ষীণ ছায়াটুকু মাত্র আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরীর ওপর পড়তে দেখেছি, তাতে অসহায় গ্রামগুলির ওপর তার রুদ্র মূর্তির কল্পনা করাও কঠিন। এই সর্বব্যাপী দুর্ভিক্ষের সঙ্গে এসে জুটেছে মহামারীর দুর্নিবার বীভৎসতা। যে অবজ্ঞাত গ্রাম্য সমাজের ভিত্তির ওপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি, সে ভিত্তি ফেটে চৌচির হয়ে ধ্বসে পড়ছে চারদিকে। ইংরেজী কেতার কমিশন বসিয়ে এই চরম দুর্গতির জন্ম দায়ী কে, তার বিচার করার, কিংবা এই দুর্ভাগ্যের গভীরতা কতখানি, তার পরিমাপ করার সময় নেই আমাদের। আমাদের সামনে আমাদের সমস্যাটি সুস্পষ্ট—হয় আমাদের দুর্বল বাহু নিয়েই আমাদের মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে হবে, অথবা নিঃশব্দে মৃত্যুকেই বরণ ক'রে নিতে হবে।

আমাদের এই সমস্যার দুটি দিক আছে। হঠাৎ যখন শিরা কেটে রক্তস্রোত বইতে থাকে, তখন প্রথম প্রয়োজন সেই রক্তস্রোত বন্ধ করা, তারপর রোগীকে ঔষধ-পথ্য দিয়ে ধীরে ধীরে সুস্থ ক'রে তুলতে হয়। আমাদের গ্রামে গ্রামে আজ সুস্থ সবল মানুষ নেই, কাটবার লোকের অভাবে মাঠের ধান মাঠেই নষ্ট হচ্ছে, দুর্বল শরীরের জীর্ণ দুর্গপ্রাকার ভেদ ক'রে রোগের বীজাণু সহজেই মারাত্মক হয়ে উঠছে। আমাদের এখনকার প্রাথমিক কর্তব্য, ধার-কর্জ ক'রে হোক, অন্যের পায়ে ধ'রে সেধে হোক, একটা প্রাথমিক ব্যবস্থা করা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার যে, ধার-কর্জ ক'রে আসন্ন বিপদকে কোনমতে এড়ানো গেলেও গৃহস্থ এই ব্যবস্থার ওপর নির্ভর ক'রে বেঁচে থাকতে পারে না। তার জন্যে প্রয়োজন নূতন সামাজিক, অর্থনৈতিক ভিত গ'ড়ে তোলার। এই গ'ড়ে তোলার কেন্দ্রস্থলে যে ব্যবস্থাটি রয়েছে, সেটি হচ্ছে শিক্ষা-ব্যবস্থা। আদিম সমাজ গ'ড়ে উঠত মানুষের একত্র থাকার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ভিত্তিতে। বর্তমান কালে দেখা গেছে যে, একটা আদর্শ এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী সমাজকে গ'ড়ে তোলা সম্ভব। এই আদর্শকে সমাজ-মনে ছড়িয়ে দেওয়া হয় শিক্ষার ভেতর দিয়ে, তাই শিক্ষা সমাজ-গঠনের কেন্দ্রে স্থান লাভ করেছে।

বাংলার সমাজ-জীবনের ধ্বংসস্তূপের ওপর নূতন সমাজের ভিত্তি স্থাপন করতে হ'লে আমাদের প্রয়োজন—পক্ষপাতহীন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমাদের ভাগ্যবিপর্যয়ের

কারণ অনুসন্ধান করার, নির্ণীত কারণগুলি সমাজ-দেহ থেকে বিদূরিত করার এবং এই বিপর্যয়কে এড়িয়ে কি ক'রে জাতীয় অগ্রগমন সম্ভবপর, সেটা স্থির করার।

আমাদের বর্তমান দুরবস্থার প্রথম অর্থনৈতিক কারণ উৎপাদনের অভাব। আমাদের গ্রামগুলিতে আজও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের চরণপাত ঘটে নি, অন্য দিকে কৃষি বয়ন ইত্যাদি জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় উৎপাদন-ব্যাপারেও যে আমরা এত পেছনে প'ড়ে আছি, তার কারণ, যুগ যুগ সঞ্চিত সহজ সবল মনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানও আমাদের গ্রাম্য সমাজে সঞ্চারিত হয় নি। ভূমিজ জ্ঞানকে অবজ্ঞা ক'রে আমরা তার প্রসার ও অগ্রগতি রুদ্ধ করেছি, ফলে বিজ্ঞানের বিকাশ আমাদের দেশে স্বাভাবিকভাবে জন্মগ্রহণ করে নি। আমরা আমাদের দুর্ভাগ্যের সবটুকু দায়িত্ব দৈন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে থাকি। কিন্তু আমাদের শিক্ষা ও চেষ্টার অভাবই আমাদের দৈন্যের জন্য দায়ী নয় কি? আমাদের অন্ন নেই, জমি অল্প, অথচ ফসল কি ক'রে বাড়ানো চলে, সে শিক্ষা আমাদের নেই। আমাদের দেশের শতকরা আশিজন লোক চাষী, অথচ কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেবার কোন আয়োজন নেই আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে। শিক্ষার যে স্তরে উন্নীত হ'লে এবং অর্থের যে সামর্থ্য থাকলে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়, কোন সত্যিকারের চাষী তাতে সেই বিদ্যা দ্বারা লাভবান হবার সুযোগ পায় কি না সন্দেহ। আমাদের যথেষ্ট বস্ত্র নেই, অথচ সুতা কাটা, বয়ন, রঞ্জন ইত্যাদি শেখাবার কোন ব্যবস্থা নেই। আমাদের রোগের উৎপাতের অভাব নেই, অথচ একটুখানি ওষুধের জন্যে আমাদের বিদেশের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকতে হয়। এসব বিষয়ে ভারতে যে কোন জ্ঞান ছিল না, তা নয়। রঞ্জনশিল্পে ভারতবর্ষ একদিন সর্বাগ্রগামী ছিল, ভারতের মসলিন একদিন বিদেশের বাজারকেও ছেয়ে ফেলেছিল। কৃষি, বয়ন, আয়ুর্বেদ ইত্যাদিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপন করতে যা প্রয়োজন, তা হচ্ছে শিক্ষা। গ্রাম্য সমাজের নাড়ীতে নাড়ীতে যে শিক্ষা নানা ভাবে প্রবাহিত ছিল, যার ফলে ভারতবর্ষ ধনী হতে পারুক না পারুক, নিজের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে অক্ষম হ'ত না, আমরা সেই শিক্ষাকে রুদ্ধ ক'রে মাথায় একটা প্রকাণ্ড অজানা শিক্ষার বোঝা চাপিয়েছি। চারপাশে যেখানে বায়ুমণ্ডল রয়েছে সেখানে মাথার ওপর বায়ুমণ্ডলের চাপটা সুসহ, কিন্তু চারদিকে বায়ুর অভাব ঘটলে মাথার ওপরের চাপ আমাদের সহজেই গুঁড়িয়ে দিতে পারে। আমাদের বর্তমান শিক্ষার চাপটা তেমনিতর একটা একতরফা চাপ, তাই এ আমাদের বিকাশের সহায়তা না ক'রে ধ্বংসের সহায়তা করছে। এ কথা সত্য যে, আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তায় অনুর্বর ভূমিতেও বাংলা দেশের সুজলা সুফলা ভূমির চাইতে উৎপাদন অনেক বেশিগুণ করা সম্ভব হয়েছে। শিক্ষার অভাবেই আমাদের চারিদিকে ছড়ানো অজস্র প্রাকৃতিক সম্পদকে আমরা ব্যবহার করতে পারি না, অথচ এইগুলি কুড়িয়ে নিয়ে বিদেশী বণিক তাদের অর্থের ঝুলি পূর্ণ ক'রে তোলে। আমরা

প্রায়ই দেশকে শিল্পপ্রধান ক'রে তোলার কল্পনা করি, কিন্তু ভেবে দেখি না যে, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিকাশ না হ'লে উচ্চতর বিজ্ঞানের স্বাভাবিক স্ফুরণ হতে পারে না। আমাদের চারদিকে যে পরিবেশ রয়েছে আমরা তা থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি, তাই আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি কুঁকড়ে আছে। সভ্যতার মহীরুহ শূন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, তার শেকড় মেলার জন্যে জমি প্রয়োজন—সেই জমি জনসাধারণের মন। আমাদের দেশে জমি তৈরি নেই, তাই বিজ্ঞান এখানে শেকড় মেলতে পারছে না।

উৎপাদন বাড়ানো আমাদের প্রধান সমস্যা সত্য; কিন্তু উৎপাদন বাড়ালেই দুঃখ ঘোচে না। বিজ্ঞানের দান আগুনের মত; এ দিয়ে যেমন প্রদীপ জ্বালানো চলে, তেমনই শিশুর হাতে এ গৃহদাহের উপকরণও হয়ে উঠতে পারে। পাশ্চাত্যের রঙ্গভূমিতে বিজ্ঞানের আবির্ভাব ঘটেছে বহুদিন, কিন্তু বিজ্ঞান সেখানে গড়েছে যত ভেঙেছে তার চাইতে অনেক বেশি; আর সেই বিরাট বহ্নিদাহের লোলুপ রসনা স্পর্শ করছে সমগ্র জগৎকে। এইটেই—শুধু আমাদের সামনে নয়, সমগ্র জগতের সামনে—সবচেয়ে প্রকাণ্ড সমস্যা। বিজ্ঞান উৎপাদনকে বাড়িয়ে দিয়েছে শতগুণে, কিন্তু মানুষের লোভকে প্রশমিত করতে পারে নি। এই লোভই রয়েছে আমাদের সকল দুঃখ, সকল অবিচার, অত্যাচার ও অন্যায়ের মূলে। বিজ্ঞান যেখানেই আত্মপ্রকাশ করুক না কেন, সকল সত্যের মত তা স্বপ্রকাশ। আজ হোক কাল হোক বিজ্ঞানের আবিষ্কার সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে, কি ক'রে এর অপব্যবহার না ক'রে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় একে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করতে পারব, এই হ'ল আমাদের সামনে সবচাইতে বড় সমস্যা।

বিজ্ঞানকে মানুষের প্রকৃত সেবায় প্রয়োগ করার যে প্রচেষ্টা পাশ্চাত্যে রূপ পেয়েছে, তার ভিত্তি রাষ্ট্রশক্তি ও ঐশ্বর্যের ওপর। লোভকে তারা জয় করতে চায় নি, তারা চেয়েছে ঐশ্বর্যকে স্ফীত ক'রে লোভকে অহেতুক করতে। ধনকে তারা ব্যক্তির কবলমুক্ত ক'রে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে, সম্পদ ও সুখকে ক'রে তুলতে চেয়েছে সুলভ। তাই সমগ্র রাষ্ট্রের ধনোৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থাকে করায়ত্ত না ক'রে তাদের গঠনপ্রচেষ্টা কার্যকরী হতে পারে না। তারা যে সমাজ সৃষ্টি করতে চেয়েছে, তা থেকে প্রভূত ধনবানকে তারা ছেঁটে ফেলতে চায় সবলে, নির্দয়ভাবে। পৃথিবীকে তারা স্বীকার করে উপভোগের বস্তুরূপে; পৃথিবীকে সুন্দর ক'রে তুলতে চায় উপভোগ করবে ব'লে। তাদের আনন্দটা ভোগের আনন্দ। এই আনন্দের যারা বাধা, তাদের নির্মমভাবে ছেঁটে ফেলতে কোন দ্বিধা নেই। এইজন্য এই ব্যবস্থায় হৃদয়ের পরিবর্তনের দিকে কোন দৃষ্টি নেই। তাদের ধারণা—চোর চুরি করে তার অভাবেরই জন্যে; মন নামক বস্তুটার একটা স্বাধীন অস্তিত্ব দিতে তারা নারাজ। মনটা বাস্তব অবস্থারই একটা প্রতিফলন মাত্র—এই তাদের সিদ্ধান্ত। ইতিহাসের যতটুকু আমরা জানি তাতে আমরা দেখতে পাই

যে, বার বার হিংসা দ্বারা সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা হয়েছে, প্রতি বারই সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। যে ধ্বংস ও হত্যার ভিত্তিতে সমাজ গড়ার চেষ্টা হয়, তারই নির্মমতার মধ্যে থাকে আত্মনাশের বীজাণু। আদিম সমাজে মানুষ একদিন এক সাম্য-ব্যবস্থার মধ্যে ছিল, সে সাম্য স্বাভাবিকভাবেই ভেঙেছে মানব-মনের বিভিন্নমুখিতা ও বিভিন্ন যোগ্যতার জন্ম। এই বৈচিত্র্য সৃষ্টির স্বাভাবিক বিকাশ। আমাদের সমাজ-গঠনে যা প্রথম প্রয়োজন, তা হচ্ছে এই বৈচিত্র্যকে একটি সর্বব্যাপী ঐক্যের বন্ধনে বাঁধবার। কান মুচড়ে মনের স্বভাব বদলানো, লাঠির ঘায়ে অন্ধকার তাড়ানোর মত। হিংসার রূপায়ন-বিভেদে, এর ভিত্তির ওপর তাই ঐক্যবদ্ধ সমাজ গ'ড়ে উঠতে পারে না।

ভারতের আশা ভাষা পেয়েছে সত্য ও অহিংসার বাণীতে। সত্য স্বরূপকে যাঁরা স্বীকার করেন, তাঁরা অস্বীকার করেন জগতের অসুন্দর রূপটিকে। জঞ্জালে যে স্থানটি আকীর্ণ হয়ে আছে, তার সত্যকার রূপটি প্রকাশ পাচ্ছে না। সেই স্থানটির তখনকার যে রূপ, সে রূপ মিথ্যা। জঞ্জাল সরিয়ে দিন, স্থানটি প্রকাশ পাবে, তার সত্যিকারের রূপটি ধরা পড়বে। মানুষের যে হিংসাসঙ্কীর্ণ, হিংসাকুটিল রূপটি আমরা দেখে থাকি, তা তার সত্যিকারের রূপ নয়। মানুষ যে নিজেরই অজ্ঞাতসারে নিজের গণ্ডিকে বিস্তৃত ক'রে সমগ্র বিশ্বকে নিজের মধ্যে অনুভব করতে চায়, তার প্রমাণ সমগ্র ইতিহাস জুড়ে রয়েছে—এটুকু না থাকলে সমাজ গ'ড়ে তোলা, জ্ঞানবিজ্ঞানের অনির্ব্বাণ সাধনা, অন্যায় এবং নিষ্ঠুরতার প্রতি সার্বজনীন ঘৃণা অসম্ভব হ'ত। যুগমানব যাঁরা এসেছেন, তাঁরা এই স্বার্থপঙ্কিল কুৎসিত পৃথিবীকে অস্বীকার করেছেন; তাঁরা চেয়েছেন এই বিকৃতির আড়ালে যে সুন্দর শাশ্বত রূপটি আছে তারই আভাস দিতে, তাঁরা আত্মনিয়োগ করেছেন আবিলতা থেকে পৃথিবীকে, মানব-মনকে মুক্ত করতে। এই আত্মনিয়োগ রূপ পেয়েছে অহিংসার মধ্যে। রোগ হয়েছে ব'লে ডাক্তার রোগীকে মেরে ফেলেন না, তা হ'লে চিকিৎসা-ব্যাপারটি অনেক সোজা হয়ে যেত। রোগ যতই কুৎসিত এবং কঠিন হোক না কেন এবং তাতে রোগীর যতই অপরাধ থাকুক না কেন, ডাক্তারের কর্তব্য হচ্ছে নিষ্ঠা ও সেবা দিয়ে, সমগ্র জ্ঞানকে প্রয়োগ ক'রে রোগীকে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করা; তবু যদি রোগী না বাঁচে, তবে ডাক্তারের জ্ঞানের অভাব তার কারণ হতে পারে, কিন্তু তার চেষ্টার অভাবের অভিযোগ করা চলে না। লোভ ও হিংসার বিকৃতি মনের সবচাইতে কঠিন ব্যাধি এবং অহিংসা-প্রচেষ্টা চিকিৎসকের প্রচেষ্টা। অহিংসার বাণী যাঁরা প্রচার করেন তাঁরা মনে ক'রে থাকেন যে, আমাদের সামাজিক ব্যাধিগুলি আমাদের মানসিক বিকৃতিরই ভয়াবহ পরিণাম। বিন্দু বিন্দু বালুকণা যখন জড় হয়, তখন তাকে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করা অতি সহজ; কিন্তু বিকৃত অসুস্থ মন যখন যুগের পর যুগ এই সামান্য কর্তব্যগুলিকে অবহেলা করে, তখন যে জঞ্জালের স্তূপ জড় হয় তা পরিষ্কার করা দুঃসাধ্য,

কখনও কখনও বা প্রায় অসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। জঞ্জালকে জোর ক'রে সরিয়ে দিলেই স্থানটির ভবিষ্যৎ পরিচ্ছন্নতা নিরাপদ হয় না। সামাজিক জঞ্জাল দূর ক'রে দিয়ে একটা ক্ষণিক চাকচিক্য হয়তো আনা সম্ভব, কিন্তু সমাজ-মন যদি ঘুমন্ত থাকে তবে সমাজদেহে আবার জঞ্জাল জমতে থাকবে। আমাদের আসল প্রয়োজন অসতর্ক ঘুমন্ত রোগগ্রস্ত মনকে জাগ্রত ক'রে তোলা। মনকে লাঠি দিয়ে স্পর্শ করা যায় না, মনকে স্পর্শ করতে হয় মন দিয়েই। এই স্পর্শ দেবার জন্যে প্রয়োজন ভালবাসার, যার মধ্য দিয়ে নিজেকে খুঁজে পাওয়া যায় অন্যের মধ্যে। এই ভালবাসাই বিভিন্নধর্মী মনের মধ্যে একটা ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টি করতে পারে। আমাদের সমাজ-গঠনে তাই প্রয়োজন অহিংস কর্মপ্রচেষ্টার ভিত্তি,—এর জন্যে প্রয়োজন গভীর মানসিক শিক্ষা, যে শিক্ষা আমাদের দৃষ্টিকোণ বদলে সমাজকে নূতনভাবে দেখতে শেখাবে।

আমাদের জাতীয় শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে আমাদের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার জন্য। যেখানে রাষ্ট্রের স্বার্থ জনগণের স্বার্থের সঙ্গে এক নয়, সেখানে সর্বপ্রকার জাতীয় প্রচেষ্টা রাষ্ট্রীয় কারণে ব্যাহত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যে সামাজিক ব্যাধি সমগ্র বাংলাকে আজ মৃত্যুর দ্বারে টেনে এনেছে, তার প্রথম এবং প্রধান লক্ষণ হচ্ছে লোভ এবং অজ্ঞতা, এবং তা পুষ্টিলাভ করেছে জাতীয় পরাধীনতার অন্ধকার ছায়ায়। অর্থহীন সঞ্চয়ের রথচক্রে আটকা প'ড়ে যারা সহস্র সহস্র লোকের মৃত্যুর কারণ হয়েছে, তারা যে ডালের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, সেই ডালকে কাটতেই ব্যস্ত। তাদের এই মত্ততাকে ক্রূরতা না ব'লে মূঢ়তা বলাই যুক্তিযুক্ত। আর যে অগণ্য জনসাধারণ চাকার নীচে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, তাদের যূথবদ্ধতা ভয়ত্রস্ত পশুর মত—একের পর আর একজে গুঁড়িয়ে যেতে দেখেও তারা দলবদ্ধভাবে পেষণের চক্রটিকে আটকে দিতে চেষ্টা করে না। এই নিশ্চেষ্টতার কারণও গভীর অজ্ঞতা। এদের চালিয়ে নিয়ে বেড়ায় অন্ধ সংস্কার, যুক্তি এখানে দানা বেঁধে উঠতে পারে না। আমরা অন্য দেশের পণ্যবিক্রয়ের কেন্দ্র, সুতরাং আমাদের উৎপাদন বাড়লে আমাদের শাসকদের ক্ষতি; এইজন্য আমাদের উৎপাদন বাড়াবার শিক্ষার ব্যবস্থা কোথাও নেই। আমরা যখন শিক্ষালাভের স্বপ্ন দেখছি, তখন আমাদের শাসকেরা শিক্ষাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করছেন, যাতে আমরা গ'ড়ে উঠছি কেরানী হয়ে, আমাদের সঙ্গে দেশের প্রকৃত পরিবেশের ঘটছে একটা পরিপূর্ণ বিচ্ছেদ। আবার এই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ব্যয়বহুল ক'রে বহুর নিকট শিক্ষাকে অগম্য ক'রে রাখা হয়েছে এবং এই ভাবে জাতির মধ্যে গ'ড়ে তোলা হয়েছে একটা নিরর্থক জিনিসকে নিয়ে লোভ এবং অবিশ্বাসের ব্যবধান।

আমাদের এই সমস্যার সমাধান ক'রে দেবার মত কোন ব্যবস্থাই পাশ্চাত্যের ভাণ্ডারে নেই। শিক্ষাকে সংস্কৃত করতে সেখানে সর্বদাই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের পৃষ্ঠপোষকতা

পাওয়া গেছে; সুতরাং পরিকল্পনা রচনা সেখানে যেমন সহজ হয়েছে, তেমনই অর্থাভাবেও পরিকল্পনার রূপায়ন ব্যাহত হয় নি। সুতরাং আমাদের দেশের সামনে যে সমস্যা, তার কোন নজির ওখানে নেই। আমাদের জাতীয় সম্পদ নেই, শিক্ষা নেই। আমাদের প্রয়োজন তা বাড়িয়ে তোলার, অথচ অর্থের সামর্থ্য বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব কোনটাই নেই আমাদের। এই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব আমাদের হিংসা দিয়ে লাভ করার কোন সামর্থ্যও নেই, আর তাকে আমরা শ্রেয় ব'লেও মনে করি না। অথচ আমরা সমাজ-সংস্কারের যে আদর্শ গ্রহণ করতে চাই, তাতে বাস্তব অবস্থার পরিবর্তনই যথেষ্ট নয়, আমরা সঙ্কল্প নিয়েছি মনকে নূতন ক'রে গ'ড়ে তোলার, দৃষ্টিকোণকে সম্পূর্ণভাবে বদলে দেবার।

এই নূতন প্রচেষ্টার পরিকল্পনার রূপায়ন হয়েছে বনিয়াদী শিক্ষার কর্মতালিকায়। এই শিক্ষা-প্রচেষ্টা অভূতপূর্ব এবং সমগ্র জীবনকে ও মানব-সমাজকে নূতন ক'রে গড়ার প্রচেষ্টা, সুতরাং নূতন সমাজের ভিত্তি বা বনিয়াদ গড়বে ব'লে একে 'বনিয়াদী' অথবা সম্পূর্ণ নূতন কর্মপন্থা ব'লে 'নইতালিম' অথবা 'নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থা' নাম দেওয়া চলে। আমরা শেষোক্ত নামেরই পক্ষপাতী, কারণ 'বনিয়াদী' কথাটাকে আমরা প্রায়ই 'অভিজাত' কথাটার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলি। এই নূতন শিক্ষা-প্রণালী আমাদের বর্তমান অভিজাত শিক্ষা-প্রণালীকেই ভাঙতে চায়, সুতরাং যে নামটাতে বার বার ভুল হবার সম্ভাবনা আছে প্রথম থেকেই সেই নামটাকে পরিবর্তন করা ভাল।

আমাদের জাতীয় পরাধীনতা আমাদের পরম দুর্ভাগ্যের কারণ সন্দেহ নেই, কিন্তু কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের চাবি যাদের হাতে তাদেরই ছেঁটে ফেলে দিলেই স্বাধীনতার ভিত্তি গ'ড়ে উঠবে না। যে সবল, যে সুস্থ, তাকে কেউ অধীন ক'রে রাখতে পারে না। অধীনতার মূল উৎস দুর্বলতা, অক্ষমতা, অসুস্থতা। কায়ার যেমন ছায়া, তেমনই দুর্বলতা ও অধীনতার মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। পরাধীনতা যেমন আমাদের দুর্বলতার কারণ, আমাদের দুর্বলতাও তেমনই আমাদের পরাধীনতার মেয়াদকে দীর্ঘতর করার কারণ। নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থার তাই প্রথম লক্ষ্য দেহে ও মনে সুস্থ এবং সবল মানুষ গ'ড়ে তোলা। শিশু যদি সুস্থ সবল মানুষ হয়ে গ'ড়ে ওঠে, তবে সমাজে আসবে নূতন জীবন, নূতন শক্তির প্রবাহ, এবং তারই ফলে পরাধীনতার বন্ধন আপনি খ'সে পড়বে। সুস্থ দেহ গ'ড়ে তোলার জন্য মানুষের জড়তাকে জয় করা প্রথম প্রয়োজন এবং সেই জড়তাকে জয় করতে হ'লে যেমন দরকার আদর্শ নেতা, তেমনই প্রচুর এবং স্বাস্থ্যকর অন্ন-বস্ত্র-পরিবেশ। এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি হ'লে কাজ আরম্ভ করার জন্য রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্তৃত্বের প্রয়োজন নেই। রাষ্ট্র আমাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে প্রথম হতেই ব্যাহত করার ফলে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত কর্তব্যগুলিও ভুলে ছিলুম; এই ব্যক্তিগত কর্তব্যগুলির প্রতি আমাদের সচেতন ক'রে দেওয়াই নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনার প্রথম কর্মসূচী।

আমাদের দেশের দৈন্য অবশ্যস্বীকার্য, অথচ আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই জাতীয় সম্পদ উৎপাদনে কোন অংশ গ্রহণ করি না। নূতন ব্যবস্থার প্রত্যেকে জাতীয় সম্পদ উৎপন্ন করার কাজে লাগবে। এই ভাবেই শুধু রাষ্ট্রীয় ধনভাণ্ডারের ওপর কর্তৃত্ব না থাকা সত্ত্বেও দৈন্যকে দূর করার এবং জীবনের মানকে উন্নত করার চেষ্টা আরম্ভ করা চলে। বস্ত্র আমাদের নেই, কেনার মত অর্থও নেই আমাদের, অথচ মিলের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে আমরা ব'সে থাকি। বিদ্যালয়ে যদি আমরা শস্য উৎপাদনের মূল সূত্রগুলি আয়ত্ত করতে পারি, বস্ত্রের জন্য যদি আমরা প্রথম হতেই আত্মনির্ভর হবার চেষ্টা করি, তবে ক্ষুধার অন্ন এবং পরিধেয়ের জন্য আমাদের মৃত্যু বরণ করতে হবে না, এটুকু অন্তত জোর ক'রে বলা যায়।

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রধানত আপত্তি করা হয়ে থাকে যে, তাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশের বাধা জন্মাবে। জীবনের দুটি দিক আছে। এক দিক থেকে আমাদের জীবন নিরবচ্ছিন্ন কর্মপ্রবাহ। শিক্ষাকে যদি আমরা জীবনের জন্য প্রস্তুতি ব'লে মনে করি, তবে শিক্ষা কর্মের সমস্যা-সমাধানেরই শিক্ষা। আমাদের জীবনের কর্ম বহুমুখী, সুতরাং একই কর্মকে নানা দিক থেকে দেখা চলে। যেমন ধরা যাক, একটি লোক কৃষিকর্মের জন্য শিক্ষা লাভ করছে। তার মাটি চেনা দরকার, কোন্ মাটি কি বীজের উপযুক্ত তা জানা দরকার, কি সারের প্রয়োজন তার জ্ঞান দরকার, কোন্ বীজ কোথায় পাওয়া যায়, কি দামে তা বিক্রি হয়, তার ব্যবহার, উপকার, চাহিদা কি রকম—এই সমস্তই তার জানা প্রয়োজন। এই ভাবে বিজ্ঞান, ভূগোল, মাতৃভাষা, অঙ্ক, অর্থশাস্ত্র সব কিছুই তাকে শিখতে হবে। এই ভাবে শিক্ষার একটা প্রধান লাভ এই যে, জ্ঞানটা পুঁথিগত হয় না, প্রকৃত পরিবেশের সঙ্গে নিবিড় যোগসাধনের ফলে জ্ঞানটা গভীর এবং চিরস্থায়ী হয়ে থাকে। ফলে জ্ঞান বোঝা হয় না, স্বাভাবিক বিকাশের রূপ গ্রহণ ক'রে থাকে। কিন্তু তাই ব'লে বিষয়গতভাবে জ্ঞানকে দেখার প্রয়োজন নেই, সে কথা সত্য নয়। শরীরের পুষ্টিসাধনের জন্য ব্যায়ামের প্রয়োজন আছে, কিন্তু কেবল হাতের বা পায়ের কিংবা বুকের ব্যায়াম করলে শরীরের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে না। সেজন্য বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যায়াম সম্পর্কে একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকা সম্ভব। বনিয়াদী শিক্ষার বর্তমান অবস্থায় কোন শিক্ষক কাজ করাতে গিয়ে হয়তো ছাত্রকে এক দিকে বহুদূর অগ্রসর করিয়ে দেবেন, অন্য দিকে অনগ্রসর রাখবেন—এমনটি ঘটা সম্ভব, কিন্তু কাজের ভেতর দিয়ে শিক্ষাদানের ফলে সকল সমস্যা সম্বন্ধেই শিশু মোটামুটিভাবে নিজেরই গরজে জেনে নেবে, এটুকু আশা করা যেতে পারে। আজও এই নূতন প্রচেষ্টার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রচিত হয় নি সে কথা সত্য, কিন্তু এই নূতন

দৃষ্টিভঙ্গী শিক্ষাকে এমন একটা নূতন রূপ দিয়েছে, যার ফলে শিক্ষা-ব্যবস্থার একটা নূতন যুগ সূচিত হচ্ছে বলা যেতে পারে।

আমাদের নূতন সমাজ-গঠনে এই শিক্ষা-ব্যবস্থার অপরিহার্যতা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে মোটামুটি আলোচনা করার চেষ্টা করলুম, ভবিষ্যতে আরও বিশদভাবে এ সম্বন্ধে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

শ্রীঅনিলমোহন গুপ্ত

উপসংহার

কবি তালপত্রের শেষপৃষ্ঠায় ধরিয়া ধরিয়া লিখিলেন, স্বহস্তোমমপ্রথমবয়স্ক কবি-কালিদাসস্য। লিখিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, প্রিয়ে, একবার এদিকে আগমন কর। প্রিয়ার কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। অগত্যা কবি তালপত্রের গুচ্ছ হস্তে লইয়া রন্ধনশালা অভিমুখে প্রয়াণ করিলেন। পাকরতা বিলাসবতী ধূমরক্তিম নয়ন কবির প্রতি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, কণ্ঠস্বর সপ্তমে উঠাইয়াছিলে কেন? গৃহে কি দিবালোকে দস্যুর আবির্ভাব হইয়াছে?

কবি উৎসাহপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, প্রিয়ে, মেঘদূত কাব্যের একটি উপসংহার রচনা করিয়াছি। নাম দিয়াছি হংসদূত।

নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কবিপত্নী কহিলেন, হংসদূত? ও নাম এবং বিষয় দুইই পুরাতন হইয়া গিয়াছে, নলরাজ দময়ন্তীর নিকট হংসদূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, সে কথা শিশুও জানে। এ সকল নচ্ছারপূর্ণ বিষয় ভবিষ্যৎ যুগের চ্যাংড়া কবিদের জন্য রাখিয়া দাও।

ক্ষুব্ধ কবি কহিলেন, প্রিয়ে, পুরাপুরি না শুনিয়াই যদি সমালোচনা আরম্ভ কর, তাহা হইলে তোমার সহিত ইতর অনভ্যান দিঙ্‌নাগাচার্যের প্রভেদ কি রহিল?

কবিপত্নী ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন, প্রভেদ কিছু রহিল বইকি! দিঙ্‌নাগাচার্যের প্রত্যহ পাকশালায় স্বামীর জন্য পিণ্ডের ব্যবস্থা করিতে হয় না। অবিলম্বে রন্ধন সমাপ্ত না করিয়া কাব্য শ্রবণ করিতে বসিলে শূন্যোদরে রাজসভায় যাইতে হইবে।

রুষ্টকণ্ঠে কবি কহিলেন, উদরপূর্তির চিন্তা পশুতেও করিয়া থাকে। তুমি আপাতত মৃৎস্থালীতে কাঠি দেওয়া বন্ধ করিয়া অবহিতচিত্তে হংসদূত মহাকাব্য শ্রবণ কর।

বিলাসবতী অবশ্য কাঠিসঞ্চালন বন্ধ করিলেন না, তবে যতদূর সম্ভব অবহিতা হইয়া কাব্যশ্রবণে প্রস্তুত হইলেন।

কবি পাঠ আরম্ভ করিলেন।

মেঘদূতের শেষে শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়া অসহ্য হৃদয়বেদনায় হতচেতন হইয়া যক্ষ সশব্দে ভূতলে পতিত হইল। স্বভাবত অলসপ্রকৃতি শ্রমবিমুখ বিলাসপরায়ণ যক্ষ প্রত্যহ কষ্ট করিয়া রন্ধন করিয়া উঠিতে পারিত না। কোন কোন দিন রামগিরি অরণ্যের বৃক্ষরাজি হইতে আম্রপনসাদি আহরণ করিয়া তদ্দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত। কিন্তু সে প্রভাতে আষাঢ়ের প্রথম জলধরদর্শনে প্রাণে যুগপৎ বিরহবেদনা ও কবিত্বের উদ্রেক হওয়ায় আহারের কথা মনে ছিল না। যক্ষের মূর্ছার কারণ বিরহজ্বালা নহে, উদরজ্বালা।

যাহা হউক, ক্ষণপরে মূর্ছাভঙ্গ হইলে ইতস্তত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া যক্ষ দেখিল, একটি রক্তচঞ্চু শুভ্রপক্ষ নধরদেহ রাজহংস পরমকৌতূহলসহকারে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে।

যক্ষ বিরক্ত হইয়া কহিল, কি দেখিতেছ? আমি কি পশুশালার কোনও অদৃষ্টপূর্ব প্রাণী, অথবা বানরাদি কোনও জীব?

হাসিয়া হংস কহিল, আহা, রাগ কর কেন? আমার মনে হইতেছিল, তুমি উপবাস-হেতু দৌর্বল্যবশত মূর্ছিত হইয়াছিলে। নিকটস্থ পুষ্করিণীতে বহুতর শফরী আদি মৎস্য রহিয়াছে। কয়েকটি আনিয়া দিব?

বিরক্ত কণ্ঠে যক্ষ কহিল, অয়ে হংস, তুমি কাণ্ডজ্ঞানহীনের মত কথা বলিও না। আমি বিরহবেদনায় চৈতন্য হারাইয়াছিলাম। ক্ষুধার জ্বালা আমাকে কোনও দিনই কাবু করিতে পারে না। তবে শফরীর কথা যাহা বলিলে, মন্দ বল নাই। গোটাকয়েক বড় বড় দেখিয়া শফরী লইয়া আইস, আমি ততক্ষণ পাকের আয়োজন করি। প্রত্যহ আম্র ও পনস ভক্ষণ করিয়া উদরে চড়া পড়িয়া গিয়াছে।

অবিলম্বে হংস বিশালপক্ষদ্বয়ে ভর দিয়া শূন্যমার্গে উঠিল, এবং দুই দণ্ড পরে চঞ্চুপুটে গুটিকয়েক শফরী আনিয়া যক্ষকে উপহার দিল। আহারান্তে শরীরে কিঞ্চিৎ বলাধান হইলে যক্ষ কহিল, হংস, তোমাকে বহু ধন্যবাদ। তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ।

প্যাঁক শব্দে হাস্য করিয়া পক্ষী কহিল, আমি তো পূর্বেই বলিয়াছিলাম, তোমার মূর্ছার কারণ বিরহযন্ত্রণা নহে, অনাহার।

কথাটা যক্ষের মনঃপূত হইল না। সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

একটু পরে হংস কহিল, বলি, মাথা কি খারাপ হইয়াছিল? ধূমজ্যোতিঃসলিল-মরুৎসন্নিপাত মেঘ নির্জীব পদার্থ, তোমার সংবাদ বহনের শক্তি তাহার কোনও কালেই নাই। এতক্ষণে হয়তো কয়েক যোজন দূরে বারিবর্ষণ করিয়া মেঘজন্মের লীলা শেষ করিয়া ফেলিয়াছে। অযথা প্রলাপ বকিতেছিল কেন?

হংসের রূঢ়বাক্যে যক্ষের ক্রুদ্ধ হওয়ার যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও সে তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া রহিল। তাহার মাথায় তখন অন্য মতলব খেলিতেছিল। মেঘ অবশ্যই সন্দেশ-বহনে অপটু, কিন্তু হংস কি দোষ করিল?

বককে নির্বাক দেখিয়া পক্ষী কহিল, সখে, যদি রুষ্ট হইয়া থাক, তাহা হইলে এ-বিষয়ে আর কিছু বলিব না।

বক কহিল, সখে হংস, তুমি শুধু রাজহংস নহ, হংসরাজ।

সন্দিগ্ধকণ্ঠে হংস কহিল, সহসা সুর বদলাইলে কেন? কোনও প্রার্থনা আছে নাকি?

সখে, তুমি সত্যই বলিয়াছিলে, আমি এতক্ষণ মেঘের নিকট অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকিতেছিলাম।

সন্তুষ্টকণ্ঠে হংস কহিল, এইবার বুদ্ধিমানের মত কথা বলিয়াছ। বাপু হে, মাত্র চার মাস বিরহযন্ত্রণা ভোগ করার পরেই তো আবার অলকাপুরীতে যাইবে, কোনওরূপে মাসচতুষ্টয় নাসিকাকর্ণ মুদিত করিয়া কাটাইয়া দাও, অযথা নির্বুদ্ধিতা করিয়া লোক হাসাইও না।

সখে, তুমি কোনও দিন আমার গৃহ দেখিয়াছ?

দেখিয়াছি বইকি! মন্দ স্থান নহে, বাপীটিও ভালই। তবে অত্যুক্তির চরম করিতেছিলে। মানস-সরোবরে না গিয়া কবে কোন্ হংস তোমার পুষ্করিণীতে পড়িয়া থাকে, তাহা তো জানি না!

আহা, ওসব কবিকল্পনায় কান দাও কেন? একটু বাড়াইয়া না বলিলে আমার ঐশ্বর্য সম্বন্ধে ইতর লোকের ধারণা হইবে কি করিয়া? কিন্তু তুমি আমার একটি উপকার কর।

ইতস্তত করিয়া হংস কহিল, তাহা বহু পূর্বেই উপলব্ধি করিয়াছিলাম। উপবেশনের আসন পাইলেই লোকে শয়নের জন্য পালঙ্কের অন্বেষণ করে। তা উপকারটি কি শুনি বাপু?

তুমি আমার প্রিয়াসকাশে গমন করিয়া তাহার সংবাদ আনয়ন করিয়া আমার প্রাণরক্ষা কর।

চঞ্চুব্যাদান করিয়া হংস কহিল, যাইরি আর কি! অযথা তোমার জন্য এই বিশতযোজন পথ শূন্যপথে অতিক্রম করিব, এত বড় মহাপুরুষ আমি নহি। তাহা ব্যতীত একনিষ্ঠ প্রেমের উপর আমার কোনও আস্থা নাই। আমার হংসী কয়েক দিন পূর্বে অপর এক হংসের সহিত পলায়ন করিয়াছে।

সখে, বকধর্ম ও পক্ষিধর্ম বিভিন্ন। তুমি তোমার বিশ্বাসঘাতিনী হংসীর কথা ভাবিয়া মন-খারাপ করিও না। আমার সরোবরে আগমন করিও, আমি রজতশুভ্রপক্ষবিশিষ্ট শত হংসী তোমার জন্য রাখিয়া দিব, তাহা ব্যতীত আমার সরোবরে অগণিত গুগলি, শম্বুক প্রভৃতি সুখাদ্য বর্তমান, তুমি পরমানন্দে কালযাপন করিতে পারিবে।

এরূপ প্রলোভন পাইলে দেবতাগণও মত পরিবর্তন করিয়া ফেলেন, হংস তো সামান্য

পক্ষী মাত্র। সে সানন্দে কহিল, উত্তম প্রস্তাব, আমি তোমার গৃহে গমন করিয়া তোমার প্রিয়তমার সংবাদ আনয়ন করিব। কিন্তু ফিরিতে অন্তত এক মাস লাগিবে।

এক মাস? আমি তো জানিতাম হংসজাতি বায়ুবেগে ভ্রমণ করে, অত সময় লাগিবে কেন?

হংস কহিল, ওহে যক্ষ, আমারও তোমার ন্যায় ভোজন শয়ন বিশ্রাম প্রভৃতি কয়েকটি অবশ্যকর্তব্য দৈনন্দিন কর্ম আছে। এক মাসের কমে হইবে না।

অগত্যা যক্ষ স্বীকৃত হইল।

যাত্রারম্ভের পূর্বে যক্ষ কহিল, হংসো, তোমাকে পথটা বলিয়া দিই। গন্তব্য স্থল অলকা—

বাধা দিয়া হংস কহিল, থাক থাক, এতক্ষণ মেঘের নিকট যাহা বলিতেছিলে, সবই আমার কর্ণগোচর হইয়াছে, এবং পথও আমার অজ্ঞাত নহে।

হংস উন্নতপাল অর্ণবপোতের ন্যায় বিস্তৃতপক্ষ হইয়া আকাশে উঠিল, এবং ক্ষণকাল মধ্যেই অলকাপুরীর পথ ধরিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

যক্ষ একাকী রামগিরি আশ্রমে হংসদূতের আগমনপ্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

বিরহবেদনা অসহনীয় হইলে যক্ষ গৈরিকমৃত্তিকা দ্বারা শিলাতলে প্রেয়সীর প্রতিকৃতি অঙ্কণে প্রচেষ্ট হইত। কিন্তু চিত্রাঙ্কণে তাদৃশ অভিজ্ঞতা না থাকায় শিব গড়িতে বানর গড়িত। বস্তুত যক্ষপ্রিয়ার আকৃতির সহিত যদি অঙ্কিত চিত্রের কোনও সাদৃশ্য থাকিত, তাহা হইলে প্রিয়াবিরহে কাতর হইবার কোনও সঙ্গত হেতু থাকিত না।

যক্ষ প্রতিদিন অধীরহৃদয়ে হংসদূতের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অবশেষে পূর্ণমাসান্তে একদিন সে বঁড়শসূত্রনিবদ্ধ বংশদণ্ড সহযোগে মৎস্যহননকার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে, এমন সময় শূন্যমার্গে পক্ষশব্দ শ্রুত হইল। সদ্যধৃত একটি বাটামৎস্য বেত্র-পেটিকায় রাখিয়া যক্ষ সানন্দে উঠিয়া দাঁড়াইল। দুই-চারি বার চক্র দিয়া হংস যক্ষের অনতিদূরে শিলাপৃষ্ঠে অবতরণ করিল।

উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া যক্ষ কহিল, স্বাগত, বন্ধু, স্বাগত! তুমি আমার বিরহক্লিষ্টা প্রিয়ার সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছ, নিকটে আসিয়া আমার আলিঙ্গন গ্রহণ কর।

শিরঃসঞ্চালন করিয়া পক্ষী কহিল, ভো যক্ষ! আমি তোমার সম্ভাষণে প্রীত হইলাম। কিন্তু তুমি যক্ষ হইলেও মনুষ্যজাতির জ্ঞাতি, তোমার অতি নিকটে গমন নিরাপত্তার খাতিরে পক্ষিজাতির নিষিদ্ধ। আমি দূর হইতেই তোমার প্রিয়ার সংবাদ জ্ঞাপন করিব, তুমি শুনিও। কিন্তু তৎপূর্বে পেটিকা হইতে গোটাকতক বাটামৎস্য প্রদানে আমার ক্ষুধা ও ক্লান্তি দূর কর।

পঞ্চসংখ্যক বাটামৎস্যে তৃপ্ত হইয়া হংস কহিল, এইবার তুমি প্রশ্ন করিতে পার, আমি যথাসাধ্য উত্তর দিব।

সাগ্রহে যক্ষ কহিল, প্রথমত, আমার ধনাগারের কিরূপ অবস্থা দেখিলে?

পক্ষী কহিল, ধনাগারের দ্বারদেশে শূল এবং ধনুর্বাণ হস্তে যে বিকটদর্শন দ্বারপাল দাঁড়াইয়া আছে, তাহাকে এড়াইয়া সেখানে প্রবেশ করা আমার কর্ম নহে।

আমার প্রাসাদ চূণকাম করা হইয়াছে?

হাঁ, তাহা হইয়াছে বটে। তবে তোমার পুষ্করিণীতে হংসেতর বকসারসহাড়গিলাদি নানা প্রকার নিম্নশ্রেণীর পক্ষীর আবির্ভাব হইয়াছে। তুমি ফিরিয়া একটা কিছু বিহিত করিও।

যক্ষ পুনরপি কহিল, আমার প্রিয়াকে কেমন দেখিলে? আমার বিরহে নিশ্চয় প্রত্যহ কৃষ্ণপক্ষের শশিকলার ন্যায় ক্ষীয়মাণা হইতেছে? তাহার একবেণীবদ্ধ কেশপাশ নিশ্চয় তৈলাভাবে রুক্ষ, গাত্রে খড়ি উঠিতেছে? তাহার হস্তপদ—

বাধা দিয়া হংস কহিল, বাপু হে, একসঙ্গে অতগুলি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নহে। তোমার বিরহখিন্না প্রিয়ার যে কাল্পনিক বর্ণনা মেঘের নিকট দিয়াছিলে, তাহা আমার স্মরণ আছে। আমিও ভাবিয়াছিলাম, সেইরূপই দেখিব।

কি দেখিলে?

দেখিলাম, তোমার প্রিয়া স্বর্ণপর্যঙ্কে অলসভাবে অর্ধশায়িতা রহিয়াছেন, দাসীগণ মিলিয়া তাঁহার পরিচর্যা করিতেছে।

বিষণ্ণমুখে যক্ষ কহিল, সম্ভবত আমার বিহনে বিকলা হইয়া মূর্ছাপন্না হইয়াছিলেন।

হইতে পারে। দেখিলাম, দাসীগণ ফেনক ও সুগন্ধি তৈল সহযোগে তোমার প্রিয়ার গাত্রমার্জনা করিয়া সুরভিত উষ্ণজলে স্নাত করাইল। তৎপরে কৃষ্ণাগুরুধূপসুরভিত ধূমে কেশপাশ শুষ্ক করিয়া কুন্দকুসুমসহযোগে কবরীবন্ধন করিয়া দিল। মোটের উপর তোমার প্রেয়সী দেখিতে নেহাত মন্দ নহেন।

ক্রুদ্ধকণ্ঠে যক্ষ কহিল, অরে হংস, তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ। আমার প্রেয়সী একবেণীনিবদ্ধ কেশ লইয়া আমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

আগমনপ্রতীক্ষা কাহারও না কাহারও নিশ্চয় করিতেছেন, তবে কাহার জন্ম, তাহা আমি জ্ঞাত নহি। আর তোমাকে মিথ্যা কথা বলিয়া আমার কোনও লাভ নাই। যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলিতেছি, ইচ্ছা না হয় বিশ্বাস করিও না।

যক্ষ কহিল, তাহার পর কি হইল?

তাহার পর দাসীগণ সযত্নে তোমার প্রিয়ার কপোলে ও উরসে কুঙ্কুমসহযোগে

পত্রলেখা অঙ্কিত করিয়া তাঁহাকে সুচারু কঞ্চুক ও দুকূলে আবৃতা করিয়া সর্বালঙ্কারভূষিতা করিয়া দিল। পূর্বেই বলিয়াছি, তোমার গৃহিণী অন্যের মধ্যে দেখিতে মন্দ নহেন।

রুদ্ধনিশ্বাসে যক্ষ কহিল, তাহার পর ?

রন্ধনশালা হইতে সুমধুর গন্ধ আসিতেছিল। কৌতূহলী হইয়া নিকটে গিয়া দেখি, সুপকারগণ নানাপ্রকার সুখাদ্য প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত। কুক্কুটমাংস শূল্যপক্ক হইতেছে, রোহিত, চেঙ্গটি প্রভৃতি মৎস্য কালিয়া প্রভৃতি ব্যঞ্জনে পরিণত হইতেছে।

তাহার পর ?

তাহার পর তোমার পত্নীর কক্ষে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিলাম, তাঁহার প্রসাধন শেষ হইয়াছে, পার্শ্বে দণ্ডায়মানা তাম্বূলকরঙ্কবাহিনীর নিকট হইতে ক্ষণে ক্ষণে তাম্বূল গ্রহণ করিয়া পরমপরিতোষসহকারে চর্বণ করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে অপরা কিঙ্করীর নিকট হইতে চষক লইয়া নিঃশেষ করিতেছেন।

তাহার পর ?

তাহার পর এক দাসী আসিয়া তাঁহার কর্ণে কি যেন নিবেদন করিল, তিনি সাগ্রহে কহিলেন, ভিতরে লইয়া আয়।

কাহাকে ?

সেই কথাই তো বলিতেছি। দাসী অন্তর্হিতা হইল, এবং ক্ষণপরে একটি সুবেশ কন্দর্পোপম যক্ষযুবককে সঙ্গে লইয়া প্রত্যাবর্তন করিল। তাহাকে দেখিয়া তোমার প্রেয়সীর কমলানন পায়সান্নসিক্ত পাটিসাপ্টাপিষ্টকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

গাত্রোত্থান করিয়া যক্ষ কহিল, আর না সখা, যথেষ্ট হইয়াছে। তুমি আমার পরম বন্ধু, আমার প্রিয়ার সন্দেশ বহন করিয়া আনিয়াছ। তুমি শুধু রাজহংস বা হংসরাজ নহ, পরন্তু পরমহংস। নির্বাসনকাল অতীত হইলে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াই তোমার জন্য আমার মরকতসোপানবিশিষ্ট বাপী শৈবালমুক্ত করিয়া শতাধিক হংসী ছাড়িয়া দিব। তুমি সেখানে সুখে কালাতিপাত করিবে।

হংস সানন্দে কহিল, অহো সখে, তুমি আমার শুভার্থী সন্দেহ নাই। তোমার নির্বাসনের মাত্র মাসত্রয় অবশিষ্ট রহিয়াছে, পূর্ণকালান্তে আমি অবশ্যই অলকাপুরীতে তোমার আতিথ্য গ্রহণ করিব।

যক্ষ কহিল, তাহা তো করিবেই, আপাতত নিকটে আইস, আমি তোমার সুকোমল পক্ষে হস্তসংবাহন করিয়া আমার হৃদয়ের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

একটু ইতস্তত করিয়া হংস কহিল, তথাস্তু। কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি করিও না।

হংস নিকটে আসিবামাত্র যক্ষ কঁ্যাক করিয়া তাহার গলদেশ ধারণ করিল।

বেদনাহত হংস কহিল, আঃ! কি করিতেছ? লাগে না বুঝি? অত আদর আমার সহ্য হয় না।

বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া বক পক্ষীর গলদেশে মোচড় দিল। দুই-একবার পক্ষ সঞ্চালন এবং অস্ফুট প্যাঁকপ্যাঁক ধ্বনি করিয়া হংস বিগতপ্রাণ হইল। অতঃপর বক অগ্নিপ্রজ্বালিত করিয়া পক্ষীমাংস শূল্যপক্ক করিবার আয়োজন করিতে লাগিল।

কবিপ্রিয়ার ডালে কাঠিপ্রদান বহু পূর্বেই সমাপ্ত হইয়াছিল। অন্ন হইতে ফেন নিষ্কাশিত করিতে করিতে তিনি কহিলেন, বাঃ, বেশ হইয়াছে।

আনন্দিতকণ্ঠে কবি কহিলেন, আমি জানিতাম, তোমার ভাল লাগিবে।

কবিপ্রিয়া কহিলেন, কাব্যখানি একবার আমার হাতে দিবে? দন্তাননা মালিনীর শ্রবণের পূর্বে তো তোমার কোনও কাব্যশ্রবণ আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। একবার স্পর্শ করিয়া ধন্য হইব।

কবি সলজ্জে প্রিয়ার হস্তে কাব্য অর্পণ করিলেন।

ক্ষিপ্রহস্তে কবিপ্রিয়া কাব্যখানি প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রদান করিলেন, ক্ষণকাল মধ্যে ব্যাকুল কবির আর্তচীৎকার উপেক্ষা করিয়া তালপত্ররচিত কাব্য ভস্মীভূত হইয়া গেল।

কাতরকণ্ঠে কবি কহিলেন, প্রিয়ে, এ কি করিলে?

ধীর শান্তস্বরে কবিপত্নী কহিলেন, ঠিকই করিয়াছি। আর ভো অল্পায়ু, দন্তানন, হতশ্রী, হাড়হাবাতে মিন্‌সে, ভবিষ্যতে এরূপ কাব্য রচনা করিলে মুণ্ডিত সম্মার্জনী সহকারে পৃষ্ঠের চর্ম উত্তোলিত করিয়া লইব।

কবি বিমূঢ়ের মত চাহিয়া রহিলেন।

বিলাসবতী কহিলেন, রন্ধন সমাপ্ত হইয়াছে, এইবার স্নান করিয়া আইস। পিণ্ড গিলিতে হইবে না?

কবি ধীরে ধীরে শিপ্রানদীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

সেই দিনই সন্ধ্যায় মনে মনে প্রিয়তমাকে শ্যালিকাসম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া কবি শৃঙ্গাররসাষ্টক কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিলেন—

অবিদিতসুখদুঃখং নির্গুণং বস্তু কিঞ্চিৎ জড়মতিরিহ —

শ্রীআর্দ্রকুমার সেন

সপ্তর্ষি

৩

শশাঙ্ক-শুভ্র

ক

কোন দামী মোটরকার যদি দৈব-দুর্ব্বিপাকে বার বার ধাক্কা খেয়ে ভেঙে-চুরে যায় এবং যদি একাধিক মূর্খ মিস্ত্রী সস্তায় সেটাকে সারিয়ে দেবার ওজুহাতে নানা রকম জোড়া-তালি লাগায় তাতে, তা হ'লে তার যা অবস্থা হয়, শশাঙ্ক-শুভ্রের বর্ত্তমান অবস্থা অনেকটা তাই। শশাঙ্ক-শুভ্র মোটরকার নন—মানুষ, তাই অবস্থাটা জটিলতর।

প্রথম ধাক্কা খান যৌবনের প্রারম্ভে। বর্ত্তমানের সাহেবী স্যুট-পরা প্রৌঢ় শশাঙ্ক-শুভ্রকে দেখে অনুমান করা কঠিন যে, যৌবনের প্রারম্ভে তিনি একদা বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে ক্ষুব্ধ হয়ে বোমার দলে যোগ দিয়েছিলেন। দেশের বাগদীদের সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করবার কল্পনাও তাঁর মাথায় একদিন এসেছিল। সখারাম গণেশ দেউস্করের বই, বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ গান, সুরেন বাঁড়ুজ্যের বক্তৃতা, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' তাঁরও চিত্তকে উদ্বোধিত করেছিল সেদিন স্বাধীনতার মন্ত্রে। বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে মেরে কানাইলাল যখন ফাঁসি গেলেন, তখন যুবক শশাঙ্ক-শুভ্রও ঠিক ক'রে ফেললেন যে, ওঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন তিনি। ও পথে বিনা-বাধায় চলতে পেলে তিনি ঠিক কি যে হতেন, তা এখন আন্দাজ করা শক্ত। কিন্তু সে পথে চলবারই সুযোগ তিনি পান নি ভালভাবে। যাত্রা করবার মুখেই তিনি ধাক্কা খেলেন। পথ-রোধ ক'রে দাঁড়ালেন পিতা হংস-শুভ্র স্বয়ং। অনুগৃহীত একজন পুলিস-কর্ম্মচারীর মুখে যেই তিনি খবর পেলেন যে, শশাঙ্ক বোমার দলে মিশেছেন, অমনই তিনি ডেকে পাঠালেন তাঁকে।

তুমি বোমার দলে যোগ দিয়েছ শুনছি।

দিয়েছি।

ও দলে যোগ দেবার মত মনের জোর আছে তোমার?

আছে।

বেশ, দেখা যাক।

ড্রয়ার থেকে প্রকাণ্ড একটা চকচকে ছোরা বার ক'রে বললেন, এই নাও। আমি বেঁচে থাকতে তোমাকে কিছুতেই বোমার দলে যেতে দেব না। তোমার যদি মনের জোর থাকে, এই ছোরা আমার বুকে বসিয়ে দিয়ে চ'লে যাও।

ছোরা হাতে ক'রে নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন শশাঙ্ক-শুভ্র।

হংস-শুভ্র বললেন, বুঝেছি। দাও ছোরাখানা। ইংরেজদের তাড়াবার চেষ্টা না ক'রে ওদের ভাল গুণগুলো নেবার চেষ্টা কর। তোমাকে বিলেত পাঠাব ঠিক করেছি, তার জন্যে প্রস্তুত হওগে যাও।

বিলেত যাওয়ার নামে স্বদেশ-প্রেম কর্পূরের মত উবে গেল যেন।

ধাক্কাটা সামলাতে মাসখানেক লেগেছিল তবু।

মাস ছয়েক পরে বিলেত চ'লে যান তিনি।

দ্বিতীয় ধাক্কাটা খেয়েছিলেন বিলেতে—জনৈক বন্ধুর সঙ্গে সাহেবিয়ানায় পাল্লা দিতে গিয়ে। সেও আজ অনেক দিনের কথা। প্রেসিডেন্সি কলেজে যে ছেলেটির সঙ্গে সবচেয়ে বেশি ভাব হয়েছিল, সেই ছেলেটিই যে ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁর অধঃপতনের কারণ হবে—এ কথা তখন কে ভেবেছিল! অন্তরঙ্গতার অন্তরালে যে ঈর্ষ্যার বীজ লুকায়িত ছিল, তা প্রথম অঙ্কুরিত হ'ল একটি তরুণী মেমসাহেবকে কেন্দ্র ক'রে। সনৎকুমারও সুশ্রী, অভিজাত-বংশীয় ধনীর সন্তান, শশাঙ্কর চেয়ে কোন অংশে কম তো নয়ই, বরং কোন কোন বিষয়ে এক-কাঠি বাড়া। ছিপছিপে চেহারা, স্মার্ট যাকে বলে তাই। শশাঙ্ক ছিলেন একটু মোটা নাদুস-নুদুস গোছের। নাচের আসরে কন্দর্পের বিচারে তাঁরই জিত হ'ল, বরমাল্যও হয়তো তাঁরই গলায় দুলত, যদি স্বয়ং কুবের এসে মধ্যস্থতা না করতেন। নিছক টাকার জোরে শশাঙ্ক তাকে ছিনিয়ে নিয়ে, ঠিক পত্নীত্বে নয়, প্রণয়িনীত্বে বরণ করলেন। সনৎকুমার মুচকি হেসে চুপ ক'রে রইলেন। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হ'ল, হারটা স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। কিন্তু সপ্তাহখানেক পরেই শশাঙ্ককে হৃদয়ঙ্গম করতে হ'ল যে, এই স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশে কোন ললনারই চরণে বা কণ্ঠদেশে কোন রকম শৃঙ্খলেরই স্থায়ী স্থান নেই, এবং তা নিয়ে হৈ-চৈ করাটা শুধু যে নিষ্ফল তা নয়, অশোভনও। দেঁতো হাসি হেসে শিভ্যাল্‌রির অভিনয় করা ছাড়া উপায় নেই। সপ্তাহখানেক পরে তাই তিনি যখন টের পেলেন, তাঁরই দেওয়া সাড়ে সাতশো পাউণ্ডের নেকলেস গলায় ঝুলিয়ে

তাঁর প্রণয়িনী সনৎকুমারের সঙ্গে প্যারিস-ভ্রমণে গেছেন, তখন আরও কয়েক পাউণ্ড খরচ ক'রে জরুরি তার-যোগে তাঁকে উচ্ছ্বসিত আনন্দ-জ্ঞাপনও করতে হ'ল। মর্ম্মান্তিক সত্যটা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব ক'রেও কিন্তু শশাঙ্ক-শুভ্র থামতে পারলেন না। টাকা ঢালতে লাগলেন। যাঁদের টাকা ছাড়া আর কোন সম্বল নেই, তাঁদের টাকার ওপর অগাধ বিশ্বাস। তাঁদের ধারণা, টাকায় শেষ পর্য্যন্ত সব হয়। আকাশে পোস্ট-অফিস থাকলে সূর্য্য-চন্দ্র গ্রহ-নক্ষত্রকেও ঘুষ দেবার চেষ্টা করতেন বোধ হয় তাঁরা। বড়লোকের ছেলে শশাঙ্ক-শুভ্র দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে শুধু প্রণয় বাবদে নয়, নানা বাবদে টাকা খরচ ক'রে সনৎকুমারের সঙ্গে টক্কর দিতে লাগলেন। শেষটা হংস-শুভ্র প্রতিবাদ করতে বাধ্য হলেন। বিশুদ্ধ ইংরেজীতে পুত্রকে তিনি যা লিখলেন, তার বাংলা অনুবাদ হচ্ছে—প্রিয় বৎস, একটা কথা যদি মনে রাখ, ভবিষ্যতে তোমারই উপকার হবে। প্রিন্স দ্বারকানাথের মত ধনীও অজস্র অপব্যয়ের আঘাতে কাবু হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর তুলনায় আমাদের আয় সামান্য। বছরে মাত্র দশ লাখ টাকা। তোমার আরও চারটি ভাই, দুটি বোন আছে। প্রত্যেকের ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রেখে তাই তোমাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, তোমার বরাদ্দ মাসহারার বেশি তুমি যা খরচ করবে, তা তোমার নামে লেখা থাকবে এবং তা তোমার অংশের প্রাপ্য থেকে বাদ যাবে ভবিষ্যতে। আর একটা কথা মনে রাখলেও সংযত হতে পারবে। কৃপণতা ক'রে অকারণ কৃচ্ছ্রসাধন করা যেমন নোংরামি, বাহাদুরি ক'রে পাঁচজনকে তাক লাগিয়ে দেবার জন্যে অকারণ অপব্যয় করাটাও তার চেয়ে কম নোংরামি নয়।

কিছুকালের জন্য সংযত হলেন শশাঙ্ক-শুভ্র এবং সেই সংযমের যুগেই কেম্ব্রিজের ডিগ্রীটা অর্জ্জন করলেন। সনৎকুমার হলেন ব্যারিস্টার। শশাঙ্ক-শুভ্রও যদি ব্যারিস্টারি পাস ক'রে আসতেন, তা হ'লে পরবর্ত্তী যুগে জটিলতর সমস্যায় পড়তে হ'ত না তাঁকে। স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করবার একটা পথ উন্মুক্ত থাকত। তিনি বিদেশী সভ্যতার হাব-ভাব কায়দা-কানুন সমস্ত আয়ত্ত করলেন, করলেন না কেবল বিদেশী প্রথায় টাকা রোজকার করবার কৌশলটা। চাকরি করলে কেম্ব্রিজের ডিগ্রীটা হয়তো কাজে লাগতে পারত, যদি প্রথম প্রথম—মানে, বয়স থাকতে থাকতেই—তিনি সেটাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু বোমার দলে যিনি একদিন যোগ দিয়েছিলেন, 'অন প্রিন্সিপল'

তিনি চাকরির বিরোধী ছিলেন। বিলেত থেকে ফিরে আসবার পর তিনি যা করতেন, প্রায়ই 'অন্ প্রিন্সিপ্‌ল' করতেন।

ফিরে এসে 'অন্ প্রিন্সিপ্‌ল'ই তিনি কংগ্রেসে যোগ দিলেন। পুরাতন যোগসূত্রকে পুনঃস্থাপন করবার জন্যই নয়—নূতন ক্ষুধাও একটা অনুভব করছিলেন। কিছুদিন আগেই রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। বিবেকানন্দের দিগ্বিজয়ের পর যে জাতীয়তা-বোধ কালক্রমে মিইয়ে এসেছিল, রবীন্দ্রনাথ তাতে যেন প্রাণসঞ্চার করলেন। জগত-সভায় ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব আবার নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হ'ল যখন, তখন ভারতের জাতীয়তার প্রতীক যে কংগ্রেস তাতে যোগ না দেওয়াটা ঘোরতর অকর্ত্তব্য ব'লেই মনে হ'ল শশাঙ্ক-শুভ্রের। গোখলে কিছুদিন আগে মারা গেছেন। ছাড়া পেয়েছেন তিলক। বিরুদ্ধপন্থী গোখলের চিতাপার্শ্বে তিলকের বক্তৃতাটা শশাঙ্ক-শুভ্রের এমন মর্ম্মস্পর্শ করল যে, তিলক-ভক্ত হয়ে পড়লেন তিনি হঠাৎ। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী গোখলের 'সার্ভেন্ট অব ইণ্ডিয়া'র অধিনায়কত্ব করছেন বটে, কিন্তু তিলক তাঁর প্রাণেও সাড়া তুলেছেন। কোন্ কুল রাখবেন ঠিক করতে পারছেন না তিনি। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ও নেতা হবার মত শক্তি সংগ্রহ করতে পারেন নি। লালা লাজপত রায় দেশের ব্যাপারে বিরক্ত হয়ে একরকম বানপ্রস্থই অবলম্বন করেছেন আমেরিকায়। এস. পি. সিন্‌হা বম্বেতে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হলেন বটে, কিন্তু তাঁর সুর পছন্দ হ'ল না কারও। তিলকেরই নেতা হবার কথা; কিন্তু ফিরোজ শা মেটা প্রভৃতি বুড়োর দল বাগড়া দিতে লাগলেন ব'লে শশাঙ্ক-শুভ্রের রাগ হ'ল খুব। এ নিয়ে রাগারাগি তর্কাতর্কি ঘোরাঘুরি কম করেন নি, এস. পি. সিন্‌হার সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করেছিলেন এবং কিছু করতে না পেরে শেষে যোগ দিয়েছিলেন তিলকের 'হোম-রুল লীগে'ই। তিলকের হোম-রুল আর পত্নী বাসন্তীর হোম-রুল কিন্তু এক নয়; তা ছাড়া বাসন্তীর বাবা একজন রায়-বাহাদুর। মনের প্রত্যক্ষলোকে কিন্তু তিলক-ভক্তিটা প্রাণপণে জাগ্রত রাখবার চেষ্টা করেছিলেন শশাঙ্ক-শুভ্র। তিলকই তাঁকে 'ডিস্‌গাস্‌টেড' হবার সুযোগ দিলেন। তাঁর খুব খারাপ লাগল, যখন বিদ্রোহী তিলক মডারেটদের সঙ্গে আপোস ক'রে কংগ্রেসে ঢুকতে রাজি হলেন। যে ন্যাশনালিজমের বিপ্লবী সুর তুলেছিলেন তিনি, শশাঙ্কর মনে তা অনেকখানি নেমে গেল যেন। একটা 'থিওরি'ই খাড়া ক'রে ফেললেন তিনি—এ দেশের

জল-হাওয়ায় বিদ্রোহ টিকতে পারে না—ভারি স্যাঁতসেঁতে দেশটা। স্যাঁতসেঁতে দেশ ছাড়াও যে প্রবলতর আর একটা কারণ আছে, তার প্রমাণও পাওয়া গেল। যতীন মুখুজ্যে বালাশোরের জঙ্গলে পুলিসের সঙ্গে লড়তে লড়তে প্রাণ দিলেন। বিবাহ করার ফলেই হোক বা বিশ্লেষণ করার ফলেই হোক, শশাঙ্ক-শুভ্রের ধারণা হ'ল, এ দেশে বিপ্লব-পন্থা অনুসরণ করা মানে প্রাণ দেওয়া বা সময় নষ্ট করা। কোনটা করতেই প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। অথচ স্বদেশী কিছু একটা করবার জন্যে প্রাণ আকুল হয়ে উঠেছিল। এই সময় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র শিক্ষিত বাঙালীর ছেলেকে ডাক দিয়ে বললেন—তোমরা ব্যবসা কর; স্বাধীন ব্যবসা ক'রে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করাটাই দেশসেবা করা। কথাটা বড় ভাল লাগল। যুদ্ধ বেধেছে, এই সময় দেশী 'ইন্‌ডাস্ট্রি'গুলোকে সচেতন ক'রে তোলা যেতে পারে। আর একটা থিওরিও খাড়া করলেন। ইংরেজরা বণিক, আঁতে ঘা দিলেই ওরা টলবে। কতকগুলো কেরানী, উকিল আর মাস্টারের বাজে চীৎকার ওরা গ্রাহ্য করবে কেন? হঠাৎ ব্যক্তিগত একটা কথা মনে পড়াতে আরও বেশি উৎসাহিত হলেন। সনৎ ব্যারিস্টারি ক'রে আর কটা টাকা রোজকার করতে পারবে? আমি যদি ভাল ক'রে ব্যবসা করতে পারি, তরতর ক'রে দুদিনেই উঠে যাব ওকে ছাড়িয়ে। ব্যবসাই করতে হবে।...থিওসফি ত্যাগ ক'রে অ্যানি বেসাণ্ট যখন 'সম্মিলিত' কংগ্রেসের অধিনেত্রী হয়ে পুরো দমে হোম-রুল আন্দোলন শুরু করেছেন, শশাঙ্কর মাথায় তখন অঙ্কুরিত হচ্ছে নানা রকম ব্যবসার প্ল্যান।

তৃতীয় ধাক্কা এইবার খেতে হ'ল। ব্যবসা করতে হ'লে টাকা চাই এবং টাকার মূল উৎস হংস-শুভ্র। তুচ্ছ তুচ্ছ কারণে তাঁর সঙ্গেই মনান্তর ঘটতে লাগল।

বিলেত থেকে ফিরে আসবার পর শশাঙ্ক-শুভ্র যা করতেন, 'অন্‌ প্রিন্সিপ্‌ল'ই করতেন। সুতীক্ষ্ণ একটা বিলিতী বিবেক তাঁর দেশী মস্তিষ্ক-বিবরে আড্ডা গেড়েছিল। হংস-শুভ্রের সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণ এই বিবেকই। হংস-শুভ্র নিজে এককালে খুব সাহেব ছিলেন, এখন কিন্তু সাহেবিয়ানা তাঁর চক্ষুশূল। বিদেশী সভ্যতার আপাত-চটকদার জৌলুস একদিন তাঁর চোখকে ধাঁধিয়ে দিয়ে তাঁকে প্রতারিত করেছিল ব'লেই সে জৌলুসের ওপর এখন তিনি জাতক্রোধ। দেহ এবং মন থেকে বাজে বিলিতী খোলসটাকে দূর ক'রে দিয়ে যখন নিজের

চতুর্দ্দিকে হংস-শুভ্র সনাতনী পরিবেষ্টনী গ'ড়ে তুলতে শুরু করেছেন, তখন শশাঙ্ক বিলেত থেকে ফিরলেন এবং পরিবর্ত্তিত পিতাকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। প্রথম প্রথম এ নিয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্য করেন নি তিনি। কিন্তু ক্রমেই দেখলেন, যাকে বার্দ্ধক্যজনিত মস্তিষ্ক-বিকৃতি ভেবে সানুকম্প লঘু হাস্যভরে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তা মোটেই লঘু হাসিতে উড়ে যাবার মত হালকা জিনিস নয়। আঘাত ক'রেও তাঁকে বিচলিত করা গেল না, কয়েকটা স্ফুলিঙ্গ উড়ল শুধু,- এবং তাতে ক্ষতি হ'ল শশাঙ্ক-শুভ্রেরই। হংস-শুভ্রের মনস্তত্ত্বটা তিনি বুঝতে পারেন নি সম্ভবত। পারলে এত কাণ্ড হয়তো হ'ত না। হংস-শুভ্র সেকালে যেমন উগ্র সাহেব ছিলেন, একালে তেমনই উগ্র হিন্দু হয়েছেন। তফাত শুধু এই যে, উগ্র সাহেব হংস-শুভ্র তাঁর পারিপার্শ্বিককে মনের মত ক'রে গড়বার সুযোগ পেয়েছিলেন, ছেলেমেয়েদের সেই আদর্শে মানুষ করেছিলেন ; কিন্তু উগ্র হিন্দু হংস-শুভ্র বৃদ্ধ বয়সে নিজের দলে কাউকে পেলেন না। সাহেব হংস-শুভ্রের কীর্ত্তিকলাপ হিন্দু হংস-শুভ্রের শান্তি বিঘ্নিত করতে লাগল এবং এইটেই বোধ হয় তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। কিন্তু তিনি আত্মসমর্পণ করলেন না কারও কাছে, তাঁর নবতম ধ্বজাকে উদ্যত ক'রে বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যেও নিজের দুর্গে অটল হয়ে রইলেন। আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে যাই হোক আধিভৌতিক হিসেবে এতে শশাঙ্ক-শুভ্রেরই ক্ষতি হ'ল।

পিতার সঙ্গে শশাঙ্ক-শুভ্রের প্রথম সংঘর্ষের কাহিনীটা এই রকম। পিতামহ যোগীশ্বর এককালে স্বগ্রামে জগদ্ধাত্রীপূজা করতেন। শিব-শুভ্র কিছুকাল করেছিলেন, পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। যোগীশ্বরের আদি নিবাস সেই হিঙ্গুল গ্রামে পুরাতন বাস্তু-ভিটা সংস্কার করিয়ে জগদ্ধাত্রীপূজা পুনঃপ্রবর্ত্তন করেছিলেন হংস-শুভ্র। হিঙ্গুল গ্রাম স্থানটি মোটেই সুগম নয়। রেল-স্টেশন থেকে দশ মাইল দূরে, কাঁচা-রাস্তায় গরুর গাড়ি ক'রে যেতে হয়। বলা বাহুল্য, এসব বাধা প্রবুদ্ধ হংস-শুভ্রকে নিরস্ত করতে পারে নি। তিনি প্রতি বছর হিঙ্গুল গ্রামে যেতেন এবং আত্মীয়-স্বজন জ্ঞাতি-বর্গ সকলকে নিমন্ত্রণ ক'রে মহাসমারোহে জগদ্ধাত্রীপূজা যথানিয়মে করতেন। পানাপুকুরের জল, মশার কামড়, সুখাদ্যের অভাব প্রভৃতি তাঁকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারে নি। তাঁর ছেলেমেয়েদের মধ্যে মৃগাঙ্ক ও ইন্দু তাঁর সঙ্গে প্রায় প্রতি বছরই হিঙ্গুল গ্রামে গিয়েছে। প্রথম যখন পূজা আরম্ভ হয়, তখন হিমাংশু সিতাংশু সুধাংশু—

তিনজনেই বিলেতে। শশাঙ্ক ফিরেছেন এবং কিছুদিন হোম-রুল ক'রে অবস্থান করছেন শ্বশুরবাড়ি দিল্লীতে। হংস-শুভ্র তাঁকে আসতে লিখেছিলেন, কিন্তু তিনি আসেন নি। অক্ষমতা এবং দুঃখ জ্ঞাপন ক'রে একখানা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন মাত্র। হিমাংশু, সিতাংশু এবং সুধাংশুকেও হংস-শুভ্র পত্র-যোগে পূজার খবরটা সাড়ম্বরে জানিয়েছিলেন। আশা করেছিলেন, উত্তরে তারাও অনুরূপ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করবে। তিনজনেরই উত্তর এসেছিল, কিন্তু উৎসাহ প্রকাশ করা দূরের কথা, এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখই কেউ করে নি। হিমাংশুর চিঠি এক সুইডিশ প্রফেসারের গুণগানে ভরতি ছিল। ডোমিনিয়নের ডেলিগেট্স, বিকানীরের মহারাজা এবং সার্ এস. পি. সিন্হাকে নিয়ে বিলেতে তখন যে ইম্পিরিয়াল ওয়ার কন্ফারেন্স বসেছিল, তাতে এস. পি. সিন্হার বক্তৃতায় 'ব্রিটিশ পাব্লিক' যে কি রকম মুগ্ধ হয়েছে, তারই বর্ণনা করেছিল সুধাংশু। আর সিতাংশু ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল অ্যানি বেসান্ট, অ্যারুন্ডেল এবং ওয়াডিয়ার 'অন্তরিত' হওয়ার খবরে এবং উল্লাস প্রকাশ করেছিল মিস্টার জিন্না হোম-রুল লীগে যোগ দিয়েছেন ব'লে। বিলেতে ব'সেও ভারতবর্ষের খবর নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল সে। সুরেন বাঁড়ুজ্যে, রাসবিহারী ঘোষ, ভূপেন বোস, মদনমোহন মালবীয়, কে. জি, গুপ্ত, মহম্মদাবাদের রাজা, তেজ বাহাদুর সাপ্রু, ভি. এস. শাস্ত্রী, সি. পি. রামস্বামী আয়ারকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ক'রে কংগ্রেস বিলেতে ডেপুটেশন পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চেম্বার্লেন সাহেব কিছুতেই নিজের 'পলিসি' প্রকাশ করলেন না, ভারতীয় সৈন্য-বিভাগে ভারতীয়দের কমিশন দিতেও চাইলেন না—সুতরাং সে ডেপুটেশন গেল না। সার্ এস. পি. সিন্হাকে নিয়ে নমো-নমো ক'রে যে কন্ফারেন্সটা হয়ে গেল, সিতাংশুর তা মোটেই মনঃপূত হয় নি। এই সব নিয়েই দীর্ঘ চিঠি লিখেছিল সে। তবে সে-ই কেবল 'পুনশ্চ' দিয়ে পূজোর বিষয় এক লাইন লিখেছিল—জগদ্ধাত্রী-পূজোর খবরটা শুনে সে 'কিউরিয়াস' হয়েছে। মৃগাঙ্ক তখন মেডিকেল কলেজে ঢুকেছে। হংস-শুভ্র ঠিক করলেন, ওকে আর বিলেতে পাঠাবেন না। পাঠানও নি। সোম-শুভ্রও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন, মানে, ছাপা নিমন্ত্রণ-পত্র একখানা ডাক-যোগে তাঁর উদ্দেশ্যেও প্রেরিত হয়েছিল। অনুতপ্ত হংস-শুভ্র যখন সোম-শুভ্রকে পত্র-যোগে আহ্বান করেন, এটা তার আগের ঘটনা। যোগীশ্বরের পৌত্র হিসেবে তাঁকে খবরটা দেওয়া উচিত—এই ভেবেই খবরটা দিয়েছিলেন

হংস-শুভ্র। একটু খোঁচা দেওয়াও উদ্দেশ্য ছিল হয়তো। সোম-শুভ্র এর উত্তরে দেবী-সূক্তের একটা নূতন ধরনের ব্যাখ্যা এবং গ্রামের গরিব-দুঃখীদের খাওয়াবার জন্যে শ পাঁচেক টাকা পাঠিয়েছিলেন। শশাঙ্ক-শুভ্র শ্বশুরবাড়িতে ব'সে রইল, অথচ জগদ্ধাত্রীপুজোয় এল না, এতে হংস-শুভ্র মনে মনে খুবই চটলেন। মুখে কিন্তু কিছু বললেন না। পিতা-পুত্রে যে সংঘর্ষটা হয়ে গেল, তা মানসিক।

দ্বিতীয় বছরের পুজোয় শশাঙ্ক-শুভ্র কাঁচা রাস্তা ভেঙে শকটারোহণে হিঙ্গুল গ্রামে সস্ত্রীক হাজির হলেন। বাসন্তী জেদাজেদি না করলে সেবারও যেতেন কি না সন্দেহ। বাসন্তীর জেদাজেদি করবার দুটো কারণ ছিল। বুদ্ধিমতী পুত্রবধূ মাত্রেই শ্বশুর-শাশুড়ীর স্নেহ আকর্ষণ করতে চায়। আমি সকলের স্নেহ আকর্ষণ করতে পারি, আমাকে দেখলে কেউ না ভালবেসে পারে না —এই ধরনের একটা গর্ব্বও বাসন্তীর মনে সদা-জাগরূক থাকত এবং সে গর্ব্বের ন্যায্য খোরাক সংগ্রহ করবার জন্যে সে না পারত এমন কাজ নেই। সবাই আমাকে ঘিরে বাহবা বাহবা করুক, সকলের সপ্রশংস দৃষ্টির কেন্দ্রবর্ত্তিনী হয়ে না থাকলে জীবনই বৃথা—এই ছিল তার জীবনের মূল প্রেরণা। অনেকে এমনিতেই অর্থাৎ বাসন্তীর কোন আয়াসের অপেক্ষা না রেখেই বাহবা দিত, অনেকের কাছে বাহবা আদায় করবার জন্যে বাসন্তীকে রীতিমত কষ্ট-স্বীকার করতে হ'ত, তৃতীয় একটা একগুঁয়ে দল ছিল যারা কিছুতেই বাহবা দিত না। এই তৃতীয় দল সম্বন্ধে বাসন্তীকে বাধ্য হয়ে মিথ্যাভাষণই করতে হ'ত—উচ্চকণ্ঠে সোচ্ছ্বাসে প্রচার করতে হ'ত যে, ওরাও ওর সম্বন্ধে গদগদ। পরিচিত-মহলে কেউ যে ওর সম্বন্ধে উদাসীন থাকবে এবং আর পাঁচজনে সেটা জানবে, এ চিন্তা বাসন্তীর পক্ষে অসহ্য। তাই সেবার বাসন্তী প্রথমত এবং প্রধানত গিয়েছিল হংস-শুভ্রের বাহবা আদায় করবার জন্যে। দ্বিতীয় কারণটা—মজা দেখা। গরুর গাড়ি চ'ড়ে মাঠের পর মাঠ ভেঙে পূর্ব্বপুরুষদের বাস্তু-ভিটেয় পৌঁছে, আত্মীয়-আত্মীয়া-পরিবৃত হয়ে জগদ্ধাত্রীপুজো দেখার মধ্যে যে মজা আছে, তা তাচ্ছিল্যভরে উড়িয়ে দেওয়ার মত বস্তুতান্ত্রিক মন বাসন্তীর তখনও হয় নি। সেই সবে বিয়ে হয়েছে। শশাঙ্কর কিন্তু হয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে যে মজায় তার মন সাড়া দিত, সে মজার প্রধান উপকরণ অর্থ। নিরর্থক গরুর গাড়ি চ'ড়ে একটা অজ-পাড়াগাঁয়ে গিয়ে জগদ্ধাত্রীপুজোর নামে অকারণ শক্তি

ও সময় অপব্যয় করার মধ্যে কি মজা যে থাকতে পারে, তা তাঁর মাথায় আসে নি। কিন্তু তিনি স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী। তরুণী ভার্য্যা যখন হিজুল গ্রামে যাবেন ব'লে ঝুঁকলেন, তখন 'অন্ প্রিন্সিপ্‌ল' তিনি বাধা দিতে পারলেন না। সঙ্গেও আসতে হ'ল। দুরূহ রাস্তায় অবলা পত্নীকে একা আসতে দেওয়াটাও 'অন্ প্রিন্সিপ্‌ল' অনুচিত। সুতরাং বিবেকের খাতিরেই সেবার শত অসুবিধা ভোগ ক'রেও তিনি হিজুল গ্রামে গিয়ে হাজির হলেন। আশা করেছিলেন, পিতা উল্লসিত হয়ে উঠবেন। হয়তো মনে মনে হয়েছিলেন, কিন্তু ভাষায় যা প্রকাশ করলেন, তাতে সুর কেটে গেল। পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা ছিল নিম্নলিখিত প্রকার।—

হংস-শুভ্র খালি গায়ে একটি মোড়ার ওপর ব'সে হুঁকোয় কাঁঠালপাতার নল লাগিয়ে তামাক খাচ্ছিলেন। অদূরে একটা ঝি বাসন মাজছিল, খ'ড়ো চালের একটি ঘরে নগ্নগাত্র কুৎসিৎ-দর্শন জনকয়েক ময়রা ভিয়ান চড়িয়েছিল, চণ্ডী-মণ্ডপে অবস্থিত গ্রাম্য শিল্পের অদ্ভুত নিদর্শন জগদ্ধাত্রী-প্রতিমাটির সম্মুখে এক পাল উলঙ্গ অর্দ্ধ-উলঙ্গ রুগ্ন ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ভিড় ক'রে, দূরসম্পর্কীয়া কয়েকজন আত্মীয়া সিক্তবসনে কলসী কাঁখে জল আনছিলেন পাশের পুষ্করিণী থেকে। এমন সময় গরুর গাড়িটা এসে থামল এবং তার থেকে নাবলেন সাহেবী স্যুট-পরা শশাঙ্ক-শুভ্র এবং হাই-হিল জুতো-পরা বাসন্তী। উভয়ে এগিয়ে এসে প্রণাম করতেই হংস-শুভ্র হুঁকোটা মুখ থেকে সরিয়ে বললেন, গুড মর্নিং, আশা করি, মিসেস মুখার্জির রাস্তায় কোন রকম কষ্ট হয় নি।

শশাঙ্ক-শুভ্রের মুখ লাল হয়ে উঠল।

বাসন্তী কিন্তু একমুখ হেসে বললে, বাবা কি যে বলেন!

ঘরের ভেতরে ঢুকে শশাঙ্ক-শুভ্র স্ত্রীকে বললেন, নিউসেন্স! এর পর আর থাকতে ইচ্ছে করছে না, চল, ফিরে যাই।

বাসন্তী আবার একমুখ হেসে বললে, পাগল নাকি!

মনান্তরের এই সূত্রপাত। বহুকাল পূর্ব্বের এই সূত্রটি নানা ঘটনা-পরম্পরায় নানারূপ আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক পাক খেয়ে খেয়ে যে জটিলতার সৃষ্টি করেছিল, তার ঠিক স্বরূপটি বাইরের লোকের দৃষ্টিগোচর হ'ত না। কিন্তু এরই বিপাকে প'ড়ে শশাঙ্ক-শুভ্র ব্যবসায়-ব্যাপারে হংস-শুভ্রের দাক্ষিণ্য-লাভে বঞ্চিত হলেন। একটা না একটা খিটিমিটি লেগেই থাকত

দুজনের মধ্যে। বাসন্তী মাঝে থাকাতে কলহটা কোলাহলে পরিণত হতে পারে নি। হংস-শুভ্র বাসন্তীকে যে খুব পছন্দ করতেন তা নয়, বরং ঠিক উল্টো। মেয়েটার কোন রকম খুঁত ধরতে না পেরে, তার সর্ব্বদা সব রকমে সবাইকে খুশি করবার চেষ্টা দেখে, তার বাপের অগাধ ঐশ্বর্য্যের ঝনৎকারে মনে মনে জ্ব'লে যেতেন তিনি। কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। কোনও ওজুহাত না পেলে কি নিয়ে রাগ করবেন? বাসন্তী রাগ করবার কোন সুযোগই কখনও দিত না। মাঝে মাঝে তিনি মৃগাঙ্কর স্ত্রী কনকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে তির্য্যক-পথে বাসন্তীকে আঘাত দেবার চেষ্টা করতেন বটে, কিন্তু সে আঘাতও বাসন্তীকে কাবু করতে পারত না। কনকের আরও বেশি প্রশংসা ক'রে বাসন্তী হংস-শুভ্রকে অপ্রতিভ ক'রে দিত। হংস-শুভ্র মনে মনে চটতেন, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলবার উপায় থাকত না। শেষটা এমন হয়েছিল যে, হংস-শুভ্র বাসন্তীকে মনে মনে ভয় করতেন। বাসন্তীর মধ্যস্থতাতেই পিতা-পুত্রের অন্তরবহ্নি দাউ-দাউ ক'রে জ্ব'লে ওঠে নি। সব দিক বজায় রেখে সকলের প্রশংসা আদায় ক'রে হাসিমুখে অসম্ভবকে সম্ভব করবার শক্তি পরিবারের মধ্যে একমাত্র বাসন্তীরই আছে। বাসন্তী হাসিমুখে কারও কাছে কখনও কিছু চাইত যখন, 'না' বলবার সামর্থ্য থাকত না তার। যা নিত, তার দশগুণ প্রত্যর্পণও করত সে নানা উপায়ে। আদরে, আবদারে, অভিমানে, অযাচিত উপহারে, অজস্র স্তুতিতে প্রত্যেক পরিচিত লোকের মনে যে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করত সে, তাতে কোন কিছু বেসুরো বাজা অসম্ভব। বাসন্তীর জগৎ ছিল ঐক্যতানের জগৎ। এ রকম স্ত্রীকে নিয়ে শশাঙ্ক-শুভ্র বিব্রত হয়েছেন সারাজীবন। তাঁর সমস্ত হিসাব-নিকাশ, সমস্ত 'প্রিন্সিপ্‌ল', বারম্বার ভেসে গেছে বাসন্তীর খুশির খরস্রোতে। বাসন্তী যা চাইবে, তাই হবে। তাই হওয়াবে সে। অথচ বাসন্তীর ওপর বেশিক্ষণ চ'টে থাকাও অসম্ভব। হেসে কেঁদে শেষ পর্য্যন্ত সে ভাব ক'রে নেবেই।

শশাঙ্ক-শুভ্রের সারাজীবনব্যাপী অর্থকৃচ্ছ্র তার একটা কারণ হয়তো বাসন্তী। কিন্তু বাসন্তী না থাকলে তাঁর অশান্তি আরও শতগুণ বাড়ত। বাসন্তী থাকাতে অনেক অশান্তিজনক ব্যাপার গ্লানিকর হয়ে ওঠে নি তাঁর জীবনে। তিনি রেগে এমন অনেক কাণ্ড ক'রে ফেলতে উদ্যত হয়েছেন, যার পরিণাম নিশ্চয়ই

ভয়াবহ রকম বিষময় হয়ে উঠত, বাসন্তী যদি দু হাত প্রসারিত ক'রে না আটকাত তাঁকে। তাঁর হঠাৎ-রাগী চিত্ত-তুরঙ্গমের মুখে বাসন্তী-বল্‌গা না থাকলে কোন্ দিন কোন্ অতল গহ্বরে প'ড়ে তলিয়েই যেতেন তিনি। বাসন্তীকে না হ'লে তাঁর চলে না।

সবই বুঝতেন। কিন্তু তবু তাঁর দুঃখ হ'ত। বাসন্তী যদি তাঁর মুখ চাইত একটু। বড্ড বেশি রকম খরচ করে—একেবারে বেপরোয়া। কিছু বলবার উপায় নেই, বললেও শুনবে না। ছেলেবেলা থেকেই ওই ভাবে মানুষ হয়েছে। বাপ অগাধ বড়লোক, আর সে তাঁর আদুরে মেয়ে।

ক্রমশ

"বনফুল"

গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টর

চতুর্থ অঙ্ক

ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলো

(জজ, দাতব্য-কর্ত্তা, পোষ্টমাষ্টার, হেডমাষ্টার। প্রত্যেকেই দরবারের পোশাকে উপস্থিত। ঘনরামবাবু ও বলরামবাবুর সসম্ভ্রমে প্রবেশ। মৃদুস্বরে কথাবার্ত্তা চলিতেছে)

জজ। [সকলকে অর্দ্ধবৃত্তাকারে দাঁড় করাইতে করাইতে] তাড়াতাড়ি করুন। সকলে গোল হয়ে দাঁড়ান। কথাবার্ত্তা হাসিঠাট্টা একদম চলবে না। মনে রাখবেন, যে-সে লোক নয়, প্রত্যেক দিন গভর্মেণ্ট হাউসে যায়; মন্ত্রীমণ্ডল ভয়ে কাঁপে! ঘনরামবাবু, আপনি ওই মাথায় দাঁড়ান; বলরামবাবু, আপনি এই দিকে।

দাতব্য-কর্ত্তা। আপনি যাই বলুন মিঃ সিন্‌হা, আমাদের কিছু করা দরকার।

জজ। কি করতে হবে?

দাতব্য-কর্ত্তা। সে তো আমরা সবাই জানি।

জজ। কিছু কিছু হাতে গুঁজে দেওয়া। এই তো?

দাতব্য-কর্ত্তা। তা হ'লে তো বুঝতেই পেরেছেন।

জজ। কিন্তু এতে বিপদ আছে। এতবড় লোক! হয়তো এই নিয়ে এক মহা গণ্ডগোল বাধাতে পারে। এক কাজ করলে হয়, এখানকার

অধিবাসীদের নামে চাঁদা ব'লে যদি কিছু দেওয়া যায়—কোন একটা উপলক্ষ্য ক'রে—

পোষ্টমাস্টার। কিংবা আর এক কাজ করলে হয়। এখানকার ডাকঘরে যেসব টাকা বে-ওয়ারিশ প'ড়ে আছে, তাই যদি দেওয়া যায়—

দাতব্য-কর্ত্তা। ও রকম করলে আপনাকে এখনই হয়তো অন্য কোন জায়গায় বদলি ক'রে পাঠিয়ে দেবেন। আমার কথা শুনুন। সভ্য-সমাজে এসব ব্যাপার ও রকম ক'রে হয় না। এখানে তো আমরা অনেক কজন আছি, আমাদের উচিত, প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে, মানে গোপনে কথাবার্ত্তা বলতে বলতে···এমন ভাবে···যেন আর কেউ কিছু না জানতে পারে। সভ্য-সমাজে এসব কাজ এমনই ক'রেই হয়। জজ সাহেব আপনি শুরু করবেন।

জজ। না না, আপনি শুরু করবেন। আপনার বাড়িতে উনি আতিথ্য-গ্রহণ করেছেন।

দাতব্য-কর্ত্তা। তা হ'লে হেডমাস্টার মশায়ের আরম্ভ করা উচিত, উনি এখানকার শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতীক।

হেডমাস্টার। না মশায়, আমি পারব না। আমার বিপদ কি জানেন, চাকরি-জগতে আমার এক ধাপও ওপরে আছে এমন কোন লোকের সম্মুখে উপস্থিত হ'লে আমার মুখ দিয়ে কথা বেরুতে চায় না। আমাকে ছেড়ে দিন আপনারা।

দাতব্য-কর্ত্তা। সত্যি। মিঃ সিন্‌হা, আপনাকেই আরম্ভ করতে হবে। আপনি মুখ খুললেই বেদব্যাস কথা বলতে শুরু করবেন।

জজ। বেদব্যাসই বটে! তবু যদি তিনি 'রেস' ও কুকুরের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতেন।

সকলে। শুধু 'রেস' ও কুকুর কেন, ইচ্ছে করলে আপনি বেদান্ত নিয়েও আলোচনা করতে পারেন। দোহাই মিঃ সিন্‌হা, এ যাত্রা আমাদের রক্ষা করুন—দোহাই আপনার।

জজ। ছাড়ুন, ছাড়ুন।

(এমন সময়ে পাশের ঘরে অনঙ্গমোহনের কাশির শব্দ শোনা গেল। শব্দ শুনিবামাত্র সকলে পড়ি কি মরি করিয়া বিপরীত দ্বার দিয়া প্রস্থানোদ্যত—প্রত্যেকে আগে পালাইতে চায়, ফলে অনেকেই আঘাত পাইল)

বলরামের স্বর। ধনরামবাবু, আপনি আমার পা মাড়িয়ে দিয়েছেন!

দাতব্য-কর্তার স্বর। আপনারা সবাই আমার ঘাড়ের ওপরে প'ড়ে চেপ্টা ক'রে দিয়েছেন। ইস্!

(অনেকের কাতরোক্তি। সকলে বাহির হইয়া গেলে পরে সদ্য-নিদ্রোত্থিত অনঙ্গমোহনের প্রবেশ)

অনঙ্গমোহন। ওঃ, খুব ঘুমোনো গিয়েছে। কি নরম বিছানা! কাল খুব কড়া রকম খেতে দিয়েছিল। খুব নেশা হয়েছিল। এখনও মাথাটা পরিষ্কার হয় নি। এখানে কিছুদিন বেশ আরামে থাকা যাবে, মনে হচ্ছে। লোকে তোয়াজ করলে আমার বেশ ভাল লাগে।...ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়ে ছুটিও মন্দ নয়; তার স্ত্রীরও এখনও বয়স যায় নি...মোটের ওপরে এখানে মন্দ লাগছে না।

(জজ সাহেবের প্রবেশ)

জজ। [দণ্ডায়মান; স্বগত] ভগবান, এই বিপদ থেকে রক্ষা কর। পা দুটো কাঁপছে। [প্রকাশ্যে] সার্, আপনার কাছে নিজের পরিচয় দিতে এসেছি, আমি এখানকার জেলা-জজ।

অনঙ্গমোহন। আপনিই তা হ'লে এখানকার জজ?

জজ। গত দশ বছর থেকে আমি এখানে আছি।

অনঙ্গমোহন। জজের কাজ লাভজনক, কি বলেন?

জজ। লাভজনক আর কি ক'রে বলি! ন বছর পরে কেবল 'রায় বাহাদুর' হয়েছি। [স্বগত] টাকাটা মুঠোর মধ্যে, কিন্তু মনে হচ্ছে, যেন তপ্ত অঙ্গার চেপে রেখেছি। ভগবান!

অনঙ্গমোহন। তবু তো রায়সাহেবের চেয়ে উঁচুতে!

জজ। [হাতের মুঠা অগ্রসর করিয়া। স্বগত] দয়াময়! এ কি বিপদে ফেললে! এ কোথায় আনলে? মনে হচ্ছে, যেন জ্বলন্ত উনুনের ওপরে ব'সে আছি।

অনঙ্গমোহন। আপনার মুঠোর মধ্যে কি?

জজ। [ভয় পাইয়া নোটগুলি মেঝের ওপরে ফেলিয়া দিল] আজ্ঞে, কিছু না।

অনঙ্গমোহন। কিছু না কেমন? অনেকগুলো নোট প'ড়ে রয়েছে দেখছি।

জজ। [কাঁপিতে কাঁপিতে] নোট! কই না! [স্বগত] ভগবান, এইবার জজের চেয়ার ছেড়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হ'ল দেখছি।

অনঙ্গমোহন। [নোটগুলি কুড়াইয়া লইয়া] না কেমন? এই তো টাকা দেখছি।

জজ। [স্বগত] সব শেষ হ'ল।

অনঙ্গমোহন। এই টাকাগুলো আমাকে ধার দিলে কি আপনার অসুবিধা হবে?

জজ। [তাড়াতাড়ি] নিশ্চয়ই নয়।...আনন্দের সঙ্গে। [স্বগত] সাহস দাও, প্রভু, সাহস দাও। করুণাময়ী, তুমিই ভরসা।

অনঙ্গমোহন। পথে আমার সব চুরি হয়ে গিয়ে বড়ই বিপদে পড়েছি। বাড়ি পৌঁছনো মাত্র আপনাকে পাঠিয়ে দেব।

জজ। আপনি ব্যস্ত হবেন না। এ তো আমার পরম সৌভাগ্য। উচ্চতর অফিসারের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন...স্টেটের কল্যাণ-কামনা...[চেয়ার হইতে উঠিয়া সসম্ভ্রমে] আপনাকে আর বিরক্ত করতে চাই না। আমার প্রতি কোন আদেশ আছে কি?

অনঙ্গমোহন। কিসের আদেশ?

জজ। জেলা-আদালতের বিষয়ে।

অনঙ্গমোহন। না, এখন আমার কিছু বক্তব্য নেই। ধন্যবাদ।

জজ। [নত হইয়া অভিবাদন; স্বগত] এবার আমরা জেলার সত্যিই মালিক হলাম।

(প্রস্থান)

অনঙ্গমোহন। জজ লোকটি মন্দ নয়।

(পোষ্টমাষ্টারের সসম্ভ্রমে প্রবেশ)

পোস্টমাস্টার। সার্, আমি এখানকার পোস্টমাস্টার—রায় সাহেব।

অনঙ্গমোহন। আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। আমি লোকের সঙ্গ খুব ভালবাসি। বসুন। আপনি তো এখানেই থাকেন?

পোস্টমাস্টার। আজ্ঞে হ্যাঁ।

অনঙ্গমোহন। এ শহরটি আমার বেশ লাগছে। যদিও খুব বড় জায়গা নয়, কিন্তু তাতে কি আসে যায়!

পোস্টমাস্টার। তা তো বটেই।

অনঙ্গমোহন। কলকাতাতেই কেবল সমকক্ষ লোক পাওয়া যায়—এসব জায়গায় তো কেবল পাড়াগেঁয়ে ভূতের বাস।

পোস্টমাস্টার। যা বলেছেন সার্। [স্বগত] লোকটি নিরহঙ্কার—সব কথাই খুলে জিজ্ঞাসা করেন।

অনঙ্গমোহন। যাই বলুন, এসব ছোট শহরে আমোদ-প্রমোদের তেমন ব্যবস্থা নেই। কি বলেন ?

পোস্টমাস্টার। সে কথা ঠিক।

অনঙ্গমোহন। লোকে কি চায় ? আরাম পাবে এবং সম্মানিত হবে, এই তো ?

পোস্টমাস্টার। খাঁটি কথা, সার্।

অনঙ্গমোহন। আমার সঙ্গে আপনার মত মিলে যাচ্ছে দেখে বেশ খুশি হলাম। লোকে আমাকে অদ্ভুত মনে করে। কিন্তু আসলে আমি খুব সরল-প্রকৃতির লোক। [স্বগত] এর কাছে কিছু টাকা চাইলে কি রকম হয় ? [প্রকাশ্যে] দেখুন, পথে আমার সমস্ত চুরি হয়ে গিয়েছে। আমাকে কিছু টাকা ধার দিতে পারেন কি ?

পোস্টমাস্টার। নিশ্চয়ই। এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি আছে ? আপনার এই সামান্য কাজ করতে পেরে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করছি।

অনঙ্গমোহন। অশেষ ধন্যবাদ। অল্প টাকা হাতে ক'রে পথ চলা আমি অন্যায় মনে করি। আপনার কি মনে হয় ?

পোস্টমাস্টার। অত্যন্ত অন্যায়। [উঠিয়া] আপনাকে আর বিরক্ত করতে চাই না। পোস্ট-অফিসের বিষয়ে কোন আদেশ আছে কি ?

অনঙ্গমোহন। না।

(অভিবাদন করিয়া পোষ্টমাষ্টারের প্রস্থান)

অনঙ্গমোহন। পোস্টমাস্টার লোকটি বেশ। পরোপকারী লোক আমি পছন্দ করি। [একটি চুরুট ধরাইল]

(হেডমাষ্টারের প্রবেশ। প্রবেশ না বলাই উচিত। কারণ পিছন হইতে তাহাকে প্রায় ধাক্কা মারিয়া ঢুকাইয়া দেওয়া হইল। অন্তরাল হইতে শ্রুত হইল—ভয় কিসের ? যান না।)

হেডমাস্টার। [কাঁদিতে কাঁদিতে অভিবাদন] হুজুর, আমি এখানকার হাইস্কুলের হেডমাস্টার। এম. এ., বি. টি. ; স্পোকন্ ইংলিশে ডিপ্লোমা-প্রাপ্ত ; বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক ; সাতখানা নোট-বুকের অথার।

অনঙ্গমোহন। বেশ বেশ, খুশি হলাম। বসুন। একটা চুরুট ধরান।
[চুরুট দিল]

হেডমাস্টার। আঁজ্ঞে! চুরুট! চুরুট তো কখনও···মানে আজ্ঞে, পান, চা, চুরুট, সিগারেট আমাদের অস্পৃশ্য। আমরা জাতিগঠন-কার্য্যে নিযুক্ত কিনা!

অনঙ্গমোহন। তা হোক না। একটা চুরুট খেলে কোন ক্ষতি হবে না। এ চুরুটটা মন্দ নয়—অবশ্য কলকাতার মত এখানে কোথায় পাওয়া যাবে? আমি সেখানে যে চুরুট খাই, তার একশোর দাম পঁচিশ টাকা। একটা খেলে সারাদিন গায়ে সুগন্ধ থাকে। এই নিন।

(হেডমাষ্টার দেশলাই জ্বালাইয়া চুরুট ধরাইতে চেষ্টা করিল। অন্তত দশটা কাঠি নষ্ট হইল, কিন্তু চুরুট জ্বলিল না। অবশেষে কম্পিত হাত হইতে চুরুট মাটিতে পড়িয়া গেল।

হেডমাস্টার। [স্বগত] চুরুটও গেল। আমার সুনামও গেল।

অনঙ্গমোহন। চুরুটে সত্যিই আপনি অভ্যস্ত নন দেখছি। চুরুট আমার বড় প্রিয়। চুরুট আর রমণী, এ দুটি বিষয়ে আজও আমি সংযমে অভ্যস্ত হলাম না। আচ্ছা, কোন্ রকম রমণী আপনার প্রিয়? তন্বী, না স্থূলা?

(হেডমাষ্টার তো অবাক্। কি উত্তর সে দিবে?)

বলুন না! তন্বী, না স্থূলা?

হেডমাস্টার। আজ্ঞে, এসব বিষয়ে কি আমাদের মতামত থাকা উচিত? আমরা যে শিক্ষা-বিভাগের লোক।

অনঙ্গমোহন। এটা কি শিক্ষার অঙ্গ নয়? বলুন না, কোন্ রকম আপনি পছন্দ করেন? অবশ্য স্থূলা বলতে আমি মোটা বলছি না, মানে দোহারা চেহারা। কি বলছি, নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন? আর তন্বী যে কি বস্তু, তা বোধ করি শিক্ষা-বিভাগের লোকও বিনা ব্যাখ্যায় বুঝতে পারে। কি বলেন?

হেডমাস্টার। এসব জটিল বিষয়ে—[স্বগত] দূর ছাই, কি যে মাথা-মুণ্ডু বকছি!

অনঙ্গমোহন। [খোঁচা মারিয়া]। যাক, আপনি না বললেও আমি বেশ বুঝতে পারছি, কোন তন্বী আপনার মনোহরণ করেছে। আপনার পছন্দ আছে, মাইরি। আমারও ঠিক ওই রকমটি পছন্দ।

(হেডমাষ্টার নীরব)

অনঙ্গমোহন। ইস, আপনি যে লজ্জায় বেগুনী হয়ে উঠেছেন দেখছি। বলুন না, ক্ষতি কি?

হেডমাস্টার। অত্যন্ত ভয় পেয়ে গিয়েছি।

অনঙ্গমোহন। ভয় পেয়েছেন? সত্যি, আমার চোখে মুখে এমন একটা কিছু আছে, যাতে লোকে ভয় পেয়ে যায়। আমি তো এ পর্য্যন্ত এমন একটাও মেয়ে দেখলাম না, যে শেষ পর্য্যন্ত আমার কাছে আত্মদান না ক'রে থাকতে পারল।

হেডমাস্টার। নিশ্চয় সার্।

অনঙ্গমোহন। দেখুন, পথে আমার সব চুরি হয়ে গিয়েছে। আমাকে তিনশো টাকা ধার দিলে কি আপনার অসুবিধা হবে?

হেডমাস্টার। [পকেট হাতড়াইয়া] যদি না থাকে তো কি সর্ব্বনাশ হবে! না না, আছে। [কাঁদিতে কাঁদিতে টাকা প্রদান]

অনঙ্গমোহন। ধন্যবাদ।

হেডমাস্টার। [নত হইয়া অভিবাদন] আর বেশিক্ষণ আপনাকে বিরক্ত করব না।

অনঙ্গমোহন। আচ্ছা বিদায়।

হেডমাস্টার। [তীরবেগে প্রস্থান করিতে করিতে, স্বগত] বাঁচা গেল, বোধ হয় উনি আর ইস্কুল পরিদর্শন করতে যাবেন না।

(প্রস্থান)

(দাতব্য-কর্ত্তার প্রবেশ ও অভিবাদন)

দাতব্য-কর্ত্তা। সার্, আমি এখানকার দাতব্য-প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্ত্তা।

অনঙ্গমোহন। বড় খুশি হলাম। বসুন।

দাতব্য-কর্ত্তা। গতকাল আপনাকে দাতব্য-হাসপাতালে নিয়ে যাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

অনঙ্গমোহন। খুব মনে আছে। কাল খুব খাইয়েছিলেন।

দাতব্য-কর্ত্তা। দেশের মঙ্গলের জন্যে সর্ব্বদাই আমি প্রাণপণ ক'রে থাকি।

অনঙ্গমোহন। সুখাদ্য আমার প্রিয়—ওই আমার একটা দুর্ব্বলতা। আচ্ছা, কাল আপনাকে আজকের চেয়ে যেন বেঁটে ব'লে মনে হয়েছিল। ব্যাপারটা কি, বলুন তো?

দাতব্য-কর্ত্তা। অসম্ভব নয় হুজুর। [একটু পরে] কর্ত্তব্য-পালনে কখনও আমি ত্রুটি করি না। [চেয়ার নিকটে টানিয়া লইয়া মৃদুস্বরে] এখানকার পোস্টমাস্টার কোন কাজ করে না। চিঠিপত্র সব দিনের পর দিন আটকে প'ড়ে থাকে। আপনার একবার ডাকঘর পরিদর্শন করা উচিত। আর এখানকার জজ, হুজুর, তার ব্যবহারের বিষয় আর কি বলব! আদালত-বাড়িতে কুকুর পুষতে শুরু করেছে। আর দিনরাত 'রেস' হচ্ছে গিয়ে তার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। যদিও সে আমার আত্মীয় এবং বন্ধু, তবু দেশের কথা মনে ক'রে এসব আপনাকে না বলা অন্যায় মনে করি। আর ঘনরাম-বাবু নামে একজন জমিদার এখানে আছে, তাকে আপনি দেখেছেন। যেমনই ঘনরামবাবু বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন, অমনই জজ তার বাড়িতে ঢুকে তার স্ত্রীর সঙ্গে—কি আর বলব। একবার ঘনরামবাবুর ছেলে-গুলোর দিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন—কেউ বাপের মত দেখতে হয় নি। এমন কি ছোট্ট মেয়েটার চেহারা পর্য্যন্ত জজের মত।

অনঙ্গমোহন। এতখানি আমি কখনও ভাবি নি

দাতব্য-কর্ত্তা। আর হেডমাস্টারটি এক বিচিত্র জীব। গভর্মেণ্ট যে ওর ওপরে কি ক'রে শিক্ষার ভার দিলে, তা ভেবে পাই না। লোকটা ঘোর বিপ্লবী—ছেলেদের এমন সব কথাবার্ত্তা শেখায়! আপনি যদি বলেন, তবে এসব অভিযোগ আমি লিখিত আকারে দিতে পারি।

অনঙ্গমোহন। বেশ তো, দেবেন। এই সব অভিযোগ পড়তে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়। আপনার নামটা যেন কি?

দাতব্য-কর্ত্তা। সুরেশ্বর ঘটক।

অনঙ্গমোহন। ঠিক, মনে পড়েছে। আচ্ছা, ঘটক মশাই, আপনার সন্তানাদি কি?

দাতব্য-কর্ত্তা। পাঁচটি হুজুর। দুটি প্রায় সাবালক হয়ে উঠেছে।

অনঙ্গমোহন। প্রায় সাবালক! বলেন কি? নাম কি?

দাতব্য-কর্ত্তা। রামেশ্বর, বীরেশ্বর, সীতা, সাবিত্রী, আর ভানুমতী।

অনঙ্গমোহন। বাঃ, বেশ চমৎকার নাম!

দাতব্য-কর্ত্তা। আমি আর আপনার অমূল্য সময় নষ্ট করতে চাই না।

(অভিবাদন করিয়া প্রস্থানোদ্যত)

অনঙ্গমোহন। বেশ মজার কথা সব আপনি শুনিয়েছেন। আচ্ছা, এর পরে আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে। [দরজা খুলিয়া ডাকিল] শুনুন শুনুন, কি যেন আপনার নাম ?

দাতব্য-কর্ত্তা। সুরেশ্বর ঘটক।

অনঙ্গমোহন। হ্যাঁ, সুরেশ্বর বাবু, আমার একটু উপকার করতে হবে। পথে আমার সব চুরি হয়ে গিয়েছে। আমাকে কিছু টাকা ধার দিতে পারেন ? শ চারেক হ'লেই চলবে।

দাতব্য-কর্ত্তা। এ তো আমার পক্ষে গৌরবের কথা। [টাকা দিল]

অনঙ্গমোহন। ধন্যবাদ ! (দাতব্য-কর্ত্তার প্রস্থান)

(ঘনরামবাবু ও বলরামবাবুর প্রবেশ)

বলরাম। হুজুর, আমি বলরাম সিদ্ধান্ত, এই জেলার একজন জমিদার, বড় রায় সাহেব।

ঘনরাম। আমি হুজুর ঘনরাম সিদ্ধান্ত, এই জেলার একজন জমিদার, ছোট রায় সাহেব।

অনঙ্গমোহন। আপনাদের কালকে দেখেছি। আপনিই তো হঠাৎ প'ড়ে গিয়েছিলেন, নাকটা কেমন আছে ?

ঘনরাম। আমার সামান্য নাকের জন্যে আপনি ব্যস্ত হবেন না। বেশ আছি।

অনঙ্গমোহন। বাঃ, বেশ। আচ্ছা, আপনাদের সঙ্গে কি টাকা আছে ?

ঘনরাম। টাকা ? কেন ?

অনঙ্গমোহন। হাজার টাকা আমার ধার চাই।

বলরাম। অত টাকা তো নেই। ঘনরাম, তোমার কাছে আছে ?

ঘনরাম। হুজুর, নগদ টাকা তো আমি সঙ্গে রাখি না। তমসুকে সব লগ্নী করা হয়েছে।

অনঙ্গমোহন। বেশ, হাজার না থাকে—একশো পেলেই চলবে।

বলরাম। [পকেট হাতড়াইয়া] ঘনরাম, তোমার কাছে কত টাকা আছে ? আমার পকেটে তো দেখছি কেবল চল্লিশ টাকা।

ঘনরাম। [পকেট হাতড়াইয়া] আমার কাছে মাত্র পঁচিশ টাকা।

বলরাম। ভাল ক'রে দেখ। তোমার পকেটে আবার একটা ফুটো আছে। ফুটোর ভেতর দিয়ে আমার অন্তরের ভেতরে ঢুকে যেতে পারে।

ঘনরাম। নাঃ, আর তো নেই।

অনঙ্গমোহন। থাক থাক, ওতেই হবে। পঁয়ষট্টি টাকাই বা মন্দ কি!
[টাকা গ্রহণ]

ঘনরাম। হুজুরের কাছে আমার একটা দরবার আছে।

অনঙ্গমোহন। কি বলুন?

ঘনরাম। আমার বড় ছেলেটি আমার বিবাহের পূর্ব্বেই জন্মেছে।

অনঙ্গমোহন। তাই নাকি?

ঘনরাম। অবশ্য পরে আমি আইনত বিবাহ করেছি। কাজেই সে এখন আমার আইনসিদ্ধ সন্তান। কিন্তু ভবিষ্যতে এ নিয়ে কোন গণ্ডগোল উঠতে পারে, এই আমার দুশ্চিন্তা।

অনঙ্গমোহন। এর জন্যে আর দুশ্চিন্তা কি? আমি কলকাতায় ফিরে এ বিষয়ে একটা আইন পাস করিয়ে দেব।

ঘনরাম। হুজুরের কাছে আশ্বাস পেয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। ছেলেটি বড় বুদ্ধিমান। ছেলেটি এই বয়সেই মুখে মুখে কবিতা তৈরি করতে পারে। কি বল বলরাম?

বলরাম। খুব লায়েক ছেলে হুজুর। এর মধ্যেই পাড়ার সবগুলো মেয়ের নাম মুখস্থ ক'রে ফেলেছে। এসব ছেলের জন্ম নিয়ে কেলেঙ্কারি, সে তো দেশেরই কলঙ্ক।

অনঙ্গমোহন। সার্, এজন্যে চিন্তা করবেন না, আমি সব ঠিক ক'রে দেব। আপনার কিছু প্রার্থনা নেই বলরামবাবু।

বলরাম। আমার সামান্য একটি অনুরোধ আছে।

অনঙ্গমোহন। কি অনুরোধ?

বলরাম। হুজুর যখন কলকাতায় ফিরবেন, মন্ত্রী, সেনাপতি, রাজা, মহারাজাদের সঙ্গে যখন দেখা হবে, তখন শুধু একবার বলবেন—আপনারা বোধ করি জানেন না, দিনাজশাহী শহরে বলরাম সিদ্ধান্ত, জমিদার, বড় রায় সাহেব ব'লে একজন বিখ্যাত লোক বাস করে।

অনঙ্গমোহন। মাত্র এই?

বলরাম। যখন গভর্নর সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে, তখনও একবার আমার নাম উল্লেখ করবেন।

অনঙ্গমোহন। বেশ, তা করব।

ঘনরাম, বলরাম। আর আমরা হুজুরকে বিরক্ত করতে চাই না। (উভয়ের প্রস্থান)

অনঙ্গমোহন। [স্বগত] ব্যাপার কি? এখানকার জজ, ম্যাজিস্ট্রেট সবাই আমাকে, বোধ হচ্ছে, বড় একজন অফিসার ব'লে ধারণা করেছে। কাল বোধ হয় নেশার ঝোঁকে অনেক মস্ত মস্ত কথা ব'লে ফেলেছি। এরা যে এমন গর্দ্দভ, তা কে জানত? এক কাজ করলে বেশ হয়। সমস্ত ঘটনা কলকাতায় পরশুরামকে জানিয়ে একটা চিঠি লিখে দিই। লোকটা চমৎকার লেখে! এই ব্যাপার নিয়ে খুব জমিয়ে লিখতে পারবে। বাবা, তার কলম নয়, কুড়ুল। সাধে কি পরশুরাম নাম! মুকুন্দ, কাগজ কলম নিয়ে—। [আনছি হুজুর, মুকুন্দর স্বর] এখানকার অফিসারদের বুদ্ধি না থাক, দয়ামায়া আছে। অনেক টাকা ধার দিয়েছে। দেখা যাক, কত হ'ল! জজের কাছ থেকে তিনশো। পোস্টমাস্টারের তিনশো। ছশো—সাতশো—আটশো—ইস্, কি ময়লা নোট বাপ! নশো। হাজারের বেশি দেখছি। এইবার একবার এই শহর থেকে বের হই তো, নৈহাটির সেই বেটা জোচ্চোরকে দেখে নেব।

(মুকুন্দর কালি-কলম কাগজ লইয়া প্রবেশ)

অনঙ্গমোহন। মুকুন্দ, ও ঘরে যে ছুঁড়ীটাকে দেখলাম, কে রে?

মুকুন্দ। মিছরি, এ বাড়ির ঝি।

অনঙ্গমোহন। মিছরি! বেশ মিষ্টি নাম তো!

মুকুন্দ। শুধু মিষ্টি নয়, হাত দিয়ে দেখো না, মিছরির ধারও আছে।

অনঙ্গমোহন। ধার না হ'লে আর তলোয়ারে সুখ কিসের? কেবল খেলাতে জানা চাই। এ ঘরে একবার পাঠিয়ে দে না।

মুকুন্দ। মণ্ডা, মেঠাই, সন্দেশ সবই খাবে। মিছরিটুকুও গরিব লোকের জন্যে রাখবে না?

অনঙ্গমোহন। [গম্ভীর স্বরে] মুকুন্দ, আমি তোমার মনিব। যা হুকুম করব, তখনই তামিল করবে। এখানকার লোকেরা আমাকে কি রকম খাতির করছে, দেখছ তো! এখন যাও। [লিখিতে শুরু করিল]

মুকুন্দ। ভগবানকে ধন্যবাদ দাও যে, এখানকার লোকে তোমাকে এখনও খাতির ক'রে চলছে।

অনঙ্গমোহন। কেন কি হয়েছে ?

মুকুন্দ। কিছু হয় নি। কিন্তু হতে কতক্ষণ ? চল, এবার স'রে পড়া যাক।

অনঙ্গমোহন। কেন ? সরতে যাব কেন ? [লিখিতেছে]

মুকুন্দ। ভগবানকে বাদ দিয়ে এখানকার লোকদের ধন্যবাদ দাও যে, তোমার স্বরূপ এরা এখনও বুঝতে পারে নি। দুদিন খুব আরাম করেছ—এবার স'রে পড়। হঠাৎ আসল লোক যদি এসে পড়ে, তবেই বিপদে পড়বে বলছি। এখান থেকে রেল-স্টেশন ত্রিশ মাইল দূরে।

অনঙ্গমোহন। [লিখিতে লিখিতে] আজকের দিনটা থেকে নিই। কাল গেলেই চলবে।

মুকুন্দ। না না, আর দেরি নয়। এরা কোন্ এক বড় অফিসার ব'লে তোমাকে ভুল করেছে। আজ যদি যাও, খুব খাতির পাবে। কাল কি হবে, বলা যায় না। স্টেশন পর্য্যন্ত যাওয়ার জন্যে চমৎকার ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা নিশ্চয় এরা ক'রে দেবে।

অনঙ্গমোহন। [লিখিতেছে] আচ্ছা, বেশ, তাই হবে। তার আগে এক কাজ কর। চিঠিখানা ডাকঘরে দিয়ে এস। আর ভাল ঘোড়ার যেন বন্দোবস্ত হয়। [লিখিতে লিখিতে] পরশুরাম এই চিঠি প'ড়ে না জানি কতই হাসবে !

মুকুন্দ। আমি এই চিঠি এ বাড়ির চাকরকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আমাকে জিনিসপত্র গোছাতে হবে।

অনঙ্গমোহন। একটা বাতি নিয়ে এস তো। [লিখিতেছে]

(মুকুন্দ নেপথ্যবর্ত্তী চাকরের প্রতি)

মুকুন্দ। দেখ বাপু, একখানা চিঠি নিয়ে দৌড়ে ডাকঘরে যাও। পোস্টমাস্টারকে বলবে, এ আমার মনিবের চিঠি, খুব জরুরি, আজকের ডাকেই যাওয়া চাই। একটু দাঁড়াও, চিঠিখানা দিচ্ছি।

অনঙ্গমোহন। [লিখিতে লিখিতে] পরশুরাম এখন কোন্ ঠিকানায় আছে ? সুকিয়া স্ট্রীট, না বকুলবাগান ? যাকগে, বকুলবাগানের ঠিকানাতেই দিই।

(মুকুন্দ বাতি লইয়া আসিল, অনঙ্গমোহন চিঠিতে গালামোহর করিল। এমন সময়ে দুলবাজ খাঁর কণ্ঠ শ্রুত হইল—"হঠ যাও, ভাগ যাও, যানে দেনেকো হুকুম নেহি হ্যায়")

অনঙ্গমোহন। [চিঠিখানা দিয়া] এই নাও।

দোকানদারদের কণ্ঠস্বর। আমাদের ঢুকতে দাও। কাজে এসেছি। দিতেই হবে ঢুকতে।

ফুলবাজ খাঁর কণ্ঠস্বর। ভাগো, ভাগো! হুজুর নিদ যাতা হ্যায়।

(বাহিরে গোলমাল বাড়িতে লাগিল)

অনঙ্গমোহন। মুকুন্দ, দেখ তো ব্যাপার কি? এত গোলমাল কিসের?

মুকুন্দ। [জানালা দিয়া তাকাইয়া] একদল দোকানদার ঢুকতে চাচ্ছে, পুলিস ঢুকতে দিচ্ছে না। ওরা বোধ হয় হুজুরের সঙ্গে দেখা করতে চায়, হাতে ওদের দরখাস্ত ব'লেই মনে হচ্ছে।

অনঙ্গমোহন। [জানালায় গিয়া] ব্যাপার কি?

দোকানদারদের কণ্ঠস্বর। হুজুরের সঙ্গে আমরা ভেট করতে এসেছি। হুজুর আমাদের ঢোকবার হুকুম দিন।

অনঙ্গমোহন। মুকুন্দ, বল গিয়ে, ওদের ঢুকতে দিক। আমি ওদের কথা শুনতে চাই। (মুকুন্দর প্রস্থান)

(দোকানদারদের প্রবেশ। অনঙ্গমোহন একখানা দরখাস্ত লইয়া পড়িল)

অনঙ্গমোহন। শ্রীল শ্রীযুক্ত মহামান্য গভর্ণেণ্ট ইন্সপেক্টর মহোদয়ের প্রতি— বিনীত দোকানদার আবদুল্লা—

(এমন সময়ে একজন এক ঝুড়ি মদের বোতল বিস্কুট কেক প্রভৃতি লইয়া প্রবেশ করিল)

অনঙ্গমোহন। এসব কি?

দোকানদারগণ। আমরা হুজুরের দয়াপ্রার্থী।

অনঙ্গমোহন। কি চাই তোমাদের?

দোকানদারগণ। হুজুর, আমাদের সর্ব্বনাশ করবেন না। আমাদের ওপরে এখানে বড় অত্যাচার হয়।

অনঙ্গমোহন। অত্যাচার? কে করে?

একজন দোকানদার। এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট। হুজুর, এমন ম্যাজিস্ট্রেট কেউ কখনও ভূভারতে দেখে নি। যেমন কথাবার্ত্তা, তেমনই কাজ। কি আর বলব হুজুর! সেদিন বাজারের মধ্যে আমার দাড়ি ধ'রে টান মারলে, বলে—নেড়েল! আমরা সর্ব্বদাই তার সম্মান রক্ষা ক'রে চলি। জেলায়

ম্যাজিস্ট্রেট যখন, তখন মাঝে মাঝে তার মেয়ের জন্যে, মেমসাহেবের জন্যে জামার কাপড়টা শাড়িটা পাঠাতে হবে—এ আমরা সবাই জানি। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন, এসব বিষয়ে আমাদের কখনও ক্রটি হয় নি। কিন্তু হুজুর, ওর লোভের অন্ত নেই। সোজা দোকানে ঢুকে প'ড়ে বললে, বাঃ, বেশ সুন্দর ছিট তো। তখনই হুজুর সমস্ত থানখানা বাংলোয় পাঠিয়ে দিতে হবে, তাতে ত্রিশ গজই থাক, আর পঞ্চাশ গজই থাক।

অনঙ্গমোহন। লোকটা দেখছি বিষম পাজি !

অন্য একজন দোকানদার। কি আর বলব হুজুর, এমন ম্যাজিস্ট্রেট এ জেলায় কোনদিন আসে নি। তার ভয়ে দোকানের জিনিসপত্র লুকিয়ে রাখতে হয়। একবার যদি শনির দৃষ্টি কোন জিনিসের ওপরে পড়ে, তা সে নেবেই—পচা-গলা যেমনই হোক। আর বলব কি হুজুর, মাঘ মাসে একবার তার জন্মদিন ব'লে ভেট পাঠালাম, আবার শ্রাবণ মাস না আসতেই ব'লে পাঠায়, জন্মদিনের ভেট চাই। হুজুর, বছরে একটা জন্মদিনের ঠেলাই আমরা সহ্য করতে পারি না, বারো মাসে বারো বার জন্মালে আমরা কি করি ? ব্যবসা-বাণিজ্য চলে কেমন ক'রে ? হুজুর নিজেই বিচার ক'রে দেখুন।

অনঙ্গমোহন। এ যে রীতিমত ডাকাতি !

অন্য একজন। ডাকাতি হুজুর, দিনে ডাকাতি। কোন জিনিস যদি না দিয়েছি, অমনই পুলিস এসে দোকানে তালাচাবি লাগিয়ে গেল। আবার শয়তানটা বলে কি জানেন হুজুর ?—চাবুক মারা আইনবিরুদ্ধ। তাই আইনসম্মত কাজ ক'রে গেল দোকানে তালাচাবি লাগিয়ে। ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়। কাজেই জিনিসটি পাঠিয়ে দিতে হয়।

অনঙ্গমোহন। কি সর্ব্বনাশ! এমন লোককে আন্দামানে পাঠিয়ে দিতে হয়।

অন্য একজন। যেখানে খুশি পাঠান হুজুর, কেবল এখান থেকে দূরে যেন হয়। আমাদের দরখাস্ত মঞ্জুর করুন হুজুর, এই সামান্য ভেট নিন।

অনঙ্গমোহন। সর্ব্বনাশ! এমন কথা কল্পনাতেও এনো না। ঘুষ আমি কখনও নিই না। তবে যদি তোমরা আমাকে তিনশো টাকা ধার দিতে চাও, তবে সে আর এক কথা।

দোকানদারগণ। এ তো আমাদের সৌভাগ্য হুজুর, কিন্তু তিনশোতে কি হবে? পাঁচশো নিন। কেবল আমাদের কথা মনে রাখবেন হুজুর।

অনঙ্গমোহন। ঘুষ নেওয়া অন্যায়, ধার নেওয়াতে দোষ নেই। দাও।

দোকানদারগণ। [রূপার রেকাবিতে করিয়া টাকা দান] হুজুর, রেকাবিটা সুদ্ধ নিন।

অনঙ্গমোহন। তোমরা যখন অনুরোধ করছ, তাই নিলাম।

দোকানদারগণ। এই ঝুড়িটাও নিন হুজুর।

অনঙ্গমোহন। কি সর্ব্বনাশ! ঘুষ আমি নিই না।

মুকুন্দ। ওদের প্রতি দয়া ক'রে নিন হুজুর। পথে কাজে লাগবে। দাও দাও। [দোকানদারদের প্রতি] এটা কি? দড়ি? কাজে লাগবে।

অনঙ্গমোহন। দাও। নিজে হাতে নিলে ঘুষ হয়, চাকরের হাত দিয়ে নিলে সে দোষ হয় না।

দোকানদারগণ। হুজুর, দয়া ক'রে আমাদের কথা মনে রাখবেন। আমরা শয়তানের সঙ্গে ঘর করছি। আমাদের বাঁচান।

অনঙ্গমোহন। নিশ্চয়। নিশ্চয়। তোমাদের কথা মনে থাকবে। এখন তোমরা যাও। (দোকানদারদের প্রস্থান)

(নীচে পুনরায় বিচারপ্রার্থী জনতার কোলাহল। জানালা দিয়া দু-চারখানা দরখাস্তের কাগজ দেখা যাইতেছে। দু-চারখানা নিক্ষিপ্ত হইয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িল)

অনঙ্গমোহন। আবার কে? [জানালায় গিয়া] না না, এখন যাও। এখন আর দরখাস্ত নেব না। [ফিরিয়া আসিয়া] মুকুন্দ, ওদের এখন যেতে ব'লে দে।

মুকুন্দ। [জানালায় চীৎকার করিয়া] এখন সব যাও। হুজুর এখন গোসল করবেন। এখন গোলমাল করলে তাঁর মাথা ধ'রে যাবে। জলদি ভাগো।

(এমন সময়ে ঘরের এক দিকের দরজা খুলিয়া গেল এবং মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা জীর্ণবস্ত্র শীর্ণকায় জনকয়েক লোককে দেখা গেল)

মুকুন্দ। পালাও, পালাও। নাঃ, এরা হুজুরের মাথা ধরিয়ে দিলে দেখছি।

(জনতাকে ঠেলিয়া লইয়া সে বাহির হইয়া গেল। দরজা বন্ধ হইয়া গেল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বিপরীত দ্বার দিয়া রমলার প্রবেশ)

রমলা। আপনি এখানে? আমি যাচ্ছি।

অনঙ্গমোহন। ভয় কিসের? বসুন না একটু।

রমলা। না না, ভয় পাই নি।

অনঙ্গমোহন। আপনি কাকে খুঁজছিলেন, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

রমলা। আমি ভেবেছিলাম, মা এখানে আছেন।

অনঙ্গমোহন। মাকে খুঁজছিলেন? সত্যি, আর কাউকে নয়?

রমলা। আপনাকে আর বিরক্ত করব না—আপনি নিশ্চয় খুব ব্যস্ত রয়েছেন।

অনঙ্গমোহন। ব্যস্ত! মোটেই নয়। আর ব্যস্ত থাকলেই বা কি? আপনার সঙ্গর চেয়ে জরুরি কাজ আর কি হতে পারে? বিশ্বাস করুন, আপনি আসাতে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি।

রমলা। আপনার কথা শুনে মনে হয়, আপনি যেন রঙ্গমঞ্চে কথা বলছেন।

অনঙ্গমোহন। রঙ্গমঞ্চে বইকি—যে-রঙ্গমঞ্চের আপনিই একমাত্র অভিনেত্রী। আদেশ করুন, আপনার বসবার জন্যে একখানা চৌকি এগিয়ে দিই। ধিক আমাকে, যাঁকে সিংহাসন এগিয়ে দেওয়া উচিত তাঁকে আজ সামান্য একখানা কাঠের চৌকি দিতে হ'ল। [চৌকি দিল]

রমলা। আমার এখন যাওয়াই উচিত। [বসিয়া পড়িল]

অনঙ্গমোহন। আপনার গলার গলার মালাটি কি চমৎকার!

রমলা। আমরা পাড়াগেঁয়ে, তাই ঠাট্টা করছেন।

অনঙ্গমোহন। আহা, আমি যদি ওই গলার মালাটি হতাম! বিচ্ছেদহীন আলিঙ্গনে ওই গলাটি ঘিরে থাকতে পারতাম।

রমলা। আপনি কি যে বলছেন, আমি বুঝতে পারছি না! আজকের দিনটি বেশ সুন্দর!

অনঙ্গমোহন। তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর আপনার ওই দুটি চোখ।

রমলা। আপনি বেশ কথা বলতে পারেন। আমার অ্যাল্‌বামে একটা ছোট কবিতা লিখে দিন না।

অনঙ্গমোহন। আপনার আদেশে আমি সব করতে পারি, কবিতা লেখা তো সামান্য কাজ। কি রকম কবিতা আপনার পছন্দ?

রমলা। কবিতার আবার রকম আছে নাকি?

অনঙ্গমোহন। আছে বইকি। বোধ্য আর দুর্বোধ্য, মানে যা বোঝা যায়, আর যা বোঝা যায় না।

রমলা। কি যে বলছেন! বোঝা যায় না এমন কবিতাও আছে নাকি? ও রকম জিনিস লোকে লেখেই বা কেন? আর বোঝেই কি ক'রে?

অনঙ্গমোহন। লেখক আর পাঠক চুক্তিবদ্ধ। লেখক বোঝাতে চায় না, পাঠকও বুঝতে চায় না। পরস্পরকে তারা বেশ চেনে, কাজেই কোন দিক থেকে প্রশ্ন ওঠে না।

রমলা। থাক। আপনি একটা বোধ্য কবিতাই লিখে দিন।

অনঙ্গমোহন। হায়! কলকাতার মেয়ে হ'লে বলত, দুর্ব্বোধ্য কবিতা চাই।

রমলা। এটা কি আধুনিক ফ্যাশান নাকি?

অনঙ্গমোহন। ঠিক ধরেছেন, আপনার এই ব্লাউসটির মত।

রমলা। তবে একটা দুর্ব্বোধ্য কবিতাই লিখুন।

অনঙ্গমোহন। ব্র্যাভোঃ! এই তো চাই। আপনি যে শুধু সুন্দরীতমা তা নয়, আপনি আধুনিকতমাও বটেন!

(অ্যাল্‌বাম লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেছে)

অনঙ্গমোহন। ময়ূরের পুচ্ছ আর ফিঙের ডানাটি
লাল মৃত্যু ছুটে আসে হাতে নিয়ে লাঠি
নৈরাজ্যের, নৈষ্কর্ম্মের, নৈর্ব্যক্তের ভাব
'পর্ব্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ'
'এট্‌ টু ব্রুট্‌'! 'রসো বৈ সঃ' 'হ্রীং ক্রীং ক্লীং'!

এ রকম আমি ঘণ্টায় তিনশো ষাটটা লাইন লিখে যেতে পারি। কিন্তু সেসব থাকুক। কবিতার চেয়ে আরও মূল্যবান বস্তু আমার কাছে আছে, তাই আপনাকে দেব—সে আমার প্রেম। [নিজের চেয়ার রমলার নিকটে টানিয়া] আপনার ওই চোখের—

রমলা। আপনার কবিতার চেয়ে আপনার কথা দুর্ব্বোধ্যতর।

অনঙ্গমোহন। কিছুই দুর্ব্বোধ্য নয়। আপনাকে আমি ভালবাসি।

রমলা। ভালবাসা? সে আবার কি? [চেয়ার দূরে সরাইয়া]

অনঙ্গমোহন। চৌকি সরিয়ে নেন কেন? কাছাকাছি তো বেশ ছিলাম। [চৌকি নিকটতর করন]

রমলা। [চৌকি দূরে সরাইয়া] কাছাকাছি কেন? দূরেই তো বেশ।

অনঙ্গমোহন। ভালবাসা যে কাছের ধর্ম্ম! [চৌকি নিকটতর করন] দূরে কেন? কাছাকাছিতে কি মাধুর্য্য!

রমলা। [দূরে সরাইয়া] কিন্তু কেন বলুন তো?

অনঙ্গমোহন। [নিকটতর করন] আপনি ভাবছেন, আমরা কাছাকাছি আছি? ভুল ভুল, রমলা দেবী, সব ভুল। আমরা দূরে—দূরে, লক্ষ যোজন দূরে। আমাদের মধ্যে ব্যর্থতায় ভরা বিচ্ছেদের অনন্ত আকাশ বিরাজমান। আহা, যদি ওই তনুলতাটি এই বাহুবন্ধে—

রমলা। [জানালায় গিয়া] বাঃ, কি সুন্দর একটা প্রজাপতি!

অনঙ্গমোহন। [উঠিয়া গিয়া] তবেই দেখুন, ঠিক এই মুহূর্ত্তে স্বয়ং প্রজাপতির আবির্ভাব। এখনও কি আপনার সন্দেহ আছে?

রমলা। [চেয়ারে বসিয়া] সত্যি, আপনি বাড়াবাড়ি করছেন।

অনঙ্গমোহন। ঠিক উল্টো রমলা দেবী, মনের উচ্ছ্বাস অনেক কষ্টে সংযত ক'রে রেখেছি।

রমলা। আপনি এখন যান।

অনঙ্গমোহন। আপনি রাগ করছেন! উঃ, আমার আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল। কি ক'রে আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করব, জানি না। [নতজানু হইয়া] ক্ষমা করুন রমলা দেবী।

ক্রমশ

প্র. না. বি.

মিথ্যাবাদী বালক

সহজ কথাগুলিকে পণ্ডিতেরা এত জটিল করিয়া তোলেন কেন, বলিতে পারেন? সত্য-মিথ্যার সাধারণ প্রসঙ্গটাই ধরুন না কেন। যে মিথ্যা বলে, সে মিথ্যাবাদী। মিথ্যা কি? যাহা সত্য নয়, তাহাই মিথ্যা। কিন্তু সত্য কি? এইবারেই ঠেকিলেন। আপনিও ঠেকিলেন, পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যও আরম্ভ হইল। শুনিয়াছি, এ প্রশ্নটি কিছুদিন আগে আর এক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নাকি উত্তর শুনিবার জন্য অপেক্ষা করেন নাই, কারণ, কেহ উত্তর দিতে পারিবে ব'লিয়া তাঁহার ভরসা ছিল না। আচরণটা ভদ্রোচিত নিশ্চয়ই হয় নাই। আর কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিতে রাজি হইলেই রবীন্দ্রনাথ ও আইনষ্টাইনকে ধরিয়া একটা বিহিত করিয়া দেওয়া যাইত।

কিন্তু দৈনন্দিন জীবন লইয়া যেখানে কারবার, সেখানে অতখানি অভ্রভেদী তত্ত্ব-তালাসের দরকার নাই। সেখানে সত্য-মিথ্যার অর্থ অতিশয় সুস্পষ্ট। বালক মাত্রেই জানে, কাচের গ্লাসটি ভাঙিয়া স্বীকার করিলে সত্য কথা বলা হয়, অস্বীকার করিলে মিথ্যা বলা হয়। অর্থাৎ, নিজের লাভ-ক্ষতি কিংবা নিন্দা-প্রশংসা নির্ব্বিশেষে কোন জ্ঞাত বিষয় যথাযথ প্রকাশ করা সত্যাচরণ। আর ক্ষতি এড়াইবার জন্য, দোষ ঢাকিবার জন্য অথবা স্বার্থসিদ্ধির জন্য উহা লুকাইয়া ফেলা কিংবা আংশিকভাবে প্রকাশ করা মিথ্যাচরণ। দর্শনের অলৌকিক রাজ্যের বাহিরে সত্য-মিথ্যার এই সংজ্ঞাই যথেষ্ট।

মিথ্যাবাদী বালককে সকলেই নিন্দা করে, এবং দেখিতেছি, নিন্দাটা যেন কায়েমী হইতেই চলিল। কিন্তু আমার মনে হয়, কথাটা একটু নতুন করিয়া ভাবিয়া দেখিবার সময় হইয়াছে। আত্মরক্ষার প্রথম ও আদিমতম অস্ত্র হইল মিথ্যা বলা; যে বালক বেগতিকে পড়িয়াও মিথ্যা বলিতে পারে না, তাহার সম্বন্ধে চিন্তিত হইবার কারণ আছে। তাহার আত্মরক্ষার সহজ প্রবৃত্তিটি সম্যক পরিস্ফুট হয় নাই, নিজের ভালমন্দ বিচার করিবার জ্ঞান হয় নাই, কল্পনাশক্তিও দুর্ব্বল। অপর পক্ষে, যে বালক দুষ্কর্ম্ম বেমালুম অস্বীকার করে, তাহার কুকর্ম্ম সুকর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞান হইয়াছে, কুকর্ম্মটা স্বীকার করিয়া লইলে সম্ভাব্য লাঞ্ছনা সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ সচেতন। কেবল তাহাই নহে, অপরাধটা সম্পূর্ণ কবুল না করিয়া যেটুকু ঘটনার হেরফের ঘটাইলে অব্যাহতি পাইলেও পাওয়া যাইতে পারে, সেটুকু বানাইয়া বলিবার মত কল্পনাশক্তি তাহার আছে। মিথ্যা বানাইয়া বলা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। একাধারে বুদ্ধিমান, সপ্রতিভ এবং প্রত্যুৎপন্নমতি না হইলে বানাইয়া বলিবার ক্ষমতা থাকিতে পারে না। আপনার ছেলেটি সত্যবাদী বলিয়া আপনি গর্ব্বিত হইতে পারেন, আমি কিন্তু শুনিয়া দুঃখিতই হইব। আমার ছেলেটির মত উহার বানাইয়া বলিবার ক্ষমতা নাই। তাই ধরিতে আসিলেই ধরা পড়িয়া যায়। আপনি বলিবেন, পড়িবেই তো, ও যে সত্যবাদী। আমি উহার আত্মরক্ষার অক্ষমতাকে বাহবা দিতে রাজি নই। এই কল্পনাশক্তিরহিত বালকরাই ধরা পড়িয়া সত্যবাদী নামে বিখ্যাত হয়। ফলে, যে সকল নিষিদ্ধ কার্য্যের সমষ্টিকে আমরা বাল্যকাল বলিয়া থাকি, সেই সকল অতি-উত্তেজনাময় অনাচারগুলি তাহাদের অভিজ্ঞতার বহির্ভূত থাকিয়া যায়। মিথ্যা বলিতে পারিলে নিষ্কৃতি পাইবার একটা ভরসা থাকে, এবং সেই ভরসাতেই বিধি-বহির্ভূত যাবতীয় দুষ্কর্ম্ম করিবার সৎসাহস জন্মায়। জর্জ ওয়াশিংটন নাকি বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, পিতঃ, আমিই এই বৃক্ষ ছেদন করিয়াছি। ইহা সত্য বলিয়া আমার মনে হয় না। যে বালক উত্তরকালে এত বড় একটা লোক হইয়াছিল, তাহার পক্ষে এই মূঢ়তা অবিশ্বাস্য। কুঠার হাতে পাইয়া যে বৃক্ষ ছেদন না করে এবং পরে সেই দুষ্কর্ম্ম অস্বীকার না করে, সে বালকের চিকিৎসার প্রয়োজন আছে।

ঘটনার অপলাপকে যদি মিথ্যাচরণ বলিতে হয়, তাহা হইলে অনেক ক্ষেত্রে অবিচারের সম্ভাবনা আছে। কারণ, ঘটনা অনেক সময়ে অবাস্তব। উহা হইতে কিছুই প্রমাণ না-ও হইতে পারে। 'গল্পগুচ্ছে'র সেই যাত্রাদলের বালক কিরণময়ীর আশ্রিত নীলকান্তকে মনে পড়ে? সে তো সতীশের দোয়াতদানটি চুরি করিয়াছিল, তাহার বাক্স হইতে উহা পাওয়াও গিয়াছিল। কিন্তু সে তো চোর নয়। সে চুরি করিয়াছিল, তবু সে চোর নয়। কিরণময়ী তাহা বুঝিয়াছিলেন। তাই বাক্সটি ঘরে আনাইয়া দোয়াতটি বাহির করিয়া গোপনে গঙ্গার জলে ফেলিয়া আসিলেন। নীলকান্ত যদি বলিত, সে চুরি করে নাই, কিছুমাত্র মিথ্যাচার হইত না।

খাঁটি কথাটি জানিতে হইলে কেবল কতকগুলি আনুষঙ্গিক ঘটনা পরীক্ষা করিলে চলে না। এক লেখক রহস্য করিয়া 'সত্য'কে তুলনা করিয়াছেন চটের বস্তার সঙ্গে। উহা ঘটনা-বোঝাই না হইলে দাঁড়াইতে পারে না। এই তুলনা অনেক ক্ষেত্রে অসার্থক। মাঝে মাঝে এক-একটি লোক দেখা যায়, তাঁহারা না জানেন এমন কোন তথ্য, এমন কোন ঘটনা পৃথিবীতে নাই। ঘটনাগুলি যেন তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া ঘটে। এক-একজন এক-একটি ঘটনা-বিশারদ—লক্ষ খবরের মালিক। কিন্তু ইঁহাদের নিকট কোন বিষয়ের উপর একটি সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত প্রার্থনা করুন, হতাশ হইবেন। কারণ, যে রসায়নে ঘটনার পাকে আসল জিনিসটি বাহির হইয়া আসিতে পারে, সেটি তাঁহাদের আয়ত্ত নয়।

আপনি বলিতে পারেন, ঘটনার বিচার এক জিনিস, আর ঘটনা গোপন করা অন্য জিনিস। নীলকান্ত না হয় চুরি করিবার উদ্দেশ্যে দোয়াতদানটি বাক্সের মধ্যে রাখে নাই, কিন্তু সে যদি দোয়াতের অবস্থান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার ভান করে, তাহা হইলে কি বলিব? কিছুই বলিবার নাই। উহা হইতে যাহা প্রমাণিত হইতে পারে, তাহা মিথ্যা। সুতরাং এ ঘটনাটিও অর্থহীন। আসল কথা, সমাজের যে সকল বিধি-নিষেধ বিচারবুদ্ধি জন্মিলে আমাদের আর অসঙ্গত বোধ হয় না এবং আমরা সহজে মানিয়া চলি, বালক-বয়সে সেগুলিকে জুলুম বলিয়া মনে হয়, এবং বালকের দুষ্কর্মগুলি সেই সব বন্ধনচ্ছেদন-অভিযানের জয়চিহ্ন মাত্র। অর্থাৎ, অপরিণত বয়সের দুষ্কৃতিগুলি দুশ্চরিত্রতার লক্ষণ নহে। উহারা নিজেরাও বোধ করি তাহা কিছু কিছু জানে, তাই অবিচারের আশঙ্কায় কোন কোন সময়ে ঘটনা গোপন করে, কখনও বানাইয়া বলে।

বানাইয়া বলিবার ক্ষমতা সাহিত্যেকদের নিকট অন্তত দোষনীয় বলিয়া মনে হইবে না, আশা করি। যাঁহারা সাহিত্যানুরাগী, তাঁহারাও এ অভ্যাসটা অনুমোদন করিবেন, ভরসা করা যায়। যিনি যত বানাইয়া বলিতে ওস্তাদ, তিনি তত শক্তিমান লেখক। রসজ্ঞানহীন ঐতিহাসিক হয়তো কথাটা মানিবেন না, তিনি 'আনন্দমঠে'

অনৈতিহাসিকতা খুঁজিয়া বেড়াইবেন, মন্বন্তরের সন তারিখ লইয়া রসিক-সমাজে একটা হৈ-চৈ তুলিয়া বসিবেন। লিটন ষ্ট্রাচির সহিত তো তাঁহার মহা তর্কই বাধিয়া যাইবে; কারণ লিটন ষ্ট্রাচি বলেন, কাহারও জীবনী লিখিতে বসিয়া যদি মনে হয়, লোকটির বাঁ পা-টি খোঁড়া হইলে মানাইত ভাল, তাহা হইলে আর দ্বিধা না করিয়া কলমের খোঁচায় তাহার বাম পদটিকে জখম করিয়া দেওয়া উচিত।

সকল বালকের কল্পনাশক্তি এক নয়। তাই বানাইয়া বলিবার ক্ষমতাও তাহাদের সমান নহে। অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে গল্প লেখে। যাহাদের কল্পনা সীমাবদ্ধ তাহারা পারিপার্শ্বিক কিংবা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। একটি মেয়ে গল্প লিখিয়াছিল—

একজন বাবা ছিল। সে রোজ ভাইকে কোলে
নিয়ে বেড়াতে যেতো। আমি তখন যেতাম না।
আমি আজ বিকেলে বেড়াতে যাবো। কিন্তু আজ
বোধ হয় বিষ্টি পড়িবে।

একই বয়সের অন্য একটি মেয়ে 'শূন্য খাঁচা' নাম দিয়া এক পলাতকা পক্ষিণীর কাহিনী বর্ণনা করিয়াছিল। তাহাদের বাড়িতে কোন খাঁচায় পোষা পাখি ছিল না। সুতরাং, তাহার কল্পনা সেই পক্ষিণীর সহিত আর একটু উর্দ্ধে উড্ডীন হইয়াছিল, বলিতে হইবে। মাঝে মাঝে দুই-একটি অতি শক্তিমান বালক দেখা যায়, তাহারা কুকার্য্য ঢাকিবার জন্য এমন সুন্দর গল্প তৈয়ারি করিয়া বলিতে পারে যে, বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকে না। দৈবাৎ উহার অসত্যতা আবিষ্কৃত হইলে বালকটির উপর রাগ করিবেন কি, উহার উপায়-নৈপুণ্য, কল্পনাকুশলতা এবং কল্পিত ঘটনার সুকৌশলী পারম্পর্য্য-সৃষ্টির অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবেন। এমন কি, ভাবিয়া আনন্দ হইবে, এ বয়সেই যেরূপ মিথ্যাবাদী হইয়াছে, কালে একটা রবীন্দ্রনাথ কিংবা শরৎচন্দ্র না হইয়া যায় না।

মিথ্যা বলাটা কখন দোষের, জানেন? যে বয়সে কৃত দুষ্কর্মের পিছনে একটা সমাজ-বিরুদ্ধ আচরণ-জ্ঞানের অস্তিত্ব ধরিয়া লওয়া অসঙ্গত নয়, সে বয়সে অপরাধীর আত্মরক্ষার চেষ্টার প্রতি আমাদের সহানুভূতি থাকে না। তাই মিথ্যা বলিলে তাহার ক্ষমা নাই। ব্যাঙাচির লেজ খসিয়া পড়িবার মত, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যাভাষী রসনাটা খসিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। যাহার যায় না, তাহার বড় হইয়াও সামাজিক চেতনা হয় নাই। সে শাস্তির যোগ্য।

"প্রবাসী"

পথভ্রষ্ট হ'লে কি এখনি ?

হে পথিক, ক্লান্ত তুমি ? পথভ্রষ্ট হ'লে কি এখনি ?
লাগে নি পশ্চিম-নভে এখনো যে বিদায়ের আভা,
অর্দ্ধপথে থমকিলে, বার্ত্তাহীন চপল লেখনী,
ভয় পেলে—লাগিয়াছে কেশপ্রান্তে শমনের থাবা ?
সমস্ত জীবন দিয়ে যে বারতা করেছ সংগ্রহ,
ভুল পথে ঘুরে ঘুরে যে সত্য করিলে অনুভব,
পূজা না হইতে শেষ চূর্ণ চূর্ণ করিয়া বিগ্রহ,
যে পথ তোমার নয়, সে পথে কি খুঁজিছ বৈভব ?
হায় ভ্রান্ত, এতকাল যে যজ্ঞের হোতা হ'লে তুমি,
হবিহীন ভস্মে তার ঘটাইতে চাহিছ দুর্গতি—
বাস্তব জগৎ নয়, কর্ম্মক্ষেত্র তব মনোভূমি,
কোনো রাজা পারে নাই করিবারে সে রাজ্যের ক্ষতি।
দূর শূন্য ভবিষ্যতে যেখানে জ্বলছে তারাদল
লক্ষ বর্ত্তমান সূর্য্য লুপ্ত সেথা স্তিমিত লজ্জায়,
ধরণীর ধূলি 'পরে যা রচিছ সকলি নিষ্ফল,
মনের কুসুম শুধু ফোটে নিত্য প্রদীপ্ত সজ্জায়।
সহস্র লোকের ভিড়ে হারায়েছে অনেক মানুষ,
ত্যজিয়াছে ভিড় যারা, তারা শুধু রয়েছে বাঁচিয়া।
ঝড়-ঝঞ্ঝা-অন্ধকারে আলো ধরে কল্পনা-ফানুষ
গোড়ায় ঘটিলে ভুল পাকা ঘুঁটি যায় যে কাঁচিয়া।
হে পথিক, ক্ষান্ত হও, পরিশ্রান্ত ও দুটি চরণ,
জনতার কোলাহল এড়াইয়া চল ওইখানে,
মনের মানুষ যেথা খুলিয়াছে দেহ-আবরণ,
যন্ত্রের গর্জ্জন যেথা ডুবে গেছে বাণীহীন গানে,
সেখানে নীরবে ব'স, সময়ের তরঙ্গের মুখে
বিরাট বৃহৎ বহু ফেনা হয়ে ফাটিছে বুদ্বুদে,
বহু কীর্ত্তিমান জন চিহ্নহীন বালুবেলা-বুকে,
অনেক পঙ্কিল জল ভ'রে গেছে কহ্লারে কুমুদে।

মন্বন্তর পার হয়ে নবজন্ম লভিবে কাহারা—
রাজ্য আর রাজনীতি উচ্চকণ্ঠে করিছে আহ্বান,
বহু জনপদ-দুঃখে হাহাকার করিছে যাহারা
কবির কাব্যেতে শুধু লেখা আছে পতন উত্থান!
কোথা রাম, রামায়ণ যে লিখেছে তারে নমস্কার।
অতীতের ইতিহাস ভবিষ্যের নহে কি ইঙ্গিত?
রাজপথে কোলাহল, দুঃসাহসী, রুদ্ধ কর দ্বার,
রুদ্ধ ঘরে গুমরিছে সুবিপুল বিশ্বের সঙ্গীত।

বে-নামা

১

ওরা ভাই, কারা—প্রকাণ্ড মুখ
গলা থেকে শুরু—নীচে নাই বুক—
তুবড়ির মত ফোটে?
—এরা দেশনেতা, যে সব জনের
পয়সা লাগে না বিজ্ঞাপনের,
ফাঁকা আওয়াজের চোটে!

২

ওরা ভাই, কারা—শুধু দুটো হাত,
ডানে-বাঁয়ে খেলে, দেখি দিনরাত,
বাঁধা যেন কার সাথে?
—একখানা খেলে নিজের উপায়ে,
আর একখানা দাদার দু পায়ে
বাঁধা কল-কব্জাতে!

৩

আর ওরা কারা—আইনের নামে
দরবার জুড়ে ব'সে ডানে-বামে,—
রাজ-কারবার করে?
—ওরা সরকার, দরকার মত
শাসনের জুয়া চালায় সতত,
স্বারত্ত নাম ধরে!

৪

লোকটি কে ইনি?—যেন চিনি-চিনি,
কি এক দলের স্বামী হন ইনি,
জানাও ছিল যে নাম!
—ভোল বদলিয়ে, নানা কৌশলে
শিং ভেঙে উনি দামড়ার দলে
রহিম হলেন রাম!

৫

ওই কোণে কারা—বিশম্ভর—
ধামা-চাপা-দেওয়া বিশাল উদর,
আইনে লাগে না ফাঁস?
—ওরা বিলকুল ঘুসুড়ুত্তো ভাই,
তুমি লও এত, আমি এত চাই,—
চোরাই বাজারে বাস।

৬

আর এরা কারা—কঙ্কালসার,—
প্রতি হাড়খানা গোনা যায় যার,
জুড়ি সারা দিকদেশ?
—এরাই যে ভাই, ভারতবর্ষ,
নাই যাহাদের বিষাদ-হর্ষ,
ম'রেও হয় না শেষ!

চোখে নাই দিঠি, মুখে নাই বাণী
হাত দুটো পাতা আছে ;
কারো বহে শ্বাস, কারো বা বয় না
উড়িছে শকুনি, সবুর সয় না,
শেয়ালে লয় বা পাছে !

ভিক্ষায় গেছে যাদের জীবন,
মরণে কি করে তার ?
সেই হাত-পাতা—ললাট-লিখন,
দারা-সুত—কে-বা কার !

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

সংবাদ-সাহিত্য

মাঘের 'পরিচয়ে' পড়িতেছিলাম—

"কমিউনিজম হইতেছে বর্তমানে সামাজিক কর্মপন্থার একটিমাত্র বিশ্বব্যাপী পার্টি যাহা, কোন রফা না করিয়া ও কিছুই গোপন না রাখিয়া, পতাকা বহন করিতেছে এবং বিচারিত ও বীরোচিত ন্যায়পরতার সহিত পর্বতের উচ্চশিখর-বিজয়ের পথে চলিয়াছে।"

ইহা হইল বিশ্বের পটভূমিকায় আদর্শ কমিউনিজমের কথা। কিন্তু সত্য-সেলুকাস-কি-বিচিত্র-এই-দেশ ভারতবর্ষে কমিউনিষ্ট পার্টি যে-কমিউনিজমের পতাকা বহন করিতেছেন, তাহার মূলমন্ত্রই যে প্রয়োজনমত সকলের সঙ্গে রফা করা এবং সব কিছুই গোপন করা, ফাল্গুনের 'প্রবাসী'তে শ্রীঅমরকৃষ্ণ ঘোষ "কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট" প্রবন্ধে তাহা বিশদভাবে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই দীর্ঘ প্রবন্ধের সামান্য অংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"কংগ্রেস আপোষকারী বলিয়া আরও এক পক্ষ চিৎকার করিল। সে পক্ষ হইল কমিউনিষ্টরা। ইহারা তখন খোলাখুলি কোনও দল নহে। কেননা, ইংরেজ সরকারের শ্যেন-দৃষ্টি ইহাদের উপর। ইহারা তখন গোপনে মাঝে মাঝে ইস্তাহার ছাড়িয়া জানাইয়া দেয় যে ইহারা আছে।

"ইহাদের ১৯৩৯ সালের যুদ্ধ সম্বন্ধে একটি ইস্তাহার হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :

"To help the imperialism in this war is to strengthen fascism in Europe."

"এই যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করিলে ইউরোপে ফাসিজমকে শক্তিমান্ করা হইবে।"

"The duty of the Indian people as a part of the International army of freedom is to unconditionally resist the war, to achieve her own freedom and weaken British Imperialism..."

"স্বাধীনতার আন্তর্জাতীয় বাহিনী হিসাবে ভারতবাসীদের কর্তব্য হইতেছে এই যুদ্ধকে সমগ্রভাবে বাধা দেওয়া, নিজ স্বাধীনতা অর্জন করা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে শিথিল করা..."

"Compromise between British Imperialism and Congress on the issue of war would be treachery to world democracy..."

"যুদ্ধ বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদ ও কংগ্রেসের মধ্যে রফা হইলে ডিমোক্রেসীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে।"...

"১৯৩৩ সালে কমিউনিষ্ট পার্টি কি ইস্তাহার দিতেছে পড়ুন :—

"The greatest threat to the victory of the Indian revolution is the fact that the masses of our people still harbour illusions about the Indian National Congress and have not realised that it represents a class organisation of the capitalists working against the fundamental interest of the toiling masses of our country."

"মনে রাখিতে হইবে যে ইহারা কথায় কথায় ভারতীয় বিপ্লবের ধূয়া তুলিয়া থাকে। বিপ্লব যে কেমন করিয়া হইবে, কাহারা করিবে, কখন করিবে, তাহার ঠিকানা না থাকিলেও কংগ্রেসকে গালি দিবার জন্ত এ মিথ্যা জোর গলায় প্রচার করিতে ইহাদের বাধে না। যদি ইহারা সত্যই বিপ্লববাদী তবে ১৯৩০-৩১ সালের বহু সম্ভাবনাপূর্ণ আন্দোলনের সময় ইহারা কোথায় ছিল? অথচ ঠিক দুই বৎসর পরেই ইহারা বলিতেছে যে কংগ্রেস বিপ্লববাদী নহে।"...

"১৯৩৩ সালে ইহাদের যে manifesto হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধার করা হইল, তাহাতে কংগ্রেসকে দোষারোপ করিতে ইহারা কি ভাবে মিথ্যার আশ্রয় লয় তাহা দেখাইয়াছি। ঐ manifestoতে আরও আছে—

"...And today Gandhi tells the peasants and workers of India that they have no right to and must not revolt against their exploiters. He tells them this at the very time when the British robbers are making open war on the Indian people in the N. W. Province and throughout the country."

"অর্থাৎ 'এবং আজ গান্ধী ভারতের কৃষক ও শ্রমিকদের বলিতেছে যে তাহাদের শোষকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার অধিকার তাহাদের নাই এবং বিদ্রোহ করা উচিত নয়। এ কথা সে বলিতেছে সেই সময় যখন ব্রিটিশ দস্যু উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে (?) এবং সারা দেশে ভারতবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যাপৃত।'"...

"দেশে যখন এরূপ একটা ব্যাপক ও তীব্র বিপ্লবাত্মক আন্দোলন চলিতেছিল তখন কমিউনিষ্টরা ১৯৩৯ সালের ফতোয়া যেন ভুলিয়া গেল। তাহারা শ্রমিক সম্প্রদায়কে বুঝাইল, "দেখ ভাই, ফাসিজমকে ধ্বংস করিতে হইলে যুদ্ধোদ্যমে বাধা দিলে চলিবে না। ব্রিটিশকে সাহায্য করিয়া যাও। দেশে যে-সব বিদ্রোহাত্মক কার্য্য চলিতেছে তাহা জাপানের গুপ্তচর পঞ্চম বাহিনীর কাজ, তোমরা ইহাতে যোগ দিও না।"

"লেনিন এক স্থানে বলিয়াছেন—

"Support must be given to those national movements which tend to weaken imperialism and bring about the overthrow of imperialism and not to strengthen and preserve it."

"অথচ "কমিউনিষ্ট"-মুখোস পরিহিত একদল লোক ভারতবর্ষে বিপ্লবাত্মক আন্দোলনকে বাধা দিতে লাগিল।

"ইংরেজ প্রমাণ করিতে চায় আমাদের মধ্যে ঐক্য নাই। সারা দুনিয়ায় সে প্রচার করিয়াছে যে ইংরেজ যদি এক দিন ভারতে না থাকে তবে হিন্দু মুসলমান পরস্পরের মাথা ফাটাইয়া একটা লণ্ডভণ্ড কাণ্ড করিয়া বসিবে।

"আশ্চর্য্য, কমিউনিষ্টরাও খুব জোর গলায় সেই কথাই প্রচার করিতেছে! আমাদের ঐক্য নাই এই প্রচারের দ্বারা ইহারা জনতার হৃদয়ে অনৈক্যের বীজ বপন করিতে সহায়তা করিতেছে। Mob-psychology যাঁহারা বুঝেন তাঁহারা এই প্রচারের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিবেন।

"ইহারা মুসলিম লীগের two-nation মতবাদের গোঁড়া সমর্থক হইয়া উঠিল। মুসলিম লীগ-প্রীতি ও "পাকিস্থান"-প্রীতি ইহাদিগের এত উৎকট হইয়া উঠিয়াছে যে তদ্দ্বারাই ইহাদের কমিউনিষ্ট-মুখোস খসিয়া পড়িয়াছে। লেনিন বা মার্কস-নীতিতে বিশ্বাসী হইলে মুসলিম লীগের "মুসলমান জাতি"র দাবী ইহারা সমর্থন করিতে পারিত না। ধর্ম্মের ছাপ যে "জাতি"বাচক একথা কোনও শিক্ষিত ব্যক্তি স্বীকার করিতে পারিবেন না, অন্ততঃ কোনও মার্কসবাদী ত নহেই।

"১৯৩৯ সালে যাহারা ভারতে "Gandhian technique of non-violence" ভাঙিয়া ফেলিবার দৃঢ় মত প্রচার করিতেছিল ১৯৪২ সালে যখন গান্ধী ইংরেজের বন্দী ও দেশের বিরাট্ জনতা গান্ধীর "technique of non-violence" ভুলিয়া "mass insurrectoin"-এ ব্যাপৃত তখন এই মহাবিপ্লবী কমিউনিষ্টরা কোথায় গেল? ইহারা তখন ইংরেজের সঙ্গে গলা মিলাইয়া দেশের বিপ্লবপন্থী জনতাকে "Fifth columnist" ও Goonda বলিয়া গালি দিল। সেই সময়কার *People's War* খুঁজিয়া জোগাড় করিতে পারিলে দেখিতে পাইবেন কিরূপ প্রচ্ছন্ন ভাবে ইহারা কংগ্রেস-ওয়ালাদের পঞ্চমবাহিনী বলিয়া প্রচার করিতেছিল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া *People's War* পড়িয়া জানিতে পারিলাম যে ভারতবর্ষে ঐক্যের অভাব। স্বাধীনতা আসিতেছে না, কেননা, ভারতের হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের টুঁটি কামড়াইয়া রহিয়াছে বলিয়া। এই যে প্রচার ইহারা করিতেছিল, তাহা কি ইংরেজের সুবিধার জন্য নহে?"

• • •

আশা করিতেছি, ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট পার্টি অচিরাৎ ঘোষ মহাশয়ের এই সকল অভিযোগের জবাব দিবেন। উক্ত পার্টিকে "কংগ্রেস-লীগ এক হও" এবং "এই যুদ্ধ জন-যুদ্ধ" ইত্যাদি বুলি ঘটা করিয়া প্রচার করিতে দেখিয়া আমাদের মত সাধারণের মনে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। কারণ, কমিউনিজম বলিতে আমরা যাহা বুঝি এবং 'পরিচয়ে' যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে আমাদের ধারণা হইয়াছিল যে, ধর্মের ভিত্তিতে স্থাপিত কোনও দলকে আর যেই করুক অন্তত সত্যকার কমিউনিষ্ট স্বীকার করেন না এবং কোন কারণেই সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের সহিত তাঁহাদের রফা করা সম্ভব নয়। কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র উক্ত 'পরিচয়ে'ই আমরা নানাভাবে গল্প কবিতা প্রবন্ধের মাধ্যমে স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রচারের বহু নমুনা দেখিতে পাইতেছি, যাহা ধর্মত কমিউনিজম-বিরোধী। মাঘের 'পরিচয়ে' "একটি দিন" গল্পেই প্রমাণ মিলিবে, যথা—

"ঘণ্টা দিয়ে হোটেলের পরিচারককে জানিয়ে দিলেন, তাঁকে যেন 'ভারতীয়' চা দেওয়া হয়। তারপর ব্যালকনীতে গিয়ে দাঁড়ালেন; চশমাটা খুলে ডান হাতে নিয়ে চৌরঙ্গী আর ময়দানের দিকে তাকিয়ে তৃপ্ত হ'লেন। চশমা-পরা লোকের স্বাভাবিক অভ্যাসবশত চোখ দুটো কুঁচ্কিয়ে ছোট করে এনে ভারতবর্ষটাকে আঁচ ক'রে নিলেন একটু।

"তারপর খবরের কাগজে দেশী খবরটুকুর ওপর চোখ পড়লো: ওদের দুজনের কথাবার্তা ফেঁসে গেছে। 'ভারতীয়' চা'য়ে চুমুক দিয়ে অদ্ভুত আরাম পেলেন।"...

"ষ্টেটস্‌ম্যানে বেরিয়েছে—কী একটা খবর নিয়ে পাশের ঘরের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রটি কী যেন বলছিলো। নরেন হঠাৎ তাকে লক্ষ্য করে গলা ফাটিয়ে চীৎকার আরম্ভ করলো—

'আপনাদের জন্তেই তো ম'শায়—খেটে খুটে এসেছি, একটু শোবো, তার কি জো' রেখেছেন? কী করবেন ভদ্রলোক? পচা আর ভেজাল খেয়ে খেয়ে শরীর তো হ'য়েছে এক একটি রোগের ডিপো। জনযুদ্ধ! এই তো আপনাদের জনযুদ্ধ। কুইনিন পাওয়া যাবে একটা? ওষুধ মিলবে একটা? দেখছেন কি, সমস্ত কোলকাতা ছেয়ে যাবে ম্যালেরিয়ায়। কুইনিন নেই—ওই তো ভদ্রলোকের আবার জর এসেছে। আপনাদের জন্তই তো—"

"বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রটি কমিউনিষ্ট নয়। কিন্তু নিজেকে এ রকম হিংস্রভাবে আক্রান্ত হ'তে দেখে সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত উত্তরটি দিয়ে বসলো—

'জনযুদ্ধ জনযুদ্ধ ক'রছেন, কী করেছেন আপনি? চুপিচুপি চেনা ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে এসেছেন, আর বিপদে পড়লেই কমিউনিষ্টদের গাল দিয়েছেন। ওরা যা বলে—করেছেন কোনো দিন? গেছেন কোনো দিন পাড়ার জনরক্ষা কমিটিতে?"

"...কাজের ঝোঁকটা একসময় ক'মে আসে: বিড়ির দোকানের উঁচু বেদীর ওপর

দুলতে দুলতে ইয়াসিন থামে। আলগা হ'য়ে যায় আঙুলগুলো। পা দুটো ছড়িয়ে নিতে পারলে ভালো হ'তো। দু'একটা কথা বলা চলবে এখন।

"শুনা হ্যায় ?

"আব্দুল মাথা নীচু ক'রেই প্রশ্ন করে—ক্যা ?

"ও নে বিগড় গিয়া ; রেডিও মে বোলা হ্যায়—

"ক্যা— ?

"গান্ধী-জিন্না মোলাকাৎ ?

"—আফশোস্

"লেকিন আভি করনা ক্যা ?

"আব্দুল বিরক্তি বোধ করে। এ রকম একটা প্রশ্ন করার সত্যিই কোনো প্রয়োজন ছিলো নাকি ?

"উন্ লোগোঁকে ফিন্ মিলনে হোগা, আউর্ কেয়া ?

"ইয়াসিন আবার দুলতে আরম্ভ করে—

"কমরেড্ সুশীল তো আজ আয়গা ইউনিয়ন অফিস্‌মে— ?

"জরুর।"...

"বিকেল পাঁচটায় সেনের সঙ্গে মোটারে উঠতে গিয়ে শকুন্তলার সমস্ত শরীরটা কেমন যেন ক'রে উঠলো। মা গো! বাড়ীর চাকরবাকরগুলো যেন কী! কারো নজরে পড়ে নি নাকি ? অভিজাত বাড়ীটার শৌখীন রঙকে কুৎসিত ক'রে দিয়ে জানলার নিচে ইট্যালিয়ান মার্বেলের ওপর কারা আলকাতরা দিয়ে লিখে রেখে গেছে—

"কমিউনিষ্টরা চোর

"কমিউনিষ্টদের নিন্দে করার এই প্রক্রিয়াটা শকুন্তলার কিছুতেই সহ্য হচ্ছিলো না ; সেনের পাশে ব'সে শরীরের ভেতরটা ওর ক্রমাগত গুলিয়ে উঠতে লাগলো—

"ইস্—মাগো !"...

"ঢাকনি-দেয়া বাল্বের আলোয় সিগারেটের দোকানে বাক্সে আয়নাটায় ভূতুড়ে ছায়া পড়েছিলো। সদ্য ভাঁজ-ভাঙা মটকার পাঞ্জাবী ও প্রয়াস-চিহ্নিত চুলে সহসা নিজেকে কেমন বিশ্রী মনে হ'লো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রটির। বিজয়া মালতীদের বাড়ী যাওয়ার অদম্য ইচ্ছাটা জোর হারিয়ে ফেলছে। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো নরেনের ওপর। ইতর, ইতর ; চীৎকার করতে পারার অসম্ভব শক্তিতে অশ্লীল সেই একটি ভদ্রলোক।

"চোখে পড়লো লাল শালুর ওপর লেখা কমিউনিষ্ট পার্টির নাম। কী হবে এখানে ? শ্রীদুর্গা কেবিন থেকে মহিলারা বেরিয়ে আসছেন। ইনস্টিটিউটের গেটে ইয়াসিন

দাঁড়িয়ে আছে। মীরাট কনস্পিরেসীর ভূতপূর্ব আসামীও। ঢুকে পড়লে মন্দ হয় না।"

* * *

একজন প্রসিদ্ধ কমিউনিষ্ট কংগ্রেস ও গান্ধীবাদকে খেলো করিবার জন্ম স্বপ্নে ভাবী ভারতের যে চিত্র দেখিয়াছেন, তাহাও উল্লেখযোগ্য।

"স্বপ্ন দেখি:

"স্বাধীন ভারত! ইংরেজ এ-দেশ ছেড়ে চলে গেছে বহুকাল—সেই কবে ১৯৪১ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর! এক শ' বছরের অতীত ইতিহাস! আজ ২০৪১ সালের সেপ্টেম্বরের ২৪শে তারিখ। দুর্গোৎসব। গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে।

'ভাবতে বড় ভালো লাগে। আরো ভালো লাগে এই কথাটা ভেবে যে, আমাদের সেই পূর্ণ স্বাধীনতা এসেছে তাঁত-চরকার নৌকোয় অহিংসার গুন টেনে, শাসনসংস্কারের অনুকূল হাওয়ায় সত্যাগ্রহের পাল খাটিয়ে। স্বাধীন ভারতের সুবিশাল বক্ষ থেকে যন্ত্রদানবের সব উৎপাত নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে। রেল, ষ্টীমার, ট্রাম, মোটর, দমকল, টেলিগ্রাফ, ফুটবল, বিদ্যুৎবাতি, সিনেমা, রেডিও—কলকারখানার যুগের অনর্থগুলোর একটাও নেই। চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, ব্ল্যাকবোর্ড—সেকেলে সব কিছুই বিদায় নিয়েছে এই অনাড়ম্বর সহজ শোভন সুন্দর জীবন থেকে। ঘড়িও নেই। তা-ও যে যন্ত্র!

"যান্ত্রিক ও প্রাক্‌-যান্ত্রিক যুগের সামাজিক অন্যায়-অবিচার সব জারিত শোধিত করে নেওয়া হয়েছে। হয়েছে অনেক সংস্কার—অনেক উন্নতি। সারা ভারতে শুধু চারটে জাত—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। বর্ণাশ্রমের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। শাশ্বত অতীতের পুরনো মদ নতুন সমাজের ছিপি-আঁটা বোতলের মধ্যে বহির্জগতের আলো-বাতাসের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে সঞ্চিত শক্তি বজায় রেখে চলেছে পরম নিশ্চিন্তে আর নির্বিবাদে।

"সমগ্র দেশে অহিন্দু আর চোখে পড়ে না। মুসলমান বলে কেউ নেই—তারা সবাই হিন্দুধর্মের পবিত্র ক্রোড়ে স্থান পেয়ে ধন্য হয়ে বেঁচে গেছে, নয় তো মনের দুঃখে হারাধনের ছেলেদের মতো ভারতের বাইরে সসম্মানে সরে পড়ে' তারা এখন কোথায়, কোন্‌ দেশে, কী করছে, কী খাচ্ছে, কী ভাবছে, কেমন আছে—কে রাখে তার খবর!

"সহর বন্দর দু'চারটে না আছে এমন নয়—মহাসমুদ্রের বুকে ছোটো ছোটো দ্বীপের মতোই তারা থেকেও যেন নেই। বন্দর আর পল্লীগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয় যৎসামান্য—যার যার স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে আমদানী-রপ্তানীর প্রয়োজন পড়ে যৎকিঞ্চিৎ। সেই রাম রাজত্বের কর্ণধার মাঝেমাঝে অনুশাসনের অহিংস বাণ নিক্ষেপ

করেন। সেই ধর্মাশ্রিত রাজনীতির বাণী নিয়ে ঘোড়া ছোটে দূরদূরান্তরে। আছে পাইক, আছে পিয়াদা, আছে লাঠিধারী বরকন্দাজ আর তীরন্দাজ—রাজধানীতে রাজস্ব আসতে কোনো অসুবিধা নেই।

"ঘরেঘরে চরকা ঘোরে। চাষী খেতে হাল চালায়। রাখাল ছেলে মাঠেমাঠে বাঁশী বাজায়। তাঁতি তাঁত বোনে। কুমোর হাঁড়িকুড়ি গড়ে। জেলে জাল ফেলে মাছ ধরে। গোয়ালা মাখন টানে আর গন্ধ ছড়ায় চতুর্দ্দিকে। কলু, কামার, ছুতোর, কাঁসারী—যার যার বৃত্তি নিয়ে সে অনায়াসে জীবন-যাপন করে বছরের পর বছর। জলেস্থলে, আকাশে-বাতাসে, রক্তেরক্তে, শিরায়-উপশিরায় প্রবাহিত হয়ে চলে অক্রান্ত অশরীরী বাণী "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ।" ব্রাহ্মণ রাতদিন শাস্ত্র ছাড়া আর কিছুই জানে না। বৈশ্য তার গুরু দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করছে। এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে শূদ্রের দল আনত শিরে আপনআপন কর্ত্তব্য কাজ নির্ব্বাক নিষ্ঠায় সম্পাদন করে যাচ্ছে। ক্ষত্রিয়কুলের উপর দেশরক্ষার কঠিন ভার—তীর, ধনুক, বর্শা, খাঁড়া, লাঠিসোঁটা—কত রকমের কত না আয়ুধ!

"স্বাধীন ভারতে বই নেই—আছে তালপাতার পুঁথি; স্লেট নেই—আছে কলাপাতা; জুতো নেই—খড়মই তো আছে; জামা নেই—চাদর রয়েছে যে। মেয়েদের হাতে আছে অক্ষয় নোয়া, সিঁথীমূলে রয়েছে এয়োতির গর্ব্ব, তাদের "আঙিনায় বেড়া। মেয়েরা সীমাবর্গের ইন্দ্রাণী।" বার মাসে তের পার্ব্বণ। মোটা ভাত আর মোটা কাপড়। কুড়ে ঘরে গভীর দর্শন। ছেঁড়া মাদুরে জ্যোতিষশাস্ত্র। Plain living and high thinking!"

এই বক্তব্যকে কিছুতেই "বিচারিত এবং বীরোচিত ন্যায়পরতা" বলিতে পারি না। শ্রীযুক্ত অমরকৃষ্ণ ঘোষের প্রবন্ধ এই সকল নানা কারণেই আমাদের মনে সংশয় জাগাইয়াছে।

• • •

তথাকথিত গণনাট্যের দলের ক্রিয়াকলাপ দেখিয়াও কম সংশয় বোধ করিতেছি না। শহরের মোটরবিলাসী বাবু-বিবি-সম্প্রদায়ের কাছে বাংলা দেশের দুর্ভিক্ষপীড়িত দুর্গতদের ভ্যাংচাইয়া এবং ফক্কড় অভিজাত সম্প্রদায়ের নকল অঙ্গভঙ্গীকে কোক-ডান্সের মর্য্যাদা দিয়া স্থায়ী থিয়েটার গঠন করিয়া অর্থোপার্জন করা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে জনগণকে মোটেই সম্মান করা হয় না। ব্যবসায়সম্মত কোক-ডান্স ইহাকে বলা চলে, কিন্তু কমিউনিজম-সম্মত গণনৃত্য ইহা নয়। পল্লীতে পল্লীতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আনন্দ ও উৎসবের প্রকাশ যে নাচ, তাহাই গণনৃত্য—ষ্টেজে তাহার নকলকে অর্থব্যয় করিয়া বিচিত্র সাজে সজ্জিত হইয়া চুরুট ফুঁকিতে ফুঁকিতে যাঁহারা তারিফ করেন, তাঁহারা জনগণের কেহই

নহেন। যে বৈদেশিক সংস্কৃতির কবলে পড়িয়া আমরা মরিতে বসিয়াছি ইহা তাহারই রকমফের। এ ক্ষেত্রেও মনে হয় আমরা কমিউনিজমের নামে ভুল পথে যাইতেছি।

—

প্রত্যক্ষভাবে যে বাংলা সরকারের প্রজা আমরা এবং বহিঃশত্রুকে রুখিবার জন্য আমরা প্রাণপণে যাঁহাদের সহযোগিতা করিতেছি, তাঁহাদের সুশাসনে আমরা কিরূপ নিশ্চিন্ত আরামে আছি, কেন্দ্রীয় পরিষদে ভারত সরকারের স্বাস্থ্য-সেক্রেটারি মিঃ জে. ডি. টাইসনের উক্তিতে তাহা প্রতীয়মান হইবে। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি হইতে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত একুশ মাসে বাংলা দেশে দুর্ভিক্ষ মহামারী ইত্যাদিতে মোট একত্রিশ লক্ষ তেপ্পান্ন হাজার তেত্রিশ জন লোক মারা গিয়াছে। ওই কালে পাঞ্জাবে সাড়ে বারো, ইউ. পি.তে নয়, বোম্বাইয়ে সাড়ে আট এবং মাদ্রাজে মাত্র দশ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। অথচ আমাদের সদাশয় বাংলা গবর্মেণ্ট তাঁহাদের বাজেটে ও হিসাবনিকাশে দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি বাবদ সাড়ে একষট্টি কোটি টাকা খরচ দেখাইয়া তেইশ কোটি টাকার ঘাটতির হিসাব পেশ করিয়াছেন। এই বিপুল অর্থের কতখানি অন্নাভাব ও মহামারীর সহিত লড়াইয়ে ব্যয় হইয়াছে, ফলেই তাহার পরিচয় মিলিতেছে। আজ প্রায় অর্ধ কোটি লোককে শ্মশানে ছাই অথবা কবরে মাটি করিবার পর দেওয়ানী খাস ও দেওয়ানী আমে কানামাছি খেলার পালা শুরু হইয়াছে। এই খেলার ইতিহাস বিভারলি নিকলস কর্তৃক লিখাইয়া ইংলণ্ডে প্রচারিত হইলে, চার্চিল সাহেবের মুখের চুরুট উপাদেয়তর হইবে সন্দেহ নাই।

—

কলিকাতায় সেদিন যে নিখিল-ভারত-সংবাদপত্র-সম্পাদক-সম্মেলন হইয়া গেল তাহাতে জীবিত সম্পাদকদের উপস্থিতির বাহুল্য দেখিয়া যেমন চমৎকৃত হইয়াছি, মৃতদের প্রতি ইঁহাদের সম্মান প্রদর্শনে চমকিত হইয়াছি ততোধিক। স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় বিখ্যাত 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকার মালিক ছিলেন, এই তথ্য জানা থাকিলে সম্ভবত ইঁহারা তাহাকে মৃতদের শোভাযাত্রায় স্থান দিতেন!

—

একটি সরকারী বিজ্ঞাপন—

"বণ্টনা নীতি অনুযায়ী প্রাপ্ত নিম্নলিখিত বাইসাইকেলগুলি এক লটে বিক্রয়ার্থ শীলমোহরযুক্ত টেণ্ডারসমূহ আহ্বান করা যাইতেছে। ১। বণ্টনা নীতি অনুযায়ী প্রাপ্ত ১০২২ খানি ভাঙাচোরা বাইসাইকেল; ২। বণ্টনা নীতি অনুযায়ী প্রাপ্ত ৪ খানি ভাঙাচোরা সাইকেল রিক্সা।

প্রকৃষ্টরূপে বণ্টনানীতি-অনুযায়ী প্রাপ্ত জমি ও নৌকার বিজ্ঞাপন সম্ভবত পরে দেওয়া হইবে।

৫ই ফেব্রুয়ারি সোমবার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে—"ভারতে ভারতীয়ের অধিকার ইংরেজ অপেক্ষা বেশি নয়, ব্রিটিশ আর্মি জার্নালের ডিসেম্বর সংখ্যায় লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল এইচ. ই. ক্রোকার-এর 'ভারত বিষয়ে বক্তৃতা' প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বলেন, 'হিন্দুগণ জগতে সর্বাপেক্ষা আনডিমোক্রাটিক জাতি এবং সোজাসুজি মুসলমান-বিরোধী। ভারতীয়গণ নিজেরাই বিদেশীয়দিগের সন্তান; বহু শতাব্দী পূর্বে ইহারা ভারত আক্রমণ করিয়াছিল। সুতরাং এখানে বসবাসের অধিকার তাহাদের ইংরেজ অপেক্ষা বেশি নয়।"

ক্রোকার সাহেব যে মামলা উত্থাপিত করিয়াছেন তাহার যথাযথ জবাব দিতে হইলে বৃদ্ধ হিমালয় এবং জননী গঙ্গাকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় তুলিতে হয়। তাঁহাদের সাক্ষ্যে আর কাহারও না হউক, আমাদের অর্থাৎ বাঙালীদের মামলা ফাঁসিয়া যাইবে। আমরা প্রমাণ করিতে পারিব যে, আমরা পশ্চিম হইতে আর্য শ্রমিকরূপে এদেশে আসি নাই, দ্রবিড় বংশোদ্ভূত এদেশেরই লোক। টমাস মার্কের অ্যাটলাস অব ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি দেখিলে আরও প্রমাণিত হইবে যে, বৈদিক যুগে সারা বাংলা দেশ সাগরগর্ভে ছিল। সুতরাং পশ্চিম-ভারতবর্ষের এই বিপদে আমরা সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

ন্যায়পথে যখন কোনও আন্দোলন চালাইয়া ফল পাওয়া যায় না, পঞ্চম বাহিনীর কাজ তখনই আরম্ভ হয়। বাংলা ভাষার পাকিস্তানী-বিভেদ আন্দোলনে বিফলমনোরথ হইয়া আন্দোলনকারীরা দেখিতেছি পঞ্চম বাহিনী রূপে ধ্বংসাত্মক কাজে (sabotage) আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ভাষারূপ প্রাসাদের ভিত্তিতলে ডিনামাইট দেওয়া হইতেছে। আমরা সাবধান করিতেছি মাত্র। সাপ্তাহিক সওগাতের সহিত সংযুক্ত 'দেশের কথা' (২৮ জানুয়ারি) হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

"জিজ্ঞাসার মীমাংসা হয়েছে, মনে হয়। রাজা নীরব সৌরভে আপন-মনে স্তিমিত-বিধুর হয়ে ওঠে। এও একটা অনুভূতি, এও একটা মনের আত্যন্তিক জিজ্ঞাসার চমৎকার খাঁজ।—এরও প্রচুর প্রয়োজন ছিলো। দিগন্তে অজস্র আকাশ—নীলে-সাদায় কতো সন্দেশ। খামোখা চিন্তার মাঝখানেই সে সরবে দুর্দান্ত হয়ে উঠলো। এমন সময়—ঠিক এমন করে নীরবে—অকুণ্ঠ বৈরাগ্যে ঠিক এমন অশেষ নির্লজ্জের মতো কেন সে এমন-সব স্বপ্নে উপাখ্যানে নিজেকে ঠিক এতোখানি ব্যতিব্যস্ত করেছে।—কেন করেছে? —রাজা নিজেকে শান্ত করতে করতে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো। নিজেকে যেন সে ফিরে পেলো। এই কি সে চেয়েছিলো, এই শয্যা আর এমন স্বপ্ন! বিছানার মতো শুভ্র-কোনো অকলংকী বিবসনা জ্যোৎস্নার মতো উজ্জ্বল আলো কি সে তার অন্তরে অন্তরে কামনা করে এসেছে। এ বিশ্রী মুহূর্ত, এর হাত থেকে উদ্ধার পেতে হবে।

কতো নিস্তব্ধ যন্ত্রণা যে মনে মনে পিষ্ট করছে সে নিরন্তর—কতো বিশুষ্ক নৈরাশ্যের তাপ-দগ্ধ ঊর্মিজাল যে সে ভেঙে ভেঙে ছুঁয়ড়ে দিচ্ছে প্রতি মুহূর্তে···সে কথার সুদীর্ঘ তরংগ-স্রোত তাকে আরো বেশি নিষ্ঠুর—বেশি নৈরাশ্যিকসিদ্ধ করে তুলছিলো। বিছানায় উবুড় হয়ে থেকেই বিছনার-বালিসের সোহাগে নিজেকে ছড়িয়ে রেখে খোলা আকাশ-পথে কোলকাতার ছোটো আকাশে সে আরো স্বপ্ন—আরো বিপুল উন্মাদনার ঐশ্পাতিক ইংগিতের আশায় নিজেকে স্তম্ভিত-নীরব করে আনলো।"

শ্রীযুক্তা জয়া সেন অনুযোগ করিয়াছেন শ্রীজ্যোতির্ময় রায় তাঁহার নূতন উপন্যাসে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিচয় দিতে গিয়া এক স্থলে লামার্কের থিওরিকে ডারউইনের স্কন্ধে চাপাইয়াছেন। যিনি উদরের পথেই সমস্ত মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজকে অন্তোমুখ করিয়া তুলিয়াছেন, তিনি যে বিজ্ঞানকে ভুলক্রমেও স্মরণ করিয়াছেন তজ্জন্যই বিজ্ঞান কৃতজ্ঞ।

—

ললিতকলাবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্র 'ললিতা'য় শ্রীশম্ভুনাথ শীল নামধেয় কোনও অকালপক্ক সমালোচক শ্রীযুক্ত অতুল বসুর চিত্র-প্রদর্শনী লইয়া যে অশোভন বাচাপল্য (বাচালতা+চাপল্য) প্রকাশ করিয়াছেন তাহার এই উল্লেখ অশোভন হইত, যদি না এই তথাকথিত সমালোচনার পশ্চাতে 'ললিতা'র কর্তৃপক্ষের আহ্বান থাকিত। কর্তৃপক্ষের মধ্যে শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা, শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্ত সতীশ সিংহের নাম দেখিতেছি। এই কদর্য ব্যক্তিগত কালিমাক্ষেপণ ইহাদের কাহার নির্দেশে হইয়াছে জানিতে ইচ্ছা হয়। শিল্পীমনের উজ্জ্বল দিকটা রঙ-তুলির সাহায্যে প্রকাশ করিয়া অন্ধকার দিকটা অর্থাৎ গ্লানি কালি-কলমের সাহায্যে প্রকাশ করাটা শিল্পীর পক্ষে পরধর্ম, সুতরাং ভয়াবহ। আমরাও ভয় পাইয়াছি।

—

মোছলেম তমদ্দুনের একমাত্র প্রধারক 'দৈনিক আজাদে'র ২৭শে মাঘের সংখ্যায় দেখিলাম, সম্পাদকীয় স্তম্ভে "ব্যালেট, লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত" বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছে। আমরা এই শুভদিনের প্রতীক্ষায় ছিলাম। আমাদের কপাল কি তবে ফিরিল?

—

ওই সংখ্যা 'আজাদে'ই সম্পাদকীয় নিবন্ধ "কংগ্রেস সাহিত্যসম্মেলনে" বহরমপুর অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রেজাউল করিম সাহেব সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, "মিঃ রেজাউল করিম যে করিৎকর্মা কংগ্রেস-সাহিত্যসেবী, তাতে আর সন্দেহ কি? বাজার পত্রিকা সমূহে তাঁর যে সব মূল্যবান কালির আঁচড় স্থান পায়—এমন কি, ছায়াপ্রসাদের কৃপায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকগুলিতেও......" ইত্যাদি। কিন্তু আমরা জানি,

রেজাউল করিম সাহেব যত করিৎকর্মাই হউন, তাঁহার সব নিষ্ফল কর্ম। তিনি আগ্রা মুসলিম রক্ষা ফণ্ড, বঙ্গ মনীষা সংরক্ষণী ফণ্ড, ফজলুল হক সহানুভূতি ফণ্ড সম্পর্কে কর্মতৎপরতা দেখাইতে পারেন নাই। 'আজাদ' একটু অতি-প্রশংসা করিয়াছেন।

—

বিমান-দুর্ঘটনায় পার্লামেণ্টের সদস্য রবার্ট বার্নেস-এর মৃত্যুতে ভারতবর্ষ একজন সহৃদয় হিতকারীকে হারাইয়াছে। 'নিউজ ক্রনিকল' পত্রিকার স্পেশাল করেস্‌পণ্ডেণ্ট হিসাবে তিনি ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবী পরিভ্রমণে বাহির হন। ১৯৩১ সালের জানুয়ারি হইতে মে মাস পর্যন্ত তিনি ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়া তৎকালীন আইন-অমান্য আন্দোলনের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করেন এবং তাহার ফলে তাঁহার সুবিখ্যাত 'Naked Fakir' পুস্তক (১৯৩১) প্রকাশিত হয়। ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত তাঁহার 'Special Correspondent' পুস্তকখানিও বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।

—

চন্দননগরের অধ্যাপক সুপণ্ডিত চারুচন্দ্র রায় সম্প্রতি পরিণত বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তিনি অনেক গবেষণা করিয়াছিলেন। তিনি চিরজীবন পরিশ্রম করিয়া বাংলা ভাষার যাবতীয় মুদ্রিত পুস্তকের একটি সুবৃহৎ তালিকা প্রস্তুত করিতেছিলেন। এই তালিকায় মায় বিষয়বস্তু যাবতীয় সংবাদ দেওয়ার বাসনা তাঁহার ছিল। তাঁহার এই আরব্ধ কাজ হয়তো সম্পূর্ণ হয় নাই, তথাপি আমরা আশা করি চন্দননগরের নাগরিকেরা এই পুস্তক অচিরাৎ সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া এই নীরব সাধকের প্রতি শেষ কর্তব্য সম্পাদন করিবেন।

—

বহরমপুরের 'নিরীক্ষা' পত্রিকার নন্দলাল সংখ্যা দেখিয়া আমরা উক্ত পত্রিকার পরিচালকবর্গের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়াছি। বাংলা দেশের একজন শিল্পীকে তাঁহারা যে মর্যাদা দিয়াছেন তাহাতে সমস্ত বাঙালী জাতিই কৃতজ্ঞ হইবে। শিল্প সম্বন্ধে রসজ্ঞ ব্যক্তিরা এই সংখ্যা এক এক খণ্ড নিশ্চয়ই সংগ্রহ করিবেন।

—

বৈশাখ সংখ্যা হইতে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস 'কালান্তর' প্রকাশিত হইবে।

—

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শনিবারের চিঠি
১৭শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৫১

পাঠকের প্রতি

সাম্প্রতি আমি সম্পূর্ণ এলোমেলোভাবে আমার মতে ভিক্টোরীয় যুগের অপেক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ লেখকদের রচনা পড়িতেছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে উইল্কি কলিন্স, হ্যারিসন এন্স্ওয়ার্থ এবং ওইজাতীয় লেখকদের লেখা উপন্যাসের একটি নাতিবৃহৎ লাইব্রেরিও গড়িয়া তুলিয়াছিলাম। এই শ্রেণীর লেখকদের কোনও লেখাই আমি দীর্ঘকাল পড়ি নাই, সুতরাং খেয়াল হইল, বাছাই করিয়া ইঁহাদের কিছু কিছু বই পড়িব এবং দেখিব সমসাময়িকদের মধ্যে ইঁহারা যে বিপুল যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার মূলে সত্যই ইঁহাদের কোনও কৃতিত্ব আছে কি না।

এই সকল পুরাতন উপন্যাস পড়িয়া আমার মনে কি প্রতিক্রিয়া হইল তাহা বিবৃত করিবার, এবং তাহারা যে সাহিত্যিক আদর্শকে সমর্থন করে বলিয়া আমার বোধ হইল তাহা টানিয়া বাহির করিবার পূর্বে আমি পাঠককে একটি সামান্য বিষয় স্মরণ রাখিবার উপদেশ দিব। তাহা এই: বই-পড়া ব্যাপারটাকে আমি কেবলমাত্র গৌণ (passive) ক্রিয়া হিসাবে গণ্য করি না। আমার বিবেচনায় লেখক যেমন কিছু সম্পাদন করিয়াছেন, পাঠকেরও তেমনই কিছু সম্পন্ন করিবার আছে। একের কাজ অন্যের কাজের তুলনায় বড় বা ছোট নয়। একটি উপন্যাসকে জীবন্ত করিয়া তুলিতে হইলে উভয়ের চেষ্টাই সমান মূল্যবান।

আধুনিক উপন্যাস (একান্ত বাজারে "commercial" উপন্যাস, যে উপন্যাসগুলিকে আপৎকালে সাধারণ লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষেরা সর্বদা বিপত্তারণ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন) পাঠ করিবার সময় উপরে লিখিত পাঠক-লেখকের পারস্পরিক কর্ত্তব্য কদাচিৎ পালিত হয়। একটি তৃতীয় শ্রেণীর ভালবাসার গল্পের পাঠকের পদমর্যাদা সাধারণ সিনেমাগৃহের সাধারণ টিকিটধারী দর্শকের ঠিক সমান (অবশ্য যে সব ছবিঘরে উচ্চশ্রেণীর ছবি প্রদর্শিত হয় সেগুলির কথা বলিতেছি না—হলিউড অথবা এল্স্ট্রির মামুলী চটকদার আজগুবি ছবির কারবারী যাহারা তাহারাই আমার লক্ষ্য)। উভয় ক্ষেত্রেই পাঠকের অথবা দর্শকের কাজ সম্পূর্ণ গৌণ। সে সম্মুখে সাজাইয়া-ধরা গল্পটিতে চোখ বুলাইয়া যায় ও নিজ হইতে একান্ত পৃথক কোনও বস্তু হিসাবে তাহা দেখে এবং গল্প বলিবার কৌশলের তারতম্য অনুসারে তাহা উপভোগ করে অথবা করে না।

'গন উইথ দি উইণ্ড', 'অল দিস অ্যাণ্ড হেভেন টু', সার্ হিউ ওয়াল্পোলের "হেরীজ"

গ্রন্থমালা এবং আরও অনেক বইয়ের নাম করা যাইতে পারে, যেগুলি, ওই জাতীয় পুতুল-নাচের ইতিকথার পাতার পর পাতা গলাধঃকরণ করিবার অসামান্ত ইচ্ছাশক্তি ছাড়া পাঠকের কাছে আর কিছুই দাবি করে না। আমার এই উক্তি অবজ্ঞাপ্রসূত নয়। সেগুলির বিশেষ প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করি না। তাহারা বেশ ভালভাবেই সে প্রয়োজন সাধন করিয়া থাকে। কিন্তু জীবনের দিক দিয়া তাহারা সাহিত্যকে বিন্দুমাত্র পরিপুষ্ট করে না।

আমাদের যুগে সত্যকার শিল্পীর সংখ্যা খুবই কম। এক সময়ে আমি নিজেই মনে করিতাম যে, টি. এফ. পাওয়িস যাহা কিছু লিখিয়া থাকেন, তাহাই শিল্প হইয়া উঠে। এখন আর আমি তাহা মনে করি না, তবে এখনও বিশ্বাস করি, তিনি খাঁটি শিল্পী। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ সম্বন্ধেও এইরূপ বলা চলিত, জেমস্ জয়েস সম্বন্ধেও। আর. ডেভিস, এইচ. ই. বেট্‌স এবং এল. এ. জি. ষ্ট্রং-(ইঁহার উৎকৃষ্ট লেখাগুলি সম্বন্ধেই বলিতেছি)-এর সম্বন্ধেও আমি অনুরূপ ধারণাই পোষণ করিয়া থাকি। ইঁহারা সেই শ্রেণীর লেখক, যাঁহারা তাঁহাদের পাঠকদের কাছ হইতে খানিকটা সহযোগিতা দাবি করিয়া থাকেন। পাঠক যদি পাঠশেষে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলেন, "কি চমৎকার গল্প, কেমন কৌতুককর (অথবা দুঃখকর অথবা রোমাঞ্চকর)—পড়িতে পড়িতে আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম!" তাহা হইলেই যাঁহারা সন্তুষ্ট হন না। সত্যকার শিল্পী যিনি, সে শব্দের হউন, রঙের হউন অথবা সুরের হউন, অথবা যে কোনও মাধ্যম তিনি ব্যবহার করুন, তাঁহার কাজ তোমাকে [অর্থাৎ পাঠক, দর্শক বা শ্রোতাকে] আত্মবিস্মৃত করা নয় অর্থাৎ তোমাকে তোমার বাহিরে লইয়া যাওয়া নয়। তাঁহার সত্যকার কাজ তোমাকে আত্মস্থ করা অর্থাৎ আপনাকে আপনি ফিরাইয়া আনা।

ভিক্টোরীয় যুগের মাঝারি ঔপন্যাসিক, এমন কি ভিক্টোরীয় যুগের মানদণ্ডে যাঁহারা দ্বিতীয় স্তরের লেখক তাঁহারাও এমন একটি গুণের অধিকারী ছিলেন, যাহা এযুগের খুব অল্পসংখ্যক লেখকের মধ্যে দেখা যায়। তাঁহারা জানিতেন যে, তাঁহাদের রচনাকে একটা গোটা শিল্পসৃষ্টি হিসাবে আয়ত্ত করিবার জন্য তাঁহাদের পাঠকেরাও সত্যকার সাধনা করিবেন, কারণ তাঁহাদের আঙ্গিকের জ্ঞান বা ধারণা ছিল। 'দি উওম্যান ইন হোয়াইট' অথবা 'দি টাওয়ার অব লণ্ডন' অথবা কলিন্স কিংবা এন্‌স্‌ওয়ার্থের ইহা অপেক্ষাও অনেক কম খ্যাতনামা কোনও উপন্যাস, যথা—'নো নেম' অথবা 'দি ল্যাঙ্কাশায়ার উইচেস' পাঠ করুন—দেখিতে পাইবেন যে, ভিক্টোরীয় যুগে কোনও উপন্যাসই নিতান্ত এলোমেলো-ভাবে জোড়াতালি দিয়া রচিত হয় নাই, সেগুলি শক্ত নিরেট ভিত্তির উপর নির্মিত হইয়াছে। যেমন করিয়া অট্টালিকা নির্মিত হয়, ঠিক সেই পদ্ধতিতেই গ্রথিত হইয়াছে।

আমি আজকাল প্রায়শই বহু লোকের মুখে শুনিতে পাই, "না, উপন্যাস আমি পড়ি

না, শুধু ডিটেকটিভ-উপন্যাস ছাড়া। আজকাল শুধু ডিটেকটিভ-গল্পের লেখকরাই শুরু বলার মত করিয়া গল্প বলিতে জানে। অন্য উপন্যাস? কি যে শেষ পর্যন্ত সে-গুলিতে ঘটিবে কেহই বলিতে পারে না। যা-তা ঘটিয়া যাইতে পারে, গয়ংগচ্ছভাবে চলিতে চলিতে হঠাৎ অকারণে মাঝপথে থামিয়া যাওয়াও আশ্চর্য নয়।" আমি জানি একালের কয়েকজন ভাল শিল্পীর সম্বন্ধে এই ধরনের সমালোচনা অন্যায়, কিন্তু উপরোক্ত ধরনের মন্তব্য এতই সাধারণ যে, একেবারে ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াও চলে না। পুরাতন এন্‌স্‌ওয়ার্থ ও কলিন্সকে পুনর্বার পাঠ করিয়া এই কথাই আমার মনে হইয়াছে যে, আজিকার দিনের সাধারণ উপন্যাসের সত্যকার গলদ হইতেছে সেইখানে, যেখানে লেখক ভুলিয়া যাইতেছেন যে পাঠকেরও কিছু অবশ্যকর্তব্য আছে। শুধু এন্‌স্‌ওয়ার্থ ও কলিন্স নয়, আমি স্বচ্ছন্দে মিস মিটফোর্ড, হেনরী কিংসলী, ট্রোলোপ ও জি. পি. আর. জেম্‌সের নাম করিতে পারিতাম।

কোনও বই পড়া মানেই সমস্ত বইটির আখ্যান-পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে আনিবার চেষ্টা করা। টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীসে'র মত অতবড় বিরাট একটা ব্যাপারকেও আমরা চেষ্টা করিলে একটা গোটা সৃষ্টি হিসাবে অনুধাবন করিতে পারি, করিতেছি যে তাহার প্রমাণ—ওই পুরাতন বইখানিই আমাদের এই যুগে নূতন আয়ু অর্জন করিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীসে'র পক্ষে যাহা সত্য, আজিকার দিনের চরম-চালু (best seller) উপন্যাসের পক্ষে তাহা সত্য হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না। বরঞ্চ আমার ধারণা 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীসে'র মত বই আজ তাহার প্রথম প্রকাশের পঞ্চাশ বৎসর পরেও শুধু ওই এক কারণে (আগাগোড়া একটা ধারা বজায় আছে বলিয়া) পঠিত হইতেছে, অথচ আমাদের একালের মোটামুটি "বেষ্ট-সেলার"গুলি পঞ্চাশ দিন অথবা তাহার কম সময়ের মধ্যেই বিস্মৃতির গর্ভে চলিয়া যাইতেছে।

আসল কথা হইতেছে আঙ্গিকের ধারণা অর্থাৎ গঠনপদ্ধতি অথবা শিল্পরূপ। কথাটা হয়তো পুরাতন-ঘেঁষা ও মামুলি শুনাইতেছে। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই; কিন্তু আমি নাচার। তবে এ কথাও আমি স্বীকার করিব যে, এ যুগের অনেক পরীক্ষাধর্মী (experimental) ঔপন্যাসিকের এই আঙ্গিক-বোধ অতিশয় তীক্ষ্ণ। মিসেস ভার্জিনিয়া উল্‌ফের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি একটা পূর্বপরিকল্পিত প্যাটার্ন-অনুযায়ী রচিত, যে পাঠক সে বিষয়ে সজাগ নন, তাঁহার সম্যক রসোপলব্ধি হইবে না। আলডুস হাক্সলি যেখানে সার্থক, সেখানে তাঁহার আঙ্গিকও চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে। আর আমাদের যুগের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে যিনি একা, শুধু সাধারণ পাঠক নয়, অতি খুঁতখুঁতে সমালোচককেও সন্তুষ্ট করিয়াছেন, সেই সমারসেট মম সম্ভবত তাঁহার সমসাময়িকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম আঙ্গিক জ্ঞানের অধিকারী।

পাঠক প্রশ্ন করিতে পারেন, "তাহা হইলে আমাদের কর্তব্য কি?" সোজাসুজি জবাব দিতে হইলে আমি স্বীকার করিব, তাঁহাদের বিশেষ কিছু করিবার নাই। তবে, তাঁহারা ধীরে ধীরে তাঁহাদের পড়ার ধরনটা বদলাইতে পারেন অর্থাৎ নিজেদের পড়ার ব্যাপারেও একটা আঙ্গিকের ধারণার চর্চ্চা করিতে পারেন। এইরূপ করিতে করিতে তাঁহাদের সেই বোধ জাগ্রত হইবে, যাহার সাহায্যে তাঁহারা যে কোনও আঙ্গিক- বা রূপহীন নিরবয়ব (amorphous) উপন্যাস—যাহার দাবি শুধু অক্ষরগুলার উপর চোখ বুলাইয়া গেলেই মিটিয়া যায়, মহৎ শিল্পীর শিল্পনৈপুণ্য বাস্তব জীবন হইতে সংগৃহীত মালমসলার সাহায্যে কল্পনার ছাঁচে ফেলিয়া যাহা সৃজন করে, তাহার মত ঘনিষ্ঠ প্রত্যক্ষ যোগ দাবি করে না—সেই উপন্যাসকে তাঁহারা অশ্লীল জ্ঞান করিয়া ঘৃণা করিতে সক্ষম হইবেন। রুচিবিগর্হিত বইকে আমরা আইনের কবলে জব্দ করিয়া থাকি, কিন্তু খারাপ বই লাখের অঙ্কে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে দিতে আপত্তি করি না। পাঠকেরা যেদিন যথার্থ অধ্যয়নের দক্ষতা অর্জন করিবে এবং অত্যন্ত খেলো বাজে বইয়ের সঙ্গে সত্যকার শিল্পসৃষ্টির পার্থক্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে, তখনই প্রতিভাবান শিল্পীরা নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইবেন। সত্যকার শিল্পসৃষ্টি করা লেখকমাত্রেরই জীবনের লক্ষ্য হইলেও তাহা সম্ভব হয় কদাচিৎ, কিন্তু বাজে খেলো লেখা কোনও না কোনও সময়ে সকলকেই লিখিতে হয়, জীবিকার খাতিরেই লিখিতে হয়। পাঠকের পাঠবিষয়ক জ্ঞানই সেগুলির প্রকাশ ও প্রচার রোধ করিতে পারে। লেখা যেমন শিল্পকর্ম্ম, পড়াও তেমনই। পাঠকেরা যখন সত্যকার শিল্পী হইয়া উঠিবে, তখনই শব্দশিল্পীরা অনশন এবং অনাহারের মারাত্মক সান্নিধ্য এড়াইয়াই শ্রবণোন্মুখ জনতাকে আকর্ষণ করিতে পারিবেন।

—জন রাওল্যাণ্ড

কাব্য-প্রসঙ্গ

যে মানসিক উৎকর্ষের জন্য মানুষ পশু হইতে বিভিন্ন, সাহিত্য সেই মানসিক উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ। আমাদের আত্মদর্শন, আত্মবিচার, আত্মপ্রসাদ সমস্তই সাহিত্যের মাধ্যমে। সাহিত্যের সাহায্যেই বাস্তবের রূঢ় লোক হইতে প্রস্থান করিয়া আমরা স্বপ্নের গূঢ় লোকে আত্মহারা হই। সাহিত্যই আমাদের আনন্দ দেয়, সান্ত্বনা দেয়, আশা দেয়, উদ্বুদ্ধ করে। মানুষের সহিত মানুষের অন্তরের ইহাই নিগূঢ়তম সেতু, সত্যতম সম্বন্ধ এবং দৃঢ়তম বন্ধন।

সাহিত্যের গণ্ডি আজ যদিও অতিশয় ব্যাপক—ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র,

রাজনীতি, সমাজনীতি, বস্তুত মানব-মনীষা-প্রসূত সমস্ত কিছুই যদিও আজ সাহিত্যের অঙ্গীভূত, কিন্তু 'সাহিত্য' বলিতে সাধারণত আমরা সৃষ্টিধর্মী কাব্য-সাহিত্যই বুঝি। যে সাহিত্য আলোচনা করিবার জন্য আপনারা এই সভার আয়োজন করিয়াছেন, তাহা কাব্য-সাহিত্যই—ইতিহাস বিজ্ঞান বা রাজনীতি নহে।

সুতরাং কাব্য-সাহিত্য সম্বন্ধেই সামান্য কিছু আলোচনা করিব।

কাব্যই আমাদের প্রাণের আশ্রয়-ভূমি।

ইতিহাস যখন অতীতের নজির তুলিয়া বারম্বার প্রমাণ করে যে, আমরা পশু ছাড়া আর কিছু নই, চিরকাল নখদন্ত বিস্তার করিয়া যুদ্ধই করিতেছি, রাজনীতি যখন নানা কৌশলে নানা ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া জঘন্য স্বার্থপরতাকেই মহিমান্বিত করিয়া তুলিতে থাকে, অর্থনীতি সমাজনীতি—কোন নীতিই যখন আমাদিগকে পাশবিক স্বার্থনীতির উর্ধ্বে লইয়া যাইতে পারে না, বিজ্ঞান যখন স্পষ্ট ভাষায় বলে—তুমি তো পশুই, আত্মরক্ষাই তোমার শ্রেষ্ঠ ধর্ম—তখন struggle for existenceএর জ্ঞানগর্ভ বাণীকে অগ্রাহ্য করিয়া একমাত্র কবিই আমাদের বিভ্রান্ত মনকে সান্ত্বনা দিতে পারে—

"ভয় নাই, ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"

সুখের সন্ধানে যখন আমরা চতুর্দিক তোলপাড় করিয়া বেড়াই, জ্ঞান-বিজ্ঞান গুরু-বন্ধু অর্থ-সম্পদ কেহই যখন আমাদের সুখের সন্ধান দিতে পারে না, তখন কবির কাছেই আমরা কেবল সুখের সন্ধান পাই—

"সুখ অতি সহজ সরল, কাননের
প্রস্ফুট ফুলের মতো। শিশু-আননের
হাসির মতন, পরিব্যাপ্ত, বিকশিত,
উন্মুখ অধরে ধরি চুম্বন-অমৃত
চেয়ে আছে সকলের পানে, বাক্যহীন
শৈশব-বিশ্বাসে, চিররাত্রি, চিরদিন।
বিশ্ব-বীণা হতে উঠি গানের মতন
রেখেছে নিমগ্ন করি নিথর গগন।
... ...
এই স্তব্ধ নীলাম্বর স্থির শান্ত জল
...সুখ অতি সহজ, সরল।"

আমাদের সাবধানী মন যখন অতি-সতর্কের বিজ্ঞতায় সব দিক সামলাইতে গিয়া

শেষ পর্যন্ত কোন দিক সামলাইতে পারে না, কবির বাণীই তখন আমাদের উপদেশ দেয়—

"ফুরায় যা দে রে ফুরাতে
ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম ফিরে যাস নেকো কুড়াতে।
বুঝি নাই যাহা চাহি না বুঝিতে
জুটিল না যাহা চাই না খুঁজিতে
পূরিল না যাহা কে রবে বুঝিতে তারি গহ্বর পূরাতে
যখন যা পাস মিটায়ে নে আশ ফুরাইলে দিস ফুরাতে।'

চতুর্দিকে যখন হতাশা, চতুর্দিকে যখন অন্ধকার, তখন একমাত্র কবিই বলিতে পারেন—অন্ধকার সত্য নয়, অন্ধকারের পরপারে জ্যোতির্ময় পুরুষকে আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি—বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

আজকাল কিন্তু অনেকে কবির এই-জাতীয় বাণীতে সন্তুষ্ট নন। তাঁহারা কাব্যে রাজনৈতিক রিয়ালিস্‌ম সন্ধান করেন, তাহাতে অতি-আধুনিকতার প্রগতি দেখিতে চান।

রিয়ালিস্‌মের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই কি লোকে কাব্যের শরণাপন্ন হয় না?

একজন পাশ্চাত্য মনীষী কাব্যকে—Interpretation of life বলিয়াছেন। কথাটা সম্পূর্ণ হইত—Poet's interpretation of life বলিলে। ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সমাজতন্ত্রী, ধনিক, শ্রমিক প্রত্যেকেরই নিজস্ব এক একটা interpretation of life আছে, প্রত্যেকটি প্রত্যেকটি হইতে স্বতন্ত্র এবং প্রত্যেকটিই হয়তো বিদ্যায় বুদ্ধিতে যুক্তিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু কেবল কবির interpretationই কাব্য। তাহাই মনোহারী এবং আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হইলেও তাহাই চিরন্তন সত্যের আধার। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, আরব্য-উপন্যাস, ডিভাইন কমেডি, ফাউষ্ট, হিতোপদেশ, ঈশপের গল্প, রবিন্সন ক্রুসো, প্রভৃতি অমর কাব্যগুলিতে রিয়ালিস্‌ম আছে কি? শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক, কালিদাসের কাব্য কি রিয়ালিষ্টিক? এমন কি ডল্‌'স হাউসের রিয়ালিস্‌ম কি সত্যই রিয়ালিস্‌ম? যাহা বাস্তব, তাহাতে রং না লাগাইলে কি কাব্য হয়? যাহা স্থূল তাহার স্থূলতার আবরণ উন্মোচন না করিলে কি তাহার সূক্ষ্ম মর্ম বোঝা যায়? যাহা স্থূল, যাহা বাস্তব, যাহা ঘটিতেছে, তাহা তো চোখের সম্মুখেই অহরহ রহিয়াছে, তাহার পরিচয় লাভের জন্য কবির কাছে যাইবার প্রয়োজন কি? চোখ খুলিয়া রাখিলেই হইল। বিস্তৃততর বিবরণের জন্য খবরের কাগজ আছে—কবিকে খবরের কাগজের রিপোর্টারের পর্যায়ে নামাইয়া আনিবার

এ হাস্যকর প্রয়াস কেন বুঝি না। কবি এমন কোন প্রয়োজনীয় খবর দিতে পারেন না, যাহার বাজার-দর আছে। যে বস্তু তিনি অন্বেষণ করেন, তাহা অরূপ রতন—যে লোকে তিনি উত্তীর্ণ হইতে চান, তাহার ঠিকানা নিজেই তিনি জানেন না, অসহায়ভাবে কেবল আবৃত্তি করিতে থাকেন—"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে"। অন্তরের অন্তরতম লোকে তিনি যাহা অনুভব করেন, তাহা ব্যক্ত করিবার ভাষাই তিনি খুঁজিয়া পান না সব সময়ে—

"নবীন চিকণ অশথপাতায়
আলোর চমক কানন মাতায়
যে রূপ জাগায় চোখের আগায়
কিসের স্বপন সে
কি চাই কি চাই বচন না পাই
মনের মতন রে।"

এই অনুভূতিই তাঁহার কাছে রিয়েল এবং ইহারই প্রতিধ্বনি রসিকের চিত্তে সত্যকে মূর্ত করিয়া তোলে।

দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁহার ব্যক্তি-সত্তা বিচলিত হইলেও কবি-সত্তা সহসা বিচলিত হয় না। কারণ যিনি কবি, তিনি অসাধারণ। সাধারণ লোক যে রাজনৈতিক কারণে উত্তেজিত বা অবসন্ন হয়, সে রাজনৈতিক কারণ কবির কাব্যলোককে বিক্ষুব্ধ করিতে পারে না। রাজনৈতিক সমস্যা কবির সমস্যাই নয়, রাজনৈতিক খবর আর কাব্যলোকের খবর এক নয়। যুদ্ধের খবর লইয়া যখন সবাই উন্মত্ত, তখন কবির মনে হয়—

ফাটিতেছে বোমা, কাঁপিছে ধরণী কামান-রবে,
টুঁটির উপর চাপিয়া বসেছে দাঁতের পাটি—
নূতন খবর খুব কি বন্ধু? শকুনি শবে
চিরকাল ধ'রে জুড়িয়া রয়েছে ধরার মাটি।
চিরকাল ধ'রে মরেছে জন্তু, শকুনি তাদের খেয়েছে ছিঁড়ে,
চিরকাল ধ'রে অসহায় চাল চ্যাপটা হইয়া হয়েছে চিঁড়ে,
চিরকাল ধ'রে তবু মহাকাল মরণ-বীণায় নিখুঁত মীড়ে
জীবনের সুর বাজায় খাঁটি,
চিরকাল ধ'রে বুক দিয়ে ঘিরে নূতন জননী নূতন নীড়ে
নূতন জীবনে বাঁচাইয়া রাখে কি পরিপাটি!

চিরকালের চিরন্তন খবরই কাব্যলোকের খবর, সমসাময়িক রাজনৈতিক খবর নয়।

কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলেই ইহার প্রমাণ মিলিবে। বিখ্যাত কবিদের কাব্যে তাঁহাদের সমসাময়িক আন্দোলনের কতটুকু পরিচয় আমরা পাই? ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাস-হোমার-ভার্জিল-গয়টে-দান্তের কাব্যে আমরা চিরন্তন মানব-মনের প্রতিচ্ছবিই দেখি, মানবের আশা-আকাঙ্ক্ষা-আকূতির আলোকেই সেগুলি দেদীপ্যমান, কিন্তু সে যুগের রাজনৈতিক আন্দোলনের বিশেষ ছবি বিশেষ একটা দলের বা মতের স্বপক্ষে ওকালতির কোন চিহ্ন তো সে সবে নাই। শেক্‌স্‌পীয়রের কাব্যে আমরা এলিজাবেথান যুগের বিক্ষোভের কতটুকু প্রতিফলিত দেখি? মিলটন তাঁহার প্রথম জীবনে রাজনীতি লইয়া মাতিয়াছিলেন, রাজনৈতিক কারণে কারারুদ্ধও হইয়াছিলেন, রাজনীতি লইয়া কিছু কিছু রচনাও করিয়াছিলেন। কিন্তু সেইজন্যই কি আমরা মিলটনকে মনে রাখিয়াছি? মিলটনের সেই রাজনৈতিক জীবনে মিলটন নিজেই অনুভব করিয়াছেন যে, he was neglecting his great gift of Poetry. তাঁহার সেই রচনাগুলি আমরা এখনও মাঝে মাঝে পড়ি প্যারাডাইস লষ্টের কবির রচনা বলিয়া। প্যারাডাইস লষ্টে কমন্‌ওয়েল্‌থের কোন উল্লেখ নাই। শেলী কীটস বায়রন কেহই সমসাময়িক রাজনীতিকে অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করেন নাই। কেহ কেহ হয়তো দুই-চারিটা সনেট লিখিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি কাব্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন নয়। টলষ্টয়ের জীবদ্দশায় রুশ দেশ যখন জারের পীড়নে আর্তনাদ করিতেছিল, তখন তিনি অ্যানা ক্যারেনিনার প্রেমের কাহিনী লিখিয়াছিলেন। জারের অত্যাচার তাঁহার কোন কাব্যের বিষয় হয় নাই। যেসব কাব্যের জন্য টষ্টয়েভ্‌স্কি শেখব জগদ্বিখ্যাত, তাহা চিরন্তন মানব-মানবীর কাব্য—বিশেষ একটা রাজনৈতিক মতবাদের নয়। অথচ তাঁহাদের প্রত্যেকেরই জীবন রাজনৈতিক আবর্তে আবর্তিত হইয়াছিল।

বাংলা সাহিত্যেও ইহার প্রচুর উদাহরণ বর্তমান। সিপাহী-বিদ্রোহের ধূমে ও গর্জনে যখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক গগন আচ্ছন্ন মাইকেল মধুসূদন তখন মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া পুলিস আদালতে চাকুরি করিতেছেন। তাহার পরই—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—তিনি যে সাহিত্যকর্মে নিজেকে নিযুক্ত করিলেন, তাহা সিপাহী-বিদ্রোহ-বিষয়ক কাব্য নয়—রত্নাবলীর ইংরেজী অনুবাদ। সিপাহী-বিদ্রোহের মত অত বড় একটা রাজনৈতিক ঘটনা তাঁহার কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিল না। তিনি যখন মেঘনাদবধ কাব্য লিখিতেছিলেন, তখন সমস্ত ভারতবর্ষ দুর্ভিক্ষের কবলে। তাঁহার কাব্যে সে দুর্ভিক্ষের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাই না। ইহার পরই বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। তিনি যখন দুর্গেশনন্দিনীর রোমান্স রচনা করিতেছিলেন, তখন লর্ড এলগিন ওহাবী-সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানদের বিদ্রোহ-নিবারণে ব্যস্ত। সে বিদ্রোহ বা তাহার নিবারণের প্রচেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাকে তিলমাত্র বিচলিত করে নাই। তাহার কয়েক বৎসর পরে লর্ড

লিটনের আমলে যখন সমস্ত ভারতবর্ষ দুর্ভিক্ষে, ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টে, আফগান যুদ্ধে আলোড়িত, তখন বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম লিখিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহা সমসাময়িক ঘটনা লইয়া নয়। ওই কাব্যগুলিতে যে সুর ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, তাহা চিরন্তন। সর্বদেশের সর্বকালের সকল মানবকে তাহা উদ্বুদ্ধ করিবে। রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনেও বহু উত্তেজনাজনক রাজনৈতিক ঘটনা ঘটিয়াছে, কিন্তু সেসব লইয়া তিনিও কোন উল্লেখযোগ্য কাব্য রচনা করেন নাই। অগ্নিযুগের বিদ্যুৎবহ্নি বা মহাত্মাজীর দাণ্ডিমার্চ তাঁহার কাব্যের খোরাক যোগায় নাই। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড লইয়া তিনি একটা ঐতিহাসিক লিপি রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার জন্যই তিনি সাহিত্যজগতে বিখ্যাত নহেন। তাঁহার পূর্বে সুব্রহ্মণ্য আয়ার অনুরূপ পত্র লিখিয়া উপাধি ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু কাব্যজগতে সেজন্য তাঁহার স্থান হয় নাই। সমসাময়িক ঘটনা লইয়া রবীন্দ্রনাথ যে কয়টা গান, প্রবন্ধ, আলোচনা বা পত্র লিখিয়াছেন, তাহা কাব্যজগতে তাঁহারও শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নহে। গোরা এবং চার অধ্যায়ের বিষয়বস্তু অনেকটা স্বদেশী হইলেও শেষ পর্যন্ত তাহাতে যে সুর বাজিয়া উঠিয়াছে তাহা সনাতন বৃন্দাবনী সুর।

"কেন আন বসন্ত নিশীথে
আঁখি-ভরা আবেশ বিহ্বল
যদি বসন্তের শেষে শ্রান্ত মনে ম্লান হেসে
কাতরে খুঁজিতে হয় বিদায়ের ছল।"

এবং এই চিরন্তন সুর লাগিয়াছে বলিয়াই ইহারা অমর হইয়া আছে। নীলদর্পণ আজকাল আর কেহ পড়ে না, গোরা চার অধ্যায় কিন্তু চিরকাল সকলে পড়িবে। নীলদর্পণ কেহ না পড়িলেও কাব্যহিসাবে ইহা যে সার্থক সৃষ্টি, সে কথা আমি স্বীকার করিতেছি। সমসাময়িক রাজনৈতিক বা সামাজিক ঘটনা কবির মনে যে কখনও রেখা-পাত করে না, এমন কথা আমি বলিতেছি না। আঙ্কল টম'স কেবিন, মাদার, নীলদর্পণ, অরক্ষণীয়া, অমৃতলালের নাটকাবলী, গালিভার্'স ট্রাভেল্‌স, ভল্‌টেয়ারের রচনা, জার্নি'স এণ্ড, অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েষ্টার্ন ফ্রণ্ট, ভার্জিন সয়েল আপ্‌রুটেড, রেনবো প্রত্যেকটিই রসোত্তীর্ণ সার্থক কাব্য এবং রসোত্তীর্ণ কাব্য বলিয়াই অর্থাৎ ওইগুলিতে চিরন্তন মানব-মানবীর শাশ্বত মূর্তি রসের তুলিকায় পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে বলিয়াই সাহিত্য-গ্রন্থাগারে উহাদের স্থান আছে—রাজনৈতিক কারণে নহে। যাঁহারা সত্যকার কবি, তাঁহারা শাশ্বতের চারণ, সমসাময়িকের নহে। সমসাময়িক ঘটনা প্রায়ই তাঁহাদের কাব্যের বিষয় হয় না, যদি বা হয় তখন তাঁহারা

তাহার মধ্যেই শাশ্বতকে প্রত্যক্ষ করেন। সমসাময়িক জনতার পদোৎক্ষিপ্ত ধূলির ঊর্ধ্বে বিচরণ করিতে পারেন বলিয়াই কবিরা অসাধারণ ব্যক্তি।

কবির কাছে অতি-আধুনিকতার দাবি যাঁহারা করিতে চান, তাঁহারা একটা কথা বিস্মৃত হন যে, কবির চক্ষে 'অতি-আধুনিক' বলিয়া কোন কিছু নাই। মানুষের যে মন লইয়া কবির কারবার, মানুষের সে মন বদলায় নাই। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মহত্ত্ব প্রতিভা ক্ষমা তিতিক্ষা সেকালেও যেমন ছিল, একালেও তেমনই আছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে যে প্রগতি আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহা বস্তুর প্রগতি, মনের প্রগতি নহে। মহাভারত রামায়ণ কাব্যে মানবচরিত্রের যে বিচিত্র বিকাশ আমরা দেখি, তদপেক্ষা বিচিত্রতর বা নবতর কোন চরিত্র আধুনিকতম কোনও কাব্যে বা ব্যক্তিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। আমাদের মনীষাও যে পূর্বাপেক্ষা বেশি বাড়িয়াছে, ইহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। যে বৈজ্ঞানিকগণ আজ নানা অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার করিয়া শত্রুর প্রতিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর, তাঁহাদের প্রতিভা যে গ্রীক বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিসের প্রতিভা অপেক্ষা বেশি, এমন কথা মনে করিবার কোন হেতু দেখি না। আর্কিমিডিস যে মনীষাবলে রোমবাহিনীকে বিপর্যস্ত করিয়াছিলেন, তাহার কাহিনীও প্রাচীন বলিয়া কম বিস্ময়কর নহে। গরুর গাড়িও একদিন মানব-সমাজে বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। আজ গরুর গাড়ি পুরাতনের পর্যায়ে পড়িয়াছে, এরোপ্লেনও একদিন পড়িবে। যে মানুষ একদা গরুর গাড়ি চড়িয়া বেড়াইত, সেই মানুষই আজ এরোপ্লেনে চড়িয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু সে উন্নততর প্রাণীতে পরিণত হইয়াছে, এমন কথা ভাবিবার সঙ্গত কারণ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে মানব-সভ্যতার বহির্বেশের কিছু পরিবর্তন হইয়াছে, মানসিকতা বদলায় নাই। পূর্বে তাহারা গদা লইয়া রথে চড়িয়া যুদ্ধ করিত, এখন প্লেনে চড়িয়া বম ফেলিয়া যুদ্ধ করিতেছে—তফাত শুধু এইটুকু। এমন কি, যে কমিউনিজমকে মানব-সভ্যতার আধুনিকতম প্রকাশ বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন, ইতিহাসের সাক্ষ্য মানিলে তাহারও আধুনিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। ঐতিহাসিকদের মতে মুখোশটা শুধু বদলাইয়াছে, অন্তর্নিহিত রূপটা ঠিক আছে। যখনই কোন দেশের দুর্বল জনসাধারণ সবল দ্বারা নিপীড়িত হইতে থাকে, তখনই সেই দেশে কমিউনিজমের সূত্রপাত হয়। দুর্বলরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া অত্যাচারের প্রতিবাদ করে এবং অবশেষে সেই সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিবলে সবলকে বিধ্বস্ত করিয়া নিজেরাই শাসনভার গ্রহণ করে। কিছুকাল তাহারা ন্যায় ও সাম্যের মর্যাদা রক্ষা করিতেও যত্নবান হয়, কিন্তু তাহা কিছুকাল মাত্র। অসাম্য আবার আত্মপ্রকাশ করে—নিপীড়িতদের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধিমান, তাঁহারাই প্রভুত্ব করিতে থাকেন। এ বিষয়ে বিখ্যাত মার্কিন লেখক উইল ডুরান্টের মত উদ্ধৃত করিতেছি—

Communism tends to appear chiefly at the beginning of Civilizations.... it flourishes most readily in times of dearth when the common danger of starvation fuses the individual into the group. When abundance comes and danger subsides social cohesion is lessened and individualism increases; communism ends where luxury begins....

বৈজ্ঞানিক, কমিউনিষ্ট কাহারও সহিত কবির বিরোধ নাই। মানব-মনের মানব-চরিত্রের মানব-সভ্যতার প্রকাশ হিসাবে তাহা কবি-মানসকে আবিষ্ট করে। অবৈজ্ঞানিক ক্যাপিটালিষ্টও করে। কোন একটা যুগকে দলকে বা 'ইজ্‌ম'কে অতি-আধুনিক বা অতি-প্রগতিশীল নাম দিয়া তাহা লইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের হয় না। কোনকালেই হয় নাই। কারণ তাঁহারা জানেন—

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম্।

যে আমরা এখন আছি, সেই আমরা পূর্বেও ছিলাম এবং ভবিষ্যতেও থাকিব। আধুনিক বা পুরাতন বলিয়া কিছু নাই। কবির চক্ষে সমস্তই চির-পুরাতন এবং চির-নূতন। একমাত্র কবিই সেই সত্যকে নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিয়াছেন, যাহা—ভিদ্যন্তে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব সংশয়াঃ। সুতরাং কোন সমসাময়িক ঘটনার উচ্ছ্বাস খবরের কাগজের সম্পাদক অথবা প্রোপাগ্যাণ্ডা-লেখককে যতটা বিচলিত করে, কবিকে ততটা করে না। ইহার জন্য তাহাদের যদি একঘরে করিতে চান করুন, কিন্তু ইহাই তাহাদের স্বভাব।

সমসাময়িক ঘটনা লইয়া না মাতিলেও ভগবানের সৃষ্টি আলো-বাতাস জল-মাটি যেমন জীবনবিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক, কবির সৃষ্টি কাব্যও তেমনই সভ্য-মানবের চিত্তবিকাশের পক্ষে অপরিহার্য। কবির কাব্যে চিরন্তন ক্ষুধার সুধা সঞ্চিত থাকে।

তাই মাইকেল মধুসূদন সিপাহীবিদ্রোহ-দুর্ভিক্ষ লইয়া কাব্য না লিখিলেও বাঙালীর মনকে বৃহতের দিকে মহতের দিকে সুন্দরের দিকে উন্মুখ করিয়া গিয়াছেন, ইল্‌বার্ট বিল বা ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টকে কাব্যে স্থান না দিয়াও বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীর মনকে দেশাত্মবোধে উদ্‌বুদ্ধ করিতে পারিয়াছেন, বোমা অথবা খদ্দর বিষয়ক কাব্য না লিখিয়াও রবীন্দ্রনাথ জগতের সুধী-সমাজকে ভারতবর্ষের মহত্ত্ব সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন।

আমাদের আজ দুর্দিন আসিয়াছে সন্দেহ নাই, আমাদের ইতিহাসে আমাদের জাতীয় জীবনে এরূপ দুর্দিন বহুবার আসিয়াছিল এবং আরও বহুবার হয়তো আসিবে। দুর্দিন আসিয়াছে বলিয়াই কি কবিকে তাহার স্বধর্ম ত্যাগ করিতে হইবে? কাব্য-সিংহাসন হইতে বঁধুকে অপসারিত করিয়া কোন বিশেষ ইজমকে সে স্থানে প্রতিষ্ঠিত করার কোন প্রয়োজন কোনকালেই হয় না।

"টুটলো কত বিজয় তোরণ, লুটলো প্রাসাদচূড়ো
কত রাজার কত গারদ ধুলোয় হ'ল গুঁড়ো।
... ...
ভাঙবে শিকল টুকরো হয়ে, ছিঁড়বে রাঙা পাগ
চূর্ণ-করা দর্পে মরণ খেলবে হোলির ফাগ।
পাগলা আইন লোক হাসাবে কালের প্রহসনে
মধুর আমার বঁধু রবেন কাব্য-সিংহাসনে।"

আজ নাদিরশাহ তৈমুরলঙ্গ কোথায়? বাগানে কিন্তু জুঁই ফুলের হাসি আজও তেমনই শুভ্র, তেমনই অম্লান। দুর্দিন আসিয়াছে বলিয়া জুঁই ফুল উচ্ছেদ করিয়া পটলের চাষ করিলে আমাদের দুঃখ ঘুচিবে এবং অত্যাচারী জব্দ হইয়া যাইবে, এ কথা আর যে-ই মনে করুক, কবি মনে করিবে না।

এ দুর্দিনে কবির কি তবে কোন কর্তব্য নাই?

আছে বইকি। একমাত্র কর্তব্য তো কবিরই। নিগূঢ়ভাবে সুন্দরভাবে সে তাহা সম্পন্ন করিবে। তাহার কর্তব্য সেই সনাতন প্রাণশক্তিকে আহ্বান করা, যাহা যুগে যুগে শিকল ভাঙিয়াছে, যাহা সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করিবার প্রয়াসে অসাধ্যসাধন করিয়াছে, দুর্জয় সাহসে ভর করিয়া দুর্গম পথে যাত্রা করিয়াছে, বৃহতের আকর্ষণে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে, মহতের পদে আত্মনিবেদন করিয়া আদর্শের জন্য আত্মবলি দিয়াছে।

কাম ক্রোধ লোভ মোহ চিরকাল আছে এবং চিরকাল থাকিবে, কিন্তু সত্য শিব সুন্দরও চিরকাল আছে এবং চিরকাল থাকিবে। সত্য-সন্ধা, শিব-পন্থী সুন্দরের ধ্বজাবাহক সেই যৌবনকে আবাহন করিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করি।*

"বনফুল"

মাধুকরী

যদি একটি অশ্রুকণা ঝলকিয়া ওঠে কভু
ও নয়নকোণে ওগো প্রেয়সী,
বুঝি আমার হৃদয় 'পরে হানিবে তীক্ষ্ণধার
নির্দয় ক্রন্দনে সে অসি!
বহু আগুনে জ্বলিয়া কত দীর্ঘ যুগের চাপে
কঠোর কঠিন মোর বক্ষ,

* জামসেদপুরের চলন্তিকা-সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে মূল সভাপতির অভিভাষণ।

আজ বিদ্যুৎ হানিবে কি নয়ন-গগন হতে
দৃপ্ত সঘন তব লক্ষ্য।
ওগো সুন্দরী মোর 'পরে কোন কি করুণা নাই,
অতীতের কোন কথা মনে কি,
কভু জাগে না ক্ষণেক তরে কেঁপে কি ওঠে না প্রাণ
স্মৃতি-রসকম্পিত ক্ষণে কি?
যবে শীতের আকাশে চাঁদ শিহরিয়া উঠেছিল
দেখেছিনু সে আলোতে নয়নে
তব মনের গোপন কথা; আজ সখী ভুলে যাও
মধু তার কটুকথা চয়নে!
বল, বল গো পরাণপ্রিয়া সে কথাটি ভুলেছ কি
আমি কি মরেছি তব হৃদয়ে?
হায় কেমনে ভুলিব আমি তুমি যাহা ভুলিয়াছ
মরিলেও, বল অয়ি নিদয়ে?

২

এস গো, প্রেয়সী, কাছে এসে ব'স নীরবে,
হৃদয় পূর্ণ, মিছে কথা ক'য়ে কি হবে?
মনের কথাটি জানাও স্নিগ্ধ চাহিয়া,
আমি জানাইব মোর কথা গান গাহিয়া।
বলিব আবার যাহা বলিয়াছি ছন্দে,
জানিও গো প্রিয়া, সেই কথা ফুলগন্ধে।
রূপালী জ্যোৎস্না ঝরিয়া পড়িবে অঙ্গে,
নয়ন-মিলনে শুধু রব তব সঙ্গে,
সেই সিঞ্চনে বক্ষে উঠিবে ফুটিয়া,
স্মৃতি-সঞ্চিত অনুরাগ-মধু লুটিয়া,
নব আবেগের শত ফুলদল-হরষে
রবে না গোপন কোন কথা তব পরশে।
যদি এ হৃদয় থাকে কভু নিস্তব্ধ,
যদি রসনায় কভু নাহি সরে শব্দ,
তবুও জানিও চিরবাঞ্ছিতা রয়েছ;
তুমিও তো সদা নয়নেই কথা কয়েছ।

৩

নিকটে থেকেও দূরে যবে চ'লে যাও,
বিদ্যুৎগতি অভিমান-বান-যোগে
লজ্জিত আমি অজানা কি অভিযোগে,
মূর্খের মত বুঝি না তুমি কি চাও।
কি যে বলিয়াছি, অথবা বলি নি হায়,
কেমনে বুঝিব, নীরব তুমি যে প্রিয়া,
কিছু যে বল না হে মোর অদ্বিতীয়া,
তুমি জান শুধু কি তব অভিপ্রায়!
সাত সাগরের ওপারে চলিয়া গেলে
ভাঙা খেলাঘর তোমার বিহনে সই,
আমার চলে না জান তুমি তোমা বই,
তুমি চ'লে গেলে কে আমার সাথে খেলে?
তোমার বিহনে ওগো মোর চিরসাথী,
আঁধারের পথে হঠাৎ হারাই বাতি।

শ্রীমধুকরকুমার কাঞ্জিলাল

রবীন্দ্রনাথ কি অ-হিন্দু?

রবীন্দ্র-সংখ্যা "শনিবারের চিঠি"তে (আশ্বিন ১৩৪৮, পৃ. ৮৯২-৯৩) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দত্ত "রবীন্দ্রনাথ ও সেন্সাস" নামে একটি নিবন্ধ লেখেন। তাহার এক স্থলে আছে, "রবীন্দ্রনাথকে লইয়া সেন্সাস-কর্তৃপক্ষগণ বিষম গোলে পড়িলেন। তিনি নিজেকে 'হিন্দু' বলিয়া পরিচয় দিলেন।" ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, ইহাতে গোলে পড়িবার বা আশ্চর্য হইবার কোনই হেতু ছিল না। কারণ তিনি বরাবর নিজেকে হিন্দু বলিয়াই মনে করিতেন। রবীন্দ্রনাথ আশ্বিন ১৮০৬ শক হইতে বৈশাখ ১৮৩৪ শক পর্য্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ নিজেকে হিন্দু সমাজেরই অঙ্গ বলিয়া গণ্য করিতেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে সংস্কৃত হিন্দুধর্ম্ম বা হিন্দুধর্ম্মেরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট শাখা, আদি ব্রাহ্মসমাজ তাহা বরাবর ব্যক্ত করিয়াছেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে একবার ভারতবর্ষে সেন্সাস লওয়া হয়। এই সময়ে সেন্সাস কমিশনার সি. জে. ওডনেল আদি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য-গণকে অ-হিন্দু রূপে ব্রাহ্ম বলিয়া গণনা করিতে নির্দ্দেশ দেন। ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি জানাইয়া আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকরূপে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৯১, ৯ই জানুয়ারি উক্ত সেন্সাস-কমিশনারকে এক পত্র লেখেন। পত্রে তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণকে হিন্দু ব্রাহ্ম বলিয়া গণ্য করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করেন। সেন্সাস-কমিশনার রবীন্দ্র-নাথের উক্তির সারবত্তা বুঝিয়া এই মর্ম্মে তাহার উত্তর দিলেন যে, সময়-সংক্ষেপ বশত তখন তখনই গণনাকারীদের নির্দ্দেশ দান সম্ভব না হওয়ায়, চরম গণনার সময় যাহাতে আদি ব্রহ্মসমাজ-ভুক্ত ব্যক্তিদের হিন্দু বলিয়া গণনা করা হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা হইবে। রবীন্দ্রনাথও সমাজের সম্পাদকরূপে উহার সভ্যগণকে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়া দিলেন যে, পরবর্ত্তী ২৬শে ফেব্রুয়ারি (১৮৯১) তারিখে যে লোকগণনা হইবে, তাহাতে তাঁহারা নিজেদের হিন্দু ব্রাহ্ম বলিয়া লিখাইবেন। রবীন্দ্রনাথের পত্র, সেন্সাস-কমিশনারের উত্তর এবং বিজ্ঞপ্তিটি এখানে প্রদত্ত হইল। বলা বাহুল্য, সকলই ইংরেজীতে লিখিত।

NOTICE

We hope that the Brahmos following the principles of the Adi Brahmo Somaj will classify themselves as Hindu Brahmos in the coming Census, which takes place on the 26th February next. The following correspondence took place between the Secretary to the Adi Brahmo Somaj and Mr. C. J. O'Donnel Superintendent of Census Operations, Bengal.

Robindra Nath Tagore,
Secretary.

The following petition was sent to the Census Commissioner :—

Sir,

With reference to the instructions issued by you as to the tabulation of all Brahmos as non-Hindus and the explanation thereof to the effect that the members of the Adi Brahmo Somaj are to be classed as Brahmos, not Hindus, and the Adi Brahmo Somaj is to be given as the sect to which they belong, I have the honour to inform you that the members of the Adi Brahmo Somaj are really Hindus as will appear from the speech of Sir Fitz James Stephen on the Civil Marriage Act (see the supplement to the Gazette of India Jan. 1872 p. 70 etc.) They differ from the general body of Hindus in this one respect that they do not worship images and are pure Theists.

Under these circumstances, I beg you will be good enough to issue further instructions modifying those already issued and directing the classification of the members of the Adi Brahmo Somaj as Theistic Hindus.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,
Robindra Nath Tagore
Secretary.

In reply to the above petition, the following letter was received from Mr. C. J. O'Donnell.

No. 292. C.

From

C. J. O'Donnell, Esq.,
Superintendent of Census Operations, Bengal

To

Babu Rabindra Nath Tagore,

Dated Calcutta the 13th January, 1891

Sir,

With reference to your letter No. 93 of the 9th instant, I have the honour to say that there is no intention to tabulate and compile Adi Somaj Brahmos as non-Hindus. For the purposes of statistics, however, it has been found necessary to distinguish ordinary Hindus from Theistic Hindus and the only simple way of accomplishing this end in the vernacular languages of these provinces is to instruct enumerators to enter the former as Hindus and the latter as Brahmos.

2. As the census begins in less than 48 hours from the time I an writing this letter I hope you will agree with me that it is practicall; impossible to issue further instructions at this period. You may, how ever, rely on me to see that your co-religionists appear as Hindus in th Census compilations.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient Servant
C. J. O'Donnell
Superintendent of Census Operations, Bengal

(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১৮১২ শকাব্দা)

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ছোটর ঋণ

ছোট ছোট যারা আমার দুয়ারে ভীরু বসন্ত-পবনের মত এল,
আমার মনের কঠিন পাষাণে পড়ে নি তাদের রেখা,
তবু আসে ছোট ছোট--
অজানা বনের নামহীন ফুলদল—
আমার বুকের পাষাণ ফলকে তাহাদের নিশ্বাস
শিশিরের মত, অশ্রুর মত, অম্লান সুন্দর।

বড় বড় যারা আমার দুয়ারে কালবৈশাখী ঝড়ের মত এল,
বহ্নিরেখায় আমার পাষাণে তাদের চিহ্ন আঁকা;
শিশিরের মত, অশ্রুর মত ছোটদের নিশ্বাস
তাদের দহনে ম্রিয়মাণ পলাতক।
তবুও আমার অজানা বনের নামহীন ফুলদল
সুরভি-স্নিগ্ধ নিশ্বাস-বায়ে নিবায় আমার জালা
বাতাসের মত অভিমানহীন ছোটদের ভালবাসা
আমার বুকের দিনের সঞ্জীবনী।

শ্রীশান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

সপ্তর্ষি

৭

চাকরি-বিমুখ আভিজাত্য-গর্ব্বে গর্ব্বিত সাহেবী-মেজাজ শশাঙ্ক-শুভ্র যদি দৈবাৎ আলাদিনের প্রদীপ একটা সংগ্রহ করতে পারতেন, তা হ'লে হয়তো তাঁর কোনক্রমে কুলিয়ে যেত। অল্প আয়াসেই অর্থ-সমস্যা সমাধান করতে পারতেন তিনি। পিতৃ-প্রদত্ত বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকার সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বন্দীজীবন যাপন করতে হ'ত না তাঁকে। আলাদিনের প্রদীপ আরব্য-উপন্যাসের কল্পলোকেই সম্ভব, এ কথা শশাঙ্কর মত শিক্ষিত বুদ্ধিমান লোকের অবিদিত থাকবার কথা নয়, তবু তিনি সারাজীবন ওই আলাদিনের প্রদীপের সন্ধানেই কাটিয়ে দিলেন। যৌবনে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র যে প্রেরণা জাগিয়েছিলেন তাঁর মনে, তদনুসারেই তিনি চলেছিলেন; কিন্তু তিনি মাড়োয়ারী নন, বাঙালী ভদ্রলোক—তাই জটিলতাই বাড়ল কেবল, অর্থাভাব ঘুচল না। যোগ্যতা থাক না থাক, অর্থ চাই-ই। পিতা বিমুখ,—নিজেকেই উপার্জ্জন করতে হবে তা। এমন একটা কিছু করতে হবে, যাতে স্বল্প আয়াসে রাশি রাশি টাকা আসবে—সংক্ষেপে এই হয়ে উঠল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। বহুবিধ বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টার হয়ে, নানা কারবারে বহু টাকা নিযুক্ত ক'রে, অল্প সুদে টাকা ধার ক'রে বেশি সুদ-দেনেওয়ালা ব্যাঙ্কে তা জমা রেখে, নানা রকম্ শেয়ার কিনে এবং দাঁও-মাফিক তা বিক্রি ক'রে, নূতন ধরনের জীবনবীমা কোম্পানি সৃষ্টি ক'রে, আম জাম কাঁঠাল প্রভৃতি দেশী ফলকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিদেশী বাজারে চালান দিয়ে, দেশলাই-কারখানা বানিয়ে, নূতন ধরনের ভদ্র ছাপাখানা বানিয়ে—বিবিধ বিচিত্র উপায়ে তিনি অর্থাগমের উপায় আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছিলেন, প্রতিদ্বন্দ্বী বন্ধু ব্যারিস্টার সনৎকুমারকে নিষ্প্রভ ক'রে দেবার জন্যে। কিন্তু পারেন নি। পারেন নি, কিন্তু থামেনও নি। বিলিতী মদের মত বিলিতী ব্যবসায়ের নেশাও পেয়ে বসেছিল তাঁকে, অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ধরেছিল যেন। তিনি ছাড়তে চাইলেও সেই করাল 'কম্লি' কিছুতেই তাঁকে ছাড়ে নি। যে মাটিতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধ'রে—সাহেবী-মেজাজের লোক হ'লেও এই প্রবাদটি তিনি বিশ্বাস করতেন। বস্তুত তাঁর জীবনে এবং মনোবৃত্তিতে দেশী-বিদেশীর একটা গাথিচুড়ি পাকিয়ে যাওয়াতে তিনি আরও বেশি বিপন্ন হয়েছিলেন। যদিও

বোমা-ননসেন্স তাঁর মন থেকে অনেক দিন আগেই অন্তর্হিত হয়েছিল, কিন্তু মনে-প্রাণে তিনি 'ন্যাশনালিস্ট' ছিলেন। এইজন্যেই হোক, বা পরশ্রী-কাতরতার বশেই হোক, সাহেবদের তিনি সুচক্ষে দেখতেন না। তাই পারত-পক্ষে কোন সাহেবী ব্যাঙ্কে তিনি টাকা রাখেন নি, কোন ব্যবসায়ে সাহেব ম্যানেজার নিযুক্ত করেন নি। দেশী ব্যাঙ্কে টাকা রেখে দেশী কর্ম্মচারীদের সহায়তায় তিনি সাহেব ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পাল্লা দেবার চেষ্টা করতেন। নিজে জমিদারের ছেলে, দিলদরিয়া আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছেন চিরকাল, ব্যবসায় পর্য্যবেক্ষণ করবার জন্যে যে বক-ধ্যান বা কাক-বুদ্ধির প্রয়োজন, তা তাঁর ছিল না। তিনি প্রকাণ্ড বাড়ি ভাড়া ক'রে ব্রেকফাস্ট-লাঞ্চ-টিফিন-ডিনারের ফাঁকে ফাঁকে দামী মোটরকার-বাহিত হয়ে প্রতিদিন (হ্যাঁ, রবিবার ছাড়া প্রায় প্রতিদিনই) দেশী কর্ম্মচারী-চালিত ব্যবসায়ের কাগজী তত্ত্বাবধান করতেন ফ্যানের তলায় ব'সে ব'সে স্টেনো এবং প্রাইভেট সেক্রেটারির সহায়তায়। এই করতেই ঘেমে উঠতেন। নানারূপ স্নায়বিক অবসাদ ঘটত। বন্ধু-বান্ধবদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সপরিবারে শিমলা কিংবা শিলং দৌড়তে হ'ত বছরে অন্তত একবার। ফলে যা হয়েছিল—বলা বাহুল্য—তার ইতিহাস অতিশয় করুণ। দেশী ব্যাঙ্ক ফেল হ'ল, দেশী কর্ম্মচারীদের অপটুতা অসাধুতা প্রকট হয়ে উঠল ক্রমশ, মুখার্জি সাহেবের স্বদেশ-হিতৈষণা ঋণজালে জড়িত হয়ে উপহাসের খোরাক যোগাতে লাগল সকলের। শেষে দেশী চরিত্র, দেশী সংস্কার, দেশী প্রথা—'এনিথিং' দেশীর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলেন তিনি। বিদেশীদের ওপর বরাবরই রাগ ছিল, স্বদেশীদের ওপরও বীতরাগ হয়ে কেমন যেন অসহায় হয়ে পড়লেন তিনি কিছুদিন।

চতুর্দ্দিকে অব্যবস্থা; মাথায় নানা রকম 'বিজনেস-প্ল্যান'; বাসন্তীর প্রশংসা-কাঙাল পর-ভোলানো ঘর-জ্বালানো স্বভাবের জন্যে সংসার-খরচ মাসিক দশ হাজারে উঠেছে; কাউকে বিশ্বাস করবার উপায় নেই—ছেলেরা অবাধ্য, প্রত্যেকটি কর্ম্মচারী চোর; সনৎকুমার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ক'রে চলেছে, চৌরঙ্গীতে প্রকাণ্ড একখানা বাড়ি কিনবে নাকি; অথচ তিনি উদয়াস্ত পরিশ্রম ক'রে কোন দিকই সামলাতে পারছেন না। প্রত্যেকটি ব্যবসা টলমল করছে, কয়েকটা ডুবেই গেছে; কিছু টাকা পেলে হয়তো সামলে উঠতে পারা যেত—বেশি নয়, লাখখানেক টাকা। কিন্তু হংস-শুভ্র দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, বরাদ্দ টাকার বেশি

এক কপর্দ্দকও দেবেন না। নাতিদের টাকা দেবেন—শঙ্খ রজত হীরক কম টাকা ওড়ায় নি তাঁর—নিতান্ত বাজে ব্যাপারে উড়িয়েছে, কিন্তু ব্যবসার উন্নতির জন্যে একটি পয়সা দেবেন না তাঁকে তিনি। কাশীর পণ্ডিতদের টাকা দিচ্ছেন, তাঁকে দেবেন না। অদ্ভুত মনোবৃত্তি!

এই সঙ্কটের মুখে শশাঙ্ক-শুভ্রের মনে পড়ল কাকামণিকে। কাকামণি ইচ্ছে করলে তাঁকে সাহায্য করতে পারেন। কাকামণি কেন যে ব্রাহ্ম হয়ে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন শুধু শুধু, তা আজও তাঁর মাথায় ঢোকে নি। ধর্ম্ম জিনিসটার উদ্ভব বর্ব্বর সমাজের কুসংস্কার থেকে—আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা এই কথাই বলেন। নানা বুদ্ধিমান লোক ওই দিয়ে নানা ধরনের মুখোশ তৈরি ক'রে নিজেদের কাজ হাঁসিল করেছে বোকা বোকা লোকদের ঠকিয়ে যুগে যুগে। কাকামণি বোকা লোক নন, তিনি কেন যে এই প্যাঁচে প'ড়ে পর হয়ে গেলেন, তা শশাঙ্কর বুদ্ধির অতীত। এই সামান্য কারণে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কটা অনর্থক বাধো-বাধো হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাধো-বাধো ভাবটা কাটিয়ে উঠতে খুব বেশি সময় অবশ্য লাগে নি শশাঙ্ক-শুভ্রের। প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ এর চেয়ে ঢের বেশি দুরূহ কাজ ক'রে থাকে। ঠিক সময়েই কাকামণির কাছে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন তিনি। এই সম্পর্কে কাকামণির যে ছবিটি তাঁর মনে আঁকা আছে, তাও অপরূপ। পূর্ব্বে কোন খবর না দিয়েই শশাঙ্ক গিয়েছিলেন। খবর দিয়ে তাঁর মনকে প্রশ্ন-সঙ্কুল ক'রে দেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে ব'লে মনে হয় নি। আচম্বিতে গিয়ে পড়লে কোন কিছু আন্দাজ করবার অবসর পাবেন না তিনি, এবং তাতেই সুফল ফলবে ব'লে শশাঙ্কর মনে হয়েছিল। গিয়ে দেখেন, ছোট্ট পরিচ্ছন্ন একটি বেতের মোড়ার ওপর ধপধপে সাদা লংক্লথের ফতুয়া প'রে সোম-শুভ্র অনিমেষ-নয়নে দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে আছেন। মাঠের দিকে চেয়ে শশাঙ্ক-শুভ্রকেও ক্ষণকালের জন্য নির্নিমেষ হয়ে পড়তে হ'ল। বিরাট একখানা সবুজ মখমলের গালিচা কে যেন চক্রবাল-রেখা পর্য্যন্ত বিছিয়ে দিয়েছে। অবশ্য ক্ষণকালের জন্যেই—পরমুহূর্ত্তে তিনি সোম-শুভ্রের দিকে চেয়ে দেখলেন। সোম-শুভ্র ব'সেই আছেন। শশাঙ্কর জুতোর শব্দ হয়েছিল নিশ্চয়; কিন্তু সে শব্দে সোম-শুভ্রের ধ্যানভঙ্গ হয় নি—ধ্যানই করছেন, শশাঙ্কের প্রথমে ধারণা হয়েছিল। অমন নিস্তব্ধ তন্ময় বাহ্যজ্ঞানরহিত হয়ে মানুষ যে গম-ক্ষেতের

দিকে চেয়ে ব'সে থাকতে পারে, তা শশাঙ্কর পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত হ'ত, যদি না তিনি দেখতে পেতেন যে সোম-শুভ্রের দুটো চোখই খোলা রয়েছে। খোলা চোখে এ কি রকম ধ্যান! বিস্মিত হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল শশাঙ্ককে। আশ্চর্য্য রকম স্তব্ধ হয়ে ব'সে ছিলেন সোম-শুভ্র। একটু গলা-খাঁকারি দিয়েও যখন তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করা গেল না, তখন শশাঙ্ককে ডাকতে হ'ল।

কাকামণি!

বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট হয়ে যেন চমকে উঠলেন তিনি। তারপর চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে শশাঙ্কর মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ—নিজের চক্ষুকে যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না।

শশাঙ্ক! তুই এমন সময়ে হঠাৎ?

তখনও হংস-শুভ্র চিঠি লেখেন নি তাঁকে, তখনও তিনি স্বজন-পরিত্যক্ত হয়ে নির্ব্বাসিত-জীবন যাপন করছেন। স্যুট-পরিহিত ভ্রাতুষ্পুত্রের আকস্মিক অভ্যাগমে অপ্রত্যাশিত এমন একটা আনন্দোচ্ছ্বাসে সমস্ত অন্তর পরিপ্লাবিত হয়ে গেল তাঁর যে চোখে জল এসে পড়ল। শশাঙ্ক তা হ'লে এখনও ভোলে নি তাঁকে! হাজার হোক, কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ করেছিলেন তো! এর পরই তিনি শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন শশাঙ্ক-শুভ্রের সম্বর্দ্ধনার জন্যে। শশব্যস্ত হবারই কথা। নিজে তিনি চা খান না, মাংস খান না, সিগারেট খান না। শশাঙ্কর কিন্তু সবই চাই বোধ হয়, ও কষ্ট সহ্য করতে পারে না—জানেন তিনি। চারদিকে লোক ছুটিয়ে দিলেন। নিজেই তাড়াতাড়ি স্টোভ জ্বালতে ব'সে গেলেন।

হাত-পা-মুখ ধুয়ে, গরম দুধের সঙ্গে মধু মিশিয়ে খা ততক্ষণ। চা এসে পড়বে এক্ষুনি। আগে যদি একটু খবর দিতিস, কোন কষ্ট হ'ত না। স্টেশনে আমার শামপানিটা রেখে দিতাম। স্প্রিং-দেওয়া গাড়ি, ভাল বলদ, কোন কষ্ট হ'ত না তোর। নতুন যে বলদ জোড়া কিনেছি ঘোড়ার মত দৌড়য়।

গম্ভীর সোম-শুভ্র শিশুর মত প্রগল্‌ভ হয়ে উঠলেন।

কথাবার্ত্তার ফাঁকে ফাঁকে পারিবারিক প্রসঙ্গের নানা আলোচনার আড়ালে-আবডালে শশাঙ্ক নিজের বর্ত্তমান জটিল অবস্থাটা ক্রমশ ফুটিয়ে তুললেন। কাকামণির সঙ্গে অনেক দিন ছাড়াছাড়ি, তাঁর মতামত ঠিক জানা নেই।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের আদর্শের সঙ্গে তাঁর মতদ্বৈধ না হবারই কথা, তাই এইটেকে প্রাধান্য দিয়েই কথা আরম্ভ করলেন তিনি। প্রফুল্লচন্দ্রের আদর্শ এ দেশে অনুসরণ করতে গিয়েই যে তিনি বিপন্ন, তা প্রতিপন্ন করবার জন্যে প্রাসঙ্গিক অপ্রসাঙ্গিক নানা ঘটনা বর্ণনা করলেন। তাঁর দুরবস্থার জন্যে যে ঘটনা-পরম্পরা দায়ী, তার ঠিক কোন্ কোন্গুলিতে বেশি রঙ ফলাও করলে সোম-শুভ্রের হৃদয় বিগলিত হবে, তা আন্দাজ ক'রে নিতে বেশি বেগ পেতে হ'ল না। বহু ব্যবসায়ে বহু লোকের সংস্পর্শে এসে এ দক্ষতাটা লাভ করেছিলেন তিনি। কিছুক্ষণ আলাপ করবার পরই লোক-চরিত্র খানিকটা বুঝতে পারতেন। সোম-শুভ্রের চরিত্র তো অনেকটা জানাই ছিল—সুতরাং তাঁর মর্ম্মস্থলে পৌঁছতে বেশি দেরি হ'ল না। ইচ্ছে করলেই তিনি যে একটা বড় চাকরি পেতে পারতেন, কিন্তু স্বাধীনতা-প্রিয়তার জন্যে তার চেষ্টা করেন নি; ব্যবসায়ে উন্নতি করতে না পারলে এ দেশের উন্নতি নেই, এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়েই তিনি নানা রকম ব্যবসা ফেঁদেছিলেন এবং স্বদেশী লোকের ওপর অত্যধিক বিশ্বাস স্থাপন করার ফলেই যে নৈষ্ফল্য ছাড়া আর কিছু অর্জ্জন করতে পারেন নি—এই সব কথা এমন একটা করুণ আন্তরিকতার সঙ্গে কখনও হেসে কখনও গম্ভীরভাবে তিনি বর্ণনা করলেন যে, কিছুক্ষণের জন্যে সোম-শুভ্র অভিভূত হয়ে পড়লেন। তাঁর ধারণা হ'ল, শশাঙ্ক তাঁরই মত একটা আদর্শের জন্যেই জীবনপাত করছে এবং হংস-শুভ্র একটা অলৌকিক জেদের বশবর্ত্তী হয়েই তাকে সাহায্য করছেন না। শশাঙ্কর বর্ণনাটা আরও মর্ম্মস্পর্শী হয়েছিল বিশ্বাস-প্রসূত ব'লে। তিনি নিজে সত্যিই বিশ্বাস করতেন যে, একটা বড় প্রিন্সিপ্‌লের খাতিরেই তিনি অনেক কিছু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ ক'রে এই সব ঝড়ঝঞ্ঝাপাত মাথা পেতে নিয়েছেন। এমন কি কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ আছে ব'লে অনেক সাহেব খদ্দেরের অপ্রীতিভাজন হয়েছিলেন এই কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত—তবু যতক্ষণ কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর মতের মিল ছিল, কংগ্রেসের সম্পর্ক ত্যাগ করেন নি তিনি। এখন অবশ্য কংগ্রেসের কেউ নন তিনি। মৃগাঙ্কর মত মহাত্মাজীর আধ্যাত্মিক রাজনীতিতে আস্থা নেই তাঁর। রজতের মত ঢাল-খাঁড়া-হীন বিদ্রোহী নিধিরাম সাজতেও চান না তিনি। হীরকের সমাজতন্ত্রবাদ তো তাঁর মাথাতেই ঢোকে না। বস্তুত আজকালকার কোন রকম হুজুকে আর আস্থা নেই তাঁর। অর্থনৈতিক

উন্নতি না হ'লে দেশের মুক্তি নেই, ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রে আগে দেশের লক্ষ্মী-শ্রী ফিরিয়ে আনতে হবে—পরাধীন দেশে অবশ্য তার অনেক বাধা আছে, কিন্তু বাধা সত্ত্বেও তার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে এবং ভালভাবে তা করতে পারলেই বাধা আপনি স'রে যাবে—এই তিনি বোঝেন এবং এইজন্যেই তিনি স্বাধীন ব্যবসাতে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। কিন্তু কেউ তাঁকে বুঝলে না।

সোম-শুভ্র নীরবে তাঁর বর্ণনা শুনে যাচ্ছিলেন। একটু ফাঁক পড়তেই হেসে বললেন, এখানে এসে পড়লি হঠাৎ কি মনে ক'রে? একটু বিশ্রামের জন্যে বুঝি? ভালই করেছিস, খুব খুশি হয়েছি আমি। বউমাকেও আনলে বেশ হ'ত। তাঁকে তো দেখিই নি আমি।

শশাঙ্ক-শুভ্রের ব্যবসায়ী বুদ্ধি তাঁকে মন্ত্রণা দিলে—এই সুযোগ, ব'লে ফেল, আর দেরি ক'রো না। লোহা গরম থাকতে থাকতেই আঘাত করা উচিত।

আঘাত করলেন। ফলও হ'ল আঘাত করার মতই। শোনামাত্রই সোম-শুভ্র বিবর্ণমুখে খানিকক্ষণ মুহ্যমান হয়ে রইলেন। মুখভাবের হঠাৎ এই পরিবর্ত্তন দেখে শশাঙ্ক-শুভ্রও ভীতই হয়ে পড়লেন প্রথমে। আড়চোখে একবার চেয়ে চুপ ক'রে রইলেন। ক্ষণকাল অস্বস্তিকর নীরবতার পর সোম-শুভ্র ধীরে ধীরে নিজের চোখ-মুখের ওপর হাত বুলিয়ে সমস্ত গ্লানিটা যেন তুলে নিলেন—কোন বিষয়ে মনঃস্থির করবার পূর্ব্বে এ রকম করেন তিনি। তারপর প্রশ্ন করলেন, কত টাকার দরকার তোমার?

অন্তত লাখখানেক না হ'লে তো সামলাতে পারব না।

সোম-শুভ্র উঠে গেলেন। সোম-শুভ্রের বিবর্ণ মুখের তাৎপর্য্য শশাঙ্ক যেমন বোঝেন নি, হঠাৎ এই উঠে যাওয়ার তাৎপর্য্যও তেমনই বুঝলেন না। বিস্মিত হয়ে গেলেন, যখন মিনিট পাঁচেক পরে তিনি ফিরে এসে অত্যন্ত সহজভাবে এক লাখ টাকার চেকখানা তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, এই নাও। এর জন্যে আসবার দরকার ছিল না তোমার এত কষ্ট ক'রে। চিঠি লিখলেই পারতে। এর পর কিন্তু আর জমল না। আঘাত পেলে শামুক বা কাছিম যেমন শক্ত খোলের মধ্যে নিজের সর্ব্বাঙ্গ গুটিয়ে নেয়, দুর্ভেদ্য গাম্ভীর্য্যের মধ্যে সোম-শুভ্র তেমনই আত্মগোপন করলেন। টাকার জন্যেই শশাঙ্ক এখানে এসেছে, তাঁর জন্যে নয়, এ ধারণাটা মনে স্পষ্ট হওয়ামাত্রই তিনি আর একবার হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, পারিবারিক বৃক্ষের ছিন্ন শাখা তিনি, অন্তরের যোগ লুপ্ত

হয়েছে, কলমের গাছের মত পর হয়ে গেছেন তিনি। জোর ক'রে আপন হওয়ার চেষ্টা যে বৃথা তা নয়, আত্মসম্মানহানিকর। সে চেষ্টা তিনি আর করলেন না।

চেক পাওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরেই ব্যবসায়-সংক্রান্ত জরুরি কাজের ওজুহাত দেখিয়ে শশাঙ্ক-শুভ্র কলকাতা অভিমুখে রওনা হয়ে পড়লেন। আরও দু-একদিন থাকতে পারতেন, কিন্তু কাকামণির আচরণটা কেমন যেন 'ফানি' ব'লে ঠেকল তাঁর। কলকাতায় পৌঁছে তিনি নিজে যা করলেন, তা আরও 'ফানি'। ব্যবসা সামলাবার জন্যে এক লাখ টাকার সত্যিই অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল তাঁর। কিন্তু ফিরে এসেই—মানে, হাওড়া স্টেশনেই একজন দালালের মুখে যেই খবর পেলেন যে, ব্যারিস্টার সনৎকুমার চৌরঙ্গীতে যে বাড়িটা কিনবেন প্রায় ঠিক ক'রে ফেলেছিলেন, সে বাড়িটা এখনও তাঁর কেনা হয় নি, বাড়ির মালিক এক লাখ টাকার কম বাড়িটা ছাড়তে রাজি নন এবং এক লাখ টাকা দিতে সনৎকুমার ইতস্তত করছেন—অমনই তিনি বাড়ি না গিয়ে সোজা হাজির হলেন সেই বাড়ির মালিকের কাছে এবং কালবিলম্ব না ক'রে কিনে ফেললেন বাড়িটা। ব্যবসাতে ঘা খাবার সম্ভাবনাটা রইল অবশ্য। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে বহু বার বহু রকম ঘা খেয়ে খেয়ে মন ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ছিলই, ভাবলেন, এটাতে নতুন আর কি হবে! সনতের ওপর টেক্কা দিয়ে বাড়িটা কিনে ফেলতে পারাতে বরং সে ক্ষতের ওপর আরামপ্রদ মলম পড়ল একটা। ব্যবসাতে লোকসান হ'ল কিছু, ছ মাসের মধ্যে কিন্তু টাকাও জুটে গেল কিছু আবার। শেয়ার-মার্কেটে অপ্রত্যাশিত রকম কিছু পেয়ে গেলেন। নিজেদের অমন প্রকাণ্ড একটা বাড়ি হওয়াতে গদগদ বাসন্তী তার পঞ্চাশ হাজার টাকার গয়নার সেটটা বাঁধা দিতে রাজি হ'ল। সময় দিলেন অনেক পাওনাদার। পরের বছর ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ ক'রে উদ্ধার করলেন গয়নার সেট, শিলং শহরে বাড়ি কিনে ফেললেন একটা। কিন্তু হুশ ক'রে সব ডুবে গেল আবার পাটের ব্যবসায়ে অত্যধিক ঝুঁকি নিতে গিয়ে তার পরের বছর। কয়েকজনের পরামর্শে শটিফুডের ব্যবসাতে নাবলেন। তাতেও গেল কিছু টাকা।...উত্থান-পতন চলছেই সারাজীবন ধ'রে। সমস্ত খতিয়ে এই কিছুদিন আগে সম্প্রতি অনুভব করেছেন যে, পতনের দিকটাই ভারী বেশি। সমস্তই যেন পতনোন্মুখ। শ্বশুরের কাছে টাকা ধার ক'রে—হ্যাঁ, ধার ব'লেই

নিয়েছেন তিনি—বাসন্তীর নামে মিল কিনেছেন একটা। তাতে কিছু লাভ হয়ে যদি কিছু ধার শোধ হয়! ধার, ধার, চতুর্দ্দিকে কেবল ধার! বাবার সঙ্গে মতের মিল নেই···কার সঙ্গেই বা আছে!

গ

মাস ছয়েক পরে।

টেলিগ্রামটা পাঠিয়ে দিয়ে অত্যন্ত অপ্রসন্ন মনে বাইরের ঘরে ব'সে ভাবছিলেন শশাঙ্ক-শুভ্র। এ কি অত্যাচার! বাড়িটা ধর্ম্মশালা নাকি! যার যখন খুশি আসবে, যতদিন খুশি থাকবে! হ'লই বা মাসতুতো ভাই। পক্ষাঘাতগ্রস্ত কাকাকে নিয়ে আমার এখানে গুষ্টিসুদ্ধ মিলে উঠে চিকিৎসা করাবে তার! কলকাতায় বাড়ি আছে ব'লে চোরের দায়ে ধরা পড়েছি নাকি! বাবা লিখেছেন, নিজেই সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসছেন তাঁদের—বুড়ো বয়সে এসব ঝঞ্ঝাট পোয়াবার কি দরকার তাঁর? আত্মীয়-বাৎসল্যটা আরও যেন বেড়েছে, কেউ গিয়ে ধরলেই হ'ল। যেখানে সেখানে এ রকম উপকার করবার মানেই বা কি? ওরা কি 'নীডি'? মোটেই নয়। বাঙালী-জাতের স্বভাবই হচ্ছে পরের স্কন্ধে আরোহণ করা। না, 'অন প্রিন্সিপ্‌ল' এসব তিনি সহ্য করবেন না। বাবা চটবেন, চটুন। কাণ্ট হেল্‌প।

···ঈজি-চেয়ারে শুয়ে পায়ের পাতা নাচাতে নাচাতে আবার পাইপটা ধরালেন। বহুদিন আগেকার আর একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল। ষষ্ঠীচরণকে নিয়ে সে কি কাণ্ড! বাবার দূরসম্পর্কের পিসী ভুবনমোহিনী দেবীর বহুপত্নীক স্বামীর বংশধর ষষ্ঠীচরণ, কোথাও কিছু নেই, একদিন বাবার এক চিঠি নিয়ে এসে হাজির। সমস্ত পরিচয় দিয়ে বাবা লিখেছেন—অর্থাভাবে পড়তে পারছে না, তোমার বাসায় রেখে বি. এ. পড়বার সুযোগ দিও একে। ছোকরা গরিব ছিল অবশ্য, কিন্তু মূর্ত্তিমান জানোয়ার একটা। হাতের নখ কাটত না, চোখের পিচুটি পুঁছত না, চবর-চবর ক'রে পান চিবোত খালি, আর পিক ফেলত যেখানে সেখানে—পেটে পিলে, মাথায় প্রকাণ্ড টিকি। সব সহ্য ক'রে তবু তাকে বাসায় রেখেছিলেন শশাঙ্ক। ছোকরা কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মাথা ঠিক রাখতে পারলে না। নবোদ্ভিন্নযৌবনা বাসন্তীকে দেখে—বাসন্তীর তখনও ছেলেপিলে হয় নি—ছোকরার মাথা ঘুরে গেল। তার

সঙ্গে বার বার হেসে হেসে কথা ক'য়ে, আর সদা-সর্ব্বদা তার সুখ-সুবিধার দিকে নজর দিতে গিয়ে অজ্ঞাতসারে তার মাথা আরও গুলিয়ে দিলে বাসন্তী নিজেই। হঠাৎ একদিন বাসন্তীকে প্রণয়-নিবেদন ক'রে বসল সে। এর পর আর তাকে বাড়িতে রাখা চলল না। চাবকে দূর করা উচিত ছিল, কিন্তু বাসন্তী তা করতে দেয় নি, ভদ্রভাবেই বিদেয় করতে হ'ল। হস্টেলে গিয়ে রইল সে। 'ওয়ার্ড' দিয়েছিলেন তাকে বি. এ. পর্য্যন্ত পড়াবেন, 'ওয়ার্ডে'র নড়চড় করলেন না তিনি, হস্টেলের সমস্ত খরচ বহন করলেন। ষষ্ঠীচরণকে হস্টেলে পাঠানো হয়েছে শুনে অসন্তুষ্ট হংস-শুভ্র পত্রযোগে যে গালাগালিটা দিয়েছিলেন তাঁকে, তা ইংরেজী ভাষায় লিপিবদ্ধ হ'লেও শোভনতার সীমা অতিক্রম ক'রে গিয়েছিল। কিছু বলেন নি শশাঙ্ক-শুভ্র, আসল কারণটা খুলে বলা সম্ভবও ছিল না। উত্তরে কেবল লিখেছিলেন—ও রকম একটা নিউসেন্সকে ভদ্র-বাড়িতে রাখা সম্ভব নয় ব'লেই হস্টেলে পাঠাতে হয়েছে। হংস-শুভ্র এর উত্তর দেন নি কোন। বছর খানেক কোন চিঠিই লেখেন নি। এ ঘটনার প্রায় বছর চারেক পরে—শঙ্খ সবে হয়েছে তখন—হিঙ্গুলগ্রামে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে যাবার জন্যে চিঠি লিখলেন হংস-শুভ্র। দেশের বাড়িতে সব রকম পূজারই পুনঃপ্রবর্ত্তন করেছিলেন তিনি। শশাঙ্ক লিখলেন—যেতে পারলে খুবই খুশি হব, কিন্তু ষষ্ঠীচরণ যদি আসে তা হ'লে আমি যাব না, অকারণ একটা অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে পড়তে চাই না। ফেরত ডাকেই হংস-শুভ্রের উত্তর এল—আজকাল তোমাদের আত্মসর্ব্বস্ব স্বজনবিমুখ মনোভাব দেখে দুঃখ হয়। কিন্তু এটা পাশ্চাত্য শিক্ষার অনিবার্য্য ফল ভেবে চুপ ক'রে থাকি। তোমার ভয় নেই, তুমি এস, ষষ্ঠীচরণের আসবার কোন সম্ভাবনা নেই। সে লক্ষ্ণৌ শহরে প্রফেসারি করছে, পূজোর ছুটিটা ওই অঞ্চলেই কাটাবে লিখেছে। শশাঙ্ক-শুভ্রের যাবার ইচ্ছে ছিল না, বাসন্তীর জেদেই সেবারও যেতে হয়েছিল। রুষ্ট শ্বশুরকে তুষ্ট করবার আগ্রহে শশাঙ্কর আপত্তি টেঁকে নি। সেখানে গিয়ে দেখা গেল, ষষ্ঠীচরণ সশরীরে বর্ত্তমান। আপাদমস্তক জ্ব'লে উঠল তাঁর।

পিতাকে আড়ালে প্রশ্ন করলেন, আপনি লিখেছিলেন, ষষ্ঠীচরণ আসবে না, কিন্তু ও তো এসেছে দেখছি। আমাকে আগে লিখলে—

এসে পড়ল, কি করি বল? মানা তো করতে পারি না।

আমি থাকব না তা হ'লে।

তোমার খুশি। আমি ওকে চ'লে যেতে বলতে পারব না। ও আমার আত্মীয় লোক। He has as much right in my house as you have.

বেশ, আমি চললাম তবে।

সোজা বাসন্তীর কাছে গিয়ে বললেন, চল,এখানে আর এক দণ্ড থাকব না।

বাসন্তীর হাসিটা এখনও মনে পড়ছে তাঁর। বাসন্তী হেসে উত্তর দিয়েছিল, কি ছেলে-মানুষি করছ তুমি!

তুমি থাক, আমি তা হ'লে চললাম।

সেবার অষ্টমীর রাতটা একা একা মেঠো রাস্তা ভেঙেই কেটেছিল তাঁর।

বাসন্তী সঙ্গে আসে নি। পিতার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখব না, বাসন্তীকেও ত্যাগ করব—এই জাতীয় নানা প্রতিজ্ঞা করতে করতে পথ হেঁটেছিলেন তিনি, বেশ মনে পড়ছে। ম্লানায়মান জ্যোৎস্নালোকে নদীপারের শুভ্র কাশবনের ছবিটাও মনের মধ্যে আঁকা আছে এখনও। আশ্চর্য্য!

বাবাকে কি টেলিগ্রাম করলে তুমি, আমাকে না জিজ্ঞেস ক'রে?

জিজ্ঞেস আবার করব কি! সত্যি কথা লিখে দিলাম—রিগ্রেট। হাউস ফুল, নো রুম।

আঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারি না বাপু! এমন মুশকিলে ফেল তুমি। ও রামদয়াল, পাশের বাড়িটা দেখ তো, 'টু লেট' লেখা ঝুলছিল দেখেছিলাম, দেখ তো, কোন ভাড়াটে এসেছে কি না!

দরোয়ান রামদয়াল চ'লে গেল।

শঙ্খ পাশের ঘরে ছিল, বেরিয়ে এসে বললে, ভাড়াটে আসে নি এখনও। যা ভাড়া হাঁকছে, মাসে আড়াই শো টাকা।

ভাড়া যা-ই হোক, তুই ঠিক ক'রে আয় বাবা। কাল তোর দাদু আসছেন নবীন ঠাকুরপোদের নিয়ে। এ বাড়িতে কুলুবে না। তাঁকে আর একটা টেলিগ্রাম ক'রে দে যে, বাড়ি ভাড়া করেছি একটা।

বাধ্য বালকের মত চ'লে গেল শঙ্খ-শুভ্র, শশাঙ্কের অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই। শশাঙ্কর অনুমতির অপেক্ষা রাখে না কেউ; অথচ শশাঙ্ককেই সব টাকা যোগাতে হয়।

শঙ্খ চ'লে গেলে বাসন্তীর দিকে চেয়ে শশাঙ্ক বললেন, মাসে আড়াই শো টাকা এখন পাব কোথা থেকে? তুমি তো সুব্যবস্থা ক'রে নিশ্চিন্ত হ'লে।

তুমি টেলিগ্রাম না করলে এই বাড়িতেই কুলিয়ে নেওয়া যেত কোন রকমে। শঙ্খ না হয় তোমার ঘরেই শুত। হীরু আর রজতের ঘর দুটো তো খালিই প'ড়ে আছে।

হীরক রজতের কথায় ক্ষণিকের জন্যে বাসন্তী অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। মাতৃহৃদয় ব্যথিত হয়ে উঠল ক্ষণকালের জন্যে। ওদের জন্যে ঘর আলাদা করা আছে বটে, কিন্তু সে ঘরে ওরা যে আসবে না, তা সবাই জানে।...সত্যি কি আসবে না?

শশাঙ্ক-শুভ্র বললেন, তিনখানি ঘরে কি হবে ওদের, পঙ্গপাল আসছে এক দঙ্গল।

একতলায় যে ঘরটায় বাক্স-আলমারি-খাট আছে, সেটাও খালি ক'রে দেওয়া যেত—ফার্নিচারগুলো চারিয়ে দিতাম সব ঘরে।

তা হ'লে বাড়ি ভাড়া করতে পাঠালে কেন?

মুচকি হেসে বাসন্তী বললে, তোমার মান রাখবার জন্যে। তুমি যে লিখে দিয়েছ, নো রুম। কাল বড় মোটরখানা নিয়ে বেরিও না তুমি। আমি ওটা নিয়ে স্টেশনে যাব বাবাকে আনতে। নিজে না গেলে হয়তো আসবেনই না তিনি। আচ্ছা, তনিমার কোন খবর আসে নি এখনও?

কই, না।

বেয়ানটি বেশ কিপ্‌টে আছেন। ফোনের দু আনাও খরচ করতে রাজি নন। আমাকেই ফোন করতে হবে রোজ। আমি সেখানেই যাচ্ছি। বাড়িটা তুমি ঠিক ক'রো।

হেসে বেরিয়ে গেল বাসন্তী।

শশাঙ্ক-শুভ্র চুপ ক'রে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ। বাসন্তী সব উলটে-পালটে দিয়ে গেল। সারাজীবন ধ'রে সবাই তাঁর সব বিধি-ব্যবস্থা বারংবার উলটে দিয়ে যাচ্ছে। তাঁর মুখের দিকে কেউ চাইবে না; এমন কি, ছেলেরাও না। শঙ্খ এক হিসেবে ভাল বটে, রজতের মত খামখেয়ালী নয়, হীরকের মত পাগলও নয়। কিন্তু ওর বুকের পাটা ব'লে কোন জিনিসই নেই যেন। কেমন যেন অত্যন্ত ভালমানুষ-গোছের; সর্ব্বদা যেন সঙ্কুচিত

হয়ে আছে।—ওকে দেখলে পুত্র-গর্ব্বে মন ভ'রে ওঠে না। নিয়মিত আপিস করে, সন্ধ্যাহ্নিক করে, সরু-গোছের একটা টিকিও রেখেছে। নিজের ঘরটিতে চুপচাপ ব'সে বই পড়ে খালি, কারও সাতে-পাঁচে থাকে না। বাবা ওকে ছেলেবেলায় কাশীতে এক টোলে পাঠিয়ে সেই যে ওর মনে কি এক ঘুণ ধরিয়ে দিলেন, কেমন যেন জরদ্গব-গোছ হয়ে গেছে। জোর ক'রে টেনে এনে হিন্দু-স্কুলে ভরতি ক'রে না দিলে ওর কোন পদার্থ ই থাকত না আর। এই উপলক্ষ্যে বাবার সঙ্গে মনোমালিন্যের কথাটা মনে পড়ল। মুখে যদিও কিছুই বলেন নি, কিন্তু আমলকী-ভেঞ্চারে একটি পয়সাও সাহায্য করলেন না এইজন্যে।

বেয়ারা এসে একখানা টেলিগ্রাম দিয়ে গেল—মৃগাঙ্ক জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। মৃগাঙ্কটাও যেন কি! হ'ল ডাক্তার, মাতল খদ্দর নিয়ে। যা কিছু রোজকার করে, ওতেই যায়। দুটো মেয়ে আছে, একটা ছেলে আছে, সেসব বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ নেই। বোর্ডিঙে বোর্ডিঙে মানুষ হচ্ছে তারা। বাবা বলেছিলেন, আমার বাসাতে থেকেই পড়ুক ওরা—বাসন্তীও সায় দিয়েছিল তাতে। আশ্চর্য্য মনোবৃত্তি এদের! আমি যেন একটা অফুরন্ত জলাশয়, যার যখন খুশি এসে কলসী ভ'রে ভ'রে নিয়ে যাবে! বাসন্তী সায় দিয়েছিল—বাসন্তী তো দেবেই; কনক কিন্তু রাজি হয় নি। বাবার কাছ থেকে মাসহারা নিতেও রাজি হয় নি সে। রেস্‌পেক্‌টেব্‌ল ওম্যান! ওই তো ঠিক। শুক্তি-মুক্তা-নবনীর পড়ার খরচ নিশ্চয় স্টেট থেকে বাবা দেন··· মৃগাঙ্কর দাতব্য চিকিৎসালয়ের খরচও বাবা দেন বোধ হয় কিছু। মৃগাঙ্ককেও তো বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকা ক'রে দেবার কথা। টাকার কথা মাথায় এসে পড়াতে শশাঙ্ক-শুভ্র অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, মনে মনে তিনি যোগ করছেন, আগামী মাসে কার কত টাকা দেনা শোধ করতে হবে। মিলটা যদি ঠিকমত চলে, আর গমের দর মণ-প্রতি যদি আট আনা ক'রেও চড়ে, তা হ'লে দেনা শোধ করতে কতক্ষণ! রজত আর হীরক যদি ওসব বাজে ব্যাপারে উন্মত্ত না হয়ে ব্যবসাতে নাবত আমার সঙ্গে—শেষ পর্য্যন্ত নাবতে হবেই, ওসব বাজে নন্‌সেন্স নিয়ে বেশি দিন কাটানো যায় না। আমিও একদিন বোমার দলে যোগ দিয়েছিলাম—হেঃ!···রজত হীরক দুজনের মুখই পর পর ভেসে উঠল মনের ওপর। ছেলে দুটো···নিজের

মনের ব্যবহারে নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন একটু পরে। মনের অন্তরতম প্রদেশে ছেলে দুটো যে আসন অধিকার ক'রে আছে, তা শ্রদ্ধার আসন। বাই জোভ—না না, শ্রদ্ধা করবার মত কিছু নেই ওদের আচরণে, ওরা ভুল পথে চলছে—অর্থনৈতিক উন্নতি করতে না পারলে, দেশের উন্নতি নেই। পিস্তল ছুঁড়ে কিংবা কুলী ক্ষেপিয়ে তা হবে না। ওয়েট এ বিট। তিনি নিজেই হাতে-কলমে দেখিয়ে দেবেন, দেশের উন্নতি কি ক'রে করতে হয়! ভাল একটা ব্যাঙ্ক খুলতে হবে আগে। সোৎসাহে উঠে ব'সে ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে পাইপটা ধরালেন আবার।

ঝনঝন ক'রে ফোনটা বেজে উঠল।

হ্যালো, কে? বাসন্তী? হ্যাঁ, আমি। ও, তনিমার ছেলে হয়েছে? এক্ষুনি? ব্যাটাছেলে? বাঃ, আচ্ছা, যাচ্ছি। বাসন্তী ফোন করছে শঙ্কর শ্বশুর-বাড়ি থেকে।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন কিছুক্ষণ। হঠাৎ মনে হ'ল, বুড়ো হয়ে গেলাম, পৌত্র হ'ল! তারপরই মনে হ'ল, নাতিকে কেন্দ্র ক'রে বাসন্তী এইবার একটা খরচের তুফান তুলবে। ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে পাইপটা কামড়ে ধরলেন। বেশিক্ষণ ব'সে থাকতে পারলেন না কিন্তু। স্টেশনেও যেতে হবে একবার, মৃগাঙ্ক আসছে এই ট্রেনে।

ক্রমশ

"বনফুল"

আইন

আইনেরে ভাল বলে 'আছে'-দের পাড়াতে
বাগারা সর্কাল পায় খালি হাত বাড়াতে।
আইনের বদনামি 'না-আছে'র কুটিরে
চালে যার খড় নাই—ঘরে নাই রুটি রে।

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

(এমন সময়ে অপর দিকের জানালায় লোকের কোলাহল শ্রুত হইল। অনঙ্গমোহন উঠিয়া সেখানে গেল)

অনঙ্গমোহন। [জানালায়] এখন আমি ব্যস্ত। তোমরা যাও।

(কোলাহল শান্ত। এই অবসরে কমলা ঘরে ঢুকিয়া প্রস্থানোদ্যত রমলাকে এক রকম ঠেলিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিয়া রমলার স্থানে নির্ব্বিকারভাবে বসিয়া রহিল। তাহার মুখ দেখিলে মনে হয়, অনঙ্গমোহনের সঙ্গে এতক্ষণ তাহারই বুঝি আলাপ চলিতেছিল। অনঙ্গমোহন ফিরিয়া রমলার স্থানে কমলাকে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইল, কিন্তু তখনই বিস্ময় দমন করিয়া তাহার সঙ্গে প্রেমালাপ শুরু করিল, যেন এতক্ষণ তাহার সঙ্গেই আলাপ চলিতেছিল)

অনঙ্গমোহন। [চমকিয়া উঠিয়া, স্বগত] Any port in a storm! [প্রকাশ্যে] দেবী, সকালবেলা আজকের দিনটা মেঘলা ছিল, কিন্তু আপনার চোখের দীপ্তিতে এখন বেশ উজ্জল হয়ে উঠেছে।

কমলা। এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না।

অনঙ্গমোহন। সম্পূর্ণ বিশ্বাস করবেন না, কারণ সঙ্গে সূর্য্যের আলোও রয়েছে। কমলা দেবী আপনার চোখ দুটি কি সুন্দর!

কমলা। কি যে বলছেন—

অনঙ্গমোহন। লক্ষ্মীর বাহন—

কমলা। পেঁচা! আপনার কি আস্পর্দ্ধা!

অনঙ্গমোহন। লক্ষ্মীকে বহন করে যে পদ্মটি, তারই পাপড়ির মত—

কমলা। এতও বানিয়ে বানিয়ে বলতে পারেন!

অনঙ্গমোহন। আপনার মুখখানি যেন সরস্বতীর বাহন—

কমলা। হাঁসের মত! আপনি এখনই বেরোন।

অনঙ্গমোহন। সরস্বতীর বাহন—

কমলা। বেরোন, বেরোন বলছি।

অনঙ্গমোহন। সরস্বতীর বাহন শ্বেতপদ্মের অনাঘ্রাত কুঁড়িটির মত ভাবে রসে রূপে সৌগন্ধে ঢলঢল!

কমলা। কি যে মিছিমিছি বকছেন—

অনঙ্গমোহন। মিথ্যা নয় কমলা দেবী, মিথ্যা নয় [হঠাৎ নতজানু হইয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া দিয়া] আমি আপনাকে ভালবাসি।

(এমন সময়ে বনমালার প্রবেশ)

বনমালা। কি আশ্চর্য্য !

অনঙ্গমোহন। [উঠিয়া] সব মাটি হ'ল।

বনমালা। [কমলার প্রতি] বলি, এ কি হচ্ছিল ?

কমলা। আমার দোষ নেই মা।

বনমালা। যাও, এখনই যাও। ও মুখ আর আমাকে যেন না দেখতে হয়।

(কাঁদিতে কাঁদিতে কমলার প্রস্থান)

[অনঙ্গমোহনের প্রতি] মাপ করবেন,···কিন্তু···এতে আশ্চর্য্য না হয়েই বা উপায় কি ?

অনঙ্গমোহন। [স্বগত] এটিও মন্দ নয়। দেখাই যাক না। [নতজানু হইয়া প্রকাশ্যে] আপনি তো দেখছেন, আমি ভালবাসায় মুমূর্ষু।

বনমালা। নতজানু কেন ? ছিঃ ছিঃ, উঠুন।

অনঙ্গমোহন। না না, আমি কিছুতেই উঠব না। আমার প্রতি কি হুকুম হ'ল না জানা পর্য্যন্ত আমি কিছুতেই উঠব না।

বনমালা। মাপ করবেন। যদি আপনার মনোভাব ঠিক বুঝে থাকি, তা হ'লে বুঝতে হবে যে, আপনি আমার মেয়েকে ভালবাসেন।

অনঙ্গমোহন। না, আমি আপনাকে ভালবাসি। বলুন, খুলে বলুন, আমি আমার এই একনিষ্ঠ ভালবাসার প্রতিদান পাব কি না ? যদি বলেন 'না' —তবে, তবে আমার এ ব্যর্থ জীবনের আর কি প্রয়োজন ?

বনমালা। কিন্তু মানে কি জানেন···ধরতে গেলে আমাকে তো এক রকম বিবাহিত ব'লেই ধরা উচিত—

অনঙ্গমোহন। বিবাহিত ! ধিক ! প্রেমের চেয়ে কি বিবাহ বড় ? কবিই তো বলেছেন—বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়। আমরা এখান থেকে পালিয়ে চ'লে যাব দূরে—দূরে, যেখানে বিবাহ নেই, সমাজ নেই, শাস্ত্র নেই, পুরোহিত নেই, যেখানে ইন্‌কাম-ট্যাক্স নেই, জীন পাহাড়ের ধারে, ছোট্ট নদীর পারে সেই দেশে···যেখানে আমরা দুটিতে···দেবী, আমি তোমার পাণিপ্রার্থী।

(কমলার ছুটিয়া প্রবেশ। সে বনমালাকে রমলা ভাবিয়াছিল)

কমলা। দিদি, ভাল হচ্ছে না বলছি! [ভাল করিয়া দেখিয়া] আরে, এ যে মা! কি আশ্চর্য্য!

বনমালা। আশ্চর্য্যটা কিসের শুনি? কি হয়েছে যে, আশ্চর্য্য হচ্ছ? বলা নেই, কওয়া নেই, কাঠবিড়ালির মত খুটখুট ক'রে যেখানে সেখানে যখন তখন এসে ঢুকে পড়া! ভদ্র ব্যবহার কবে আর শিখবে? বয়স যে আঠারো হ'ল। এখনও যেন তিন বছরের খুকীটি রয়েছ!

কমলা। [কাঁদিয়া ফেলিয়া] মা, সত্যি আমি জানতাম না, আমি ভেবেছিলাম—রমলাদি।

বনমালা। তোমার মাথার মধ্যে যে কি ঢুকেছে! সবতাতেই জজের মেয়েরা হয়েছে তোমার আদর্শ! কেন, সামনে আর কোন মেয়ে কি নেই? নিজের মা তো রয়েছে চোখের ওপরে, তার আদর্শ অনুসরণ করতে পার না?

অনঙ্গমোহন। [কমলার হাত ধরিয়া] দেবী, আমাদের সুখে বাদ সাধবেন না। আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন।

বনমালা। [বিস্ময়ে] তা হ'লে ওকেই—

অনঙ্গমোহন। জীবন, না মৃত্যু?

বনমালা। দেখ, দেখ, তোমার মত রূপগুণহীন একটা মেয়ের জন্যে আমাদের সম্মানিত অতিথি আমার কাছে নতজানু হয়েছিলেন—আর এমন সময়ে বলা নেই, কওয়া নেই, এসে ঢুকে পড়া! আমি এখন অনুমতি না দিলেই উচিত দণ্ড হয়। এমন সৌভাগ্যের তুমি মোটেই যোগ্য নও।

কমলা। আমাকে ক্ষমা কর মা, আর কখনও আমি এমন কাজ করব না।

(ম্যাজিষ্ট্রেটের ভীত ব্যস্তভাবে প্রবেশ)

ম্যাজিস্ট্রেট। হুজুর, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।

অনঙ্গমোহন। ব্যাপার কি?

ম্যাজিস্ট্রেট। দোকানদারেরা এসেছিল হুজুরের কাছে নালিশ করতে। দোহাই হুজুর, ওদের একটি কথাও সত্যি নয়। ওরা চোর, জোচ্চোর, শহরের লোককে ঠকায়। আর কসাই-বুড়ী যদি ব'লে থাকে যে, আমি ওকে চাবুক মেরেছি,

সে কথাও বিশ্বাস করবেন না। আমাকে জব্দ করবার জন্যে ও নিজেকে নিজে চাবকে নালিশ করতে এসেছে।

অনঙ্গমোহন। প'ড়ে মরুকগে কসাই-বুড়ী। আমার নিজের চিন্তায় আমি এখন নিজে পাগল।

ম্যাজিস্ট্রেট। ওদের কথায় কান দেবেন না হুজুর। ওরা ঝাড়ে বংশে মিথ্যাবাদী, ওদের কথা কেউ কখনও বিশ্বাস করে না হুজুর, করা উচিত নয় হুজুর। আর ঠকাবার কথা যদি ধরেন, তবে এমন সব রামঠগ ভূভারতে কেউ কখনও দেখে নি।

বনমালা। হুজুর কমলাকে বিবাহ করবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছেন, শুনেছ?

ম্যাজিস্ট্রেট। সর্ব্বনাশ! এমন কথা মুখে আনতে নেই। হুজুর, ওঁর কথায় আপনি রাগ করবেন না। ওঁর মাথা খারাপ, ওঁর মা পাগল ছিলেন।

অনঙ্গমোহন। কিন্তু আমি সত্যিই বিবাহের অনুরোধ জানিয়েছি। আমি ভালবাসায় পাগল হয়েছি।

ম্যাজিস্ট্রেট। হুজুর, এ যে বিশ্বাস করা কঠিন।

বনমালা। সত্যি গো, সত্যি।

অনঙ্গমোহন। আমি সত্যি বলছি। ভালবাসায় আমি পাগল হয়ে যাব—হয়তো এতক্ষণ পাগল হয়ে গিয়েছি।

ম্যাজিস্ট্রেট। এ যে স্বপ্নাতীত হুজুর! আমরা যে এ সম্মানের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

অনঙ্গমোহন। কিন্তু আপনারা যদি কমলাকে না দেন, তবে আমি যে কি ক'রে ফেলব, তা বলতে পারি না।

ম্যাজিস্ট্রেট। হুজুর, আমাদের নিয়ে পরিহাস করবেন না।

বনমালা। কি বুদ্ধি, মাগো! হুজুর বার বার বলছেন, তবু চীৎকার করছে!

ম্যাজিস্ট্রেট। তবু যে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

অনঙ্গমোহন। অনুমতি দিন, শীঘ্র অনুমতি দিন। আমি যদি হতাশ হয়ে আত্মহত্যা ক'রে ফেলি, তবে তার জন্যে আপনি দায়ী হবেন, এ কথা নিশ্চিত জানবেন।

ম্যাজিস্ট্রেট। ভগবান! আমি কি বলছি জানি না, কি করছি জানি না।

হুজুর, রাগ করবেন না। হুজুরের যা ইচ্ছে, তাই হবে। উঃ, মাথাটার ভেতরে সব ওলটপালট হয়ে গিয়েছে! হায় হায়! আমার কি হ'ল গো?

বনমালা। নাও, অনেক হয়েছে, এবার ওঁদের আশীর্ব্বাদ কর।

(কমলা ও অনঙ্গমোহন ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গেল)

ম্যাজিস্ট্রেট। কিন্তু এ কি সত্যি? [চোখ রগড়াইয়া] নাঃ, এ যে কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না। কিন্তু সত্যিই তো ওরা হাতে হাতে ধ'রে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। সত্যিই তো ওরা আমাদের প্রণাম করছে।...হুর্‌রা—হুর্‌রা! মার দিয়া! কেল্লাফতে! [লাফাইতে লাগিল]

(মুকুন্দর প্রবেশ)

মুকুন্দ। হুজুর, গাড়ি প্রস্তুত।

অনঙ্গমোহন। আচ্ছা, যাও, আমি আসছি।

ম্যাজিস্ট্রেট। হুজুর, চললেন?

অনঙ্গমোহন। হ্যাঁ।

ম্যাজিস্ট্রেট। কিন্তু হুজুর যেন একটা বিবাহের আভাস দিয়েছিলেন?

অনঙ্গমোহন। শুধু একদিনের জন্যে যাচ্ছি। আমার এক বুড়ো মাতুল আছেন, লোকটা খুব ধনী, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। কালই ফিরব।

ম্যাজিস্ট্রেট। তবে আর হুজুরকে বাধা দেব না।

অনঙ্গমোহন। না, আমার দেরি হবে না। বিদায় কমলে...অহো-হো! ভাষায় আমার মনোভাব প্রকাশ করতে পারছি না।

ম্যাজিস্ট্রেট। হুজুরের পথের জন্যে কোন কিছুর যদি প্রয়োজন থাকে...টাকা-পয়সা যথেষ্ট আছে তো?

অনঙ্গমোহন। এক রকম আছে।

ম্যাজিস্ট্রেট। এক রকমের কাজ নয়। কত দরকার বলুন?

অনঙ্গমোহন। আপনি আমাকে দুশো দিয়েছিলেন, তার মানে চারশো, আমি গুণে দেখেছি। আপনাকে ঠকাতে চাই না। আর চারশো দিন—তা হ'লেই পুরো আটশো হবে।

ম্যাজিস্ট্রেট। নিশ্চয়। [টাকা বাহির করিয়া] সৌভাগ্যবশত ঠিক চারশোই আছে।

অনঙ্গমোহন। খুব কৃতজ্ঞ হলাম। [টাকা গ্রহণ]

ম্যাজিস্ট্রেট। সে কি কথা হুজুর!

অনঙ্গমোহন। আচ্ছা, আসি। আপনার আতিথেয়তা ভোলবার নয়। [বনমালার প্রতি] আপনার স্নেহ চিরকাল মনে থাকবে। [কমলার প্রতি] তোমাকে বলবার মত ভাষা এখনও সৃষ্টি হয় নি···অহো-হো!

(বাহিরে ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানের শব্দ)

মুকুন্দ। কোচম্যান ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে হুজুর।

ম্যাজিস্ট্রেট। আপনি কি ভাড়াটে গাড়িতে যাচ্ছেন?

অনঙ্গমোহন। আমি তো ছদ্মবেশে বেরিয়েছি, কাজেই এ ছাড়া উপায় কি?

ম্যাজিস্ট্রেট। তা বটে।

(কোচম্যানের শব্দ)

বনমালা। তবে গাড়িতে পাতবার জন্যে একখানা কম্বল নিয়ে যান।

ম্যাজিস্ট্রেট। ঠিক ঠিক। বিলিতী কম্বলখানা দাও। না না, সেই পারশিয়ান 'রাগ'খানা—নীল রঙের।

(কোচম্যানের শব্দ)

ম্যাজিস্ট্রেট। হুজুরকে কবে আশা করব?

অনঙ্গমোহন। কাল কিংবা বড় জোর পরশু।

(একজন চাকর 'রাগ'খানা আনিয়া মুকুন্দকে দিল। সে তাহা লইয়া বাহির হইয়া গেল)

(কোচম্যানের শব্দ)

অনঙ্গমোহন। [ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতি] আসি। [বনমালার প্রতি] আসি।

ম্যাজিস্ট্রেট ও বনমালা। বিদায়।

অনঙ্গমোহন। বিদায় কমলে! অহো-হো! [চোখে রুমাল দিল]

(কমলা কাঁদিতে লাগিল। অনঙ্গমোহনের প্রস্থান। বাহিরে গাড়ি ছাড়িবার শব্দ)

পঞ্চম অঙ্ক

ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলো

(পূর্ব্বোক্ত কক্ষ। ম্যাজিষ্ট্রেট, বনমালা ও কমলা)

ম্যাজিস্ট্রেট। বনমালা, দেখ, পুরুষস্য ভাগ্যং কাকে বলে! এ রকমটি নিশ্চয়ই তুমি কখনও আশা কর নি! ছিলে ম্যাজিস্ট্রেটের পত্নী, এবারে হ'তে চললে···নাঃ, এ কল্পনাতীত!

বনমালা। মোটেই কল্পনাতীত নয়। আমি জানতাম, এ রকম হবেই। তোমার কাছে অসম্ভব মনে হচ্ছে, তার কারণ, চিরটা কাল মফস্বলে জংলী ভূতদের মধ্যে কাটালে, কখনও অ্যারিস্টক্র্যাটদের সঙ্গে মেশ নি তাই।

ম্যাজিস্ট্রেট। অ্যারিস্টক্র্যাট! আরে, আমি নিজেই তো একজন অ্যারিস্টক্র্যাট। মফস্বলে থাকি ব'লে কি অ্যারিস্টক্র্যাট নই? জঙ্গলে কি বিশাল শাল্মলী তরু থাকে না? কিন্তু ওসব কথা যাকগে। এখন একবার আমাদের ভবিষ্যৎটা চিন্তা ক'রে দেখ। এক লাফে গাছের তলা থেকে গাছের আগডালে গিয়ে চড়লাম। এইবার দেখ না, শহরের বদমাইশগুলোর কি অবস্থা করি। [একজন পুলিসের প্রবেশ] কে? চন্দন সিং? দোকানদারদের একবার নিয়ে এস তো, বাছাধনদের একবার দেখে নিচ্ছি। যারা আমার নামে নালিশ করতে এসেছিল, তাদের নামের তালিকা আমি চাই। আর সবচেয়ে বেশি ক'রে চাই—ওই কি যে বলে ওদের?—সেই লেখক-গুলোকে, যারা দরখাস্ত পিছু চার আনা নিয়ে দরখাস্ত লিখে দেয়। ওদের গিয়ে বল যে, ম্যাজিস্টেটের মেয়ের বিয়ে, যে-সে লোকের সঙ্গে নয়, না সে দোকানদার, না সে সাহিত্যিক। বাবা, তার জুড়ি খুঁজে পাওয়া ভার! সে সকলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। বুঝলে, শহরের সব লোক যেন আজই জানতে পায়, এখনই জানতে পায়। যাও, থানার যত পুলিস শহরের মধ্যে বেরিয়ে পড়ুক—এক-একজন এক-এক দিকে যাক। না না, প্রত্যেক দিকে দুজন ক'রে যাক। গভর্মেণ্ট-বিল্ডিংগুলোর ওপরে নিশান উড়িয়ে দাও। দোকানদাররা যদি ভাল চায়, তবে বাড়িতে বাতি দেবার ব্যবস্থা করুক। যাও, শিগগির যাও। [চন্দন সিংএর প্রস্থান] আচ্ছা, বনমালা, আমরা এর পরে কোথায় থাকব, এখানে, না কলকাতায়? তোমার কি ইচ্ছে, শুনি?

বনমালা। অবশ্যই কলকাতায়। এর পরে এখানে থাকা অসম্ভব।

ম্যাজিস্টেট। অবশ্যই কলকাতায়। বালিগঞ্জ অঞ্চলে। চমৎকার!

বনমালা। বালিগঞ্জে? বালিগঞ্জে তো চাকরেরা থাকে। আলিপুরে থাকতে হবে, ওখানেই তো অ্যারিস্টক্র্যাটদের 'অরিজিন্যাল হোম', আদিম নিবাস।

ম্যাজিস্টেট। একজ্যাক্টলি! যেমন এরিয়ানদের আদি নিবাস মধ্য-এশিয়ায়।

বনমালা। তুমি কখনও অ্যারিস্টক্র্যাটদের সঙ্গে মেশ নি, তাই বালিগঞ্জের চেয়ে বেশি ভাবতে পার না।

ম্যাজিস্ট্রেট। এর পরে আর ম্যাজিস্ট্রেট থাকা চলে না, কি বল ?

বনমালা। অবশ্যই না। তুমি কি ভাব ম্যাজিস্ট্রেটি একটা মস্ত কিছু ?

ম্যাজিস্ট্রেট। নিশ্চয়ই নয়। তোমার জামাইয়ের যখন মন্ত্রীদের সঙ্গে এত বন্ধুত্ব, গভর্মেণ্ট-হাউসে ঘন ঘন যাতায়াত, ইচ্ছে করলে নিশ্চয় আমাকে একটা জেনারেল ক'রে দিতে পারে! তোমার কি মনে হয় ?

বনমালা। নিশ্চয়ই পারে। এ আর বেশি কি ?

ম্যাজিস্ট্রেট। চমৎকার! চমৎকার! জেনারেল! বুকের ওপরে এক সার পদক! চমৎকার! আচ্ছা, কোন্ রঙের ফিতে তোমার পছন্দ ? লাল, না নীল ?

বনমালা। অবশ্যই নীল। লাল হচ্ছে গিয়ে অ্যারিস্টক্র্যাটদের রঙ।

ম্যাজিস্ট্রেট। তোমার যখন পছন্দ তো তাই হবে। কিন্তু লালও মন্দ নয়। জেনারেল হওয়ার মত সুখ কি আর আছে ? বড় বড় ঘোড়া, ঝলমলে ইউনিফর্ম, চকচকে মেডেল, চারদিকে আরদালী, সেপাই ; আর সত্যিকারের যুদ্ধে কখনও যেতে হবে না, এই পরম আশ্বাস। যখন গভর্নরের সঙ্গে ব'সে খানা খাচ্ছি, ম্যাজিস্ট্রেটরা দূরে হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবে। হাঃ হাঃ হাঃ! চমৎকার!

বনমালা। তোমার রুচি নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে রকমের। হবেই বা না কেন ? চিরটা কাল কাটালে জংলী ভূতদের মধ্যে। মনে রেখো, এখন থেকে তোমার স্বভাব সহবৎ সব বদলাতে হবে। যারা এখন তোমার বন্ধু হবে, তারা এখ'নকার জজ আর পোস্টমাস্টার নয়, তারা সব মন্ত্রী, রাজা, মহারাজা। আমার রীতিমত ভয় আছে, তোমার কথাবার্তা শুনে সবাই হাসবে, বুঝবে, তুমি একটি আস্ত জংলী ভূত।

ম্যাজিস্ট্রেট। কথায় কি ক্ষতি ?

বনমালা। অবাক করলে! কথায় কি ক্ষতি ? কথাতেই তো অ্যারিস্টক্র্যাট বোঝা যায়। কথা ছাড়া অ্যারিস্টক্র্যাটদের আর কি আছে ?

ম্যাজিস্ট্রেট। শুনেছি, কলকাতায় দু রকম মাছ আছে—মাছের অ্যারিস্টক্র্যাট —ভেটকি আর তপসে। নাম শুনেই জিবে জল আসে।

বনমালা। ওই তো! ঠিক এই ভয়ই করছিলাম। মাছের চেয়ে বেশি আর কিছু ভাবতে পার না? আমি তোমাকে ব'লে রাখছি; কলকাতায় আমাদের বাড়িটাকে কাল্‌চারের কেন্দ্র ক'রে তুলতে হবে। ড্রয়িং-রুমে রাখতে হবে যামিনী রায়ের ছবি, পুরনো ভাঙা সব পাথরের মূর্ত্তি; আর সমস্ত ঘরটাতে এমন সুগন্ধ ছড়িয়ে রাখতে হবে, যাতে কোন লোক ঢোকবামাত্র আবেশে আপনি তার চোখ বুজে আসবে। [ভাবাবেশে চোখ বন্ধ করিয়া দেখাইল] আঃ, কি সুগন্ধ!

(দোকানদারদের প্রবেশ)

ম্যাজিস্ট্রেট। এই যে বাছাধনেরা! কেমন আছ সব?

দোকানদারগণ। [অভিবাদন করিয়া] আশা করি, হুজুর ভাল আছেন।

ম্যাজিস্ট্রেট। বটে! হুজুর! কাল আমার নামে নালিশ করবার জন্যে আসা হয়েছিল! কি লাভ হ'ল? পেঁয়াজ-বেচা, রসুন-চোর, পোস্তখোর, ডাঁটা-গিলে গোবর-গণেশের দল! ভেবেছিলে, আমাকে জেলে পুরবে? কি লাভটা হ'ল, শুনি?

বনমালা। আঃ, তোমার কথাবার্ত্তা নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে রকমের।

ম্যাজিস্ট্রেট। এখন আর কথাবার্ত্তায় কি আসে যায়? কাল যে অফিসারের কাছে তোমরা নালিশ করতে এসেছিলে, তিনি আমার মেয়েকে বিয়ে করছেন, শুনেছ? এইবার কি করবে, শুনি? এখন কি বলবার আছে? তোমরা শহরের লোকদের ঠকাও। তোমরা গভর্মেণ্ট-কন্‌ট্রাক্ট নাও, লাখ লাখ টাকা চুরি কর রদ্দি কাপড় আর পচা আটা চালিয়ে। আমাকে কুড়ি গজ কাপড় দিয়ে ভাবছ, রেহাই পাবে? তোমাদের আর কেউ ছুঁতে পারবে না, না? গোবর-গাদার ওপরে মোরগগুলোর মত বুক ফুলিয়ে তোমরা বেড়াও কিসের সাহসে? তোমরা প্রকাশ্যে ব'লে বেড়াও, তোমরাও ভদ্রলোক। দোকানদার আবার ভদ্রলোক? ভদ্রলোকে যদি ঠকায়, তার একটা মহদুদ্দেশ্য আছে। ভদ্রতা-শিক্ষা সমাজের লক্ষ্য। তোমাদের জীবনের কি উদ্দেশ্য শুনি? ভদ্রলোকের ছেলে বিজ্ঞান শেখে, সেজন্যে ইস্কুলে মার খায়; মার না খেলে ভবিষ্যতে সে বৈজ্ঞানিক হতে পারে না। তোমরা কি কর? ছেলেবেলায় খদ্দের ঠকিয়ে তোমরা জীবন আরম্ভ কর। ভাল ক'রে ঠকাতে না পারলে মনিব তোমাদের ধ'রে ঠেঙায়।

ছেলেবেলায় নামতা শেখবার আগেই তোমরা মাপে ঠকাতে শুরু কর। এই রকম ঠেঙানি খেতে খেতে পাকা ঠক হয়ে উঠলে তোমরা বুক ফুলিয়ে বেড়াও। যাও যাও, ওতে যারা ভোলে ভুলুক, আমাকে সে দলের পাও নি।

দোকানদারগণ। হুজুর, আমাদের বড় অন্যায় হয়ে গিয়েছে।

ম্যাজিস্ট্রেট। আর তোমরা নালিশ করতে চাও! শহরের নতুন সাঁকোটা তৈরি করবার সময়ে যখন হাজার টাকা খরচ ক'রে বিশ হাজার টাকার চেক বের ক'রে নিলে, তখন তোমাদের কে সাহায্য করেছিল? আমিই না? আজ সেই আমার বিরুদ্ধে তোমরা নালিশ করতে চাও! এসব কথা ফাঁস ক'রে দিলে এত দিনে তোমরা থাকতে কোথায়? আন্দামানে, জান? বল, কি বলবার আছে?

দোকানদারগণ। হুজুর, আমাদেরই সব দোষ। আমাদের মাথায় দুষ্ট সরস্বতী ভর করেছিল, তাই ওই বুদ্ধি হয়েছিল। কি চাই, হুকুম করুন। কেবল রাগ ক'রে থাকবেন না।

ম্যাজিস্ট্রেট। রাগ ক'রে থাকবেন না! এখন এসে পায়ে পড়েছ কেন, শুনি? আমি জিতে গিয়েছি ব'লেই তো।

দোকানদারগণ। [নত হইয়া] আমাদের সর্ব্বনাশ করবেন না, হুজুর।

ম্যাজিস্ট্রেট। এখন সর্ব্বনাশ করবেন না, কিন্তু তখন কি বলেছিলে? আমি তোমাদের সকলকে…যাক, ভগবান তোমাদের বিচার করবেন। আমি তোমাদের এবারের মত ক্ষমা করলাম। যথেষ্ট হয়েছে। প্রতিহিংসা নেওয়া আমার স্বভাব নয়। আমার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে, যার তার সঙ্গে নয়; সে উপলক্ষ্যে তোমাদের উপহারগুলো দেখে শুনে দিও। পচা আটা, ভেজাল ঘি আর রদ্দি ছিট দিয়ে সেরো না। এখন যাও।

(দোকানদারদের প্রস্থান)

(জজ ও দাতব্য-কর্ত্তার প্রবেশ)

জজ ও দাতব্য-কর্ত্তা। কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স।

জজ। রায়.বাহাদুর, আপনার এই সৌভাগ্যে আমরা আনন্দিত।

দাতব্য-কর্ত্তা। মিসেস সরস্বতী, আমি যে কতদূর খুশি হয়েছি, তা প্রকাশ করবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আয়ুষ্মতী হও মা কমলা।

(রঘুনাথবাবু, লাবণ্যবাবু ও সপত্নীক কামিনীবাবুর প্রবেশ। ইঁহারা তিনজনেই পেন্সনপ্রাপ্ত গভর্মেণ্ট-অফিসার)

রঘুনাথবাবু। রায় বাহাদুর, কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স। দীর্ঘজীবী হোন আপনারা। নবদম্পতি দীর্ঘজীবন লাভ করুক। পৌত্র-প্রপৌত্রাদিতে আপনারা চিরদিন পরিবেষ্টিত হয়ে বিরাজ করুন।

কামিনীবাবু। আজ কি আনন্দের দিন!

কুমুদিনী [কামিনীবাবুর পত্নী]। সত্যি মিসেস সরস্বতী—এ রকম সৌভাগ্য আপনার হবেই, তা আমরা সবাই জানতাম। কতদিন এ নিয়ে আলোচনা করেছি।

লাবণ্যবাবু। কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স। বেঁচে থাক মা কমলা।

(অবশেষে ঘনরাম ও বলরামের হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ)

বলরাম ও ঘনরাম। কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স।

বলরাম। এই শুভদিনে···

ঘনরাম। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে··

বলরাম। নবদম্পতিকে···

ঘনরাম। আশীর্ব্বাদ···

ঘনরাম ও বলরাম। করছি। কমলা, দীর্ঘজীবী হও।

ঘনরাম। মা কমলা, সোনার পালঙ্কে ব'সে, সোনার শাড়ি প'রে চিরকাল বিরাজ কর।

বলরাম। আর তোমার সোনার টুকরো ছেলে কোলে আসুক। আহা, আমি এখনই কল্পনা করতে পারছি, কি রকম ক'রে সে কাঁদবে। [কাঁদিয়া দেখাইল]

(সপত্নী হেডমাষ্টারের প্রবেশ)

হেডমাস্টার। আপনাদের সৌভাগ্য চিরস্থায়ী হোক।

হেডমাস্টারের পত্নী। মিসেস সরস্বতী, আজ বড় আনন্দের দিন। এই সংবাদ শুনেই আমি ওঁকে বললাম—ওগো, খবর শুনেছ? চল, একবার শিগগির গিয়ে দেখা ক'রে আসি। তার উত্তরে উনি বললেন—কোন রকমে পাস হয়েছে। কোন রকমে কি গো মা? এ রকমটি যে ভূ-ভারতে আর হয় নি, কোন রকমে কি গো? শেষে দেখি, উনি পরীক্ষার খাতার মধ্যে

ডুবে রয়েছেন। খাতাপত্র টেনে ফেলে দিয়ে ওঁকে ধ'রে নিয়ে এসেছি। কি বলব মা কমলা, এই সংবাদ শোনবামাত্র আমার চোখে জল, ওঁর চোখে জল, খেন্তি, পটল, নাদু সকলের চোখে জল। সমস্ত বাড়ি জলে জলময় গো।

ম্যাজিস্ট্রেট। আপনারা সব বসুন। ঝগড়ু, খান কতক চেয়ার নিয়ে আয়।

(পুলিস সুপার ও পুলিসের প্রবেশ)

পুলিস সুপার। সার্, আপনার এই সৌভাগ্যের জন্যে অভিনন্দন করছি।

ম্যাজিস্ট্রেট। ধন্যবাদ। বসুন। [সকলে বসিল]

জজ। রায় বাহাদুর, এইবারে বলুন তো, কি ক'রে কি ঘটল ?

ম্যাজিস্ট্রেট। সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! হিজ একসেলেন্সি স্বয়ং প্রস্তাব করলেন।

বনমালা। অতি নম্র আর বিনীত ভাবে। কি সুন্দর ভাষা! আমাকে উদ্দেশ ক'রে বললেন—আপনার গুণে মুগ্ধ হয়ে এই প্রস্তাব করছি। যেমন শিক্ষা, তেমনই সহবৎ। বললেন—জীবনের কি মূল্য দেবী? আপনার গুণে আমি অভিভূত হয়েছি।

কমলা। মা গো, ওসব কথা তো আমাকে বলেছিলেন।

বনমালা। চুপ কর। সব কথাতেই তর্ক! বললেন—আমি বিস্মিত হয়েছি! এমন ক'রে লোকে বলতেও পারে! আমি বললাম, এ সৌভাগ্য কল্পনা করবার সাহস পর্য্যন্ত আমাদের নেই। অমনই তিনি নতজানু হয়ে ব'লে উঠলেন, দেবী, আমার জীবন ব্যর্থ ক'রে দেবেন না। আমার প্রেমের প্রতিদান দিন, নতুবা আত্মহত্যা ক'রে শান্তি লাভ করব।

কমলা। মা, ওসব কথা আমার উদ্দেশে বলা।

বনমালা। তোমার উদ্দেশেই বটে, কিন্তু বলেছিলেন আমাকে।

ম্যাজিস্ট্রেট। রীতিমত ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন। হঠাৎ ব'লে উঠলেন—গুলি করব, গুলি করব।

ঘনরাম ও বলরাম। শ্বশুর-শাশুড়ীকে ? কি সর্ব্বনাশ!

ম্যাজিস্ট্রেট। না না, নিজেকে।

জজ। কি আশ্চর্য্য!

হেডমাস্টার। সবই অদৃষ্টের হাত!

দাতব্য-কর্ত্তা। অদৃষ্টের হাত নেই হেডমাস্টার মশায়, এ হচ্ছে গিয়ে পুণ্যের পুরস্কার। [স্বগত] যত সৌভাগ্য এই নরাধমগুলোরই হয় দেখছি !

জজ। সেই কুকুরের বাচ্চাটা আপনাকে দিয়ে যাব।

ম্যাজিস্ট্রেট। এখন কুকুরের বাচ্চার বিষয়ে ভাববার সময় আমার নেই।

জজ। আচ্ছা, ওটা না নেন, সেই বড়টা নিতে পারেন।

কামিনী। এখন হিজ একসেলেন্সি কোথায় ? শুনলাম, হঠাৎ কি কারণে যেন তিনি কোথায় গিয়েছেন।

ম্যাজিস্ট্রেট। জরুরি কাজে একদিনের জন্যে গিয়েছেন।

বনমালা। তাঁর মাতুলের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষার জন্যে।

ম্যাজিস্ট্রেট। গিয়েছেন বটে, কিন্তু আগামী কালই…[হাঁচি]

সকলে সমস্বরে। জীব সহস্র।

ম্যাজিস্ট্রেট। ধন্যবাদ। আগামী কালই ফিরবেন। [হাঁচি]

সকলে সমস্বরে। জীব সহস্র।

বনমালা। আমরা শীঘ্রই কলকাতায় উঠে যাচ্ছি। এ রকম পাড়াগাঁয়ে বাস করা কঠিন। সেখানে ওঁকে জেনারেল ক'রে দেবে।

ম্যাজিস্ট্রেট। সত্যি, জেনারেল হ'লে তবে আমার যোগ্য চাকরি হয়।

হেডমাস্টার। তা আপনি হবেন।

রঘুনাথবাবু। ভগবান এখন আপনার মুরুব্বি, কিছুই অসম্ভব নয়।

জজ। বড় জাহাজেই বেশি জল লাগে।

দাতব্য-কর্ত্তা। এ আপনার যোগ্য সম্মান।

জজ। [স্বগত] জেনারেল হ'লেই প্রহসন সম্পূর্ণ হয়। গরুর পিঠে লাগাম ক'ষে উঠলে ঠিক মানায়। যাক, কর্ত্তার নেমন্তন্ন, না আঁচানো পর্য্যন্ত বিশ্বাস নেই।

দাতব্য-কর্ত্তা। [স্বগত] সব মাটি করলে ! আরও কত কি দেখতে হবে ! অযোগ্য লোকেই বড় পদ পায়। হতেও বা পারে জেনারেল। [প্রকাশ্যে] আমাদের যেন ভুলবেন না রায় বাহাদুর।

জজ। আমাদের দরকারের সময়ে যেন সাহায্য পাই।

কামিনী। আগামী বছরে আমার বড় ছেলেটিকে চাকরির খোঁজে কলকাতা

নিয়ে যাব। আমাকে একটু অনুগ্রহ করতে হবে, এখন থেকেই ব'লে রাখছি।

ম্যাজিস্ট্রেট। আমার দিক থেকে কোন ত্রুটি হবে না।

বনমালা। তুমি তো সকলকেই ভরসা দিচ্ছ। কিন্তু এসব কথা ভাববার সময়ও তোমার হবে না। আর এসব দায় বইতেই বা যাবে কেন?

ম্যাজিস্ট্রেট। বইব না কেন? পুরনো বন্ধুদের কাজ কি করতে নেই?

বনমালা। নিশ্চয়ই করতে আছে। কিন্তু এসব ছোটখাটো লোকদের কাজ করলে বড়লোকদের কাজ করবার সময় পাবে কি ক'রে?

কুমুদিনী। [স্বগত] ও মাগী চিরদিনই ওই রকম। ছোটর সৌভাগ্য হ'লে এমনিই হয় বটে।

বনমালা। আমাদের এই সৌভাগ্যে সবাই আনন্দিত। কেবল ঘরের শাঁকচুন্নি মুখ ভার ক'রে কোথায় গিয়ে ব'সে আছে।

হেডমাস্টারের পত্নী। কে গো?

বনমালা। ওই যে সাধ ক'রে নাম রাখা হয়েছে রমলা! রমলা, না 'কানমলা'।

(কমলা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল)

কমলা। দিদি কি ছেনালিই না আরম্ভ করেছিল। উনি যত তাড়াতে যান, তত যেন জড়িয়ে ধরে।

বনমালা। সত্যি, মাগো! আমি যেতেই আমাকে বললেন, আপনার রূপে গুণে মুগ্ধ হয়ে—

কমলা। ও কথা তো আমাকে বললেন মা।

বনমালা। ফের তর্ক!

(হেনকালে পোষ্টমাষ্টার ব্যস্তসমস্তভাবে প্রবেশ করিল, তাহার হাতে একখানা চিঠি)

পোস্টমাস্টার। অদ্ভুত ঘটনা! আশ্চর্য্য সংবাদ! যাকে আমরা গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টর ব'লে মনে করেছিলাম, সে মোটেই গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টর নয়।

সকলে। কি? ইন্সপেক্টর নয়?

পোস্টমাস্টার। মোটেই নয়, আদৌ নয়। একখানা চিঠি থেকে আমি আবিষ্কার করেছি।

ম্যাজিস্ট্রেট। কি সর্ব্বনাশ! কার চিঠি?

পোস্টমাস্টার। আমি ডাকঘরে ব'সে আছি। মেলব্যাগ বাঁধা হচ্ছে—এখনই সীল করা হবে। এমন সময়ে আপনার বাড়ির চাকর দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে বললে, একখানা চিঠি আছে। আমি বললাম, আজ আর হবে না। সে বললে, সে হবে নি, স্বয়ং হুজুরের চিঠি, খুব জরুরি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোন্ হুজুর? বললে, হুজুর আবার কে? কলকাতার হুজুর। আজই যাওয়া চাই। আমি বললাম, দাও। ব্যাগে ভরতে যাব, হঠাৎ কি ভেবে খুলে ফেললাম।

ম্যাজিস্ট্রেট। কি ভরসায় খুললেন? সর্ব্বনাশ!

পোস্টমাস্টার। জানি না কিসের ভরসায়। মনে হ'ল, কোন দৈবশক্তি যেন আমাকে ভরসা দিলে। ঠিকানা দেখি, পরশুরাম, বকুল বাগান, কলিকাতা। মনে মনে ভাবলাম, বাবা, আমার সঙ্গে চালাকি! আমি ত্রিশ বছর এই কাজ করছি। বেশ বুঝতে পারলাম, এ নাম হচ্ছে গিয়ে ছদ্মনাম। নিজেও যেমন ছদ্মবেশে এসেছে, তেমনই ছদ্মনামে চিঠি পাঠানো হচ্ছে। কার হাতে গিয়ে পৌছবে, কে জানে? হয়তো খোদ গভর্নরের হাতে। একবার দেখা দরকার—কি লিখল, পোস্টাফিসের কোন গলদের কথা আছে কি না! কি বলব, মশায়, কত চিঠিই তো রোজ খুলি, কিন্তু এ তো চিঠি নয়, যেন জলন্ত অঙ্গার। হাত যেন পুড়ে যায়। এক কানে কে যেন বলতে লাগল, সাবধান, খুলো না! আর এক কানে কে যেন বললে, খোল, খোল, কোন ভয় নেই। গা কাঁপতে লাগল, কপালে কাল-ঘাম দেখা দিলে। কেমন ক'রে যে খুলে ফেললাম, তা নিজেই জানি না।

ম্যাজিস্ট্রেট। কি সাহস আপনার! এতবড় অফিসারের চিঠি খুলে ফেললেন!

পোস্টমাস্টার। সেই তো রহস্য। লোকটা মোটেই অফিসার নয়।

ম্যাজিস্ট্রেট। তা হ'লে আপনার মতে উনি কি, তাই শুনি?

পোস্টমাস্টার। কেউ নয়, কিচ্ছু নয়।

ম্যাজিস্ট্রেট। [রাগিয়া] 'কেউ নয়, কিচ্ছু নয়' ব'লে আপনি কি বোঝাতে চান? আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করতে পারি, জানেন?

পোস্টমাস্টার। কে? আপনি? সে আপনার সাধ্য নয়।

ম্যাজিস্ট্রেট। কেন নয়? জানেন, উনি আমার মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন?

শীঘ্রই আমি কলকাতায় গিয়ে মস্ত অফিসার হব? আপনাকে ধ'রে আমি আন্দামানে পাঠাতে পারি?

পোস্টমাস্টার। আন্দামানের কথা এখন রাখুন, বরঞ্চ চিঠিখানা প'ড়ে শোনাই। কি, পড়ব তো?

সকলে। পড়ুন, পড়ুন।

পোস্টমাস্টার। [পাঠ] প্রিয় পরশুরাম, এই চিঠিতে এক অভিনব সংবাদ তোমাকে পাঠাচ্ছি। কলকাতা থেকে রওনা হবার পরে নৈহাটিতে একবার নামি। সেখানে তাস খেলায় হেরে টাকা-পয়সা যা ছিল সব গেল। কোন রকমে দিনাজসাহীতে এসে এক হোটেলে উঠলাম। এমন অবস্থা হ'ল যে, হোটেলের বিল শোধ করতে পারি না, হোটেলওয়ালা জেলে দেয় আর কি! এমন সময়ে আমার কলকাতার পোশাক এক আশ্চর্য্য ভাগ্য-পরিবর্ত্তন ক'রে দিলে। এখানকার লোকেরা হঠাৎ আমাকে এক মস্ত গভর্মেণ্ট অফিসার ব'লে মনে করলে। তারপরে আর কি? এখন আমি ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোয় তোফা আরামে আছি, আর তার স্ত্রী ও মেয়ে দুটির সঙ্গে দিবারাত্রি প্রেম করছি।…কাকে দিয়ে যে আরম্ভ করব, জানি না। আচ্ছা, ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রীকে দিয়েই আরম্ভ করা যাক। সে এক নম্বরের ছেনাল, যা খুশি ওকে দিয়ে তাই করানো যায়। সেই সেদিনকার কথা মনে আছে, যখন এক হোটেলে খেতে গিয়ে দেখি, পয়সা নেই? হোটেলওয়ালা গলা-ধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দিলে? এখন আমার অবস্থা সম্পূর্ণ অন্য রকম, সবাই টাকা ধার দিচ্ছে। এরা সব অদ্ভুত জীব, তুমি দেখলে হাসতে হাসতে মরতে। তুমি তো হাসির গল্প লেখ। এদের কাহিনী নিয়ে একটা কিছু লেখ না। মাইরি, সে বেশ হবে! প্রথমেই ম্যাজিস্ট্রেটকে ধরা যাক। সে একটি নিরেট গর্দ্দভ…

ম্যাজিস্ট্রেট। এ হতেই পারে না। নিশ্চয় এ কথা নেই

পোস্টমাস্টার। [চিঠি দেখাইয়া] নিজেই প'ড়ে দেখুন।

ম্যাজিস্ট্রেট। [পড়িয়া] একটি নিরেট গর্দ্দভ। হতেই পারে না, এ কথা আপনি বসিয়ে দিয়েছেন।

পোস্টমাস্টার। আমার প্রয়োজন কি?

দাতব্য-কর্ত্তা। পড়ুন, পড়ুন।

হেডমাস্টার। তার পরে কি ?

পোস্টমাস্টার। [পাঠ] ম্যাজিস্ট্রেট একটি নিরেট গর্দ্দভ।

ম্যাজিস্ট্রেট। থাক থাক। ফিরে ফিরে পড়তে হবে না। আমরা সবাই জানি, কি লেখা আছে।

পোস্টমাস্টার। [পাঠ] এই যে···এই যে···নিরেট গর্দ্দভ। পোস্টমাস্টারটি মন্দ নয়। [থামিয়া] আমার সম্বন্ধেও খানিকটা অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করেছে।

ম্যাজিস্ট্রেট। থামলে চলবে না, পড়ুন।

পোস্টমাস্টার। কি দরকার ?

ম্যাজিস্ট্রেট। পড়ছেন যখন সবটা পড়তে হবে।

দাতব্য-কর্ত্তা। আচ্ছা, আমাকে দিন, আমি পড়ছি। [চশমা পরিয়া পাঠ] এখানকার পোস্টমাস্টারটির চেহারা ঠিক তোমার অফিসের দরোয়ানজীর মত। তার ওপরে লোকটা আবার পাঁড় মাতাল।

পোস্টমাস্টার। লোকটাকে আচ্ছা ক'রে চাবুক মারা দরকার।

দাতব্য-কর্ত্তা। [পাঠ] আর দাতব্য-প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তা···কর্ত্তা···ইয়ে, ইয়ে—

কামিনীবাবু। থামলেন কেন ?

দাতব্য-কর্ত্তা। হাতের লেখা অস্পষ্ট। লোকটা যে বদমাইশ, তাতে আর সন্দেহ নেই।

কামিনীবাবু। আমাকে দিন, আমার চোখ ভাল আছে। [চিঠিখানা লইল]

দাতব্য-কর্ত্তা। ওটুকু বাদ দিলেই হয়। পরের লেখাগুলো বেশ স্পষ্ট।

কামিনীবাবু। ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? আমি সবটাই পড়তে পারব।

পোস্টমাস্টার। না না, সবটা পড়তে হবে।

সকলে। কামিনীবাবু, পড়ুন।

দাতব্য-কর্ত্তা। আচ্ছা, তবে এখান থেকে পড়ুন। ওপরের ওটুকু থাক।

পোস্টমাস্টার। না না, কোন অংশ বাদ দিলে চলবে না। সবটুকু পড়ুন।

কামিনীবাবু। [পাঠ] এখানকার দাতব্য-প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তা আস্ত একটি টুপি-পরা ভোঁদড়।

দাতব্য-কর্ত্তা। এ কি রকম রসিকতা ! টুপি-পরা ভোঁদড়! ভোঁদড় আবার কবে টুপি পরে ?

কামিনীবাবু। [পাঠ] আর হেডমাস্টারটির সর্ব্বাঙ্গে রসুনের গন্ধ।

হেডমাস্টার। রসুনের গন্ধ! জীবনে আমি রসুন স্পর্শ করি নি।

জজ। [স্বগত] ভগবান্ রক্ষা করেছেন, আমার সম্বন্ধে কিছু নেই—

কামিনীবাবু। [পাঠ] এখানকার জজ…

জজ। এই মাটি করেছে! [জোরে] দীর্ঘ চিঠি অত্যন্ত বিরক্তিকর। এসব বাজে জিনিস প'ড়ে কেন মিছিমিছি সময় নষ্ট করা?

হেডমাস্টার। মোটেই বিরক্তিকর নয়।

পোস্টমাস্টার। পড়ুন, পড়ুন।

দাতব্য-কর্ত্তা। বাদ দেবেন না, সবটা পড়ুন।

কামিনীবাবু। [পাঠ] এখানকার জজ সাহেবটি একটি 'অজভুশ'।…ওটার মানে কি?

জজ। ভগবান্ জানেন, মানে কি! 'বদমাইশ' হ'তে পারে, কিম্বা হয়তো তার চেয়েও কিছু খারাপ।

কামিনীবাবু। [পাঠ] 'কিন্তু এরা সবাই ভালমানুষ, আর এদের মস্ত গুণ, এরা চাইবামাত্র টাকা ধার দেয়। ভাই পরশুরাম, আমি ঠিক করেছি, কেরানীগিরি ছেড়ে দিয়ে তোমার মত সাহিত্যিক হতে চেষ্টা করব। আজ আসি। আমাকে শিলিগুড়ির ঠিকানায় চিঠি দিও; গাঁয়ের নাম মনে আছে তো?—কদমকুঁড়ি।

একজন মহিলা। কি দুঃসংবাদ!

ম্যাজিস্ট্রেট। আমার সর্ব্বনাশ হ'ল। এর চেয়ে মৃত্যু ভাল। কোথায় গেল সে বেটা? গ্রেপ্তার ক'রে আন তাকে, গ্রেপ্তার ক'রে আন!

পোস্টমাস্টার। আর গ্রেপ্তার! এতক্ষণে সে পগার পার। আমি আবার বেছে বেছে তাকে শহরের সেরা ঘোড়া জুটো যোগাড় ক'রে দিয়েছিলাম।

কুমুদিনী। মাগো!—এ রকম ঘটনা কখনও শুনি নি।

জজ। ঘটনা! ঘটনা! এদিকে যে আমার কাছ থেকে তিনশো টাকা ধার নিয়েছিল।

দাতব্য-কর্ত্তা। আমার কাছ থেকেও তিনশো।

পোস্টাস্টার। আমিও তিনশো—

বলরাম। আমি আর ঘনরাম মিলে পঁয়ষট্টি টাকা দিয়েছিলাম।

জজ। কিন্তু এ কেমন ক'রে ঘটল? আমাদের পক্ষে এ রকম ভুল কেমন ক'রে সম্ভব হ'ল?

ম্যাজিস্ট্রেট। [কপাল চাপড়াইয়া] আমি এমন ভুল কি ক'রে করলাম! হায় হায়! আমাকে কি এখনই বাহাত্তুরে পেল? ত্রিশ বছর চাকরি করছি, কোন দোকানদার, কোন কন্‌ট্রাক্টার আমাকে ঠকাতে পারে নি। বড় বড় ঠক বদমাশ আমার কাছে কাত। তিন-তিনটে কমিশনারের চোখে ধুলো দিয়েছি...আর শেষে—

বনমালা। কিন্তু এ যে অসম্ভব। উনি যে কমলাকে বিয়ে করবেন বলেছেন।

ম্যাজিস্ট্রেট। [রাগিয়া] বিয়ে করবেন! বিয়ে করবেন! কোথাকার ধাপ্পাবাজ! [পাগলের মত] দেখ, দেখ, সকলে চেয়ে দেখ, এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট নির্ব্বোধ, বাহাত্তুরে, নিরেট গর্দ্দভ। [নিজের প্রতি] তোমার উচিত দণ্ড হয়েছে। এই রকম একটা ছোঁড়াকে গভর্ণেন্ট-অফিসার ব'লে কল্পনা করা! যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল। ওই ছোকরা যেখান দিয়ে যাবে, এই গল্প করতে করতে যাবে। তারপর হয়তো কোন কলম-বাজ নাট্যকার এই নিয়ে এক ফার্স লিখে ফেলবে। দেশ-বিদেশের লোক হাসবে। এই কলম-বাজ কালি-ছুঁড়নেওয়ালারা কাউকে খাতির করে না—না ধনীকে, না মানীকে। সবাই হাসবে আর হাততালি দেবে। [দর্শকের প্রতি] দাঁত বের ক'রে এত হাসি কিসের? নিজেদেরও এমন ঘটতে পারে। [মেঝেতে পা ঠুকিয়া] এই সাহিত্যিকদের একবার আমি দেখে নেব। দেখে নেব এই সরস্বতীর দিনমজুর-গুলোকে, দু আনা ক'রে পৃষ্ঠা লিখনে-ওয়ালাদের, ভদ্রলোকের গায়ে কালি-ছুঁড়নে-ওয়ালাগুলোকে। সবগুলোকে ঠেলে আমি যমের বাড়ি পাঠাব। এগুলো না থাকলে অপমানের কথা লোকে দুদিন বাদে ভুলে যেত! এগুলোই যত...এগুলোই যত...আবার হাসি! [মেঝেতে পা ঠুকিয়া, বক্ষে করাঘাত। কিছুক্ষণ পরে] নাঃ কিছুতেই এ অপমান ভুলতে পারছি না। এমন ভুল কেমন ক'রে হ'ল? ওই ছোঁড়াটার মধ্যে কি ছিল, যাতে তাকে গভর্ণেন্ট-ইন্সপেক্টর ব'লে মনে করলাম? হঠাৎ কি হ'ল, সকলেই 'ইন্সপেক্টর ইন্সপেক্টর' ব'লে রব তুললে? কে প্রথম এ রব তুললে? কে?

দাতব্য-কর্তা। বাস্তবিক, কেমন ক'রে সকলের যে একই ভুল হ'ল, তা বুঝতে পারছি না!

জজ। বাস্তবিক, প্রথমে কে রব তুললে? এই যে, এঁরাই প্রথমে এই সংবাদ এনেছিলেন। [ঘনরাম ও বলরাম বাবুকে দেখাইয়া]

বলরাম। কখ্খনও আমি নই।

ঘনরাম। আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানি না।

দাতব্য-কর্তা। আপনারাই প্রথমে এই রব তুলেছিলেন।

হেডমাস্টার। আমার বেশ মনে আছে, এঁরা দুজনেই প্রথমে ছুটতে ছুটতে এসে বললেন—তিনি এসেছেন, তিনি এসেছেন, হোটেলে আছেন, অথচ বিল শোধ করছেন না। খুব লোক চিনেছিলেন বটে!

ম্যাজিস্ট্রেট। ঠিক ঠিক, এঁদেরই কীর্তি। হতভাগা গুজবদার সব।

দাতব্য-কর্তা। গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টরের গল্পও এঁদের রটানো।

ম্যাজিস্ট্রেট। গুজব রটিয়ে বেড়ানো ছাড়া আর কোন কাজ নেই আপনাদের? আপনারা দুজনে শয়তানের ডুগি-তবলা।

জজ। কেচ্ছা-কাহিনীর ঝাড়ুদার।

হেডমাস্টার। জোড়া গাধা।

দাতব্য-কর্তা। টুপি-পরা জোড়া ভোঁদড়। [সকলে তাহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল]

বলরাম। সত্যি বলছি, আমি নই, ঘনরামবাবুই প্রথমে—

ঘনরাম। কি বলছ বলরাম? তুমিই তো প্রথমে—

বলরাম। তুমিই প্রথমে—

ঘনরাম। তুমিই—

(এমন সময়ে ইউনিফর্ম-পরা একজন আরদালী প্রবেশ করিল)

আরদালী। কলকাতা থেকে গভর্মেণ্টের হুকুম নিয়ে যে ইন্সপেক্টর এসে পৌঁছেছেন, তিনি আপনাদের সেলাম জানিয়েছেন। তিনি ডাকবাংলোতে আছেন।

(এই সংবাদে ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হইল। যে যেমন বসিয়া ছিল তেমনই রহিল, যেন সব পাথরে তৈয়ারি মূর্তি। এমন কি ভয় পাইবার শক্তিও যেন তাহাদের লোপ পাইয়াছে। ঠিক সেই সময়ে বিপরীত দ্বার দিয়া হাসিমুখে রমলার প্রবেশ। বনমালা ও কমলা এমনই পাথর হইয়া গিয়াছে যে, রমলার হাসিমুখ দেখিয়াও রাগিতে ভুলিয়া গেল। মিনিট-খানেক এই ভাবে পাষাণ-সংঘ থাকিবার পরে যবনিকা পড়িয়া গেল)

সমাপ্ত প্র. না. বি.

আগস্ট, ১৯৪২

মহাত্মাজী বললেন, শেষবারের মত বড়লাটের কাছে দূতিয়ালি করব। ব্যর্থ হ'লে অসহযোগের দরকার হবে হয়তো।

কিন্তু দরকার হয় নি কোন কিছুরই। কারাগারে তাঁরা নিস্তব্ধ। কংগ্রেস বে-আইনী।

পান্নালাল মুষড়ে গেছে। যেন কাণ্ডারীহীন নৌকায় ভেসে যাচ্ছে। উমাকে বলে, কি আর করব! খাই-দাই, খবরের কাগজ পড়ি, আর রাজা-উজির মারি লড়ায়ের ম্যাপ দেখে দেখে। খুশি তো এবার?

কিন্তু গোলমাল খবরের কাগজেও। আমেরি সাহেব সগৌরবে বলছেন, চিরকেলে বজ্জাত বাংলা দেশ কেমন ঠাণ্ডা এবারে দেখ!

অনন্ত মাস দুই জেল থেকে বেরিয়েছে। আগুন হয়ে সে বলে, অসহ্য!

চা পরিবেশন করতে এসে উমা দুজনের মাঝখানে দাঁড়াল। অনন্ত তবু বলতে লাগল, কি লজ্জার কথা দাদা! রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের দেশ—বাঘেরা নির্বংশ হ'ল নাকি?

পান্নালাল ঘাড় নেড়ে বলে, ঠিক তাই। সুন্দরবনে অতি-সুন্দর ধানের আবাদ হচ্ছে। যেখানে বাঘ ডাকত, চাষারা সেখানে লাঙল ঠেলে।

তাড়াতাড়ি উমা রেডিও খুলে দিলে। গানের গোলমালে এই সব বেয়াড়া কথার অবসান হোক। কিন্তু কপাল মন্দ, গান সে সময়টা নেই। রেডিওরও ওই এক খবর—সুশীল সুবাধ্য ভক্তিমান বাংলা দেশ। মিঃ আমেরি টিটকারি দিয়ে বলছেন—

অনন্ত উঠে এসে রেডিওর চাবি বন্ধ করলে।

অসহ্য দাদা, পাগল হয়ে যাবার দাখিল।

পান্নালাল সায় দিলে, ঠিক।

উমার প্রদীপ্ত চোখ দুটি অনন্তর মুখের উপর পড়ল। পান্নালাল বলে, এমনিতেই মানুষ এত কথা বলে যে টেঁকা মুশকিল। তার ওপর আবার এক-একটা কথা এই রকম যদি লাখ বার ছড়ানোর বন্দোবস্ত হয়, উপায় কি পাগল না হয়ে?

অনন্ত বলে, আর কথাটাও ভাবুন দিকি! পরশুরাম একুশ বার নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন, তবু জড় মারতে পারেন নি। এরা এমন বাহাদুর যে, দু-চার মাস জেল কি দু-দশ ঘা বেতের বাড়ি দিয়ে ঠাণ্ডা করবে চারিদিক!

উমা টিপ্পনী কেটে বলে, বাহাদুর সত্যিই। পরশুরাম শুধু ডান হাতেই কুড়ুল চালিয়েছিলেন, তাই পেরে ওঠেন নি। সব্যসাচী এরা, ডান হাত বাঁ হাত সমানে চালাচ্ছে। জেল, জরিমানা, অথবা মিলিটারি কণ্ট্রাক্ট, প্রকাশ্য ও গোপন চাকরি—

চারিদিকে নানা গুজব, ছাপানো ও সাইক্লোষ্টাইল-করা নানারকম কাগজ হাতে আসছে, আর উমা বিষম উদ্বিগ্ন হচ্ছে মনে মনে। ভিন্ন জাতের মানুষ এই এরা। চড়কের সময় ঢাকের বাজনা শুনলে সন্ন্যাসীর পিঠ চড়চড় ক'রে ওঠে, এদেরও তেমনি। তার উপর সময় নেই অসময় নেই, অনন্ত 'দাদা' 'দাদা' ক'রে আসছে।

সন্ধ্যার পর একদিন অনন্ত টিপিটিপি এসে উঠল একেবারে তেতলায়। উমা নেই। স্বস্তির শ্বাস ফেলে সে দরজায় খিল এঁটে দিলে। চোখে কালো গগ্‌ল্‌স্, চিনতে পারা যায় না। পুঁটলি থেকে বের করলে চকচকে ছোরা একখানা।

আর ওই টিনের ভিতর কি হে—অত যত্নে কাপড় মুড়ে এনেছ?

অনন্ত বলে, এখন খালি। যাবার মুখে পেট্রোল ভরতি করে দেবে।

একটা যন্ত্র বের ক'রে বলে, দেখে নিন দাদা, তার কাটতে হবে এই রকম ক'রে। টেলিগ্রাফ-লাইন সাবাড় ক'রে তারপরে কাজের আরম্ভ কিনা!

শুনেছ? ম্লানমুখে পান্নালাল বলে, আজ দুপুরেই একটাকে মেরে ফেলেছে রাস্তায় তার কাটছিল ব'লে।

অনন্ত বলে, কাটছিল না, মেরামত করছিল—ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানির লোক। কারও মাথার ঠিক নেই দাদা, না ওদের, না আমাদের।

উমা এসে খিল-দেওয়া দরজা ঝাঁকাচ্ছে। খুলে দিতে অনন্তর দিকে কটমট ক'রে সে তাকালে।

পান্নালাল বলে, বিশ-পঁচিশটা টাকার দরকার প'ড়ে গেল যে!

কি হবে?

কলকাতায় থাকা যাচ্ছে না।

উমা অনুনয়-ভরা কণ্ঠে বলে, তাই চল পানুদা, আমার সঙ্গে সুপ্রিয়াদের গাঁয়ে। তোমার বিশ্রামের দরকার।

পান্না হেসে উঠে বলে, বিশ্রামের তো তোফা জায়গা রয়েছে ভাই। পাকা বাড়ি, পরের খরচ।

গান্ধীর ছোট্ট একটা ছবি টেবিলে, সত্যাগ্রহে চলেছেন, সেই সময়কার। হিমালয়ের প্রত্যন্ত থেকে বঙ্গের সমুদ্র-বিস্তার অবধি নিখিল মানব-মানসের সত্য ও দুঃখের পথে বিজয়-যাত্রা চলেছে যেন। ছবির দিকে তাকিয়ে নিশ্বাস পড়ল পান্নালালের। বলে, যেমন ওই ওঁরা হাজারে হাজারে বিশ্রাম করছেন আজকে। জবরদস্তি ক'রে বিশ্রাম করাচ্ছে।

উমা পাংশু হয়ে ওঠে। বলে, শোন পানুদা, দরজায় শত্রু—হুজুগের সময় নয়। শেষ কথাগুলো ওঁর মনে রেখো।

পুণ্য বৈদিক মন্ত্রের মত পান্নালাল গান্ধীবাণী আবৃত্তি করলে, অহিংসায় স্বাধীনতা যদি না আসে, আমি মরব। আমি মরলে দেশ যেন যে উপায়ে পারে স্বাধীনতার চেষ্টা করে।

অনন্ত বললে, তা গান্ধী তো মারাই গেছেন।

উমা চমকে ওঠে।—বলছ কি?

মরা নয় তো কি! যাকে বলে সিভিল ডেথ।

সহসা ভীষণ হৈ-চৈ উঠল রাস্তায়। অসংখ্য ভারী জুতোর সমবেত ধ্বনি।

পান্নালাল বলে, দিব্যচক্ষে দেখছি, জেলের দুয়োর খুলতে হ'ল ব'লে। বিক্ষুব্ধ কোটি কোটি মানুষকে ঠেকাতে পারে টিয়ার-গ্যাস বা পিস্তলের গুলি নয়—বেঁটে ওই বুড়ো মানুষটি ও তাঁর দলবল।

ট্রামে চলেছে পান্নালাল আর অনন্ত। বড় রাস্তার মোড়ে থামতে জন আষ্টেক উঠল গাড়িতে। বলছে, নামুন তো মশায়েরা। শিগগির নেমে যান, শিগগির।

ট্রলির দড়ি টেনে ধ'রে কেটে দিলে একজন।

দেশলায়ের কাঠি ফুরিয়েছে যে, ও সোনাদা! কণ্ডাক্টরকে হেসে বললে, দাও তো ভাই তোমারটা, সিগারেট ধরাই।

দাউদাউ ক'রে গাড়ির সামনেটা জ্ব'লে উঠল। সারি সারি পিছনে আরও খানদশেক দাঁড়িয়ে গেছে। সমস্ত জ্বালিয়ে দেবে, লঙ্কাকাণ্ড চলবে সমস্ত রাত রাস্তায় রাস্তায়!

ধুলো উড়িয়ে তীরের মত আসে একটা লরি। মানুষ পালাচ্ছে। লরি থামতে না থামতে লাফিয়ে পড়ল লাঠি আর রিভল্‌ভারধারী লালমুখ পুলিসেরা। এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছে, যাকে পাচ্ছে বেদম পিটাচ্ছে, ছুঁড়ে মারছে হাতের লাঠি।

ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকার বিদীর্ণ ক'রে মাথার উপরে অকস্মাৎ আগুনের গোলা লোফালুফি শুরু হ'ল। বর্মার পাহাড়ে জঙ্গলে যে কাণ্ড চলছে, এই কলকাতার বুকের উপর এ-ও প্রায় তেমনি। বড় বাড়ির দোতলার বারান্দা—কংক্রিটের বেষ্টনী। তারই আড়াল থেকে অগ্নিপিণ্ড একের পর এক এসে পড়ছে অবিরল ধারায়। ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিসের দল গুলি ছুঁড়ছে, কিন্তু মানুষ দেখা যাচ্ছে না, দেয়ালের বালি খসিয়ে গুলি নিচে পড়ছে।

ফটক গলির মধ্যে, ভিতর থেকে বন্ধ। লাথির উপরে লাথি মারছে—সেকেলে ভারী দরজা একটু নড়ে না। রাস্তার ওপারের পুরানো লোহার দোকান থেকে একটা জয়েষ্ট নিয়ে আসে সাত-আটজনে। তারই আঘাত দিতে দিতে খিল ভেঙে পড়ল।

বারান্দায় কেউ নেই—কা কস্য পরিবেদনা। অর্ধেক ভরতি কেরোসিনের টিন আর

অজস্র পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি প'ড়ে রয়েছে। আর গোটা কুড়িক স্তাকড়ার পুঁটলি একদিকে—এক-এক টুকরা দড়ি ঝোলানো তাতে। এই এক নূতন অস্ত্র বের করেছে। একজনে দড়ি ধ'রে পুঁটলি ভেজায় কেরোসিনে, পাশের মানুষ দেশলাই জেলে দেয়, জলন্ত গোলা অবিরাম নিচে পড়তে থাকে।

প্রহর দেড়েক রাত্রি। পান্নালালেরা হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌছল শহরের বাইরে বটতলায়। সবশুদ্ধ বাইশজন হাজির; ভোরের ট্রেনে রওনা হবে। নিরন্ধ্র আঁধার—মুখ দেখা যায় না। ফিসফিস ক'রে তালিম দেওয়া হচ্ছে, কে কোথায় নামবে, আত্মগোপন ক'রে কি ভাবে কাজ হাসিল করতে হবে। আঠারোই আগষ্ট—মঙ্গলবার। নিশিরাত্রে চাঁদ ডুবে গেলে ছোট লাইনের সমস্ত ষ্টেশন একসঙ্গে জ্ব'লে উঠবে; পরদিন সকালবেলা লোকে দেখবে ছাইয়ের গাদা।

খুব স্ফূর্তি পান্নালালের। আজকে এই রাত্রেই পৃথিবীর নানা প্রান্তে কত সৈন্য যুদ্ধে যাচ্ছে। এরাও যেন তেমনই একটা দল। কারও সঙ্গে কারও পরিচয় নেই, এক যাত্রায় চলেছে মৃত্যু-আকীর্ণ রাস্তায়।

পান্নালালের হাতে ছোট সুটকেস। তাতে নানারকম জিনিসপত্র—আর আছে গান্ধীজীর ছবিখানা—উমার টেবিল থেকে নিয়ে এসেছে। মনে মনে জপমন্ত্রের মত আবৃত্তি করছে, আঠারোই—রাত্রি যখন ঠিক একটা। কেন চলেছে, পান্নালাল তা জানে না। সে সৈনিক, জানবার গরজ নেই। শুধু এক দুরন্ত ক্রোধ কালকূটের মত দেহমন আচ্ছন্ন ক'রে আছে। লক্ষ কোটি নরনারীর চিত্তবিজয়ী যাট বছরের ত্যাগ আর দুঃখ-বরণে মহিমান্বিত কংগ্রেস রাজার আইনমতে আর জীবিত নেই। নির্লোভ নির্মোহ তার নেতৃবৃন্দ—শ্বেত শুদ্ধ খদ্দরে আবৃত-দেহ, আলাপ করতে যাও,—যা বলছ তাতেই হাসি, হাতজোড় করছেন কথায় কথায়, প্রবলের সঙ্গে শক্তি ও বুদ্ধির যখন মারপ্যাঁচ চলছে, তখনও প্রতি কথায় রসিকতা। বন্দী এঁরা চোর-ডাকাতের মত। ভারতের নির্মল আত্মা কঠিন কারাগারে নিপীড়িত।

কলকাতা থেকে অনেক—অনেক দূরে ছোট লাইনের ছোট ষ্টেশনটি। দুখানা আপ আর দুখানা ডাউন—সাকুল্যে এই চারখানা গাড়ি দিনে রাত্রে চলাচল করে। বাকি সময় প্ল্যাটফর্মের প্রান্ত অবধি বিস্তৃত আশশ্যাওড়া ও ভাঁটের জঙ্গলে মশার গুঞ্জনটুকুও পরিষ্কার শোনা যায়। দিনেও কখন কখন শিয়াল ডেকে ওঠে।

ষ্টেশন-মাষ্টার জয়চন্দ্র সরকারের দশ বছর কাটল এখানে। অন্য লোক এসেই পালাই পালাই করে, তিনি কিন্তু দিব্যি আছেন। পেন্‌শনের আর দু বছর সাত মাস বাকি,

এর মধ্যে আর কোনখানে ঠেলে না দেয়—ভালয় ভালয় এই আড়াইটা বছর কেটে গেলে বাঁচেন। স্ত্রী শহরের মেয়ে, অহরহ খিটমিট করছেন, সুবিধা পেলেই বাপের বাড়ি কিংবা মামার বাড়ি ঘুরতে যান, মেয়ে অণিমাও যায় সঙ্গে। কিন্তু জয়চন্দ্রকে নড়ানো যায় না, পয়েণ্টস্‌ম্যান পুরন্দর সিং ঘর-গৃহস্থালীর ভার নেয় সেই সময়টা। কোম্পানির পেন্‌শন কিংবা যমরাজের পরোয়ানা ছাড়া কেউ তাঁকে নড়াতে পারবে না এ জায়গা থেকে।

দুপুরের গাড়িতে ধবধবে পাঞ্জাবি-পরা এক ভদ্রলোক নামলেন। দেখতে পেয়ে জয়চন্দ্র ছুটতে ছুটতে গিয়ে তাঁকে অফিস-ঘরে বসালেন। অণিমা জানলা ধ'রে দাঁড়িয়ে ছিল, গাড়ির সাড়া পেলে সে জানলায় এসে দাঁড়ায়। হাসিখুশি মেয়েটা, কিন্তু ভদ্রলোক দেখে মুখ অন্ধকার হ'ল, স'রে এল তাড়াতাড়ি জানলা থেকে।

এবং যা ভাবছিল—জয়চন্দ্র এসে স্ত্রীকে ডাকলেন, শুনছ?

এর পরের ব্যাপারও মুখস্থ অণিমার। খবর যাবে ছোটবাবুর বাসায়। ছোটবাবুর বউ এসে পড়বেন, তাকে নিয়ে প্রাণপণে ঘষামাজা লেগে যাবে। কালো রঙে একটু চিকণ আভা ধরানোর চেষ্টা।

কিন্তু গিন্নির আজ মেজাজ খারাপ। তিনি ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, ভাত চাপাতে হবে তো? পারব না, যা করবার কর। এত বলছি, রেণুপদ আসব আসব করছে, মচ্ছব থামাও এখন কয়েকটা দিন।

অস্ফুটকণ্ঠে জয়চন্দ্র বলেন, ইনি তা নন গো।

আরও আগুন হয়ে গিন্নি বলেন, সকলে যা, উনিও তাই। বোকা পেয়ে গেছে তোমাকে। পথ-চলতি মানুষ ষ্টেশনে নামে, মেয়ে দেখার ছুতো ক'রে ভালমন্দ খেয়ে স'রে পড়ে।

আর কথা না বাড়িয়ে জয়চন্দ্র স'রে পড়লেন। গিন্নিও গজর-গজর করতে করতে সরু চাল বের করলেন এ হাঁড়ি ও হাঁড়ি হাতড়ে।

কুটুম্বটি কোয়ার্টারেই এলেন না। ষ্টেশনে ভাত গেল, পুরন্দর সিং দিয়ে এল। মেয়ের বাপ হয়ে জয়চন্দ্র যেন যুক্তকর গরুড়পক্ষী হয়ে আছেন; ছেলেওয়ালারা এসে যা বলবে, তাতেই রাজি। খবর শুনে কাজের ফাঁকে ছোটবাবুর বউও একবার এসেছেন, গালে হাত দিয়ে তিনি বলেন, মেয়েটাকেও সাজিয়ে-গুজিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে অফিস-ঘরে? ওমা, কি ঘেন্না!

খাওয়াটা গুরুতর হ'ল। কুটুম্ব এলে এইটে উপরি লাভ। জয়চন্দ্র গড়াচ্ছেন। অণিমা টিপিটিপি এসে বাপের পাকাচুল তুলতে বসল।

সহসা অতি কাতর কণ্ঠে ব'লে ওঠে, আমি পারি না বাবা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি—আর আমায় টানাটানি ক'রো না।

চমকে ঘাড় তুলে তাকালেন জয়চন্দ্র। মেয়ের দু চোখে জল টলটল করছে।

কি বলছিস?

অণিমা বলে, গুরুঠাকুরের মত এত খাতির-যত্ন কর, সবাই তো মুখ বেঁকিয়ে চ'লে যায়। রাস্তার লোক ডেকে ডেকে এত অপমান কেন সহ্য কর? আমায় দুটো পেটে খেতে দাও ব'লে?

জয়চন্দ্র চঞ্চল হয়ে উঠে বসলেন। এই দেখ কাণ্ড!

মেয়ের চোখ মুছে দিলেন কোঁচার কাপড়ে। তবু কাঁদে। বিব্রত হয়ে বলেন, সে সব কিছু নয়—তোকে দেখতে আসে নি। মানুষ এলেই মায়ে-বেটীতে তোরা আঁতকে উঠবি?

বিশ্বাস করছে না দেখে বললেন, আজ রাত্রে বিষম কাণ্ড হবে এই ষ্টেশনে।

গলা খাটো ক'রে বলতে লাগলেন, খবরদার, খবরদার! কেউ জানতে না পারে, তা হ'লে চাকরি থাকবে না। ষ্টেশন জ্বালিয়ে দেবে স্বদেশিরা, লাইন ওপড়াবে।

চোখের জলের উপর রামধনু ঝিকমিক ক'রে উঠল অণিমার মুখে। ছোটবাবু খবরের কাগজ রাখেন, তাঁদের পড়া হয়ে গেলে বিকেলবেলা সেটা নিয়ে এসে প্রতিটি ছত্র সে যেন গোগ্রাসে গেলে। আইন বাঁচিয়ে এবং নিজেদের যোল আনার জায়গায় আঠারো আনা আখের বাঁচিয়ে যা লেখে কাগজওয়ালারা, তার ভিতর দিয়েও এতদূরে অণিমা দেশের দ্রুত হৃদ্‌স্পন্দন শুনতে পায়। এল বুঝি এতদিনে ভাঁট-শ্যাওড়ায় আচ্ছন্ন ষ্টেশনে, পানা-ভরা নিঃস্রোত ভৈরবের ধারে দুর্মদ সৈনিক-দল—স্বাধীনতার স্বপ্ন অনারোগ্য ব্যাধি হয়েছে যাদের! লাইনের উপর দিয়ে গাড়ি চলার মত নির্দিষ্ট বাঁধা-ধরা জীবন। লাইন ওলটাতে আসছে—অণিমার মন কেমন নেচে ওঠে, লাইন-বাঁধা জীবনটাও উলটে যাবে বুঝি আজকে রাত্রির অন্ধকারে!

ছুটে সে জানলায় গেল, অনেকক্ষণ ধ'রে অনেক উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করে ষ্টেশনের মানুষটিকে। ঈজি-চেয়ারে শুয়ে আছেন, ফরসা জামার হাতা আর মাথার খানিকটা মাত্র দেখা যাচ্ছে।

বেশ মানুষ তুমি বাবা। ষ্টেশনে রেখে এলে, নিয়ে এলে কি হ'ত? আনবে তো বিকেলবেলা? আলো থাকতে থাকতে এনো, ভাল ক'রে দেখব।

কাছে এসে দেখে, জবাব দেবেন কি—জয়চন্দ্র ঘুমিয়ে পড়েছেন।

আকাশ মেঘে থমথম করছে। ষ্টেশন নির্জন। পুরন্দর সিং অবধি ওজন-কলের

পাশে চট পেতে প'ড়ে আছে। কেউ দেখতে পাবে না, একটি বার সে শুধু দেখে আসবে তাঁকে।

কিন্তু ভদ্রলোকই অণিমাকে দেখে ফেললেন।

এস, এস মা। খবর কি? ভাল আছ?

অপ্রতিভ অণিমা তাড়াতাড়ি বললে, ঘুম ভেঙেছে কি না দেখতে এলাম কাকাবাবু। ডাব কেটে আনিগে যাই।

আসতে আসতে ভাবে, এই রকম পোশাকে এসেছেন! বেল্টে আঁটা রিভল্‌ভারটা ধপধপে ওই আদ্দির পাঞ্জাবির নিচে?

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। প্ল্যাট্‌ফর্মে আলো মাত্র একটি। তিনটি জ্বালাবার কথা, মোটের উপর জ্বলছেও তাই। একটি এখানে, আর দুটো জয়চন্দ্র আর ছোটবাবুর কোয়ার্টারে। পুরন্দর সিং কেরোসিন নিয়ে রোজ হারিকেন ভর্তি ক'রে দিয়ে আসে।

অণিমা জিজ্ঞাসা করলে, কি করছেন রে এখন কাকাবাবু?

পুরন্দর বলে, চুল বাগাচ্ছেন হাত-চিরুনি দিয়ে, দেখে এলাম।

ঘণ্টা বাজল। অনেক দূরে অস্পষ্ট গুমগুম আওয়াজ। ডিবা হাতে অণিমা এসে অফিস-ঘরে ঢুকল।

কাকাবাবু, পান।

গাড়ি আসার সময়টায় এই ভিড়ের মধ্যে মেয়েকে দেখে জয়চন্দ্র বিরক্ত হলেন। বললেন, আঁধারে লাইন পার হয়ে এলি, পুরন্দর সিংকে দিয়ে পাঠালেই হ'ত।

অণিমা বলে, রেণুদা আসছেন যে এই গাড়িতে। তুমি বেরিয়ে আসার পর চিঠি এল।

আসছে নাকি? উল্লাসে প্রায় আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি ফুটল জয়চন্দ্রের মুখে। আগন্তুকের কাছে পরিচয় দিতে লাগলেন, এর ন মাসীর ভাশুরের ছেলে রেণুপদ—এম. এ. পড়ে। মাসতুতো বোনের বিয়েয় গিয়ে আলাপ-পরিচয় হয়েছে। বড্ড ভাল ছেলে—বাড়ির ওদেরও খুব পছন্দ। এসেছিস, ভাল হয়েছে খুকী, আমি তো চিনি নে।

গাড়ি এল চারিদিক কাঁপিয়ে। আবছা অন্ধকারে মুখ দেখা যায় না। অণিমা পাগলের মত ইঞ্জিন থেকে শেষ গাড়ি অবধি ছুটছে। ছোট্ট ষ্টেশন—যারা ওঠা-নামা করে, তারা প্রায় সবাই আশপাশের দু-তিনখানা গ্রামের। সকলের মুখ চেনা। এই রাত্রে বর্ষার জল-জঙ্গল ভরা গ্রামে কাদা জোঁক আর কেউটে সাপের মধ্যে নূতন কেউ আসছে না, নিতান্ত যাদের কাঁধে ভূত চেপে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে সেইরকম মানুষ ছাড়া।

পান্নালাল নামল। নেমে সে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। সাব্যস্ত ক'রে ফেললে, কোন্ দিক দিয়ে বেরুনো সুবিধা।

পিছন থেকে হাতে টান আর উচ্ছ্বসিত হাসি।

এই যে রেণুদা, হাঁ ক'রে দেখছেন কি?

সুটকেসের দিকে নজর পড়তে অণিমা সেটা ছিনিয়ে নেয়।

কি ওতে—কাপড়চোপড়? দিন আমাকে, আমি নিয়ে যাচ্ছি। থাক থাক, আমার সঙ্গে ভদ্রতা করতে হবে না। চলুন।

এক হাতে সুটকেস ঝোলানো, আর এক হাত দিয়ে যেন সে পান্নালালকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে চলল। এমন বিপাকে পান্নালাল কখনও পড়ে নি। গেটের দিকে গেল না, নিয়ে যাচ্ছে প্ল্যাটফর্মের শেষপ্রান্তে।

ওই যে আমাদের বাসা। গুমটির ওখান থেকে গুঁড়ি মেরে তার পেরুতে হবে। সত্যি রেণুদা, ভাবতেই পারি নি, আপনি আসবেন এই জংলী পাড়াগাঁয়ে!

নিতান্ত অন্তরঙ্গের মত গা ঘেঁষে চলেছে। হঠাৎ সামনে অণিমার কাকাবাবুটি। যেন সমস্ত দৃষ্টি পুঞ্জিত ক'রে তাদের দিকে তাকাচ্ছেন। অন্ধকারে উজ্জ্বল হিংস্র চোখ দুটি। কাছাকাছি গিয়ে অণিমা বললে, আমাদের কাকাবাবু। বড্ড ভালমানুষ আর বড্ড ভালবাসেন সকলকে। দাঁড়াবেন না রেণুদা, হাত-পা ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে এসে তারপরে আলাপ-টালাপ করবেন।

পান্নালাল যুক্তকরে ভদ্রলোককে নমস্কার ক'রে অণিমার সঙ্গে চলল।

প্লাট্‌ফর্মের শেষে ঢালু জমি, এক-পেয়ে পথ। লাইনের তার ডিঙিয়ে শাপলা-ভরা বিলের কাছে অণিমা থমকে দাঁড়াল।

আপনার নাম রেণুপদ চট্টোপাধ্যায়, এম. এ. পড়েন। বুঝলেন তো?

মুগ্ধচোখে চেয়ে পান্নালাল বললে, বুঝেছি। হাওয়া খেতে এসেছি আপনাদের এখানে, কেমন?

এমন অবস্থায়ও মৃদু হাসির আভা খেলে গেল অণিমার মুখে। বলে, শুধুই হাওয়া খেতে নয় অবিশ্যি। সে থাকগে। খাওয়া হয় নি নিশ্চয়? চলুন। যাকে কাকাবাবু আর ভালমানুষ বললাম, ভালমানুষ উনি মোটেই নন। পুলিস-ইন্‌স্পেক্টর—পীরনগরের পথে খুব আসা-যাওয়া আছে এখানে। আজ সকাল থেকে জাল পেতে ব'সে আছেন।

পান্নালাল দাঁড়িয়ে পড়ল। বলে, তা হ'লে নাই বা গেলাম আপনাদের বাসায়! রসদ কিছু আছে সুটকেসে। ওতেই চলবে। দুঃখিত হলেন?

অণিমা সুটকেসটা নিঃশব্দে তার হাতে তুলে দিলে।

পালান, ওইদিক দিয়ে অমনই মাঠ ভেঙে। ছুটে চ'লে যান।

মেয়েটিকে একবার ভাল ক'রে দেখে নিয়ে পান্নালাল দ্রুতপদে চলল। আর কোনদিন জীবনে দেখা হবে না। মুখ ফিরিয়ে একবার বললে, নমস্কার!

পগার পেরিয়ে দূরবিস্তৃত খেজুর-বনের আড়ালে ছায়ার মত মিলিয়ে গেল।

এতক্ষণে গা কাঁপছে অণিমার। পুলিস-লোকটার সন্দেহ হয়ে থাকে যদি? রেণুপদর সম্পর্কে যদি তদন্ত করতে আসে কোয়ার্টারে? তাকে ধরবে, বাপের চাকরি-সুদ্ধ টান প'ড়ে যাবে, 'কাকাবাবু' ব'লে ত্রাণ পাওয়া যাবে না। নিপাট ভালমানুষ তার বাবা, বাংলা দেশের ছা-পোষা ভদ্রলোকেরা যেমন হয়।

কি হচ্ছে ওদিকে, আশাভঙ্গ ইন্‌স্পেক্টর কি করছে—একটু না দেখে বাসায় ফিরতে পারে না। গাড়ি চ'লে গেছে, ষ্টেশন আবার চুপচাপ। বৃষ্টি এসেছে। ওয়েটিং-রুমের পিছনে বকুলগাছের নিচে ভিজতে ভিজতে অণিমা দেখতে লাগল। না, খাঁচা ভর্তি ওদের। একটা কোথায় স'রে পড়েছে, অতি আনন্দে সে খেয়াল নেই। তারপর মেলা ওয়েটিং-রুমে। স্বাস্থ্যবান হাসিমুখ ছেলেগুলি, কোমরে মোটা মোটা দড়ি বাঁধা। অনাহারে শুকনো মুখ, রুক্ষ চুল উড়ছে, চোখের দৃষ্টিতে তবু বিদ্যুতের আলো। খবরের কাগজে যুদ্ধবন্দীদের ছবি দেখে থাকে, সেই রকম যেন কতকটা।

অনন্তও এদের মধ্যে। অণিমা তাকে চেনে না, কাউকেই সে চেনে না। দলের মধ্যে থেকেও ছেলেটি যেন তবু দলছাড়া।

দিন তো আর একটা সিগারেট।

ইন্‌স্পেক্টর তাড়াতাড়ি সিগারেট-কেস এগিয়ে ধরে। একটা তুলে নিয়ে বিজয়ীর মত অনন্ত ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

হঠাৎ এক বিচিত্র স্বপ্ন ঘনিয়ে আসে অণিমার মনে। রেণুপদ সত্যিই যদি আসে, বিয়ে হয়ে যায়—স্বর্গ হাতে পাবেন তার গরিব বাপ-মা। সুন্দর পাত্র, ভাল অবস্থা, এম. এ. পড়ছে কলকাতার হষ্টেলে থেকে, বাংলা দেশের লক্ষ লক্ষ মেয়ে তপস্যা করছে এমন বরের জন্য। কুশ্রী মেয়েটা কিন্তু আরও বেশি চায়। যাকে রেণুপদ বলে ডাকল, সত্যি সত্যি যদি এইরকম হ'ত তার রেণুদা। কপালের ঘামের মত জীবন থেকে সুখ-দুঃখ যারা মুছে ফেলেছে, দুটো দিন শান্তিতে ঘরে থাকবার জো নেই, যুদ্ধের সৈনিক—প্রিয়তমার সঙ্গে হেসে কথা বলবার সময় কখন?

পান্নালাল ছুটছে, ছুটে পালাচ্ছে। বার বার মনে হচ্ছে অণিমার কথা। কুরূপ, কিন্তু চোখ দুটো ভারি উজ্জ্বল। খনির মধ্যে হঠাৎ-দেখা একজোড়া দামী হীরের মত, অন্ধকারের মধ্যে চোখের আলো ছড়িয়ে সাবধান ক'রে দিচ্ছে—

পালান—ছুটে চ'লে যান।

ক্লান্ত পান্নালাল এক পুকুর-ঘাটে জিরিয়ে নিচ্ছে। শান্তিতে বসা যায় না, কানের কাছে সমুদ্যত চাবুকের মত কালো মেয়েটার কণ্ঠ, পালান।

সুটকেসটা খুললে। রুটিখানা চিবিয়ে নেওয়া যাক। খেতে খেতে সে গান্ধীজীর ছবিখানা দেখে। তপঃকৃশ একখানি শান্ত মুখ—দূর-দূরান্তর পুণ্যনগরে আগাখাঁর প্রাসাদ-কারা থেকে মমতা-মাখা চোখে যেন চেয়ে আছেন। পান্নালালের দু চোখ অকস্মাৎ জলে ভ'রে যায়। মনে মনে বলতে থাকে, পথ আমাদের অন্ধকার, আলো দেখতে পাচ্ছি নে। কিছু বুঝতে পারছি নে। কি করব আমরা? কোন্ পথে চলব?

যখন পনরো-ষোল বছর বয়স, লাঠির বাড়ি আর কারাগারে সে জীবন শুরু করেছে। সামনে অনির্বাণ স্বাধীনতার শিখা, পথের দিকে দেখে নি তাকিয়ে। যখন জেলে থেকেছে, দু-চার মাস তখনই যা একটু অবসর। আজ সন্দেহ হচ্ছে, ব্রতভ্রষ্ট হ'ল কি এতকাল পরে? গ্রামোপান্তে ভাঙা গানার উপর বিভ্রান্তের মত সে ব'সে রইল।

শ্রীমনোজ বসু

সংবাদ-সাহিত্য

তেরো শ পঞ্চাশের অঘটিত মন্বন্তরলব্ধ অর্ধকোটি বাঙালীর অকালমৃত্যুর বিনিময়ে জনগণমন-অধিনায়ক ভারতভাগ্যবিধাতা আমাদিগকে কি কি দিয়াছেন—তাহারই একটা ফিরিস্তি মনে মনে প্রস্তুত করিতেছিলাম। কারণ তেরো শ বাহান্নের বন্যঘটিত আসন্ন মন্বন্তরের ফলে আরও কিছু বিনিময় ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। পূর্ব ফিরিস্তি লইয়া আগে হইতে প্রস্তুত থাকিতে পারিলে আমাদের ঠকিবার সম্ভাবনা কম। দুর্গতদের দুর্গতিনিবারণী রিলিফ ফণ্ডের দুর্গে যাঁহারা সুকৌশলে আত্মগোপন করিয়াছেন তাঁহারা আমাদের তালিকার ভিতর পড়িবেন না, যাঁহারা সরকারী সতর্কতার ফাঁদে পড়িয়া মামলায় ঝুলিতেছেন তাঁহারাও আমাদের ফিরিস্তি-বহির্ভূত থাকিবেন, ইস্পাহানী প্রমুখ যে সকল সহৃদয় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ব্যাজলাভে চাউলাদি বিক্রয় করিয়া মাত্র কয়েক কোটি টাকার মুনাফা করিয়া দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন তাঁহাদিগকেও আমরা হিসাবের মধ্যে ধরিব না, কারণ আর্থিক ঐশ্বর্যকে তুচ্ছ করিবার মত পারমার্থিক শিক্ষা আমাদের আছে। মৃত্যুর বিনিময়ে যে যে অমৃত আমরা লাভ করিয়াছি, ক্ষয়শীল জীবন উৎসর্গ করিয়া যে অক্ষয় সম্পদ আমরা অর্জন করিয়াছি, সেইগুলির কথাই চিন্তা করিতেছিলাম। সে অমৃত আমরা লাভ করিয়াছি সাহিত্য ও শিল্পের মধ্য দিয়া। পাঁচখানি উপন্যাস, দুইখানি

নাটক, এক শ তেরোটি গল্প, দুই হাজার সাত শ বিয়াল্লিশটি কবিতা এবং তিন শ বাইশখানি ছবি—অর্ধকোটি প্রাণের মূল্য হিসাবে নিতান্ত কম নয়। মৃত্যুর দুস্তর সমুদ্রে অমৃতত্বের এই যে কোকনদগুলি বিকসিত হইল, একদা মৃত্যুর সমুদ্র যখন শুকাইয়া সাহারা হইয়া যাইবে সেদিনও এইগুলি মরুভূমির মধ্যে স্থলপদ্মের মত ফুটিয়া থাকিয়া অতীতের স্মৃতি বহন করিবে। বাংলা দেশের চিহ্নও হয়তো ইতিহাস বা ভূগোলের পৃষ্ঠায় থাকিবে না, কিন্তু মরমী কবির টাকায় চারখানি কবিতা, অথবা দরদী নৃত্যশিল্পীর "ক্ষুধায় তাহার মৃত্যু হইয়াছিল" নৃত্য সেই অনাগত ভবিষ্যতে নূতন গণমনের বিস্ময় উৎপাদন করিবে, ইণ্ডিয়া রসাতলে গেলেও তাহার "স্পিরিট" মৌতাতী জনের নেশা জমাইতে কসুর করিবে না।

* * * *

এইরূপই হয়। স্বর্ণলঙ্কা এবং এক লক্ষ পুত্র ও সওয়া লক্ষ নাতি সমেত বিলকুল ধ্বংসমুখে পতিত হইয়া দশমুণ্ড বিশহস্ত রাবণ কবি বাল্মীকির কৃপায় মহাকালের বক্ষে রামায়ণ হইয়া ফুটিয়া আছে। আমরাও থাকিব। তেরো শ পঞ্চাশের মন্বন্তর ছানিয়া কবি ঔপন্যাসিক ও শিল্পীরা অমৃত তুলিয়াছেন, তেরো শ বাহান্নের বস্ত্র-সঙ্কটও বৃথা যাইবে না। গণশিল্পীরা পেন্সিল-তুলি শানাইতেছেন—সময়ের সাদা পর্দায় আমাদের উলঙ্গ অমূর্তিান কল্পনাচক্ষে এখনই দেখিতে পাইতেছি; কালো, মোটা, বেঁটে, লম্বা, রোগা, লিকলিকে, ভুঁড়িওয়ালা, ভুঁড়িহীন, শীর্ণা ও নিবিড়নিতম্বা পুরুষ নারীর দিগম্বর মিছিল—ভবিষ্যৎ মানবের দৃষ্টিক্ষুধার কি পরিপূর্ণ ভোজ! ডুমুরপত্রেরও আবরণ নাই, বল্কলের শোভা—

গোপালদা প্রবেশ করিলেন। "এক অপূর্ব দৃশ্য প্রকাণ্ডাকার জটাধারী মহাপুরুষে"র বেশ, হাতে কমণ্ডলু। ঠিক 'আনন্দমঠে'র শেষ দুই অধ্যায়ে বর্ণিত চিকিৎসকের মত। একটু নাটকীয় ভঙ্গীতে বলিলেন, বৎস, আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাকে লইতে আসিয়াছি।

আমি সত্যানন্দ নহি, সুতরাং জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। গোপালদা কমণ্ডলু হইতে খানিকটা জল লইয়া আমার মুখে ছিটাইয়া দিলেন। গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, তোমাদের কংগ্রেস-সাহিত্য-সঙ্ঘ তুলিয়া দাও, উহাতে আর প্রয়োজন নাই। তোমাদের সাহায্য ব্যতিরেকেই ভারতবর্ষ অচিরাৎ স্বাধীন হইবে।

রহস্যটা কোন্ দিকে গড়াইতেছে, ঠাহর করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। গোপালদা গলায় বজ্রনির্ঘোষ আনিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, আমি ঠিকই বলিতেছি। এগারো শ ছিয়াত্তর সালের মন্বন্তরের পরের অবস্থা স্মরণ কর। তখন বুঝিয়াছিলাম, এদেশে অনেক দিন হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান লুপ্ত হইয়া গিয়াছে—শিখায় এমন লোক নাই; আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি। ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত,

লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। তাই ইংরেজকে রাজা করিয়াছিলাম। ইংরেজী-শিক্ষায় এ দেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে, ইহা জানিতাম। আমার সে ধারণা আজ সার্থক হইয়াছে। তোমরা বহিস্তত্ত্বে সুপণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছ।

আশ্চর্য, গোপালদা কি হিপ্‌নটিজ্‌ম জানেন? তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে হঠাৎ আমার বোধ হইল, আমিই সত্যানন্দ। বলিলাম, প্রভু—

গোপালদা হাসিলেন, বলিলেন, বল বৎস।

কিছু বলিতে পারিলাম না, ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলাম।

গোপালদা বলিলেন, বৎস, অবিশ্বাসী হইও না। প্রমাণ চাও? দিব।

গোপালদা কমণ্ডলু হইতে আবার জল লইয়া আমার মুখে ছিটাইলেন। অকস্মাৎ আমার মাথা কেমন ঘুরিয়া গেল। সম্বিৎ ফিরিয়া পাইতেই অনুভব হইল, আমি রঙমহল প্রেক্ষাগৃহে বসিয়া আছি। আমার বাম পার্শ্বে আকলেজ-সুহৃদ্‌ গোপাল হালদার; দক্ষিণে বন্ধু বলাই অর্থাৎ বনফুল, ষ্টেটসম্যান-সম্পাদকের সহিত ঘনিষ্ঠ বাক্যালাপরত পি. সি. যোশী ও গ্লোব নিউজ এজেন্সীর আমেরিকান কার্যাধ্যক্ষের পাশে সত্যেন মজুমদারকেও দেখিলাম। সম্মুখে রঙ্গমঞ্চের পাটাতনে নাচ চলিতেছে, অন্ধ্রদেশের ধোবারা সোভিয়েট লাল-বাহিনীর বিজয়ে উদ্দাম উল্লাস-নৃত্য করিতেছে। সে কি উন্মাদনা! আমার মাথা আবার ঘুরিয়া গেল, বোধ হইল, ধোবাদের আনন্দোৎসবে গাধারাও যোগ দিয়াছে। সমবেতকণ্ঠের ঐক্যতান-সঙ্গীত রুশবিজয়কে মর্ম্মস্পর্শী করিয়া তুলিয়াছে।

কমণ্ডলু-জলস্পর্শে আশ্বস্ত হইতেই গোপালদা বলিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় একবার ইংরেজের বহিস্তত্ত্ব শিক্ষার সামান্য একটু পরিচয় পাইয়া প্রসন্ন হইয়াছিলাম। ভারতমাতার শ্রেষ্ঠ সন্তান মনস্বী রামমোহন রায়ই মাত্র সেদিন দীর্ঘদিনের জড়তা ত্যাগ করিয়া জাগিয়াছিলেন, স্পেন দেশে স্বাধীন নিয়মতান্ত্রিক শাসনের প্রবর্তনে আনন্দোৎফুল্ল রামমোহন কলিকাতার টাউনহলে ভোজ দিয়াছিলেন। সেদিন একা রামমোহন, আর আজ? দেখিলে না বৎস, মান্দ্রাজী ধোবীরা সুদূর রুশের বিজয়ে কি কাণ্ডটাই না করিল! এ নৃত্যগীত তাহাদিগকে শিখাইয়াছে অন্ধ্রদেশের কৃষাণকর্মীরা। বোঝ, কোথাকার জল কোথায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে। বহিস্তত্ত্বের শিক্ষা আজ সমাপ্তপ্রায়।

ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু ইংরেজ?

গোপালদা নির্ভয় দিয়া বলিলেন, সেদিন ইংরেজ বণিক ছিল, অর্থ সংগ্রহেই তাহার মন ছিল; রাজ্যশাসনের ভার সে লইতে চাহে নাই। মন্বন্তরের পর তোমাদের বিদ্রোহের কারণে তাহারা রাজ্যশাসনের ভার লইতে বাধ্য হইয়াছিল, কেন না, রাজ্যশাসন

ব্যতীত অর্থ সংগ্রহ সম্ভব হইত না। আজ তেরো শ পঞ্চাশের মন্বন্তরের পর রাজা আবার বণিকবৃত্তি ধরিয়াছে, সস্তায় চাউল-আটা খরিদ করিয়া অধিক মূল্যে প্রজার নিকট বেচিয়া

তাহারা প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতেছে। তেরো শ বাহান্নের বস্ত্রসঙ্কটেও যে তাহারা মানচেষ্টারের বিলুপ্ত-প্রায় বস্ত্রব্যবসায়কে পুনরুজ্জীবিত করিবে, তাহার আভাস পাইতেছি। শাসক আবার বণিকবৃত্তি ধরিয়াছেন, সুতরাং তোমাদের আত্মনিগ্রহকারী আন্দোলনের আর কোনই প্রয়োজন নাই। বহিস্তত্ত্বে যাহারা চূড়ান্ত শিক্ষালাভ করিয়াছে, তাহাদেরই থাকিতে দাও বৎস, আইস আমরা চলিয়া যাই।

আমার কণ্ঠে আমার অজ্ঞাতসারে ধ্বনিত হইল, কিন্তু প্রভু, আমরা যে ব্রতে ব্রতী হইয়াছি, তাহা পালন করিব না?

—বৎস, তাহার প্রয়োজন নাই। কংগ্রেস-লীগ এক হইতেছে, আজ ইংরেজের যুদ্ধ তোমাদের জনযুদ্ধ। দেখিতেছ না যুদ্ধজয়ে এ-দেশের কামার-কুমার-চাষা-ধোপারাও নাচিতেছে! বলিতে বলিতে গোপালদা আসিয়া আমার হাত ধরিলেন। আমি মূঢ়ের মত তাঁহার অনুসরণ করিলাম। আর লেখা হইল না। বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।

"তৃতীয় বার্ষিক ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে"র নিমন্ত্রণ-পত্র হইতে উদ্ধৃত করিতেছি: "আজ আমাদের সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সম্মিলিত হ'য়ে জনসাধারণকে নতুন আশায় ও নতুন কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করবার প্রয়োজন যে কত বড়, তা বিস্তারিত-ভাবে বলা বাহুল্য। গত তিন বছর ধ'রে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে আমাদের এই প্রদেশ ছারখার হয়েছে; বিপদ এখনও কাটে নি। বিপদকে প্রতিরোধ করবার এবং ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নবজীবনের সৌধ গড়ে তুলবার কাজে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের দায়িত্ব কারো চেয়ে কম তো নয়ই, বরং বেশি। কারণ তাঁরাই দেখিয়ে দিতে পারেন, বাঁচবার কী উপাদান দেশবাসীর মধ্যে রয়েছে এবং বাঁচবার পথে তাঁরাই সর্বসাধারণকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। সুস্থ জনসংস্কৃতির আদর্শে জাতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতে দেশবাসীর মধ্যে নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চার করবার ক্ষমতা শিল্পী ও সাহিত্যিকদের হাতে। সেই পুনরুজ্জীবনই বর্তমান সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য।"

উদ্দেশ্য অর্থাৎ থিওরি চমৎকার। কাহারও কিছু বলিবার নাই। এবার কার্য অর্থাৎ প্র্যাকটিসে কিরূপ দাঁড়াইতেছে দেখা যাক। এই প্রতিষ্ঠানের বর্তমান বৎসরের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং যুগ্মসম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন শ্রীযুক্ত মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য। সচরাচর সভাপতি এবং সম্পাদকেরাই হন সভা বা প্রতিষ্ঠানের প্রাণ। [একটা ব্যাপার লক্ষ্য করিবার মত এই যে, এই কম্যুনিষ্টশাসিত প্রতিষ্ঠানেও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য—অব্রাহ্মণ-নহ-তুমিরা অর্থাৎ সুধী প্রধানেরা এখনও প্রধান হইবার সুযোগ পাইতেছেন না। অবশ্য এই উক্তি

এই প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ অবান্তর এবং আমাদের রসিকতার সামান্য প্রয়াসমাত্র!] এখন এই প্রাণেদের আধুনিক চাঞ্চল্য বিচার করা যাক। উক্ত সম্মেলনের সময়েই শৈলজানন্দের একটি সবাক ছায়াছবি কলিকাতার কোনও চিত্রগৃহের "রূপালি" পর্দায় মুখর হইয়াছে। ছবিটি আমরা দেখিয়াছি এবং দেখিয়া এত ঘৃণাবোধ করিয়াছি যে, নিজেদের সাহিত্যিক বলিয়া প্রচার করিতে লজ্জানুভব করিতেছি। উপরোক্ত নিমন্ত্রণ-পত্রের প্রত্যেকটি পংক্তিকে শৈলজানন্দের গল্প এবং সংলাপ অন্তত দশ-দশবার জুতাপ্রহার করিয়াছে। "সুস্থ জনসংস্কৃতির আদর্শে জাতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতে দেশবাসীর মধ্যে নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চারে"র ইহাই যদি নমুনা হয়, তাহা হইলে 'চুম্বনে খুন' 'কিসমিস' প্রভৃতি ফাসিষ্ট শিল্পসৃষ্টি কি দোষ করিল? উক্ত প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের একবার সভাপতির কীর্তি দেখিয়া আসিতে অনুরোধ করি।

অন্যতম সম্পাদক ন্যাশন্যাল ফ্রন্টের শিরোভূষণ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চতুষ্কোণে'র সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারাই জানেন, তিনি কি ভাবে "ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নবজীবনের সৌধ" গড়িয়া তুলিবার কাজে তৎপর আছেন। মাণিকবাবু-বিবৃত "সুস্থ জনসংস্কৃতির আদর্শে"র কিঞ্চিৎ আধুনিক নমুনা দিতেছি।

"—ওমা, সুবলবাবু যে! পেন্নাম।

—এ তোমার কেমন ব্যাভার সুখময়ী?

—তোমারি বা এ কেমন ব্যাভার সুবলবাবু, দিন দুকুরে নাগাল ধরা?

দুহাতে কানা ধরে কলসীটা সে নামিয়ে রাখল। যে কাঁখে কলসী ছিল তার উল্টো দিকে বেঁকে বেঁকে সোজা করে নিল কোমরটা। অবহেলার সঙ্গে কাঁধে ফেলা ভিজে আঁচলটি নামিয়ে ধীরে ধীরে ভাঁজ খুলে আবার ভালো করে গায়ে জড়াল।

—গোড়ায় তো ডরিয়ে গেলাম, কোন্ মুখপোড়া উঁকি মারছে গো? শেষে দেখি মোদের সুবলবাবু। নিশ্চিন্দি হয়ে তখন সাঁতার কেটে চান করলাম। ফিক্ করে হেসে লজ্জায় মুখ নামিয়ে মৃদুস্বরে বলল, তোমার জন্যে। সত্যি তোমার জন্যে—কাল ফিরে যেতে হল তোমার!

সুবল ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, কাল তো প্রথম নয়। ফিরেই তো যাচ্ছি। এলে না কেন কাল? রাত দুপুর তক্ শিরীষতলায় মশার কামড় খেলাম। মা মনসা না করুন,—দুহাত জড়ো হয়ে সুবলের কপালে ঠেকে গেল—সাপের কামড়ে মরব একদিন।

সুখময়ী আপসোসের আওয়াজ করল চুকচুক, বালাই ষাট। কিন্তু কী করি, তেনা যে ফিরে এল গো!

—একবার জানান দিয়ে তো যেতে পারতে, সবাই ঘুমুলে পর? ঘুরঘুটি আঁধারে একটা মানুষ হাঁ করে—

—ঘুমিয়ে পড়লাম যে! ওনার সাথে ঝগড়া করে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়লাম।

—ঝগড়া হল? বেশ, বেশ! তা ঝগড়াটা হল কী নিয়ে?

—সোয়ামির সাথে মেয়েমানবের আবার কী নিয়ে ঝগড়া হয়? শাড়ি গয়না নিয়ে।

সুবল হঠাৎ উত্তেজিত, উৎসুক হয়ে বলল, তুমি যত শাড়ি গয়না চাও—

—ইস্? ফতুর হয়ে যাবেন! ছায়ায় চাপা আলো লেগে সুখময়ীর পান খাওয়া দাঁতের ঘষামাজা অংশগুলিতে ভোঁতা ঝকমকি খেলে গেল।—ফতুর নয় হলে। মোর তরে ফতুর হতেই তো চাইছ তুমি হাজারবার। কিন্তু শাউড়ি সোয়ামি যখন শুধোবে মোকে, অ বউ, শাড়ি গয়না কোথা পেলি লো, কী জবাব দেব শুনি? বলব নাকি, কুড়িয়ে পেইছি গো, ঘাটের পথে কুড়িয়ে পেইছি?

—কাল নিয়ে চারবার ঠকালে আমায়।

—ওগো মাগো, ঠকালাম! আমি তোমায় ঠকালাম! ভেস্তে গেল তো কী করব আমি? হাত-পা বাঁধা মেয়েলোক বই তো নই! ঘরের বউ, পরের দাসী, কী খ্যামতা মোর আছে বলো? তোমায় ঠকাব, তোমার জন্তে মরণ হয়েছে আমার? কিছু ভালো লাগে না সুবলবাবু, একদণ্ড ঘরে মন বসে না। মাইরি বলছি, কালীর দিব্যি।

আড় চোখে চেয়ে চেয়ে দ্বিধা-সঙ্কোচের ভঙ্গি করে হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে বুক দিয়ে সে সুবলকে গাছের সঙ্গে চেপে ধরল, মুখ উঁচু করল, সুবলের মুখের কাছে কিন্তু পৌঁছল না।"

* * *

অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয় লিখিত 'অরণি'র "কথাপ্রসঙ্গে" হিটলার-মুসোলিনির ব্যক্তিগত শ্রাদ্ধের সহিত যাঁহারা তাঁহার বক্তৃতা "আমাদের বিমানবহরে"র যোগাযোগ নির্ণয় করিতে পারিবেন, তাঁহারাই উপরে উদ্ধৃত পত্রের "বিপদকে প্রতিরোধ করবার" সঠিক আদর্শের সন্ধান পাইবেন। আর অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

কবি অমৃতকুমার দত্ত আমাদের বর্তমান বস্ত্রসমস্যার চমৎকার সমাধান করিয়াছেন। "শকুন্তলাকে" সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেছেন—

"এখন যদি ডাক দি, যদি বলি—এসো।
এসো তোমার আভিজাত্যকে অতিক্রম করে'

শাড়ী আর সায়ার মিথ্যা মোহকে ছেড়ে
ক্ষণস্থায়ী ঐশ্বর্যের আলো-কে অন্ধ করে'
এসো, আমার এই রিক্ত শূন্য হাতে
রাখো তোমার নরম হাত।"

শকুন্তলারা যদি শাড়ি আর সায়ার মিথ্যা মোহকে ছাড়িয়া আসিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা দুষ্মন্তেরাও না কোন্ ধুতি-লুঙ্গির মোহ ছাড়িতে পারিব। "তোমার আভিজাত্যকে অতিক্রম করে" হইতেই মালুম হইতেছে লেখক কোন্ সম্প্রদায়ের। ইঁহারা যদি একটু চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আসন্ন ঘোরতর বস্ত্রসঙ্কটে সারা বাংলা দেশই মিথ্যা মোহ ছাড়িয়া সরকারকে এবং পুঁজিবাদীদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইতে পারিবে।

—

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করিবার জন্ম যাঁহারা প্রাণপণ করিতেছেন, তাঁহারা সম্ভবত এ যুগের গণমনের খবর রাখেন না। রাখিলে এতখানি উত্তম প্রকাশ না করিয়া তাঁহারা নিরস্ত হইতেন। গণমন (স্ত্রী) বলিতেছেন—

"কালধর্মী রবীন্দ্রকাব্য-দর্শন মুখ্যত অনেকগুলি বাদের ঐক্যতান—ভারতীয় অতিন্দ্রিয়বাদই যার মূল সুর। ওটা আবার ভাববাদী দর্শনের অকৃত্রিম ধুরাধারকও। কিন্তু যে-ফিউদাল ও যৌবন-বুর্জোআ সমাজে ওর কার্যকারিতা সক্রিয় ছিল, সাম্প্রতিক বুর্জোআ সমাজ-ব্যবস্থার গংগাযাত্রায় তার স্বরূপ গলিতকুষ্ঠের মতন ফেটেফুটে বেরিয়েছে।···

রবীন্দ্রনাথ!

যৌবন-বুর্জোআ-র সামাজিক পরিবেশে মন তাঁর দানা বেঁধেছিল। ফিউদাল সমাজের গলিত অংশগুলোর ওপর অস্ত্রোপচার করে শিশু-বুর্জোআ সমাজ-জীবনে যে নবজাগরণের স্পন্দন এনেছিল তারই প্রাণবন্ত সংগীত রবীন্দ্রনাথ শুনেছিলেন, শুনিয়েছিলেন উদাত্তকণ্ঠে। বুর্জোআর উদারতায় তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন···কিন্তু সশ্রেণী সমাজে মানুষের শুভবুদ্ধির ভ্রূণহত্যা যে অবশ্যম্ভাবী শেষবয়সে তার দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করলেও সন্দিহান ছিলেন।"

হিংটিংছট হইলেও "অতিপরিষ্কার ভাব নব আবিষ্কার"। রবীন্দ্রনাথ আর বেশিদিন বাঁচিয়া থাকিলে মার খাইতেন। স্মৃতি-সমিতির কর্মকর্তাদের এ সংবাদ কাজে লাগিতে পারে।

* * *

স্মৃতিসমিতি বলিতে মনে পড়িল, গত ২৪এ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'ম্যুনিসিপাল গেজেট' সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমল হোম "নিখিল-ভারত রবীন্দ্রনাথ-স্মৃতিসমিতি" সম্বন্ধে যাহা